১ম বর্ষ, বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৩৩ সন।

সাধনা।

(গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মাসিক-পত্রিকা।)

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

ভারত-বিখ্যাত ভক্তি-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশীয়

প্রভুপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, সিদ্ধান্তরত্ন

(২৪)

সম্পাদক

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম, এ,

অধ্যাপক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ।

কার্য্যালয় :— শঙ্করপ্রেস, কুমিল্লা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ।৴৹

কুমিল্লা শঙ্করপ্রেসে, শ্রীসুরেশচন্দ্র দে কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাধনা—প্রথমবর্ষ।

লেখকদিগের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি, এ,

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন মালাকার।

শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ বন্দোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র নাথ।

শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীযুক্ত নরহরি দাস ভাগবতভূষণ কাব্য-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ।

শ্রীযুক্ত নবকুমার কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্তভূষণ।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

শ্রীযুত নববল্লভ বিশ্বাস।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

শ্রীযুক্ত প্রভাকর চক্রবর্ত্তী কাব্যনিধি।

প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণকিশোর গোস্বামী বিদ্যাভূষণ এম, এ,

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ব্যাকরণতীর্থ।

প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু বি, এ,

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন।

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গাঙ্গুলী।

শ্রীযুক্ত বিভাসপ্রকাশ গাঙ্গুলী এম-এ,

শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন গোস্বামী।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-বিন্দুঃ—

১ম বর্ষ, বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৩৩ সন।

সাধনা।

(গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মাসিক-পত্রিকা।)

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

ভারত-বিখ্যাত ভক্তি-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশীয়

প্রভুপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, সিদ্ধান্তরত্ন

(২৪)

সম্পাদক

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম, এ,

অধ্যাপক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ।

কার্য্যালয়:— শঙ্করপ্রেস, কুমিল্লা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ।/০

কুমিল্লা শঙ্করপ্রেসে, শ্রীসুরেশচন্দ্র দে কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাধনা—প্রথমবর্ষ।

লেখকদিগের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি, এ,

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন মালাকার।

শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ বন্দোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র নাথ।

শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীযুক্ত নরহরি দাস ভাগবতভূষণ কাব্য-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ।

শ্রীযুক্ত নবকুমার কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্তভূষণ।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

শ্রীযুত নববল্লভ বিশ্বাস।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

শ্রীযুক্ত প্রভাকর চক্রবর্ত্তী কাব্যনিধি।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-বিন্দুঃ—

সাধনা।

(মাসিক-পত্রিকা।)

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা ॥

১ম বর্ষ, { বৈশাখ—১৩৩৩ } ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদি-প্রণয়-ঘন-সারৈঃ সুরভিতাম্।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষম-সংসার-সরণী
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-শিখরিণী ॥

গ্রন্থাদির প্রারম্ভে নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য মঙ্গলাচরণ করিতে হয়, প্রাচীন মহাজনগণের এইরূপ রীতি আছে। শ্রুতিও বলেন "সমাপ্তিকামো মঙ্গলম্ আচরেৎ" "অবাধে কার্য্য-সমাপ্তির ইচ্ছায় মঙ্গলাচরণ করিবে।" তাই আমরা শ্রীপত্রিকার পরিচালনা-সৌষ্ঠব, নির্ব্বিঘ্নতা, গুরুত্ব প্রভৃতির জন্য প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ করিতেছি।—

শ্রীজীব গোস্বামিচরণ ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন, "যদ্যপি শ্রীভগবানের নামরূপ লীলা স্তোত্র প্রভৃতি স্বভাবতই অলৌকিক, অনন্ত ফলপ্রদ, তথাপি যে যে নাম-রূপ লীলা-স্তোত্র পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত ও অনুষ্ঠিত, তাহাদের

অনুষ্ঠানে ফলাধিক্য আছে ; কারণ, সে সকল নাম-রূপ-লীলা-স্তোত্র, সিদ্ধ বাক্যের শক্তি-সমন্বিত, অতএব মহদনুষ্ঠিত নাম-রূপ-লীলা-স্তোত্র প্রভৃতির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণই বিধেয়।"

আমাদের সম্প্রদায়ের প্রধানতম আচার্য্য হইয়াছেন শ্রীপাদরূপগোস্বামী, যাঁর অসামান্য কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-রস-সাগরে নিমজ্জিত হইতে সুযোগ পাইয়াছি—যাঁর সাধন, যাঁর ভগবৎপ্রিয়তা, যাঁর অচিন্ত্য অসাধারণ প্রভাব বিশ্ব-বিশ্রুত—যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরের অন্তরঙ্গ প্রিয়-পার্ষদ—তাঁর অনুগত আমরা তাঁহারই উচ্চারিত শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিতেছি। তিনি যে শ্লোকে শ্রীবিদগ্ধমাধবের মঙ্গলাচরণ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সেই শ্লোক এই নব-পত্রিকার নব-আবির্ভাবে মঙ্গলাচরণরূপে নিয়োজিত হইল। তাঁহার উচ্চারণ-জনিত শক্তি এবং মঙ্গলাচরণের প্রভাব পত্রিকার পরিচালনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর প্রবাহিত হউক।

মঙ্গলাচরণরূপে ব্যবহৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—"হরিলীলা-শিখরিণী তে তব তৃষ্ণাং ক্ষপয়তু,"—কলিহতজীব, "শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ শিখরিণী তোমাদের বিষয়-তৃষ্ণা দূরীভূত করুন।"

দধি দুগ্ধ শর্করা এলাচি সংযোগে নির্ম্মিত শিখরিণী-নামক -পেয় বস্তু, স্বীয় অপূর্ব্ব আস্বাদে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে ও তৃষ্ণা নাশ করিতে ক্ষমতা-শালী। তাই শিখরিণীর সহিত হরিলীলার উপমান-উপমেয় ভাব। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, শিখরিণী যেমন, তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণাকে বিদূরিত করিয়া স্ববিষয়ে তৃষ্ণার উদ্রেক বর্দ্ধিত করে, বারম্বার পান করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেয়—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণলীলাও জীবগত অনন্ত সংসার-বাসনা ধ্বংস করিয়া স্বকীয় আস্বাদন-দানে জীবগণকে আকর্ষণ করুন। যেহেতু সর্ব্ববিধ-আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি ভক্তি-শাস্ত্রের অভিমত নহে। ভক্তিশাস্ত্র শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সেবা-সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষারাশির উত্তরোত্তর প্রাবল্যকে প্রচুর প্রশংসাই করেন। সর্ব্ববিধ বাসনার নিবৃত্তি মায়াবাদীদের মত, সে মত ভক্তদের নিকট উপেক্ষিত ও অনাদৃত।

শ্লোকের তৃতীয় চরণও এই কথারই আভাস দেয়। "সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম বিষম-সংসার-সরণী-প্রণীতাং" যে সংসার-পথের চতুর্দ্দিক আধ্যাত্মিক

আধিভৌতিক আধিদৈবিক এই দুঃখত্রয়ে ভয়ঙ্কর জ্বালাময়—যে সংসার-পথ কর্ম্ম-গতির সমাশ্রয়ে স্বর্গ-নরকরূপ উচুনীচুর যাতায়াতে অতিরিক্ত তৃষ্ণাপ্রদ ও যাতনাপ্রদ, যেখানে প্রতি-পাদ-বিক্ষেপে অনন্ত তৃষ্ণা অনন্ত ক্লেশ অনন্ত পরিশ্রম, সেই সংসার-পথে বিচরণ-হেতু যে তৃষ্ণা—তা'কেই শ্রীকৃষ্ণলীলা-শিখরিণী ধ্বংস করুক, শ্রীভগবদ্বিষয়ক তৃষ্ণাকে নহে।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-শিখরিণীর আস্বাদ অত্যন্ত অধিক। চন্দ্র-সম্বন্ধীয় যে স্বর্গীয়-সুধা, যার আস্বাদে দেবতারা উন্মত্ত, যা'কে নিয়ে দেব-দানবের মহা যুদ্ধ, সেই স্বর্গীয়-সুধার আস্বাদ-গর্ব্বকে খর্ব্ব করিতে লীলা-শিখরিণী সমর্থা।

আবার সেই হরিলীলা-শিখরিণীতে অপূর্ব্ব সৌরভের সংযোগ হইয়াছে—যে সৌরভে লীলা-শিখরিণীতে অভূতপূর্ব্ব-মাধুর্য্যের সমাবেশ। শ্রীরাধাদির প্রণয়রূপ ঘনসারের (কর্পূরের) সংমিশ্রণজাত সৌরভে হরিলীলা-শিখরিণী সুরভিত। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণলীলা জগৎকে এতটা আকর্ষণ করিতে পারিত না, যদি ব্রজবধূগণের প্রীতির সংযোগ শ্রীকৃষ্ণলীলায় না হইত। শ্রীকৃষ্ণলীলার সর্ব্বাধিক চমৎকারিতাই হইল ব্রজবধূগণের সঙ্গে। সেই ব্রজবধূগণের প্রীতিকর্পূর-বাসিত জগৎব্যাপি সৌরভে জগতের আকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণলীলার একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

এইরূপ অদ্ভুত-গুণসম্পন্না হরিলীলা-শিখরিণী শ্রীপত্রিকার নির্ব্বাধ পরিচালনায় পরিচালকগণের সহায়তা করুন, শক্তিদান করুন, অশেষ বাধারাশিকে ধ্বংস করুন এবং স্বীয় আস্বাদেই জগৎকে আকর্ষণ করুন। ইহাই প্রার্থনা।

আর যাঁর করুণায় আমরা শ্রীহরিলীলা-শিখরিণীর সংবাদ পাইতেছি এবং রসিকভক্ত হরিলীলা-শিখরিণী আস্বাদন করিতেছেন; যাঁর অতুল করুণায় আজ বিশ্ববাসী প্রেমধর্ম্মে উন্মুখী, কলিহত জীবের দুঃখে যিনি অতীব কাতর, সেই রাধাভাব-কান্তিদ্বারা আবৃত-কলেবর গৌরবপু শ্রীমন্মদন-গোপাল-দেবকেও আমরা শ্রীপত্রিকার প্রারম্ভে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি করিতেছি, তিনি পত্রিকার সম্পাদক, পরিচালক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলের প্রতিই কৃপা দৃষ্টি করুন—যাহাতে সকলেই তাঁহার প্রসাদে লীলা-শিখরিণীর আস্বাদে উন্মত্ত হয়েন, বিশ্ব ভুলিতে পারেন, এবং তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে অগ্রসর হইতে পারেন। এই প্রার্থনাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে করিতেছি।

শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

নিবেদন।

জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত-চন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

পরমকরুণ গৌরসুন্দর! তোমার চরণে কোটী কোটি নমস্কার। প্রভো! আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি পতিত, তুমি পতিতপাবন; আমি অধম, তুমি অধম-তারণ; তাই বড় আশায় বুক বাঁধিয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম; প্রভো! একবার কৃপানেত্রে এ অধমের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

শুনিতে পাই, স্বতন্ত্র হইয়াও তুমি নাকি প্রেম-বশ; কিন্তু তাতে আমার কোনও ভরসাই নাই; কারণ, আমার চিত্তে প্রেম নাই। শুনিতে পাই, তুমি নাকি ভক্তির অধীন; তোমার ভক্তের মুখেই তুমি নাকি শপথ করাইয়া বলাইয়াছ, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—তোমার ভক্তের নাকি কিছুতেই বিনাশ নাই; কিন্তু প্রভো! তাতেও আমার প্রাণে কোনও ভরসার সঞ্চার হয়না; কারণ, আমি ভক্ত নহি, আমার ভক্তি নাই। শুনিয়াছি তুমি পতিত-পাবন, তোমার ভক্তের মুখেই শুনিয়াছি,

পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।

তাই, আমার প্রাণে একটা আশার ক্ষীণ-রেখা পতিত হইতেছে, তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবনা বলিয়া একটু ভরসা হইতেছে; কারণ, আমি যে প্রভো, নিতান্ত পতিত। প্রভো, তুমি নিজ করুণার বশে যদি পতিতের অনুসন্ধান করিতে থাক, তাহা হইলে

মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।

আমার প্রতি যদি দয়া না কর, তবে হে দয়াময় পতিত-পাবন, তোমার দয়ার পাত্র আর কোথায় পাইবে? এমন পতিত আর কোথায় পাইবে প্রভো!

যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ।

মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥

মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তব দয়াবল॥

তুমি প্রভো, জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ; কিন্তু জগাই-মাধাইর দৃষ্টান্ত মনে পড়িলে আমার সমস্ত আশা-ভরসা উড়িয়া যায় প্রভো! নিরাশার অন্ধকারে সমস্ত হৃদয় ভরিয়া যায়। জগাই-মাধাই পতিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বৈষ্ণব-অপরাধ ছিল না; আমি যে প্রভো, মহা অপরাধী; আমার কি গতি হইবে প্রভো! চাপাল-গোপালের অপরাধ ছিল, শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকটে; তাই যতক্ষণ তাঁহাদের অপরাধ ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত ছিলেন; অন্যের কথা কি বলিব প্রভো, শচীমাতার কথা মনে হইলেই যে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। চাপাল-গোপালাদির সৌভাগ্য এই, যখন তুমি নবদ্বীপে প্রকট হইয়াছিলে, তখনই তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল; তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাদের বলিয়া দিয়াছিলে, কোথায় তাঁহাদের অপরাধ, কিরূপে তাহার খণ্ডন হইবে। কিন্তু প্রভো! হতভাগ্য আমার জন্ম তো তখন হয় নাই — হইবেই বা কেন? এমন শুভ-মুহূর্ত্তে, গৌরের প্রকট সময়ে, এমন মহা অপরাধীর জন্ম কি সম্ভব? তাই তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলাম—অপরাধ-সমুদ্রের অতল-তলে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম।

যখন গৌর নিত্যানন্দ,   অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,

নদীয়া-নগরে অবতার।

তখন না হৈল জন্ম,   এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,

মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥

কিন্তু প্রভো, আমাকে কি এই ভাবেই থাকিতে হইবে? অনাদিকাল হইতে কত অপরাধের-বোঝা টানিয়া লইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতেছি; অনন্তকাল পর্য্যন্তও কি আমাকে তাহাই করিতে হইবে? না করিয়াই বা কি করিব? নিজের দিকে যদি দৃষ্টি করি, তবে বলিতেই হয়, না করিয়াই বা কি করিব? এমন কোন্ গুণ আছে আমার, যাহার প্রভাবে আমার ক্ষীণ মেরুদণ্ড অপরাধের বোঝার পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে?

গণইতে দোষ, গুণ নাহি পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার॥

কিন্তু প্রভো, তুমি তো জগতের ত্রাণ-কর্ত্তা, আর আমিও তো প্রভু জগতের বাহিরে নাই ?

তুহুঁ জগতারণ, জগতে কহায়সি,
জগ-বাহির নহি মুঞি ছার॥

তোমার ভক্ত বলিয়াছেন, লোকের উদ্ধার করাই নাকি, তোমার স্বভাব।

লোক-নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব।

আমার মতন মহা-অপরাধীর কি কোনও ভরসাই নাই প্রভো! আমাকে বাদ দিয়া অপর সকলকে উদ্ধার করাই কি প্রভো তোমার স্বভাব ? আমার দিকে চাহিলে মনে হয়, কখনও তোমার কৃপা পাইতে পারিবনা—কোটি কোটি জন্মেও না; কিন্তু প্রভু, তোমার করুণার দিকে চাহিলে তো এখনও প্রাণে ভরসা আসে ? এই ভরসা কি বৃথা প্রভো! না, না, প্রভো! তোমায় দোষ দিতে পারিনা, তুমি মঙ্গলময়, তোমাতে অমঙ্গল-জনক কিছুই নাই,—থাকিতেও পারেনা। জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি তো সর্ব্বদাই ব্যস্ত প্রভো! নিজের দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অনাদিকালেই তোমার মত দয়ালু প্রভুর সান্নিধ্য ছাড়িয়া দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, সুখ-সমুদ্র হইতে দূরে ছুটিয়া গিয়া গোস্পদাভাসে সুখের খোঁজ করিতেছি, স্নিগ্ধ সলিলা জাহ্নবী হইতে দূরে পলায়ন করিয়া পিপাসা-নিবৃত্তির আশায় মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছি—মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া মায়ার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি। তুমি তাহা দেখিলে, দেখিয়া তোমার করুণ হৃদয়, তোমার দাস-বৎসল হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়া গেল—আমার স্থায় হতভাগ্য মোহান্ধ জীবকে ফিরাইবার নিমিত্ত কত কৌশল করিলে। জীবের প্রতি কৃপা করিয়াই তুমি শাস্ত্র প্রচার করিলে, তদ্দ্বারা জীবের ঘোর মোহ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে; হতভাগ্য আমরা ফিরিয়াও চাহিলাম না। তারপর, নানা অবতাররূপে কত সময় কত উপদেশ দিলে—হতভাগ্য আমরা তাহাতে কর্ণপাতও করিলাম না। মায়িক সুখে মত্ত হইয়া আছি, মায়িক সুখকেই যথাসর্ব্বস্ব মনে করিতেছি, ইহা অপেক্ষা অধিকতর লোভনীয় কিছু যে আছে, সেই ধারণাইতো আমাদের নাই—তোমার

শাস্ত্রের কথায়, তোমার অবতারের কথায় আমরা কর্ণপাত করিব কিরূপে ? আমাদের অবস্থা বুঝিয়াই বোধ হয়, তুমি তখন নিজে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইলে ; অবতীর্ণ হইয়া এমন সব লীলা করিলে, যাহার আনন্দ-চমৎকারিতার নিকটে আমাদের মায়িক সুখ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ; তুমি মনে করিয়াছিলে, বৃন্দাবনের এই আনন্দ-সমুদ্রের কথা শুনিলে জীব আর মায়া-মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইবেনা, তোমার সন্ধানেই চঞ্চল হইয়া উঠিবে।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥

পরম-লোভনীয় বস্তুটী দেখাইলে ; কিরূপে জীব তাহা পাইতে পারিবে, তাহাও বলিয়া দিলে ; কৃপাবশতঃ তুমি বলিয়া দিলে—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

"জীব! তুমি আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর ; তাহা হইলেই আমার এই অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময়ী লীলায় প্রবেশ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে।" আমার মতন হতভাগ্য জীব যাহারা, তাহারা তোমার কথা শুনিয়াও যেন শুনিল না—কাণে শুনিল বটে, কিন্তু কাজে কিছুই করিল না, করিতে পারিল না ; কারণ, কিরূপে তোমার ভজন করিতে হইবে, তাহার একটা আদর্শ তাহারা দেখিতে পায় নাই বলিয়াই বোধহয় তাহারা কাজে কিছু করিতে পারিল না। সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী তুমিও তাহা বুঝিলে ; বুঝিয়া গৌররূপে নবদ্বীপে আসিয়া, জীবের ন্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজে ভজন করিয়া জীবকে ভজন শিক্ষা দিলে। যে লোভনীয় বস্তুটী দ্বাপরে বৃন্দাবনে জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াছিলে, তাহা পাওয়ার উপায়টী নিজে আচরণ করিয়া দেখাইলে—ঐ লোভনীয় বস্তুটী লাভ করিলে যে কত আনন্দ, তাহার কথা তো দূরে, তাহা লাভ করিবার পথে দাঁড়াইলেই যে একটা সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক ও অন্তঃবিস্মারক আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাও তুমি দেখাইলে।

তাই, বলি প্রভো! তোমার করুণার কি অন্ত আছে ? তোমার দোষ দিতে পারিনা। আমার মঙ্গলের জন্য যাহা যাহা করা দরকার, সমস্তই তুমি করিয়াছ—হতভাগ্য আমি, তোমার একটী উপদেশও গ্রহণ করিতে পারিতেছিনা। আমার অপরাধ-খণ্ডনের উপায়ও তুমি বলিয়া দিয়াছ প্রভো! কিন্তু হতভাগ্য আমি—সে

উপায় অবলম্বন করিতে যে আমার মন যায় না! নিত্যসুখের বিপরীত দিকে, আমার অণুস্বাতন্ত্র্যকে অনাদিকাল হইতেই যে একটা গতি দান করিয়া আসিতেছি, তাহার বেগ তো ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হইতেছে, এখন ইচ্ছা করিয়াও তো তাহার গতি ফিরাইতে পারিতেছিনা, প্রশমিতও করিতে পারিতেছিনা প্রভো! কিন্তু আমি ক্ষুদ্র, আমার শক্তিও ক্ষুদ্র; আমার স্বাতন্ত্র্যও ক্ষুদ্র—আমার নিকটে ক্ষুদ্র না হইলেও তোমার বিভু-স্বাতন্ত্র্যের নিকটে অতিক্ষুদ্র। আমার এই অণুস্বাতন্ত্র্য —যাহার অপব্যবহারে আমি তোমা হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, তাহা তোমার বিভু-স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্পূর্ণ রূপে যোগ্য। তুমি সর্ব্ব-শক্তিমান্, প্রভো! তোমার চরণে প্রার্থনা, তোমার বিভু-স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা আমার এই অণু স্বাতন্ত্র্যকে নিয়ন্ত্রিত কর, আমার চিত্তের বহির্ম্মুখী গতি ফিরাইয়া দাও প্রভো! কুলটা রমণী গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়াও সর্ব্বদাই যেমন তাহার নাগরের কথা চিন্তা করে, সেইরূপ নিজের দুর্দ্দৈব-বশতঃ যখন যে কর্ম্মেই রত থাকিনা কেন, সর্ব্বদাই যেন তোমার চরণ চিন্তা করিতে পারি, তাহাই কর প্রভো!

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ-রসায়নম্ ॥

আর, নিজের কর্ম্মফলে যখন যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্ব্বদাই যেন তোমার চরণে মতি থাকে—কৃপা করিয়া, হে পতিত পাবন! কৃপা করিয়া তাহাই করিও, প্রভো, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা।

কিয়ে মানুষ পশু, পাখীয়ে জনমিয়ে
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।

* * * * *

পরমকরুণ গৌরসুন্দর! এ দীনহীনের আরও একটী নিবেদন আছে। তোমার নাম, রূপ, গুণ, লীলা তত্ত্বাদির আলোচনার উদ্দেশ্যে যাঁহারা এই শ্রীপত্রিকার প্রচারে অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহাদেরই কৃপাদেশে এই অধম শ্রীপত্রিকা-সেবার কিঞ্চিৎ আনুকূল্য-চেষ্টায় নিয়োজিত হইয়াছে। আমি কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ, সাধন-ভজন-হীন; তোমার তত্ত্বাদি-আলোচনার সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু প্রভো! তুমি যেমন স্বপ্রকাশ বস্তু, তোমার লীলা-তত্ত্বাদিও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ বস্তু। প্রভো! তুমি ভক্তবৎসল; তোমার ভক্তদের প্রীতির নিমিত্ত

তুমি কত সময়ে কত ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক, তোমার নাম-রূপ-লীলাদিও কত বৈচিত্র্যের সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই, এই দীন-হীনের প্রার্থনা—প্রভো! তুমি কৃপা করিয়া শ্রীপত্রিকার গ্রাহক-ভক্তদের প্রীতির নিমিত্ত এই শ্রীপত্রিকার কলেবরে তোমার নাম-রূপ-লীলাদির তত্ত্ব যেন প্রকটিত কর। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্—তুমি ইচ্ছা করিলেই তাহা করিতে পার; তুমি ইচ্ছা করিলে মূককেও বাচাল করিতে পার, পঙ্গুদ্বারাও গিরি লঙ্ঘন করাইতে পার। তুমি ইচ্ছা করিলে বালকের দ্বারাও সিদ্ধান্তরত্ন প্রকাশ করাইতে পার এই অধমের কথা ছাড়িয়া দেই—তোমার ভক্তদের প্রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তুমি যেন প্রভো, তাহাই কর, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহ-ব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত-সাগরম্॥

আর শ্রীনিতাইচাঁদ! এই শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক প্রভুপাদ তোমারই বংশের উজ্জ্বল রত্ন; তোমারই শক্তির আবেশে শুদ্ধাভক্তি প্রচার করিয়া তিনি জীব-জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এই শ্রীপত্রিকা-প্রকাশও তাঁহার প্রচার-কার্য্যেরই একটা বৈচিত্র্য। তোমার শক্তিতে তিনিই এই কার্য্যের যোগ্য; তাঁহার কৃপা-শক্তিতে তিনি এই অযোগ্য-জড়কেও চালিত করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করাইতে অভিপ্রায় করিয়াছেন নিতাইচাঁদ! এ অযোগ্য দাসাধমের দ্বারা যেন তোমার বংশধরের মর্য্যাদা-হানি না হয়, কৃপা করিয়া তাহাই করিও, ইহাই প্রভু, তোমার চরণে বিনীত প্রার্থনা। আর, পত্রিকা-সম্পাদককে সময় সময় মক্ষিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়—যাহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া অনুমিত হয়, তাহার আলোচনা করিতে হয় হে অদোষ-দরশী নিতাইচাঁদ! প্রয়োজন মনে করিলে শক্তি দিয়া তুমি তাহা করাইয়া লইও; কিন্তু দেখিও যেন প্রভো, এই অধমের বাসনা-কলুষিত-চিত্তে হিংসা-বিদ্বেষের অনল জ্বলিয়া না উঠে; প্রভো! তোমার চরণে প্রার্থনা, যখনই এইরূপ কিছু দেখিতে পাও, তখনই যেন তুমি কৃপা করিয়া তোমার দাসানুদাসা-ধমকে রক্ষা কর, তখনই যেন প্রভো তুমি স্মরণ করাইয়া দাও যে,

নিন্দা নাই নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে।
নিরবধি নিত্যানন্দের নাম লয় সুখে॥

আমি জানি বা না জানি, আমি তো তোমারই দাস, প্রভো! তোমার দাসকে তুমি রক্ষা না করিলে আর কে করিবে?

* * * *

আর শ্রীপত্রিকার গ্রাহক-অনুগ্রাহক ভক্ত-মণ্ডলীর চরণেও এই অধমের একটী নিবেদন আছে। আমি অজ্ঞ, অশেষ দোষের আকর। আপনারা অদোষ-দরশী, পরমদয়াল-বিগ্রহ। আপনাদের সেবায় নিয়োজিত এ দাসানুদাসের সমস্ত অপরাধ আপনারা কৃপা করিয়া নিজগুণে ক্ষমা করিলেই এ অধম রক্ষা পাইতে পারে, কৃতার্থ হইতে পারে। শ্রীপত্রিকার সংশ্রবে এ অজ্ঞ অনেক সময়েই ধৃষ্টতা ও বাচালতা প্রকাশ করিতে পারে। আপনাদের চরণে প্রার্থনা—আপনারা এই অজ্ঞের বাচালতা ক্ষমা করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। এই অজ্ঞের লেখায় অনেক সময়েই অপসিদ্ধান্তাদি থাকিতে পারে; তাহা এই অজ্ঞ বুঝিতে না পারিলেও দৃষ্টিমাত্রেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন; আপনাদের চরণে প্রার্থনা—তখন আপনারা এই অজ্ঞকে অপরাধী করিবেন না; কৃপা করিয়া এই অজ্ঞের ভ্রম-প্রদর্শন করিয়া তাহাকে শোধিত করিয়া লইবেন। আর আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন সর্ব্বদাই সরল প্রাণে বলিতে পারি—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

প্রেমবার্ত্তা।

কলির কীর্ত্তি-কলাপ মর্ত্তে চলিছে প্রবলভাবে!
সত্যের নামে মিথ্যা প্রচার—গুরু-দক্ষিণা লাভে!
ধর্ম্ম কাঁদিছে মর্ম্ম বিদরি, ঘোর অধর্ম্মের হাসি!
ভণ্ড কপট বিকট-নৃত্যে সজ্জন যায় ভাসি!
ধাত্রী-ধরণী আর্ত্তনিনাদে শূন্যে মাভৈঃ বাণী—
"নম কীর্ত্তন প্রেম-বার্ত্তায় দিবে যুগান্তর আনি।"

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস,
চককৃষ্ণপুর, নদীয়া।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন।

[অভিসার-অনুরাগ]

যে প্রেম নিত্য নবীন ভাব ধারণ করিয়া চিরানুভূত প্রিয়-জনকেও নিত্য নবীন-রূপে অনুভূত করায়, রস-শাস্ত্রে উহাই 'অনুরাগ' নামে অভিহিত হইয়াছে। নায়ক ও নায়িকার নানা কার্য্য দ্বারা এই অনুরাগ ব্যঞ্জিত হইলেও প্রধানতঃ তিনটী কার্য্য দ্বারাই উহা অধিকতর প্রকাশ পাইয়া থাকে। (১) নায়ক-নায়িকা কর্ত্তৃক প্রেমোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ভাব-গদ্গদ-কণ্ঠে প্রিয়-জনের রূপ-গুণের বর্ণন; (২) দুর্দ্দমনীয় প্রেমের মোহিনী শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত নায়ক-নায়িকার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা-সূচক আক্ষেপ-উক্তি এবং (৩) প্রেমোৎকণ্ঠার আতিশয্যে অভিসার-প্রবৃত্তা নায়ক-নায়িকার আশঙ্কা, ভয়, উৎকণ্ঠা ও আনন্দ-মিশ্রিত অপূর্ব্ব ভাব-বৈচিত্র্যও উহারই বাহ্য প্রকাশ। বোধ হয়, এ জন্যই অনুরাগ-সূচক কার্য্যের অসংখ্য প্রকার বিদ্যমান থাকিলেও রস শাস্ত্র-কারগণ 'রূপ', 'আক্ষেপ' ও 'অভিসার'—এই তিনটী প্রধান সুস্পষ্ট ও সুন্দর বিষয় অনুসারেই 'রূপানুরাগ', 'আক্ষেপানুরাগ' ও 'অভিসারানুরাগ' নামে অনুরাগের

তিনটী শ্রেণী-ভেদ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, 'পূর্ব্ব রাগ' ও 'অভিসার' এই দুইটীই সরল প্রেম-লীলার সর্ব্বস্ব। যদিও সম্মিলনই পূর্ব্ব-রাগ ও অভিসারের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং প্রিয়-সম্মিলনেই উহাদিগের চরম ও পরম সার্থকতা, কিন্তু পূর্ব্ব-রাগে ও অভিসারে প্রেমের যে অপূর্ব্বত্ব ও চমৎকারিত্ব প্রেমিক ব্যক্তিরা অনুভব করিয়া থাকেন, বোধ হয় প্রিয়-সম্মিলনেও সেরূপ চমৎকারিত্ব নাই। সম্মিলন বিশেষতঃ সম্ভোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিতৃষ্ণা; কিন্তু চির-ব্যাকুলতা, চির-অতৃপ্তি-পূর্ণ পূর্ব্ব-রাগ ও অভিসারের চির-নবীন দর্শন-লালসার বুঝি আর অন্ত নাই। তাই, আমরা দেখিতে পাই যে, বিশ্ব-সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ প্রেম-কবিতার ইহাই চিরন্তন ও শ্রেষ্ঠ উপকরণ। বৈষ্ণব-কাব্যে প্রেমের যে উৎকর্ষ, যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অন্যত্র নিতান্ত বিরল; সুতরাং এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবিদিগের কৃতিত্বের তুলনা-স্থলও বিশ্ব-সাহিত্যে বড় অধিক দেখা যায় না। যাহা হউক, প্রেম-লীলায় অভিসারের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে বাঙ্গালার দুইজন প্রাচীন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতের কবি যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিয়া গোবিন্দদাসের অভিসার-অনুরাগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বৈষ্ণব-কবি-চূড়ামণি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীরাধাকে তিমিরাভিসারে গমনের জন্য প্রোৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রিয় সখীর মুখে বলিয়াছেন,—

"কাশ্মীর-গৌর-বপুসামভিসারিকাণা-
মাবদ্ধ-রেখমভিতো রুচি-মঞ্জরীভিঃ।
এতত্তমাল দল-নীলতমং তমিস্রং
তৎপ্রেম-হেম-নিকষোপলতাং তনোতি॥"

'কুঙ্কুম সুপীত দেহে অভিসারে চলি নারীগণ
উজ্জ্বল আলোক-রেখা প্রকাশিলে নিকুঞ্জ মাঝারে।
সে সবার অকৃত্রিম প্রেম-হেম-পরীক্ষা-কারণ
নিকষ-পাষাণ হেন—নিবিড় তিমির শোভা করে!"

স্বর্ণের অকৃত্রিমতার পরীক্ষা হয় কষ্টিপাথরে; তেমনি অভিসারিকাদিগেরও প্রেমের পরীক্ষা হয় তিমিরাভিসারে; তাই জয়দেব তিমিরাভিসারে প্রস্থিতা সুন্দরীর অঙ্গের ক্ষীণ আলোক রেখাকে কষ্টিপাথরের ক্ষীণ স্বর্ণ-রেখা-রূপে এবং অন্ধকারকে স্বর্ণ-পরীক্ষার প্রকৃষ্ট উপাদান কষ্টিপাথর রূপে বর্ণিত করায় অভিসারের অনন্যসাধারণ উৎকর্ষই পরিস্ফুট হইয়াছে।

মহাকবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দের মুখবন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে নায়ক নায়িকার বাস্তব (realistic) প্রেম-লীলার বর্ণনায় যাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন বলিয়া মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, সেই মহাকবি গোবর্দ্ধন আচার্য্যের অমর-কোষ কাব্য "আর্য্যা সপ্তশতী" গ্রন্থের কোনও অভিসারিকা নায়িকার সঙ্গিনী তাঁহার প্রিয়-সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"দেহ-স্তম্ভঃ স্খলনং শৈথিল্যং বেপথুঃ প্রিয়-ধ্যানম্।
পথি পথি গগনাশ্লেষঃ কামিনি কস্তেঽভিসার-গুণঃ॥

অর্থাৎ—

বারম্বার গতি-রোধ, শৈথিল্য, স্খলন,
দেহ-কম্প, প্রিয়-ধ্যান আর—
সুন্দরি! তেমনি পথে নভ আলিঙ্গন,—
কি গুণের তব অভিসার?

রসজ্ঞ পাঠকদিগকে বলিতে হইবে না যে, এখানে নায়িকার সঙ্গিনীর পরিহাস-উক্তিতে অভিসারের বিঘ্ন ও দোষগুলি বর্ণিত হইলেও উহা দ্বারা সুকৌশলে অভিসারের অনন্য-সাধারণ ভাব-বৈচিত্র্য ও উপাদেয়তাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং সখীর উক্তির আক্ষরিক অর্থ সেই অভিসারের নিন্দা-সূচক হইলেও নায়িকার অভিন্ন-হৃদয়া সহচরী অভিসারের ভাবোচ্ছ্বাস-মাধুর্য্যটী যে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে এবং উহার নিন্দা-চ্ছলে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যেরই রসোদ্গার করিয়া, অভিসারের চমৎকারিত্বই যে প্রকটিত করিতেছে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

মহাকবি গোবিন্দ-কবিরাজের অভিসারানুরাগের পদাবলীতেও অভিসারের এই অসাধারণ ভাব-বৈচিত্র্য ও রস-মাধুর্য্যই পূর্ণ-মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা অন্ধকারাবৃত রজনীতে নানা-বিঘ্ন-সঙ্কুল সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত-কুঞ্জে উপনীত হইয়াছেন, তখন প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাঁহার স্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়াছে; তাই তিনি নিজের বাহাদুরী দেখাইবার উদ্দেশ্যে নহে, কিন্তু পূর্ণ অভিন্ন-হৃদয়তা ও প্রেমোল্লাসের অনিবার্য্য ফলেই প্রেম-গদ্গদ-কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

ধানশী।

"মাধব! কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥ধ্রু॥
মন্দির তেজি যব পদচারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদ-যুগে বেড়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুল-কামিনি তাহে কুহু যামিনি
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর ॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন-আশে কিছু নাহি জানলুঁ
চির-দুখ অব দূর গেল।
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণ- হুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥
(প-ক-ত ৯৭৯ সং পদ)

গোবিন্দদাসের এই সরল ও হৃদয়-স্পর্শী পদে প্রেমিকা-শিরোমণি শ্রীরাধার অতুলনীয় প্রেমের যে অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব প্রকটিত হইয়াছে, আমরা উহার রস-বিশ্লেষণের অক্ষম প্রয়াস দ্বারা রসজ্ঞ পাঠকদিগের রস-ভঙ্গ করিব না; প্রিয় পাঠক! একবার মানস-নেত্রে সঙ্কটাকীর্ণ দুর্গম-পথে অন্ধকারাবৃত ঘোর রজনীতে অভিসারে প্রস্থিতা রাজনন্দিনী সুকুমারী শ্রীরাধার ধ্যান-গম্য রূপটী প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করুন, তাঁহার সমুদ্রবৎ অসীম ও গম্ভীর ভাব-বৈচিত্র্যের অতি-ক্ষুদ্র অংশও হৃদয়ঙ্গম করুন,—তার পরে বলুন, নিষ্কাম প্রেমের সর্ব্ব-

সহিষ্ণুতা ও তন্ময়তার ইহা অপেক্ষা পরাকাষ্ঠা আর হইতে পারে কি? কবিতায় প্রেম-চিত্রেরই বা ইহা অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ আর কিছু থাকিতে পারে কি?

জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ প্রেম-কবিতার ন্যায় বৈষ্ণব-কবির পদাবলীও অধিকাংশই গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। বৈষ্ণব-পদাবলীতে গীতি-কাব্যের উপযোগী ভাব-তন্ময়তা ও ভাবোচ্ছ্বাসই সমধিক লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তা বলিয়া, বৈষ্ণব-কবিরা অনেকেই যে অতি উচ্চ শ্রেণীর স্বভাব-বর্ণনা-শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, উহাও বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক; কেননা, বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাব ও রসের চমৎকারিত্বে বিমুগ্ধ হইয়া, আমরা অনেক সময়েই বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অতুলনীয় প্রেমলীলার পারিপার্শ্বিক বহিঃ-প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিরূপ ফুটিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হইয়া যাই। প্রকৃত-পক্ষে শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার পক্ষেও অনবদ্য শব্দ ও অর্থের মণি-কাঞ্চন-সংযোগের ন্যায় বহিঃ-প্রকৃতিও অন্তঃ প্রকৃতির চিত্র-অঙ্কনে তুল্য নৈপুণ্যেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে; কেননা, যেমন উপযুক্ত শব্দের সাহায্য ব্যতীত ভাবের উপযুক্ত প্রকাশ হইতে পারে না; তেমনি পারিপার্শ্বিক বহিঃ-প্রকৃতির উপযুক্ত চিত্রাঙ্কণ ব্যতীতও অন্তঃ-প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চিত্র পরিস্ফুট হইতে পারে না; এজন্যই জগতের অতি-শ্রেষ্ঠ কবিদিগের কাব্যে আমরা অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃ-প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে প্রায় তুল্য অভিনিবেশ ও প্রায় তুল্য নৈপুণ্যই দেখিতে পাই। পারিপার্শ্বিক বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃ-প্রকৃতির বর্ণনায় যদি বৈষ্ণব-কবিদিগের মধ্যে কেহ তুল্য নৈপুণ্য প্রদর্শিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি গোবিন্দদাস। এ বিষয়ে তিনি বোধ হয় মহাকবি বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে অভিসার-বর্ণনার প্রসঙ্গেই বহিঃ-প্রকৃতি-বর্ণনা-নৈপুণ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অভিসার-লীলায় যেমন অসাধারণ ভাব-বৈচিত্র্য, তেমনি পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিরও নানা চমৎকারিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারেই রস-শাস্ত্রকারেরা 'অভিসার' বিষয়টীকে 'তিমিরাভিসার' 'জ্যোৎস্নাভিসার' 'দুর্দ্দিনাভিসার' 'দিবাভিসার' 'কুজ্ঝটিকাভিসার' প্রভৃতি নানা

শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পদাবলী হইতে এই সকল বিভিন্ন অবস্থার অভিসারের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে গেলে, আমাদের এই প্রবন্ধ শ্রীপত্রিকার অনুপযোগী সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবে এবং তাহাতে পাঠকবর্গেরও ধৈর্য্য-হানি ঘটিতে পারে বলিয়া, আমরা বিশেষার্থী পাঠকদিগকে পদকল্পতরুর দ্বিতীয় শাখার ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পল্লবের ৩০৫, ৩০৯ ৩১৯, ৩২৬, ৩৪২ ৩৪৬ সংখ্যক ও ৩য় শাখার ১৩শ পল্লবের ৯৮৬—৯৯৪, ৯৯৬, ৯৯৯—১০০৪ সংখ্যক বিচিত্র ও উৎকৃষ্ট পদগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা এখানে ঐ পদগুলির মধ্য হইতে শুধু দুই চারিটী পদ উদ্ধৃত করিয়াই গোবিন্দদাসের বর্ণনা-নৈপুণ্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

প্রথমেই বর্ষাকালের একটা গাঢ় অন্ধকারাবৃত রজনীতে অভিসারের চিত্রটী দেখুন,—

"অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।(১)
কত শত কোটি শবদে জিউ কাঁপ॥(২)
তহিঁ (৩) দিঠি জারত বিজুরিক জালা।(৪)
ইথে জনি ছোড়বি (৫) মন্দির বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলি বনমালি।
অন্তর জরজর পন্থ নেহারি॥
ভ্রমই ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার।
তহিঁ বরিখত অবিরত জল-ধার॥
পাঁতর (৬) মা (৭) তেজ আঁতর (৮) বারি।
কৈছে পড়ারব (৯) সো সুকুমারি॥
গুণি (১০) গুণি আকুল চঞ্চল মুরারি।
মীলল আধ পন্থে বর-নারি॥
গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ॥"

(১) ঝাঁপিয়াছে (২) কাঁপিতেছে (৩) তাহাতে (৪) বিদ্যুৎ-শিখা দৃষ্টিকে ঝলসাইয়া দিতেছে (৫) জনি ছোড়বি—পাছে না ছাড়ে (৬) প্রান্তর (৭) মাঝে (৮) অন্তরায় (৯) পার হইবে (১০) গণিয়া, ভাবিয়া।

শ্রীকৃষ্ণের আশঙ্কা ও উদ্বেগপূর্ণ উক্তির ভিতর দিয়া এখানে কবি বর্ষণ-বহুল বর্ষা রজনীর ভীম-কান্ত চিত্রটী কিরূপ চমৎকার-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন! আর ভণিতায় কবির মন্তব্যটী বা কিরূপ অপূর্ব্ব! এরূপ সঙ্কটাকীর্ণ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া যে প্রেমের দেবতা কন্দর্প প্রেমিকা-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে কবি অনুকম্পা-সূচক 'মন্দ' অর্থাৎ মূর্খ ছাড়া আর কি গালি দিতে পারেন।

এরূপই একটা বর্ষার দুর্দ্দিনে দিবাভিসারের একটা চিত্র দেখুন,—

"গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি (১) কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজ-গামিনি হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥(২)
চৌদিশে অথির পবন করু দোল।
জগ ভরি শীকর-নিকর-হিলোল॥(৩)
চলইতে গৌরি নগর পুর-বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥
জানলুঁ গুণবতি পুণ-ফল (৪) সোই।
দুরদিন (৫) কাহুক শুভ-দিন হোই॥

বর্ষার বাদ্‌লা দিনের কি সুন্দর বর্ণনা! সে দিনে মেঘের ঘোরে দিবা কি রাত্রি চেনা যায় না; ঝঞ্ঝা-বাতাস আর জলের ঝাপ্‌টা আসার ভয়ে পুর-বাসীরা যার যার মন্দিরের কপাট বন্ধ করিয়া রাখে, দিবা-অভিসারের এমন উৎকৃষ্ট সুযোগ কি শ্রীরাধা পরিত্যাগ করিতে পারেন? এরূপ দুর্দ্দিনে গজরাজকে গন্তব্য পথে চালাইতে হইলেও মাহুতকে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশাঘাত করিতে হয়, কি গজ-গামিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আত্মহারা হইয়া নিরঙ্কুশ-গতিতেই অভি

---

(১) নিকটে (২) বিস্তার করে, প্রকাশ করে (৩) বৃষ্টি-কণা-সমূহের তরঙ্গ (৪) পুণ্য-ফল (৫) দুর্দ্দিন।

সারে ধাবিতা হইয়াছেন! সুরসিক সখী-স্থানীয় গোবিন্দদাস রঙ্গ দেখিয়া শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,—"ও গো গুণবতি! জানিলাম ইহাই পুণ্যের ফল; দুর্দ্দিনও কাহারো পক্ষে শুভদিন হইয়া থাকে!"

তিমিরাভিসার ও বর্ষাভিসারের এরূপ বিচিত্র বর্ণনা আরও কত আছে; আমরা কত উদ্ধৃত করিব? চলুন পাঠক! এখন একটা বসন্ত-রজনীর জ্যোৎস্না-অভিসারের চিত্র দেখা যাউক। আলঙ্কারিক আচার্য্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য দর্পণ" গ্রন্থে সদৃশ-গুণ দ্বারা সদৃশ-গুণের তিরোধান-সূচক "সামান্য" নামক, অর্থালঙ্কারে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"মল্লিকাচিত-ধম্মিল্লাশ্চারু-চন্দন চর্চ্চিতাঃ।
অবিভাব্যাঃ সুখং যান্তি চন্দ্রিকাস্বভিসারিকাঃ॥

(সা—দ ১০ম পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ—

মল্লিকায় সাজে কেশ-ভার,
গৌর-অঙ্গে সুশীত চন্দন,—
চন্দ্রিকায় অভিসারিকার
অলক্ষিতে সানন্দে গমন!

গোবিন্দদাসও জ্যোৎস্না-অভিসারের এই সুন্দর কৌশলটী পূর্ণ-মাত্রায় প্রকটিত করিয়াই লিখিয়াছেন,—

"কুন্দ-কুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার॥
চন্দন-চরচিত রুচির কর্পূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চান্দনি রজনি উজোরালি গোরি।
হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরি॥ধ্রু॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন-লোচন ভূল।
রঙ্গ-পুতলি কিয়ে রস মাহা বুর॥

পূরতি মনরথ গতি অনিবার।
গুরু-কুল-কণ্টক কি করয়ে পার॥
সুরত-শিঙ্গার-কিরিতি-সম ভাগ।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

'হেরইতে পরিজন' ইত্যাদি অন্তিম পংক্তিগুলির অর্থ এই যে, (শ্রীরাধাকে) দেখিলে (তাঁহার) পরিজনদিগের লোচনও ভুলে অর্থাৎ পরিজনেরাও তাঁহাকে শ্রীরাধা বলিয়া চিনিতে পারেনা; (তাঁহাকে দেখিয়া বোধহয়) রাং দ্বারা নির্ম্মিত (ধবল) পুত্তলিকা যেন পারদের মধ্যে, নিমগ্ন; ('রঙ্গ' ও 'রস' এই শ্লিষ্ট শব্দ-দ্বয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত ধ্বনি-গম্য অর্থ—উল্লাসের প্রতিমূর্ত্তিটী যেন রস-সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে!) শ্রীরাধার উৎকট মনোরথই তাঁহার অবারিত গমনকে সম্পূর্ণ করিতেছে; (এরূপ স্থলে) গুরুজন ও কুলরূপ তুচ্ছ কণ্টকে কি করিতে পারে? (শ্রীরাধার) ভাস অর্থাৎ দীপ্তি সম্ভোগ-সজ্জার (শ্বেতবর্ণ) কীর্ত্তিরাশির তুল্য; (উপমা-অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত ধ্বনি এই যে, শ্রীরাধা এ ভাবে সঙ্কেত-স্থলে অভিসার করায় জ্যোৎস্নাভিসারিকাদিগের সমুচিত শুভ্র যশোরাশি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধার বলিয়া শ্রীরাধাকেই আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে!)

যে মহাকবি অভিসারের এরূপ অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কবিতায় অভিসারান্তে প্রিয়-সম্মিলনের চিত্রটী কিরূপ ফুটিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য পাঠকবর্গের কৌতূহল হওয়া খুব স্বাভাবিক; তাই, আমরা এখানে সেইরূপ একটী মিলনের পদ উদ্ধৃত করিয়াই আজিকার বক্তব্য শেষ করিব।

কামোদ।

"আদরে আগুসরি   রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে   চরণ যুগ মোছই
হেরই চির-থির আঁখি॥
পিরিতি-মূরতি অধিদেবা।(১)
যাকর দরশনে   সব দুখ মীটল
সোই আপনে করু সেবা॥ধ্রু॥

হিমকর শীতল নীরহি (২) তীতল (৩)
করতলে মাজই (৪) মুখ।
সজল-নলিনি-দলে মৃদু মৃদু বীজই (৫)
পুছই পন্থকি দুখ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বূল পূরি
মধুর সম্ভাষই কানু।
গোবিন্দদাস ভণ নিতি নব নৌতুন
রাইক অমিয়া সিনান॥

আমরা রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের সোহাগপূর্ণ প্রিয়া পরিচর্য্যার এবং "হেরই চির-থির আঁখি" ইত্যাদি ভাব-পূর্ণ পংক্তিগুলির সুমধুর ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকটিত প্রেম-পরাকাষ্ঠা ও প্রেম-তন্ময়তার বিশ্লেষণের ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া এই অপূর্ব্ব পদের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিব না ; সুতরাং সহৃদয় পাঠকগণকে নিজ নিজ শক্তি-অনুসারে উহার রসাস্বাদন করিতে অনুরোধ করিয়াই আজিকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ।

স্বস্তি।

সাধনা চিরন্তনী। নিত্য নূতন ভাবে তার বিকাশ। যাঁর "সাধনা", তিনি তাকে জানিয়ে দিলে সংশয় স্থান না পেয়ে পালিয়ে যায়। এবার শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁর ভাব-বিলসিত অঙ্গদ্বারে সেই অপ্রচারিত "সাধনা"কে প্রচার করিলেন। যাঁর পথ চেয়ে সারা বাংলা এত-দিন ব'সে, "সাধনা" তাঁকে জানাবে—দেখাবে।

---

(১) প্রেমের মূর্ত্তিমান্ অধিষ্ঠাতৃ দেব (শ্রীকৃষ্ণ) (২) জল দ্বারা (৩) সিক্ত (৪) মার্জ্জিত করে (৫) বাতাস করে।

ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চনা আর হরিনাম—সকলইত সাধনা। তার পূর্ণ সফলতা প্রীতিতে—সম্বন্ধ-জ্ঞানে—সেবায়। সিদ্ধি সাধনারই। প্রীতিতেই প্রত্যক্ষ-দর্শন ও আনন্দ স্বরূপানুভব। আনন্দময়ের সেবাই সুখানুভব। শ্রীগৌরসুন্দর হ্লাদকারী বিগ্রহ। অভক্ত অসুর প্রতি তাঁর আনন্দ-কিরণপাতে জ্বালা সঞ্চার। শ্রীকৃষ্ণ সুখ-স্বরূপ। প্রতিকূলস্বভাব কংস তাঁকে মূর্ত্তিময় মৃত্যু ব'লেই দেখে'ছিল।

জগৎ চায় সত্য সুন্দর ও পূর্ণ আনন্দকে। ছোট বড় সবাই কেবল আপন-স্বরূপের পূরণ আর স্ফূরণে অনাদিকাল স্পন্দিত। কত ছন্দেই না নৃত্য আর কতই না নূতন সুরে গান গাওয়া। পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের ত আর অবধিই নেই। নিত্য আনন্দের ছন্দঃ কোথাও খুঁজে না পাওয়াতেই তার অযথা শ্রম আর ক্লান্তি। নিত্যানন্দের ছন্দেই তার স্পন্দনের চরিতার্থতা। সে সুরেই তার গান গাওয়ার পরিণতি। তাঁরই দেওয়া বসনে ঢাকতে হবে। যেটি চির নির্ম্মল,-চির সুন্দর,-চির উজ্জ্বল।

এই সাধনা স্বপ্নরাজ্যের রাজকন্যার মতন নিরাবিল সুখে জীবন যাপন কর্ব্বে, আশা করা অনুচিত। তবুও কেন জানি মনে হয়, প্রতিদিন এই ভক্তিসাধনার অমিয়া-আস্বাদ-লোভে সকলেই তাকে গ্রহণ কর্ব্বেন। নূতন যাত্রী সাধনার গতি কোথায়, কেমনে বলিব ; কিন্তু তার অঙ্কেও আমাদের অনেক দুঃখ দূর হবে এই ভরসা। আমরা সাদরে সাধনাকে অভিনন্দিত কচ্ছি। শুভ-তৃতীয়ার সম্বন্ধ পেয়ে সাধনাও অক্ষয় হোক।

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী এম, এ,
ঢাকা।

পুরুষ-প্রয়োজন।

"পুরে—দেহে শয়ন করে" এই যৌগিক বৃত্তি-নিষ্পন্ন অর্থে 'পুরুষ' শব্দে জীবমাত্রকে বুঝিতে হইবে, পুংমাত্র নহে। জীবমাত্রের যে বস্তুতঃ স্বাভাবিক

প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন-বুদ্ধি, অর্থাৎ জীবসকল যে বস্তুর জন্য সতত ব্যাকুলিত-চিত্তে ইতস্ততঃ ধাবমান, এমন কি আত্ম-পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত নহে, সেই বস্তুই পুরুষ-প্রয়োজন বা পুরুষার্থ।

এই পুরুষ-প্রয়োজন বা পুরুষার্থ-বস্তু কি? তাহা আমরা ভালরূপে বুঝিতে চেষ্টা করি। আমরা জড়জগতের জীব, আমাদের বুদ্ধি প্রাকৃত উপাদানে গঠিত, বেশী দূরে যাইবার শক্তি নাই; তথাপি যতদূর সম্ভব সূক্ষ্মভাবে দার্শনিক-তত্ত্বের ভিতর দিয়া যদি প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাই, অবশ্যই বুঝিতে পারিব। যদি আমরা প্রথমতঃ — কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষি-প্রভৃতি ইতরপ্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যপর্য্যন্ত জীবগণের চরিত্র বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করি, তবে দেখিতে পাই—সকলেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তুল্য বস্তুতে, সকলেই তুল্য-বস্তুর জন্য লালায়িত।

এখনও বোধ হয় বস্তুটী সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিতেছেনা। আমরা মানুষ, অতএব মানুষের কাছে গেলই বস্তুটির পরিচয় উত্তমরূপে পাইতে পারিব, সন্দেহ নাই। আমরা এবার প্রত্যেক মানুষকে একটি প্রশ্ন করিব;— "ভাই! বল ত আমাদের কোন্ বস্তুতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনবুদ্ধি—কোন্ বস্তুর জন্য আমরা লালায়িত?" এই প্রশ্নের উত্তরে কি বালক, কি যুবা, কি প্রৌঢ়, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি রাজা, কি প্রজা, কি অজ্ঞ, কি বিজ্ঞ—সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিবে,— আমাদের "সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তিতে" স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি, ইহাই আমাদের প্রয়োজন, ইহার জন্যই আমরা লালায়িত, এমন কি আত্মোৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত নহি।

এজন্য অনেক দার্শনিকগণই এই সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিকেই পুরুষ-প্রয়োজন বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যাহাতে জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি, সেই 'সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিই যখন পুরুষার্থ বস্তু বলিয়া অবিসংবাদিভাবে সর্ব্বসম্মত, তখন এই পুরুষার্থলাভের নিমিত্ত শাস্ত্রজিজ্ঞাসার আবশ্যক কি?—এজগতে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির নানাবিধ উপায় ত আমরা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছি! সুতরাং তজ্জন্য পরোক্ষবাদ-শাস্ত্রসমালোচনাদ্বারা এই সরস জীবনটাকে নিরর্থক নীরস করিবার প্রয়োজন কি? অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ—বাড়ীর প্রাঙ্গণে যদি মধু পাওয়া যায়, অর্কে

সেই মধু আহরণের জন্য দুর্গম পর্ব্বতে গমন করিবার প্রয়োজন কি ? আমরা প্রথমতঃ সাংখ্যশাস্ত্রের অভিমত কিঞ্চিৎ উত্থাপন করিয়া, এই পূর্ব্বপক্ষটী সমাধানের চেষ্টা করি—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥"

—সাংখ্যকারিকা।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ-দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রজিজ্ঞাসা প্রয়োজন। কিন্তু ঐ দুঃখত্রয় বিনাশের উপায় প্রত্যক্ষগোচর হয় বলিয়া, শাস্ত্রজিজ্ঞাসা নিরর্থক। যেহেতু—শারীরিক ও মানসিক ভেদে আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার। তন্মধ্যে বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাদির বৈষম্য-জনিত জ্বরাদি রোগ—শারীরিক দুঃখ; এ দুঃখ কটু-তিক্ত-কষায়াদি ঔষধ সেবন-দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। কামক্রোধাদি ও প্রিয় বিরহাদি-জনিত মানসিক দুঃখ, মনোজ্ঞবনিতাবিলাস-সুরাপান-স্রক্‌চন্দন-বিলেপনাদি ও প্রিয়-সমাগমাদি-দ্বারা নিবৃত্ত হয়। মনুষ্য-পশু-পক্ষি-সরীসৃপাদি-প্রাণিগণ হইতে সমুৎপন্ন—আধিভৌতিক দুঃখ, ইহা নিরুপদ্রব স্থান আশ্রয়াদি দ্বারা দূরীভূত হয়। যক্ষ-রক্ষঃ-বিনায়ক গ্রহাবেশ হইতে সঞ্জাত—আধি-দৈবিক দুঃখ; ইহা প্রতীকারের নিমিত্ত মণি মন্ত্রৌষধাদি প্রয়োগই সহজ উপায়।

সুতরাং দুঃখত্রয়নিবৃত্তির এসকল উপায় থাকিতে শাস্ত্র-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি ? এমত আশঙ্কা সমীচীন হয়না। কারণ, এইসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ উপায়দ্বারা যদি বা দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি হয়, তাহা অতি অল্পকালের জন্য, পুনরাবৃত্তিহীনরূপে নহে। অতএব প্রত্যক্ষভূত উপায় সকল দ্বারা দুঃখরাশি হইতে অবশ্যম্ভাবী ও চিরস্থায়িরূপে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব বলিয়া, অবশ্যম্ভাবী ও পুনরাবৃত্তি-হীনরূপে দুঃখত্রয়নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা নিতান্ত আবশ্যক। এজন্য শাস্ত্রজিজ্ঞাসা নিষ্ফল নহে, পরন্তু বিশেষ ফলোপধায়ক। প্রত্যক্ষবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষটি নিরসনকল্পে আমরা সাংখ্যশাস্ত্র হইতেও এই অনুকূল যুক্তিটি পাইলাম।

এই জড়-জগতে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির যে সকল উপায় আমাদের

করণাপাটব এই চতুর্ব্বিধ দোষে দূষিত বলিয়া, আমাদের প্রত্যক্ষাদিও দূষিত। কোনও বস্তুর তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, দার্শনিকগণ আট প্রকার প্রমাণ অবলম্বন করিয়া থাকেন (প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি—প্রমাণ হইতেই প্রমেয়বস্তুর সিদ্ধি হয়।) যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য। তন্মধ্যে দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের মতে, একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণই স্বীকৃত। বৈশেষিক মতে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতে—প্রত্যক্ষ, শব্দ ও অনুমান, এই তিনটী প্রমাণ। নৈয়ায়িকমতে—প্রত্যক্ষ, শব্দ, অনুমান ও উপমান এই চারিটি প্রমাণ। মীমাংসকমতে—প্রত্যক্ষ, শব্দ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয়টী প্রমাণ। পৌরাণিকমতে—প্রত্যক্ষাদি ছয়টি ও সম্ভব, ঐতিহ্য-এই আটটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রমাণ-কর্ত্তার ভ্রমাদি চারিটী দোষ, এই সকল প্রমাণে সংক্রমিত হয় বলিয়া লৌকিকালৌকিকী-বস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞানের নিদানভূত অপৌরুষেয় বচনরূপ শ্রুতিই নিখিল প্রমাণের শিরোভূষণ। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"—অপৌরুষেয় শব্দকদম্বই শ্রুতির মূল, এজন্য শ্রুতি বা শ্রুতিমূলক শব্দই নিরবদ্য প্রমাণ।

সুতরাং সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণের যে সকল অভিমত আছে, ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব ঐ সকল মতের খণ্ডন পূর্ব্বক, অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলিয়াছেন, "কিন্তু সর্ব্বেশ্বরাভিখ্যস্য পুরুষোত্তমস্য স্বরূপতো গুণতশ্চ পরিজ্ঞানং স্বজ্ঞানপূর্ব্বকং তদৈব কল্প্যতে" ইতি। স্ব-স্বরূপ-জ্ঞান-পূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বর-নামক পুরুষোত্তমকে স্বরূপে ও গুণেতে বিশেষরূপে জানাই সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তির আত্যন্তিক-সিদ্ধির নিমিত্ত কল্পিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরহরি দাস, ভাগবতভূষণ
কাব্য-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ।
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

সুখের খেলা।

যা'র সারাটা জীবন শুধু দুঃখের সহিত খেলা, সে যাচ্ছে সুখের খেলার সম্বাদ দিতে। কথাটা "বন্ধ্যার ঘরের নাতি"র মতন খুবই হাস্যাস্পদ বটে, তবু শ্রীবৈষ্ণব-চরণ রেণুর নাকি অচিন্ত্য প্রভাব আছে, তাই প্রথমতঃ শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-পদরজঃ নমস্কার ক'রে তাঁর প্রভাবে পবিত্রতম অচেনা রাজ্যের খবর কিছু ব'লে ও লিখে যদি কৃতার্থ হ'তে পারি, তজ্জন্যে চেষ্টা করছি।

সবটা জগৎ এক একটা খেলা জুড়ে' আছে—কেউ কেউ চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানী বস্তুর সহিত, কেউ বা অচিৎ অর্থাৎ জড়-বস্তুর সহিত। "চিদ্বস্তুর সহিত জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের—আর জড়-বস্তুর সহিত কর্ম্মী এবং মায়ামুগ্ধ জীবের খেলা। আবার এঁদের সহিত মিলে' সুখও নিত্য নানা খেলা খেলছে।

কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, সুখের খেলা মাত্র বুকের মাঝখানে, সুখ নাকি মাত্র হৃদয়ের বস্তু, (১) মন ছাড়া কেউ আর তা'কে দেখতে পায় না; মনের নাকি সে একটি একচেটিয়া সম্পত্তি। বাস্তবিক আমরাও এরূপই অনুভব করি।

আবার বৈষ্ণব-দার্শনিকেরা বলেন, শাশ্বত সুখ, মূর্ত্ত হ'য়ে নাকি চোখের মুখের বুকের সামনে থাকে, বুকের নাকি ভিতর বাহির জড়িয়ে বসে' থাকে, সেই মূর্ত্ত সুখ হ'তে নাকি শত শত বৈচিত্রী-সুরধুনী, শতমুখী হ'য়ে প্রবাহিত হয়—যদি তাঁ'কে বুঝতে পারে, ধরতে পারে, রাখতে পারে; নচেৎ সে নাকি একটা পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে (২) নিজের নিত্য সঙ্গীদের সঙ্গে নিত্যলীলা বিস্তার ক'রে থাকে। সে খেলা নাকি পূর্ব্বে ছিল, পরেও থাকবে, এখনও নাকি আছে, (৩) তাঁর সঙ্গী বই আর কেউ নাকি ও খেলা দেখতে পায় না।

কথাটা হেয়ালীর মত রহস্যময় হ'লেও, জটিল হ'লেও শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যদের কৃপায় অনেকটা সোজা হ'য়ে পড়েছে, তাই তাঁদের মতে সুখ

(১) "সত্ত্বাত্মকঃ আন্তরধর্ম্ম-বিশেষঃ সুখং" যোগদর্শন-টীকা, "অনুকূলতয়া বেদনীয়ং সুখং" ন্যায়শাস্ত্র।

(২) "নাহং সর্ব্বস্য প্রকাশো যোগমায়া-সমাবৃতঃ।"—গীতা।

(৩) যদ্‌গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ।" শ্রুতি।

সুখ কে, তাঁর স্বরূপ কী, কেমন ক'রে দর্শন হয়, এই বিষয়ে আপাততঃ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

শ্রুতি বলেন, "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" "শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময়। সেই আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণকে কিম্বা তাঁর অভিব্যক্তিবিশেষকে লাভ ক'রে এই জীব সুখী হ'তে পারে।" "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এই বেদান্তসূত্রে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীকৃষ্ণকেই আনন্দের মূল স্বরূপ ব'লে প্রমাণিত করে'ছেন।

জলীয় বাষ্পরাশি প্রথম আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কেউ তা'কে দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা হাওয়া লাগ্‌লে পরেই জমাট বেঁধে' শিলারূপে পরিণত হয়। অদৃশ্য হ'লেও সেই বাষ্পরাশি যেমন ঘনীভূত হ'য়ে লোকের নয়নের সাম্‌নে আসে, সেইরূপ নিত্যসুখ-বস্তুটী অদৃশ্য হ'লেও শুধু সূক্ষ্ম অবস্থা মাত্র তাঁর একটা থাক্‌লেও (৪) যখন ভক্তের পরিপক্ক-ভক্তিরূপ ঠাণ্ডা হাওয়ার সম্পর্ক তাঁর সহিত হয়, তখন সে আর অদৃশ্য থাক্‌তে পারে না, হস্তপদ-সমন্বিত হ'য়ে ঠিক আমাদের মত মূর্ত্ত হ'য়ে নয়নের সাম্‌নে এসে' দাঁড়ায়, এবং নানা খেলা খেলে। অধিক কি? নিত্য ভক্তদের ভক্তিরূপ শৈত্য বস্তুর সম্পর্কে দক্ষিণ মেরুর তুষার-রাশির মত যে সদা সর্ব্বদা মূর্ত্ত হ'য়ে আমাদের মত মানুষ হ'য়ে আছেনই, নিত্য নানাবিধ খেলা খেলেনই। এরূপ কথা শ্রুতিতেও যেন শুনা যায়, "চিদ্‌ঘনঃ আনন্দঘনঃ ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।" "ভক্তিযোগে জ্ঞান ও আনন্দ, ঘন অর্থাৎ মূর্ত্তরূপে প্রকট হয়।" এ যেন সুখের মূর্ত্ত হওয়ার কথা।

জীবের এই মূর্ত্ত সুখের যথাযথ অনুভূতির ক্ষমতা আসে—ধ্রুবানুস্মৃতির পর; যখন গঙ্গাস্রোতবৎ অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী মনোগতি (ধ্রুবানুস্মৃতি) সেই মূর্ত্ত সুখের চরণ-প্রান্তে লুটিয়ে পড়ে, তখন প্রথমে সে মনে অনুভূত হয়। পরে চোখে বুকে নাকে তাঁর দর্শন স্পর্শন ও সৌগন্ধ প্রতিফলিত হয়। এই হ'তে জীবের সত্য আনন্দের খেলা দেখ্‌বার অধিকার। (৫)

(৪) ব্রহ্ম-পরমাত্মরূপে।

(৫) শ্রীভাষ্যে এরূপই উল্লেখ আছে। শ্রীজীব গোস্বামিচরণ ভক্তিসন্দর্ভে

মায়িক জীব যে আমরা, আমাদের সহিতও একজাতীয় সুখ খেলা করে। হউক সে ক্ষণিক, হউক সে পরিণামে দুঃখপ্রদ, কিন্তু তাঁর একটা অনুভূতি তো আমরা পে'য়েই থাকি। যদিও ঠিক সুখ নামে তাকে বলা নাও যে'তে পারে, অন্ততঃ সুখাভাস তো বলতে হ'বেই—যার লালসায় আমাদের অনন্ত ক্রিয়ার বিকাশ, যার আশায় আমাদের ঘর, বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি।

আরণ্যক-শ্রুতি বলেন, এই যে আমাদের অনুভূত সুখ, ইহা সত্য মূর্ত্তি সুখেরই একটা খেলা-বিশেষ। মায়িক জীবকে বাঁচিয়ে রাখতে (৬), তাদের নিখিল ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ করতে, সত্য নিত্য সুখের সন্ধান দিতে সেই সুখ-রূপী শ্রীকৃষ্ণই মায়াতে স্বীয় সুখাংশের আভাস ফেলিয়ে রাখছেন—যা' নিয়ে কর্ম্মী ও মায়ামুগ্ধ জীবের খেলা। উহা ঠিক সুখ নয় ব'লেই তাদের দুঃখের মাত্রা সমধিক।

যেমন চাঁদ উঠেছে আকাশে, সরোবরে পড়েছে তার একটা প্রতিচ্ছবি, একটি অবুঝ বালকের সাধ হয়েছে চাঁদ ধরতে, বালক চাঁদ ধরবার আশায় জলেই চাঁদ আছে মনে ক'রে বেশ সাবধান হ'য়ে সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, অনেক চেষ্টা করল, নাকে মুখে জল গেল, দুঃখ পে'ল, পরিশ্রান্ত হ'ল, কিন্তু চাঁদ ধরতে পারল না—চাঁদের একটা আভাস বারম্বার পরিলক্ষিত হ'ল মাত্র। এইরূপ জাগতিক সুখ সেই শাশ্বত সুখের আভাস, জগতের লোক তা' দে'খে রমণীয় ব'লে বোধ করে; কিন্তু ঠিক বস্তু সে নয়। ঠিক বস্তু মায়ার অতীত দেশে বিদ্যমান। এ সুখ মায়া অর্থাৎ প্রতারণা-শক্তির কার্য্য ব'লে, নশ্বর ও মহাদুঃখ পাবার একটা ফাঁদ মাত্র।

যেমন সুখের মুখ্য-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ; তেমনি তাঁর মুখ্য-খেলবার স্থানও শ্রীবৃন্দাবন। সেখানে সুখের উদ্ভট তাণ্ডব-লীলা ঘরে ঘরে দুয়ারে দুয়ারে পথে পথে চত্বরে চত্বরে। সুখ সেখানে শত শত লীলা-কুসুম দিয়ে মুহুর্ম্মুহু মালা তৈরী করছেন, যাঁর সৌরভে ভক্তের তনু-মন আনন্দিত এবং নিজের চেষ্টার সফলতায় নিজেই নাকি সুখ পরম সুখী হ'ন। তাই দার্শনিক কবি কৃষ্ণদাস তার-স্বরে

(৬) "এতস্যৈব মাত্রামুপজীব্য জীবন্তি জীবাঃ"—বৃহদারণ্যক।

গে'য়ে গেছেন "সুখরূপী কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন"। হাতের পুতুলের মত সুখ নাকি সেখানাকর লোকের অধীন, "কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় তুমি আমি সম।"

সেখানে নাকি তাঁর সঙ্গীদের ভাবানুসারে কখনো বাল্য, কখনো পৌগণ্ড, কখনো কৈশোর মূর্ত্তি—সুখ আবির্ভূত করেন। সেখানকার লোক যেমন সুখকে খোঁজে, তেমনি সুখও নাকি কা'কেও বাবা, কা'কেও মা, কা'কেও প্রিয়া ব'লে খুঁজে খুঁজে বেড়ান। স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের ত্র্যংস্পর্শে সুখের দানশীলতা নাকি সেখানে উথ্‌লে' পড়েছে।

বাল্যমূর্ত্তি সুখ ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর পা দিয়ে' পার হ'তে পারে না ব'লে মা আমায় পার কর ব'লে নাকি কেঁদে আকুল হন! সেই সুখই নাকি আবার সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণব্রহ্ম! অহো কি অদ্ভুত খেলা। তাই উপাধ্যায় রঘুপতি আবেগভরে ব'লেছেন,

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভজন্তু ভবভীতাঃ
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম।

"ভবভয়ে কাতর হ'য়ে কেহ কেহ শ্রুতি-শাস্ত্রের বিচারে তৎপর হউন, কেহ বা স্মৃতি-শাস্ত্রের গবেষণা করুন। আমার কার্য্য কিন্তু আর কিছুই নেই। আমি কেবল নন্দবাবার চরণ দু'টী বন্দনা কর্‌ব। যেহেতু মূর্ত্ত-আনন্দ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বাবার আঙ্গিনার মাঝখানে খেলা করেন। শুধু নন্দবাবা তুষ্ট হ'লেই সুখ আমার হাতের মু'ঠে আপনিই আস্‌বেন।"

পৌগণ্ড-অবস্থার সুখ, সখ্য-ভাবের ও বৈচিত্রীর শত শত শতদল ফুটিয়ে সখাগণকে সুখের এক মহাসাগরে নির্মজ্জিত ক'রে নিত্য নানা খেলা খেলছেন, যমুনার নীল বারিধারার তরঙ্গের তালে তালে সখাদের সহিত নাকি সুখের উদ্ভট নৃত্য! সখাদের সহিত সেখানে নাকি সুখের উৎসৃষ্ট খাওয়া-খাওয়ি!

সর্ব্বাপেক্ষা বৈচিত্রীর আবাস হ'ল কৈশোরে। বেণুমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও ভক্তগত-ভাবমাধুর্য্যের অনন্ত চতুর্ব্যূহ নাকি ক্ষণে ক্ষণে সেখানে আবির্ভূত হয়। সেখানের হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ-সবই সুখধারার এক-একটি মহা উৎস। সেই উৎস-রাজি-প্রবাহিত সুখধারা নাকি এক মহারস-সাগরে গিয়ে মিলে। এই হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, হাস্য, পরিহাস সম্ভাষণের

নিত্যলীলা বিস্তার ক'রে নিজেও নাকি আকৃষ্ট হন, জগৎকেও নাকি আকৃষ্ট ক'রে নিজের খেলার সঙ্গী কর্‌তে চান। এতেই নাকি তাঁর আকর্ষণ-সত্তা-বিশিষ্ট আনন্দত্ব, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণত্ব। যমুনা-তীরের সেই রহো-লীলাও নাকি আবার পরকীয়া ভাবে, "কভু মিলে, কভু না মিলে' দৈবের ঘটন।". তাতেই রঘুপতি, বিস্ময়ের পরাবধি-স্থানে অধিষ্ঠিত হ'য়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাছে গে'য়ে গেছেন,

কস্মৈ কিং কথনীয়ং কোবা প্রত্যয়মায়াতি।
যমুনাতীরে গোপ-বধূটী-বিটং পরংব্রহ্ম।

"কাকেই বা কি বল্‌ব, এ কথা কেইবা বিশ্বাস কর্‌বে?, যিনি পরব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনিই নাকি যমুনাতীরে কুঞ্জবনে গোপবধূর উপপতি! অহো! এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি হ'তে পারে।

সেখানে আরো অদ্ভুত ব্যাপার এই:—মনে করে মানিনী প্রেয়সী নাকি সুখকে ফে'লে চলে যায়। সুখ নাকি তখন "অনঙ্গ-বাণ-খিন্নমানসঃ" হ'য়ে "হা রাধে" "হা রাধে" ব'লে ছুটে' ছুটে' খুঁজে' খুঁজে' কুঞ্জে কুঞ্জে বেড়ান; দেখা পে'য়ে সকলের বাঞ্ছনীয় হ'য়েও—আরাধ্য হ'য়েও-নাকি কত ক'রে' প্রেয়সীর স্তবস্তুতি করেন, চরণ-তলে লুটিয়ে পড়েন, বলেন—

"স্মরগরল-খণ্ডনং　　মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পাদ-পল্লব-মুদারং।'

"রাধে, স্মররূপ-বিষনাশ-কারী এবং আমার মস্তকের ভূষণ-স্বরূপ অতি-সুন্দর তোমার পাদপল্লব আমার মস্তকে দাও।" তিনিই নাকি আবার পূর্ণব্রহ্ম! অহো কি অদ্ভুত!

মায়িক-সুখ-লালসায় প্রতারিত জীব! যদি সত্য সুখের খেলায় মিল্‌তে চাও, তবে সুখের নিত্যসঙ্গীদের কারো শ্রীচরণ জড়িয়ে ধর, তাঁরা ভারি দয়ালু, অবশ্য তোমাকে নিত্য সুখের নিত্যসঙ্গী ক'রে নিবেন।

শ্রীশ্রীনিতাই-করুণা।

শীতল-কর-কমলবর কোমল জিনি নবনি
তাপিত তনুপর যবহি দেল।
যুগহি যুগ পরি অটন জাত তাপ ত্রৈগুণ
নিমেষ মাহা নিশেষ পঁহু কৈল॥
কি পেখনু নিতাইচাঁদে করুণা নিরুপাধিয়া।
অশেষ অপরাধী কিয়ে নিন্দু কিয়ে দাম্ভিক
কিয়ে আতুর, বধির মূক আঁধিয়া॥
করুণা-রসে ঢর ঢর চলই গোরা-আবেশে
অরুণ দিঠে করুণ-প্রেম-ধারা।
বিচার নাহি দেয়া দেয় সমুখে যাকো পেখই
হৃদয়ে টানি বোলত গোরা-গোরা॥
অগতি নীচ পতিত কিয়ে, কিয়ে যবন চণ্ডাল
যা কর গুণে পাবন-নামধারী।
স বনাধিপ সেবনরসে জগজনে ভাসাওল
গোপীভাব লালসা মাহা ভারি॥

শ্রীগোপীনাথ বসাক, ঢাকা॥

শ্রীধাম বৃন্দাবনের স্বরূপ-তত্ত্ব।

বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, দেবর্ষি নারদ একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিতেছেন "হে গোপপতে! দ্বাদশবনাত্মক শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপ-তত্ত্বাদি কি, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে। যদি আমাকে তাহা শ্রবণ করিবার যোগ্যপাত্র মনে করেন, তবে কৃপা পূর্ব্বক বর্ণন করুন।"

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"দেবর্ষে, এই মনোরম শ্রীবৃন্দাবন আমারই বিশুদ্ধ ধাম। এই ধামে পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ তরু গুল্মলতা মনুষ্য ও দেবতা

প্রভৃতি যাহা যাহা অবস্থান করিতেছে, তাহারা সকলেই মৃত্যুর পরে আমার নিত্যধামে প্রবেশ করে। এই যে আমার নিবাসস্থান শ্রীবৃন্দাবন, ইহাতে যে সকল গোপকন্যা আমার সহিত বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই যোগিনী, এবং আমার নিত্যসেবাপরায়ণা। এই পঞ্চযোজন পরিমিত শ্রীবৃন্দাবন আমার দেহস্বরূপ। এ স্থানে পরমামৃতবাহিনী এই কালিন্দী সুষুম্না-নামে অভিহিতা। এ স্থানে দেবগণ ও ভূতগণ সকলেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্বদেবময় আমি কখনও এই বৃন্দাবনকে ত্যাগ করি না। পৃথিবীতে অবস্থিত এই বৃন্দাবনে যুগে যুগে আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। মনোহারী তেজোময় এই শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপ চর্ম্ম-চক্ষের অগোচর। বিশেষতঃ এই বৃন্দাবনের অলৌকিকরূপ যে দীব্য কদম্ব ও অশোক প্রভৃতি বৃক্ষ, তাহা অদ্যাপি মহাভাগবতগণ সাক্ষাৎকার করেন।"

এই বিষয়টী বরাহপুরাণে ভগবান শ্রীবরাহদেব পৃথিবীর নিকটে বর্ণনা করিতেছেন,—"অয়ি বসুন্ধরে! এই শ্রীবৃন্দাবনস্থ কালীহ্রদের পূর্ব্বদিকে, সর্ব্বলোক-পূজিত শত শত শাখাবিশিষ্ট পবিত্রগন্ধযুক্ত মহদাশ্চর্য্যজনক একটী কদম্ব বৃক্ষ আছে। সেই কদম্ববৃক্ষটী চিরকালই পবিত্র সুন্দর ও শীতল পুষ্পযুক্ত, তাহার জ্যোতিতে দশদিক প্রভাসিত হয়। শ্রীবৃন্দাবনের ব্রহ্মকুণ্ডে যাহারা মৎকর্ম্মপরায়ণ হয় অর্থাৎ মদ্বিষয়ক ভক্তি অনুষ্ঠান করে, তাহারা স্নান-মাহাত্ম্যে সত্বর অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। সেই ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে একটী শ্বেতবর্ণ অশোক বৃক্ষ আছে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে মধ্যাহ্ন সময়ে ভক্তজন-সুখপ্রদ সেই অশোক বৃক্ষটী পুষ্পিত হয়। পবিত্র ভগবদ্ভক্ত বিনা অর্থাৎ যে সমস্ত ভক্তের মনোবৃত্তি অনবরতই শ্রীভগবানে রমণ করে, তাঁহারা বিনা অন্য কেহই, এমন কি পৃথিবী পর্য্যন্তও এ তত্ত্ব জানেন না।"

এই সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইতে আর একটী বিশেষ কথা উপলব্ধি হইতেছে। যথা শ্রীবৃন্দাবনের গোলোক-বৃন্দাবন ও ভৌমবৃন্দাবন এই দুইরূপে প্রকাশ। আবার ভৌমবৃন্দাবনেরও দুইটী প্রকাশ-ভেদ আছে, যথা—প্রকট

এই শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশ পৃথিবীস্থ হইয়াও অন্তর্দ্ধান শক্তিতে পৃথিবীকে স্পর্শ না করিয়াই বিরাজমান আছেন। অতএব পৃথিবী শ্রীধামের সেই অপ্রকট প্রকাশকে স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না, অর্থাৎ নিজ জড়-ধর্ম্মে লিপ্ত করিতে পারিতেছেন না, এবং সর্ব্বথা অসমর্থা। পৃথিব্যাদি-পঞ্চভূতময় দেহাভিমানী আমরা যেমন বরাহপুরাণে কথিত, কালীহ্রদের পূর্ব্বভাগস্থিত মহাকদম্ববৃক্ষ এবং ব্রহ্মকুণ্ড-তীরবর্ত্তী অশোকবৃক্ষ দেখিতে পাই না, এবং ঐ বৃক্ষ দুইটী পৃথিবীস্থ হইলেও পৃথিবীর অগোচর, সেই প্রকার এই অপ্রকট ভৌমপ্রকাশও প্রাপঞ্চিক চক্ষের অগোচর বুঝিতে হইবে।

যখন শ্রীভগবান্ পৃথিবীতে লীলা করিবার জন্য ইচ্ছা করেন, তখন তিনি প্রথমতঃ উক্ত ভৌম-অপ্রকট-প্রকাশে অবতীর্ণ হয়েন। এই সময়ে ঐ অপ্রকট বৃন্দাবনও আমাদের প্রাকৃত চক্ষুর গোচর যে প্রকাশ, তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হয়েন। আবার এই দৃশ্যমান প্রকাশটীও কৃপাপূর্ব্বক পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াই আছেন। এইভাবে শ্রীভগবানের পৃথিবী-স্পর্শটী স্বীকার করা হয়। এবং এই অভিপ্রায়েই শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।"

ইত্যাদি বাক্যের সঙ্গতি হইয়া থাকে।

এক্ষণে গোলোক ও ভৌমবৃন্দাবনের অভেদত্ব দেখান হইতেছে। শ্রীভগবৎ-ধাম সকলের উপরিভাগে এবং অধোভাগে প্রকাশ-মানত্ব-হেতু উভয়-বিধত্বই প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ধাম মাত্রই প্রপঞ্চাতীত নিত্য-অলৌকিকরূপে এবং শ্রীভগবানের নিত্য-বিহারাস্পদ স্বরূপেই ঊর্দ্ধ ও অধঃ মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিত। যে শ্রীধাম ঊর্দ্ধে আছেন তাঁহাদের স্বরূপে, এবং মর্ত্ত্যলোকে বিরাজমান যে ধাম তাঁহার স্বরূপে কোনও প্রকার ভেদ নাই। কেবলমাত্র দুইস্থানে প্রকাশমান আছেন বলিয়া দুই প্রকারে বর্ণিত হইতেছেন। বস্তুতঃ কিন্তু শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানত্ব হেতু শ্রীবিগ্রহের মত ঊর্দ্ধ অধঃ উভয়ত্র প্রকাশে কোন বিরোধ নাই। নাম-রূপ ও গুণে এক প্রকারই বুঝিতে হইবে। শ্রীধামের বহুধা স্বরূপ স্বীকার করিলে অত্যন্ত গৌরব হইয়া পড়ে।

শ্রীগোলোক ও শ্রীগোকুলের অভেদ উদ্দেশ করিয়া সেই গোলোক সর্ব্বগত অর্থাৎ উপরিভাগে ও অধোভাগে বিরাজমান ও ব্যাপকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। নচেৎ ব্রহ্মসংহিতাতে "গোলোক এব নিবসতি" অর্থাৎ গোলোকেই শ্রীগোবিন্দ বাস করেন—এই প্রমাণে "এব" শব্দ-দ্বারা ভৌমব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার প্রতিপাদক বরাহ-পুরাণোক্ত বচনসমূহের বিরোধ ঘটিয়া যায়। শ্রীব্রহ্মসংহিতোক্ত বচনের সহিত শ্রীবরাহপুরাণোক্ত বচনের অবিরোধ রক্ষা—শ্রীগোলোক ও শ্রীগোকুলের অভেদ স্বীকারেই হইতে পারে। অতএব শ্রীহরিবংশেও দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যথা,—"হে দেব! গো ও গোকুলবাসিগণের উপদ্রব বিনাশকারী তুমি মৎপীড়িত সেই লোক রক্ষা করিয়াছ। এস্থলে শ্রীগোলোক বর্ণনকারী দেবরাজ কর্তৃক শ্রীগোলোক ও গোকুলের অভেদই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি অভেদ না হইত, তাহা হইলে শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারণের পূর্ব্বে দেবরাজ কৃত বিঘ্নে অভিভূত শ্রীগোকুলকেই শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গের সহিত গোলোক বর্ণন-প্রসঙ্গে তুমি এই গোলোককে রক্ষা করিয়াছ, দেবরাজের এই উক্তি সুসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব অভেদরূপে এবং ভেদরূপে বর্ণন করা হেতু একবিধই শ্রীমথুরা প্রভৃতি ধাম প্রকাশ-ভেদে উভয়বিধরূপে অর্থাৎ ভেদাভেদরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। আরও যখন গোপগণের প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গোলোক-দর্শন করাইলেন, তখন পৃথিবীতে প্রকাশমান শ্রীবৃন্দাবনকেই গোপগণ গোলোকরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

ভৌমব্রজলীলা এবং শ্রীগোলোক-লীলা উভয় স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের মত শ্রীগোপ-গোপীগণেরও প্রকাশ-ভেদ, অর্থাৎ ঐ গোপগণই এক প্রকাশে শ্রীগোলোকে এবং অন্য প্রকাশে শ্রীব্রজে বিরাজমান আছেন। যখন প্রকাশ-ভেদ হয়, তখন সেই সেই লীলারস পোষণ করিবার জন্য লীলাশক্তি শ্রীগোপাদি-পরিকরগণের সেই সেই প্রকাশ-ভেদের অভিমান-ভেদ এবং পরস্পরের অননুসন্ধানটীও প্রায়শঃ সম্পাদন করাইয়া থাকেন। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে শ্রীগোলোক, প্রকাশের পরিকরগণের অভিমান, আমরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই গোলোকেই আছি। আর যাঁহারা ভৌমব্রজের পরিকর, সেই প্রকাশে অভিমান—আমরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই ব্রজেই আছি। যেহেতু উভয়ের অভিমান-ভেদ, এবং

এই প্রকার প্রকাশান্তর কিছু অসম্ভব নহে। যেহেতু যিনি পরমেশ্বর-শব্দবাচ্য, তিনি নিজ শ্রীবিগ্রহ, পরিকর, ধাম ও লীলা প্রভৃতির একই সময়ে একই স্থানে অনন্ত প্রকার বৈভব-প্রকাশে সমর্থ।

এস্থলে একটী বিশেষ কথা বলা আবশ্যক যে, যদ্যপি গো-শব্দের অর্থ তেজ এবং কুল-শব্দের অর্থ সমূহ অর্থাৎ তেজসমূহ যেখানে তাহাই গোকুল, ইত্যাদি প্রকারে যোগার্থ অবলম্বনে বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে বটে, তথাপি "রূঢ়ির্যোগার্থমপাহরতি" অর্থাৎ রূঢ়ি-বৃত্তি যোগার্থকে অপহরণ করে—এই ন্যায়ানুসারে গোকুল-শব্দের গো-গোপাবাসরূপ অর্থটীই বুঝিতে হইবে।

এবারে এই স্থানেই এ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি হইল, আগামী সংখ্যায় শ্রীবৃন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বসতি, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিবার আশা রহিল।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ব্যাকরণতীর্থ।
বৈষ্ণবদর্শন-বিদ্যালয়, নবদ্বীপ।

ব্রজ-লীলা।

অনেক সময় আমার অনেক সহাধ্যায়ী ও সহকর্ম্মী বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, ব্রজলীলার অর্থ কি? একদিন জনৈক এম, এ, উপাধিধারী বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, Do you believe in mythological Krishna? তুমি কি পৌরাণিক কৃষ্ণে বিশ্বাস কর? আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম, I do not quite see what you mean by mythological; but I am rather proud that I have faith in Krishna engaged in His Lila. তুমি "পৌরাণিক" দ্বারা কি বলিতে চাও, আমি ঠিক বুঝিতেছিনা, তবে ইহা আমি গৌরবের বিষয় মনে করি যে, লীলাময় কৃষ্ণে আমার বিশ্বাস আছে। কেহ কেহ এ কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তোমরা ব্রজলীলার উপাসনা কর কেন? চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে (তোমরা যাহাকে

দ্বাপরযুগ-বশ) মথুরা জেলার অন্তর্গত বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে তিনি তাঁহার প্রজ্ঞা ও প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি অনেক কেলেঙ্কারীও করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও তাঁহার ন্যায় অনেক প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর উপাখ্যান আছে। তোমরা যদি বৃন্দাবন-বিহারী কৃষ্ণের উপাসনা কর, তবে আর একজন গোবিন্দপুর-বিহারী নগেন্দ্রনাথের উপাসনা করিলেই বা হানি কি? আমি সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, হানি কি ঠিক বলিতে পারিনা; কিন্তু লাভ যে নাই, তাহা পরিষ্কার জানি। এ দুইয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ। মনে কর, মহামহোপাধ্যায় তর্কচূড়ামণি মহাশয় আর চৈতনধূপী দুজনেই পরিষ্কার কাপড় পরিয়া রাস্তায় চলিয়াছেন, রাস্তার লোক—যাঁহারা তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে চিনে, তাহারা দলে দলে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়; আর যাহারা কাহাকেও চিনেনা, তাহারা উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া চলিয়া যায়; আবার চৈতনধূপীর পোষাক-পরিচ্ছদ যদি বেশী জমকাল হয়, তবে অনেক অজ্ঞলোক হয়তঃ তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে উপেক্ষা করিয়া চৈতনধূপীকেই নমস্কার অভিবাদন করে। এক্ষণে এ তিন শ্রেণীর লোকের কাজের ঔচিত্যানৌচিত্য হিসাবে কোন তফাৎ আছে কিনা, একবার ভাবিয়া দেখ। একথা বলিলে অনেক সময় তাহারা ব্রজলীলার রহস্য জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই আমার ব্রজলীলা-বিষয়ে এ প্রবন্ধ লিখিবার অধ্যবসায়। এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা আছে, সে কথা ভাবিবার আস্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে এজাতীয় প্রবন্ধের আবশ্যকতা আছে জানিয়া আমি সূচনা করিলাম মাত্র। সুযোগ্য লীলা-রসাভিজ্ঞ সুধী লেখক-মহোদয়গণ এবিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের তৃপ্তি সাধন করিবেন, ইহাই আমার ভরসা ও প্রার্থনা।

ভগবান্ আছেন, একথা সকলেই স্বীকার করেন। ভগবানের স্বরূপ, স্থিতি, লীলা ইত্যাদি বিষয়ে সকলের ধারণা সমান নহে। এমন লোকও আছেন—যাঁহাদের সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই, অথচ তাঁহারাও সংস্কারবশে বলিয়া থাকেন, ভগবান্ আছেন। তাঁহাদের ভগবানে বিশ্বাস আছে,

কোন যুক্তি-তর্ক নাই, ভগবান্ সম্বন্ধে কোন খোঁজ নাই, তাঁহারা আপনার লইয়া দুনিয়ার মাঝে বেশ আছেন, ভগবানের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও বলিয়া থাকেন, হাঁ ভগবান্ আছেন। কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা—এই দৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্যমাত্রই ভগবচ্ছব্দবাচ্য, এতদতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এই মতের আচার্য্য। ইংরাজী শিক্ষিত অনেক লোক—ইংরাজকবির কথা নির্ব্বিচারে গ্রহণীয়—এই ন্যায়ানুসারে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বোধোদয়ে লিখিয়াছেন, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। আমাদের দেশের অনেক লোক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ধারী হইয়াও এই বোধোদয়ের স্তর ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরমহাশয় সংস্কৃত-সাহিত্যে বিদ্যার সমুদ্র হইলেও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সকল শাখায় তাঁহার তেমন ব্যুৎপত্তি ছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায়না। সুতরাং তাঁহার মত একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হওয়াও অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি ভারতীয় বহু দার্শনিক অকাট্য যুক্তি সহকারে এতাদৃশ মত খণ্ডন করিয়া স্বতন্ত্র মত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ভগবান্ তাঁহার একস্বরূপে এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চময় বিশ্বের অন্তর্যামী হইলেও, স্বয়ং আর এক স্বরূপে তাহার উপরে কোথাও অবস্থান করেন। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Transcendental Theory. শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

এস্থলে উপাদান-লক্ষণের দ্বারা এই প্রপঞ্চময় জগতের কথাই বলা হইয়াছে, এবং ভগবান্ বলিয়াছেন, ইহা আমার ভিন্না প্রকৃতি। তাহা হইলে, ভগবানের স্বরূপ প্রকৃতি এ জগৎ হইতে পৃথক্ কোন বস্তু, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। আর্য্য দার্শনিকগণের সৃষ্টি-রহস্য-সমন্বিত ভগবত্তত্ত্ব এইরূপ।

ভগবানের অনন্ত শক্তি। তাহার মধ্যে তিনটী প্রধান — চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, ও মায়াশক্তি। এই তিন শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, আর জীবশক্তি তটস্থা। ভগবানের বা তাঁহার স্বরূপ-

সৃষ্টি করেন। এই মায়াসৃষ্ট জগতের বিশালতার কথা ভাবিলে আমাদের চিন্তা অবশ হইয়া পড়ে। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি, ইত্যাকার অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তাহার মধ্যে রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলে, এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্য এবং প্রতি সূর্য্যের চারিদিকেই এক একটী সৌরজগৎ রহিয়াছে; সুতরাং আকাশের নক্ষত্রাবলির দিকে দৃষ্টি করিলেই এই জগতের বিশালতার কতকটা ধারণা জন্মে। আমাদের শাস্ত্রমতেও এ জগৎ তদ্রূপ বিশাল। ভগবান্ এক স্বরূপে এই বিশাল জগতের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। ভগবানের তটস্থা শক্তি জীবগণ স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য প্রয়োগ করিয়া অনেকে আপন ইচ্ছায় ও দায়িত্বে এই মায়ার জগতে আসিয়া বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। আমরাই এই মায়াবদ্ধ জীব। অপরদিকে ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি বা চিচ্ছক্তির প্রভাবে ভগবল্লীলার উপযোগী এক চিন্ময় রাজ্য অনাদিকাল হইতেই প্রকটিত হইয়া আছে। এই চিন্ময়-রাজ্য মায়িক স্থান ও কালের অতীত—সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। মহামায়াসৃষ্ট জড়জগৎ সসীম, এই চিন্ময়রাজ্য অসীম। ইহা জড়-বিরোধী-চিন্ময়-বস্তু বলিয়া জড়জগদ্বাসীর জড় চক্ষুর গোচর নহে। এই চিন্ময়-রাজ্যের অসংখ্য বিভাগ। এক এক বিভাগে অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ তাঁহার এক এক স্বরূপে অবস্থান করেন, প্রত্যেক বিভাগেই ভগবানের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বহুপরিকররূপে আত্ম-প্রকট করিয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাদের সহিত বিহার করেন। তাঁহার প্রতিবিভাগাধিপতি ভগবৎ-স্বরূপ লীলার জন্য তাঁহার এক এক শক্তিকে এক বা একাধিক ভাগে মূর্ত্ত করিয়া দিয়াও স্বয়ং পূর্ণই থাকেন। ভগবানের অনেক কাজই অদ্ভুত ও অচিন্ত্য। চিদ্‌রাজ্য যেমন সর্ব্বগ অনন্ত, ও বিভু; তদন্তর্গত প্রতিবিভাগও তেমনি সর্ব্বগ, অনন্ত, ও বিভু।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কথাটি এই:—মহম্মদ-প্রচারিত ইসলামধর্ম্মের গন্তব্য বেহস্ত, আর যীশুখ্রীষ্ট-প্রচারিত খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের গন্তব্য হেভেন (Heaven) এই দুইটীও চিদ্‌রাজ্যেরই দুইটি বিভাগ। আল্লা এক বিভাগাধিপতি ভগবৎ-স্বরূপ; এবং গড God অন্য বিভাগাধিপতি আর এক ভগবৎ-স্বরূপ। মহম্মদ যে বলিয়াছেন, আল্লা ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই; তাহার বিভাগে অন্য স্বরূপ নাই, এ কথা সর্ব্বতোভাবেই সত্য। অপরদিকে যীশু যে বলিয়াছেন, তৎ প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্ম (Christianiy) ব্যতীত হেভেনে

যাইবার অন্য পন্থা নাই, তাহাও ঠিক। ইহাতে অন্য কোন ধর্ম্মের সঙ্গে কোন বিরোধ নাই। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। হেভেনকে স্বর্গদ্বারা অনুবাদ করা হইলেও খৃষ্টানদের হেভেন আর হিন্দুদের স্বর্গ সম্পূর্ণ দুই স্থান—একটি আর একটির অনেক উপরে। হেভেন ভগবদ্ধামের বিভাগ-বিশেষ, সুতরাং নিত্য; আর স্বর্গ মায়ার রাজ্যের অন্তর্গত, সুতরাং ধ্বংসশীল। স্বর্গবাসীদিগকে সাধারণতঃ অমর বলা হইলেও তাঁহারা বাস্তবিক অমর নহেন, দীর্ঘজীবী মাত্র। জীব পুণ্যের ফল ভোগের জন্য স্বর্গে যায়, এবং নির্দ্দিষ্ট কাল ভোগ হইয়া গেলে তাহারা আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে।

এ স্থলে প্রশ্ন—এই চিদ্‌রাজ্যের অসংখ্য বিভাগবিহারী ভগবৎস্বরূপ-সমূহের মধ্যে মূল স্বরূপ কে? আমাদের পুণ্যভূমি ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের বিশেষত্বই এই যে, ইহার জল বায়ুর মধ্যেই দার্শনিকতত্ত্ব নিহিত আছে। ইহার জলবায়ু স্পর্শ করিলেই জটিল দার্শনিক-তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। এখানে ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যেও বহু তত্ত্বকথা রহিয়াছে। আপনারা গোলোকধাঁধার ঘর দেখিয়াছেন; সেখানে সকলের উপরে কাহার স্থান? গোলোকধামের। চিদ্‌রাজ্যেরও সর্ব্বোপরিধাম গোলোক। সুতরাং গোলোক-বিহারী শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণই মূল ভগবান্। অন্যান্য স্বরূপ তাঁহারই প্রকাশ, বিলাস, অংশ, ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ — শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এই গোলোকের আবার দুইটী স্বরূপ আছে — গোলোক আর ব্রজ বা বৃন্দাবন। এই ব্রজ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পূর্ণতম ভগবান্। ইনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইলেও, তাঁহার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে— প্রয়োজন হইলে আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। এখানে তাঁহার যে লীলা হয়, তাহা অতি বিচিত্র। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার বিস্তার।
সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার॥ চৈঃ চঃ

তিনি নিজে সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি। যেমন তরল পদার্থও ঘন হইলে তাহা দ্বারা মূর্ত্তি গড়া চলে, জল বরফ হইলে তাহাতে মূর্ত্তি গড়া সম্ভবপর হয়, খেজুরের রস ঘন হইয়া শর্করা ও মিছরি হইলে তাহাতে খেলনা প্রস্তুত হয়, তেমনি সচ্চিদানন্দ ঘন হইলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণতনু গঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য,

উহা আমাদের ন্যায় মায়াসৃষ্ট ভৌতিক বস্তু নহে; উহা সচ্চিদানন্দ, অজ, শাশ্বত, নিত্য। এই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলাসহায়িত্রী শক্তি যোগমায়ার সাহায্যে আপনার স্বরূপ-শক্তিকে মাতা, পিতা, দাস, সখা, প্রেয়সীবৃন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত বিভিন্ন ভাবে বিহার করতঃ বিভিন্ন রস আস্বাদন করিতেছেন। এই রসাস্বাদনই লীলার উদ্দেশ্য। মহামায়ার সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্য আস্বাদন করা যেমন একদিকে তাঁহার অভিপ্রায়, ভগবদ্ধামে আপনার মূর্ত্ত শক্তিস্বরূপ পারিষদ্‌বৃন্দের সহিত লীলারস আস্বাদন করাও তেমনি অপরদিকে তাঁহার অভিপ্রায়। প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বজ্ঞ। তিনি যদি জানেন যে, তাঁহার সহিত তাঁহার লীলা হইতেছে, তিনি তাহারই অংশ; তিনি যাঁহার ক্রোড়ে পুত্ররূপে শয়ান আছেন, তিনি তাহার পিতা নন, বরং তিনি নিজেই তাঁহার পিতারও পিতা, তবে আর লীলারস আস্বাদন হয় কিরূপে? অপত্যস্নেহের স্বাদ গ্রহণ হয় কিসে? সকলই রঙ্গমঞ্চের অভিনয়তুল্য হইয়া পড়ে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভগবান্ ইচ্ছাময়, তাঁহার ইচ্ছানুসারে যোগমায়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্বরূপ-তত্ত্ব বিস্মৃত করাইয়া, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধজ্ঞান জাগাইয়া দেন। তাই লীলা মিষ্ট হইয়া উঠে। এই ব্রজলীলা এক আনন্দের সাগর। এই আনন্দময় ধামে আনন্দময়ের লীলা-সাগরে যে নিত্যনূতন তরঙ্গের পর তরঙ্গ, আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত উত্থিত হয়, তাহার বর্ণনা মানুষের অপূর্ণ ভাষায় সম্ভবপর হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সখাদের সহিত পুলিনভোজনাদিতে, প্রেয়সীবৃন্দের সহিত নৌকা-বিলাসাদিতে, রাস-নৃত্যাদিতে যে রসের হিল্লোল উত্থিত হয়, তাহার এক কণিকায় ত্রিভুবন ভাসাইয়া দিতে পারে—ত্রিভুবনের সমগ্র আনন্দ তাহার এক বিন্দুর সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহে—তাহা বরং ভক্তহৃদয়ের অনুভূতিগম্য, ভাষায় বর্ণনীয় নহে।

কৃপাময় ভগবান্ এই ব্রজলীলার রস-সাগরে ডুবিয়া থাকিয়াও তাঁহার মায়াবদ্ধ জীবকে একেবারে ভুলিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার এক স্বরূপকে যুগাবতাররূপে বারংবার প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে ভগবদ্ধামের খবর ও পথ বলিয়া দিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে তদীয় রসলীলাদির বার্ত্তা

ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু মায়াবদ্ধজীবের মায়ার মোহ কিছুতেই কাটিল না—'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ' হইয়া রহিল। তখন একদিন পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন, আমি আমার এই ব্রজলীলার আনন্দ-সাগর তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে খুলিয়া দিব, দেখি, তবু তাহাদের মন আকৃষ্ট হয় কিনা।

ভগবানের কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না। যেই তাঁহার ইচ্ছা হইল, অমনি তাঁহার ইচ্ছা পূরণকারিণী যোগমায়া ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত আমাদের এই ভারত-বর্ষে মথুরা জেলায়, ভগবদ্ধামান্তর্গত ব্রজপুর প্রকটিত করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিদ্বস্তু জড়জগতের জড়চক্ষুদ্বারা দর্শন করা যায় না। কিন্তু শ্রীভগবানের ক্ষমতা অসীম। তিনি ইচ্ছা করিলে জীবকেও শক্তি দান করিয়া তাঁহার চিন্ময় ধাম ও চিন্ময় স্বরূপাদি দর্শন করাইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তৎকালীন জীবকে শক্তিদান করতঃ তাহাদের সম্মুখে তাঁহার ব্রজলীলার যবনিকা উত্তোলন করিয়া দিলেন, আর জগদ্বাসী তাঁহার অপূর্ব্ব কেলিকলাপ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইল। ইহাই লীলা-প্রাকট্যের রহস্য। যোগমায়ার চতুরতায় জগদ্বাসী শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি-লীলা প্রত্যক্ষ করিল বটে, কিন্তু প্রকট-লীলাও তাঁহার অপ্রকট নিত্যলীলার অনন্তপ্রবাহের খণ্ডপ্রকাশমাত্র—ইহার এখানেই আদি, এখানেই অন্ত এরূপ নহে। এস্থলে আবার বলিয়া রাখি প্রকট-লীলার শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলার শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন—সপরিকরে একই, কেবল যবনিকার অন্তরালে আর বাহিরে মাত্র। সুতরাং ভূবৃন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণ লোকলোচনের গোচর হইয়াছেন, তিনিই স্বয়ং ভগবান্—সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূর্ত্তি; তাঁহার ধাম ও পরিকরগণ ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সামান্য প্রাকৃত জীবের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরিকর ও লীলাকে জাগতিক নীতির তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিলে চলিবে না; বাস্তবিক সে তুলনার কোন কারণই নাই। এ দুইয়ের উপাদান সম্পূর্ণ পৃথক্, ভাবে আপাততঃ একটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও বস্তুতঃ বৈশিষ্ট্য অনেক। সাদৃশ্যের কারণও যথেষ্টই আছে। এই প্রাপঞ্চিক জগৎ ভগবৎ-রাজ্যেরই ছায়া। ভগবদ্ধামই ইহার আদর্শ। ছায়ার সঙ্গে কায়ার যেমন আকৃতিগত মিল থাকে, এখানেও তাই। ভগবদ্ধামে যে যে সম্বন্ধ আছে, এখানেও তৎসমূহের একটা ছায়াপাত হইয়াছে। তবে কায়া আর ছায়া কখনও একবস্তু নহে। ধনীরা সোনার গহনা পরে,

তাহা দেখিয়া গরীব লোকেরা পিতল দিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া ব্যবহার করে। এ দুয়ের মধ্যে একটা কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। শ্রীকৃষ্ণলীলার বিরুদ্ধে সচরাচর অজ্ঞতাবশতঃ যে সকল অভিযোগ করা হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের পর-দারত্ব তাহাদের অন্যতম। বাস্তবিক ব্রজলীলায় সে পরদারত্বের কথাই উঠিতে পারে না। ব্রজের পরকীয়া একটি ভাবমাত্র। যেখানে স্বয়ং ভগবান্ স্বশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া আত্মশক্তির বিগ্রহরূপিণী প্রেয়সীবৃন্দের সহিত লীলারস আস্বাদন করেন, সেখানে আবার তত্ত্বতঃ পরকীয়া কি? তবে লীলারসের পুষ্টির জন্য যোগমায়া তাঁহাদের মনে একটি পরকীয়া-ভাব সংঘটন করিয়া দিয়াছেন মাত্র। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক হিসাবেও প্রকটলীলায় ব্রজসুন্দরী-গণ আজন্ম শ্রীকৃষ্ণগত-প্রাণা। পুরুষান্তরের সহিত তাঁহাদের বিবাহ কোন কালেই হয় নাই। তবে ব্রজসুন্দরীগণের স্বপ্নবৎ একটা ধারণা ছিল যে, তাঁহাদের একটা বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহিত পুরুষনারীর আচরণ তাঁহাদের মধ্যে কোন কালে ছিল না। সুতরাং ব্রজলীলার বিরুদ্ধে পরদারত্বের অভিযোগ সর্ব্বথা অমূলক।

এক্ষণে আশা করি, আমার উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইয়াছে—ব্রজলীলার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। লীলাশুক সুধী লেখকগণ ইহার পূর্ণরস পরিবেশন করিয়া রসলিপ্সু পাঠকবৃন্দের তৃপ্তি সাধন করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা—আর ভজন-পরায়ণ রসিক-ভক্তমহোদয়গণের কৃপাই ব্রজলীলারস হৃদয়ঙ্গম ও আস্বাদন করিবার একমাত্র সম্বল। আমাদের হৃদয় অবিরাম বিষয়-চিন্তায় শুষ্ক ও নীরস। সে চিত্তকে সিক্ত করিয়া আমাদের উপর পরমকৃপালু বৈষ্ণব মহাত্মগণ কৃপা-বারি বর্ষণ করুন।

শ্রীহরিনারায়ণ মজুমদার।

নব-বরষে প্রার্থনা।

(১)

এস হে বাঞ্ছিত, হৃদয় রতন

শ্রীশচীনন্দন গৌরমণি।

এস হে নিতাই দয়াল ঠাকুর

কাঙ্গালের ধন প্রেমের খনি।

(২)

দীনহীন বেশে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,

সহিলে কতই যাতনা।

জীবের লাগিয়া কাঁদিতে এমন,

কে আছে জগতে বল না?

(৩)

লয় পরিকর লইয়া সাথে,

দরশন দিতে এসো গো ঠাকুর।

আশাপথ পানে চাহিয়া চাহিয়া,

আর কত দিন যাইবে মোর!

(৪)

তোমরা যেমন দয়াল ঠাকুর

তেমনই নিঠুর আমার হিয়া।

পাষাণ হ'তেও অধিক পাষাণ,

নতুবা যাইত গলিয়া!

(৫)

মানব-জনম অবসান প্রায়,

হ'লো না হ'লো না সাধন-ভজন!

বিফলে গোঁয়াইনু দুর্লভ জনম

(তাই) রাতুল চরণে লইনু শরণ!

(৬)

কর দয়া মোরে দয়াময় প্রভু
তব নাম প্রেমে মজিয়া,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম মুখে নিতে
যায় প্রাণ দেহ ছাড়িয়া॥

বৈষ্ণব-পদরেণু-প্রার্থী।
দীন যষ্টীমোহন দে দাস।

মহাভাব।

সংজল্প।

[সূচনা। মহাভাবের একটি অবস্থার নাম দিব্যোন্মাদ। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণ-বিরহাবস্থায় এই দিব্যোন্মাদ প্রকটিত হয়। দিব্যোন্মাদে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কোনও একটী বিষয়েই সমস্ত চিত্ত-বৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, তাই অন্যকোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকেনা, সে বিষয়-সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তবৃত্তির কোনও ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়না বলিয়াই প্রতিভাত হয়; প্রেম-বিশেষের শক্তিতেই এইরূপ বিবশতা পরিলক্ষিত হয় বলিয়া এই বিবশতাকে প্রেম-বৈবশ্য বলে।

এই প্রেমবৈবশ্য বশতঃ, যে বিষয়ে চিত্তবৃত্তির-অনুসন্ধান থাকেনা, সেই বিষয়-সম্বন্ধে দিব্যোন্মাদবতীর আচরণ অনেকটা ভ্রমপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়; তাই দিব্যোন্মাদের একটা সাধারণ লক্ষণ হইল—ভ্রমাভা বৈচিত্রী। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।

দিব্যোন্মাদে চিত্তের প্রেমবৈবশ্য দুইরকমে অভিব্যক্ত হইতে পারে—কায়িক ও বাচনিক। প্রেম-বৈবশ্যের কায়িক-অভিব্যক্তিকে বলে উদ্‌ঘূর্ণা—স্যা বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতম্। উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩৭॥ আর প্রেমবৈবশ্যের বাচনিক অভিব্যক্তির অনেক ভেদ আছে; একটী ভেদের নাম চিত্রজল্প; চিত্রজল্পব্যতীত আরও বহুভেদ আছে।

উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তভেদা বহবো মতাঃ ॥
—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩৭ ॥

চিত্রজল্পের আবার দশ রকম ভেদ আছে—প্রজল্প পরিজল্প, বিজল্প, উজল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। এই দশরকম চিত্রজল্পে দিব্যোন্মাদের ভ্রমাভা বৈচিত্রীতো আছেই, তাহা ছাড়া আরও কয়েকটী সাধারণ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ, মহাবিরহ-সময়ে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূতরূপে সমাগত কোনও কৃষ্ণসুহৃদের দর্শনেই চিত্রজল্পের অভিব্যক্তি হয়; দ্বিতীয়তঃ চিত্রজল্পে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গূঢ়-রোষ প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ, ইহাতে নানাবিধ ভাবের স্ফুরণ হয়। চতুর্থতঃ, চিত্রজল্পের অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। এই সাধারণ লক্ষণের তৃতীয় লক্ষণে যে নানাবিধ ভাবের কথা বলা হইল, সেই নানাবিধ ভাবের সমাবেশের বৈচিত্রী-অনুসারেই চিত্রজল্পের দশ রকম বৈচিত্রী; এইসকল বৈচিত্রীই দশরকম চিত্রজল্পে বিশেষ লক্ষণ।

চিত্রজল্পের প্রথম চারিটি বৈচিত্রী—অর্থাৎ প্রজল্প, পরিজল্প বিজল্প ও উজ্জল্প—শ্রীশ্রীসোনার-গোরাঙ্গ-পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা পরবর্ত্তী বৈচিত্রীগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বাসনা করি। পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটী বৈচিত্রীর সহিত পরবর্ত্তী বৈচিত্রী-সমূহের এমন কোনও বিশেষ সম্বন্ধ নাই, যাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৈচিত্রী-সমূহের জ্ঞানের অভাবে পরবর্ত্তী বৈচিত্রীগুলি আস্বাদন করিতে পারা যাইবেনা। যেটুকু জানা বিশেষ দরকার, তাহা এই সূচনায়ই সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

আরও একটী বিষয় জানা দরকার। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন তাঁহার বিরহে ব্রজসুন্দরীগণ অত্যন্ত কাতরা। এই সময়ে ব্রজবাসীদিগকে সান্ত্বনা দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজের সুহৃদ্ উদ্ধবকে দূতরূপে ব্রজে পাঠাইলেন। এই উদ্ধবের দর্শনেই চিত্রজল্পের অভিব্যক্তি। দূত উদ্ধবের দর্শনে শ্রীমতী ভানু-নন্দিনীর সমস্ত চিত্ত-বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ-দূত-বিষয়ে এতই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল যে, দূত সম্বন্ধীয় বিষয় ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ই তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইত না—সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতেন, তাহাকেই কৃষ্ণের দূত বলিয়া মনে করিতেন; যাহা কিছু শুনিতেন, তাহাকেই দূতের উক্তি বলিয়া মনে করিতেন (প্রেম-বৈবশ্যের ফল)। এইরূপই যখন শ্রীরাধিকার মনের অবস্থা, তখন

একটী ভ্রমর গুন্ গুন্ শব্দ করিতে করিতে তাঁহার চরণ সান্নিধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। তিনি মনে করিলেন, এই ভ্রমরও শ্রীকৃষ্ণেরই প্রেরিত দূত, এবং গুন্ গুন্ শব্দে ভ্রমর তাহার বক্তব্যই তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিতেছে। তাই, এই ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভানু-নন্দিনী নানাবিধ ভাববৈচিত্রীপূর্ণ বাক্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতীর এই বাক্যগুলিই দশরকম চিত্রজল্পের উদাহরণ; শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমর-গীতায় ইহাদের উল্লেখ আছে; শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের সাহায্যেই দশবিধ চিত্রজল্পের উদাহরণ, শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া আমরা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করি।

আর একটী কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ প্রাকৃত নায়িকা নহেন, তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তির বিলাস। শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" এবং "কৃষ্ণো বৈ পরমংদৈবতম্"-ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই তাঁহার স্বরূপ-শক্তি অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধিকাদি লীলাপরিকররূপে আত্ম-প্রকট করিয়া আছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি বলিয়া স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়া শক্তি; রস-বৈচিত্রীর অনুরোধে ব্রজে তাঁহাদের পরকীয়া-নায়িকার ভাব, যোগমায়ার প্রভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণও জানেন না, গোপীগণও জানেন না; জানিলে মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর হানি হইত বলিয়াই যোগমায়া তাঁহাদিগকে জানিতে দেন না। কৃষ্ণ-প্রেয়সী-গোপীগণের বস্তুতঃ অপর কাহারও সঙ্গে বিবাহ হয় নাই—হইতেও পারে না; কারণ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যকান্তা। তবে, পরকীয়ারস-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের অনুরূপ যোগমায়া-কল্পিত মূর্ত্তির সঙ্গে অভিমন্যু আদি গোপগণের বিবাহ হইয়াছিল। যোগমায়ার এই রহস্য কেহই জানিত না। শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের স্বপ্নবৎ বিবাহ-প্রতীতি জন্মিয়াছিল—তাঁহাদের পিতামাতাদি জানিতেন, তাঁহাদের সঙ্গেই অভিমন্যু-আদির বিবাহ হইয়াছিল। তাই তাঁহাদিগকে পতিগৃহে যাইতে হইয়াছিল—কিন্তু পতিগৃহে যাইয়া থাকিলেও তথাকথিত পতির সহিত তাঁহাদের কাহারই দৈহিক সম্বন্ধাদি ছিল না। যোগমায়া তাঁহাদিগকে রক্ষা-

করিতেন; তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে অভিসারাদিতে বহির্গত হইতেন, তখন যোগমায়া-কল্পিত মূর্ত্তি তাঁহাদের পতির গৃহে থাকিত, গোপগণ মনে করিতেন, তাঁহাদের পত্নীগণ গৃহেই আছেন।]

* * * * *

সংজল্পের বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাতে দুর্ব্বোধ্য পরিহাসময় আক্ষেপের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতাদির (অকৃতজ্ঞতা, নির্দ্দয়ত্ব, পরদ্রোহিত্ব, প্রেম-শূন্যত্বাদির) কথা প্রকাশ করা হয়।

সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া।
তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতোবুধৈঃ॥
—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪৫।

শ্রীমতী ভানু-নন্দিনীর চরণ-শোভার নিকটে কমলের শোভা ম্লান হইয়া যায়; তাঁহার চরণ-সৌরভের নিকটে কোটি কোটি কমলের সমবেত সৌরভও পরাজিত। তাঁহার চরণ-নখরের জ্যোতির নিকটে লক্ষ্মীর জ্যোতি তো তুচ্ছই, কোটি কোটি লক্ষ্মীও এই নখর-জ্যোতির নির্মঞ্ছন করিতে পারিলে অপনাদিগকে ধন্য মনে করিবেন। এতাদৃশ চরণ কমলের শোভায় ও সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া—বোধহয় ফুল্ল-কমল-ভ্রমেই মধুপানের আশায়—ভ্রমরটী গুন্ গুন্ শব্দ করিতে করিতে শ্রীরাধার চরণতলে আসিয়া পতিত হইল—পতিত হইয়াও মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিল। দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা মনে করিলেন, গুন্ গুন্ শব্দে ভ্রমরটী তাঁহাকেই কিছু বলিতেছে—সম্ভবতঃ বলিতেছে যে "ভানু-নন্দিনি! তোমার মতন অপরূপ সৌন্দর্য্যবতী ও প্রেমবতীকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণের অন্যায় হইয়াছে, অপরাধ হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাইয়াছে—সন্দেহ নাই। কিন্তু রাধে! তুমি তো করুণাময়ী, তুমি করুণা করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা কর; কৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে তোমার চরণ-তলে নিপতিত হইয়া আমিই তোমার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ক্ষমা কর রাধে! পদতলে মস্তক-স্থাপন-মাত্রেই তো সজ্জন-গণ অপরাধীকে ক্ষমা! করিয়া থাকে; রাধে তুমি সজ্জনাগ্রগণ্যা; আমি তোমার চরণ-তলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। কৃষ্ণের অপরাধ ক্ষমা কর রাধে!"

এইরূপ মনে করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীরাধার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রোষেরস ঞ্চার হইল। কৃষ্ণের দূত ভ্রমরের প্রতিই সেই রোষ অভিব্যক্ত হইল। ভানু-নন্দিনী রোষভরে ভ্রমরকে বলিলেন,

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টা পত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৪৭।১৬

"ভ্রমর! কেন তুমি আমার চরণতলে মস্তক রাখিয়াছ? শীঘ্র আমার চরণ ত্যাগ কর। দূর হইয়া যাও এখান হইতে।" ভ্রমর গেল না, চরণতল ত্যাগ করিল না; বরং আরও মৃদু মৃদু গুঞ্জন করিতে লাগিল। ভানুনন্দিনী মনে করিলেন, ভ্রমর রোদন করিতেছে—রোদন করিতে করিতে প্রার্থনা করিতেছে—"রাধে! তোমার প্রাণবল্লভের—তোমার প্রেমের কাঙ্গাল কৃষ্ণেরই দূত আমি; তাঁহার প্রতিনিধিরূপে তোমার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি; আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না রাধে! তুমি মুখে যাহাই বলনা কেন, রাধে, আমি জানি তোমার হৃদয় অতি কোমল, তোমার হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ। কোপ ত্যাগ কর রাধে, তোমার প্রাণবল্লভের অপরাধ ক্ষমা কর, করুণাময়ি!" এইরূপ ভ্রমরের উক্তি মনে করিয়া শ্রীরাধিকা সোল্লুণ্ঠ বচনে বলিলেন—"কপট-চাটু-বাক্যে আর কাজ নাই ভ্রমর! ইহা ছাড়িয়া দাও। আমি লক্ষ্মী-আদি রমণীর ন্যায় অনভিজ্ঞা নহি যে, তোমার রমণীয় চাটুবাক্যে প্রতারিত হইব। আমি সব জানি; তোমাকেও জানি, তোমার মনিবকেও জানি। রম্যচাটুবাক্যে অনুনয় প্রকাশ করিয়া লোকের—বিশেষতঃ রমণীকুলের—মন গলাইতে তোমার মনিবটী বড়ই পণ্ডিত; তাঁহার নিকটেই তো তুমি ইহা শিক্ষা করিয়াছ! সুতরাং চাটুবাক্যে তুমিও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছ, তাহা জানি এবং দেখিতেছিও। কিন্তু মধুপ! আমাদের নিকটে তোমার পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সার্থকতা কিছুই নাই। তোমার মনিবটীর চাটুবাক্যের রহস্য আমরা বেশ ভালরূপেই জানি। সেই শঠচূড়ামণির আপাতঃ-মধুর বিষগর্ভ চাটুবাক্যে ভুলিয়াই তো আমরা আমাদের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছি। ভ্রমর! তোমার মনিবটীর

একটী নাম না মুকুন্দ ? তা ঠিকই—সার্থক-নামাই তিনি ; মুক্তিং কুৎসিতামপি দদাতি যঃ সঃ মুকুন্দঃ—এই তো তাঁর নামের অর্থ ? তা কুৎসিৎ-মুক্তি তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন বটে !—আমাদের সকলকেই গৃহাদি-সর্ব্বস্ব হইতে, এমন কি, কুলধর্ম্ম হইতেও তিনি মুক্তি দিয়াছেন !! তোমার মুকুন্দের কৃপায় আজ আমরা বনবাসিনী, কুলত্যাগিনী !!! তাঁর অসাধারণ চাটুকারই তাঁহার মুকুন্দ-নামের যাথার্থ্য স্থাপনের প্রধান সহায় (ধূর্ত্তত্ব, নির্দ্দয়ত্ব ও পরদ্রোহিত্ব প্রকাশ)। সেই মুকুন্দের নিকটে—সেই চাটু-বিদ্যাই তো তুমি শিক্ষা করিয়াছ ভ্রমর ! আমরা সব জানি—এখানে আর তোমার পাণ্ডিত্য বিকাইবে না। তাই বলি, কপট-চাটুবাক্য ত্যাগ কর—আমার চরণ ত্যাগ কর, দূরে সরিয়া যাও ভ্রমর !”

ভ্রমর তখনও মৃদু মৃদু গুঞ্জন করিতে লাগিল। ভানু-নন্দিনী মনে করিলেন, ভ্রমর বুঝি বলিতেছে "রাধে ! সমস্তই বুঝিলাম। কিন্তু রাধে, কৃষ্ণ ধূর্ত্ত, নির্দ্দয় হইলেও তোমার তো প্রাণকোটি অপেক্ষাও প্রিয় ; তাঁহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া কি লাভ, প্রেমময়ি ! তাঁহাকে এইবার ক্ষমা কর, করুণাময়ি !” শ্রীরাধিকা মনে করিলেন, ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে এ সব কথা বলিয়া অনুনয় করিতেছে। তাই তিনি বলিলেন—"ক্ষমা করিব কাহাকে ভ্রমর ! যে ক্ষমার যোগ্য, তাহাকেই ক্ষমা করা যায় ; যে ক্ষমার সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহাকে ক্ষমা করিলে ক্ষমারই কলঙ্ক হয় ভ্রমর ! সকল অপরাধের ক্ষমা হয় না ভ্রমর ! যে কৃতজ্ঞ, তাকে বরং ক্ষমা করা যায় ; তাহার কৃত দুষ্কর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে অনুতাপ জন্মিতে পারে, তাতে সে শোধরাইয়া যাইতে পারে ; কিন্তু যে অকৃতজ্ঞ, তাকে ক্ষমা করিলে তার অকৃতজ্ঞতা-জনিত দোষেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তোমার মনিবটীর মত অকৃতজ্ঞ জগতে অপর একটীও খুঁজিয়া পাইবেনা ভ্রমর ! যার জন্য—সেবাদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে যাকে সুখী করার জন্য আমরা বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিলাম, আমাদের ইহকাল পরকাল সমস্ত নষ্ট করিলাম—পতি পুত্র পিতা-মাতা প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত (১)

---

(১) রাস-রজনীতে মুরলী-বাদন-সময়ে যে সমস্ত গোপী গৃহমধ্যে নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াই পরে রাসে গমন করিয়াছিলেন।

ত্যাগ করিলাম, এমতাবস্থায়ও যে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—একবারও আমাদের দুর্দ্দশার কথা ভাবিলনা—সেই প্রেমহীন অকৃতজ্ঞ-চূড়ামণিকে ক্ষমা করিতে বলিতেছ ভ্রমর! ইহা অসম্ভব?"

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

আমার কাহিনী।

কে আমি? চিন্তাশীল মানবের মনে চিরকালই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে — "কে আমি?" সে স্থির থাকিলেও, মৃত্যু তাহাকে স্থির থাকিতে দেয়না, সময়ে অসময়ে সে ভাবিতে বাধ্য হইয়া থাকে—এই যে "আমি, আমি" করিয়া দিন রাত্রি মরিতেছি, এই "আমি কে?" সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু একথা বর্ণে বর্ণে সত্য—আমি এক নির্দ্দিষ্ট দিনে উলঙ্গ অবস্থায় এই জগতে আগমন করিয়াছি, আবার আর এক নির্দ্দিষ্ট দিনে এখান হইতে উলঙ্গ অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব। আমি যদি জড় দেহমাত্রই হই, তবে আমার আদি এবং অন্ত বা জন্ম এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—অমার জীবন কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট দিন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আমার মৃত্যু আছে, তাহা বিশ্বাস করিতেও পারিতেছি না, ধারণায়ও আনিতে পারিতেছিনা। মৃত্যু যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে মৃত্যু-ভয়ে সময়ে কাঁপিতেছি কেন? মৃত্যু-ভয়ে কাঁপিলেও, আমি যে মরিব, তাহা মনে করিতে পারিতেছিনা,—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে চিরকালই ধ্বনি উঠিতেছে,—"আমার শেষ নাই। আমি চিরকালই থাকিব।" চক্ষুর উপর দেহকে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াও আমার ভিতর এইরূপ ভাবের উদয় হয় কেন? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—জগতে আশ্চর্য্য কি? তিনি বলিয়াছিলেন—"এক দল লোক নিত্যই মরিয়া যাইতেছে; অথবা যাহারা

কেহ দেবর-পুত্রাদিকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; শ্রীরাধিকাদি পতিত্যাগ করিয়াছিলেন, ধন্যাপ্রভৃতি পিতামাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাহারা থাকিতেছে, তাহারা কিছুতেই ভাবিতেছেনা, আমরাও মরিব—কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।" বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে বাস্তবিকই ইহার চেয়ে আর আশ্চর্য্য নাই; ভিতরের দিক দিয়া দেখিলে, আবার বলিতে হয়, ইহার চেয়ে সত্যও নাই! দেহই যদি আমি না হই; দেহব্যতিরিক্ত অবশ্যই আমি যদি কিছু হই, আর সেই আমার যদি বাস্তবিক মৃত্যু না থাকে, তবে সময়ে আমি মৃত্যু-ভয়ে কাঁপিতে পারি বটে, কিন্তু "আমি মরিবই" বলিয়া ভাবিতে পারিনা।

আমার দেহের খবর লইতে গেলে আমাকে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু কোথা হইতে মাতৃগর্ভে এই দেহ আসিল, তাহার উত্তরে পিতার বীর্য্য-সমীপে উপস্থিত হইতে হয়। আমি দেহ হইলে, আমাকে ঘাড় হেট করিয়াই স্বীকার করিতে হয়, আমি আর কিছু নই, পিতারই বীজ; তবে মাতারও কিছু লইয়া এই আমি হইয়াছি।

আমার দিন এবং রাত্রি আছে; দিনের বেলায় জাগিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিয়া বাহির হই, আবার রাত্রিকালে ঘুমাইয়া পড়ি। জীবনের প্রথম হইতে এইরূপ আমি দিনে উঠিয়া এবং রাত্রিতে পড়িয়া চলিতেছি। আমি দিনে চেতন হইলেও চেতন থাকিতে পারিতেছি না, রাত্রিতে অচেতন হইলেও, অচেতন থাকিতেছি না; কিন্তু চেতনই থাকি, বা অচেতনই থাকি, আমি, যাইতেছিনা, দিবসের সৃষ্টি এবং রাত্রির প্রলয়ে আমি, যে ভাবেই হউক বর্ত্তমান আছি।

বর্ত্তমান দেহ-সৃষ্টি এবং দিনরাত্রির ভিতর শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্বের বেশ একটী সুন্দর আভাস পড়িয়াছে।

শাস্ত্রে প্রলয় এবং মহাপ্রলয়ের কথা আছে। মহাপ্রলয়ে এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই থাকেনা। ইহার যত কিছু, সবই মহাবিষ্ণু বা বেদোক্ত সহস্রশীর্ষা পুরুষের আশ্রয়ে থাকে। এই পরমাত্মা পুরুষ স্বয়ং ভগবান লীলা-পুরুষোত্তমেরই অংশ, সুতরাং তাঁহার সহিত অভিন্ন ভগবান অনন্ত স্বরূপে বিরাজ করেন, ইনিও তাঁহার একটি স্বরূপ।

সৃষ্টির সময় এই ভগবান বহিরঙ্গা শক্তি প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহার অব্যর্থদৃষ্টিতে অচেতন প্রকৃতি চেতন এবং শক্তিমতী হইলে, তাঁহার গর্ভে তিনি সমুদায় বীজ ছাড়িয়া দেন—এইরূপে সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

স্বয়ং ভগবান এই আদি পুরুষের আসনে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিতেছেন—

"মমযোনি মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাম্ ততোভবতি ভারত ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃপিতা ॥"
—গীতা।

মহদ্ ব্রহ্ম হইতেছেন প্রকৃতি বা সৃষ্টির যোনি ; ভগবান হইতেছেন বীজ-প্রদ পিতা। মাতৃযোনিতে পিতৃবীজ পতিত হওয়াতেই আব্রহ্মস্তম্বের উৎপত্তি।

তাহা হইলে আদি পুরুষ ভগবানের কথা অনুসারে দাঁড়াইল এই যে, আমি—তাঁহার বীজ বা জীব। আদিতে তাঁহার ভিতর ছিলাম, সর্গে, বা কারণ-সৃষ্টির সময় তাঁহার ভিতর হইতে চ্যুত হইয়া প্রকৃতির উপর পতিত হইয়াছি।

মূলে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই, তিনি কারণ-সৃষ্টিকে কার্য্যে প্রকাশ করিয়াছেন। আদি সৃষ্টির নাম সর্গ, তাঁহার সৃষ্টির নাম বিসর্গ। তাঁহার দিনরাত্রি আছে—তাঁহার দিনে সৃষ্টি হয়, রাত্রিতে প্রলয় হয়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ হয় ; এইরূপ প্রায় এক হাজার (৯৯৪) দিব্যযুগে ব্রহ্মার একটী দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাত্রি আবার দিনের সমান। এইরূপ ৩৬৫ দিন-রাত্রিতে ব্রহ্মার এক বৎসর। তাঁহার পরমায়ু হইতেছে একশত বৎসর। পরমায়ু শেষে আবার মহা-প্রলয়।

সর্গে পরম-পিতা ভগবান হইতে বাহির হইয়া এই প্রকৃতিতে ব্রহ্মার বিসর্গে পড়িয়াছি। সহস্রযুগাত্মক রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় লীন হইয়া থাকিতেছি ; আবার তাঁহার দিনে বাসনা এবং কর্ম্ম অনুসারে কোটি কোটিবার সদসৎ যোনিতে সদসৎ দেহ ধারণ করিতেছি—আবার ত্যাগ করিতেছি—অবিরাম জন্মমৃত্যু চলিতেছে। আদি পিতা ভগবানের, অংশী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমরা এইরূপই শুনিতে পাই।

সহস্রযুগপর্য্যন্তম হর্যদ ব্রহ্মণোবিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ॥
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমেপ্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বাপ্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমে ঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

গীতা ৮।১৭—১৯

তাহা হইলে আমার কোটি কোটিবার জন্মই হউক, আর কোটি কোটিবার মৃত্যুই হউক, জন্মমৃত্যুর ভিতর আমি আমিই আছি; অস্ত্যর্থে অস্ ধাতু; সুতরাং আমি সৎ। সৎ হইবারই কথা বটে; কারণ, আমি সৎ পুরুষ ভগবানেরই বীজ বা জীব। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও মহৎ হইতে মহৎবস্তু ভগবানেরই অংশ। আমি জীব যে ভগবানের অংশ, তাহা তাঁহার শ্রীমুখেই প্রকাশ—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

জীব সৎ-চিদানন্দ আমার অংশ, সুতরাং সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মন এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় প্রকৃতির কার্য্য। মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারের এবং ইন্দ্রিয়গুলি রাজস অহঙ্কারের পরিণাম। সে এই ছয়টী বহন করিয়া এই চতুর্দ্দশভুবনের ভিতর ভ্রমণ করে। স্থূলদেহ যায়, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ থাকে, বায়ু ফুলের গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করিতে পারে, দেহের ঈশ্বর এই জীবও সেইরূপ, অন্যদেহে এইগুলি লইয়া হাজির হয়—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥

গীতা।

সে আমাকে ছাড়িয়া প্রাকৃত বিষয় ভোগ করিতে এই প্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়-ভোগের করণ। সে এই করণের দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেবচ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥

গীতা।

তাহা হইলে, নিত্য ভগবানের অংশ নিত্য আমি, ছয় ইন্দ্রিয়-যোগে বিষয় ভোগ করিবার জন্ত ক্রমাগত শরীর ধারণ এবং ত্যাগ করিয়া বেড়াইতেছি, আমি ভগবানের কিরূপ অংশ, ইহাই এখানে বিবেচ্য। ভগবানের স্বরূপ হইল সচ্চিদানন্দ। অংশীর ধর্ম্ম অংশেও বর্ত্তমান থাকিবার কথা, তাহা হইলে আমিও সচ্চিদানন্দ। কিন্তু আমি সৎ হইলেও যে অসতের মত হইয়া বেড়াইতেছি—একবার থাকিতেছি, একবার থাকিতেছি না, একবার বাঁচিতেছি, একবার মরিতেছি। দিব্যজ্ঞানই বা কোথায়? আনন্দের সঙ্গেই বা আমার সেরূপ সম্বন্ধ কোথায়? আমি দিবানিশি ত্রিতাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, সুখ-শান্তি-আনন্দের সন্ধানই করিতেছি, কিন্তু পাইতেছি কোথায়? তাহা হইলে আমি সৎ-চিদানন্দ ভগবানের কিরূপ অংশ হইলাম?

রাম-নৃসিংহাদিও ভগবানের অংশ। ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে, স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহারা প্রপঞ্চের উপর আবির্ভূত হন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

গীতা।

তাঁহারা ত আমার মত প্রাকৃত ইন্দ্রিয় লইয়া বিষয় ভোগ করিতে আসেন না, ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে আসেন। ভগবানের স্বরূপ-ধর্ম্ম এবং ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি তাঁহাদের ভিতর দৃষ্ট হয়, তাই তাঁহাদিগকে ভগবানের স্বাংশ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিতাপদগ্ধ হতভাগ্য মায়াধীন জীব আমি, আবার কিরূপে ভগবৎ-স্বরূপের অংশ হইলাম? ভগবানই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন:—তুমি আমার অবতার রামনৃসিংহাদির ন্যায় আমার স্বরূপের বা স্বরূপশক্তির অংশ না—সে সব আমারই ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ। এক কথায় বলিতে গেলে, সে সবই আমি। স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা-শক্তি ছাড়া আমার একটী পরা-প্রকৃতি বা তটস্থাশক্তি আছে—জীব তুমি তাহা হইতেই হইয়াছ, তুমি আমার সেই শক্তিরই অংশ। জীব দ্বিবিধ—নিত্যমুক্ত এবং নিত্যবদ্ধ।

নিত্যমুক্ত জীব আমাকে ছাড়িয়া প্রাকৃত-রাজ্যে প্রবেশ করে না। আমার চরণ-সমীপেই থাকে ; কিন্তু তুমি প্রাকৃত বিষয় ভোগ করিবার জন্য আমাকে ভুলিয়া নিত্যবদ্ধ হইয়াছে, আমার পরা-প্রকৃতির অংশ হইয়া অপরা-প্রকৃতির হাতে পড়িয়াছে। সংসার-লীলার জন্য আমার অপরা-প্রকৃতি আছে। তাহা হইতেছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাপ্রকৃতিরষ্টধা ॥

গীতা ৭।৪

এই আটটীকে বিস্তৃত করিলে ২৪টি তত্ত্ব হয়। পঞ্চভূতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্রা আছে। অহঙ্কারের পরিণাম পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়। মনঃ এখানে প্রধান। ভগবান ক্ষেত্র-তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার সময় আটটীকে বিস্তৃত করিয়া এই ২৪ তত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন।

মহাভূতান্য হঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ ॥

১৩।৫ গীতা।

অপরা-প্রকৃতির পরিণাম হইতেছে—নশ্বর-দেহ বা ক্ষেত্র। অপরা ব্যতিরিক্ত আমার অন্য একটী পরা-প্রকৃতির আছে—তাহার পরিণাম বা অংশ হইতেছে নিত্যজীব। আমার এই অপ্রাকৃত প্রকৃতি দ্বারায় এই প্রাকৃত-জগৎ ধৃত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে অপরা প্রকৃতির পরিণাম দেহ, পরাপ্রকৃতির পরিণাম জীব আমাকে ধারণ করিয়া নাই। আমিই দেহকে ধারণ করিয়া আছি। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ দেহ আছে। দেহ হইতে আমি বাহির হইয়া গেলেই আর দেহ থাকিতে পারে না। স্থাবর জঙ্গম যত কিছু প্রাণী, এই অপরা-পরার মিলনের ফলে হইয়াছে।

এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয় ॥

ভগবানের অপরা প্রকৃতি হইতে পরাপ্রকৃতি জীব আমি শ্রেষ্ঠ ; তবু সে আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে কিরূপে ? আর কেনই বা আমি তাহার হাতে পড়িয়া এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছি ?

এইসব "কেনর" উত্তর পাওয়া বড় কঠিন। সামান্য জড় বিজ্ঞানেই "কেনর" উত্তর পাওয়া যায় না, "কেমন করিয়া"র উত্তর মাত্র পাওয়া যায়। জড় বিজ্ঞানের যখন এই দশা, তখন জড় বুদ্ধির অতীত চৈতন্য-বিজ্ঞানের কথা ত স্বতন্ত্র।

অমৃতের পুত্র আমি কেন এই মৃত্যু-সংসারে পড়িলাম? ইহার উত্তরে সাধারণতঃ এই কয়রূপ কথা উঠে।

(১) ভগবান আমাকে শাস্তি দিবার জন্য বহিরঙ্গা শক্তি বা গুণময়ী মায়ার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন।

(২) মায়া আমাকে শাস্তি দিবার জন্য ভগবানের নিকট হইতে আমাকে টানিয়া লইয়াছেন।

(৩) ভগবান স্বতন্ত্র। আমি তাঁহার পুত্র। সুতরাং যতই কেন কম হউক না, আমার কিছু উত্তরাধিকার স্বত্বে স্বাতন্ত্র্য আছে; এই স্বাতন্ত্র্য বলেই পিতা হইতে মুখ ফিরাইয়া বহির্মুখ হইলাম, প্রাকৃত বিষয় ভোগ করিতে আমার বাসনা হইল। স্বতন্ত্র পিতা এই স্বতন্ত্র বহির্মুখ পুত্রের বাসনানুসারে ব্যবস্থা করিলেন—"তথাস্তু।"

(১) প্রথমটী স্বীকার করিলে ভগবানের উপর দোষারোপ করা হয়, তিনি নির্দ্দয় হইয়া পড়েন; কিন্তু তিনি সকল দোষের অতীত, সকল গুণের আকর। অতি বড় পাষণ্ডও তাহাকে নির্দ্দয় বলিতে সাহস করে না। তিনি সকল ধর্ম্মে সকল সমাজে দয়াময় বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ভগবান আমাকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার মায়ার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, এমন হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

(২) গুণময়ী মায়া বহিরঙ্গা শক্তি বাহিরে বাহিরেই থাকেন, তাঁহাকে স্পর্শ করিবারই তাঁহার অধিকার নাই। তিনি তাঁহার আজ্ঞাপালিকা দাসী। তিনি যে আমাকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে—বলাৎকারে টানিয়া লইয়াছেন, এমনও হইতে পারে না।

(৩) স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিয়া প্রাকৃত বিষয় ভোগ করিবার বাসনা করিয়াছি এবং আমার বাসনা পূরণের জন্যই বাঞ্ছাকল্পতরু আমাকে প্রকৃতির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ইহাই সঙ্গত বলিয়া ধারণা হয়। গোড়ায় গলদ

বলিয়া একটী কথা আছে। এই গোড়ায় গলদ হইয়াছে আমার। সংসারে সেই গলদেরই ক্রমাগত জের চলিতেছে বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে।

এ কথাটী ধ্রুবসত্য, যে কারণেই হউক সনাতন জীব আমি মায়ার হাতে বাঁধা পড়িয়াছি। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তম নামে তিনটী গুণ আছে, সেই তিনটী গুণই দেহীকে দেহে বাঁধিয়া থাকে।

সত্ত্বং রজ তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

ভগবানের তটস্থা-শক্তির অংশ জীব আমি তিনগুণে বাঁধা পড়িয়া গুণময়ী মায়ার অধীন হইয়াছি। এই জন্য আমি ভগবানের অংশ হইলেও স্বাংশ নহি, কিন্তু বিভিন্নাংশ। ভগবানের স্বরূপ অবতারগণ তাঁহার স্বাংশ, সুতরাং মায়াধীশ। তাঁহারা মায়ার রাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াও মায়াধীন হন না। আমার পৃথক প্রাকৃত দেহ বা ক্ষেত্র আছে, তাঁহাদের প্রাকৃত দেহ নাই। তাঁহাদের দেহ অপ্রাকৃত, তাঁহাদের জন্ম মৃত্যু নাই,—আবির্ভাব-তিরোভাব মাত্র। ত্রিতাপ নাই—আমার ত্রিতাপ আছে। জীব আমি পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া বেশ সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি। দেহপুরীতে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া আমি পুরুষ-নামেও কথিত। পুরুষ আমি এই নবদ্বারযুক্ত দেহ-পুরীতে যে সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, আবার সুখের পর দুঃখ ভোগ করিতেছি; তাহা কি আর বলিতে হইবে? এইখানে ভগবান সাংখ্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে—

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্‌গুণান্॥

পুরুষ সুখ দুঃখের ভোক্তা বলিয়া কথিত হয়, পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির গুণ সকল ভোগ করে।

আমার সদসৎ যোনিতে জন্মের কারণ হইতেছে এইগুলি—

"কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু।"
গীতা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

পরম পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয় বিগত ৪ঠা বৈশাখ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে প্রভুপাদ এখন দুই যায়গায় পাঠ করিতেছেন। পাঠে অতুলনীয়-আনন্দধারা প্রবাহিত হইতেছে।

প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয় এপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীসোণারগৌরাঙ্গ পত্রিকার নিয়ামক ছিলেন। এক্ষণে তিনি উক্ত শ্রীপত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নিজেই এই "সাধনা" পত্রিকা প্রচার করিলেন।

বৈষ্ণব-জগতের উজ্জ্বলতমরত্ন প্রভুপাদ শ্রীল অতুল-কৃষ্ণ-গোস্বামি-মহোদয়-প্রমুখ পরম-পণ্ডিত-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বয়সাধিক্যাদি বশতঃ এখন আর বিভিন্নস্থানে যাতায়াত করিতেছেন না; জন-সাধারণও তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ও তাঁহাদের শ্রীমুখে ভাগবত-কথাদি শ্রবণ করিয়া কৃতার্থতা-লাভের সুযোগ পাইতেছেনা। যে সমস্ত আচার্য্য-সন্তান আজ কাল নানাস্থানে যাতায়াত করিয়া জীব-সাধারণকে ভাগবত-কথাদি শুনাইয়া কৃতার্থতা দান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে পরমপূজ্য প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয়ই বিশেষ ভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ; বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ পারদর্শিতায়, শাস্ত্রব্যখ্যার অতুলনীয়-মধুরতায়, গোস্বামি-শাস্ত্রানুযায়ী ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান-তৎপরতায় এবং ব্যবহারের অমায়িকতায়—এই প্রভুপাদকে আদর্শস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। তাঁহার প্রচারিত এবং তাঁহারই সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধায়কতায় পরিচালিত "সাধনা" অতি শীঘ্রই যে জন-সাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবে, ইহা মনে করা বোধহয় দুরাশা হইবে না।

শ্রীনিবাস-আচার্য্য-প্রভুর দৌহিত্র-সন্তান-শ্রীধাম নবদ্বীপ, গানতলারোড় নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চট্টরাজ গোস্বামি-মহাশয়ের অনুকূলে একখানা আবেদন-পত্র বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে মুদ্রিত হইল। এই আবেদন-পত্রখানি শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীল রামকণ্ঠ গোস্বামী তর্কতীর্থ এবং শ্রীল সদানন্দ দাস মোহন্ত

ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক প্রচারিত এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীল কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ-প্রমুখ বাহু পণ্ডিত, গোস্বামী এবং বৈষ্ণব কর্ত্তৃক অনুমোদিত বলিয়া প্রকাশ। আবেদন-পত্রে জানাগেল, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ-সেবা লইয়া, শ্রীধাম নবদ্বীপে অতি ক্লেশে পরগৃহে বাস করিতেছেন। তিনি এক্ষণে উক্ত শ্রীবিগ্রহের জন্য একটী শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব-সাধারণের নিকটে সাহায্য-প্রার্থী। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন না।

আশা।

(এ) হৃদয় কাননে, বসি আনমনে,
কত আশা-তরু, রোপিনু রে হায়।
মায়া না মিটিল, বাসনা না গেল,
যতন করিয়ে, সেবিনু সবায়॥

সুখ-ফল আশে, আকুল পিয়াসে,
আশা-তরুপানে, প্রাণ-শুক ধায়।
ফল না ফলিতে, শতকলি সাথে,
কতশত তরু, শুকাল রে হায়॥

হেরি প্রাণ-শুক, ফলেতে বিমুখ,
হতাশের শ্বাস, ফেলে যাতনায়।
(সে)নিরাশ পবন, আমোদি কানন,
আশা-তরু চেয়ে, পোষিছে রে হায়॥

ভাবিয়া ভাবিয়া, আকুল হইয়া,
নিরাশ আঁধারে, দুঃখ-নিশি যায়।
রজনী পোহাতে, হেরি রে প্রভাতে,
শত নব তরু, জনমে রে তায়॥

হেরি ফল যত, পড়ে অবিরত,
কাননের মাঝে, নব তরু তায়।
ফল না পাইব, কেবল হেরিব,
আশাতরু যত, চৌদিকে ছড়ায়॥

ভাবে প্রাণ-শুক, নাহি চাহি সুখ,
এহেন কাননে, রহিতে আমায়।
রাখহে পিঞ্জরে, বাঁধি' প্রেম-ডোরে,
তব নাম ফল, দাও হে আয়॥

কেমনে হে হরি, আশা পরিহরি,
আশার ছলনা, দূরিব হে হায়।
প্রেম-ভরে তোঁরে, হৃদয়-মন্দিরে,
কেমনে পূজিব শিখাও আমায়॥

শ্রীসুবোধ চন্দ্র আয়কাত বি, এ,

সমালোচনা।

সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা। শ্রীযুক্ত নরহরি ভাগবতভূষণ, কাব্য-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ॥• প্যানতলা রোড নবদ্বীপ, জিং নদীয়া ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই উপাদেয় গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস-অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে গ্রন্থকারের স্বকপোল-কল্পিত মত একটীও নাই। গ্রন্থসম্পাদনে অতি-সাবধানতার সহিত বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামিপাদগণের পদাঙ্কই সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। শ্রীগুরু-পূজা সম্বন্ধীয় এরূপ সুন্দর সুসিদ্ধান্ত এবং রাগানুগীয় ভজনের এইরূপ সুন্দর দিগ্‌দর্শন অপর কোনও আহ্নিক-পদ্ধতিতেই দেখি নাই। শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃত কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও কতিপয় অত্যাবশ্যক স্তবাদি গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে ইহার উপাদেয়তা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি, ভারতের অদ্বিতীয় ভক্তি-

শাস্ত্রব্যাখ্যাতা প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয়কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায়ও গ্রন্থখানি বৈষ্ণব জগতের একটী সম্পত্তিবিশেষ হইয়াছে। বাস্তবিক রাগানুগীয় ভজনের অনুকূল এইরূপ আর কোনও আহ্নিক-পদ্ধতি আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই।

শ্রীভাগবতামৃত-কণা ঃ শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ বিরচিত এবং কবিরাজশ্রীল কানুপ্রিয় গোস্বামিকর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৵০; শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী, ভাজনঘাট পোঃ নদীয়া ঠিকানায় প্রাপ্তব্য

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে চক্রবর্ত্তিপাদের মূল, নীচে বঙ্গানুবাদ আছে। এবং বিস্তৃত পাদটীকায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সকলেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, তাঁহার ধামতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, এবং অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামোটি অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি অতি সুন্দর হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

(১)

ফরিদাবাদ, ঢাকা।

সবিনয় নিবেদন এই :—

রায়বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় "গোবিন্দ দাসের কড়চার" কোন পাণ্ডুলিপি বাহির করিতে না পারিয়া আমাকে বিগত ২৩।৩।২৬ তারিখে এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, শীঘ্রই তিনি বৃহৎ ভূমিকা সহ পুস্তকের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ২য় সংস্করণ বাহির করিতেছেন। সাহিত্যিক বৈষ্ণব মাত্রেরই এই বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করা আবশ্যক। আমরা তাঁহার নিকট হইতে প্রাচীন পুথি চাই। বৃহৎ ভূমিকা সহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ২য় সংস্করণ বাহির করিলে একটা মস্ত ভুলকে, একটা অসত্যকে, ভাল সাজে সজ্জিত করিয়া দাঁড় করান হইবে মাত্র। নিজ জেদ-বশে এই কার্য্যে হাত দিয়া মানবজাতির ভুল ধারণার পুষ্টে আর অগ্রসর না হয়েন— এ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুকে নিবেদন জানাইয়াছি। আপনি এ বিষয় আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত—

সম্পাদকীয় মন্তব্য :— গোবিন্দ দাসের কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে পত্রিকাদিতে দীনেশ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা একেবারেই গ্রহণীয় নহে। এই কড়চার উপর গুরুত্ব দিয়া তিনি একবার যে ভুল করিয়া বসিয়াছেন, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলেই সেই ভুল দূর হইবে না—তাঁহার মত লোকের ইহা বুঝা উচিত। তিনি দ্বিতীয় সংস্করণই করুন, সুদীর্ঘ ভূমিকাই লিখুন, আর যাহাই করুন না কেন, অপ্রামাণ্য বস্তু কখনও প্রামাণ্য হইবে না—বরং তাঁহার এই চেষ্টায় বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার অভাবই তিনি জনসাধারণকে জানাইয়া দিতেছেন। দীনেশ বাবুর মত প্রবীণ সাহিত্যসেবী ও দেশহিতৈষীর পক্ষে ইহা শোভনীয় বলিয়া মনে হয় না। ক্রটী সকলেরই হইয়া থাকে; ক্রটী-স্বীকারে কাহারও গৌরবের হানি হয় না, বরং মহত্বই প্রকাশ পায়।

দীনেশবাবু একবার লিখিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে দক্ষিণে গিয়াছিলেন, ইহা সম-সাময়িক লেখক কবিকর্ণপূরও উল্লেখ করেন নাই, কবিরাজ গোস্বামী অপরের নিকট শুনিয়া, বিশেষ বিচার না করিয়াই নিজের গ্রন্থে কৃষ্ণদাসের কথা লিখিয়াছেন। আমরা সানুনয়ে দীনেশ বাবুকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন একবার কর্ণপূরকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য খানা পড়িয়া দেখেন, দেখিবেন—কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি কর্ণপূরের উক্তিরই প্রতিধ্বনিমাত্র।

---

(২)

বাজিতপুর, ১৪।১২।৩২

কোটি দণ্ডবৎ প্রণামান্তে শ্রীচরণে নিবেদন এই :—

১। বড় আশা করিয়া শ্রীবৈষ্ণব-চরণে উপস্থিত হইতেছি; প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ হইবে। অত্র পত্রের সঙ্গে পাঁচটী প্রশ্ন দেওয়া গেল। তাঁহা আমরা অতি নরাধমের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এ যাবৎ আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টাতে এই সব প্রশ্নের সুমীমাংসা করিতে না পারিয়া অবশেষে শ্রীহরির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্তের শরণাপন্ন হইলাম।

আমার প্রশ্নগুলি আপনার শ্রীপত্রিকায় ছাপাইয়া তাহার উত্তর আহ্বান করিবেন এবং তৎসম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবেন, এই নিবেদন।

২। মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্তগণ হরিনাম সম্বন্ধে মফঃস্বলে যে সব কথা প্রচার করিতেছেন, তদ্বিরুদ্ধে শ্রীশ্রীসোনার-গৌরাঙ্গ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত স্পষ্টবিলাস ভক্তিকূপ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রচুর নহে। অতএব সকাতর প্রার্থনা, এতৎ-সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া উচিত সিদ্ধান্ত জন-সাধারণকে জানাইয়া রক্ষা করিবেন।

প্রশ্ন।

(১) গৃহী-বৈষ্ণবদিগের বিবাহ-ক্রিয়া কি ভাবে ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন হওয়া উচিত? আমাদের দেশ-প্রচলিত বিবাহ গৃহী-বৈষ্ণবগণের পক্ষে শাস্ত্র-সঙ্গত ব্যবস্থা কি না?

(২) গৃহী-বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কি ভাবে ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হইবে? বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করণীয় কি না? মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবগণের পক্ষে করণীয় কি না?

(৩) মহাগুরু-নিপাতে মালা-তিলক রাখা এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি করা যায় কি না?

(৪) শ্রীশ্রীএকাদশী-ব্রতদিনে আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও বৎসরান্ত একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য কি?

(৫) অন্য দেব-দেবীর পূজা কি প্রণালীতে গৃহী-বৈষ্ণবগণের করণীয়?

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণের দাসানুদাসাকাঙ্ক্ষী—

সুরেন্দ্রকিশোর কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য:—পরম ভাগবত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর কর মহাশয় যে কয়টী কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আলোচনার বিষয়। আরও কয়েকজন ভক্ত এইরূপ প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিলে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিব। এ সকল বিষয়ে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য আলোচনা করিবার নিমিত্ত আমাদেরও বাসনা রহিল।

(৩)

২১শে বৈশাখ।

শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-ভজন-পরায়ণেষু—

পত্রিকা-সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে; তবে এই বক্তব্য জন-সাধারণের, আমার নিজের নয়। যাহাতে পত্রিকাটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে হইলেও জনসাধারণের অভিমত আবশ্যক। তজ্জন্য কয়েকটী বিষয়ের জন্য আপনাকে লিখিতেছি।

১। ভক্তি-সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা—কর্ম্ম জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিশ্রেষ্ঠ কেন? তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন।

২। কলিযুগে নামই যে একমাত্র সম্বল। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত বা অন্যান্য অনেকের মত হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নামকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং সত্যই নামের তুল্য আর কিছুই নাই; এ বিষয়েও শাস্ত্রীয় আলোচনার দ্বারা প্রমাণ।

৩। সদাচার। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের নৈতিক অবনতি হইতেছে; যাহাতে জনসাধারণ সদাচারী হইয়া ৺ভগবৎ-আরাধনায় দৈনিক জীবনের কিয়দংশ অতিবাহিত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক।

৪। প্রভুপাদের লেখা প্রতিমাসেই কিছু কিছু থাকা আবশ্যক। ইহাতে জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহ হইবে।

৫। সোনার-গৌরাঙ্গে গৌড়ীয়-সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ আলোচনা একটু বিশদ্‌ভাবে করা আবশ্যক, সকলেই মনে করেন।

৬। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর "জন্মভিটা"-সম্বন্ধে আলোচনায় অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ আলোচনা আরও বিশদ্‌ভাবে করাই সকলের বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী।

শ্রীধাম নবদ্বীপ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য ঃ—পরমভাগবত গোস্বামি-মহাশয়ের উল্লিখিত বিষয়গুলি বাস্তবিকই প্রণিধান-যোগ্য। এই সকল বিষয়ে আমরা সাগ্রহে লেখক-মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রার্থনা।

তোমার চিন্তায় কবে হবে
চিত্ত আমার পূর্ণ বিভোর।
তোমার প্রেমে তলিয়ে যা'ব
ছিড়বে আমার মোহের ডোর।
বাসনা আমার দিনে রেতে
অন্ধ যাচয় দৃঢ় মাথে,
বাধন-হারা হয়ে কখন,
পড়বে ঝ'রে ফুলেতে মোর।
জ্ঞান কর্ম্ম সব নষ্ট হ'বে
তোমার নামে উঠ্‌ব ক্ষেপে;
তোমার নামটী সহজ হ'য়ে
ধ্বনিবে সারা সময় ব্যাপে।
তোমার নামের মধুরতা
দূর করবে মোর তৃষ্ণাক্ষুধা;
তুমি আমার আপন হবে
সরিয়ে দিয়ে, আপন জন।

শ্রীসূর্য্যকান্ত মণ্ডল।

সাধনা।

(মাসিক-পত্রিকা।)

—:•:—

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা ॥

১ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৩ { ২য় সংখ্যা।

গোবিন্দদাসের পদবলীর রসাস্বাদন।

(৩)

[রসোদ্গার]

যেমন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগের সম-বেদনা দ্বারা দুঃখের লাঘব হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহাদিগের সম-আস্বাদন দ্বারাও সুখের প্রাচুর্য্য ঘটিয়া থাকে; এজন্য প্রিয়-জনের নিকট দুঃখ-সূচক আক্ষেপ-উক্তি যেমন আবশ্যক ও স্বাভাবিক, আনন্দ-সূচক রসোদ্গারও স্বাভাবিক বটে। নায়ক ও নায়িকা কর্ত্তৃক প্রিয় সখা ও সখীর নিকট প্রেম-সম্মিলন-সুখের সরস বর্ণনাই পদাবলী-সাহিত্যে 'রসোদ্গার' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রে 'রস' শব্দটী যথেষ্ট ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য হইলেও 'করুণ'-রস প্রভৃতি অন্যান্য রসের রহস্য-নিবেদন, এমন কি আদি-রসের প্রসিদ্ধ বিভাগ-দ্বয়ের অন্যতর 'বিপ্রলম্ভ' বা বিরহের অন্তর্গত 'পূর্ব্ব-রাগ', 'মান', 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' ও 'প্রবাস'—এই বিষয় চতুষ্টয়ের অন্যতম বিষয়-সূচক রহস্য-বর্ণনার এই পারিভাষিক 'রসোদ্গার' শব্দের বাচ্য নহে; আদি-রসের অপর প্রসিদ্ধ বিভাগ 'সম্ভোগ বা প্রিয়-সম্মি-

শাস্ত্রে প্রেমিক-যুগলের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার তারতম্য-হেতু 'সম্ভোগ' বিষয়টী 'সংক্ষিপ্ত' 'সঙ্কীর্ণ' 'সম্পন্ন' ও 'সমৃদ্ধিমান্'—এতু চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; সুতরাং এই হিসাবে 'রসোদ্গার' ও 'সংক্ষিপ্ত রসোদ্গার' 'সঙ্কীর্ণ রসোদ্গার' 'সম্পন্ন রসোদ্গার' ও 'সমৃদ্ধিমান্ রসোদ্গার'—এই চারি প্রকার হইয়া থাকে। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে রসের এই স্বাভাবিক তারতম্য-অনুসারেই 'রসোদ্গার'-বিষয়ক পদাবলী বিশেষ সুবিবেচনার সহিত স্বতন্ত্র-ভাবে সঙ্কলিত ও সুবিন্যস্ত হইয়াছে। স্থানাভাব-হেতু আমরা এখানে শুধু গোবিন্দদাসের 'সংক্ষিপ্ত রসোদ্গার'-পদাবলীর সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব; 'সঙ্কীর্ণ রসোদ্গার' প্রভৃতি পরের প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ প্রথম সাক্ষাৎ দর্শনেই পরস্পরের প্রেমে মজিয়াছেন; নায়িকারা পরাধীন বলিয়া স্বভাবতই ঐক্ষেত্রে প্রেমাভিযোগ (Adreances) প্রদর্শনে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে পারে না; তাই, শ্রীরাধার বিভ্রম-বিলাস হইতে চতুর-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তমার প্রেমের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার নিকট নিজের বিশ্বস্ত 'আপ্ত-দূতী' পাঠাইয়া এবং সেই দূতীর সাহায্যেই, তাঁহাকে সখীদিগেরও অজ্ঞাতসারে সঙ্কেত-কুঞ্জে আনয়ন করিয়া প্রিয়তমার সহিত প্রথম সম্মিলিত হইয়াছেন। এ অবস্থায় প্রেমিক-যুগলের স্বাভাবিক লজ্জা ও ভয় ইত্যাদি—কারণ হেতু সম্ভোগ বিশেষ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইতে না পারিলেও ব্যাকুলতা ও নবীনতার আতিশয্যে এই রস-শাস্ত্রোক্ত 'সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ'টী প্রেমিক-যুগলের নিকট যারপরনাই মধুর ও প্রীতিকর বলিয়া প্রতীত হয়। সখ্য-প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, উহা নিজের প্রিয় সখা বা সখীকে নিজের সুখ বা দুঃখের সাথী না করিয়া তৃপ্তিলাভ করে না; সুতরাং সহজেই বুঝাযায় যে, শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়সখীদিগের নিকট তাঁহার এই প্রথম প্রিয়-সম্মিলনের কাহিনী ব্যক্ত করিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক থাকিলেও, শুধু লজ্জার জন্যেই এ পর্য্যন্ত উহা পারিয়া উঠেন নাই। শ্রীরাধার-ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি প্রিয়তমা সখীরাও রূপ, গুণ ও বৈদগ্ধীর হিসাবে শ্রীরাধার অপেক্ষা বড় কম নহেন; তাঁহারা আজ শ্রীরাধার একটা নূতন রকমের চাপা উল্লাসের ভাব

সারেই তাঁহাদের প্রিয়-সখীর রসের ভাণ্ডারটী লুণ্ঠিত হইয়াছে; আর তাঁহাদের প্রিয়-সখীটীই সেই লুণ্ঠনের প্রধান সাহায্য-কারিণী এবং সেও এই ব্যাপারে তাহার পারিতোষিক স্বরূপ লুণ্ঠিত ধনের একটা মস্ত ভাগ আদায় করিয়া লইযাছে! এ অবস্থায় আসল চোরকে ধরিয়া, তাঁহার নিকট হইতে চোরাই মালের ভাগ আদায় করিতে না পারিলেও নিজদের প্রিয়-সখীর নিকট হইতে সেই মালের কিছু ভাগ আদায় না করিয়া সখীরা ছাড়িবেন কেন? তাই সখীদিগের মধ্যে প্রধানা, বোধ হয়, সুরসিকা শ্রীললিতাই আমাদের কৃষ্ণ-বিলাসিনী শ্রীরাধাকে সপ্রণয় ও সুমধুর রহস্য-বচনে বলিতেছেন:—

"বিভাষ।"

চৌদিকে চকিত নয়নে জন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল (১) অঙ্গ।
বচনক ভাতি বুঝই নহি পারিয়ে
কাহাঁ শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি, কী ফল পরিজনে বাঁচি (২)।
শ্যাম সুনাগর, গুপত প্রেমধন
জানলুঁ হিয় মাহা সাঁচি (৩)॥ধ্রু॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি-অঙ্গ-ভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম, বদন মাহা ঝলকই
এত দিনে পেখলুঁ আঁখি॥
গহন মনোরথে পন্থা না হেরসি
জীতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ (৪)
মৌনহি (৫) সমুঝলুঁ (৬) কাজ (৭)"

(পদকল্পতরু ২২৭ সংপদ)

অর্থাৎ, যদি তোমার হৃদয়ের মধ্যে গোপন-ভাবে কোনও ধন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া না থাক, তাহা হইলে তুমি এখন (চোরের মতন) চঞ্চল-নয়নে চারিদিক্ পানে বারম্বার তাকাইতেছ কেন? আর- তোমার আবৃত অঙ্গটা (আরও অধিক) আবৃত করিতেছে কেন? সুন্দরি! তোমার আপনার পরিজন আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া কি ফল হইবে? (আমরা তোমার ভাব-ভঙ্গীতেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুমি নায়ক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-রূপ (অমূল্য) ধন তোমার হৃদয়ের মধ্যে গুপ্ত-ভাবে সঞ্চিত করিয়াছ! (যদি বল, এ বিষয়ের প্রমাণ কি? তাই, বলিতেছি) তোমার এই (সলজ্জ ও চাপা উল্লাস-পূর্ণ) ঈষৎ হাস্যই তোমার গুপ্ত মর্ম্ম কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছে; (আর সাক্ষী শুধু একজনই বা হইবে কেন?) তোমার প্রত্যেক অঙ্গেরই (একটা নূতন-ধারা) ভঙ্গিমা এ বিষয়ে সাক্ষী পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং (কোনও ব্যক্তির) পরিধেয় বস্ত্রের গ্রন্থির ভিতরে রক্ষিত স্বর্ণ (গোপনকারী ব্যক্তির) মুখের মাঝে ঝলক দেয়—এতদিনে ইহা চক্ষে দেখিলাম! * অতএব তোমার গুপ্তধন যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন আমাদিগকে উহার ভাগ না' দিলে চলিবে কেন?

সখীর এই সপ্রেম রসিকতায় শ্রীরাধার ক্লেশ-জনক সঙ্কোচের বাঁধটা ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল মুখ-পদ্ম হইতে প্রথম প্রিয়-সম্মিলনের অমৃতায়মান রসোদ্গার নির্গত হইয়া সখীদিগের কর্ণে সুধা-বর্ষণ করিতে লাগিল; শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—

শ্রীগান্ধার।

দরশনে লোর নয়ন-যুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর (১) দুহুঁ ভুজ কাঁপি॥
দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ (২)।
নামহিঁ (৩) যাক (৪) অবশ করু অঙ্গ॥ ধ্রু॥

---

* তুলনা করুন—

"আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী॥ বিদ্যাপতি;

চেতন না রহ চুম্বন-বেরি (৫)।
কো জানে কৈছে রভস-রস-কেলি ॥
সো ধনি মাঝি সুরত-অধিদেবী।
তাকর চরণ-কমল পরে (৬) সেবি।
কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব (৭)।
অনুভবি (৮) আপ (৯) পরহুঁ সমুঝাব (১০)॥
তবহুঁ (১১) জগত ভরি অকিরিতি (১২) এহ।
রাধা-মাধব অবিচল-লেহ (১৩)॥
এ কিয়ে সুদঢ় (১৪) কিয়ে পরিবাদ (১৫)।
গোবিন্দদাস কহ না তাহে বিবাদ॥

(পদকল্পতরু ২৬৩ সংপদ)

অর্থাৎ—প্রিয় সখিগণ! তোমাদের নিকট আমার অবক্তব্য কি কথা আছে? তবে, আমি কি চাই বলিব? আমার কি-ই বা বলার ক্ষমতা আছে! যখন প্রিয়তমের সহিত প্রথম সম্মিলন হইল, তখন তাঁহার দর্শন-মাত্রেই অশ্রু-জল, আমার নয়ন-যুগলকে আবৃত করিয়া, আমার দৃষ্টি-শক্তিকে বিলুপ্ত করিয়া দিল! প্রিয়তম আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিতে গেলে—কি জানি কেন, আমার ভুজদ্বয় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল! সুতরাং সেই আলিঙ্গন সুখকর কি ক্লেশকর, আমার কম্পান্বিত অবশ স্তব্ধ অঙ্গ তাহা কি করিয়া বুঝিবে! তাই, প্রিয়-সখি! মিনতি করিয়া বলিতেছি—সে সকল কথা ছাড়িয়া দাও; বেশী কথায় কাজ কি? তাঁর নাম লইলেই আমার অঙ্গ যেন অবশ হইয়া যায়! আবার খুঁটিয়া খুঁটিয়া চুম্বন ও রস-ক্রীড়ার কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? প্রিয়তমের চুম্বন-কালে আমার চেতনাই ছিল না; সম্ভোগ-লীলা যে কেমন, তা কে জানে? তুমি বলিতেছ যে, রসিকা নায়িকারা কতজন কত

(৫) চুম্বন-কালে (৬) উপরে (৭) অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক-বিকার (৮) অনুভব করিয়া (৯) নিজে (১০) পরকেও বুঝাইবে (১১) তবু (১২) অকীর্ত্তি, কলঙ্ক (১৩) স্থির-প্রেম-বিশিষ্ট (১৪) সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত

চমৎকার-ভাবে তাহাদের সম্ভোগ-সুখের বিষয় বর্ণন করিয়া থাকে; তবে আমি তা পারিব না কেন? শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে শরীরে যে সব অশ্রু, পুলক ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হয়, নিজে বেশ করিয়া অনুভব করিয়া, যে নায়িকা উহা অপরকেও বুঝাইতে পারিবে, আমি তাহাকে সম্ভোগ-লীলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া মানিব, আর তাহার পাদপদ্মের উপরে পূজা দিব! সেই নায়িকাই ধন্যা; হতভাগিনী আমি নিজেই তাঁহার সম্ভোগ-লীলার প্রকৃত আস্বাদন পাইলাম না, তোমাদিগকে আবার বর্ণনা করিয়া উহার আস্বাদ কি বুঝাইব?

বলা বাহুল্য যে, সুরসিকা ও সুচতুরা সখী শ্রীরাধার এই আনন্দ-জড়তাময় বিহ্বল উক্তি হইতেই বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, প্রেমোৎকর্ষ ও রসাস্বাদনের আতিশয্যে সম্ভোগ-কালে তাঁহার রস শাস্ত্রের বর্ণিত "আনন্দাত্মক সংমোহ" উপস্থিত হওয়ায়ই তিনি সাধারণ নায়িকাদিগের ন্যায় সম্ভোগ-লীলার খুঁটি-নাটি কার্য্যগুলির বিষয় মনে রাখিতে পারেন নাই; ইহা তাঁহার অপ্রেমিকতা বা অরসজ্ঞতার পরিচায়ক না হইয়া বরং তাঁহার অসাধারণ প্রেম-তন্ময়তা ও রসজ্ঞতারই সূচনা করিতেছে; সুতরাং তাঁহাদের প্রিয়-সখী নিজের অপূর্ব্ব রসাস্বাদনের অতৃপ্তি-হেতু প্রিয়-সম্ভোগে সচেতনা যে নায়িকার সৌভাগ্যের ও রূপের প্রশংসা করিলেন, বস্তুতঃ সে-ই অপ্রেমিকা ও অরসজ্ঞা; বিষ্ণুপ্রিয়া সরস্বতীরই অপর-মূর্ত্তি সুতরাং নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বে ও অজ্ঞাত-সারেও ঋত-ভাষিণী শ্রীরাধার উক্তির বিপরীত-লক্ষণা দ্বারা সূচিত ব্যঙ্গ্য-অর্থে সেই আপাত-প্রশংসিতা নায়িকা প্রেমের দেবী নহে—শুধু আত্মেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিময় কাম-লীলার মূর্ত্তিমতী দেবতা; সুতরাং নিতান্তই দুর্ভাগ্যবতী। কিন্তু মনের আনন্দ-উল্লাসটা কৌশলে রহস্য দ্বারা প্রকাশ না করিলে নহে বলিয়া, সখী যেন ন্যাকা সাজিয়াই, সম্ভোগ-লীলার কোনও আস্বাদনই শ্রীরাধার অদৃষ্টে ঘটে নাই—শ্রীরাধার উক্তির এই সহজ-বোধ্য অর্থ ধরিয়া লইয়া, প্রিয়-সখীর প্রতি কপট সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"হায়! কি আপশোশের কথা! তবু পৃথিবী-শুদ্ধ পোড়া-লোকে নিন্দা করিয়া বলে কি না যে, শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরাধার মধ্যে কি চমৎকার প্রেম! দু-জনের মধ্যে একটুকুও ছাড়াছাড়ি হয় না!" (সখীর এ কথার ব্যঙ্গ্য অর্থ এই যে, যে নায়ক শ্রীরাধার

পাইয়াও সম্ভোগ-রসের আদান-প্রদান ব্যতীত উঁহাকে অতৃপ্ত অবস্থায় বিদায় করে, তাহাকে বালক বা গরুর রাখাল ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? এরূপ অরসিক ও মূর্খের সহিত আবার কোন্ রসিকা বা সুন্দরী নায়িকার কবে প্রেম হইতে পারে! হত-ভাগিনী প্রিয়-সখীর অদৃষ্টে কেবল অমূলক কলঙ্কই সার! আমাদিগের পদ-কর্ত্তা গোবিন্দ দাস শুধু এই পদের রচয়িতা কবি নহেন—তিনিও সখীর অন্যতমা, অনুগা-ভাবে সখীদিগের সহিত শ্রীরাধার এই রহস্যময় সুমধুর রসোদ্গার-লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন; তবে তিনি সখীর মত বক্রোক্তি-ভাষিণী নহেন—তাঁহার অধীন-পদোচিত নম্রতা ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক প্রেম-ভক্তির জন্যই, তিনি দুই দিক্ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে চাপা রসিকতার সহিত বলিতেছেন—ঠাকুরাণীরা কেন মিছামিছি বিবাদ করিতেছেন? শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতই রসজ্ঞ কিনা এবং তাঁহার প্রতি আপনাদের আরোপিত অরসজ্ঞতা শুধু কুৎসাজনিত কিনা—ইহা গুরুতর সন্দেহের বিষয়ই বটে; এই বিবাদের মীমাংসা শুধু কথায় হইতে পারে না! (ধ্বনি-গম্য অর্থ—সত্য কি মিথ্যা স্থির করিতে হইলে নিজের পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক; সুতরাং শ্রীরাধারাণীর ন্যায় আপনারাও একবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত নির্জ্জন সঙ্কেত-কুঞ্জে সম্মিলিত হইয়া দেখুন; আপনাদেরও চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইবে!) সখীদিগের সহিত এরূপ রহস্য-আলাপ হেতু শ্রীরাধার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, অতঃপর তিনি গদ্গদ-কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

সুহই।

"আধক আধ-আধ　　দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত-কোটী　　কুসুম-শরে জরজর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনী, জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি　　যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥　ধ্রু॥

সুনয়নি কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জলু আগি॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লব জানে
রসবতি-রস-মরিযাদ॥

(পদকল্পতরু ২৩৪ সংখ্যা)

অর্থাৎ—অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক চক্ষুর অঞ্চল অর্থাৎ প্রান্তধারা (সোজা কথায়—অতি অল্প মাত্র অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে) যখন হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছি, তখন হইতেই কন্দর্পের কত শতকোটি অর্থাৎ অসংখ্য পুষ্পবাণে জর্জ্জরিত হইতেছি; প্রাণ যাইবে কি থাকিবে বুঝিতে পারি না। হে সখি! জানিতে পারিলাম যে, বিধি আমার প্রতি বাম হইয়াছে (কেন না, বিধি আমাকে দুনয়ন ভরিয়া সাধ মিটাইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনের শক্তি দেন নাই!)। যে (ধন্যা) নায়িকা দুই চক্ষু ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পারেন, তাঁহার চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম। সুনয়না কেহ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ,—কিন্তু আমার কাছে তিনি উজ্জ্বল বিদ্যুতের মত প্রতীত হন; রসবতী নায়িকা তাঁহার কল্পিত স্পর্শের আনন্দে ভাসিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার স্পর্শে আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে। প্রেমবতী রমণী প্রেমের জন্য জীবন পরিত্যাগ করেন, কিন্তু আমার এই চঞ্চল জীবনেও সাধ হইতেছে। সর্ব্ব-স্থানীয় পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলেন যে শ্রীবল্লভ রসবতী শ্রীরাধার এই অনন্য-সাধারণ রসের মর্য্যাদা অর্থাৎ মাহাত্ম্য জানেন। *

রামায়ণে ভূতের কেঁচ্ মেচির মত এখানে একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি

* এই উৎকৃষ্ট পদের অলঙ্কার ও ধ্বনির বৈচিত্র্য বাহুল্য-ভয়ে এখানে ব্যাখ্যা করা গেল না; বিশেষ-জিজ্ঞাসু আমাদের সম্পাদিত সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

না; সহৃদয় পাঠক দয়া করিয়া রসভঙ্গ মার্জ্জনা করিবেন। গোবিন্দদাস ভণিতায় যে শ্রীবল্লভের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কে? পদকল্পতরুর ৩য় শাখার ১১শ পল্লবে নিম্নলিখিত সুপ্রসিদ্ধ পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরিতি অনুরাগ বাখানিয়ে
অনুখণ নৌতুন হোয়॥ ধ্রু॥
জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে মুখে-মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা॥
বচন-অমিয়া-রস অনুখণ শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনি রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখি।
কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি॥

(পদকল্পতরুর ৯৩৭ সংপদ)

এই পদেরই একটা মৈথিল রূপান্তর (version) বিদ্যাপতির পদাবলীর সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে; তাহাতে পাঠের সামান্য সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ও 'কহ কবি বল্লভ" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি-দ্বয়ের পরিবর্ত্তে পাঠ আছে—

"বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত।
লাখে ন মিলল এক॥"

উদ্ধৃত পদের প্রথম কলিটী শ্রীরূপ-গোস্বামি-পাদের প্রণীত উজ্জ্বল-নীল-মণি গ্রন্থের নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ; যথা—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥"

অনুরাগের এইরূপ লক্ষণ উজ্জ্বল-নীলমণির পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও রস-গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়না; শ্রীরূপ গোস্বামী বিদ্যাপতির আন্দাজ এক শতকের পরবর্ত্তী ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ হইতে বিদ্যাপতির পদের মর্ম্ম গৃহীত হওয়া অসম্ভব। বিদ্যাপতির রচিত কোনও রস-শাস্ত্রের খোঁজ পাওয়া যায় নাই; অনুরাগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যাইয়া বিদ্যাপতি যে নায়িকার মুখ দিয়া অনুরাগের একটা রসশাস্ত্রের ধরণে লক্ষণ লিপি-বদ্ধ করিবেন, ইহাও খুব আশ্চর্য্য বোধ হয়।' পক্ষান্তরে, গৌড়ীয় পদকর্ত্তারা অনেকেই অনেক স্থলে উজ্জ্বল-নীলমণির লক্ষণ ও উদাহরণের সুস্পষ্ট অনুসরণে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং আমরা এই পদটী বঙ্গীয় পদকর্ত্তা বল্লভের রচিত বলিয়াই অনুমান করিতে বাধ্য হইতেছি। এই কবি অর্থাৎ পদ-কর্ত্তা বল্লভ যে কে ছিলেন, নিশ্চিত বলা যায়না; তবে গোবিন্দদাস যে পূর্ব্বোক্ত 'আধক আধ-আধ' ইত্যাদি পদের ভণিতায় এই বল্লভকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়; কেননা, গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার "চপল জীবনে মঝু সাধ" এই বাক্যের ধ্বনি এই যে—জীবন নশ্বর হইলেও শ্রীরাধা অগত্যা সারাটা জীবন ভরিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অসীম প্রেম-সাগরের কিয়দংশ উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহার ইহাই গভীর আক্ষেপ যে, জীবন অবিনশ্বর নহে, জীবন অবিনশ্বর হইলে তিনি অনন্ত কাল ধরিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের রসাস্বাদন করিতে পারিলে বোধ হয় কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন; কবি বল্লভের উক্ত পদেও এই অসীম রস-পিপাসা ও অতৃপ্তিই পরিস্ফুট হইয়াছে; তবে উভয় পদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, গোবিন্দদাস 'সুনয়নি' 'রসবতি' ও 'প্রেমবতি' শব্দগুলির লক্ষণা-মূলক ধ্বনিদ্বারা আপাত-প্রশংসিত নায়িকার দৃষ্টি-কুশলতা, রসজ্ঞতা ও প্রেমিকতার নিন্দা ব্যঞ্জিত করিয়া কবিত্বের যে উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন, কবি বল্লভের পদে ধ্বনির সেরূপ চমৎকারিত্ব নাই। কবি বল্লভের "জনম অবধি" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি-দ্বয়ে যে অসীম অতৃপ্তি সুন্দর স্বাভাবিক ভাষায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে,—তাঁহার 'লাখ লাখ যুগ' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে সে স্বাভাবিকতা ও রস-সান্দ্রতা রক্ষিত হয় নাই। জগতের আপামর সকল ব্যক্তির নিকটেই সুখের সময়টা সংক্ষিপ্ত ও দুঃখের সময়টা সুদীর্ঘ প্রতীত হয়; এ অবস্থায়, মিলনের কালটা যে কিজন্য শ্রীরাধার নিকট 'লাখ লাখ যুগবৎ' প্রতীত হইবে

তাহা বুঝিতে হইলে শক্তিমান্ ও শক্তিরূপা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অনাদি-অনন্ত-কাল-ব্যাপী নিত্য প্রেম-সম্বন্ধ-রূপ বৈষ্ণব-দর্শনের প্রসিদ্ধ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে চলে না।

কবিতায় এইরূপ দার্শনিক-তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ কাব্যের উৎকর্ষের পরিচায়ক না হইয়া, সহৃদয়দিগের বিবেচনায়, কাব্যের অপকর্ষেরই কারণ বটে। সে যাহা হউক, এই পদের প্রথম কলিতে উজ্জ্বল-নীলমণির মত অনুমোদিত অনুরাগের লক্ষণ ও পরবর্ত্তী কলিগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন ও রস-শাস্ত্রের মত উপস্থাপিত হওয়ায় পদটী যে অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচনা নহে—কিন্তু শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয়দিগের পরবর্ত্তী কোনও বঙ্গীয় কবির রচনা, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে 'বল্লভ' ও 'হরি বল্লভ' ভণিতায় আরও অনেকগুলি পদ আছে। তন্মধ্যে 'হরিবল্লভ' ভণিতা-যুক্ত পদাবলী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-টীকাকার ও কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোবিন্দদাসের অনেক পরবর্ত্তী, সুতরাং গোবিন্দদাসের প্রশংসিত শ্রীবল্লভ 'হরি বল্লভ' হইতে পারেন না। শুধু 'বল্লভ' বা 'শ্রীবল্লভ' ভণিতার পদ গুলির মধ্যে পদকল্পতরুর ৩য় শাখার ১৩ শ পল্লবের "ও মুখ শরদ সুধাকর-সুন্দর" ইত্যাদি (১০২২ সংখ্যক) পদটীর ভণিতায় আছে—

"নরোত্তমদাস আশ চরণে রহু
শ্রীবল্লভ-মন ভোর॥"

ইহাদ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, এই পদের রচয়িতা "শ্রীবল্লভ" সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জনৈক শিষ্য, সুতরাং গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ছিলেন।

বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সংস্করণের ভূমিকার ২।৵০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা, সখি কি পুছসি অনুভব মোয় ইত্যাদি পদকল্পতরুতে দেখিলে উক্ত কবির রচনা বলিয়াই মনে হয়না। পদকল্পতরুতে ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম নাই, কবি বল্লভ আছে।" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু এই পদটীর যে মৈথিল রূপান্তর প্রকাশিত করিয়াছেন, উহার সহিত শুধু ভণিতার নামান্তর ব্যতীত প্রকৃত

পাঠ-বৈষম্য বিশেষ কিছুই দেখা যায় না; ভণিতার এরূপ গোলযোগ নানা কারণেই সঙ্ঘটিত হইতে পারে; সুতরাং এই পদটির একটা রূপান্তর মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত কারণে আমরা এটীকে বিদ্যাপতির রচিত পদ, কিংবা বিদ্যাপতির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা। আমাদিগের বিবেচনায় ইহা পূর্ব্বোক্ত কারণে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া গণ্য হওয়ার যোগ্য নহে; গোবিন্দদাস তাঁহার "আধক আধ-আধ" ইত্যাদি যে পদে কবি বল্লভের এই পদটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, কাব্য-রসের হিসাবে তাহাও এই পদের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। আজকাল কথায় কথায় কাব্য ও কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়; আমরা আধ্যাত্মিকতার বিরোধী নহি; কিন্তু ইহাই বলিতে চাই যে, যেমন সুমিষ্ট আম্র-ফলের উপরের সমস্ত অংশ পরিত্যাগ করিয়া, উহার অস্থি ও মজ্জার স্বাদ-গ্রহণ করিলেই উহার প্রকৃত রসাস্বাদন করা হয়না; তেমনি কাব্যের উৎকর্ষের বিচার করিতে হইলেও প্রধানতঃ উহার রস ও ব্যঞ্জনা দ্বারাই উহা করা আবশ্যক হয়। এজন্যই দেখা যায় যে, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি-গণ তাঁহাদিগের কবিতায় দার্শনিক তত্ত্ব-গুলিকে সাধ্য-অনুসারে বর্জ্জন করিয়াই কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় এম, এ,

শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য।

শ্রীনামের স্বরূপ-নির্ণয়।

বিশ্ববাসীর হৃদয়-মরুভূমিতে আনন্দধারা প্রবাহিত করিতে, জগতের হৃদয়-গুহা হইতে নিখিল ভয়, সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিতে, রসনার অগ্রভাগে শ্রীনামরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েন। আমরা গোবিন্দ-ভাষ্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, একই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু, প্রধানতঃ চতুর্দ্ধা প্রকাশিত হয়েন, শ্রীবিগ্রহ, নাম, ধাম ও লীলার সহায়-কারিণী রমণীরত্নরূপে অর্থাৎ

কান্তারূপে। তন্মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি, ভক্তের ভক্তিবাসনা পূর্ণ করিতে, রমণীরত্ন, লীলার পূর্ণ সহায়তা করিতে—ভক্ত এবং ভগবান এই দুইকেই আনন্দ দিতে—আর নাম, আপাত-মধুর বিষয়-ভোগ-লালসায় প্রপীড়িত মায়ামুগ্ধ জীববৃন্দকে মূর্ত্ত আনন্দের নিকট টানিয়া নিতে আবির্ভূত হয়েন। যদি শ্রীনামের করুণা আমাদের উপর পতিত না হয়, তবে শ্রীবিগ্রহ, ধাম ও লীলার সহায়কারিণী রমণীরত্ন প্রভৃতি সকলই মায়ামুগ্ধ জীব আমাদের পক্ষে বৃথা হইয়া পড়ে। কৃপণের ধনের মত জিনিস থাকিলেও যদি ভোগ করা না যায়, তবে সে জিনিসের আবশ্যকতা কি? বস্তুতঃ নামের করুণার পরেই শ্রীবিগ্রহ, ধাম ও লীলার সহায়কারিণী-শক্তির মধুরতা আস্বাদন। তাই, আমরা বলিতে পারি, ভগবন্নামের নিকট আমরা যতটা কৃতজ্ঞ, শ্রীমূর্ত্তি, ধাম ও লীলার সহায়কারিণী-শক্তির নিকট ততটা কৃতজ্ঞ নহি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকমুনিও এরূপই ইঙ্গিত করেন।

"নাম ব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ।" শ্রীভাঃ ৬।২।১০

"শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিলে নাম-উচ্চারণকারীর প্রতি 'আমার এই ব্যক্তি, ইহাকে সতত সকল স্থানে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য,' এইরূপ বুদ্ধি শ্রীবিষ্ণুর হইয়া থাকে।" (শ্রীস্বামিপাদ)।

"শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণে, হৃদয় মধ্যে তাঁহার (ভগবানের) অনুভূতি প্রদান করে।" (শ্রীজীব-গোস্বামী)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও দেখা যায়, সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি শুকমুনি, পঞ্চমস্কন্ধের অন্তভাগে, তামিস্রাদি নরক বর্ণনা করেন, নরক-যন্ত্রণার কথা শুনিলে ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। সেখানে যন্ত্রণার ঘোর আর্ত্তনাদে, হাহাকার-শব্দে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত; কোথায়ও সেখানে শান্তির নিশ্বাস প্রবাহিত হয় না।

সেখানে ভয়ঙ্করাকৃতি যমদূতগণ, পাপীকে তপ্ত-তৈলে নিক্ষেপ করিতেছে, কোথাও বা অত্যন্ত উত্তপ্ত কটাহে ফেলিয়া দিতেছে; কোথাও বা বিষধর সর্পশ্রেণীদ্বারা দংশন করাইতেছে; পাপিগণ যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছে, কিন্তু প্রাণ যাইতেছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরীক্ষিত মহারাজ সমস্তই শুনিলেন, তাঁহার দয়া-প্রবণ হৃদয় পাপীর দুঃখে বিগলিত হইল, বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিল। ভাবিলেন, জীবগণ তো সততই পাপকার্য্যে লিপ্ত, ধর্ম্মেতে জীবের প্রায়শই আস্থা দেখা যায় না; বোধ হয়,

তাহারা সতত এই প্রকার দুঃখই ভোগ করিতেছে। জীবের পাপ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কি কোনও উপায় নাই? আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রারম্ভেই শুকমুনির নিকট প্রশ্ন করিয়া বসিলেন,

অধুনেহ মহাভাগ, যথৈব নরকান্নরঃ।

নানোগ্রযাতনা-ন্নেয়াত্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ শ্রীভাঃ ৬।১।৫

"হে মহাভাগ, যে উপায় অবলম্বন করিলে, ভীষণ হইতেও ভীষণতম নানাবিধ যাতনাপূর্ণ-নরকে জীবের যাইতে হয় না, এমন কোন উপায় আমার নিকটে বলুন।"

এই প্রশ্নের উত্তরে, শ্রীশুকমুনি বলিলেন, বৎস পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন-স্বরূপ বলদেবচন্দ্র একাই যেমন দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষণার স্বয়ম্বরে সসৈন্য মহাযোদ্ধা কুরুগণকে পরাস্ত করেন, কপটযুদ্ধে বন্দীকৃত শাম্বকে নিজ পুত্রবধূ লক্ষণার সহিত দ্বারকায় আনয়ন করেন,

আর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম বন্ধু অর্জ্জুন যেমন একাই উত্তর কুরুযুদ্ধে কুরু-সৈন্যকে উন্মথিত করেন, বিরাটরাজের গোধন রক্ষা করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-নামেরও অচিন্ত্য মহাশক্তি আছে; তাইতে একাই শ্রীনাম, মহা মহা পাতকরাশিকে বিধ্বংস করিতে পারেন, জীবকে রক্ষা করিতে পারেন। শুধু পাতকনাশ নহে, জীবের হৃদয়ে প্রেমামৃত দান করতঃ মূর্ত্ত আনন্দ ভগবানের পদারবিন্দের সঙ্গী করিতে পারেন। সুতরাং বিহ্বল হইবার কোনও কারণ নাই, জীবের—একান্ত হইয়া নামের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

এই প্রসঙ্গে অজামিলের ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া নামাভাসের ফল যমতাড়না নাশ ও ভগবৎপ্রাপ্তি দেখাইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে আশ্বস্ত করিলেন; কিন্তু ভগবান, ধাম ও লীলার সহায়কারিণী শ্রীভগবৎকান্তা আছেন বলিয়া কোনও আশ্বাস প্রধানতঃ দিলেন না।

ইহাতে আমরা বুঝি, জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে শ্রীনাম, যতটা শক্তিশালী, অন্যে ততটা শক্তিশালী নহে—পর্য্যন্ত স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নহেন।

ভগবান, তাঁর শক্তি, ও ধাম—নাম ধরিয়া ডাকিলে, সম্বন্ধ স্থাপন করেন, দুঃখ নিবারণ করেন, সুখ দেন; কিন্তু নামের আশ্রয় না নিলে তাঁহারাও ফলপ্রদ হইতে পারেন না। আর নামরূপী অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব, ইচ্ছা করিলেই জিহ্বা-মরু-

ভূমিতে উদিত হইয়া কৃপাবৃষ্টি করিতে থাকেন, সমস্ত দুঃখ বিধ্বংস করতঃ আনন্দ দিতে চেষ্টা করেন। শ্রীনাম অপেক্ষা অধিকতর মাহাত্ম্যশালী আর কে হইতে পারেন ?

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-ধুরন্ধর, শ্রীজীব-গোস্বামিচরণ, সন্দর্ভে অনেক স্থলেই নামের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ; একটী স্থল অত্যন্ত আশাপ্রদ এবং পরমাস্বাদ্য, তাই উক্ত স্থলটী উদ্ধৃত করিয়া এবারকার মত নাম-মাহাত্ম্য সমাপ্ত করিতেছি।

"... ... ... নাম্না ভগবানসৌ সাক্ষাৎ অভিমুখী ক্রিয়তে ইতি লিঙ্গাদেব তচ্ছ্রীবিগ্রহবত্তদপি তৎস্বরূপভূতমেব ভবতি। তদ্বিজাতীয়েন তদভিমুখীকরণানর্হত্বাৎ। অতএব ভয়-দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তিরিব সাঙ্কেত্যাদৌ অপি অস্য প্রভাবঃ শ্রূয়তে। ... ... তস্মাৎ যত্তত্বং শ্রীবিগ্রহ-রূপেণ চক্ষুরাদৌ উদয়তে, তদেব নামরূপেণ বাগাদাবিতি স্থিতম্। তস্মান্নাম-নামিনো স্বরূপাভেদেন তৎসাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকারঃ।"

—শ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত ভগবৎসন্দর্ভ, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

"ভগবন্নামের উচ্চারণে ভগবান্ উন্মুখী হয়েন, এই চিহ্নদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির মত তাঁহার নাম ও তাঁহার স্বরূপভূত বস্তু, আমাদের নামের মত ধ্বংসশীল ও শক্তিবিহীন নহে। অর্থাৎ ভগবান যেমন সচ্চিদানন্দ-ময়, অচিন্ত্য অনন্ত অদ্ভুত প্রভাবসম্পন্ন—তদ্রূপ, তাঁহার নামও সচ্চিদানন্দময়, অনন্ত অলৌকিক প্রভাবের আশ্রয়স্থল ; যেহেতু বিজাতীয় কাল কর্ম্ম ও মায়া প্রভৃতি-বস্তুদ্বারা স্বরূপানন্দ ও প্রেমানন্দ-বিভোর ভগবানের আকর্ষণ সম্ভব নহে। স্বরূপানন্দ-প্রভৃত বৈচিত্রী ব্যতীত ভগবানের আভিমুখ্য অসম্ভব।

এই জন্যই দেখা যায়, ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি ভয় দ্বেষ করায় কংস-শিশুপাল প্রভৃতির যেমন (স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীতও) শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি খাইতে শুইতে বেড়াইতে সকল সময়েই স্ফূর্ত্তি পাইত, তদ্রূপ, সাঙ্কেত্য, পরিহাস্য, স্তোভ, হেলন প্রভৃতিতে (নামীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারণ না করিলেও) নাম স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। অজামিল-চরিত্র এ বিষয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত।

তাই বুঝিতে হইবে, যে তত্ত্ববস্তু, (অদ্বয় জ্ঞান) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত-বৃন্দের দেহ, মনও চক্ষুতে শ্রীমূর্ত্তিরূপে দৃষ্ট, স্মৃত ও স্পৃষ্ট হয়, সেই তত্ত্ববস্তুই

(অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই) নামরূপে বাক্য মন ও কর্ণে উচ্চারিত স্মৃত ও শ্রুত হইয়া থাকে। নাম এবং নামীর স্বরূপের বিভিন্নতা না থাকায়(১) নামের যথার্থ সাক্ষাৎকারেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

এখানে জানা আবশ্যক, কংসাদি অসুরগণ ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দেখিয়াও যেমন আস্বাদন করিতে পারে নাই, সেইরূপ অপরাধজনিত বিষয়-বাসনা-দুষ্ট-আমাদের ইন্দ্রিয়-বর্গও নামের আস্বাদন ঠিক করিতে পারিতেছেনা।

বাস্তবিকই ভগবান, আমাদিগকে তাঁর নিকটে নিতে কত সুবর্ণ-সুযোগ দিয়াছেন, হতভাগ্য আমাদের অদৃষ্টে কি ভীষণ বিড়ম্বনা! এহেন ভগবান্নামেও ও অভিরুচি জন্মিল না। ধিক আমাদের জীবনে, ভগবন্! আমাদের উপায় কি হইবে? তোমার কৃপারতো ইয়ত্তা নাই—কিন্তু কৃপাগ্রহণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি কোথায়?

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তিঃ
তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে কালঃ
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমিদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।" পদ্যাবলী—

ভগবন্, "অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার,
কৃপাতে করিলে অনেক নামের প্রচার,
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়,
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
সর্ব্বশক্তি নামে দিলে করিয়া বিভাগ
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।"

হায়—অদৃষ্ট! তোমার পরাক্রম কি এতই ভীষণ! (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

---

(১) নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যো মুক্তো-হভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন। শ্রীহরিভক্তি বিলাস। ১১।২৬৯

আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু।

(১)

কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে আমার মন অস্থির হইত, সহস্র বৃশ্চিকের দংশনের বিষময়ী জ্বালা আমাকে যখন অভিভূত করিত, আমার বলবতী বাসনায় যখন আমূলচ্ছেদী আঘাত পড়িত, যখন কোনও এক নিরালম্ব স্থানে আমার ক্ষুদ্র জীবন পর্য্যবসিত হইত— তখন কে যেন আমার হৃদয়ের অন্তরালে থাকিয়া আমায় নূতন করে' জাগিয়ে তুলিত, নব শক্তি উন্মেষিত করিত, উৎসাহের নব শঙ্খনাদে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া সকল অবসাদ দূর করিত। সে যে কে, কত ভাবিতাম, কিন্তু কোনও কূল কিনারা পাইতাম না।

স্বার্থান্ধ জগৎ, স্বার্থানুসন্ধানের ভিতর দিয়াই এখানে প্রিয়তা শত্রুতা ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি। তাই, যখন স্বার্থের খাতিরে কর্ম্মগতির ঘোরতম পরিবর্ত্তনে মিত্র শত্রু হইত, সহায় অসহায় হইত, ভালবাসার পাত্র আমি, শত্রুর পদে অধিষ্ঠিত হইতাম— তখনও কে যেন আমার চিরমিত্র, কখনও শত্রুতা করিত না ; সদা সহায় থাকিত, হৃদয়ে তাহার অসীম ভালবাসার নিদর্শন পাইতাম।

আমার কুবাসনা আমায় যখন টেনে এক সুদূর মরুভূমিতে নিয়ে যাইত, তখন কার যেন শক্তিশালী আকর্ষণ অকস্মাৎ পিছন হইতে ধরিয়া রাখিত। লুকিয়ে লুকিয়ে যেন বলিত, আর যেওনা, ফিরে এস, ফিরে এস, এ যাওয়ার অন্তিমদশা বড়ই ভীষণ।

(২)

আমার একটা রোগ আছে, একটা কোন বিষয়ের চিন্তা ছাড়া মনটা এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। তাই যখন কলনাদিনী পুণ্যসলিলা ভাগিরথী-তীরে গিয়ে বসিতাম, তখন ভাবিতাম, মাতর্গঙ্গে, তোমার পবিত্র সলিলে পূত হইয়া কত মুনি ঋষি তোমার তীরেই অধ্যাত্ম-জগতে এগিয়ে গিয়েছেন, যাদের নাম উচ্চারণ করিয়া আজ বিশ্ববাসী ধন্য। তুমিতো জগৎকে সকল প্রকারে শীতল করিতে বারিধারা রূপে প্রবাহিত। তোমার শান্তিময়ী বারিধারা কালুষ্যময়ী আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে পূত করিতে কি সমর্থ নয় ? মা, তোমার দোষ কি ? এযে

আমার অনাদি-সঞ্চিত কর্ম্মফলের পরিণাম। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চিন্তাস্রোতের স্বাভাবিকতায় আমার সেই অচেনা বন্ধুর কথা মনে পড়িত।

বলিতাম, ওহে আমার অদেখা অজানা অন্তরঙ্গ বন্ধু, বাস্তবিকই তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তুমিই আমার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর; কারণ, জগতে আমার কত কত বন্ধু আছে, কা'কেও তো হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া সবগুলি কথা কইতে পারি না; লজ্জা হয়, ভয় হয়, পরে বা কে কি মনে করিবে। তোমার কাছে আমার হৃদয়ের আবরণ নাই, সবই তুমি জান, ভালও জান, মন্দও জান, অন্য বন্ধুর নিকট যেমন ভালটা বলি, মন্দটার অনেকটা লুকিয়ে রাখি, তোমার নিকট তো সেরূপ করিনা। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে নিষ্কাসিত করিয়া খুঁটে খুঁটে একটা একটা করে' সমস্তই জানাই। কারণ জানি—নিঃসহায়ের দীনের একমাত্র বন্ধু তুমি, আমার মত দীন নাই, আমার মত নিঃসহায়ও নাই; তোমায় ছাড়া আর কাকে মনের বেদনা জানাইব? তুমি ছাড়া আমার গতিই বা কে আছে?

(৩)

প্রিয়তম বন্ধু আমার, তুমি আমার কথা শু'নে বিদ্রূপ করিতে পার, হাসিতে পার ও বলিতে পার যে, তুমি আমাকে তো অন্তরঙ্গ বন্ধু বল, কিন্তু আমি যেমন তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় তেমন ভালবাস কি? ইহা ঠিক কথা বটে, আমি বাস্তবিকই বিদ্রূপের পাত্র, তুমি আমায় জড়িয়ে ধরে' রাখিতে চাও; কিন্তু আমি সর্ব্বাঙ্গে বাসনারূপ পিচ্ছিল বস্তু মাখিয়া রাখিয়াছি; তোমার হাত হইতে পিছলে' অনেক দূরে গিয়ে পড়ি। ইহাতে আমারই সম্পূর্ণ দোষের ফল। কিন্তু বলি বন্ধু, তুমি আজীবন মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করে' কেন আমায় অকপটে ভালবাসিতেছ? আমার মত হতভাগ্যের প্রতিও যখন তোমার পূর্ণ ভালবাসার বিকাশ, তখন বুঝিতে পারিয়াছি—আমার স্বভাব যেমন তোমায় ভালবাসা না করা, ভুলে' থাকা—সেরূপ তোমারও স্বভাব আমায় সতত ভালবাসা, মনে রাখা, তোমার স্বভাবই বাস্তবিক বন্ধুতার পরিচায়ক। তাই, তোমার ভালবাসায় তোমাকে আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু বলি। আমার দিকে চাইলে আমি অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছি।

(৪)

প্রিয়তম, আমার স্বভাবে আমি তোমার নিকট থেকে সব স্বার্থই যাচিয়া নিতে চাই ; কারণ আমি জানি—তুমি সর্ব্বশক্তিময়, বিশ্বে তুমিই সবচেয়ে ধনী এবং কৃপণতা-শূন্য। এই চিরদিনের চাওয়া-চাওয়িতে বোধ হয়, তোমাকেও উ'দ্বিগ্ন হইতে হয়। অকৃত্রিম বন্ধুতার বাধক ঐ চাওয়াটাকে কি তুমি দূর করিতে পার না ?

তুমি বেশ ভাল করে' জানিও, যতদিন ঐ চাওয়াটি দূর করিতে পারিবে না, ততদিন তোমাকেও আমি সরলতার সহিত ভালবাসিতে পারিব না, তুমি ভালবাস আর নাই ভালবাস। আমার এ শক্তি নাই যে, সব স্বার্থ ছেড়ে' বুকের মধ্যে তোমাকে তুলিয়া লই। অভাবের প্রতাড়না আমার আছে, তোমার আছে কিনা জানি না ; যদি তোমার অভাব কিছু থাকেও, তবু বোধ হয়, আমাদের যে জাতীয় অভাব, সে জাতীয় নয়। যদি সে জাতীয় হইত, তবে এতটা ভালবাসিয়াও দূর করিয়া রাখিতে পারিতে না। আমার অন্তর্দাহ তোমার সহ্য হইত না। এ যন্ত্রণার চিরবিদায়ের ব্যবস্থা করিতে।

আমি যদিও "আমার তুমি" এরূপ বুদ্ধি করিতে এখনও সাহস পাইনা, তবুও তো "তোমার আমি" এরূপ বুদ্ধি করিই। অনাত্মজ্ঞ আমি তো তোমার উপরই সব ভার সপে' দিয়াছি। আমায় তোমার পথে এই ভবাটবীর মধ্য দিয়া নিয়ে যাবে, এই আশাতো আমার খুবই আছে।

ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু প্রিয়তম আমার, আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে কি ? আমার হাত ধরিয়া তোমার পথে নিয়ে যাবে কি ? যদি তাতে তোমার কষ্ট হয়, তবে থাক্। আমার আত্মকৃত ব্যাধি—কর্ম্মরাশির ভোগ হৌক। আমার অনন্ত কর্ম্ম-জীবনের কর্ম্মধারা ধারাবাহিকরূপে প্রবাহিত হউক। কিন্তু "তোমার আমি" এই ধারণাটুকু যেন নিভিয়ে দিয়ো না।

এরূপ ভাবিতে ভাবিতে দ্বিজেন্দ্রলালের একটা গান মনে পড়িত—বারম্বার উচ্চারণ করিয়া খুব সুখ পাইতাম, তাহা এই :—

"যখন জীবন-আহবে ক্লান্ত, শ্রান্ত পরাণ বহি,
কে আসে তখন, মুছাতে নয়ন, আকুল নয়নে চাহি।
বেদনায় দিতে সান্ত্বনা, শোকে, ঢালিতে শান্তি-বিন্দু,

তবু জানি তায় ডাকারি নতন ডাকিতে নারিনু কভু,
আমার হৃদয়-দেবতা সে যে গো আমার প্রাণের প্রভু।
কলুষিত কায়া কুৎসিত ছায়া কমনীয় সাজে ঢাকি,
আপাতমধুর নরকের পথে লহে গো যখন ডাকি।
কে থেকে আড়ালে, ধীরে ধীরে বলে ও পথে যেয়োনা কভু,
আমার হৃদয়-দেবতা সে যে গো, আমার প্রাণের প্রভু।"

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ।

বিরহ।

(সখি) শ্যাম বঁধু নাহি এল,
আমি মানস-কুসুমে, গেথেছিনু হার,
বিরহে শুকায়ে গেল।
(সখি) শ্যাম বঁধু নাহি এল,
আমি নিশি দিন কত, সহিব যাতনা,
মরম ফাটিয়া গেল॥
আগে জানি নাই, সে যে কঠিন এমন,
বিষ-শর হৃদে হানে।
যাতনা আকুল, হইবে পরাণী;
চা'বেনা নয়ন কোণে॥
তাহলে কি সই, হেরিতাম তারে
পরিণাম বিষময়।
কাঁদিতে কাঁদিতে, তনু হ'ল ক্ষীণ,
নাহি প্রাণ বাহিরায়॥
আমার বলিতে, কিছু নাহি আর;
দেহ-কারাগারে প্রাণ।

উৎকণ্ঠা প্রহরী, করিছে পীড়ন,
শুধু এই প্রতিদান।
উহু মরি মরি, কেহত বুঝেনা,
শেলের আঘাত বুকে।
শ্যাম বঁধু সনে করিয়া পিরীতি;
শুধু লাভ এই সুখে॥
বাঁচিবার যদি, সাধ থাকে মনে,
যেওনা যমুনা-তীরে।
আঁখি-শরে তব, বিঁধিবে পরাণ,
ভাসিবে নয়ন নীরে॥
বয়সে কিশোর, নবীন নাগর,
রসময় তনু খানি।
স্বভাব তাহার, ব্যাধের আচার,
নিরদয় অতি জানি।
মনে হয় সদা, কেবা হেন আছে,
বেদনা বুঝিবে যে।
নিছিয়া পুছিয়া, ঘুচাবে বেদনা,
মরমের সাথী সে॥
জগত খুঁজিয়া, দেখিলাম আমি,
হেন জন নাহি মোর॥
গুহ দেখি আসি, গরব প্রকাশি,
চিতে শুয়ে আছে মোর॥
আন আন সখি, ভখিয়া গরল
জুড়াই প্রাণের জ্বালা।
সদা দেহ মোর, কাঁপে থরথর,
ছাড়িয়া না ছাড়ে কালা॥

শ্রীমতী ক্ষিরোদবাসিনী দেবী।

প্রশ্ন-সপ্তক-সম্বন্ধে। *

অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাসের মাধুকরীতে গৌড়-রাজর্ষি মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সাতটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্র-জ্ঞানও নাই, ভজনও নাই; সুতরাং প্রশ্ন সাতটীর সমাধানের প্রয়াস পাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি, কেবল আত্ম-শোধনের অভিপ্রায়েই এস্থলে প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অভিলাষী হইয়াছি। সুবিজ্ঞ আচার্য্য-সন্তানগণই এ বিষয়ের সমাধান করিবেন।

প্রথম প্রশ্ন। "শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে স্মরণ-মননে 'ব্রাহ্মণ-কিশোর কুমার' এই সিদ্ধদেহ চিন্তনীয় কিনা?"

এই প্রশ্ন-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে, শ্রীনবদ্বীপের স্মরণ-মননে পার্ষদ-দেহই চিন্তনীয় কিনা? যদি পার্ষদ-দেহ চিন্তনীয় হয়, তাহা হইলেই সেই পার্ষদ-দেহের স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রয়াস সম্ভব হইতে পারে।

গত চৈত্র-মাসের "শ্রীশ্রীসোনার-গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় "নবদ্বীপের সেবোপ-যোগী সিদ্ধদেহ"-শীর্ষক-প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে এই অযোগ্য লেখক একটু বিস্তৃত-ভাবেই আলোচনা করিয়াছে। তথাপি, পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত এস্থলে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইতেছে।

ঈশ্বর ও জীবের সেবা-সেবকত্ব-ভাবই ভক্তিমার্গের বিশেষত্ব; সিদ্ধাবস্থাতে ভগবদ্ধামেও যাহাতে এই সেবা-সেবকত্ব-ভাব রক্ষিত হইতে পারে, ভক্তিমার্গের সাধন-প্রণালীতে তদনুরূপ ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে। সাধন-কালে উপাস্য-স্বরূপের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেবকরূপে নিজেরও একটী স্বতন্ত্র-সত্তার চিন্তাই এই শাস্ত্র-বিহিত ব্যবস্থার সার মর্ম্ম। এই যে স্বতন্ত্র-সত্তার কথা বলা হইল, ইহা সাধকের প্রাকৃত জড়-সত্তা হইতেই পারে না; কারণ, প্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা সম্ভব নহে; শ্রীমন্ মহাপ্রভুই বলিয়াছেন,

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর। চৈঃ চঃ।

---

* এই প্রবন্ধটী পরমারাধ্য নিয়ামক-প্রভুপাদ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনুমোদন করিয়াছেন।—লেখক।

অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তু যখন জীবের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূতই হইতে পারে না এবং সেবা-বস্তুটীও যখন ইন্দ্রিয়-সাধ্য-ব্যাপার ব্যতীত অপর কিছুই নহে (১), তখন অনায়াসেই বুঝা যায় যে, জীবের প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারেনা। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিন চিন্তে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ চৈঃ চঃ॥

পরম করুণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই যে সিদ্ধদেহের কথা বলিলেন, ইহা প্রাকৃত জড়দেহ নহে—ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময়-দেহ। মানসিকী সেবায় এইরূপ একটী অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহের ভাবনা দ্বারাই চিন্ময় ভগবদ্ধামে স্বাভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইবে—ইহাই ব্যবস্থা।

সাধক-দেহের জপ-হোমাদিও জড়দেহের সাধনে সিদ্ধ হইতে পারে না—সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে না; ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা; তাই নিত্যকরণীয় জপ-হোমাদির পূর্ব্বে শাস্ত্রকারগণ ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ॥
—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫।৩৪॥

কিন্তু এই ভূতশুদ্ধি-বস্তুটী কি?

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্।
অব্যয়-ব্রহ্মসম্পর্কাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা॥
—শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস ৫।৩৩॥

ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুদ্ব্যোমাদি যে সকল পঞ্চমহাভূত জীবের শরীর-রূপে পরিণত হইয়াছে, সেই সমস্ত ভূতের শোধনকেই ভূতশুদ্ধি বলে। এই ভূত-সমূহ অব্যয় ব্রহ্মের অংশ, সুতরাং সেই ব্রহ্মই কারণ; আর ইহারা কার্য্য, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু; এইরূপ অবধারণই ভূতশুদ্ধি। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ-সনাতন গোস্বামীও লিখিয়াছেন—"শ্রীভগবতোঽংশত্বেন সম্বন্ধা-

(১) হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা।

হ্মেতোর্বিশোধনং কার্য্যকারণাদিভিন্নতয়া বিজ্ঞানং যদিয়মিব ভূতশুদ্ধির্মতা-হৃভিজ্ঞৈঃ।"

কিরূপে ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে? শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৫।৩৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ-সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—তদংশত্তাদভিন্নত্বেন তদীয়ত্বেন স্বাত্মানং বিজানীয়াদিতি অর্থঃ। এবঞ্চ সতি সোঽহমিতি। যঃ শ্রীভগবদংশঃ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽহম্। যদ্বা তদংশত্বেন তদধীনো নিত্যসেবকোঽস্মীতি অর্থঃ।—সাধক মনে করিবেন, চিৎস্বরূপ ভগবানের চিৎকণ-অংশ বলিয়া আমিও চিন্ময়াত্বাংশে তাঁহা হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ আমিও চিন্ময় এবং আমি তাঁহারই। এমতাবস্থায় আমিও সেই-ই। সেই-ই কি? না, আমি ভগবানের অংশ, সুতরাং আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব; এবং শ্রীভগবানের অংশ বলিয়া আমি তাঁহার অধীন, তাঁহারই নিত্য সেবক।"

এস্থলে বলা হইল—জপাদির প্রারম্ভে সাধক চিন্তা করিবেন, "আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এবং শ্রীভগবানের নিত্যসেবক।" এইরূপ চিন্তা দ্বারাই ভূত-শুদ্ধি করিতে হয়। এইরূপ চিন্তাময় জপাদিই অভীষ্ট ফলদায়ক; এবং এইরূপ চিন্তাহীন জপাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলেও নিষ্ফল—ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ॥

এই অবশ্যকরণীয় ভূতশুদ্ধিতে দেখা গেল, সাধক নিজেকে "শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব" রূপে চিন্তা করিবেন। ইহা নিশ্চয়ই একটা চিন্ময়-স্বরূপের চিন্তা—প্রাকৃত জড়দেহের চিন্তা নহে—কারণ, প্রাকৃত জড়দেহ "শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব" হইতে পারে না। উদ্ধৃত টীকার "তদংশত্বাত্তদভিন্নত্বেন" বচনেও উহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভূত-শুদ্ধি-প্রকরণে শ্রীজীবগোস্বামিচরণ ভক্তিসন্দর্ভে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আরও পরিস্ফুট। "অথ তেষাং শুদ্ধভক্তানাং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং যথাসতি ব্যাখ্যায়তে। তত্রভূতশুদ্ধির্নিজাভিলষিত-ভগবৎ-সেবৌপায়িক-তৎপার্ষদ-দেহ-ভাবনা-পর্য্যন্তৈব তৎসেবৈক-পুরুষার্থিভিঃ কার্য্যাঃ নিজানুকূল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্ট-দেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে, তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্। অহংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্দ্বিষ্টত্বাৎ।"—ভক্তিসন্দর্ভ।২৮৬॥

ভক্তিসন্দর্ভের এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—ভগবৎসেবাই যাঁহাদের একমাত্র পরম-পুরুষার্থ, সেই সকল শুদ্ধভক্তগণের পক্ষে নিজ ভাবানুকূল সেবার

উপযোগী ভগবৎপার্ষদদেহের ভাবনা অবশ্যকর্ত্তব্য। যেখানে যেখানে নিজের অভীষ্ট উপাস্য-স্বরূপের চিন্তার বিধি আছে, সেখানে সেখানেই সাধকের পক্ষে সেবোপযোগী পার্ষদদেহের ভাবনা কর্ত্তব্য। সেব্য-সেবকভাবে যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপাসকের পক্ষেই এইরূপ ব্যবস্থা। এইরূপ না করিলে সাধকের জপ-হোমাদি অহংগ্রহোপাসনায় পর্য্যবসিত হয়; কিন্তু অহংগ্রহোপাসনা শুদ্ধা ভক্তির প্রতিকূল। শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের ৫।৩৬-৩৯ শ্লোকে ভাবনা-দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহকে শুষ্ক ও দাহ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিদ্বারা ভূতশুদ্ধির যে ব্যবস্থা আছে, পার্ষদ-দেহ-ভাবনার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই তাহা অনুসরণীয়—ইহাই শ্রীজীবগোস্বামিচরণের অভিপ্রায়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে জপ-হোমাদিতেও ভগবৎ-পার্ষদদেহের ভাবনা অবশ্যকর্ত্তব্য; ইহা না করিলে তাঁহার সাধন, ভক্তির অনুকূল হইবে না, বরং অহংগ্রহোপাসনাতেই পর্য্যবসিত হইবে। অধিকন্তু, ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পাঞ্চভৌতিক দেহের চিন্তায় ভগবদ্ভজন শাস্ত্রবিধিবহির্ভূত, সুতরাং এইরূপ তথাকথিত ভজন ভজন-শব্দ-বাচ্যই নহে, ইহা একটী উৎপাত-বিশেষ।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূ ২।৪৬॥

এইরূপ পার্ষদ-দেহের ভাবনাই শ্রীভগবানের সাক্ষাদ্ভজনে সাধকের প্রবৃত্তি সূচিত করে; এবং এই সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিই ভক্তিমার্গে সাধনের নৈপুণ্য বা আসঙ্গ।

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। ভঃ রঃ পূঃ ১।২২॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"অনাসঙ্গৈরিতি যদুক্তং তত্র চাসঙ্গেন সাধন-নৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ॥"

পার্ষদ-দেহ-ভাবনাময়রূপ নৈপুণ্যহীন সাধনকেই অনাসঙ্গ সাধন বলে; অনাসঙ্গ শত-সহস্র সাধনের দ্বারাও ভগবচ্চরণে ভক্তি লাভ হয় না। এইরূপ অনাসঙ্গ-সাধনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥ আদি ৮ম পঃ।

ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে পার্ষদদেহ-ভাবনার একটা বিশেষ হেতুও আছে; সাধন-সময়ে যিনি যেরূপ ভাবনা করেন, সিদ্ধাবস্থায়ও তাঁহার সেইরূপ প্রাপ্তিই হইয়া থাকে (২)। পার্ষদরূপে স্বাভীষ্ট-ভগবৎসেবাই ভক্তিমার্গের সাধকের কাম্যবস্তু; সুতরাং তাঁহার পক্ষে পার্ষদদেহ-ভাবনা অপরিহার্য্য।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, নিজ ভাবানুকূল শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা যেমন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তদের কাম্যবস্তু, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবাও সেইরূপ কাম্যবস্তু কিনা?

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভজন-পদ্ধতিতে ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা উভয়-লীলার স্মরণ-মননের পদ্ধতিই যখন প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে, দেখা যায়, তখন সিদ্ধাবস্থায় উভয়-লীলার সেবাই সাধকের প্রার্থনীয়, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কেবল অনুমান নহে, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে, এবং প্রচলিত স্মরণ-মনন-পদ্ধতি শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সিদ্ধাবস্থায় উপাস্যের সেবা-প্রাপ্তিতেই উপাসনার পর্য্যাপ্তি; সেবা-প্রাপ্তির বাসনা না থাকিলে উপাস্যের উপাস্যত্বই সিদ্ধ হয় না। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের উপাস্য, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না;

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥

---

(২) সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা।
—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়।

যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ ॥
—বাচস্পত্যাভিধানধৃত স্মৃতি-বচন।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী

এবং

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈ র্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজনমুদ্রামপদিশন্
সচৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিচরণদিগের উক্ত দুইটী শ্লোকই শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের উপাস্যত্ব নির্ণয়ে, সুতরাং সাধকের সিদ্ধাবস্থায় শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের সেবাপ্রাপ্তি-বিষয়ে যথেষ্ট। সর্ব্বসম্বাদিনী-গ্রন্থেও শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের উপাস্যত্ব নির্ণীত হইয়াছে :—

অথ ··· শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবনামানং শ্রীভগবন্তং
কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়া···স্তৌতি।

উভয় স্বরূপের সেবা-প্রাপ্তিই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রার্থনীয়, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পরিস্ফুট ভাবেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন :—

হা হা প্রভু লোকনাথ! রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥

—প্রার্থনা।

উভয় স্বরূপের সেবা-প্রাপ্তিই যখন সাধকের কাম্যবস্তু, তখন উভয় স্বরূপের স্মরণ-মননেই পার্ষদদেহের ভাবনা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, পর্ষদদেহের ভাবনা ব্যতীত স্মরণ-মনন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং নবদ্বীপ-লীলার সেবোপযোগী সিদ্ধদেহও যে আচার্য্য ও মহাজনগণের অনুমোদিত, ইহাও অনায়াসে বোধগম্য হইতেছে। বাস্তবিক বৈষ্ণবগণের ভজন-পদ্ধতিতে নবদ্বীপের সিদ্ধদেহের ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে, শ্রীনবদ্বীপের ভজনে সাধকের কয়েকটী আত্মধ্যান উদ্ধৃত হইতেছে :—

আত্মানং চিন্তয়েৎ শিষ্যং দাস-দাসানুরূপকম্।
হরিনামাঙ্কিত-তনুং দ্বাদশাঙ্গুলকৈযুতম্॥

রূপ-যৌবন-সম্পন্নং মালাভিঃ কণ্ঠভূষিতম্।
সেবাপরং বৈষ্ণবঞ্চ কৃষ্ণ-চৈতন্য-সন্নিধৌ॥

* * * *

দিব্য শ্রীহরিমন্দিরাঢ্যতিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতম্।
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণং সুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ॥
শুভ্রং-সূক্ষ্ম নবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুম্।
ধ্যায়েচ্ছ্রীগুরুপাদপদ্ম-নিকটে সেবোৎসুকঞ্চাত্মানম্॥

উক্ত ধ্যান দুইটীর "রূপ-যৌবন-সম্পন্নং" "কৃষ্ণচৈতন্য-সন্নিধৌ," "বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুম্" ইত্যাদি পদ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সাধকের নবদ্বীপ-লীলার সেবোপযোগী দেহটী যথাবস্থিত পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ। কারণ, প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ, নিত্যই বিমলতা বহন করিতে পারে না, নিত্যই রূপ-যৌবন-সম্পন্ন থাকিতে পারেনা, এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সান্নিধ্যেও থাকিতে পারে না।

উক্ত ধ্যান দুইটী হইতে পাওয়া গেল, নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ কিশোর-বয়সান্বিত পুরুষ-দেহ। কিন্তু ইহা কোন জাতীয়, তাহার কোনও উল্লেখ উক্ত ধ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে নবদ্বীপের সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শন মাত্রই আছে, বিশেষ বিবরণ নাই।

বৃন্দাবনের সখীভাবের আত্মধ্যানেও সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শন মাত্র পাওয়া যায়, বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সখীভাবের আত্মধ্যানটী এই :—

আত্মানং চিন্তয়েৎ তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপ-যৌবন-সম্পন্নাং কিশোরী-বয়সাকৃতিম্॥
নানা-শিল্প-কলাভিজ্ঞাং সেবনোৎসুক-সেবিকাম্।
রাধামাধবয়োঃ সেবাং কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ॥

বৃন্দাবনের সেবোপযোগিনী কিশোরী যে গোপজাতীয়া হইবেন, তাহার উল্লেখ এই ধ্যানে নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সিদ্ধদেহে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কথা বলিয়াছেন, সেই সিদ্ধদেহটী কিশোর-দেহ, কি কিশোরী-দেহ হইবে, গোপজাতীয় হইবে, কি অন্য জাতীয় হইবে, তাহা কিছুই বলেন নাই। সিদ্ধদেহেই যে লীলা-স্মরণ

করিতে হইবে, ইহাই তিনি জানাইয়া দিলেন। সিদ্ধদেহের বিশেষ বিবরণ, সাধকের স্বাভীষ্ট-সেবার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। মধুর-ভাবের ব্রজোপাসকের সিদ্ধদেহ কিশোরী-দেহ হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া সকল ভাবের সিদ্ধদেহই যে কিশোরী দেহ হইবে, তাহা নহে; সখ্যভাবের সিদ্ধদেহ পুরুষদেহ না হইলে সেবার অনুকূল হইবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া শ্রীগুরুদেবই সিদ্ধদেহের বিশেষ বিবরণ—বর্ণ, বস্ত্র, বয়স, সেবা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। নবদ্বীপের এবং ব্রজের উভয় স্থানের সিদ্ধদেহেরই এইরূপ ব্যবস্থা।

শ্রীমতী ভানু-নন্দিনীর সকল দাসীই যে গোপকন্যা, তাহা নহে। তাঁহার দাসীগণের মধ্যে রজক-কন্যা এবং নাপিত-কন্যাও আছেন (৩)। তবে সর্ব্ববিধ অন্তরঙ্গ-সেবায় তাঁহাদের অধিকার দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অধিকার একমাত্র গোপ-কন্যাদেরই; ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, শ্রীমতী ভানু-নন্দিনীও গোপকন্যা। স্বজাতীয়া দাসী না হইলে বোধ হয় অন্তরঙ্গ-সেবা সম্ভব হয় না।

শ্রীনবদ্বীপ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের মধ্যে সকল জাতীয় লোকই থাকিতে পারেন; কিন্তু সকল সেবায় বোধ হয় সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ, তাই বোধ হয় অন্তরঙ্গ-সেবায় ব্রাহ্মণ-দাসেরই বেশী অধিকার।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। লীলার সহায়কারিণী প্রধানা শক্তির আনুগত্যেই ভজনের পদ্ধতি দেখা যায়। শ্রীব্রজলীলায় প্রধানাশক্তি শ্রীরাধা; তাঁহার আনুগত্যে, তাঁহার দাসী-অভিমানেই সাধক শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে অভিলাষী; তাই বোধহয়, বৃন্দাবনের সিদ্ধদেহ গোপজাতীয়, শ্রীরাধার জাতীয়। শ্রীবৃন্দাবনে যেমন "কৃষ্ণের নিজ শক্তি রাধা লীলার সহায়," তেমনি নবদ্বীপ-লীলাতেও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীই "প্রভুর নিজশক্তি"—শ্রীরাধারই প্রকাশ-বিশেষ শ্রীগদাধর। তাই, শ্রীগদাধরের আনুগত্যেই নবদ্বীপ-লীলার সেবা বাঞ্ছনীয়; গদাধর ব্রাহ্মণকুমার, তাই সাধকের নবদ্বীপের সিদ্ধদেহও

(৩) শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ২য় সর্গ ৬৪,৬৬,৬৭

ব্রাহ্মণকুমার দেহ হইলেই অন্তরঙ্গ-সেবার অনুকূল হইবে বলিয়া মনে হয়। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় এজন্যই বোধহয় লিখিয়াছেন—"গদাধর মোর কুল।"

যাহা হউক, যদি কোনও সাধক ব্রাহ্মণেতর জাতীয় সিদ্ধদেহে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে বাধা দেওয়ার কোনও হেতুও বোধহয় থাকিতে পারে না। তাঁহার সিদ্ধ-দেহানুকূল-সেবা তিনিও পাইতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভজন ধন্য, শ্রীগৌরাঙ্গভজন ধন্যতর, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন ধন্যতম এবং "পল্লীবাসী"তে সমালোচিত অভিনব পঞ্চ-তত্ত্ব (শ্রীগুরু, গৌরাঙ্গ, শ্রীশচীদেবী, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী)—এইরূপ বাদের সমীচীনতা এবং ইহা প্রচারে বৈষ্ণব-জগতের হিতাহিত।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-ভজন ও শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে পার্থক্য কি বুঝা গেল না। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন বলিতে রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপের ভজনই বুঝা যায়; এই স্বরূপের ভজনই সমস্ত গোস্বামিশাস্ত্রের অনুমোদিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভজন বলিতে বোধহয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসি-স্বরূপের ভজনই প্রশ্নের অভি-প্রায়। কিন্তু প্রভুর সন্ন্যাস-স্বরূপের কোনও ভজন প্রচলিত আছে বলিয়া জানিনা—গোস্বামি-শাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া জানি না। প্রভুর প্রকট-লীলার অন্তর্গত একটী নৈমিত্তিক-লীলাই সন্ন্যাস—একটী বিশেষ উদ্দেশ্যে—পড়ুয়া পণ্ডিতাদি গর্ব্বিত লোকদিগের গর্ব্ব-চূর্ণ করিবার নিমিত্ত, প্রভুর নিন্দাজনিত তাহাদের অপরাধ-খণ্ডনের নিমিত্তই—এই লীলা। নিত্য-লীলারই উপাসনা প্রচলিত, নৈমিত্তিক-লীলার উপাসনা প্রচলিত দেখা যায় না। কংস-বধ-লীলার উপাসনা নাই; কালিয়-দমন-লীলারও উপাসনা নাই।

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজনও আধুনিক; প্রাচীন কোনও মহাজনের বা আচার্য্যের উক্তিতে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিলেও গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার উপাস্য-স্বরূপ ছিলেন না। গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাও বোধহয় প্রভুর আদেশে ঠাকুর-মহাশয়ের, একটী নৈমিত্তিক কার্য্য।

প্রিয়ার প্রতি নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি যে পার্ষদগণের সহিত নিত্যই নবদ্বীপ-লীলায় বিলসিত, তাহা কেবল তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তগণই জানেন। জন-সাধারণকে এই গূঢ় লীলারহস্যটী জানাইবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, প্রভু ঠাকুর-মহাশয় দ্বারা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করাইলেন—পরন্তু গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার-ভজন প্রবর্ত্তিত করাইবার উদ্দেশ্যে নহে। কারণ, ব্রজের ভজন-প্রবর্ত্তনই প্রভুর লীলার অন্যতম হেতু বলিয়া গোস্বামিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসি-স্বরূপের ভজন এবং গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-স্বরূপের-ভজন যখন শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় না, কোনও সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়াও শুনা যায় না, তখন, শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের ফলের সঙ্গে এই দুই রকম ভজনের ফলের তরতমতার কথাই উঠিতে পারে না। পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা পঞ্চম প্রশ্নের আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় প্রশ্ন। শ্রীগৌরাঙ্গ "কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ" এই সিদ্ধান্ত ও শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত সিদ্ধান্ত "শ্রীকৃষ্ণস্য আবির্ভাব-বিশেষঃ" এই উভয় সিদ্ধান্তের তারতম্য—স্বরূপতঃ ও উপাসনাগত ভেদ-নির্ণয়।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামিচরণের সিদ্ধান্তের উপরে নূতন সিদ্ধান্ত চালাইতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরিচায়কমাত্র। গোস্বামিচরণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শ্রীমন্-মহাপ্রভু নিজেও নিজের স্বরূপ-সম্বন্ধে সেই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন,

গৌর-অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনু তিঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ।

শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরও এই কথাই তাঁহার কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেনঃ—

রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্॥

শ্রীজীব-গোস্বামিচরণের-সিদ্ধান্তের উপরে নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে যাওয়াও

যৎ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাও তা। যাঁহার সাহস হয়, তিনি তাহা করুন।

* রুক্মবর্ণ পুরুষ। মুণ্ডকোপানিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে তৃতীয় মন্ত্রে রুক্মবর্ণ পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। ৩।১।৩॥

এই তৃতীয় মুণ্ডকের আরম্ভ—জীবাত্মা-পরমাত্মা-বাচক "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে। ইহার পরে-ঐ তৃতীয় মুণ্ডকেরই এবং-ঐ পঞ্চম খণ্ডেরই পঞ্চম মন্ত্রে উক্ত রুক্মবর্ণ পুরুষ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তিও আছে :—

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ
ক্ষীণদোষাঃ।৩।১।৫

এই মন্ত্রে "অন্তঃশরীরে" শব্দের অর্থ—অন্তর্ম্মধ্যে শরীরস্য পুণ্ডরীকাকাশে (শঙ্কর-ভাষ্য); আর "জ্যোতির্ম্ময়ঃ" শব্দের অর্থ—রুক্মবর্ণঃ (শঙ্করভাষ্য)। সুতরাং এই মন্ত্রটী হইতে বুঝাযাইতেছে যে, রুক্মবর্ণ-পুরুষ শরীরাভ্যন্তরে থাকেন—তিনি জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মা; প্রথম "দ্বা-সুপর্ণা" মন্ত্রের মর্ম্মও তাহাই। সুতরাং প্রকরণ-বলে রুক্মবর্ণ-পুরুষকে পরমাত্মা বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলে, শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাই খর্ব্ব করা হয়—শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ বা তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না।

"রুক্মবর্ণ"-শব্দের অর্থ "স্বর্ণবর্ণ—পীতবর্ণ" ধরিলে, "কর্ত্তারমীশং ব্রহ্মযোনিং" ইত্যাদি শব্দের বলে স্বর্ণবর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে বুঝাইতে পারে; কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলেও তাঁহার রুক্মবর্ণত্ব যদি "রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিতত্ব"-জনিত না হয়, তাহা হইলে গোস্বামি-শাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। বাস্তবিক, রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিতত্ব-অর্থেই শ্রীল বলদেববিদ্যা-ভূষণ-পাদ একস্থলে মুণ্ডকের উক্ত মন্ত্রটীর উল্লেখ করিয়াছেন। "অপারং কস্যাপি প্রণয়িজন-বৃন্দস্য" ইত্যাদি শ্লোকের "রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ প্রকটয়ন্" অংশের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"স্বাং রুচিং দ্যুতিং আবব্রে পিদধে। কিং কুর্ব্বন্নিত্যাহ। তদীয়াং তদ্বৃন্দসম্বন্ধিনীং দ্যুতিং প্রকটয়ন্নুপরি প্রকাশয়ন্। অন্যোঽপি চৌরঃ স্বরূপমাবৃত্য

চোরয়তীতি প্রসিদ্ধমেতৎ। শ্রুতিরপ্যেতৎ সূচয়তি। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমিত্যাদিনা।" বিদ্যাভূষণ-পাদের এই অর্থ গ্রহণ করিলে, রুক্মবর্ণপুরুষ, শ্রীজীব-গোস্বামিচরণের "শ্রীকৃষ্ণস্য আবির্ভাবিশেষঃ" ই হইয়া পড়েন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও রুক্মাঙ্গ-পুরুষের উপাসনাগত ভেদ বোধহয় এই যে—যদি রুক্মাঙ্গ-পুরুষ পরমাত্মাই হয়েন, তাহা হইলে,স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও পরমাত্মার উপাসনায় যে পার্থক্য, শ্রীগৌরাঙ্গ ও রুক্মবর্ণ-পুরুষের উপাসনাতেও সেই পার্থক্য। আর যদি বিদ্যাভূষণপাদের অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের উপাসনাগত কোনও ভেদই দেখা যায় না।

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ শ্রীগদাধর পুংভাবাপন্ন পুংশক্তি, তাঁহাকে সরাইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ভজনের প্রচেষ্টা।

যে ধামের যিনি মুখ্যা শক্তি, তাঁহার সহিত সেই ধামের শক্তিমানের ভজনই চিরপ্রসিদ্ধ। বৃন্দাবনের মুখ্যা-শক্তি শ্রীরাধা; তাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন প্রচলিত; ললিতাদি সখীবৃন্দের কোনও একজনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভজন প্রচলিত নাই। দ্বারকায় রুক্মিণ্যাদি প্রধানা শক্তি, তাঁহাদের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের ভজন সম্ভব হইতে পারে। বৈকুণ্ঠেও লক্ষ্মী-নারায়ণের ভজন প্রসিদ্ধ; কারণ, লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের প্রধানা শক্তি। নবদ্বীপের প্রধানা শক্তি শ্রীগদাধর—যিনি "প্রভুর নিজশক্তি বা মুখ্যা শক্তি"; তাই গৌর-গদাধরের ভজন প্রসিদ্ধ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীও প্রভুর শক্তি বটেন, কিন্তু প্রধানা শক্তি নহেন। তাই শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন অপ্রসিদ্ধ।

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজনের প্রাপ্তি কি? শ্রীরাধাগোবিন্দ-ভজনের অনুরূপ প্রাপ্তি-সম্ভাবনা হয় কি? শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন-প্রচারে জীব কৃতার্থ হইতেছে বা ব্রজভজন হইতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বঞ্চিত হইতেছে? ইহার প্রতিষ্ঠা কোথা হইতে?

দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনায় এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন গোস্বামিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না।

যে লীলা-সহায়কারিণী শক্তির সাহায্যে শক্তিমান্ লীলাদি করিয়া থাকেন,

সেই লীলা-সহায়কারিণী শক্তির মহিমার তারতম্যানুসারেই শক্তিমানের মাধুর্য্যাদি-বিকাশেরও তারতম্য হইয়া থাকে। ব্রজে পূর্ণ শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ণাশক্তি শ্রীরাধার সঙ্গে লীলাদি করিয়া থাকেন; তাই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ। সেই পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণই যখন দ্বারকায় মহিষী-আদির সহিত লীলা করেন, তখন তাঁহার মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ হয় না—অথচ সেই একই কৃষ্ণ। শক্তির প্রভাবেই শক্তিমানের মাধুর্য্যাদির বিকাশ; সুতরাং যে শক্তি যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন, তাঁহার সাহচর্য্যে শক্তিমানের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদিও সেইরূপই অভিব্যক্ত হইবে। অনন্তধামে অনন্ত লীলাবৈচিত্রীর রহস্যই বোধহয় ইহা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইলেও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন ব্রজের কোনও শক্তি নহেন, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলনে ব্রজভাবের বা ব্রজমাধুর্য্যাদির স্ফূর্ত্তি বোধ হয় সম্ভব নহে। বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী দ্বারকার সত্যভামা; সুতরাং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলনে দ্বারকার ভাবই স্ফূর্ত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজনে শ্রীরাধাগোবিন্দ-ভজনের অনুরূপ প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

এখন দেখিতে হইবে, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজনে, সত্যভামা-শ্রীকৃষ্ণের ভজনের অনুরূপ প্রাপ্তি সম্ভব কি না?

আজকাল যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন-প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা নিজেদিগকে বিষ্ণুপ্রিয়ার সখী—শ্রীগৌরাঙ্গে কান্তাভাবাপন্ন সখী বলিয়া মনে করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে কান্তাভাবেই তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা-প্রয়াসী। এইরূপ সেবা-প্রাপ্তি সম্ভব হইত—যদি নিত্যলীলায়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এমন কোনও সখী থাকিতেন, যিনি কান্তাভাবে প্রভুর সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ কোনও সখীর উল্লেখ কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। নবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবী ব্যতীত অপর কোনও রমণীই কান্তাভাবে প্রভুর সেবা করেন নাই—প্রভুও অপর কোনও রমণীর প্রতি কান্তাভাব পোষণ করেন নাই। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন-প্রচারেচ্ছুদিগের চেষ্টা—মূলহীন বৃক্ষের পত্রে জল-সিঞ্চনের মতনই ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। যে ধামে যে রস নাই, সেই ধামে সেই রসের

উপাসনা হইতে পারে না; বৈকুণ্ঠে বাৎসল্যভাব নাই, পরকীয়া-কান্তাভাবও নাই; তত্তদ্‌ভাবের পরিকরও নাই, তাই বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের, বাৎসল্য-ভাবের উপাসনাও প্রচলিত নাই, পরকীয়া-কান্তাভাবের উপাসনাও নাই। ভক্তিমার্গের সাধকের সেবা আনুগত্যময়ী; নিজ ভাবানুকূল পরিকরের আনুগত্যেই তাঁহার সেবা; তাই, যে ভাবের পরিকর নাই, সেই ভাবের আনুগত্য ও সেবা চলিতে পারে না। নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্তাভাবের পরিকর নাই; সুতরাং কান্তাভাবে তাঁহাদের ভজনও অসম্ভব। তাই গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন—কান্তাভাবে সত্যভামা-শ্রীকৃষ্ণের ভজনের অনুরূপও হইতে পারে না বলিয়াই মনে হয়। এই ভজনের প্রাপ্তি যে কি, তাহা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই জানেন।

তবে, দাস্যভাবে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের ভজনের অনুরূপ ভাবে বোধ হয় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন অনুমোদিত হইলেও হইতে পারে। ইহাও যুক্তির কথা, শাস্ত্রে এই ভজনেরও কোনও উল্লেখ বোধ হয় নাই। এই ভাবে, শ্রীঈশানাদির আনুগত্যে ভজন যুক্তিযুক্ত হইলে দাস্যভাবে শ্রীনবদ্বীপ-প্রাপ্তি হয় তো সম্ভব হইতে পারে।

আজকাল যে ভাবে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজনের প্রচার হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজনেচ্ছুগণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রচারিত ব্রজ-ভজন হইতে দূরেই সরিয়া পড়িতেছেন।

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন-প্রয়াসীদিগের পঞ্চ-তত্ত্ব-বাদও অদ্ভুত।

নবদ্বীপের ভজনীয় পঞ্চ-তত্ত্বের পরিচয় শ্রীল স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামি-চরণই স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন :—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামিচরণগণ সকলেই এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শ্রীগৌর, শ্রীনিত্যানন্দ,-শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধরাদি এবং শ্রীশ্রীবাসাদি —এই-ই পঞ্চতত্ত্ব। কিন্তু "শ্রীগুরু, গৌরাঙ্গ, শ্রীশচীদেবী, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী"—এই পঞ্চতত্ত্বের পরিচয় পূর্ব্বে কেহ দেন নাই।

পঞ্চতত্ত্বাত্মক ইত্যাদি শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তরূপ স্বরূপতত্ত্ব,

ভক্তাবতার-তত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব ও ভক্তশক্তি-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গদেব; ভক্তরূপ স্বরূপতত্ত্ব তাঁহার অভিন্ন কলেবর বিলাস-মূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দরাম; ভক্তাবতার-তত্ত্ব শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র; ভক্ততত্ত্ব শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ, ভক্তশক্তি-তত্ত্ব, শ্রীগদাধরাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিস্বরূপ ভক্তবৃন্দ। এইরূপই এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিচরণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদির সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীগুরু, গৌরাঙ্গ শ্রীশচীদেবী, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী" এই পঞ্চতত্ত্বের ভিত্তি যে কোথায়, কেহও খোঁজ করি, খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন না।

ষষ্ঠ প্রশ্ন।—কথিত শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থের প্রামাণিকতা কি?

ভক্তিবিনোদ শ্রীল কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদিত একখানা "প্রেম-বিবর্ত্ত" আমরা দেখিয়াছি। ইহা গৌর-পার্ষদ শ্রীপাদ জগদানন্দ-পণ্ডিতের রচিত বলিয়া মনে হয় না। সম্যক্ আলোচনার স্থান এখানে নাই; সংক্ষেপে আমরা দুই একটী হেতু দেখাইতেছি।

(১) গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, শ্রীল স্বরূপদামোদরের নিম্নলিখিত শ্লোকটী দ্বারা:—

রাধা-কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

এই শ্লোকের প্রথম-দুই চরণে বলা হইল—শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্; আর শ্রীরাধা কৃষ্ণ-প্রণয়ের বিকৃতি বলিয়া স্বরূপতঃ হ্লাদিনী-শক্তি; অতএব, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া স্বরূপতঃ শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণেরও ভেদ নাই—তাঁহারা একাত্মা। কৃষ্ণ-প্রণয়ের বিকৃতি বলিয়া শ্রীরাধা কিরূপে হ্লাদিনীশক্তি হইলেন? না—হ্লাদিনী-শক্তির বিকারই প্রেম বা প্রণয়; তাই প্রেম বা প্রণয়ও হ্লাদিনী; আর প্রণয়ের বিকার বলিয়া শ্রীরাধাও হ্লাদিনী। উক্ত শ্লোকের অর্থ-বিবৃতি উপলক্ষে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন:—

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা, নাম মহাভাব ॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥
—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ।

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ॥
—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিচরণ "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি"র যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্, হ্লাদিনী তাঁহার স্বরূপ-শক্তি; হ্লাদিনীর বিকারই প্রেম, এবং এই প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাবই হইল শ্রীরাধার স্বরূপ; তাই শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি; শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নাই বলিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও এইরূপ অর্থই করিয়াছেন:— শ্রীরাধায়াঃ স্বরূপমাহ। শ্রীকৃষ্ণস্য যতঃ প্রেম্নঃ বিকৃতিবিকাররূপা অতোহ্লাদিনীশক্তিঃ অস্মাদ্ধেতোরেকাত্মানৌ রাধাকৃষ্ণৌ। এই অর্থানুসারে শ্লোকটীর প্রথমচরণের অন্বয় হইবে এইরূপ:— কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিঃ রাধা হ্লাদিনীশক্তিঃ অস্মাৎ তৌ একাত্মানৌ।

কিন্তু প্রেমবিবর্ত্তে উক্ত শ্লোক-চরণের কি অর্থ করা হইয়াছে শুনুন:—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়ের বিকৃতি হ্লাদিনী।৯
রাধাকৃষ্ণ প্রণয়ের বিকার হ্লাদিনী।
প্রণয়ের পরে জন্মে চিত্ত উন্মাদিনী ॥১৩
রাধাকৃষ্ণ দুই হইলে হয়ত প্রণয়।
প্রণয় হইলে তবে বিকার ঘটয় ॥১৪
দুই দেহ হবার আগে বিকার না ছিল।১৫
প্রণয়-বিকার শক্তি সেই আহ্লাদিনী।৩৫
—মঙ্গলাচরণ, প্রেমবিবর্ত্ত।

রাধা এবং কৃষ্ণ পূর্ব্বে এক দেহে ছিলেন; পরে তাঁহারা দুই হইলেন। দুই দেহ হওয়ার পরে তাঁহাদের মধ্যে প্রণয় জন্মিল; প্রণয় জন্মিলে তারপরে প্রণয়ের বিকার জন্মিল; এই প্রণয়ের বিকারের নামই হ্লাদিনীশক্তি। (সুতরাং শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তি নহেন!)

এই অর্থ যে নিতান্ত অসঙ্গত এবং বিচারসহ নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সমস্ত গোস্বামিশাস্ত্র বলিতেছেন—হ্লাদিনীর বিকারই হইল প্রেম বা প্রণয়; কিন্তু প্রেমবিবর্ত্ত বলিতেছেন—প্রণয়ের বিকার হইল হ্লাদিনী!

প্রেমবিবর্ত্তের অর্থানুসারে শ্লোকটীর প্রথমচরণের অন্বয় হইতেছে এইরূপ:— হ্লাদিনীশক্তিঃ রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিঃ ভবতি। এইরূপ অন্বয়ে হ্লাদিনী-শক্তির তত্ত্বই পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীরাধার তত্ত্ব পাওয়া যায় না; অথচ শ্রীরাধার তত্ত্ব প্রকাশ করাই শ্লোকের প্রথমচরণের অভিপ্রায়।

এইরূপ অর্থ করিলে যে কেবল গোস্বামি-সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা নহে। শ্রীল স্বরূপ দামোদরের শ্লোক-রচনা-শক্তিরও অমর্য্যাদা করা হয়। হ্লাদিনী-শক্তি যদি রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ের বিকৃতিই হয়েন, তবে শ্লোকের প্রথমচরণে "অস্মাৎ"-শব্দের সার্থকতা কি? অস্মাৎ—কস্মাৎ? হ্লাদিন্যাঃ রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিত্বাৎ? তাহাই যদি হয়, তবে "একাত্মানৌ"-শব্দের-তাৎপর্য্য কি? একাত্মানৌ কৌ? হ্লাদিনী-কৃষ্ণৌ? হ্লাদিনী আর কৃষ্ণকে একাত্মা বলাই যদি এই শ্লোকের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তৃতীয়-চরণের "তদ্দ্বয়"-শব্দেও হ্লাদিনী এবং কৃষ্ণ এই দুইকেই বুঝাইবে, রাধা এবং কৃষ্ণকে বুঝাইবে না (প্রেমবিবর্ত্তের মতে রাধা হ্লাদিনী নহেন; রাধা কে, তাহা প্রেমবিবর্ত্ত বলেন নাই); এবং শেষ চরণের "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং"-শব্দটীও একেবারেই অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। ঐক্য হইল হ্লাদিনীর এবং কৃষ্ণের (যে হ্লাদিনী শ্রীরাধা নহেন); এই ঐক্য-প্রাপ্ত বিগ্রহ কিরূপে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত হইতে পারে? স্বরূপ দামোদরের মত পণ্ডিত লোক যে এইরূপ দোষযুক্ত একটী শ্লোক রচনা করিবেন এবং জগদানন্দের মত পণ্ডিত যে একটী শ্লোকের এইরূপ বিকৃত এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অর্থ করিবেন, ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন না। এই মঙ্গলাচরণ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীল কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রেম-

বিবর্ত্তকে শ্রীল জগদানন্দ-পণ্ডিতের রচিত গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকিলেও ইহা জগদানন্দের রচিত নহে।

(২) প্রেমবিবর্ত্তে অনেক অদ্ভুত সিদ্ধান্তও দেখিতে পাওয়া যায়:—

(ক) ১৭শ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।

অসাধুর সঙ্গে নাম করিলে যে "সর্ব্বদাই নাম-অপরাধ" হইবে, এমন কথাতো নাম-অপরাধ-তালিকায় দেখা যায় না। ইহা নামাভাসই বা কিরূপে হয়, তাহাও বুঝিতে পারিনা। নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অন্যবস্তুর ব্যপদেশে ভগবানের নাম উচ্চারিত হইলেই তাহাকে নামাভাস বলে। "অসাধুর-সঙ্গে" যাঁহারা নাম করেন, তাঁহাদের শ্রীনামের প্রতিই লক্ষ্য থাকে।

(খ) শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে সনাতন,　　কৃষ্ণ যে রতন ধন
　অনেক যে দুঃখেতে মিলয়।
দেহ, গেহ, পুত্র, দার,　　বিষয়-বাসনা আর
　সর্ব্ব-আশা যদি তেয়াগয়॥—ভক্তমাল।

প্রভু আরও বলিয়াছেন:—

অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ। চৈঃ চঃ।

কিন্তু প্রেমবিবর্ত্তের ২১।২২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে:—

ওরে ভাই শুষ্কবৈরাগ্য এবে দূর কর।
যুক্ত বৈরাগ্য আনি হৃদয়েতে ধর॥
বিষয় ছাড়িয়া ভাই কোথা যাবে বল।
বনে যাবে সেথানে বিষয়-জঞ্জাল॥
পেট তোমার সঙ্গে যাবে, দেহের রক্ষণে।
কত চেষ্টা হবে তাহা ভেবে দেখ মনে॥
অকারণ জীবনের শীঘ্র হবে ক্ষয়।
মরিলে কেমনে আর মায়া করবে জয়॥

যদিও না মর তবু হইবে দুর্ব্বল।
জ্ঞাননাশ হইবে কোথা জ্ঞানের সম্বল॥
ঘরে বসি সদাকাল কৃষ্ণনাম লঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।

প্রেমবিবর্ত্তের মতে, গৃহে থাকাই যুক্তবৈরাগ্য, আর গৃহ ছাড়িয়া যাওয়াই শুষ্ক বৈরাগ্য !!

(গ) কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে পরকীয়া রস নাই

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥—চৈঃ চঃ।

কিন্তু প্রেমবিবর্ত্তের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

পরকীয়া মহারস গোলোকের নিত্যধন।

ইহা শ্রীজীব-গোস্বামিচরণের সিদ্ধান্তেরও প্রতিকূল।

(ঘ) প্রেমবিবর্ত্তের ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

দধি দুগ্ধ স্মার্ত্ত উপচরিত আমিষ।
যুক্তবৈরাগীর হয় গ্রহণে নিরামিষ॥

স্মৃতিসম্মত আমিষও যুক্তবৈরাগীর পক্ষে নিরামিষতুল্য ! এইরূপ অনেক অদ্ভুত কথা প্রেমবিবর্ত্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌরপার্ষদ-পণ্ডিত জগদানন্দ যে এইরূপ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায়না।

(৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অনেক পরেই এই প্রেমবিবর্ত্ত লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় ; চরিতামৃতের অনেক পদ অবিকৃত ভাবে, এবং অনেক পদ সামান্য বিকৃতভাবে প্রেমবিবর্ত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কোনও লোক চরিতামৃত হইতেই এই সকল পদ সংগ্রহ করিয়া স্বরচিত পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইল :—

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।১৮পৃঃ

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগ, নাহি তাহে জড়দাগ,
শুক্লবস্ত্র শূন্য মসীবিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার একবিন্দু
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
জড়দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি
শুদ্ধ দেহ না হয় উদয়॥—৪২পৃঃ
দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমেতে অন্ধ
সেই প্রেমে কৃষ্ণ নাহি পাই।
তবে যে করে ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করে ইহা জানিহ নিশ্চয়॥—৪৩পৃঃ
গ্রাম্য-কথা না শুনিবে গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ-নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥—৪৭পৃঃ
বিশুদ্ধ বৈরাগী করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন যাপন॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই সমাজে বেড়ায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥—৪৮পৃঃ

জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থখানা জগদানন্দের লিখিত হইলে চরিতামৃতেও ইহার উল্লেখ থাকিত

হইতে পারে, উদ্ধৃত পয়ারগুলি হয়তো কবিরাজ গোস্বামীই পূর্ব্ববর্ত্তী জগদানন্দের গ্রন্থ হইতে তাঁহার চরিতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি তাহাই হইত, কবিরাজ গোস্বামী নিজের গ্রন্থে তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতেন।

আরও একটী হেতু আছে; উদ্ধৃত পয়ারগুলির ভাষার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষার বেশ সামঞ্জস্য আছে; পয়ারগুলি অতি সরল, মধুর এবং স্বাভাবিক; ইহাতে কষ্ট-রচনার কোনও লক্ষণই নাই। কিন্তু প্রেমবিবর্ত্তের রচনা কষ্ট-কল্পিত; অনেক ঘষামাজা করিয়া, অনেক চেষ্টার পরেই যেন এক একটী পয়ার লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; প্রেমবিবর্ত্তের রচনা স্বাভাবিক নহে। প্রেমবিবর্ত্তের যে কয়টী পয়ার ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা সহজে বুঝা যায়। প্রেম-বিবর্ত্তের অঙ্গে উপরে উদ্ধৃত চরিতামৃতের পয়ারগুলি কঙ্কর-প্রস্তরখণ্ডে হীরকের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। প্রেমবিবর্ত্তে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না; ইহা কবিতাকারে লিখিত গদ্য-পুস্তকই।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া পাঠকদের ধৈর্য্য নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।

সপ্তম প্রশ্ন।—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ধর্ম্মপত্নী নহেন, এই উক্তির অযৌক্তিকতা।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ধর্ম্মপত্নী নহেন, ইহা নিতান্ত অপরাধজনক-উক্তি। বেদবিধি-অনুসারে গৃহীত পত্নী মাত্রই ধর্ম্মপত্নী। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বেদবিধি অনুসারে যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান সম্পাদন পূর্ব্বকই বিবাহ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি প্রভুর ধর্ম্মপত্নী কেন না হইবেন?

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপ-তত্ত্ব।

(২)

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীগোলোক শ্রীবৃন্দাবনের অংশ-বিশেষ। যে লীলাটী প্রপঞ্চলোকে অভিব্যক্ত হয় না, তাহাই গোলোক। এবং আরও

শ্রীভগবান একই স্থানে নিজ শ্রীবিগ্রহ, ধাম, লীলা, পরিকর প্রভৃতির অনন্ত-প্রকার বৈভব-প্রকাশে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে একই শ্রীবিগ্রহে ষোড়শ সহস্র মহিষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এবং ইহা দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় আগমন করেন। আবার মিথিলা-নিবাসী ভক্তমুকুটমণি শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন শ্রীকৃষ্ণ উক্ত ভক্তদ্বয়কে দর্শন দিবার অভিলাষে মিথিলায় আগমন করেন, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে স্বীয় বিগ্রহের এবং শ্রীশুকমুনি প্রভৃতি অন্যান্য পার্ষদ ঋষিগণেরও একই সময়ে দুইটী করিয়া প্রকাশের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক প্রকাশই নিজ নিজ প্রকাশে অভিমান-বিশিষ্ট। অর্থাৎ যে প্রকাশ শ্রুতদেবের গৃহে যাইতেছেন, তাঁর অভিমান—আমি শ্রুতদেবের গৃহেই যাইতেছি, বহুলাশ্বের গৃহে যাওয়া হইল না। এই প্রকার, যে প্রকাশ বহুলাশ্বের গৃহে গমন করিতেছেন, তাহাদের অভিমান আমরা বহুলাশ্বের গৃহেই যাইতেছি, শ্রুতদেবের গৃহে আমাদের যাওয়া হইল না। এই প্রকারে এই ভৌমবৃন্দাবনেরও শ্রীগোলোক নামে সর্ব্ববৈকুণ্ঠোপরি প্রকাশান্তরে স্থিতি অসম্ভব নহে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরব-স্থানীয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে বাঙ্গলা পয়ারে অতি সরল ভাষায় এই সমস্ত তত্ত্ব সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতির পর পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণ-বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান॥

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম॥

তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোলোক ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্ম-চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

এইক্ষণে, শ্রীবৃন্দাবন যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বসতি-স্থান, সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। অথর্ব্ব-বেদে উক্ত হইয়াছে,—"গোকুলাখ্যে মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবন-মধ্যে সহস্রদলপদ্মে ষোড়শদল-মধ্যে অষ্টদল-কেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজত ইতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, ধনুর্যজ্ঞ-দর্শনার্থ কংসরাজ-সভায় সমাগত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য দর্শনে উল্লসিত হইয়া মথুরাপুররমণীগণ পরস্পর শ্রীব্রজভূমির সৌভাগ্য-বিশেষ বর্ণন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণ-পুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥

হে সখিগণ! ব্রজভূমি পরম পুণ্যবতী। যেহেতু সে স্থানে, গিরীশ ও রমা-কর্তৃক অর্চ্চিত-চরণারবিন্দ, মনুষ্য-চিহ্নে গূঢ় পুরাণ-পুরুষ বনজাত বিচিত্র পুষ্পপত্র-বিরচিত মাল্যে বিভূষিত হইয়া শ্রীবলদেবের সহিত বেণুবাদন করতঃ গো-সকল পালন করিতে করিতে বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা বিহার করিতেছেন।—এ স্থলে "অঞ্চতি" এই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়ার প্রয়োগ দ্বারা, গোকুল মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি দেখান হইতেছে। অন্যথা, পুরস্ত্রীগণের বর্ণন-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতেই আসিয়াছেন, সে সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিহার করিতেছেন—এই প্রকার বর্ত্তমানকালের প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ, প্রকট-লীলায়

শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রজ ত্যাগ করিয়া মথুরায় আগমন করিয়াছেন। অতএব ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ঊর্দ্ধাম্নায়-তন্ত্রে শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীর নিকট শ্রীগোবিন্দদেবের মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে "সেই শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবনেই চারিযুগে বিরাজ করেন,"

বৃন্দাবনে যোগপীঠে স এব সততং স্থিতঃ।
অসৌ যুগচতুষ্কেঽপি শ্রীমদ্বৃন্দাবনাধিপঃ॥

পাতালখণ্ডেও কথিত হইয়াছে যে,

"যমুনা-জলকল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধবঃ॥"

এই প্রকারে সকল শাস্ত্রই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বসতি সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ দিয়াছেন। প্রবন্ধ-বিস্তৃতিভয়ে সে সকলের অধিক আলোচনা করা হইল না।

এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপটী নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন। ইহার উপরে সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়। তাহার উপরে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার-তত্ত্ব, এবং মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতির স্থান। তৎপরে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যরূপ প্রকৃতি-তত্ত্ব বিদ্যমান। তদুপরি বিরজা নদী। এই বিরজা নদীর সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। ইহা মূর্ত্ত-বেদাঙ্গ সকলের অঙ্গস্বেদ-জলে প্রবাহিত হয়। এইস্থানে সমস্ত দেবতাগণের যথাক্রমে স্থিতি। এই বিরজা-তীরে ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের মুক্তি স্থান। তদূর্দ্ধে পরমব্যোম বিরাজিত। তাহার উপরে একটী চতুষ্কোণাত্মক স্থল আছে। ইহাকেই শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক বলা হয়। ইহার চারিটী কোণে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহের চারিটী ধাম। দেবলীলা হেতু এই ধাম-চতুষ্টয় ব্যোম-ধামে অবস্থিত বুঝিতে হইবে। এই শ্বেতদ্বীপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থের হেতুদ্বারা আবৃত। পূর্ব্বাদি চারিদিক ঈশানাদি চারি বিদিক্, ঊর্দ্ধ এবং অধঃ এই দশদিকে দশটী শূল-দ্বারা ইহা বিদ্ধ। ইহা পদ্মকুমুদ প্রভৃতি অষ্টনিধি-সম্বলিত এবং অনিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি নিষেবিত। মন্ত্রাত্মক ইন্দ্রাদি দশদিকপাল ইহার সকলদিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। শ্যাম, গৌর,

চতুর্দ্দিক সুশোভিত। শ্রীবিমলাদি অলৌকিক ষোড়শ শক্তিগণ কর্ত্তৃক এই শ্বেতদ্বীপ সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত।

এই শ্বেতদ্বীপ বা গোলোকের মধ্যস্থলে একটী সহস্রদল-বিশিষ্ট পদ্ম আছে। এই পদ্মটীর নাম গোকুল বা বৃন্দাবন। এই স্থানটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা শ্রীকৃষ্ণের মহাবৈকুণ্ঠাখ্য স্থান। ইহা নন্দ-যশোদাদির সহিত বাসযোগ্য শ্রীকৃষ্ণের মহা-অন্তঃপুর।

ঐ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকারের অভ্যন্তর স্থলটী ষট্‌কোণ বিশিষ্ট এবং হীরক-কীলক শোভিত। এই ছয়টী কোণ ষড়ঙ্গ-বিশিষ্ট ষট্‌পদী মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্রের স্থান। সেই কর্ণিকারের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ তৎসংলগ্ন অভ্যন্তর কেশর-বলয় সকল শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় গোপগণের বসতিস্থান। সেই কমলের পত্র সকল শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-কান্তাগণের উপবনরূপ বিলাস-স্থান। এ স্থানে উন্নত-প্রান্ত পত্রসকলের মূল সন্ধিসকলে অভ্যন্তর প্রবেশের পথসকল বর্ত্তমান আছে; এবং সন্ধিসকলের অগ্রভাগে গোসমূহের বিশ্রাম স্থান অর্থাৎ গো-নিবাস।

এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য নূতন পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাদের মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমরসকল মুহুর্মুহু গুঞ্জন করতঃ চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছে। অমৃতলতিকা-ব্যাপ্তা, নানাবিধ প্রাণি-নিষেবিতা, ষড়্‌ঋতু-সুখদা, সর্ব্বজন্তু-সুখাবহা, নীলোৎপলদলশ্যামা বায়ু কর্ত্তৃক মন্দ মন্দ তরঙ্গায়িতা, কুসুমপরাগসমূহে সুবাসিতা, স্বচ্ছ-সলিলা কালিন্দী তথায় কুলু কুলু রবে প্রবাহিত হইতেছে। এই কালিন্দীর উভয় তট রত্নবদ্ধ। রাজহংস-সমূহ সর্ব্বদা তথায় উৎফুল্লান্তঃ-করণে ক্রীড়া করিতেছে।

এই বৃন্দাবনে নির্ঝর-গহ্বর-সংবলিত রত্নধাতু-রাগমণ্ডিত, সুচিত্র পক্ষিগণসঙ্কুল শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ বিরাজমান। এ স্থানের গৃহ-সমূহ চিন্তামণি-সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত। এবং বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ। কালিন্দীজল-সম্পৃক্ত সুশীতল, বিবিধ কুসুমপরিমল-বাহী বায়ু প্রতিনিয়ত সঞ্চালিত হইয়া এই সকল বৃক্ষকে কম্পিত করিতেছে। বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট বিহগনিচয় শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতেছে। [ভ্রমরের ঝঙ্কারে এবং নৃত্যশীল পিককুলের কেকারবে সে সদাই পরম মনোরম।

তন্মধ্যে একস্থানে দুইটী কল্পবৃক্ষ একত্র সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের তলদেশে মণিময় মন্দির আছে। এই মন্দির-মধ্যে একখানি রত্নসিংহাসনে ফুল্লেন্দীবর-কান্তিবিশিষ্ট, মৃগমদতিলকযুক্ত, ময়ূরপুচ্ছ-সুশোভিত, বৈজয়ন্তী-মাল্যধর বেণুন্যস্তবদন, মৃদুমন্দহাস্যযুক্ত শ্যামসুন্দর উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার বাম-পার্শ্বে উপবিষ্টা গলিতসুবর্ণবর্ণা, পট্টাম্বরধারিণী কিঙ্কিণীজালশোভিতা, আনন্দরসসংমগ্না নবযৌবনা শ্রীরাধিকা প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বদনে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া পর্ণচূর্ণসমন্বিত পূগফালি মুখাম্বুজে প্রদান করিতেছেন। প্রিয় নর্ম্মসখীগণ ইঁহাদের দুইজনের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিতা হইয়া বিবিধপ্রকার সেবা করিতেছেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত ব্যাকরণতীর্থ।

পুরুষ-প্রয়োজন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈ র্জন্মমৃত্যু প্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ॥
যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

যিনি সদ্গুরুর নিকটে বেদাদি শাস্ত্র হইতে সর্ব্বাধ্যক্ষ সর্ব্বেশ্বরকে অবগত হয়েন, তাঁহার দেহ-দৈহিক-মমতারূপ রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়; এবং সেই মমতাপাশ হইতে সমুত্থিত ক্লেশরাশি ক্ষয় হইয়া জন্মমৃত্যুর বিরতি ঘটে। তদনন্তর উত্তরো-

স্তর সর্ব্বেশ্বরের ধ্যান হেতু লিঙ্গদেহ ধ্বংস হইলে, চান্দ্রপদ ও ব্রাহ্মপদের অতীত (চান্দ্র ও ব্রাহ্ম অপেক্ষায়) তৃতীয়—অনন্ত, নিত্য ও দিব্য বিভূতিযুক্ত প্রকৃতি-গন্ধ-পরিশূন্য (অপ্রাকৃত) ভাগবত পদ-লাভ হওয়ায়, পরমসুখ-প্রাপ্তিরূপ অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। সাধক যখন দীপসদৃশ স্বকীয় স্বরূপ-জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বকে ধ্যান করেন, তখন জন্মাদি বিকারশূন্য—সর্ব্ব—প্রধানাদি সর্ব্বতত্ত্ববিশিষ্ট, অথচ প্রধানাদিদ্বারা অস্পৃষ্ট সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তমকে জানিয়া, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন।

যে পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিলে, সমস্ত দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত সুখপ্রাপ্তি ঘটে, সেই পুরুষোত্তমের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলেন—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। "রসো বৈ সঃ"—তিনি একমাত্র রস অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী"—জীব একমাত্র রস বা আনন্দস্বরূপ সর্ব্বেশ্বরকে লাভ করিয়াই আনন্দ-শীল হইতে পারে, তদ্ভিন্ন পরমানন্দলাভের আর উপায় নাই। এই পরতত্ত্ব-লক্ষণ আনন্দের কণামাত্র অবলম্বন করিয়া সমস্ত প্রাণী জীবনধারণে সমর্থ হয় (তস্যৈব মাত্রাণি উপজীব্য এতানি ভূতানি উপজীবন্তি)।

এই পুরুষোত্তম বা পরতত্ত্ববস্তুই আনন্দের মূলস্বরূপ, ইহাতেই আনন্দের চরম পর্য্যবসান। এই পরতত্ত্বানন্দের নিরূপণ-প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে—"সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি—ইহাই আনন্দের মীমাংসা হইতেছে" এই বাক্য হইতে উপক্রম আরম্ভ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্যলোকে যে আনন্দ আছে, তাহা হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট মনুষ্যগন্ধর্ব্বলোকের (১) আনন্দ। মনুষ্যগন্ধর্ব্বানন্দ আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট দেবগন্ধর্ব্বলোকের (২) আনন্দ। দেবগন্ধর্ব্বানন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট পিতৃলোকের আনন্দ। পিতৃলোকের আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট আজানজ-দেবলোকের (৩) আনন্দ। আজানজ-দেবলোকের

(১) মনুষ্যাঃ সন্তঃ কর্ম্মবিদ্যাবিশেষাৎ গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ মনুষ্যগন্ধর্ব্বাঃ।

(২) জাতিতঃ এব গন্ধর্ব্বাঃ দেবগন্ধর্ব্বাঃ।

(৩) আজান ইতি দেবলোকঃ, তস্মিন্ জাতা আজানজাঃ—স্মার্ত্তকর্ম্ম-

আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট কর্ম্মদেবলোকের (১) আনন্দ। কর্ম্ম-দেবলোকের আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট দেবলোকের (২) আনন্দ। দেবলোকের আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট দেবরাজ ইন্দ্রের আনন্দ। ইন্দ্রের আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট দেবগুরু বৃহস্পতির আনন্দ। বৃহস্পতির আনন্দ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মার আনন্দ। এই প্রজাপত্যানন্দ হইতেও শতগুণে উৎকৃষ্ট পরব্রহ্মানন্দ।

এইরূপ ভাবে মনুষ্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রাজাপত্যলোক পর্য্যন্ত অবস্থিত দশ প্রকার আনন্দের মধ্যে উত্তরোত্তর শতগুণিতরূপে উৎকর্ষপরিমাণ দেখাইয়া, তাহা হইতেও পরব্রহ্মানন্দকে শতগুণে উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতেও পরব্রহ্মানন্দের উৎকর্ষপরিমাণ স্থির হইল না বলিয়া, অপরিতোষ-হেতু অবশেষে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—যে পরব্রহ্মানন্দের পরিমাণ নিরূপণ করিতে যাইয়া, তাহার অনুসন্ধান না পাইয়া বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে। এই বাক্য দ্বারা শ্রুতি পরব্রহ্মানন্দের অপরিসীমতা দেখাইয়াছেন।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—এই পরব্রহ্মানন্দকে যিনি অবগত হইয়াছেন, তাঁহার আর কোথা হইতেও ভয়ের সম্ভাবনা নাই। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—এই পরব্রহ্মানন্দ যদি প্রতি জীবের হৃদয়াকাশে পরমাত্মারূপে বিরাজিত না থাকিতেন, তবে কেই বা অপানচেষ্টা করিতে পারিত, আর কেই বা প্রাণচেষ্টা করিতে সমর্থ হইত? এই পরব্রহ্মানন্দই লোকসকলকে আনন্দিত করিতেছেন (এষ হ্যেবানন্দয়তি—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীনরহরি দাস, ভাগবতভূষণ
কাব্য-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ।

---

(১) যে অগ্নিহোত্রাদিনা শ্রৌতেন কর্ম্মণা দেবান্ গচ্ছন্তি।

(২) অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশ আদিত্যাঃ, ইন্দ্রঃ প্রজাপতিশ্চ ইতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবাঃ।

নবদ্বীপে মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে গৌড়-রাজর্ষি ভক্ত-মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে আসিয়াছিলেন, সঙ্গে আসিয়াছিলেন বহরমপুরের বৈষ্ণব-জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ সেন। কাশিমবাজারাধিপতির অবসরপ্রাপ্ত অমাত্য শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয়ের জাহ্নবীসৈকতোপরিস্থিত ভজনাশ্রমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শ্রীধামের আখড়া-সমূহের মহান্তগণের অনুরোধে প্রথমে গোরাচাঁদের আখড়ায় সমবেত ভক্তমণ্ডলীতে যোগদান করেন। তথায় নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং টোলের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হয়; প্রেমকণ্ঠ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন দাস মহান্তের সুমধুর গৌরলীলারস-গানে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপরে পূজ্যপাদ শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য প্রভুপাদ ৺জগদানন্দ গোস্বামীর বাড়ীতে শ্রীশ্রীমদনগোপালের সম্মুখে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতা পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়ের হৃৎকর্ণরসায়নী ইতর রসাবিস্মারণী সুমধুর ব্রজলীলার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে মহারাজা বাহাদুর বিশেষ আনন্দিত হয়েন। পরদিন বৈষ্ণবদর্শন-বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, সেবাশ্রম, বকুলতলা হাই স্কুল, ডিস্‌পেন্‌সারী, মাতৃমন্দির প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। জাহ্নবীসৈকতে গঙ্গাতীরের সিদ্ধ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের স্মরণ-সভা হয়; তাহাতে প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী বেদান্তরত্নের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন বাক্‌চি মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাননীয় গৌড়রাজর্ষি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং ভক্তমহিমা কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বশেষে উক্ত সৈকতস্থিত উক্ত সিদ্ধ বাবাজী মহারাজের আদেশে শ্রীযুত বামাচরণ বসু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ভজন-আশ্রমে "শ্রীশ্রীগৌরকিশোর আশ্রম সহর নদীয়া ধীর সমীর" লিখিত প্রস্তর ফলক সংযোজিত করেন। উক্ত সিদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের আদর্শে যাহাতে ৩।৪ জন ভক্ত নির্জ্জনে বিশুদ্ধ ভজন করিতে পারেন, এরূপ ভজন-কুটীর ও গোফা প্রস্তুত হইয়াছে। দুইজন ভক্ত এক্ষণে তাহাতে ভজন করিতেছেন।

প্রভুপাদ শ্রীল রঙ্গনন্দন গোস্বামী, শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, শ্রীল নৃত্যগোপাল গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ এবং বর্ত্তমান চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সদানন্দ বাবু, ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণ বাবু, শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মহারাজা বাহাদুরের বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

অবশ্য বলিতে হইবে না যে, মহারাজা বাহাদুর প্রধান প্রধান দেবালয়াদি দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল।

আমার কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গুণসঙ্গবশতঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম জীব আমি বহুরূপীর মত বহুরূপ ধারণ করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতকার—সংক্ষেপে সারগর্ভ ভাষায় বলিতেছেন—

কৃষ্ণ-ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে তুলে কভু নরকে ডুবায়।
রাজা যেন দণ্ড্য জনে জলেতে চুবায়॥

এখন তর্জ্জামা করিয়া দেখা যাউক "কে আমি"র পরিচয়ে কি দাঁড়াইতেছে।

(১) আমি ভগবানের বীজ বা জীব বা পুত্র, সুতরাং তাঁহার সহিত আমার পিতা-পুত্র সম্বন্ধ। অকৃতজ্ঞ পুত্র আমি পরম পিতার ভজন করি নাই, বা করি না বলিয়াই জন্মে জন্মে তাপ ভোগ করিতেছি। একথা আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের মুখেও শুনিতে পাই—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥—চৈঃ ভাঃ

(২) আমি ভগবানের অংশ হইলেও, স্বাংশ বা স্বরূপ-শক্তির অংশ নহি, কিন্তু বিভিন্নাংশ জীব। আমি যে বিভিন্নাংশ, তাহা কার্য্যেই ধরা পড়িতেছে। আমি ভগবান্ হইতে বিভিন্ন হইয়া বেশ থাকিতে পারিতেছি, আমি কিছু বিভিন্ন বলিয়াই প্রকৃতির তিন গুণ আমাকে বাঁধিতে পারিয়াছে। যাঁহারা স্বরূপ-শক্তির অংশ, তাঁহারা ভগবান্ ব্যতীত এক নিমেষও থাকিতে পারেন না, অনাদিকাল হইতে তাঁহারা ভগবানের নিকটেই আছেন—নিত্য ভগবানকে লইয়াই তাঁহাদের নিত্য-সংসার। তবে আমি তটস্থ-শক্তির অংশ বলিয়া এপার ওপার দুই পারেই থাকিতে পারি। ভগবান্ হইতে দূরে পড়িয়াছি, আবার তাঁহার নিকটেও যাইতে পারি।

(৩) পরা প্রকৃতির অংশ বলিয়া আমিও প্রকৃতি। তিনি পুরুষোত্তম, আমি প্রকৃতি ; সুতরাং ভগবানকে আমি স্বামী বা প্রভুও বলিতে পারি।

পুত্রের স্বরূপগত-ধর্ম্ম হইতেছে পিতার সেবা করা ; অংশের স্বরূপগত ধর্ম্মও অংশীর সেবা করা, আবার প্রকৃতির স্বরূপগত-ধর্ম্মও পুরুষের সেবা করা, তাহা হইলে আমি জীব তাঁহার পুত্রই হই, বিভিন্নাংশই হই, বা প্রকৃতিই হই—আমার স্বরূপগত-ধর্ম্ম হইতেছে তাঁহার সেবা করা—তাঁহার সহিত আমার নিত্য দাস্য ভাব।

কৃষ্ণদাস সত্য সত্যই বলিয়াছেন—

"জীবের স্বভাব এই কৃষ্ণের নিত্যদাস।"—চৈঃ চঃ

আমার প্রকৃত বা অপ্রাকৃত স্বরূপ। ভগবানের তটস্থাশক্তির অংশ জীব আমি তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী গুণময়ী মায়ার হাতে পড়িয়া বহুনামরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি। জড়-বিজ্ঞানে এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, হইতেছে না, বা হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহার দ্বারা আমার প্রকৃত স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। আমি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, অথচ দেহের সর্ব্বত্রই ব্যাপিয়া আছি। আপাদ-মস্তক যেখানে আমাকে আঘাত করিবে, সেখানেই আমার লাগিবে ; কারণ, আমি দেহের সর্ব্বত্রই আছি ; কিন্তু এমনই আমি যে দেহটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কোন অণুবীক্ষণের দ্বারাই আমাকে দেখিতে পাইবে না। দেহের ভিতর কিছুই দেখিতে না পাওয়ায়, বা দেখিবার সাধ্য না হওয়ায়, দেহ ব্যতীত কিছুই নাই বলিয়া তুমি নাস্তিক হইতে পার, কিন্তু আমি নাস্তি

নহি,—অস্তি,—তবে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির গোচরে নাই। অপরা প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া সাত ঘাটের জল খাইয়া বেড়াইতেছি বটে; কিন্তু প্রাকৃত রাজ্যে এমন কিছু নাই, যাহা আমার অস্তিত্ব লোপ করিতে পারে। "বাপ কা ব্যাটা, সিপাই কা ঘোড়া, কিছু না হয় ত থোড়া থোড়া," আমি যাহাই হই না, বা যাহাই করি না কেন, আমি বাপকা বেটা,—সতের পুত্র সৎ। কোটী কোটী বার নরকেই যাই, আর যে দশাতেই পড়ি, আমি বর্ত্তমান থাকিবই। যে সর্ব্বকারণ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর হইতে আমার অস্তিত্ব,—স্বয়ং তিনিই আমার অপ্রাকৃত স্বরূপের পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে দিয়াছেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥—গীতা ২।২০

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ—গীতা ২।২৩—২৪

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটী ভূত। ভূতে ভূতের উপর বা ভূতের কোন বিকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু ভূতপতি নিকটে থাকিলেও সে তাহার কিছু করিতে পারে না। দেহ পঞ্চভূতের বিকার, ভূতের প্রভাব তাহার উপর খাটিতে পারে, কিন্তু ভূতপতির আত্মজ আমি ভূতের ফাঁদে পড়িলেও ফাঁদে না দি পা,—ভূত হইতে স্বতন্ত্র থাকি। পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ,—আমি বুদ্ধির উপরে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥—গীতা ৩।৪২

পঞ্চভূতের উপরে জড়-বুদ্ধির স্থান বলিয়া,—তাহার দ্বারা পঞ্চভূত সংক্রান্ত জড়-বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার এবং উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু আমার নীচে বলিয়া সে আমার বার্ত্তা কিছুই দিতে পারে না। জড়-বিজ্ঞানের উপর যে

চৈতন্য-বিজ্ঞান আছে, তাহার যন্ত্রপাতি-দ্বারা আমার স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। চৈতন্য-বিজ্ঞানে একটু অগ্রসর হইলেও আমি অন্ধকারের ভিতর বসিয়া এই চক্ষুতেই আত্মজ্যোতি দর্শন করিতে পারি। এই জ্যোতিকে ব্রহ্মজ্যোতিও বলা হয়। শুদ্ধ-জীব আমিও শাস্ত্রে স্থানে স্থানে ব্রহ্মপদবাচ্য হইয়াছি,—ভগবান্ আমাকে ব্রহ্ম বলিয়াও পরিচয় দিয়াছেন—"জীবের আদি নাই, সে অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান,—সে সৎ অর্থাৎ স্থূলও নহে, অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্মও নহে, কিন্তু আমার আশ্রিত ব্রহ্ম—

"অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।"—গীতা ১৩.১২

আমার দেহের স্বরূপ।

আমার দেহকে শ্রীভগবান ক্ষেত্র বলিয়াছেন। ক্ষেত্র ত বটেই, কারণ, আমি ইহাতে বাসনারূপ কর্ম্ম করিয়া কুফল সুফল ভোগ করি। কোন দিন কোন সূত্রে এই ফল-ভোগের জমিখানি আমি মূল মালিকের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি—তাহা যখন বলিবার উপায় নাই, তখন বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে, অনাদিকাল হইতেই ইহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শুনিতে পাই, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক না উঠিলে, মালিক কিছুতেই ইহা হইতে উচ্ছেদ করিবেন না, তাঁহার শরণাগত না হইলে আবার ইচ্ছা করিয়াও ছাড়িবার উপায় নাই। মায়ারাজ্যের এই ক্ষেত্রে সুখ অপেক্ষা দুঃখই বেশী, মৃত্যুর পর মৃত্যু আছে। খাস মহলে যে জমি আছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার সাধনা করিলে, ইহা ছাড়িতে পারা যায়, অন্যথা নহে।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়-গোচরাঃ॥

গীতা—১৩.৫

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত, তাহাদের কারণ স্বরূপ অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই দশ ইন্দ্রিয়, এক মন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ পঞ্চ-তন্মাত্র—একুনে (৫+১+১+১+১০+১+৫) ২৪ তত্ত্ব

এই দেহের বিকার হইতেছে—

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।—গীতা ১৩।৬

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা ও ধৃতি।

অনাদি কাল হইতে দেহের সহিত সম্বন্ধ করিয়া আমিই যেন দেহ হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু আমার দেহ, আমি দেহ নহি। দেহ আমার সহিত যুক্ত থাকিয়া আমাকে ক্ষর পুরুষ করিয়া রাখিয়াছে, দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে আমি অক্ষর পুরুষ হইতে পারি। কেহ কেহ বলেন, "আমি ম'লে ঘুঁচিবে জঞ্জাল," কিন্তু এ "আমি" যে মরে না। তাই আমাদের বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—"আমি" লইয়া জঞ্জাল নহে, জঞ্জাল দেহ লইয়া। দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে আমার জঞ্জাল ঘুচিতে পারে, নতুবা নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

মহাভাব—দিব্যোন্মাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অবজল্প।

শ্রীকৃষ্ণে কাঠিন্য, কামিত্ব এবং ধূর্ত্ততা আছে বলিয়া তাঁহার প্রতি আসক্তি-স্থাপন অযোগ্য—যাহাতে এই ভাবের বাক্য, ঈর্ষ্যা ও ভয়ের সহিতই উক্ত হয়, তাহাকে অবজল্প বলে।

* * * *

ভ্রমরটী তখনও গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া ভানু-নন্দিনীর চরণ-সান্নিধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। গুন্ গুন্ শব্দ শুনিয়া দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা মনে করিলেন, ভ্রমর তাঁহাকেই বুঝি বলিতেছে—"রাধে! তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অকৃতজ্ঞ বলিতেছ; কিন্তু বাস্তবিক তিনি অকৃতজ্ঞ নহেন; তোমরা তাঁহার জন্য যাহা করিয়াছ, তাহা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই, তাঁহার মতন কোমলমনা লোকের পক্ষে, তাহা ভুলিয়া যাওয়াও সম্ভব নহে। তাই তিনি সর্ব্বদাই কেবল তোমার ধ্যানেই নিমগ্ন থাকেন; আমরা তো সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকি; তাই

তাঁহার আচরণ সমস্তই দেখিতে পাই। তাই বলি রাধে! কোমলমনা বন্ধুজনের সহিত বিবাদ রাখা সঙ্গত হয় না। তোমার অন্তঃকরণও সাতিশয় কোমল; আমি জানি, তোমার চিত্ত এখনও শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত; বৃথা সন্দেহের বশেই তুমি সেই আসক্তি দূর করিতে চেষ্টা করিতেছ। আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি, রাধে! আমার কথা বিশ্বাস কর—সতত-তোমার-ধ্যানে-নিমগ্ন শ্রীকৃষ্ণের কোমল অন্তঃকরণের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহাতে তোমার চিত্তের আসক্তি নষ্ট করিতে চেষ্টা করিও না, রাধে!"

ভ্রমরের এইরূপ উক্তি অনুমান করিয়া যেন একটু উপেক্ষার মৃদুহাসি হাসিয়াই ভানু-নন্দিনী বলিলেন—"না, না, ভ্রমর! তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র কিছুই জান না; জানিবেই বা কিরূপে? তুমি তো তাঁর নূতন ভৃত্য মাত্র; কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন পরেই তো তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এত অল্প সময়ে কি অভিজ্ঞতাই বা তুমি লাভ করিবে? যদি লোক-চরিত্র বুঝিবার মতন তীক্ষ্ণবুদ্ধি তোমার থাকিত, তাহা হইলেও বা তাঁহার চাল-চলন দেখিয়া তাঁহার প্রকৃতি কিছু কিছু বুঝিতে পারিতে। দেখ ভ্রমর! যাঁর বর্ণটা কালো, তাঁর অন্তঃকরণ কি কখনও সাদা (কলঙ্কশূন্য) হইতে পারে? আর যে কখনও সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, সহজ দাঁড়ানোর ভঙ্গীই যার কুটীল (ত্রিভঙ্গ), তাঁর অন্তঃকরণ কি কখনও সরল হইতে পারে? তা কখনও হইতে পারে না, ভ্রমর! তুমি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে কিছুই জাননা, তাই অর্ব্বাচীনের মত কথা বলিতেছ। আমাদের ছোটকাল হইতেই কৃষ্ণকে আমরা দেখিয়া আসিতেছি—তাই তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে আমাদের বেশ একটু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। কেবল ইহাই নহে—তুমি পৌর্ণমাসী দেবীর কথা তো শুনিয়াছ? তিনি সর্ব্বজ্ঞা; তাঁহার নিকটে আমরা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথাও শুনিয়াছি—কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও তিনি কালো ছিলেন, সুতরাং নিষ্ঠুর ছিলেন, কামুক ছিলেন, ধূর্ত্তও ছিলেন। এ জন্মে তিনি কিরূপ নিষ্ঠুরতা এবং ধূর্ত্ততার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তো আমাদিগকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ; পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কি করিয়াছিলেন, তাহা কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শুন:—

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃতবিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাম্।

বলিমপি বলিমত্ত্বাহবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ য
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥
—শ্রীভাঃ ১০।৪৭।১৭

পূর্ব্বে একজন্মে তিনি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁর নাম ছিল রামচন্দ্র, বর্ণ ছিল নবদূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যাম অর্থাৎ কালো। কিন্তু ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম হইলেও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি ব্যাধের আচরণ গ্রহণ করিলেন! ব্যাধ যেমন গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া মৃগগণকে অতর্কিত-ভাবে হত্যা করে, সেই কালোবরণ ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রও গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া অতর্কিত ভাবে কপিরাজ বালীর প্রাণ বিনাশ করিলেন। ইহাকে ব্যাধের আচরণই বা বলি কেন? ইহা তো ব্যাধের আচরণ অপেক্ষাও ঘৃণিত! যে জন্তুর মাংস লোকে খায়, বা যাহার চর্ম্ম লোকে ব্যবহার করে, ব্যাধ কেবল সেই জন্তুকেই হত্যা করে—যাহার মাংস কেহ খায় না, যাহার চর্ম্ম কেহ ব্যবহার করে না, এমন বানরকে ব্যাধও অনর্থক হত্যা করে না। গৃহস্থের অনিষ্ট-সাধনই যেমন মূষিকের স্বভাব, তাই মূষিক যেমন নিজের খাদ্য না হইলেও গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া থাকে,—তদ্রূপ কেবল নিষ্ঠুরতাই যাহাদের মজ্জাগত স্বভাব, নিজের অপর কোনও স্বার্থ না থাকিলেও কেবল নিষ্ঠুরতা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই তাহারা অনর্থক জীবের প্রাণ বিনষ্ট করে। বালি-বধে রামচন্দ্রের এইরূপ স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে (কাঠিন্য)। ইহাতে তাঁহার কুলধর্ম্মের মর্য্যাদা-জ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে! ক্ষত্রিয় সম্মুখ-সমরেই আততায়ীকে আহ্বান করেন, গুপ্তহত্যা ক্ষত্রিয়ের কুলোচিত মর্য্যাদা-জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। আর এই নিরপরাধ বালীকে কেন তিনি চোরের মত হত্যা করিলেন, তাহা যদি শুন, ভ্রমর, তাহা হইলে তোমার প্রভুর চরিত্র-সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত রহস্য তুমি জানিতে পারিবে। রামচন্দ্র নাকি জটা-বল্কল ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে কয়েক বৎসরের জন্য বনে গিয়াছিলেন; সন্ন্যাসী হইয়া বনে গমন-কালেও নিজের যুবতী স্ত্রীটীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তিনি ভুলেন নাই (কামুকত্ব ও ঈর্ষা); যাহা হউক, গভীর বনমধ্যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে কে এক রাক্ষস নাকি তাঁহার পত্নীটীকে কুটীর হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া

যায়; জটাবল্কল-ধারী অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী রামচন্দ্র কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া যখন পত্নীটীকে দেখিতে পাইলেন না, ইতস্ততঃ খুঁজিয়াও কোথাও পাইলেন না, তখন সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর নাকি একেবারে করিণীহারা মদোন্মত্ত করীর মত হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, অনেক বিনিদ্র রজনীর চিন্তা-ভাবনা, অনেক অনশন-দিবসের অনুসন্ধানের পরে তিনি জানিতে পারিলেন—কে তাঁহার হৃদয়-রত্নটী অপহরণ করিয়াছে। তাহার উদ্ধারের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শেষে বালীর সহোদর সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুতা করিলেন। বালি-সুগ্রীবের ছিল ভ্রাতৃ-বিরোধ; স্ত্রীর উদ্ধারের নিমিত্ত সুগ্রীবের সহায়তা অপরিহার্য্য জানিয়া সুগ্রীবকে বশীভূত করিবার অভিপ্রায়েই তিনি সুগ্রীবের শত্রু বালীকে হত্যা করিলেন—তাহাও আবার গোপনে! বালি-বধের গূঢ় রহস্যও যে রামচন্দ্ররূপী তোমার প্রভুটীর স্ত্রী-পারতন্ত্র্য, (কামুকত্ব ও ঈর্ষা), তাহা বোধ হয় তুমি এখন বুঝিতে পারিয়াছ ভ্রমর। যাহা হউক, তিনি বালীকে এক পলকেই বধ করিলেন—বালীকে বেশীক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই; রামচন্দ্রের নিষ্ঠুরতারূপ ঘোর-তমসাচ্ছন্ন-রজনীতে পলক-ব্যাপী-বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় ইহাই একমাত্র তাঁহার কৃপার ক্ষীণ হাসি। পঞ্চবটীবনে তিনি যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুনিলে তোমার শরীর শিহরিয়া উঠিবে—বিস্ময়ে তুমি অবাক্ হইয়া যাইবে, ভ্রমর! তুমি বলিতেছ, তোমার প্রভুটী অত্যন্ত কোমল-হৃদয়; তুমি কিরূপ ভ্রান্ত, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার পঞ্চবটী-কীর্ত্তির কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। পরমসুন্দর যুবাপুরুষ রামচন্দ্রকে দূর হইতে দর্শন করিয়া শূর্পণখা-নাম্নী কোনও এক অনূঢ়া উদ্ভিন্ন-যৌবনা রমণী কামবাণে খিন্না হইয়া সঙ্গ-লাভের দুরাশায় রামচন্দ্রের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিল—ইহাই তাহার অপরাধ; রামচন্দ্র তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া চিরকালের জন্য সেই হতভাগিনীকে পুরুষ-সমাজের অস্পৃশ্য, এমন কি অদৃশ্যা করিয়া দিলেন। ভ্রমর! ইহাই কি তোমার প্রভুটীর কোমল হৃদয়ের বিলাস-বৈচিত্র্য? যদি সেই হতভাগিনী দ্বিচারিণী হইত—তাহা হইলেও না হয় মনে করিতাম, তাহার পাপের উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে। কিন্তু সে যে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত অস্পৃষ্ট-ভ্রমর-কমলের ন্যায়

তিনি সূর্পণখার প্রতি এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করি ভ্রমর? বৈরাগ্য-রক্ষার জন্য যাঁর এত প্রবল আগ্রহ, তিনি কি কখনও একাকিনী যুবতী স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করেন (কামুকত্ব ও ঈর্ষা)? যদি বল, হতভাগিনী সূর্পণখা কামাতুরা হইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিল—এই কামাতুরতার জন্য তিনি তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন। এ কথা শুনিলে, এই দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় ভ্রমর! এ যুক্তি, অন্যের পক্ষে খাটিলেও খাটিতে পারে, কিন্তু রামচন্দ্রের পক্ষে মোটেই খাটে না ভ্রমর! তিনি নিজেই যে স্ত্রী-পরতন্ত্র ছিলেন, স্ত্রীর হাতের ক্রীড়া-পুত্তলিকা ছিলেন—নচেৎ স্ত্রীর অন্যায় আব্দার রক্ষার নিমিত্ত, স্ত্রীর ইঙ্গিত-মাত্রেই একটী নিরপরাধ স্বর্ণ-মৃগকে তিনি কোন প্রাণে বধ করিলেন? (কামিত্ব, কাঠিন্য ও ঈর্ষা)।

এই তো গেল তাঁর একজন্মের বিবরণ; তাঁর আর একজন্মের কথাও একটু শুন ভ্রমর! সেইবার তিনি জন্মিয়াছিলেন ব্রাহ্মণের ঘরে—বামন-রূপে। কিন্তু তাঁহার আকৃতির খর্ব্বতার খেদ, তিনি বোধ হয় তাঁহার ধূর্ত্ততার বিপুলতা-দ্বারাই পূরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সেইবারও অবশ্য তাঁর স্বভাবের পরিচায়ক কালো বর্ণটী ছিল। তিনি পরম-ধার্ম্মিক বলি-মহারাজের যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন; বলি-মহারাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে তাঁহার অর্চ্চনাদি করিলেন; তিনি তাঁহার পূজোপহার গ্রহণ করিলেন, পরে ত্রিপাদ-ভূমি দক্ষিণা-স্বরূপ যাচ্ঞা করিলেন। সরল-হৃদয় পরম ধার্ম্মিক বলী তৎক্ষণাৎই সম্মত হইলেন। কিন্তু পরম-ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণরূপী কালো বামন তাঁহার চরণের বিশালতা প্রকটিত করিয়া তিন পাদ-ক্ষেপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল অধিকার করিয়া বসিলেন—ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য হইতে বলীকে বঞ্চিত করিয়া ভূ-বিবরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন! কাক যেমন—যে স্ত্রীলোক তাহাকে আহার্য্য দেয়, সেই আহার্য্য খাইয়া, তাহাকেই বেষ্টন করিয়া কা-কা-শব্দ করিতে থাকে, আর সেই শব্দে তাহার সজাতীয় অন্যান্য কাক আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহায়তায় সেই স্ত্রীলোকটীরই কদর্থনা করিতে থাকে—এই ব্রাহ্মণরূপী কালো বামনও ধর্ম্ম-প্রাণ সরল-হৃদয় বলী-মহারাজের তদ্রূপ কদর্থনা করিয়াছেন, (ধূর্ত্ততা)। এ বারেও তিনি তাঁহার কুলধর্ম্ম তাঁহার মতনই রক্ষা করিয়াছেন! ব্রাহ্মণ হইবেন নিষ্কিঞ্চন অকৈতব—কিন্তু কালো বামন-ব্রাহ্মণ—ত্রৈলোক্যের

সাম্রাজ্যের জন্য লুব্ধ হইলেন—তাহাও আবার বঞ্চনাদ্বারাই লাভ করিলেন !!!

তাই বলি, ভ্রমর ! তোমার ঐ কালো প্রভুটীর সঙ্গে বন্ধুতা করা একেবারেই নিরাপদ নহে (ভীতি)। যার বর্ণ কালো, তার অন্তর কখনও,—কোন জন্মেই সাদা হইতে পারেনা, সরল হইতে পারে না; সুতরাং তাহাতে আসক্তি-স্থাপন কোনও মতেই সঙ্গত নহে। বর্ণই লোকের স্বভাবের পরিচয় দেয়; তোমার প্রভুটী হইলেন কালো, আর আমরা হইলাম গৌরাঙ্গী; তাঁহার বর্ণ যেমন আমাদের বর্ণের বিপরীত, তাঁহার স্বভাবও তদ্রূপ আমাদের স্বভাবের বিপরীতই হইবে; সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদের সখ্য কোনও মতেই নিরাপদ হইতে পারে না, ভ্রমর !"

ভ্রমরটী আবার গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া উঠিল। ভানু-নন্দিনী মনে করিলেন তাঁহার কথা শুনিয়াই ভ্রমর বুঝি বলিতেছে—"রাধে ! কৃষ্ণ কালো বলিয়া তাঁহার চিত্তটীও কালো, অশুদ্ধ; আর তুমি গৌরাঙ্গী বলিয়া তোমার চিত্তটীও গৌর—বিশুদ্ধ, ইহাই তুমি বলিলে। কিন্তু বিশুদ্ধ-চিত্তা হইয়া তুমি কেন প্রতিমুহূর্ত্তেই পরনিন্দা (কৃষ্ণের নিন্দা) করিতেছ ? ইহা তো বিশুদ্ধ-চিত্ততার পরিচায়ক নহে ?"

ভ্রমরের এইরূপ উক্তি অনুমান করিয়া ভানু-নন্দিনী বলিলেন—"ভ্রমর ! দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ। ভ্রমর ! তোমার এ কি রকম বিচার ? যিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে অসহ্য দুঃখে জর্জ্জরিত করিতেছেন, আমরা তাঁহার কথাগুলির অর্থও আলোচনা করিতে পারিব না ? আর ইহাতে নিন্দাই বা কোথায় ? আমরা তো তাঁহার সম্বন্ধে কোনও মিথ্যা কথা বলিতেছি না ? যাহা যথার্থ সত্য, তাহাই বলিতেছি, ইহাতেও কি তাঁহার নিন্দা করা হইল ? তা নিন্দাই হউক, আর যথার্থ কথা বলিতেছি বলিয়া অনিন্দাই হউক,আমরা তাহার কথা ত্যাগ করিতে পারিব না—ইহা আমাদের পক্ষে দুস্ত্যজ্য। আমরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাঁর কথা তো ত্যাগ করিতে পারিতেছি না ? কিরূপেই বা ত্যাগ করিব ? তাঁহার আচরণে আমরা যে যাতনা ভোগ করিতেছি—এ যাতনা তো আমাদের নিত্য সহচর; এই অসহ্য যাতনাই যে তাঁহার আচরণের কথা আমাদের মনের মধ্যে স্ফুরিত করিয়া দিতেছে; তৎসম্বন্ধীয় কথার প্রবল বন্যায় আমাদের মন যখন প্রপীড়িত হইয়া পড়ে, তখন স্বতঃই ঐ কথার স্রোত

মুখ-বিবর-যোগে বাহির হইয়া পড়ে — কিরূপে আমরা বন্যার বেগ দমন করিব ভ্রমর ?"

রসিক ভক্তগণের আস্বাদনের নিমিত্ত, এই প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণকমল গোস্বামীর একটী পদ এস্থলে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না :—

যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল,
"পোড়া" অন্তরে কি ভাল তার ?
কাল ভালবেসে, ভাল কোন্ কালে হয়েছে কা'র ?
না বুঝিয়ে ভ'জে কাল, দুঃখে ম'জে গেল কাল,
কাল ভালবেসে, হ'ল আসন্ন-কাল গোপিকার।
এক কালার কথা বলি, ছিল বামন মহাছলী,
তারে ভালবেসে, বলীর উপকারে অপকার।
ভুলিয়ে বলীর বলি, ত্রিপাদ-ভূমি ছলে ছলি,
ছলিয়ে বলীর বলি, "তারে" পাতালে দিল আগার।
রামচন্দ্র ছিল কাল, সূর্পণখা বেসে ভাল,
সঙ্গ-আশে পাশে গেল, তারে কৈ'ল নাসাকার।
ছিল সীতা মহাসতী, নির্দ্দোষে বলে অসতী,
ষষ্ঠমাসের গর্ভবতী, বনে কৈ'ল পরিহার।

—স্বপ্নবিলাস।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

শ্রীপাট পানিহাটী-নিবাসী পরম-ভাগবত পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। বহু প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ-সমুদ্র-মন্থন করিয়া তিনি যে "বৈষ্ণবচরিতাভিধান" সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। সম্প্রতি প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থের অনুসন্ধানে তিনি মানভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়াছিলেন;

অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াও আনিয়াছেন; এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে অনেক অপ্রকাশিত গ্রন্থও আছে। তিনি শীঘ্রই এ সমস্ত গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ লক্ষ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পরবর্ত্তী মহাজনগণও অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে অতি অল্প কয়খানি গ্রন্থই আজকাল প্রচলিত আছে; অনেক গ্রন্থের খবরই আমরা রাখিনা। কত স্থানে অমূল্যরত্ন-স্বরূপ কত গ্রন্থ হয়তো অযত্নে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে; এ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ কোনও অনুসন্ধানই কেহ নেন নাই। শ্রদ্ধেয় ভট্ট মহাশয় প্রাচীন-গ্রন্থানুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া বৈষ্ণব-সমাজকে বাস্তবিকই অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের অনুরোধ, যাঁহাদের ঘরে প্রাচীন কোনও গ্রন্থ আছে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া ভট্ট মহাশয়কে সংবাদ জানান, তাহা হইলে তাঁহার প্রারব্ধ কার্য্যের বিশেষ আনুকূল্য হইবে।

বিগত অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ-মাসের মাধুকরী-পত্রিকায় নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ-সম্বন্ধে পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল-গোস্বামি-মহোদয়ের একখানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের একস্থানে প্রভুপাদ লিখিয়াছেন :— "শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা আস্বাদন করিতে হইলে তদনুকূল পার্ষদ-দেহ-ভাবনা সাধককে অবশ্যই করিতে হইবে।" এই উক্তির পাদটীকায় মাধুকরীতে লিখিত হইয়াছে— "প্রভুপাদের দ্বিতীয় পত্রে এই মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।" অথচ দ্বিতীয় পত্রখানি মাধুকরীতে মুদ্রিত হয় নাই। পাদটীকা-অনুসারে বুঝা যায়, পার্ষদ-দেহ-ভাবনার প্রয়োজন নাই, ইহাই প্রভুপাদের পরিবর্ত্তিত মত।

প্রভুপাদের মুদ্রিত পত্রখানির একস্থানে উক্ত পার্ষদ-দেহ-সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে :— "সেই পার্ষদ-দেহের মধ্যে ব্রাহ্মণাভিমানী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রাহ্মণাভিমানী-পার্ষদই অনুকূল।"

যাহা হউক, মাধুকরীর পাদটীকার উল্লেখ করিয়া আমরা প্রভুপাদের নিকটে চিঠি লিখিয়াছিলাম। উত্তরে, শ্রীনবদ্বীপ হইতে ৮।৫।২৬ ইং তারিখের পত্রে, প্রভুপাদ লিখিয়াছেন :— "আমার দ্বিতীয় পত্রে বিশেষ কিছু মতের পরিবর্ত্তন

ঘটে নাই। পূর্ব্বমতই সমর্থিত হইয়াছিল। তবে মহাপ্রভুর পার্ষদ-দেহের চিন্তা ব্রাহ্মণ-ভিন্ন-জাতিরূপেও করা যায়—যদি সাধকের ইচ্ছা হয়। তাহাতে বাধা দেওয়ার কোনও প্রমাণ বা যুক্তি নাই, এতটুকু মাত্র অধিক কথা ছিল। সম্পূর্ণ মত-পরিবর্ত্তনের কথা অমূলক।"

শ্রীধাম-নবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামি-মহাশয়ের অনুকূলে একখানা আবেদনপত্র এইবারেও বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে মুদ্রিত হইল। শ্রীবিগ্রহের সেবা লইয়া তিনি বাস্তবিকই বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। অর্থের অসচ্ছলতাবশতঃ তিনি শ্রীমন্দিরও করিতে পারিতেছেন না, তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে সেবার বন্দোবস্তও করিতে পারিতেছেন না।

ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের ন্যায়, কোনও ভক্তের ভজনের আনুকূল্য করাও ভক্তির পুষ্টিসাধক—ইহা বৈষ্ণব-মাত্রেই জানেন। তাই আমরা আশা করি, ভজনানুরাগী বৈষ্ণবমাত্রেই গোস্বামি-মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহ-সেবার আনুকূল্য করিবেন। যিনি যাহা দান করিবেন, তাহার কোনও অংশই শ্রীবিগ্রহ-সেবার কার্য্য ব্যতীত অন্য কোনওরূপে ব্যয়িত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সজ্জনগণের অর্থানুকূল্যে গোস্বামি-মহাশয় তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের অভিলাষানুরূপ সেবার বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছেন শুনিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

জ্যৈষ্ঠমাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুত নলিনীকুমার ভদ্র মহাশয় "হাজো" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজাবরুয়া প্রণীত "শ্রীশঙ্করদেব আরু শ্রীমাধবদেব" নামক আসামী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিয়াছেন:— "শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া, মণিপুরে আসিয়া, সেখানেও ধর্ম্মপ্রচার করেন। সেখান হইতে সন্ন্যাসী-বেশে আসামে আসিয়া তিনি হাজোতেও কিছুদিন ছিলেন।"

হাজো, আসামের অন্তর্গত একটী স্থান, গৌহাটি হইতে পনর মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে। শ্রীযুত লক্ষ্মীনাথ বেজাবরুয়া মহাশয় কোন প্রমাণ-বলে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর আসামে যাওয়ার কথা লিখিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবগ্রন্থে

ইহার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসার পরে, নীলাচল ছাড়িয়া প্রভু কেবল একবার গৌড়দেশে গিয়াছিলেন, আর একবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যাওয়ার কথা কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। যেবার গৌড়ে যায়েন, সেবারও কানাইর নাটশালা হইতেই নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী।

নিত্য হরিদ্বেষী দৈত্য হিরণ্যকশিপু
হরিপরায়ণ পুত্র ধীমান্ প্রহ্লাদে
সুধাইল মূর্ত্তিমান ক্রোধরিপুসম
"কে করিল মৃত্যুমুখে তোরে পরিত্রাণ ?"
"নিত্যসখা হরি মোর সতত রক্ষক ;"
"সেই চিরশত্রু হরি কোথা বর্ত্তমান ?"
"আব্রহ্ম-স্তম্বের মাঝে বিদ্যমান তিনি,
অধিক কি হেরি তারে এ স্তম্ভেরও মাঝে।"
অমনিই বহির্গত বিদ্বেষের অসি !
অমনিই বহির্গত নৃসিংহ শ্রীহরি,
দুষ্টের দমন শিষ্ট-পালনের তরে—
বিকট ব্রহ্মাণ্ড ভেদী ধ্বনির ভিতর !
এ হিরণ্য সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীচতুর্দ্দশী
উজলিল চিরতরে ভক্তিকীর্ত্তি ঘোষি।

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

(মাসিক-পত্রিকা।)

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা ॥

১ম বর্ষ, আষাঢ়—১৩৩৩ ৩য় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন লিখিত]

শ্রীনামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে হৃদয়ে একটা ভরসার সঞ্চার হয়; "বলান্নময়তীতি" নাম—শ্রীনাম বলপূর্ব্বক নামাশ্রয়ীর চিত্তকে নমিত করে। মায়াময়-অভিমানই, ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রধান অন্তরায়। অভিমানের ফলে হৃদয়ে যেরূপ মালিন্য ও কাঠিন্য জন্মে, এমন আর কিছুতেই হয়না। অনেক বস্তু আছে, যাহাদের প্রভাবে চিত্ত কঠিন হইয়া যায়, মলিন হইয়া যায়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অভিমানেই সর্ব্বপ্রধান। অভিমান-কঠিন চিত্তে কোমল-স্বভাবা ভক্তিদেবী আসন গ্রহণ করিতে পারেন না; তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন:—

অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সে-ই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা

অভিমানের অনুগামী দোষও অনেক; অভিমান হইতে পরনিন্দা, পরচর্চা এমন কি শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সম্বন্ধেও দোষদৃষ্টি আসিয়া পড়ে। এই সাংঘাতিক অন্তরায়রূপ অভিমানকে বিদূরিত করিবার পক্ষে অন্য-নিরপেক্ষ সামর্থ্য একমাত্র শ্রীনামেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যে ব্যক্তি কোনও প্রকারেই কাহারও নিকটে নত হইতে জানেনা বা পারেনা, তাহাকে তৃণ হইতেও নীচ করিবার শক্তি—কাহারও কোনও কথা বা আচরণ সহ্য করিবার সামর্থ্য যাহার নাই, তাহাকে বৃক্ষসম সহিষ্ণু করিয়া লওয়ার শক্তি,—যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই নিজের সম্মান লইয়াই ব্যস্ত, তাহাকে নিজ-সম্মানের অপেক্ষারহিত করিবার শক্তি—যে ব্যক্তি সম্মানার্হ ব্যক্তিকেও প্রাণ খুলিয়া সম্মান দিতে কুণ্ঠিত, সর্ব্বোত্তম হইয়াও শ্বপচাদি-সর্ব্বজীবে সম্মান দান করিবার মতন তাহার চিত্তের অবস্থা জন্মাইবার শক্তি—মুখ্যতম ভাবে একমাত্র শ্রীনামেরই আছে।

শাস্ত্রে অনেক রকম সাধনের কথা উল্লিখিত আছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে শক্তিমান্ পতিত-পাবন শ্রীনামের মত দ্বিতীয় কিছুই নাই। অন্যান্য সকল সাধনই দুর্ব্বল—একমাত্র শ্রীনামই বলীয়ান্; কেননা, অন্যান্য সকল সাধনই প্রায়শঃ অন্য-অপেক্ষা দ্বারা প্রতিহত হয়; কিন্তু শ্রীনাম অন্য অপেক্ষার ধার ধারেন না। যে অন্যের অপেক্ষা রাখে, সে ই দুর্ব্বল; আর যে অন্যের কোনও রূপ অপেক্ষা রাখেনা, সে-ই সবল বা বলীয়ান্।

অন্য যত সাধন আছে, সকল সাধনেই দেশ-কালাদির কিছু না কিছু অপেক্ষা আছে; কিন্তু শ্রীনাম-সাধনে দেশ, কাল বা পাত্রাদির কোনও অপেক্ষার লেশ-মাত্রও নাই। এ বিষয়ে সমস্ত শাস্ত্রই অবিসংবাদিত ভাবে উচ্চৈঃস্বরে ফুৎকার করিয়া রটনা করিতেছেন:—

ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা।
চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ॥

অন্যান্য ভক্তি-অঙ্গের সাধনে অধিকারি-গত বিচারের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী। চৈঃ চঃ।

এই প্রমাণের অভিপ্রায় এইযে, ভক্তিমার্গের সাধকের, জাতিগত, বর্ণগত ও গুণগত কোনও অপেক্ষা না থাকিলেও যে ভক্তি অঙ্গের [illegible]

করা হইবে, সেই ভক্তি-অঙ্গের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। কারণ, অনুষ্ঠেয় ভক্তি-অঙ্গের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে, তাহার মাহাত্ম্যের প্রতি আস্থা না থাকিলে, সাধকের চিত্তে বিপরীত ভাবনার উদয় হইতে পারে, সুতরাং ভক্তি-অঙ্গের সাধনে তাহার আদর ও আবেশ হইতে পারেনা।

পূর্ব্বোক্ত পয়ারার্দ্ধে "শ্রদ্ধাবান্" পদটী "ভক্তি-অধিকারী" পদের বিশেষণ মাত্র—ভক্তিতে অধিকার-বিষয়ে হেতু নহে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ না হইলে ভক্তি-সাধন করিতে পারিবেইনা—এরূপ অর্থ নহে। শ্রুতির একটী বাক্য লইয়া এবিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত।

এই শ্রুতিতে "স্বর্গকাম" পদটী অশ্বমেধ-যজ্ঞাধিকারীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা অশ্বমেধ-যজ্ঞাধিকারিত্বের হেতু সূচনা করেনা। অর্থাৎ স্বর্গকাম না হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেনা, এইরূপ অর্থ নহে। শ্রীপৃথু মহারাজ ও শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ প্রভৃতি স্বর্গকামী ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অশ্বমেধ-যজ্ঞে তাঁহাদের অধিকার ছিল। সুতরাং স্বর্গকামত্ব অশ্বমেধ যজ্ঞাধিকারিত্বের হেতু নহে; উক্ত শ্রুতি-বচনে "স্বর্গকাম"-শব্দও হেতু সূচক বিশেষণ নহে। ইহা হেতু-সূচক বিশেষণ হইলে স্বর্গকাম ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারওই অশ্বমেধ-যজ্ঞে অধিকার থাকিতনা।

এইরূপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উদ্ধৃত পয়ারার্দ্ধে "শ্রদ্ধাবান্" পদটী ভক্তি-অধিকারিত্বের হেতুভূত নহে; হেতুভূত বিশেষণ হইলে,—শ্রদ্ধাবান না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তি-সাধনে কাহারওই অধিকার জন্মিতে পারিবেনা—এইরূপ অর্থ হইয়া পড়িত। কিন্তু

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়না কথা।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত-বচনে দেখা যায়, সাধুদিগের সঙ্গে হৃৎকর্ণ-রসায়ন হরি-কথা শ্রবণরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে শ্রদ্ধাদির উদ্ভব হয়। এই প্রমাণে, শ্রদ্ধা জন্মিবার পূর্ব্বেও ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে অধিকার দেখা যায়; সুতরাং শ্রদ্ধা, ভক্তি-অধিকারিত্বের হেতু নহে, ইহাই বুঝা যাইতেছে।

তথাপি, অর্থাৎ যদ্যপি শ্রদ্ধার অভাবসত্ত্বেও ভক্তি সাধনে অধিকারী হইতে পারাযায়—তথাপি, (শ্রীনাম ব্যতীত) অন্যান্য ভক্তি-অঙ্গের সাধনে তত্তদঙ্গের প্রতি কিছু কিছু বিশ্বাস থাকা আবশ্যক (নচেৎ অনুষ্ঠানে আদর এবং আবেশ থাকিতে পারেনা;) এবং এই সকল ভক্ত্যঙ্গের সাধনে দেশ-কাল-পাত্রাদির অপেক্ষাও আছে। কিন্তু শ্রীনামাশ্রয়-সম্বন্ধে এইরূপ কোনও অপেক্ষারই স্থান নাই।

পদ্যাবলী-গ্রন্থে শ্রীলক্ষ্মীধর-নামক কোনও কবি শ্রীনামের মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনমংহসা
মাচণ্ডালমমূকলোক-সুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
ন দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষ্যতে
মন্ত্রো২য়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ-নামাত্মকঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-নামের মহিমা আর কি বলিব? শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ-মন্ত্র কৃতচিত্ত অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগেরও আকর্ষণ-বিদ্যা—এই শ্রীকৃষ্ণ-নাম জীবন্মুক্ত-অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকেও আকর্ষণ করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন। ইহার উচ্চারণ মাত্রে প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত সমস্ত মহাপাতক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীনামে প্রমথন ও প্রক্ষোভণ—এই শক্তিদ্বয় বর্ত্তমান আছে; তাই, যাহাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেরও অধিকার নাই, এমন ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই এই নাম-গ্রহণের যোগ্যতা আছে। অধিকন্তু এই শ্রীনাম—বাক্‌শক্তি-রহিত ব্যক্তি ব্যতীত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের পক্ষেই সুলভ। ইহাতে অধিকারি-সম্বন্ধে কোনও রূপ বিচার নাই। শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভের কথা তো দূরে—এমন কি মুক্তি-সম্পত্তিও দাসীর ন্যায় সাধকের অনুসরণ করিয়া থাকে। মণিমন্ত্রাদির দ্বারা বশীকৃত কোনও জন্তু যেমন তাহার প্রতি বিরক্তভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না—শ্রীনামাশ্রয়ীর সম্বন্ধে মুক্তি-সম্পত্তির অবস্থাও তদ্রূপ; শ্রীনামাশ্রয়ী মুক্তি-সম্পত্তির প্রতি ফিরিয়া চাহেন না, মুক্তি-সম্পত্তির প্রার্থনাও করেন না—

থাকে, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। মুক্তি সর্ব্বদা নামাশ্রয়ীর করতলগত। এইরূপে, আকর্ষণ, উচ্চাটন, প্রমথন, প্রক্ষোভণ, বশীকরণ এবং সংসার-দুর্ব্বাসনার উচ্ছেদ-সাধন করে বলিয়া মারণ—শ্রীনামের এই ছয় প্রকার কার্য্যকারিত্বই দেখা যাইতেছে।

আবার, অন্যমন্ত্রাদি দীক্ষা, দক্ষিণা ও পুরশ্চরণাদির অপেক্ষা করে; দীক্ষাদি ব্যতীত এই সকল মন্ত্র সিদ্ধ ও কার্য্যকরী হয় না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ-মন্ত্রের এইরূপ দীক্ষা-পুরশ্চরণাদির কোনও অপেক্ষাই নাই; মানবের জিহ্বা-স্পর্শ-করিবা মাত্রই শ্রীনাম এক-কালে সকল প্রকার দুর্ব্বাসনাকে ধ্বংস করিয়া প্রেমের আবির্ভাব করাইয়া থাকে।

এ স্থানে একটী বিচার্য্য বিষয় এই যে, শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, যদি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র দীক্ষাদির অপেক্ষা না করিল, তবে আর স্বতন্ত্ররূপে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি আছে? ইহার উত্তর এই যে, দীক্ষাগ্রহণ বিনা কেবল শ্রীনামাত্মক-মন্ত্রে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইতে পারে। কিন্তু প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিলাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় অত্যন্ত আবশ্যক।

শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ দীক্ষা গ্রহণের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। যদ্যপি শ্রীভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ, তত্র বিশেষেণ নমঃশব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ, শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিত-শক্তিবিশেষাঃ, শ্রীভগবতা সমমাত্ম-সম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরম-পুরুষার্থফলপর্য্যন্তদান-সমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিক-সামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা। উচ্যতে, যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি-সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতি-ভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি। তত উভয়মপি নাসমঞ্জসমিতি তত্র তত্তদপেক্ষা নাস্তি।

ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,—মন্ত্র শ্রীভগবন্নামাত্মক। অর্থাৎ মন্ত্রটী শ্রীভগবানেরই নাম। বিশেষতঃ শ্রীনাম নমঃ স্বাহা স্বধা প্রভৃতি বৈদিক প

তান্ত্রিক শব্দ-দ্বারা অলঙ্কৃত। শ্রীভগবান ও শ্রীঋষি প্রভৃতিও ঐ মন্ত্রে শক্তি-বিশেষ সমর্পণ করিয়াছেন। এবং ইহা শ্রীভগবানের সহিত সাধকের দাসাদি একতর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। দীক্ষাগ্রহণ বিনা শ্রীভগবানের সহিত দাসাদি সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কেবল শ্রীনাম দীক্ষাগ্রহণ বিনাও পরম-পুরুষার্থ শ্রীভগবৎপ্রেম পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু দাসাদি সম্বন্ধের অভাব-জন্য সেবা-সম্পত্তিলাভে অধিকারিতা ঘটে না। প্রেম লাভ করিয়া সালোক্যাদি মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব শ্রীনাম হইতে মন্ত্রের সামর্থ্য অতিশয় অধিক থাকা স্বত্বেও, শ্রীনাম যখন দীক্ষাদির অপেক্ষা করে না, তখন মন্ত্রে দীক্ষাদির অপেক্ষা থাকিবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। যদ্যপি স্বরূপতঃ মন্ত্রে দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই বটে, তথাপি প্রায়শঃই দেহাদি-সম্বন্ধহেতু কদর্য্য-আচরণকারী বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের চিত্তকে দেহাদি-অভিনিবেশ হইতে সঙ্কুচিত করিবার জন্য শ্রীমদ্ ঋষিগণ এই অর্চ্চন-মার্গের কোন কোন মর্য্যাদাবিশেষ স্থাপন করিয়াছেন। এবং ঐ সমস্ত মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্র তাহার প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান করিয়াছেন। অতএব শ্রীনামে দীক্ষার আবশ্যকতা নাই এবং মন্ত্রে দীক্ষার আবশ্যকতা আছে—এই দুই বাক্যের কোন বিরোধ রহিল না।

এ বিষয়ে সুধীগণের বিবাদ করিবারও কোন আবশ্যকতা নাই। যেহেতু শাস্ত্রকার ঋষিগণ কোন কোন বিষয়ে বিশেষ মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। যেমন গঙ্গা হইতেও যমুনার অধিক মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু অস্পৃশ্যজন-স্পর্শে গঙ্গার যেরূপ পবিত্রতা নষ্ট হয় না, যমুনার সেইরূপ কোন মাহাত্ম্য বর্ণিত নাই। তথাপি গঙ্গা যমুনার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। তদ্রূপ নাম হইতে মন্ত্রের অধিক সামর্থ্য বর্ণিত হইলেও, ঋষিগণ মন্ত্রগ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতেও বিরোধ করিবার কিছুই নাই।

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়-পূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন দশম স্কন্ধে শ্রীশ্রুতিগণ বলিতেছেন,—

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।

ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরাজলধৌ ॥

হে অজ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার ভজনানুষ্ঠানে মনকে নিশ্চল করিবার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে হয় না। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দে দৃঢ়ভক্তি করিলেই চিত্তের নিশ্চলতা অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু শাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে যে,—

সর্ব্বমেতদ্ গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহঞ্জসা জয়েৎ।

শ্রীগুরুদেবে একান্ত ভক্তি করিলেই পুরুষ সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্নকে অনায়াসে জয় করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীগুরুদেবে ভক্তি বিনা চিত্তজয়ের উপযোগী যোগ প্রভৃতি সাধনও ব্যর্থ হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যেই শ্রুতিগণ বলিতেছেন,—বিজিত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা এবং পঞ্চপ্রাণের দ্বারা যাহারা অসংযত চিত্তরূপ দমনের অযোগ্য অশ্বকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা করে, তাহারা শ্রীগুরুদেবের চরণসেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বহুশত উপায় অবলম্বনে খিন্ন হইয়া, পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইয়া এই সংসার-সমুদ্রে অস্বীকৃত-কর্ণধার বণিকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বণিক যেরূপ উত্তম কর্ণধারের সাহায্য না লইয়া সমুদ্র পার হইতে গেলে সমুদ্রে মগ্ন হয়, তদ্রূপ যদি কেহ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় না করিয়া যোগাদি সাধন অবলম্বন পূর্ব্বক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে নানা ভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে হয়। এই জন্য শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।

শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিতে হইলে সমিৎপাণি হইয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ আচার্য্য-বিশিষ্ট পুরুষই ভগবৎ তত্ত্ব সম্যক অবগত হইতে সমর্থ।

শ্রীগুরুদেবের কৃপাব্যতীত কখনও হৃদয়ে ভগবদ্ভাবের উদ্রেক হইতে পারে না। শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিলে কেবল যে চিত্ত সংযত হয় তাহা নহে, ইহাতে সংসার-বন্ধনও ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট পন্থায় ভগবদ্ভজন

করিতে করিতে আনন্দের অনুভব হইলেই মন আপনা হইতেই নিশ্চল হইয়া যায়। অতএব শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য।

বিশেষতঃ শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-শ্রবণে "আমার শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে কি প্রয়োজন আছে? শ্রীনামই আমার সর্ব্বার্থ-সাধক হইবে।" এই ভাব হৃদয়ে পোষণ জন্য দশটী নামাপরাধের মধ্যে শ্রীগুরুর অবজ্ঞা অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের অবহেলারূপ দ্বিতীয় নামাপরাধটী উপস্থিত হইয়া থাকে। কারণ, শ্রীগুরু একটী তত্ত্ব। এই গুরুতত্ত্বটী দুই প্রকারে বিভক্ত। যথা—সমষ্টি ও ব্যষ্টি। যতদিন পর্য্যন্ত দীক্ষা-গ্রহণ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সমষ্টি গুরুর আরাধ্যত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইহা স্বীকার না করিলে, বৈদিক কর্ম্মাদিতে গুরুপূজা গুরুবরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যেমন শ্রীভগবন্মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলেও শ্রীভগবানের পূজ্যত্ব সর্ব্বকার্য্যেই বিহিত আছে, সেই প্রকার শ্রীগুরুদেব-সন্নিধানে দীক্ষাগ্রহণ না করিলেও শ্রীগুরুপূজা অবশ্যই করিতে হইবে। বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে এবিষয়ে আর অধিক বিস্তার করা হইল না।

দীক্ষাগ্রহণের পরে কিন্তু ব্যষ্টি গুরুর আরাধনা সাক্ষাদ্ভাবে করা কর্ত্তব্য। অতএব এই তত্ত্বের অমর্য্যাদা করিলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং অপরাধী জনার বহুল নাম-কীর্ত্তনেও মনের ভিতরে ঐ অবজ্ঞা-বুদ্ধিটী নিহিত থাকে বলিয়া, কোন সময়েও তাহার প্রেম-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

শ্রীভগবদ্ভক্তিরাজ্যে একাঙ্গ ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অপরাঙ্গ ভক্তির অমর্য্যাদা বা অনাদর অপরাধ-জনক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীপুষ্প-দোল।

আজু কি আনন্দ ভকতবৃন্দ সুরধুনী-তীরে মেলি।
প্রিয় গদাধর গৌরাঙ্গ-সুন্দর করে দোহে ফুলকেলি॥
চন্দ্রকিরণে পুষ্প-কাননে উজল মধুর নিশি।
মলয়-পবন করে বিতরণ সৌরভ দশদিশি॥

মধু সুগন্ধে মধুপবৃন্দে কুসুমে কুসুমে ধাওয়ে।
হেরিয়ে দোহার কুসুম সমর গুন্ গুন্ গীত গাওয়ে॥
একেতো দোহার অঙ্গের শোভায় তুলনায় বলিহারী।
তাহে মনমত ফুল সাজে কত সাজায়েছে মনহারী॥
টগর মালতী গোলাপ সেউতি শেফালি বকুল বেলি।
কুন্দন মল্লিকা রঙ্গন যূথিকা গন্ধরাজ চামেলি॥
চাঁপা নাগেশ্বর কাঞ্চন কেশর কমলজ থলজ ফুলে।
অতসী মাধবী পুন্নাগ করবী রজনী গন্ধাদি ফুলে॥
প্রেমরস ভরে দোহে দোহ-পরে মারে ফুল ছোরি ছোড়ি।
চৌদিকে ভকত বরিষয়ে কত হরি হরি ধ্বনিকরি॥

একেতো শ্রীবৃন্দাবন ফুলের সংসার।
তাহে আরো বৃন্দাদেবীর সৃজন বিস্তার॥
তাহে ধীর সমীরণ যমুনার কূল।
তাহে পূর্ণিমার রাতি সৌরভে আকুল॥
তাহে বিধি সিরজিল ফুলের সমর।
তাহে ব্রজনারী সঙ্গে রসিক-নাগর॥
তাহে সাজি ফুলতূণে ফুল-ধনু করে।
তাহে ফুল বরিষণ দোহে দেহোপরে॥
তাহে অনুগত কত ব্রজগোপী সঙ্গে।
আনন্দে যোগায় ফুল ফুল-রণ-রঙ্গে॥ *

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে নিতি নব লীলা।
কুসুম সমরে আজি সবহু মাতিলা॥
রসবতী নাগরী রসিক নাগর।
ফুল বরিষয়ে জনু বরষা-বাদর॥
কানু মারে ফুল-বাণ আকাশের পথে।
বিথারি আকাশে ফুল ঝরে গোপী-মাথে॥

ধনুকে জুড়িয়া ফুল ব্রজ-গোপী হানে।
আকুল করয়ে শ্যামে হানিয়ে পরাণে॥
কত শত গোপী মেলি কুসুম যোগায়।
কত অনুগত গোপীবৃন্দ ফেলি দেয়॥

ফুল-কুঞ্জবনে ফুল-সিংহাসনে ফুলময় রাধাকান্ত।
ফুল দুজনে ফুল বিভূষণে ফুলময় দোহ তনু॥
ফুলে শিখি-চূড়া ফুলে বেণী বেড়া শিরে শিখি ফুলে ফুলে।
ফুলের মাকড়ী ঝুমকা মাধুরী ফুলের কুণ্ডল দোলে॥
ফুলের লহর ফুল-চন্দ্রহার পাঁচ ফুলে বনমালা।
ফুলের অঙ্গদ ফুলের কঙ্কণ ফুলের তার বাজু-বালা॥
ফুলের কিঙ্কিনী কটীর বন্ধনী ফুলের নূপুর পায়।
ফুলের ভ্রমরী ফুল ছাড়ি ছাড়ি চরণকমলে ধায়॥
ফুল-কুঞ্জ-পরি ফুলে শুক-সারী ফুল-ডালে গীত গায়।
ফুলের পাপড়ি পড়ে ঝরি ঝরি ফুলের আরতি তায়।
ফুলে গোপবালা ফুলের হিন্দোলা ফুলডালে দোলায়েছে।
ফুলের যুগলে দোলে ফুল-দোলে কোন গোপী দোলাইয়াছে॥

শ্রীগোপীনাথ বসাক।

[এই কবিতাটী জ্যৈষ্ঠের সংখ্যার নিমিত্তই প্রেরিত হইয়াছিল এবং জ্যৈষ্ঠের পত্রিকায়ই ইহা প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু অসময়ে আসায় যথাসময়ে পত্রস্থ করিতে পারা যায় নাই। ইহাতে রসিক ভক্তগণের আস্বাদনের অনেক জিনিষ আছে মনে করিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে হইলেও প্রকাশ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—সাঃ সঃ]

গোবিন্দদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন।

[সঙ্কীর্ণ-রসোদ্গার]

আমরা এবারে গোবিন্দদাসের সঙ্কীর্ণ রসোদ্গারের আলোচনা করিব।

শ্রীরূপ-গোস্বামী তাঁহার "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থের "সম্ভোগ"-প্রকরণে লিখিয়াছেন যে,—

"যত্র সঙ্কীর্য্যমাণঃ স্যুর্ব্যলীক-স্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষু-পেশলঃ॥"

অর্থাৎ যেখানে মানান্তে নায়ককর্তৃক প্রযুক্ত আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি উপচারগুলি নায়ক-কৃত অপরাধের স্মৃতি ইত্যাদির দ্বারা 'সঙ্কীর্ণ' অর্থাৎ সংমিশ্রিত হয়, উষ্ণ ইক্ষুর ন্যায় স্বাদু সেই সম্ভোগকে 'সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ' বলা যায়। বস্তুতঃ নায়কের নানা প্রকার স্তুতি-নতি দ্বারা নায়িকার মানভঞ্জন হইলে যখন নায়কের সহিত তাহার পুনর্মিলন ঘটে, তখন নায়িকার মনের অবস্থাটি এক-রকম মিশ্র-ভাবাত্মক হওয়াই স্বাভাবিক বটে। এক দিকে মিলনের আনন্দের মধুরতা, আর একদিকে নায়কের কৃত পূর্ব্ব অপরাধের স্মৃতি-জনিত কিঞ্চিৎ উষ্মা; সুতরাং এই উভয় প্রকার ভাবের সঙ্করতা বা সংমিশ্রণ-হেতু, তৎকালীন সম্ভোগ-সুখটা যে কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও মধুর ইক্ষু-খণ্ডের চর্ব্বণ-জনিত আস্বাদনের মতন একটু স্বতন্ত্র রকমের প্রতীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহের কি কারণ আছে?

গোস্বামি-পাদ তাঁহার গ্রন্থে এই সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের দুইটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পূজ্য-পাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহোদয়ের 'আনন্দচন্দ্রিকা'-নাম্নী টীকা অবলম্বনে উহাদের আভাষ ও সংক্ষিপ্ত রস-বিশ্লেষণ প্রদান করিব; কেন না, তাহা না করিলে, সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগটা বুঝি তেমন উপাদেয় নহে, তপ্ত ইক্ষুখণ্ডের সাদৃশ্যে এরূপ ধারণাও মনে হওয়া বিচিত্র নহে। দৃষ্টান্ত-শ্লোক দুইটী এই, যথা :—

"সাসূয়-জল্পিত-সুধানি সমৎসরাণি
মানোপরাম-রমণীয়-দৃগিঙ্গিতানি।
কংসদ্বিষঃ স্ফুরদমন্দ-সুখাত্মকন্ত-
বিক্রীড়িতানি সহ রাধিকয়া জয়ন্তি॥"

যথা বা :—

"বক্ত্রং কিঞ্চিতদবাঞ্চিতং বিবৃণুতে নাতিপ্রসাদোদয়ং
দৃষ্টিভ্রূ'ক্লতটা ব্যনক্তি শনকৈ রীর্ষ্যাবশেষ-চ্ছটাম্।
রাধায়াঃ সখি সুচয়ত্যবিশদা বাগপ্যসূয়া-কলাং
মানান্তং স্ফুবতী তথাপি মধুরা কৃষ্ণং ধিনোত্যাকৃতিঃ॥

অর্থাৎ কোনও একদিবস পৌর্ণমাসী নিজেই শ্রীরাধাকে প্রসন্ন ও সঙ্কেত-নিকুঞ্জে অভিসার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত করাইয়া, নিজে সুকৌশলে লতাবিতানে লুক্কায়িত হইয়া, লতা-রন্ধ্র-দ্বারে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মানান্তে সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ-লীলা দেখিতে দেখিতে মোহিত হইয়া মনে মনে সেই লীলার নিত্যত্বের কামনা করিয়া করিয়া স্বগত-ভাবে বলিতেছেন— "শ্রীরাধার সহিত কংসারি শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গ-ক্রীড়া-সমূহের বলিহারি যাই! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া অর্থাৎ দোষারোপের ভাব আছে, আবার উহার সঙ্গে সঙ্গেই অমৃতময় আলাপও চলিতেছে; মৎসর অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকার প্রতি বিদ্বেষ-প্রকাশ আছে,—আবার উহার সঙ্গে সঙ্গেই মান-বিরাম-সুলভ মধুর কটাক্ষ-সমূহও চলিতেছে; এই ক্রীড়ায় প্রণয়ি-যুগলের কতই না আনন্দ উচ্ছলিত হইতেছে!"

চক্রবর্ত্তি-পাদ বলিয়াছেন যে, মানান্ত-সম্ভোগের শুধু আদি ও মধ্য অবস্থায়ই এই ভাব-সঙ্করতা সম্ভবপর বটে,—কিন্তু সম্ভোগের শেষ অবস্থায় নহে; গোস্বামি-পাদ প্রথম শ্লোকে সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগের মধ্য-অবস্থারই উদাহরণ দেখাইয়াছেন; সুতরাং তিনি পরবর্ত্তী শ্লোকে আবার উক্ত সম্ভোগের আদি ও মধ্য অবস্থার উদাহরণ এক সঙ্গে প্রদর্শিত করিয়াছেন। গার্গী নান্দীমুখীকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মানান্ত-সম্ভোগ-লীলার রসাস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—"শ্রীরাধার মুখখানি ঈষৎ অবনত, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার মনের সম্পূর্ণ প্রসন্নতা জন্মে নাই; শ্রীরাধার দৃষ্টি ঈষৎ বক্র, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, এখনও ঈর্ষার ভাবটা সম্পূর্ণ দূর হয় নাই; শ্রীরাধার ভাষাও কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট, তাহাতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার মনে অসূয়া-ভাবেরও কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে,—তথাপি সখি! দেখ দেখ, শ্রীরাধার সুমধুর আকৃতিই যেন বলিয়া দিতেছে যে, রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সেই সুমধুর আকৃতি দেখিয়া আনন্দে ভাসিতেছেন।" *

---

* স্বর্গ-গত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংস্করণে উদ্ধৃত শ্লোক-দ্বয়ের অতি অশুদ্ধ ও বিরুদ্ধ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে; বাহুল্য-ভয়ে উহা এ স্থলে আলোচিত হইল না; কৌতূহলী পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।—লেখক।

দেখা গেল, পূজ্য-পাদ গ্রন্থকার কিংবা টীকা-কার ভাব-সঙ্করতা-হেতু 'সঙ্কীর্ণ' সম্ভোগের বিশেষ একটা ভাব-বৈচিত্র্য ও আস্বাদনের অপূর্ব্বতা স্বীকার করা ব্যতীত, উহার কোনও অনুপাদেয়তার ইঙ্গিত করেন নাই; সুতরাং "কিঞ্চিৎ উষ্ণ ইক্ষু-খণ্ডের' দৃষ্টান্ত-দ্বারা শীতল-ইক্ষু-খণ্ড-চর্ব্বণ-প্রিয় কোনও পাঠকের মনে যদি ঈষৎ উষ্ণ ইক্ষু-চর্ব্বণের অনুপাদেয়তার মত সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগের রসাস্বাদনের প্রতিও কিঞ্চিৎ অনাদরই প্রতীত হয়, তাহা বিচার-সঙ্গত হইবে না। গোস্বামি-পাদের উক্ত দৃষ্টান্তের পোষকতায় ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইক্ষু রোপিত হইয়া শীতের প্রারম্ভেই উহা সুপক্ক ও সুমধুর হইয়া থাকে; গ্রীষ্মকালে শৈত্য-সংকৃত মধুর-রস সমধিক প্রীতি-কর হইলেও শীতকালে শীতল ইক্ষু-খণ্ড সমূহ তাদৃশ প্রীতিকর হইতে পারে না; সুতরাং শীতের সময়ে ঈষৎ উষ্ণ ইক্ষু-খণ্ড-সমূহ যেমন আস্বাদন-কারীর অপ্রীতিকর না হইয়া, আস্বাদন-বৈচিত্র্যে বরং অধিক প্রীতিকরই হইয়া থাকে, সেইরূপ মানান্ত-মিলনে ভাব-সঙ্করতা-পূর্ণ সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ-রসই রসজ্ঞ প্রেমিকদিগের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করিয়া থাকে। মানব-চরিত্রের অন্তস্তল-দর্শী মহাকবি গোবর্দ্ধন আচার্য্য এ জন্যই তাঁহার অতুলনীয় কোষ-কাব্য "আর্য্যা-সপ্তশতী"-গ্রন্থে রসজ্ঞ প্রেমিক নায়কের মুখে বলিয়াছেন,—

> "কিঞ্চিৎ কর্কশতামনু রসং প্রদাস্যন্ নিসর্গ-মধুরং মে।
> ইক্ষোরিব তে সুন্দরি! মানস্য গ্রন্থিরপি কাম্যঃ॥"

অর্থাৎ—

> আগে কিছু কর্কশতা করি' প্রকটন,
> পাছে মিষ্ট রস যেবা দেয় গো প্রচুর,
>
> হে সুন্দরি! কাম্য মোর, তোমার তেমন
> ইক্ষু-গ্রন্থি হেন মান-গ্রন্থিও মধুর।

পুনশ্চ স্থানান্তরে—

> "মান-গ্রহ-গুরু-কোপা-দনু দয়িতাত্যেব রোচতে মহ্যম্।
> কাঞ্চনময়ী বিভূষা দাহাঙ্কিত-শুদ্ধ-ভাবেব॥"

অর্থাৎ—

মান-ভাব হেতু গুরু-কোপ অপমানে
প্রিয়ারে আমার ভালো লাগে যে তেমন—
স্বর্ণ-অলঙ্কার যেন বহ্নির দাহনে
অপূর্ব্ব বিশুদ্ধি এবে করেছে ধারণ!

বস্তুতঃ প্রেমের এই অদ্ভুত চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন বলিয়াই পূজনীয় গোস্বামি-পাদ তাঁহার উক্ত রস-গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন—

"অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
তস্মাদ্ধেতোরহেতোশ্চ যূনাং মান উদঞ্চতি॥"

অর্থাৎ—

প্রেমের কুটিল গতি ভুজঙ্গের গতি প্রায়;—
কারণে বা অকারণে তাই মান দেখা যায়!

রস-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রেমিক-প্রেমিকার সেই স্বভাবসিদ্ধ মান-ভাবের প্রাচুর্য্য দেখিয়া, তাঁহাদের প্রেমের গভীরতা ও উৎকৃষ্টতার প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন, কিন্তু রসিক-শিরোমণি পণ্ডিত-কবি রায়রামানন্দ প্রেম-লীলার অপরিহার্য্য সহচর জানিয়া ইহাকে "প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত" নামে অভিহিত ও বৈষ্ণব-ভক্তের পরম-ধ্যেয় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরৈক্যের ন্যায়ই বৈষ্ণবগণের আরাধ্য অন্যতর পরম তত্ত্ব-রূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। *

এ স্থলে ইহা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, গৌড়-রাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ কবিশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনের "আর্য্যা-সপ্তশতী" কাব্য পরবর্ত্তী কালের গৌড়ের বাদ্‌শাহের মন্ত্রী কবি-পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ গোস্বামি-পাদের সুপরিচিত ছিল; গোস্বামি-পাদ তাঁহার সঙ্কলিত "পদ্যাবলী"-নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে "আর্য্যা-সপ্তশতী" হইতে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তিনি গোবর্দ্ধন আচার্য্যের পূর্ব্বোদ্ধৃত "কিঞ্চিৎ কর্কশতাময়" ইত্যাদি আর্য্যাটী মনে রাখিয়াই মানান্ত-কালীন সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের লক্ষণটী লিখিয়াছিলেন; এরূপ অনুমান করিলে, বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। যাহা হউক, আমরা এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব। সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগের যে রসোদ্গার, তাহাই

* 'শ্রীচরিতামৃত'-গ্রন্থের মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদে রামানন্দ-সংবাদ দ্রষ্টব্য।

পদাবলী-সাহিত্যে 'সঙ্কীর্ণ-রসোদ্গার'-নামে অভিহিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, গোবিন্দদাসের রচিত সঙ্কীর্ণ-রসোদ্গারের পদ একটী বই আর অধিক পাওয়া যায় নাই; কিন্তু সে পদটী একাই অন্যের একশত পদের সমান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; পদটীর ভাষা ও ভাব একটু অদ্ভুত রকমের বটে; সুতরাং আমাদিগকে উহার তাৎপর্য্য ভালরূপে বুঝিতে হইলে পদটী লইয়া একটু বেশী রকম নাড়াচাড়া করিতে হইবে। পদটী এই :—

ধানশী।

"শ্যামর-তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দুর-চিহ্ন কিয়ে অরুণ সাজ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখর-পদ কিয়ে নব শশিক সঞ্চার॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিল রজনি ভেল ভান॥
পুন অনুমানি হাম ভেল ভোর।
টীট কানাঞি কয়ল মোহে কোর॥
তবহুঁ যতন করি করইতে মান।
হাস-কুমুদে তহিঁ সব করু আন॥
মানিনি-মান-গরব ভেল চুর।
নাগর আপন মনোরথ পুর॥
তবহুঁ না জানল দিন কিয়ে রাতি।
গোবিন্দ দাস কহ সমুচিত শাতি॥

(১—২)। অর্থাৎ—(শ্রীরাধা 'সন্দেহ'-অলঙ্কারের সাহায্যে বর্ণিত করিতেছেন)— (এ কি) শ্যাম-অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ কিংবা (প্রদোষের) অন্ধকার বিরাজ করিতেছে? (এ কি, চুম্বনকালে শ্রীকৃষ্ণের মুখে সংলগ্ন) সিন্দূরের দাগ, কিংবা (প্রদোষের) রক্তিম-আভা শোভা পাইতেছে?

(৩—৪)। (এ কি) ছিন্ন হার অর্থাৎ ছিন্ন হারের ইতস্ততঃ বিস্রস্ত শ্বেত পুষ্পরাজি বা মুক্তা-চয়, কিংবা সঞ্চরণ-শীল অর্থাৎ সুদূর-বিক্ষিপ্ত নক্ষত্র-রাজি?

(এ কি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অপর-নায়িকার প্রদত্ত) নখ-ক্ষত, কিংবা বঙ্কিম নবীন চন্দ্র-কলার উদ্গম ? ('পদ'—লক্ষ্ম অর্থাৎ চিহ্ন। "পদং ব্যবসিত-স্থান-ত্রাণ-লক্ষ্মাঙ্ঘ্রি-বস্তুষু" অমর-কোষ)

(৫—৬)। শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপ দোষাকর * দেখিয়া প্রাতঃকালকেই আমার প্রথম রাত্রি অর্থাৎ প্রদোষ বলিয়া প্রতীতি হইল (অর্থাৎ প্রদোষ-রূপী শ্রীকৃষ্ণের সেই অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে আমি বিমোহিত হওয়ায়, প্রভাতে অপর-নায়িকার বিলাস-শয্যা হইতে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আর আমার ঈর্ষা-ভাব রহিল না—ইহাই ধ্বনি-গম্য অর্থ)

(৭—৮)। আমি পুনরায় (অর্থাৎ—মানের স্বভাব-সিদ্ধতা ও দুষ্পরি-হার্য্যতা হেতু পুনর্ব্বার) অনুমান করিয়া, অর্থাৎ ইনি প্রভাতে সমাগত অপর নায়িকার রতি-চিহ্নধারী শ্রীকৃষ্ণই বটেন, প্রদোষকাল নহে,—এইরূপ বিবেচনা করিয়া (মান বশতঃ) অচেতন হইলাম ; তখন ধৃষ্ট নায়ক শ্রীকৃষ্ণ আমাকে (বিবশা পাইয়া) ক্রোড়ে ধারণ করিলেন !

(৯—১০)। তখনও (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-তাপ-হর শ্রী-অঙ্গের অমৃতায়মান স্পর্শে আমার মনের গ্লানি অপনীত হইলেও) আমি মান-ভাব প্রকাশ করার জন্য যত্ন করিতে লাগিলাম অর্থাৎ তাঁহার আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কার্য্যে বাহ্যিক অল্প বাধা জন্মাইতে লাগিলাম ; কিন্তু রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হাস্য রূপ কুমুদের (বিকাশ) দ্বারা আমার সকল (প্রয়াস) অন্যথা অর্থাৎ ব্যর্থ করিয়া দিলেন ! (কুমুদ অর্থাৎ শ্বেত-উৎপল রজনী ব্যতীত প্রাতে বিকশিত হয় না ; সুতরাং শ্রীরাধা যে একরূপ জেদ্ করিয়াই, প্রদোষ-রূপী সুদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে প্রভাতাগত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া এবং সেজন্যই প্রদোষকে প্রভাত বলিয়া স্থির করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছিলেন, উহা টিকিবে কেন ? শ্রীকৃষ্ণের হাস্য-কুমুদের বিকাশ দ্বারাই শ্রীরাধার প্রাতঃকালের অনুমান

---

* এ স্থলে "দোষাকর" শব্দটী শ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্ব্যর্থ বটে ; উহার এক অর্থ—দোষের আকর (দোষ+আকর) ; ও অপর অর্থ—'দোষা' (রজনী) করে যে (দোষা+কর ('কৃ' ধাতু+'ট' প্রত্যয়) অর্থাৎ নিশা-কর চন্দ্র। + রূপক দ্বারা অনুপ্রাণিত কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার।

ব্যর্থ হইল! "হাস-কুমুদে" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির ধ্বনি-গম্য অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের ভুবন-মোহন মৃদু-হাস্য দর্শনে সম্পূর্ণ আত্মহারা হওয়ায় শ্রীরাধার আর কোনও প্রতিকূল ভাব পোষণ, কিংবা প্রতিকূল আচরণ করার কিছু মাত্র শক্তি রহিল না। তাই মহাকবি গোবিন্দদাস স্থানান্তরে (পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ২১শ পল্লবে, ২৪২৬ সংখ্যক পদে) লিখিয়া গিয়াছেন—

"মুখরিত-মুরলি-মিলিত-মুখ-মোদনে (১) মরকত-মুকুর মৈলান (২)।
মানিনী-মান-মথন (৩) মুচুকায়নি (৪) মুনি-মানস-মুরছান (৫)॥

(১১—১২)। মানিনী (আমার) মানের গর্ব্ব চূর্ণ হইল, রসিক নাগর নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন!

(১৩—১৪)। তখনও (অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর্ণিত সন্দেহ ও প্রদোষকালের সম্বন্ধে প্রাতঃকাল বলিয়া ভ্রান্তি বিদূরিত হইলেও) বুঝিতে পারিলাম না—উহা দিবস কি রজনী! (এখানে ভ্রান্তি-অপনোদনের কারণ রহিয়াছে, তথাপি ভ্রান্তি বিদূরিত হইতেছে না—এই আপাতঃ-বিরোধের সূচক 'বিরোধাভাস' অলঙ্কার ও প্রসিদ্ধ কারণের অভাবেও কার্য্যোৎপত্তি-রূপ 'বিভাবনা' অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত বস্তু-ধ্বনি এই যে; তৎকালে শ্রীরাধা সুরসিকা নায়িকার স্বভাবসিদ্ধ রস-শাস্ত্রের বর্ণিত "আনন্দাত্মক সংমোহ"-ভাবে অচেতন-প্রায় হওয়ায় তাঁহার দিবা-রাত্রির জ্ঞান ছিলনা!) সখী-স্থানীয় পদ-কর্ত্তা গোবিন্দদাস এখানে সুমধুর রহস্য করিয়া বলিতেছেন—ইহাই উপযুক্ত শাস্তি! অর্থাৎ ভুবন-মোহন নাগর-শেখর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজের শক্তি না বুঝিয়া যে দুঃসাহসিনী নায়িকা মান-ভাব পোষণ করে, তাহার পক্ষে ইহাই উচিত শাস্তি বটে।

দুরূহ শব্দের বা বাক্যের অর্থ এবং কবিতার অলঙ্কার (Figures of Rhetoric) ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো চলে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতার যাহা প্রাণ, সেই 'ব্যঙ্গার্থ' বা 'ধ্বনি' ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে গেলে, উহার চমৎকারিত্ব বা মাধুর্য্য প্রায় সবটাই নষ্ট হইয়া যায়; তথাপি সাধারণ

(১) মোদনে—আনন্দ-জনকতায়। (২) ম্লান। (৩) মন্থন অর্থাৎ ধ্বংস কারী। (৪) মুচ্‌কি হাসি অর্থাৎ মৃদু হাস্য। (৫) মূর্চ্ছা-কারী।

পাঠকের জন্য 'ধ্বনি'-প্রধান কবিতার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, ব্যাখ্যা-কারদিগকে ধ্বনিরও কিছু কিছু ব্যাখ্যা না করিলে চলে না; আমাদিগকেও অগত্যা তাহাই করিতে হইতেছে। বস্তুতঃ উদ্ধৃত পদটীর ৫ম ও ৭ম কলি দুইটীতে "তবহুঁ" ইত্যাদি অল্পাক্ষর বাক্যের সাহায্যে মহাকবি গোবিন্দদাস যে কত অপূর্ব্ব ভাব ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, তাহার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য ব্যাখ্যায় বর্ণনীয় নহে; একমাত্র সহৃদয় রসজ্ঞ ব্যক্তিরাই উহার প্রকৃত মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিবেন।

এখন এই পদটীর সম্বন্ধে আরও কয়েকটী অবান্তর কথা বলা আবশ্যক। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মানিয়া লইলাম, পদটির 'অলঙ্কার' ও 'ধ্বনি' সুন্দর, কিন্তু পদটী যে নানাবিধ অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত সুতরাং বিলক্ষণ দুরূহ বলিয়া, রচনার অতি শ্রেষ্ঠ "প্রসাদ" গুণ-বিবর্জ্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং উহাকে এতটা প্রসংসা করা যায় কি? স্ত্রীলোকের উক্তি, অন্তরঙ্গ সখীর নিকটে সখীর উক্তি—তাহাও আবার রসের উক্তি, এরূপ স্থলে ভাষার সরলতা ও নিরলঙ্কার সরসতাই তো শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক-গণেরও অভীষ্ট বটে; গোবিন্দদাস তাঁহার এই পদটীতে সেই সমীচীন আদর্শের বিপর্য্যয় করিয়া ভাল করিয়াছেন কি?

আমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, কথাগুলি সত্য; মহাকবি গোবিন্দ দাস যে ইহা না জানিতেন এমন নহে; তাঁহার অনেক রসোদ্গারের পদেই তো অপূর্ব্ব লালিত্য, প্রাঞ্জলতা ও নিরলঙ্কার সরসতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন; এখানেও কি তিনি সেরূপ করিতে পারিতেন না? পারিতেন না,— এমন কথা বলিতে পারি না; মহা কবির লোকোত্তর প্রতিভার পক্ষে কি অসাধ্য আছে? কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, এই পদটীর 'হেঁয়ালি' ভাষার এরূপ একটা অপূর্ব্ব উদ্দেশ্য ও মাধুর্য্য আছে, যাহা আর কোনও প্রকারেই প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। মান বা "প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত" প্রেম-লীলার অপরিহার্য্য সহচর ও তজ্জন্য প্রেমিক ও রসজ্ঞদিগের বিশেষ আস্বাদ্য ও প্রীতি-কর হইলেও, ভ্রম-স্বীকার কার্য্যটা মানুষের পক্ষে স্বভাবতই একটু লজ্জা-জনক বটে। তার পরে প্রিয়-সখীর নিকট প্রাণের সরল কথাগুলির সরল উক্তি খুব স্বাভাবিক হইলেও — কবি সে গুলিকে

ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশিত না করিয়া সোজা কথায় বর্ণনা করিলে, উহার দ্বারা নায়িকার চরিত্রের অসাধারণ সরলতাই ব্যক্ত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে শ্রেষ্ঠ কবিতার সৃষ্টি হয় না; সুতরাং এখানে কবিকে বেশ বুঁঝিয়া সুঝিয়াই এমন একটা রচনা-কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে, যাহাতে শ্রীরাধার অলীক মানের জন্য লজ্জা-নিবারণের চেষ্টা, ও সত্য-কথা বলিয়া সখীকে আনন্দিত করা—এই দুইটী বিভিন্ন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রীরাধার মধুর হাস্য-রস-পূর্ণ (Humourous) পূর্ব্বোক্ত হেঁয়ালি বাক্য দ্বারা তাঁহার অপ্রতিভতার সঙ্গোপন এবং মনের গূঢ় ভাবের সুকৌশল প্রকাশ দ্বারা প্রিয়-সখীর আনন্দ-বিধান — এই দুইটী কার্য্যই সিদ্ধ হইয়াছে; অধিকন্তু পদটীরও কবিতা হিসাবে অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা রক্ষিত হইয়াছে; এইরূপ রচনা-কৌশল অবলম্বন না করিলে, গোবিন্দদাস যে আর কি উপায়ে এতগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াও ধ্বনির হিসাবে এরূপ একটা শ্রেষ্ঠ কবিতার সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; তাই এই পদটীর ভাষা ও ভাবের অপেক্ষাকৃত কঠিনতাকে উহার উৎকর্ষের হানি-জনক বিবেচনা না করিয়া, এরূপ স্থলে উহাকে সরস নারিকেল-ফলের বহিরাবরণের কঠিনতার মতই অপরিহার্য্য ও সহনীয় বলিয়া স্বীকার করিতেই বাধ্য হইয়াছি।

আগামী বারে আমরা গোবিন্দদাসের 'সম্পন্ন' ও 'সমৃদ্ধিমান্' রসোদ্গারের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ,।

[বৈশাখের সাধনায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ১২শ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ। ৭ম পংক্তিতে প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন 'সম্মিলন, বিশেষতঃ সম্ভোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিতৃষ্ণা; কিন্তু চির ব্যাকুলতা, চির অতৃপ্তি পূর্ণ পূর্ব্বরাগ ও অভিসারের চির নবীন দর্শন লালসার বুঝি আর অন্ত নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, বিশ্ব-সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ প্রেম-কবিতার ইহাই চিরন্তন ও শ্রেষ্ঠ উপকরণ। বৈষ্ণব-কাব্যে প্রেমের যে উৎকর্ষ, যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অন্যত্র নিতান্ত বিরল ইত্যাদি।" এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করেন—"শ্রীরাধা-গোবিন্দের সম্মিলন, বিশেষতঃ সম্ভোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণামও বিতৃষ্ণা"

বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশ্য তাহা নহে। বিশ্ব-সাহিত্যের সাধারণ প্রেম-কবিতা সম্বন্ধেই তিনি ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন এবং ঐ জাতীয় প্রেম-কবিতা অপেক্ষা বৈষ্ণব কবিদিগের প্রেমের "উৎকর্ষ" এবং "পরাকাষ্ঠা"ও তিনি খ্যাপন করিয়াছেন। সুরসিক প্রবন্ধ-লেখকের রস-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা সর্ব্বজন-বিদিত, ব্রজপ্রেমের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার অনবধানতা আমাদের কল্পনায়ও আসে না; ব্রজের মিলনেও যে "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর"—একথা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। —সাঃ সঃ।]

গোবিন্দদাসের কড়চা ও রায়বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন।

বিগত ইং ১৯১৩ সালে সুপ্রসিদ্ধ Dwan Review নামক পত্রিকায় তাৎকালিক ঢাকা বিভাগের সুযোগ্য স্কুল-ইন্সপেক্টার মাননীয় H. E. Stapleton (বর্ত্তমানে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল) ঢাকা ফরিদাবাদ হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের একটি review সম্পাদন করেন। সেই সমালোচনা-প্রবন্ধে তিনি গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে স্বধামগত ত্রিপুরা-রাজমন্ত্রী ৺রাধারমণ ঘোষ মহোদয়ের একটি উক্তি প্রকাশিত করেন। তাহা এই, যথা—

"Babu Radha Raman Ghosh, the authority referred to later is inclined to doubt whethor this Karcha is really written by Chaitanya's servant."

সেই কাল অবধি উক্ত কড়চা-সম্বন্ধে আমাদের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হয়। দুঃখের বিষয় ডাক্তার দীনেশ বাবুর প্রতি আমাদের অটল বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আমরা তৎ-কর্ত্তৃক নানাভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত হইলাম। জানিয়া শুনিয়া একটা জাল পুথির সিদ্ধান্ত ও ঘটনাগুলি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া নিষ্কলঙ্ক চাঁদ শ্রীচৈতন্যদেবের ও

তাঁহার পার্ষদ পূত-চরিত গোস্বামিগণের সম্বন্ধে গুরুতর কলঙ্ক আনিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিগত তিন বৎসরকাল তুমুল আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। অবশেষে নানা প্রমাণে গোবিন্দদাসের কড়চার সম্পূর্ণ অমূলকতা ও ডাক্তার দীনেশ বাবুর গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার জীবনের যাবতীয় সাহিত্য পুস্তক সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে তিনি নিজ জিদ্ ও খেয়ালবশে প্রেম-সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মত প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় মহোদয় ডাক্তার দীনেশ বাবু রচিত 'বৈষ্ণব-কবির মর্ম্ম-কথা'-নামক প্রবন্ধের যে বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হইবে। যথা—

"শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর লেখাগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে যে, তিনি সহজিয়া প্রেমটিকে সমাজে পরিচালিত করিতে বদ্ধপরিকর; কিন্তু তিনি ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহসী নন। বৈষ্ণবের ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া সহজে সহজিয়া-প্রেম সমাজে চালাইবার প্রয়াস তাঁহার লেখায় ধরা পড়ে।"

অথচ ডাক্তার দীনেশ বাবু বিগত ২৩।৩।২৬ তারিখে আমাদের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন যে—

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা হইতে রচনার নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়া দিবার ভার দিয়াছিলেন। সহজিয়াদের এক বিরাট সাহিত্য আছে—তাহাদের শত শত পুঁথি আছে। আমি তাহাদিগকে বাদ দিতে পারি নাই। কিন্তু তাহাদের মত আমি গ্রহণ করিয়াছি, এরূপ প্রমাণ ত নাই।"

বেশ কথা। আমরা বলি—

(ক) অকিঞ্চনদাসের বিবর্ত্তবিলাস-নামক পুস্তক হইতে অন্যস্থল উদ্ধৃত করিয়া কি রচনার নিদর্শন দেওয়া যাইত না?

(খ) অপবিত্রজনক গ্রানিকর স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তৎপার্শ্বে "নায়িকা ভিন্ন মুক্তি নাই" এই মন্তব্যটি লিখিয়া গ্রন্থকারের রুচির পরিচয় দেওয়া হয় নাই কি?

(গ) উক্ত মন্তব্যের পরিপোষক অংশ উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় পাদ-টীকায় "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিবার হেতু কি?

(ঘ) আবার তাহাও বিকৃত ভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যথা—

"দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে প্রবীণা সে বয়সে কিশোরী॥
তাহা দুই লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
কোন জন জানে ক্ষুদ্র কিবা তার মনে॥"

কিন্তু পুথির প্রকৃত পাঠ এই, যথা—

"তাহা দুই লঞা রায় (রামানন্দ রায়) নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতি শিখায় নর্ত্তনে॥"

ভাল, জিজ্ঞাসা করি—রায় রামানন্দ সম্বন্ধে এই অংশ উদ্ধৃত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? ইহাতে সাহিত্য হিসাবে এমন কি অপরিহার্য্য উপকরণ ছিল তাহা আমরা বুঝি না। রায় রামানন্দ কি ভাবে কি কারণে এই সব দেবদাসী-দিগকে শিক্ষা দিতেন, তাহা বুঝিবার ধরিবার শক্তি আমাদের নাই, সুতরাং এইসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে ধৃষ্টতা মনে হয়। ডাক্তার দীনেশ বাবু সহজিয়াদের মত গ্রহণ করিয়াছেন কি না, এসম্বন্ধে তিনিই ভাল বুঝিবেন।

ডাক্তার দীনেশ বাবু পুনরায় লিখিয়াছেন—

"সহজিয়াদের উচ্চাদর্শে স্ত্রী পুরুষের প্রীতি দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। ইহা তাহারা যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহা দোষের নহে। অবশ্য ব্যভিচার অনেক আছে। স্ত্রী পুরুষের প্রীতি যাহা ভগবদ্মুখী, তাহা কিরূপ, বুঝিতে হইলে আমার 'Chaitanya and His age' পুস্তকের শেষের দিকটা পড়িয়া দেখিবেন।"

বাস্তবিক পর-রমণীতে রস হয় না—পরোঢ়াম্ বর্জ্জয়িত্বা ইতি সাহিত্য-দর্পণ-বচন। ব্রজপরকীয়া একটি অপূর্ব্ব ভাব। এবিষয়ে ব্রজলীলা সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করাটা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অর্ব্বাচীনত্ব। যে অবস্থা মুনিজন-ধ্যানের অগম্য, সে সম্বন্ধে প্রাকৃত ব্যক্তিদের কোন কোন উক্তি দুঃসাহস মাত্র এবং তাহার ফলে জনসমাজ উপকৃত না হইয়া বরং কলুষিতই হয়। অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ভিন্ন প্রকৃতই পর-স্ত্রী ও পর-পুরুষের সম্বন্ধ নিরয়মুখী ও চিরকাল ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত থাকিবেই থাকিবে। মহাজনবর শ্রীশ্রীচণ্ডীদাসের রজকিনী রামী সংক্রান্ত ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও পরবর্ত্তীকালের

চক্রান্ত। সহজিয়াবাদীগণ নিজ উদ্দেশ্য সমর্থনকল্পে প্রত্যেক মহাজনের নামের সঙ্গেই এক একটি নায়িকার নাম যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীদাসের নামে যে সকল রাগাত্মিক পদ প্রচলিত আছে, তাহা উক্ত মহাজন-রচিত নহে, ইহা বৈষ্ণবসমাজ বিশেষরূপে জানেন।

অল্পদিন হয় সুপ্রসিদ্ধ আনন্দবাজার পত্রিকায় ডাক্তার দীনেশ বাবু "বৈষ্ণব কবির মর্ম্মকথা" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। চিদানন্দময়ী মধুর লীলার স্বপ্রকাশত্বের হানি করিয়াছেন। "বাংলার পল্লীতে পল্লীতে সহজিয়া প্রেমের সাধনা চলিয়াছিল, সহজিয়া প্রেমলীলার জন্য বহু নরনারী প্রলুব্ধ হইয়াছিল" এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তসমূহ ডাক্তার দীনেশ বাবু উক্ত প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সহজিয়া মত গ্রহণ করিয়াছেন কি না তিনিই বিচার করিবেন।

অপরদিকে মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ও স্বপ্রণীত প্রসিদ্ধ "বৈষ্ণব-কবিতায়" বৈষ্ণব-কবির মর্ম্মকথা (?) প্রকাশ করিয়াছেন। সমাজের প্রধান ব্যক্তির সিদ্ধান্ত-বিষয়ে পদস্খলন হইলে ভয়ানক ভাববিপ্লব উপস্থিত হয়। সাধারণ মানব-মানবীর সম্বন্ধ হইতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ পৃথক যথা—

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥"

ইহাই বৈষ্ণব-কবির মর্ম্মের বস্তু। উক্ত মহাজনগণ নিজ নিজ সাধনাবলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া গানে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রাকৃত কোন কিছু হইতে উহা গড়িয়া উঠে নাই—ইহাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। ডাক্তার দীনেশ বাবু নিজ জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনায় বাংলা সাহিত্যের ভিতর যে বিষ ঢালিয়া রাখিয়াছেন—বিগত ৩০ বৎসর কাল সেই বিষ সমাজের নরনারীকে বিশেষ ভাবে জারিত করিয়া তাহাদের নৈতিক ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন—। অপরদিকে ডাক্তার রবীন্দ্র বাবু ঠিক ঐ সিদ্ধান্তই ভাষার ছটায়, ছন্দের ছটায় সাহিত্যমধ্যে প্রকাশ করিয়া অতীব সূক্ষ্ম ভাবে মানবজাতির অকাল-ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

নরনারীর অবাধ মিলন-মেশা ব্যাপারে প্রেমের পরা পরিণতি ঘোষণা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে দুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। উভয়ের রচনা হইতে যতকাল ঐ বিষ উঠাইয়া ফেলা না হইবে, তাবৎকাল কত কোটি জীবন যে ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অকালে ধ্বংস মুখে পতিত হইবে, তাহার ইয়ত্তা করা যাইবে না।

গোবিন্দ দাসের কড়চার আন্দোলন ব্যাপারে বাংলা সাহিত্যের ভিতরকার উপরোক্ত যে ভীষণ গ্লানি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সংস্কার ও সংশোধন কল্পে আপনার শ্রীপত্রিকা অগ্রসর হইয়া সফলতা লাভ করুক, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

বিনীত সেবক,
শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়।

ভক্তিদেবীর আত্ম-পরিচয়।

(১)

আমার নাম ভক্তি; আমার বাসস্থান ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে; যে আমার শরণ লয়, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হ'য়ে অভয় দান করি; তার ঈপ্সিত-বস্তুকে দিয়া দেই, এটী আমার স্বভাব।

আমি জাতিতে যে কি, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না, আমিও না। তবে আমার গুণসকল প্রকাশ করিতে ঋষিদের ও শ্রুতিদের খুবই আগ্রহ দেখা যায়। তাঁরা বলেন, যিনি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, শক্তি-শালিনী, পবিত্রা ও মধুরা, তিনিই ভক্তি। এই সকল কথায় আমার অভিমান মোটেই হয় নাই, গর্ব্বিতাও হই না; তবে, আমার অভিমান নাই, গর্ব্ব নাই, এ কথা বলিতে পারি না; আমার অভিমান, আমার গর্ব্ব, ভগবানের চরণাশ্রিতা বলিয়া। ভগবানের চরণ ছাড়া হ'য়ে আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না, এই অভিমানেই আমার বকভরা।

ভগবানের সব চেয়ে আদরের পাত্রী আমি; আমাকে তিনি খুব ভাল-বাসেন, আমার তিনি অত্যন্ত বশীভূত। আমার অপাঙ্গের তালে তালে তাঁকে নৃত্য করিতে হয়, তিনি আমাকে ছাড়া হ'য়ে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। আমি যেখানে, তিনি সেখানে নাগরী-শিরোমণির বশীভূত নাগর-রাজের মত নিত্য বিরাজ করেন। এই সৌভাগ্যে আমি মহা সৌভাগ্যশালিনী।

(২)

আমার একটা স্বভাবের পরিচয় না দিলে, আমার ঠিক ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই সেই স্বভাবটীর কথাই বলিতেছি। আমার স্বভাব, আমার আশ্রয় যে নিবে, তাকে ভগবানের নিকট একদিন না হয় একদিন নিয়া যাবই। ভক্ত ও ভগবানের দূরে দূরে থাকা, আমার ভারি অপছন্দ, আমি ইহা মোটেই দেখিতে পারি না; আমি স্বীয় শক্তিবলে কখনো ভগবানকে ভক্তের দ্বারের ভিখারী করি, কখনো বা ভক্তকে ভগবানের দ্বারে নিয়া যাই; ভক্ত-ভগবানের মিলনই আমার আস্বাদ্য, ইহাতেই আমার পূর্ণতৃপ্তি।

এ কার্যটা বোধ হয় আর কেহই করিতে পারে না; তা'তে যদি আমার একটু গর্ব্ব হয়, তবে কাহারো দুঃখ পাওয়ার বোধ হয় হেতু নাই।

আমি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ শ্রুতদেবের ঘরে নিয়াছি, বলির দ্বারের দ্বারপাল করিয়া রাখিয়াছি, শ্রীদাম-বিপ্রের ক্ষুদ্রান্ন খাওয়াইয়াছি, নিত্যতৃপ্ত আত্মারাম ভগবানকে অতৃপ্ত অভাবযুক্ত ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত করিয়াছি; ইহা কি আমার শক্তির পরিচয় নহে ?

(৩)

আমার সামর্থ্য যে কত, তার দিঙ্‌নির্ণয় করাও অসম্ভব, তবু কিছু বলি। উপর থেকে' একটী বালক নেমে' এসেছিল এ জগতে, তাঁর নাম ছিল প্রহ্লাদ। আমি স্বীয় অসীম-শক্তিবলে তাঁর নিকট আগুনকে শীতল করে'ছি, বিষকে অমৃতরূপে পরিণত করিয়াছি। আমারই শক্তিতে তাঁর রক্ষার জন্য কুলিশ-সদৃশ কঠোর গজদন্তও তুলা হ'তে সুকোমল হইয়াছে, তীক্ষ্ণধার অসিও ধারহীন হইয়াছে।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য দেখা'য়েছিলেম সেদিন, যেদিন হিরণ্যকশিপু স্তম্ভের মধ্যে ভগবান আছে কি না, জিজ্ঞাসা করায় প্রহ্লাদ যখন উত্তর দিল, 'আছে'। আমি তখন জড় বস্তু খণ্ডের মধ্যে ভক্তের বাক্য রক্ষা করিতে পূর্ণ চৈতন্যের অভ্যুদয় করাইয়াছিলাম, যাহা কখনও হয় নাই।

আমার আশ্রয় নিয়ে ধ্রুব চাহিল "পিতৃ-পিতামহ কর্ত্তৃক অনাধ্যাসিত-পদ"। আমি তো সাক্ষাৎ ভগবানকে উপস্থিত করা'য়ে দিলাম; তখন সে বলিতে আরম্ভ করিল—প্রভো, আমি কাচ খুঁজিতে খুঁজিতে চিন্তামণি তোমাকে পেয়েছি, আর বরের প্রয়োজন নাই। তবু তা'কে সর্ব্বোচ্চ-পদ তো দেওয়াই হল, অধিকন্তু ভগবানের নিত্য-চরণার্চ্চনের সৌভাগ্যও দিয়াছি।

ভগবানের ইচ্ছা-শক্তি নাকি সকল শক্তি অপেক্ষা বলবতী। আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জগতের সাম্‌নে জানাইয়া দিয়াছি, ঐ ইচ্ছা-শক্তি পর্য্যন্ত আমার নিকট পরাভূতা। ভগবানের ইচ্ছা ছিল, "কুরু-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না।" ভক্তপ্রবর ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিল, "আমি কুরু-যুদ্ধে অস্ত্র ধরাইব"। ভীষ্ম আমার আশ্রয় লওয়ায় তাঁকে (ভগবানকে) অস্ত্র ধরা'য়ে ছাড়িয়াছি। পৃথ্বীমণ্ডল কাঁপা'য়ে বিগলিত পীত-উত্তরীয় অবস্থায় রথচক্র-হাতে রুদ্রমূর্ত্তিতে আবির্ভাব দেখাইয়াছি। অস্ত্র-হস্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত করিয়াছি।

সেদিন ভগবানকে কি ত্রস্তই না করিয়াছিলাম, যেদিন গজরাজকে কুম্ভীর ধরে'ছিল। একদিক দিয়ে পীত-বস্ত্র স্কন্ধ হইতে বিদ্যুতের মত খসিয়া পড়িতেছিল, আর এক হাতে চক্র উত্তোলিত, আকাশ থেকে গরুড়ের পীঠ হইতে ভূমণ্ডলে লাফা'য়ে পড়্‌বার উদ্যোগ, যেন একটা চাঞ্চল্যের মূর্ত্তি, সে দিনের দৃশ্যটা কতই অপূর্ব্ব! আর কত বলিব।

(৪০)

আমার কাছে জাতের বিচার নাই, আশ্রমের বিচার নাই, দেশের বিচার নাই। সব স্থানে আমি আছি, নরে আছি বানরে আছি, দেবে আছি অসুরে আছি, স্বর্গে আছি, মর্ত্ত্যে আছি, পাতালে আছি, রসাতলে আছি, পশুতে আছি, পাখীতে আছি, যে চায় তার কাছেই আছি। আমাকে আহ্বান করিতে শুচি হওয়ার দরকার হয় না, শুচি অশুচি সবস্থানে আমার পূর্ণ-

প্রভাব। কোথায়ও যাওয়ার আমার বাধা নাই। আমার আবির্ভাবের কোনও কাল-বিচারও নাই।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতে চতুঃশ্লোকীতে আমার কথা বলা হইয়াছে—"অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা" "নিষেধ মুখে ও বিধিমুখে শাস্ত্র নাকি আমার সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বপাত্রে বিদ্যমানতা বর্ণন করে।"

(৫)

তবে আমার একটা মহান্ দোষ আছে। আমার আশ্রয় নিলে, বেশী-দিন ঐহিক-সুখ ভোগ করা যায় না, বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়; কারণ, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা শিশু উপস্থিত হয়, তার নাম বৈরাগ্য। সে এ সমস্তটা জগৎকে একটা বীভৎস-কাণ্ডময় দেখায়ে, এখানের যত কিছু সব নাকি স্বার্থময়, ক্ষণিক, দুঃখপ্রদ, সে তাহাই জগতের চক্ষে ফুটে করে' দেখা'য়ে দেয়।

আর বৈরাগ্যের দোষ দেই কেন? আমিই যখন সবটা হৃদয় দখল করে' বসি, তখন সে (যার হৃদয়ে আমি) বাহিরের দিকে লক্ষ্যই যে করিতে পারে না। কেমন হ'য়ে যায়, শুধু অন্তর্মনা, সকল স্থানে উদাস; হয় তো কা'কেও পাগলই করে দেই। কি কর্‌ব, যার যেটা স্বভাব, সে সেটা ছেড়ে তো থাক্‌তে পারে না।

পাপ নাশ করিতে আমি একটী অমোঘ অস্ত্র। পাপের মূল অবিদ্যা পর্য্যন্ত নাশ করে' তবে আমি চুপ হই। তাপীর হৃদয়ের পিত্তজ্বালা দূর করিতেও আমি অব্যর্থ মহৌষধ। যেই আশ্রয় লওয়া, অমনি ক্রমশঃ শীতলের দিকে। আজ এ পর্য্যন্তই থাক্। আর একদিন এসে' সব পরিচয় দিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-পুরাণ-বেদান্ত-তীর্থ।

অধরামৃত।

অধরামৃত কথাটা শ্রবণ মাত্রেই প্রথমতঃ ইহাই বোধ হয় যে, ইহা কোন একটী অমৃতবিশেষ। অমৃত ত পূর্ব্বে ক্ষীরোদ-সমুদ্রে ছিল, পরে যখন দেবতা ও অসুরগণ সম্মিলিত হইয়া মৈনাক পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড করিয়া এবং

অনন্ত-সর্পকে রজ্জুরূপে গ্রহণ করিয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্রকে মথিত করিলেন, তখন বহুদিনের বহু পরিশ্রমের পরে শ্রীশ্রীনারায়ণ-বল্লভা স্বয়ং লক্ষ্মীর সহিত ঐ অমৃত সমুদ্র হইতে উত্থিত হইল। এমন সময়ে অমৃত-ভোজনকালে সুর ও অসুরগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হইল। তখন ভগবান স্বয়ং মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নিজরূপমুগ্ধ মূর্খ অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবতাগণকে অমৃতের কিছু অংশ পান করাইলেন, অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহা পরম যত্নের সহিত চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে নিভৃত স্থানে রাখিয়া দিলেন। চন্দ্রবিম্বে অমৃত আছে বলিয়া, যে যত তাপিত হউক না কেন, চন্দ্র দেখিবা মাত্র আজ্ পর্য্যন্ত সকলের সকল সন্তাপ দূর হয়। তবে বিরহ-বিধুরের কথা স্বতন্ত্র।

এইত পাইলাম অমৃতের সংবাদ। তবে এ আবার কোন্ অমৃত? পূর্ব্বোক্ত অমৃত হইতে এ অমৃতের কিছু বিশেষত্ব আছে, এই জন্যই বলা হইয়াছে অমৃত-বিশেষ। সে অমৃত থাকে চন্দ্রে, কিন্তু এ অমৃত থাকে বদন-চন্দ্রে। এই জন্যই ইহার নাম অধরামৃত। তবে এস্থলে আমি যে অধরামৃতের কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, ইহা সাধারণ জীব বা মানুষের অধরামৃত নহে। কারণ, আমাদের যে অধরামৃত, তাহা থুথু বা কফ, যাহা শুনিলেই বীভৎস-রসের উদ্রেক হয়। কারণ, মাংস, মূত্র, পুরীষ ও অস্থিপূর্ণ পচাগলা এ দেহ-স্পৃষ্ট পদার্থ যে বীভৎস-রসোদ্দীপক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীবৈষ্ণবের অধরামৃতও এস্থলে আমার বক্তব্য নহে। তাঁহাদের অধরামৃতের বৈশিষ্ট্য আছে, অন্য প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সম্বন্ধেই কিছু বলিবার নিমিত্ত আমি উদ্যত হইয়াছি। ইহা যে আমার ঘোর দুরাশা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ, যে অধরামৃত-মাহাত্ম্য মুনি, ঋষি, লোকপিতামহ ব্রহ্মা—এমনকি স্বয়ং অনন্তদেব পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন, সেই অপার্থিব পদার্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে ইন্দ্রিয়ভোগ-লম্পট আমাহেন পামরেরও অভিলাষ!! ইহা কি বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবার প্রচেষ্টা নহে? তথাপি এইমাত্র আশা, যেমন কোথাও মহোৎসব আরম্ভ হইলে উচ্ছিষ্ট-পত্র-সংলগ্ন ভোজনাবশেষ ভক্ষণ করিবার আশায় কুকুরসমূহ আসিয়া সমবেত হয়, সেই প্রকার শ্রীবৃন্দাবনে রাসরজনীতে যে মহামহোৎসব হইয়াছিল, এবং তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্রজসুন্দরী-

গণ শ্রীকৃষ্ণের যে অধরসুধা পান করিয়াছিলেন, তাহার অতি সামান্য একবিন্দু পরিমিত উচ্ছিষ্ট লাভের আশায় ইতস্ততঃ সন্ধান করিয়া ফিরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চন্দ্রের সুধা হইতে শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা যদি শতবৎসর ধরিয়াও একান্তভাবে সুধাকর চন্দ্রের তপস্যা করি, তাহা হইলেও সে একবিন্দু সুধা দিতে সমর্থ হইবে না, সে রক্ষক মাত্র। কিন্তু একবার কাতর প্রাণে আমাদের এই কৃষ্ণচন্দ্রের বা তাঁহার অনুগতজনের নিকটে প্রপন্ন হও, তাহা হইলে তখনই, এই অধরামৃত-লাভের সৌভাগ্য পাইবে। যেহেতু ইহা তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি।

সুধার সহিত একত্র বাস করিয়া চন্দ্রের কিরণ-সমূহ আমাদিগকে যে শান্তি দান করে, তাহা তাৎকালিক ও অসার্ব্বজনীন। কারণ, দিবাভাগে চন্দ্র-কিরণ-জনিত শান্তি আর উপভোগ হয়না, এবং বিরহী জনের তাপ চন্দ্রোদয়ে আরও অধিক বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাধর-সুধা সকল সময়ে সকলেরই পরম-শান্তি-প্রদায়ক। ইহাতে বিরহ-ব্যথাও বিদূরিত হয়। চন্দ্রকিরণ বাহ্য দৈহিক তাপ অপনোদন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিলে জন্মের মত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ বিদূরিত হয়।

চন্দ্রস্থিত অমৃত পান করিলে অমর হওয়া যায় বটে, কিন্তু সে অমরত্ব একটা পরিমিত কালের জন্য। মহাপ্রলয়ের সময়ে অমরেরা সকলই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং ঐ অমৃতে কাম-ক্রোধাদি-জনিত তাপের উপশম হয়না, বরং উত্তরোত্তর তাহা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। অমরদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বদন-সুধাকরস্থ অমৃত পান করিলে কাম-ক্রোধাদির যন্ত্রণা চিরতরে নিবৃত্ত হয়। এবং এই অমৃতের লবমাত্র আস্বাদনে তুচ্ছ অমরত্ব দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম শ্রীগোলোকে নিত্য-পার্ষদ-গতি লাভ হইয়া থাকে। তথা হইতে আর কোন কালেও পুনরাবৃত্তি ঘটেনা।

এ বিষয়ে প্রমাণ পূতনা-রাক্ষসী। হৃদয়ে সদ্ভাব পোষণ করিয়া অধরামৃত পান করা দূরের কথা, ঐ রাক্ষসী নিজ স্তনে বিষ মাখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইতে আসিয়াছিল। নিজে অধরামৃত পান করিল না, কিন্তু ঐ অমৃতের

স্পর্শ মাত্রেই জিঘাংসা-স্বভাব-বিশিষ্টা রাক্ষসী হইয়াও তাহার জননী গতি প্রাপ্তি হইল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণাধর-সুধার সামর্থ্যও কিছু বোঝা যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণ মাত্র ছয়দিনের শিশু। পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিবার পর্য্যন্ত সামর্থ্যও নাই। আর অন্যদিকে সেই পূতনা। তার দেহখানা ছয় ক্রোশ লম্বা। দাঁতগুলি লাঙ্গল-দণ্ডের মত। নাসিকাটা যেন পর্ব্বতের গহ্বর। স্তন দুইটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত স্থূল। পিঙ্গলবর্ণের দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ। চক্ষু দুইটা অন্ধ-কূপের সদৃশ গভীর। হস্তপদ বন্ধ সেতুর তুল্য। নদীর পুলিনের মত তাহার জঙ্ঘা দুইটী এবং জলশূন্য হ্রদের ন্যায় তাহার উদর। এই বিশাল কলেবরের একদেশস্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গাকার একটা স্তনের অগ্রভাগে অতি অল্প পরিমিত স্থানে শিশু শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমলের পুষ্পপেলব ক্ষুদ্র অধরৌষ্ঠের স্পর্শ হইল, এবং উহাতে তদীয় অধরামৃতের লবমাত্রের যে সহযোগ হইল, তাহারই শক্তিতে ঐ সমগ্র বপুটা পবিত্র হইয়া গেল। পূতনার মোক্ষের পরে ঐ দেহটা দগ্ধ করিবার সময়ে রক্তমাংস-ভক্ষণ জনিত দুর্গন্ধে ব্রজের অনিষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ব্রজবাসিগণ তাহাকে লোকাবাসের বাহিরে লইয়া গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া যখন পোড়াইতে আরম্ভ করিলেন, তখন ঐ অপবিত্র দেহ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত-স্পর্শজনিত পবিত্র অগুরু-চন্দন-সৌরভ-ধূম উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণাধরসুধার স্পর্শেরই এই সামর্থ্য, পান করিলে যে কি হয় তাহা বর্ণনাতীত।

ভক্তপ্রবর হরিদাসবর্য্য শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় এই অধরামৃতের কিছু আস্বাদ পাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে গাহিয়াছিলেন,—

ত্বয়োপভুক্ত-স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তবমায়াং জয়েমহি॥

এই অধরামৃতের, শ্রীভগবদ্বিমুখতা-সম্পাদয়িত্রী মায়াকেও জয় করিবার সামর্থ্য আছে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজেই নিজের অধরামৃতের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিতেছেন।

ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভুঠাঁই কৈল আগমন॥

মালা পরাইঞা প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ রহুক যার গন্ধে মন মাতে॥

প্রসাদ গ্রহণ করিয়া যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছু জিহ্বাতে স্পর্শ করাইলেন, তখন

অমৃতস্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদু কোথা হৈতে হৈল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথায় সঞ্চারিল॥
সুকৃতিলভ্য ফেলালব কহে বার বার।

শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখে "ফেলালব" এই শব্দটী শ্রবণ করিয়া শ্রীমজ্জগন্নাথদেবের সেবকগণ ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রভু কহে এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্॥

এই ফেলালব সামান্য ভাগ্যে মিলে না। যাঁহার উপর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-কৃপা হয়, তিঁহিই ইহা পাইয়া থাকেন।

পুনরায় যখন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত নিভৃত স্থানে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ করিতে করিতে প্রসাদ পাইতেছেন, তখন

প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হইল মন॥
প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ গব্য॥
রসবাস গুড়ত্বক্ আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব॥
সে সে দ্রব্য এত স্বাদ গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত॥
আস্বাদ দূরে রহু গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ॥

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হইল।
অধরের গুণসব ইহাঁ সঞ্চারিল ॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্য-বিস্মারণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥

এই ত হইল কৃষ্ণাধরামৃতের বৈশিষ্ট্য। এই অধরামৃত শান্তদাস্যাদি সকল ভক্তেই আস্বাদন করিয়া থাকেন। শান্ত-ভক্ত ও দাস-ভক্তগণের ইহা পাওয়া স্বাভাবিক। সখাগণও এই অমৃতের আস্বাদ পাইয়া থাকেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সমভিব্যাহারে গোচারণ করিবার জন্য বনমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন, তখন কোন বৃক্ষে একটী সুপক্ক ফল পাইলে, তাহা নিজে কিছু ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ সখাদিগকে দিয়া তাহার মিষ্টতা ও সুপক্কতা সকলকে অনুভব করান। কিম্বা যখন তাঁহারা দ্বিপ্রহর কালে যমুনা-পুলিনে সমবেত হইয়া স্বস্ব গৃহ হইতে আনীত ভোজ্যাদি ভক্ষণ করিতে বসেন, তখন কাহার খাদ্য অতিশয় উপাদেয় ও সুস্বাদু হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করাইবার জন্য সকলেই এক এক গ্রাস শ্রীকৃষ্ণের অধরে প্রদান করেন, এবং ঐ সঙ্গে নিজেরাও আহার করিতে থাকেন। ইহাতেই সখাদের অধরামৃত প্রাপ্তি ঘটে।

পিতামাতা প্রভৃতি বাৎসল্য ভাবাপন্ন ভক্তগণও এই অধরামৃত লাভে বঞ্চিত হয়েন না। যখন পিতা নন্দ কিম্বা মাতা যশোদা কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া একত্রে আহার করিতে বসেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণের বদনে এক এক গ্রাস দেন, এবং এক এক গ্রাস নিজেরাও ভক্ষণ করেন। কিম্বা আহার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন আর খাইতে চাহেন না, তখন তাঁহারা অবশিষ্ট ভোজ্য নিজেরাই আহার করেন। এইভাবে বৎসলগণেরও কৃষ্ণাধরামৃত লাভ ঘটে।

কিন্তু এই অধরামৃত যে ভক্ত যতই আস্বাদন করুন না কেন, মধুররস-পাত্রী মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজসুন্দরীগণ যে অমৃত পান করেন, তাহা আর কেহই পাইতে পারেন না। যদি কোন ভাগ্যবান তাঁহাদের দাসী ভাবে শ্রীচরণে প্রপন্ন হয়েন, তবেই কথঞ্চিৎ আস্বাদন পাইতে পারেন। কারণ, এই অধরামৃত প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছার বর্দ্ধন করিয়া থাকে॥ এইজন্য মধুরভাবাপন্ন কান্তাগণ ব্যতীত অন্য কোনও ভক্তের পক্ষে ইহা প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। সমগ্র কান্তাগণের মধ্যেও ব্রজগোপীগণেরই ইহা নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা তাঁহাদেরই—শ্রীমুখের বাক্য,—

গোপ্যঃ ! কিমাচরদয়ং কুশলংস্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপীকানাং ॥

হে গোপীগণ ! এই বেণু এমনি কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের যে অধরামৃত কেবল গোপীগণেরই ভোগ্য এই বেণু তাহা স্বাতন্ত্র্যে পান করিতেছে ?

এই অধরসুধা দ্বারকার মহিষীগণ পর্য্যন্ত পান নাই। যেহেতু দ্বারকাগমন কালে শ্রীকৃষ্ণকে বংশীত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। বেণুনাদ-কর্পূরবাসিত শ্রীকৃষ্ণ-অধরামৃত মহাভাব স্বরূপিণী-গোপীগণ ব্যতীত অন্য কেহই পান নাই। সেইজন্য তাঁহারা রাসমহোৎসবে গান করিয়াছিলেন—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥

হে বীর ! সুরতবর্দ্ধক, শোকনাশক, শব্দায়মান বেণুবন্ধে সুন্দররূপে চুম্বিত, এবং মানবগণের তোমাব্যতিরিক্ত অন্য সুখেচ্ছাবিস্মারক তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর !!

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

এখনো কি অচেনা ?

কত কাল গেল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তার পর কত শরৎ, বসন্ত, কত বৎসর, যুগ, যুগান্তর আর কত মন্বন্তর। কোন্ এক সুদূর অজানা ভোরের-রাঙ্গা আলোর ভেতর জীব যাঁকে প্রথম দেখ্‌বে ব'লে আশা ক'রেছিল, যাঁর অরূপ রূপের কিরণে স্নান ক'রে সারা রাতের জড়তা আর গ্লানি দূরে ফেলে আনন্দে নেচে উঠ্‌বে ব'লে মনে ক'রেছিল—যাঁর সুন্দর মূর্ত্তির পানে

সন্ধান ব'লে দেবে অনুমান ক'রেছিল—গানের সুরে সারা জীবন মঙ্গলের সাথে জড়িয়ে যাঁকে স্বপ্ন দেখেছিল, তাঁর সন্ধান এখনও কি হ'ল না? আজও কি সে অচেনা অজানাই র'য়ে গেল? জীবের এত সাধনার পথ চলা, এত আকুলতা উৎকণ্ঠা সকলই কি ব্যর্থ হ'য়ে রইল?

চ'খের সুমুখে যে জিনিষগুলো প্রথম দেখা গিয়েছিল, সেগুলো নিয়েই খোঁজের প্রারম্ভ। একটি একটি ক'রে এ মাটি, জল, আগুন, বাতাস আর আকাশ খুঁজে তাঁর খোঁজ। কোথাও তাঁর সন্ধান না পেয়ে আরও একটু এগিয়ে যাওয়া। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ল'য়ে পরীক্ষা চল্ল। জগতের তন্মাত্রগুলোতেও তাঁকে না পেয়ে এগারটি ইন্দ্রিয়—যা দিয়ে অষ্ট বিষয়গুলি ভেতরে আস্বাদ করা হয়। তাতেও হ'ল না; আরও সূক্ষ্মরূপের সন্ধান ক'রে প্রকৃতি আর পুরুষ পর্য্যন্ত আবিষ্কার। অনেক কাল আগে থেকে এই সংখ্যা ক'রে সমস্ত বস্তুর পরীক্ষা—অজানাকে জানাবার প্রচেষ্টা। সংখ্যা রেখে বস্তু পরিচয় করাইত ব'লে এদের মত সাংখ্য ব'লে পরিচিত।

ক্রমশঃ আরও খোঁজ। প্রত্যেকটি বস্তুকে টুকরো টুকরো ক'রে বিশ্লেষণ। আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণেরই মতন। ত্রসরেণু, অণু, পরমাণু ক'রে তার কোন্‌টির ভেতর কি বিশেষত্ব—যাতে ক'রে বড় আকারের জিনিষগুলিরও বিশেষ বিশেষ গুণ, রূপ আর আকার। এ ভাবের খোঁজ আজও চ'লেছে যে ভাবে—তাতে মনে হয় কোন্‌দিন জানি সে অচেনার আরো কোন্ এক বিশেষ গুণের মহিমা বৈজ্ঞানিকের নূতন ভাষায় ফুটে উঠবে।

সংখ্যা ধ'রে যাঁরা খোঁজ কচ্ছিলেন, তাঁদের ভার আরেক নবীন দল গ্রহণ কল্লেন। শেষ পুরুষ-তত্ত্বটি আরও ভালো ক'রে বোঝাবার বাসনায় ধীরভাবে অনুশীলন চল্ল। কত অনুষ্ঠান, আর কত প্রক্রিয়া সাধনার অঙ্গীভূত হ'য়ে গেল। কোনও পুরুষ—বিশেষ যাঁর সবরকম বন্ধন-কষ্ট ঘুচে গেছে—তাঁরই নাম ঈশ্বর। আর সেই ঈশ্বর-প্রণিধান ক'রেও গতির শেষ সীমানায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। যেটি সাংখ্য চব্বিশটি তত্ত্বের জ্ঞানে হয় ব'লে ব'লেছিল। সমাধিতে উপনীত হ'তে পাল্লেই যোগ-যুক্ত হ'লো। এ অবস্থা জীব আর পরমের মিলনের অবস্থা...

অন্যদিকে যাঁরা স্বাধীনভাবে চ'লেছিলেন, তাঁরা প্রবুদ্ধ হ'য়ে সংবাদ জানিয়ে দিলেন—শেষ্ টা সব শূন্য। চরম-গতি শূন্যের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ। প্রথমটা শুন্‌তে কেমন মনে হ'লেও যেভাবে এরা সত্তার অভাব-সত্তাকে প্রতিপন্ন করেছেন, তা ভাব্‌লে আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে হয়; আর মনে হয়, এক পা এগিয়ে গেলে মহাশূন্যকে মহা সত্তা ব'লে গ্রহণ করা যায়। এই দলে জ্ঞানীদের মতে যাকে দেখা যাচ্ছে, অনুভব করা যাচ্ছে—বুকে ধ'রে সুখী হওয়া যাচ্ছে, সে সব ক্ষণিক। ক্ষণে ক্ষণে নূতন অনুভূতি। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতন বিষয়-জগতের অন্তরে একটা বিরাট বিজ্ঞানের ধারা—যেটা কোন্ দিন থেকে ব'য়ে যাচ্ছে, তা বলা যাবে না। আর তারই ওপর তোমার বালুর ঘর তৈরী। সুখ-দুঃখের অনুভূতির সাথে সকল বন্ধন খুলে গেলে, তেল পুড়ে গিয়ে প্রদীপ-শিখার যেমন অবস্থাটি হয় তেমনি মহা শূন্যে লয় হ'য়ে যাবে সব। সে মহাশূন্য একটা সুন্দর রমণী-মূর্ত্তি ধ'রে তোমার বুকে জড়িয়ে রাখ্‌বে—এমন স্বপ্ন দেখাও অল্প সুখের নয়। এমনি ক'রে মহাসুখের সংবাদও অই দলের অনিসন্ধিৎসুর কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

চিরকালই তেমন লোকের অভাব নেই—যারা আপন ঘরে শয্যায় ব'সে ভোরবেলার সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্ত্তে চায়। যাদিগে পাখীর গান কুঞ্জের দ্বারে ডেকে আনে না, যারা খোলা বাতাসে বেড়াইতে ভয় পায়, এ ভাবের কয়েকজন—তাদের সংখ্যা অল্প নয়,—বিশেষ কারো মতের ভিতর না ঢুকে সব দলের দোষ দেখায়ে ব'ল্লে তোমাদের সন্ধান ব্যর্থ। সুমুখে যে আছে, তাকে ভাল ক'রে ভোগ করে লও। হাতের একটা চড়ুই বনের একটা ময়ূরের সমান। ভোগের বিষয় পেয়েছ তোমার হাতের কাছে, তাকে সুন্দর ব'লে গ্রহণ কর—ভোগকর। তারই চারু-মূর্ত্তিতে আপন-ভোলা হও। যেটি নেই, তার জন্য অত শত মাথাঘামানো কখখনো ভালো নয়। কত পথ হেটে এলে তার হিসাব করবার কাউকে যখন দেখ্‌ছিনা, তখন অনর্থক পথের ক্লান্তি সইবে কেন। পরের দোষ দেখানো ছাড়া নিজেদের বল্‌বার মতন এদের বিশেষ কিছু নেই। যেটুকু আছে, তা সবাই আমরা জানি—অনুভব করি। সেটুকু এই যে, সুখে থাকা চাই, তা পরকে দুঃখ দিয়েও, যদি প্রয়োজন হয়।

তর্ক সবগুলো মতেরই অঙ্গীভূত। এ ছাড়া ভিন্ন এক সম্প্রদায় তর্কযুক্তি দিয়ে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টায় আছেন। তাঁদের কারুর যুক্তি ঈশ্বর-অস্তিত্বের অনুকূলে, কারুর বা প্রতিকূলে। এদের কথা কাটা-কাটির ভেতরও খুব চিন্তাশীলতা আর গাম্ভীর্য্য। ব্যবহারিক প্রমাণ দিয়ে পরমার্থ-নির্ণয়ে যে চেষ্টা, ন্যায়-চর্চার ভেতর এরা রেখে গেছেন, তা সমগ্র মানব জাতির একটা গরিমার বস্তু। যতকাল মানুষের বিচার-বুদ্ধি, ততদিন এদের যুক্তির প্রশংসা।

বৈদিক ঋষিকুল স্বাভাবিক প্রেরণায় দেবতার গান গেয়েছিলেন। তার নাম সূক্ত। যেমনটি দেখেছিলেন, ঠিক তেমনই সোজা কথায় তাদের বাণী-রাণী জেগেছিল। তাঁরা ঋষি—তাঁদের বাণী মন্ত্র। অই রকম সোজা সরল প্রাণে ডেকেই তাঁর সন্ধান করতে হয়। মানুষ কি জানি কোন্ দিন জাঁক-জমকের কাছে আত্মবিক্রয় ক'রে সেই সরল প্রাণের গানের সাথে কতকগুলো অনুষ্ঠানের সংঘটনা ক'রে ফেলেছিল। রাজা দুষ্মন্তের পায়ে, তপোবন-বাস অবহেলা ক'রে শকুন্তলার আত্মবিক্রয়েরই মতন সমগ্র সমাজের অভিশাপে অনুষ্ঠান প্রাণহীন হ'য়ে উঠ্‌ল। জাঁকজমকে ভুলে মানুষ অনেক দিন কাটায়ে দিয়েছিল। এই কর্ম্মকাণ্ডের যজ্ঞব্যাপারের বিপরিণাম তন্ত্রের ঘটায়। পিটুলীর তৈরী পিষ্টক থেকে আরম্ভ ক'রে নানা প্রকার পশু, এমন কি নরবলি পর্য্যন্ত এই ঘটার সাথে জড়িত।

বেদান্তের ধ্বনির কাছে যজ্ঞের গোলমাল থেমে গেল। জ্ঞানিগণ সব রকম উপাসনাকে জাগতিক অনুষ্ঠান ব'লে দেখালেন। জগৎ মায়িক—মিথ্যা। মিথ্যার রাজ্যের কোন কিছু সত্যের সন্ধান ব'লে দিতে পারে না, আর এসব উপায় দিয়ে পরম সত্য চরম-সুন্দরকে ধরাও যায় না। যজ্ঞ, উপাসনা সব ব্যর্থ। সাংখ্য, যোগ, মীমাংসক, বৌদ্ধ আর ভাগবত যাকে পেলেন বেদান্তীগণ সবারই মত উড়িয়ে দেবার জন্য খুব উচুসুরে আর শক্ত তালে পাখোয়াজ বাজিয়ে গেলেন। সবগুলো মত কতক দিন ধরে তাঁদের গম্ভীর সুরের কাছে বেসুরো ব'লে মনে হচ্ছিল। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত। তাঁরই সত্তায় জগৎ ব'লে ভ্রম। বাস্তব জগৎ ব'লে কোন বস্তু নেই। ব্যবহারের যোগ্য জগৎ আছে বটে, তবে তত্ত্বজ্ঞানীর চখে সেটি মিথ্যা। এক অদ্বৈত-তত্ত্ব, সব্‌টা জুড়ে

বসে আছে। কেবল অদ্বৈতে কেউ কেউ খুসী না হওয়ায় আরও সাধনা চল্ল। সাধকের চ'খে কেবল অদ্বৈত, বিশিষ্ট-অদ্বৈত রূপে,—আরও কতরকমে ফুটে উট্‌ল,—সেগুলো আরবারে আলোচনা করা যাবে। তারপর সেই পরতত্ত্বেরই নূতন নূতন গুণের আবিষ্কারের সাথে ঋষিদের দেওয়া সর্ব্বরস সর্ব্বগন্ধ প্রভৃতিই তাঁর যথার্থ অভিধা ব'লে গৃহীত হ'ল। তখনও পূর্ণ-তম পরিচয় পাওয়া হয়নি।

যেটুকু বাকী ছিল, লীলায় তার পূর্ণতা, সার্থকতা দেখা গেল। লীলায় ব্রহ্ম-সনাতন সক্রিয় হ'লেও নিষ্ক্রিয়, মূর্ত্ত হ'য়েও অমূর্ত্ত—ক্ষুদ্র হ'য়েও মহান্—কাছে থেকেও দূরে—একই সময়ে একস্থানে ও সর্ব্বস্থানে ব্যাপকরূপে আপনাকে ভক্তের সমীপে প্রকাশ কল্লেন। তাঁর ধাম, তাঁর বিগ্রহ, তাঁর স্বরূপ হ'তে অতিরিক্ত পদার্থ নয়। তাঁর পরিকর অনুগত হ'য়েই তাঁর সেবানুশীলন করতে হবে তারই ধামে ব'সে—অর্থাৎ তাঁরই মধ্যে থেকে তাঁর সন্ধান। স্বরূপ—সৎ, চিৎ, আনন্দ। ধাম, বিগ্রহ, পরিকরও সচ্চিদানন্দময়। সকল শক্তিরই বিভিন্ন প্রকার সমাবেশ তাঁরই মধ্যে। এমন কিছু নেই যা তাতে নেই। তিনি সব্‌টা জুড়ে। নিরাকার নির্ব্বিশেষও তাঁরই একটী স্বরূপ। সর্ব্বান্তর্য্যামী-রূপেও তাঁরই বিলাস।

সবগুলো স্বরূপের ভেতর সর্ব্বরূপবান, সর্ব্বগুণবান স্বরূপে—ভগবদ্রূপেই আস্বাদন-প্রাচুর্য্য। বেশী পেতে, অল্পে তুষ্ট কেউ হবেন কি ? অনন্ত ভগবানের রূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপেই আস্বাদনের পরাকাষ্ঠা। শুধু বস্তু থাকিলে কি হয়, প্রীতিযুক্ত হইলেই বস্তুর আস্বাদন। শ্রীরাধাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দররূপে অই লালসাময়ী প্রীতি আস্বাদনের ধারা প্রবর্ত্তন ক'রেছেন। জীব শ্রীগৌরসুন্দরেরই অনুগত—তাঁরই পরিকরের শরণাগত হ'য়ে এই প্রীতি-ধারায় ডুবুরী হ'লে উজ্জ্বল-নীলমণির মালীক হ'তে পারে। কতজন এম্‌নি করে ধনী হ'য়ে গেছে, আরও যাচ্ছে।

বাংলার ভাগ্য যে, যাঁকে নানাভাবে জগত খুঁজে খুঁজে তন্ন তন্ন করেছিল, তিনি নিজেই এসে আপনার খোঁজ ব'লে দিয়ে গেলেন। বাংলার কবি, ভক্ত, দার্শনিক—এমনি করে তাঁর সাধনার পথ ব'লে দিলেন, যাতে ক'রে সংস্কৃত মন্ত্রগুলো উচ্চারণ না করে, বা সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রগুলো না পড়েও পরতত্ত্ব অনুসন্ধানের পথে বেশ এগিয়ে যাওয়া যাবে। প্রার্থনা, গান, আর চরিতামৃত

আস্বাদন ক'রে শ্রেষ্ঠ সাধনার সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানা যেতে পারে—যা কঠিন মন্ত্রে বা দর্শনের পুঁথিতে পাওয়া দুষ্কর হবে। এত করে সে অচেনা মদনমোহন আপনাকে চেনা করবার জন্য বাংলার দ্বারে উপস্থিত। এখনও কি তাঁকে অচেনাই বলব ?

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী এম, এ।

নবকুমার। *

জ্ঞানের অতীত চোখের অগোচর
কোন সে অচেনা অজানা দেশ।
যথা হ'তে তব আগমন হেথা
ছাড়িয়া সকল পূবের বেশ ॥
হাস্যেতে তব স্বর্গের সুধা
ঝরিয়া পড়িছে বদন হ'তে।
পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নারাশি
তোমার দেহে ফুটিয়া উঠে ॥
কান্নাটী তোমার এমনি মধুর
শ্রবণে মত্ত হয় যে প্রাণ।
তাহারই সুরে সুর মিলাইয়া
বাজিছে হৃদয়-বীণার তান ॥
আকাশের মত নির্ম্মল তব
চিত্তেতে নাই চিন্তার ক্লেশ ॥
সুখের পাথারে রয়েছ ডুবিয়া
স্পর্শ হয় নাই পাপের লেশ ॥

---

* দাদাপ্রভু শ্রীযুক্ত যদুগোপাল গোস্বামীর পুত্ররত্নের জন্মোৎসব-উপলক্ষে লিখিত।

অাঁধার ঘরের মণি যে তুমি
পূর্ণ কর তুমি শূন্য দিক্।
চোখের আলো প্রাণের নিশ্বাস
দরিদ্রের তুমি পরশ-মাণিক।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

মহাভাব—দিব্যোন্মাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অভিজল্পিত ঃ

শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যাঁহারা পক্ষীর ন্যায় আচরণ অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে পর্য্যন্তও দুঃখদান করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে ত্যাগ করাই উচিত — ভঙ্গীপূর্ব্বক এইরূপ সানুতাপ বচনকে অভিজল্পিত বলে।

ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ।
যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতম্॥
—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪৯।

* * * * *

শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি পোষণ করা সঙ্গত নহে—হেতু প্রদর্শন-পূর্ব্বক এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরাধিকা বলিয়া ফেলিলেন—"আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার চরিত-কথাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই, ত্যাগ করা যায়ও না; ইহা দুস্ত্যজ।" ভ্রমরটী বোধ হয় তখনও গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছিল; ভানু-নন্দিনী মনে করিলেন, "আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-ত্যাগের কথা শুনিয়াই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ-দূত এই ভ্রমর গুন্ গুন্ রবে তাহার আপত্তি জ্ঞাপন করিতেছে।" এইরূপ মনে করিয়াই—শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করাই যে উচিত, ইহা প্রকাশ্যভাবে খুলিয়া বলিতে না পারিলেও ভঙ্গীপূর্ব্বক তাহাই ভানু-নন্দিনী ভ্রমরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভ্রমর!

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্‌
সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি।

—শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৪৭

আমরা তো সাক্ষাদ্ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্য করিয়াছিলাম, সুতরাং আমাদের যে এইরূপ দুঃখ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? তাঁহার সাক্ষাৎ-সঙ্গ তো দূরের কথা, তাঁহার চরিত-কথার সঙ্গই যে সমস্ত জগতকে সন্তপ্ত করিতে সমর্থ। তিনি প্রতিক্ষণে যে সকল লীলা করিয়া থাকেন, সে সমস্ত লীলা যে সকল শব্দদ্বারা বর্ণিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকটী শব্দই শ্রোতার কর্ণে যে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভ্রমর! তাঁহার লীলাকথার প্রকৃত স্বরূপটী কি তা জান? ইহা সাধুর বেশে সজ্জিত মহাঘাতুকের তুল্য—সাধুর-বেশ দেখিয়া সরলপ্রাণ লোক যেমন নিঃসন্দেহে তাহাকে সাদরে গৃহে স্থান দিয়া থাকে, কিন্তু অবিলম্বেই যেমন তাহার হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়—তদ্রূপ আপাতঃ কর্ণ-রসায়ন শ্রীকৃষ্ণকথাকেও লোক সাগ্রহে শ্রবণ করিতে থাকে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই অপার-দুঃখ-সমুদ্রে তাহাকে নিমজ্জিত হইতে হয়। সুমিষ্ট লড্ডুকের অভ্যন্তরে যদি ধুস্তূর-বীজের চূর্ণ লুক্কায়িত থাকে, লোকে প্রথমতঃ তাহা দেখিতে পায় না; লড্ডুকের মিষ্টত্ব অনুভব করিয়াই তাহা ভক্ষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনতিবিলম্বেই ধুস্তূর-বীজ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে উন্মাদবৎ করিয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণ-কথাও তদ্রূপ; অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বলিয়া লোকে ইহা শ্রবণ করিতে থাকে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই উন্মাদের ন্যায় তাহাকে আত্মীয়-স্বজন-গৃহ-বিত্তাদির মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া যথাতথা বিচরণ করিতে হয়। ভ্রমর! কর্ণবিবরে অমৃতায়মান শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথার এক কণিকাও যদি কেহ একবার মাত্র সেবন করে—(বহু পরিমাণে ও বহুবার সেবনের তো কথাই নাই)—তাহা হইলেও তাহার সমস্ত দ্বন্দ্ব-ধর্ম্ম একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়—স্ত্রী যদি শুনে, তবে তাহার পতির প্রতি অনুরাগ দূর হইয়া যায়; পতি যদি শুনে, তবে তাহার স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বিনষ্ট হইয়া যায়; পুত্র যদি শুনে, তবে পিতামাতার প্রতি তাহার কোনও মমতা থাকেনা; পিতামাতা যদি শুনে,

তবে সন্তান-সন্ততির-প্রতি আর তাহাদের স্নেহের বন্ধন থাকেনা। এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণকথার গুণে লোকের সমস্ত মমতা-বন্ধন সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও তত দুঃখের বিষয় কিছু নাই; কারণ, যাহার কোনও আত্মীয়-স্বজন নাই, এমন লোককেও সংসারে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে দেখা যায়। কিন্তু ভ্রমর! বৈরাগ্যের যে কি দুঃখ, তাহা সাংসারিকলোক মাত্রেই অবগত আছে। শ্রীকৃষ্ণকথা তীব্র বৈরাগ্য জন্মাইয়া লোককে অনির্ব্বচনীয় দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় যে অত্যন্ত কঠোর, নির্দ্দয় এবং কৃতঘ্ন, তাহা তোমাকে আর কতবার বলিব ভ্রমর! তাঁহার সংশ্রবে, তাঁহার লীলাকথাতেও এই কঠোরতা, নির্দ্দয়তা এবং কৃতঘ্নতা সংক্রামিত হইয়াছে। তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্তই, শ্রোতার কর্ণ-বিবর-যোগে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শ্রোতার হৃদয়কেও কঠোর, নির্দ্দয় এবং কৃতঘ্ন করিয়া তোলে। তাই এই লীলা-কথা শ্রবণ মাত্রেই লোক স্ত্রী-পুত্র-পিতা-মাতা-পিসী-মাসী প্রভৃতি গৃহকুটুম্বগণকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; তাহাদের কাতর-ক্রন্দন যেন তাহার কর্ণেই প্রবেশ করে না; তাহাদের দুরবস্থার কথা একবারও ভাবিয়া দেখে না। গৃহে হয়তঃ এমন আর কেহই নাই, উপার্জ্জনাদিদ্বারা যে তাহাদের ভরণপোষণ করিতে পারিবে; হয়তো বা, কল্য কি খাইবে, এমন সংস্থানও তাহাদের গৃহে নাই—তথাপি সে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যাহাদের কৃপায় সে এই জগতের আলো দেখিতে সমর্থ হইয়াছে, নিজে না খাইয়া না লইয়া শিশুকাল হইতে তাহাকে যাহারা লালন-পালন করিয়া মানুষ করিয়াছে, যাহাদের স্নেহে, মমতায় এ পর্য্যন্ত সে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ-কথার গুণে আজ সে তাহাদিগকে যেন কৃপবারি-যোগে মৃত্যুর হস্তেই সম্প্রদান করিয়া যাইতেছে!! আচ্ছা, স্ত্রী-পুত্রাদির কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম; তাহারা না হয় মরুক; কিন্তু কৃষ্ণকথা শুনিয়া যে বাহির হইয়া যায়, তার যদি কিছু সুখ হইত, তাহা হইলেও তো সান্ত্বনার একটা কিছু পাওয়া যাইত; কিন্তু তাও তো হয় না ভ্রমর! তাহারও যে দুঃখের আর অবধি থাকে না। যখন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, চিত্তবিক্ষেপ-বশতঃ তখন তো সে একটী তণ্ডুল-কণাও সঙ্গে করিয়া নিতে পারে না; এমতাবস্থায় তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে বল তো ভ্রমর! ভিক্ষা ভিন্ন তখন

তাহার আর গত্যন্তর থাকে না; ভিক্ষাও কি আর তাহাদের জুটে? না কোনও স্থানে তাহাদের স্থূল ভিক্ষাই মিলে? স্থূল ভিক্ষার জন্য তাহাদের অনুসন্ধানও বড় দেখা যায় না। ধুস্তুর বীজ সেবনে যাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি জন্মে, তার কি আর এ সব বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান থাকিতে পারে? তবে দেহের সংস্কার-বশতঃ আহারের চেষ্টা আসে; তাই, পক্ষীর ন্যায়, পথে ঘাটে ক্ষুদ-কণিকা যাহা পায়, তাহা দ্বারাই কোনওরূপে জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। এইরূপ অবস্থার লোক একজন নয়, দুইজন নয়—শত শত, সহস্র সহস্র। পক্ষিধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে, বোধ হয় তাহারাও পক্ষীই হইয়া যায়। ভ্রমর, এই যে এখানে দলে দলে বিহঙ্গ দেখিতেছ, যাহারা উদর-পূরণের নিমিত্ত গোধূম-কণিকাদির অনুসন্ধানে ব্যস্ত—ইহারাও বোধ হয় মানুষই ছিল—বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ-কথার মাহাত্ম্যেই ইহাদের এই অবস্থা-লাভ হইয়াছে; তা, পক্ষী হইয়াও কি ইহারা সুখে আছে? দেখনা, খাদ্যাভাবে, বাসস্থানের অভাবে—শীত-গ্রীষ্ম বর্ষায় কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! এমনই তোমার কৃষ্ণ-কথা-সঙ্গের বিষময় প্রভাব!

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গের গুণে আমাদের এই দুর্দ্দশা, আর তাঁহার লীলা কথার সঙ্গগুণে ইহাদের এই দুর্দ্দশা। ইহাতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় বস্তুমাত্রেই লোকের সন্তাপদায়ক; লোককে দুঃখ দেওয়ার নিমিত্তই বোধ হয় তাঁহার জন্ম। পৌর্ণমাসীর মুখে শুনিয়াছি, কৃষ্ণের কোনও কোনও স্তাবক নাকি তাঁহাকে পরমেশ্বরও বলেন; যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, সকলকে অপ্রতিহত ভাবে দুঃখ দেওয়ার সুবিধা হইবে বলিয়াই বোধ হয় তিনি পরমেশ্বরত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন।”

আজল্প।

নির্ব্বেদ-বশতঃ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কুটিলত্ব ও দুঃখপ্রদত্ব বর্ণিত হয় এবং ভঙ্গীপূর্ব্বক যাহাতে অপরের সুখপ্রদত্ব কীর্ত্তিত হয়, এইরূপ উক্তিকে আজল্প বলে।

দৈন্যাৎ তন্দ্রান্বিদত্বঞ্চ নির্বেদাদ্যত্র কীর্ত্তিতম্।
ভদ্যান্মত্নঃখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ॥

—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৫১।

* * * * *

ভ্রমরটী তখনও গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছিল; দিব্যোন্মাদবতী ভানু-নন্দিনী মনে করিলেন, তাঁহার কথা শুনিয়াই ভ্রমরটী বোধ হয় বলিতেছে :—"রাধে! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ এবং তাঁহার চরিত্র-কথার সঙ্গ যদি এতই সন্তাপজনক হয়, তাহা হইলে কেন তোমরা তাঁহার সহিত সৌখ্য স্থাপন করিতে গিয়াছিলে? আর কেনই বা এখনও তাঁহারই সেই সন্তাপজনক চরিত্র-কথাই সর্ব্বদা আলোচনা করিতেছ?"

এইরূপ অনুমান করিয়া ভানু-নন্দিনী ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—"ভ্রমর! আমাদের সরলতা এবং অজ্ঞতার ফলেই আমরা তাঁহার সহিত সৌখ্য-স্থাপন করিতে গিয়াছিলাম, তাহা আর অস্বীকার করার যো নাই। কৃষ্ণ যে মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদের সহিত শঠতা করিবেন, তা তো প্রথমে আমরা বুঝিতে পারি নাই; তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বোহরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শ-তীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তা॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।

শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের নিকটে বলিলেন, আমরা তাঁহার নিমিত্ত যাহা করিয়াছি, তাহার প্রতিদান করিতে নাকি তিনি সমর্থ নহেন; তাই তিনি আমাদের নিকটে চির-ঋণী হইয়া রহিলেন। সরল-প্রাণ আমরা তাঁহার এই বাক্যেই ভুলিয়া গেলাম, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলাম, বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকটে গেলাম। কিন্তু হায়! ব্যাধের কৃত্রিম গীতে বিশ্বাস করিয়া ব্যাধের নিকটবর্ত্তিনী হইলে অনভিজ্ঞা হরিণীগণের যে অবস্থা হয়, তাহাদিগকে যেমন শঠ-ব্যাধের শরাঘাতে বিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে হয়,—আমাদেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল; আমরাও কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করিয়া

তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিলাম ; তাঁহার মনে যে এত ছিল, তা কি নির্ব্বোধ আমরা তখন জানিতাম ? আমাদিগকে নিকটে পাইয়া কৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন—তাঁহার অঙ্গ-অঙ্গের স্পর্শের কথা আমাদের স্মরণ হয় না, তবে এইটুকু মনে আছে যে বলপূর্ব্বক নখাঘাত দ্বারা তিনি আমাদের দেহে তীব্র স্মর-জ্বালা উৎপাদন করিয়াছিলেন ; এই নিদারুণ স্মর-জ্বালার তীব্রতা, হরিণীর দেহে শর-জ্বালার তীব্রতা অপেক্ষাও বোধ হয় কোটিগুণে অধিক। এইরূপে, একবার নয়, দুইবার নয়—নির্ব্বোধ আমাদিগকে বহুবারই এই নখাঘাত-জনিত স্মর-জ্বালা ভোগ করিতে হইয়াছে ; আমরা এমনই অজ্ঞ যে, একবার তাঁহার কথায় ভুলিয়া স্মর-জ্বালা ভোগ করিয়াও, পুনঃ পুনঃ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছি, পুনঃ পুনঃ তীব্র স্মর-জ্বালা ভোগ করিয়াছি। তাই বলি ভ্রমর ! তাঁহার সঙ্গ সন্তাপজনক হইলেও যে আমরা তাঁহার সঙ্গে সৌখ্য স্থাপন করিতে গিয়াছি, তাহা কেবল আমাদের অজ্ঞতার ফলে,—শ্রীকৃষ্ণ যে মহা শঠ, তাহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়া। আর তাঁহার চরিত-কথাও যে সন্তাপজনক, তাহা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তথাপি যে আমরা তাঁহার কথা ছাড়িতে পারিতেছি না, তাহা কেবল তাঁহার কথা দুস্ত্যজ বলিয়া। আমরা নিজেরা চেষ্টা করিয়া এই দুস্ত্যজ-কথা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না। তাই বলি, হে ভ্রমর ! হে বিদূষক ! নানাবিধ রম্যকথায় লোকের মনকে আকৃষ্ট করার শক্তি তো তোমার যথেষ্টই আছে ; সন্তাপ-জনক কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া অন্য কোনও কথা তুমি বল—কৃষ্ণকথা হইতে আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পার কিনা দেখ। এখন অন্য কথাই আমাদের নিকটে সুখপ্রদ হইবে ; সাক্ষাদ্‌ভাবে সুখপ্রদ না হইলেও কৃষ্ণকথার ন্যায় সন্তাপদায়ক হইবে না, ইহা সত্য ; তাই বলি হে বিদূষক, তুমি

"ছাড়ি কৃষ্ণ-কথা অধন্য
বল অন্য কথা ধন্য।"

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

বিবিধ প্রসঙ্গ ।

বিনিময় ও সমালোচনার আশায় অনেক পত্রিকা-সম্পাদকের নামেই আমরা সাধনা পাঠাইয়াছিলাম। গৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদকের নামেও একখণ্ড পাঠান হইয়াছিল। গৌড়ীয়-সম্পাদক বৈশাখের সাধনা খানা মোড়ক না খুলিয়াই ফেরত দিয়াছেন; মোড়কের উপরে ফেরত দেওয়ার কৈফিয়তও দিয়াছেন, লিখিয়াছেন :—"দুঃসঙ্গ বিধায় গ্রহণ অযোগ্য"। সম্পাদক মহাশয়ের কৈফিয়ত পড়িয়া খুব হাসি পাইল, একটা গল্পও মনে পড়িল। গল্পটী এইরূপ :— কোনও এক বারাঙ্গনার একটী পালিত-কন্যা ছিল, কন্যাটী যখন বয়ঃস্থা হইল, তখন তাহাকে স্বীয় ঘৃণিত ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবার উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে কোনও এক সংযতচিত্ত সাধু পুরুষের সঙ্গে দৈবঘটনায় কন্যাটীর পরিচয় হয়। সাধুর প্রভাবে ও উপদেশে পালিকা-মাতার জঘন্য উদ্দেশ্য, ও তাহা সিদ্ধ হইলে নিজের ভবিষ্যজ্জীবনের বিভীষিকা সম্বন্ধে কন্যাটীর জ্ঞান জন্মিল; পালিকা-মাতার প্রস্তাবে ও অনুনয়-বিনয়ে সে কর্ণপাতও করিল না। বারাঙ্গনাটী বুঝিতে পারিল, ঐ সর্ব্বনাশা সাধুপুরুষটীই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার সমস্ত আশা-ভরসা উড়াইয়া দিয়াছে, কন্যাটীকে কুপরামর্শ দিয়াছে। বারাঙ্গনাটী একদিন দেখিল যে, ঐ সাধুপুরুষটী আবার কন্যাটীর নিকটে যাইতেছেন; অমনি সে রোষ-কষায়িত লোচনে তাঁহার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—"খবরদার, ভণ্ড! তুমি আমার বাড়ীর ছায়াও মাড়াইওনা। আমার মেয়েটীকে কুপরামর্শ দিয়া তুমি আমারও সর্ব্বনাশ করিতেছ, তাহারও সর্ব্বনাশ করিতেছ। বাবা! এমন বদ্‌লোক জানিলে আমি কি আমার মেয়ের ছায়াও তোমাকে দেখিতে দিতাম? এমন দুঃসঙ্গও লোকে করে"!

সকল জিনিষ সকলের প্রীতিকর হয় না। ঘৃত অতি উপাদেয় বস্তু বটে, কিন্তু এক রকম জীব আছে, ঘৃত খাইলে তাহারা কুৎসিত হইয়া পড়ে, তাই ঘৃত দেখিলেই যেন ভয়ে তাহারা আঁৎকে উঠে। আবার তাহাদের রুচিকর খাদ্য যাহা, তাহা দেখিলেও মানুষ ঘৃণায় দশ পা পিছিয়ে যায়।

গৌড়ীয় পত্রিকার ৪র্থ খণ্ড ৪২শ সংখ্যায় কোন্ একজন "পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক" প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা গেল, এই "চুম্বক" শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের দিকে পাঠকগণকে আকর্ষণ করে না, বরং তাহা হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নাম ও বৈষ্ণব-সম্বন্ধে চুম্বক বলেন "সাত্বত-শাস্ত্রে বলিয়াছেন; ইঁহারা অধোক্ষজ-বস্তু, ইঁহারা সকলেই স্বতন্ত্র ও স্বরাট্-বস্তু।" আমরা জানিতাম, একমাত্র গোবিন্দই স্বতন্ত্র ও স্বরাট্ বস্তু; শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়:—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন,

একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।

বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য, কিম্বা মহাপ্রসাদের কৃষ্ণনিরপেক্ষতা—অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বটে। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অঙ্গীকৃত বস্তুই মহাপ্রসাদ, সুতরাং মহাপ্রসাদের স্বয়ং-সিদ্ধত্ব সম্ভব নহে।

চুম্বকের আরও একস্থান আছে:—"কাল সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে 'গোবিন্দ' বর্ত্তমান ছিলেন, গোবিন্দ হইতে কাল সৃষ্ট হইয়াছে।" আমরা জানি, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পাঁচটী বস্তু অনাদি; এই পাঁচটী অনাদি বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল নিত্য। সুতরাং কাল সৃষ্টবস্তু নহে, ইহাই দর্শন-শাস্ত্রের অভিমত। অথচ, পরমহংসজী বলেন, কাল সৃষ্ট বস্তু! তিনি যে বলিয়াছেন—"কাল সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে" এই বাক্যের "পূর্ব্বে" শব্দই কাল-সৃষ্টির পূর্ব্বেও কালের অস্তিত্ব, সুতরাং অনাদিত্ব, সূচিত করিতেছে। যাহা দ্বারা পূর্ব্বাপরের জ্ঞান জন্মে, তাহাই কাল।

চুম্বকে এইরূপ অনেক অদ্ভুত কথা আছে।

গৌড়ীয়ের উক্ত সংখ্যায় অন্য একস্থলে লিখিত হইয়াছে—"কিম্বদন্তী-মতে বীরভদ্র প্রভুর কোনও সন্তান ছিল না। তিনটী রাঢ়ীয়-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-শিষ্যকে পুত্ররূপে গ্রহণ করায় তাঁহাদের অধস্তনগণ নিত্যানন্দবংশ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।" প্রাচীন গ্রন্থ-লিখিত মতকে উপেক্ষা করিয়া "গৌড়ীয়-পত্রিকা" এই কিম্বদন্তী-মতকেই গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তদনুসারে নিরীহ-পাঠকগণের

মনে একটা ভ্রান্তধারণা জন্মাইয়া, নিজেদের ন্যায় তাঁহাদিগকেও আচার্য্য-নিন্দারূপ অপরাধে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ভক্তিরত্নাকর প্রাচীন প্রামাণিকগ্রন্থ; তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—প্রভু বীরচন্দ্রের দুই পত্নী—শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণী।

যদু-নন্দনের ভার্য্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি অতি পতিব্রতা-ধর্ম্ম যাঁর॥
তাঁর দুই দুহিতা শ্রীমতী নারায়ণী।
সৌন্দর্য্যের সীমাস্তুত অঙ্গের বলনী॥
শ্রীঈশ্বরী-ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥
—১৩শ তরঙ্গ।

প্রভু বীরচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন না, তাঁহার তিন পুত্র ছিলেন:—

যৈছে প্রভু বীরচন্দ্র গুণের আলয়।
তৈছে তাঁর তিন পুত্র প্রেমভক্তিময়॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীজনবল্লভ প্রচার।
কনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ পরম উদার॥
মধ্যম শ্রীরামচন্দ্র পরম সুশান্ত।
তিনের চরিত্র বর্ণিবে ভাগ্যবন্ত॥
—১৪শ তরঙ্গ।

গৌড়ীয়-পত্রিকার ৪৩শ সংখ্যায় প্রকাশ—৫ই জুলাই তারিখে "বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভার" এক বিশেষ অধিবেশনে, শ্রীযুত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয়ের "বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী"-গ্রন্থের বিরুদ্ধে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়া কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে—উদ্দেশ্য, যেন ঐ গ্রন্থখানা এম্-এ পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে ইহাও জানান হইয়াছে যে, "বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভা"ই অনতিবিলম্বে একখানা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবেতিহাস প্রণয়ন করিয়া দিতে পারেন।

এই বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার ইতিহাস বোধ হয় অনেকেই জানেন না।

নিত্যধামগত ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়, কেদার বাবুর দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরে একটা নূতন দল সৃষ্টি করেন এবং নিজেও নিজের পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-চিদ্বিলাস-শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর" এই নির্ণাম-উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকজন অনুগত লোকও আছেন, ইঁহাদিগকেও তিনি ভক্তিগিরি, ভক্তিপর্ব্বত, ভক্তিসারঙ্গ প্রভৃতি উপাধি দিয়াছেন। বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা এই বিমলা বাবুরই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার অনুগত কয়েকজন লোক ব্যতীত অপর কেহই এই রাজসভার সদস্য নাই।

. কেদার বাবুর জীবদ্দশায় কলিকাতা সরকার লেইনে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তাহার নাম ছিল 'বিশ্ব-বৈষ্ণব-সভা'—'বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা' নহে। অল্প কয়েক বৎসর অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াই এই সভা তিরোহিত হয়। বিমলা বাবুর বিশ্ব বৈষ্ণবরাজ-সভা উক্ত বিশ্ব বৈষ্ণব-সভার অভিনব সংস্করণ বলিয়াও মনে হয় না। কারণ, কেদার বাবুর বিশ্ব-বৈষ্ণব-সভায় আচার্য্য-সন্তানগণের অবমাননা হইতনা; প্রভুপাদ গোকুলচাঁদ গোস্বামী, প্রভুপাদ শশীভূষণ গোস্বামী, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নাকি বিশ্ব-বৈষ্ণব-সভায় যোগদান করিতেন। কিন্তু বিমলাবাবুর সম্প্রদায়ের সহিত কোনও বৈষ্ণবাচার্য্যেরই সহানুভূতি নাই—এই সম্প্রদায় গুরুদ্রোহী, বৈষ্ণবদ্রোহী এবং আচার্য্যদ্রোহী বলিয়াই সাধারণতঃ পরিচিত। ইঁহাদের আচরণও সাধারণতঃ গোস্বামি-শাস্ত্রবিরোধী; ইঁহাদের বা তথাকথিত বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার অভিমত শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে। এই সম্প্রদায়ের মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে—নাম "গৌড়ীয়"; গৌড়ীয় পাঠ করিলেই সকলে ইঁহাদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন। ইঁহারা মনে করেন, একমাত্র ইঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণব, ইঁহাদের দলের বাহিরে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অবৈষ্ণব বা "বৈষ্ণবব্রুব"। বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণকে ইঁহারা বলেন "গৃহ-দাস" ইঁহারা কয়েকখানা প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থেরও অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন—সঙ্গে ইঁহাদের মতানুযায়ী অর্থও প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, ইঁহাদের অধিকাংশ ব্যাখ্যাই ভ্রান্তিপূর্ণ এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

ইঁহারা যে ভাবে সাধারণের নিকটে নিজদিগকে পরিচিত করিতে প্রয়াসী, শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাঁহার বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনীতে ইঁহাদিগকে সেইভাবে চিত্রিত না করিয়া ইঁহাদের সহজ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি ইঁহাদের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়াছেন। ইতিহাস-লেখককে সর্ব্বত্রই আলোচ্য ব্যক্তির পিতৃ-পিতামহের নাম লিখিতে হয়; মুরারিবাবুও তাহাই করিয়াছেন, তিনি অস্বাভাবিক কিছু করেন নাই; ইহাও ইঁহাদের অন্তর্দাহের একটী হেতু; কারণ, পিতৃ-পিতামহের নাম কেন, নিজেদের পিতৃদত্ত নামের উল্লেখেও ইঁহারা অস্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠেন।

কলুষিত-চরিত্র নর-নারীগণ এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালেই নিজেদের ব্যভিচার-বৃত্তি চরিতার্থ করিত। পুরুষ তিনেক হইল, কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার নামক কোনও এক ব্যক্তি এই ব্যভিচারকে ধর্ম্মের আবরণ দিতে চেষ্টা করে—এই উদ্ভট ধর্ম্মের (?) নাম হয় কালাচাঁদী বা সহজিয়া ধর্ম্ম। যাহাহউক, কামুক-কামুকা-সংঘটিত ব্যভিচারকে ধর্ম্মের নামে প্রচলনের চেষ্টা হইয়া থাকিলেও কোনও সৎলোকের নিকটে এই ব্যভিচারের কথা প্রায়ই কেহ স্বীকার করিত না। আমরা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, সম্প্রতি ফরিদপুর কাঁসা-ভোগ হইতে নাকি এই সম্প্রদায়ের একখানা মুখপত্র প্রকাশিত হইয়াছে—নাম সমাধি। বৈষ্ণবাচার তো দূরের কথা, যাহা সামান্য-সদাচারেরও বহির্ভূত, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারের চেষ্টা হইতেছে। ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালী-সমাজের কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভু-সন্তানগণ তাঁহাদের ভজনাদিতেই নিবিষ্ট, তাই তাঁহারা এসব বিষয়ে হাত দিয়া নিজেদের ভজনের বিঘ্ন জন্মাইতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণবাচার্য্যদের দুইটী প্রধান কাজ—এক, ভজনের আদর্শ স্থাপন, তাহা তাঁহাদের অনেকেই হয় তো করিতেছেন; আর—বৈষ্ণব-সমাজের শাসন; এদিকে কিন্তু তাঁহাদের কাহারওই প্রায় লক্ষ্য নাই। অনেকে, নিজের শিষ্য-দের পর্য্যন্ত শাসন করিয়া চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মাইতে অনিচ্ছুক! ইহাতে তাঁহা-দের নিজের ভজনের উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের যে সর্ব্ব-

নাশ। তাঁহারা আচার্য্য, বৈষ্ণব-সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তাঁহারা দায়ী; বৈষ্ণব-সমাজের দেহে যে সমস্ত ঘৃণিত ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে, তাহার চিকিৎসার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করুন, ইহাই তাঁহাদের চরণে বিনীত প্রার্থনা।

সমাধি-পত্রিকা সমাজে যে সকল ব্যভিচার প্রচলনের চেষ্টা করিতেছে বলিয়া শুনা যায়, তাহাতে যে কেবল বৈষ্ণব-সমাজেরই ক্ষতি হইবে, তাহা নহে—হিন্দুসমাজেরও ক্ষতি হইতেছে। হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গের এ বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে চলিবে না।

জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমার শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-গৌরাঙ্গে সম্পাদক-মহাশয়ের প্রকাশমূর্ত্তি কাঙ্গাল-বাবাজী লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী-সম্বন্ধে যে অশ্রোতব্য কটুকথা লইয়া এত গণ্ডগোল, তাহার মূল 'সোনার-গৌরাঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত কৃষ্ণগোবিন্দ দাসের অশুভ প্রবন্ধ—যাহার মূল কপি সোনার-গৌরাঙ্গ-সম্পাদকের নিকট দ্রষ্টব্য।" বহরমপুর-আলোচনা-সমিতির-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয় অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাসের মাধুকরীতে এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন প্রবন্ধকে লক্ষ্য করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার লেখা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় না। যাহা হউক, কাঙ্গাল বাবাজীর উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই:—শ্রীল কৃষ্ণগোবিন্দ দাস বাবাজীর "শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলভজন" প্রবন্ধ ২য় বর্ষ বৈশাখের সোনার গৌরাঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্বন্ধে একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে—"গয়াশ্রাদ্ধ সস্ত্রীক করাই গৃহস্থের ধর্ম্ম, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রীর ধর্ম্মপত্নী-সংজ্ঞাই হয়না। সম্ভবতঃ তাহাতেই প্রভু একা গয়ায় গিয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান করিয়াছেন।" পাণ্ডুলিপিতেও অবিকল এরূপ লেখা ছিল। পাণ্ডুলিপির উপক্রম এবং উপসংহার একজনের হাতের লেখা; কিন্তু কাহার লেখা বলিতে পারি না—সম্ভবতঃ কৃষ্ণগোবিন্দদাস-বাবাজীর। আর মধ্যস্থল (উদ্ধৃত 'গয়াশ্রাদ্ধ সস্ত্রীক করাই' ইত্যাদি অংশও) অন্য একজনের হাতের লেখা—ইঁহার লেখা আমাদের সুপরিচিত; ইঁহারই পীড়াপীড়িতে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়; এবং পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায়—

অনবধানতাবশতঃ উক্ত অংশ অপরিবর্ত্তিতভাবে প্রকাশ করার দরুণ ত্রুটী স্বীকার করিলে ইনি একটু উষ্মাপ্রকাশ করিয়াও সম্পাদককে পত্র দিয়াছিলেন। সুতরাং আপত্তিকর অংশটী শ্রীলকৃষ্ণগোবিন্দ দাস বাবাজীর অভিপ্রেত কিনা, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

কাঙ্গালবাবাজী আরও লিখিয়াছেন—"উপাসনাতত্ত্ব গোস্বামিপ্রভুসন্তানগণের নিজস্ব সম্পত্তি—তাঁহাদের শিষ্য-সম্প্রদায়ের ইহা আলোচনার বিষয় নহে, এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য।" এরূপ একটা অদ্ভুত "অবিসম্বাদিত সত্যের" ধারণা লইয়াই বোধহয় তিনি গৌড়-রাজর্ষি-কাশিমবাজারাধিপতিকেও অবমাননা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রায়রামানন্দ, হরিদাস-ঠাকুর, ঠাকুর শ্যামানন্দ, ঠাকুর নরোত্তমদাস প্রভৃতির কথাও বোধহয় কাঙ্গাল-বাবাজী ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে শূদ্র রামানন্দরায়ের নিকটে তত্ত্ব-কথা শুনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং হরিদাসঠাকুরের সঙ্গে তত্ত্ব-কথার আলোচনা করিতেন। উপাসনাতত্ত্ব যদি শিষ্য-সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়ই না হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির মধ্যে "সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছাকে" অন্তর্ভুক্ত করিলেন কেন? আর, বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রিকাতেই বা সম্পাদক মহাশয় "শ্রীদাদার" নামে উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করেন কেন? "মহাত্মা শিশিরকুমারের বাণী" এবং 'কালিহৈরার কথাই' বা প্রকাশিত হয় কেন?

শ্রীনবদ্বীপের গানতলারোড্-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামি-মহোদয় কৃতজ্ঞতা-সহকারে জানাইয়াছেন যে, হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্‌-এ মহাশয় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-সেবার আনুকূল্যার্থ পাঁচটাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

আমার কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমার সাংসারিক স্বরূপ।

সত্ত, রজ ও তম— প্রকৃতির তিনটী গুণ। এই গুণ-সঙ্গহেতু বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে আমি বিভিন্ন নামরূপ ধারণ করি।

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি-জন্মসু।

গীতা—১৩।২১।

আমি কখন স্থাবর হইয়া অচল হই, কখনও জঙ্গম হইয়া চরিয়া বেড়াই, স্থলচর, জলচর, খেচর—সব চরই আমি হইতে পারি। মনুষ্য নানাবিধ, দেশ, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির বিচারানুসারে নানাভাগে বিভক্ত। গুণানুসারেই এইরূপ হইয়া থাকে। আমিও গুণানুসারে সবই হইতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদের নিকট জীবের এই বিশ্লেষণ অতি সুন্দর-ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"এই ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক জলস্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ পঃ।

বড়ই আশ্চর্য্য, আমি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে মনুষ্য-যোনি লাভ করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছি। পিতামাতার রাখা নামে আমি পরিচিত। বাঙ্গালা-দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া আমি বাঙ্গালী। হিন্দুসমাজ ভুক্ত বলিয়া আমি হিন্দু। অমুক আমার পিতা, অমুকের অমুক ইত্যাদি আমার উপাধি এবং পরিচয়ের শেষ নাই। আমার দেহের বর্ণ কাল কি সুন্দর একটা আছেই। ইহা ব্যতীত জন্মগুণে আমার একটি অদৃশ্য বর্ণ আছে। বিদ্যাশিক্ষার সময় ব্রহ্মচারী ছিলাম, গৃহে গৃহিণীর সহিত গৃহস্থ হইয়াছি, আবার গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী ভিক্ষুও হইতে পারি। আমি আমার পূর্ব্বপুরুষ-সম্বন্ধে ইহা উহা বলিয়া যতই পরিচয় দিইনা কেন,—আমার আদিপুরুষের পরিচয় স্বয়ং ভগবান দিয়া রাখিয়াছেন—

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকইমাঃ প্রজাঃ॥

গীতা ১০।৬

ভৃগু প্রভৃতি সপ্তমহর্ষি, তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী চতুঃসন (সনক সনাতন, সনন্দ সনন্দন), স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু—এই পঁচিশজন আমারই প্রভাব-বিশিষ্ট,এবং হিরণ্য-গর্ভরূপ আমারই সংকল্প মাত্রে উদ্ধৃত হইয়াছেন। জগতে পরিবর্দ্ধনশীল এই সমুদয় ব্রাহ্মণাদি তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদিরূপে অথবা শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপে উৎপন্ন হইযাছে।

তাহা হইলে উক্ত পঁচিশজন প্রজাপতিই মানব-জাতির প্রকৃত পূর্ব্বপুরুষ। আমি এইবার ভাগ্যক্রমে দুর্লভ মনুর কুলে জন্মলাভ করিয়াছি বলিয়াই মানব। মনুর ভাব-ধারা আমার ভিতর আছে, মনুর মন আমাতে কিছু না কিছু বর্ত্তমান।—আমি মনে করিলে প্রকৃত স্বরূপ এবং পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ব্রহ্মা, তাঁহার মানসপুত্র একাদশ মহর্ষি এবং চতুর্দ্দশ মনু আমার পূর্ব্বপুরুষ এই বলিয়া মূল আদিকে ভুলিতে পারি, এইজন্য শ্রীভগবান ইহাদিগকে প্রজা-গণের আদি বলিয়া বলিয়াছেন—"এই সকল আদির আবার আমিই আদি, সকলেই আমা হইতে বাহির হইয়াছে—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।—গীতা ১০।৮

এক মানুষ আমিই গুণানুসারে কত না ভাবে দাঁড়াইতে পারি। আমি তিন গুণে বাঁধা। এক এক গুণ এক এক সময়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তখন সেই গুণের ধর্ম্ম-অনুসারেই আমার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যখন আমার ভিতর তমোগুণের প্রাধান্য হয়, তখন কুম্ভকর্ণের মত ভোঁড় হইয়া ঘুমাই, আর সময়ে সময়ে জাগিয়া ছাগ, বোকরি, শুকর, গরু, যা কিছু সম্মুখে পাই উদরস্থ করি, আর ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হই। যখন রজোগুণের উদয় হয়, তখন রাবণের মত সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে ত্রিলোকে বাহির হই, স্বর্গের দেবগণকে পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ করিয়া খাটাইয়া লই, ভগবানও আমার হাতে রক্ষা পান না, তাঁহার সতী-লক্ষ্মী পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি করি, আমার বাসনার আগুনে চরাচর জ্বলিয়া যায়, বিপ্লব উপস্থিত হয়, আমার অরাজকতায় জগত যায়। যখন সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তখন প্রায় বিভীষণের মত অভিনয় করি (নির্গুণা ভক্তির উদয় ব্যতীত ভক্ত-অভিনয় হয়না বলিয়া 'প্রায় বিভীষণের মত অভিনয় করি' বলা হইল।) সকলেই যাহাতে শান্তিতে থাকিতে পারে, সকলেই যাহাতে ন্যায় এবং ধর্ম্মপথে চলে, তাহার চেষ্টা করি। মানবজাতির সুখ-শান্তির কণ্টক-স্বরূপ, শান্তিময়ের রাজ্যের কলঙ্ক-সদৃশ মহাপাষণ্ড ভ্রাতাকে সদুপদেশ প্রদান করি। সে পদাঘাতে "দূর দূর" করিয়া বাহির করিয়া দিলে, ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া জগতে শক্তি স্থাপনের চেষ্টা করি।

সত্ত্বগুণে আমি ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব-রজ-গুণে আমি ক্ষত্রিয়, রজ-তম-গুণে আমি বৈশ্য, তমোগুণে আমি শূদ্র, ঘোর তমোগুণে আমি বর্ণশঙ্কর, ঘোরতর তমোগুণে আমি, ম্লেচ্ছ, ঘোরতম তমোগুণে আমি নরাকার পশু।

আবার সত্ত্বগুণে আমি দৈব; তখন আমি দৈবী সম্পদের অধিকারী—তখন আমার এইগুলি সম্পদ—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি র্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগ শান্তির পৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥
গীতা। ১৬। ১—৩

নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে একান্তনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, বেদাদিপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা ত্যাগ, সর্ব্বজীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, কুকার্য্যে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, সর্ব্ববিধশুচিতা, অদ্রোহ এবং অনভিমান—এই ষড়্‌বিংশতি প্রকার বৃত্তি দৈবী সম্পদের অভিমুখজাত ব্যক্তির হইয়া থাকে।

তমোগুণে আমি আসুর, তখন আমি আসুরী সম্পদের মালিক। আসুরী সম্পদ এইগুলি—

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥—১৬।৪।

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞানতা—এই গুলি আসুরী সম্পদের উদ্দেশ্যে জাতব্যক্তির হইয়া থাকে।

আসুর হইলে, আমার নিকট ভগবান অদৃশ্য হয়, আমিই তখন ভগবান্ হইয়া জগতে বিপ্লব উপস্থিত করি।

এই আমিই আবার সাধনা দ্বারা গুণাতীত হইতে পারি। তখন আমি জীবন্মুক্ত—আমার দেহটী সাপের খোলসের মত হইয়া থাকে—সে দেহে আর গুণের প্রাধান্য থাকে না,—দেহটী ত্যাগ হইলেই প্রকৃত স্বরূপ লাভ হয়। দেহ-ত্যাগের পর প্রাকৃতরাজ্যের অতীত নিত্যধামে প্রবেশ করিবার অধিকারী হই।

গুণানুসারে আমি কর্ম্মী, নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী হই, আবার নিগুর্ণা-ভক্তির উদয় হইলে আমি ভক্তও হইতে পারি। আমার অসাধ্য কিছুই নাই, সাধ্য-সাধনার তারতম্যানুসারে—গরু-চুরী হইতে বৈষ্ণব-বন্দনা পর্য্যন্ত সবই আমার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। গুণেই বাদ, গুণেই বিবাদ, গুণেই বিসম্বাদ, গুণেই যতকিছু গোল, যতকিছু অশান্তি, যতকিছু জঞ্জাল। গুণের হাত এড়াইতে পারিলেই আমি ভাল হই। "আপ ভালত জগত ভাল"। তখনই এই বৈষম্যময় জগত আমার নিকট ভালরূপেই দাঁড়ায়, তখন হরিময় এই চরা-চর হয়। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। তখন আনন্দের

আর সীমা নাই—মানবদেহ ধারণ করিয়াও তখন আমি প্রকৃত স্বরূপ লাভ করিতে পারি; তখন দেশ, জাতি, সমাজ, বর্ণাশ্রম সকলের উপরে উঠিয়া এই আমিই আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মুক্তকণ্ঠে এই বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে পারি—

নাহং বিপ্র নচ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহংবর্ণী ন চ গৃহপতি র্নোবনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যোন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি বিপ্র, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি এ সকলের কিছুই নহি, কিন্তু নিখিল-পরমানন্দের যিনি বিগ্রহ ও পরিপূর্ণ অমৃতসাগর, সেই গোপীবল্লভের দাসদিগের দাসানুদাস হই। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা।

আষাঢ় মাস।

একাদশী।	৭ই মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা।	১০ই শুক্রবার।
একাদশী।	২১শে মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।	২৬শে রবিবার।

শ্রাবণ মাস।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।	৩রা মঙ্গলবার।
একাদশী। প্রদোষে শ্রীহরির শয়ন। চাতুর্মাস্য ব্রতারম্ভ।	৫ই বুধবার।
একাদশী।	১৯শে বুধবার।

সাধনা।

(মাসিক-পত্রিকা।)

—:•:—

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা ॥

১ম বর্ষ, } শ্রাবণ—১৩৩৩ { ৪র্থ সংখ্যা।

রায় রামানন্দ ও দেবদাসী।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু একদিন নীলাচলে গম্ভীরায় বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রদ্যুম্নমিশ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিশ্র প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া বলিলেন,

মহাপ্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ পামর।
কোন্ ভাগ্যে পায়াছোঁ তোমার দুর্ল্লভ-চরণ ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণ-কথা কহ মোরে হইয়া সদয় ॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য-৫ম পঃ।

"প্রভো! আমার ইচ্ছা হইয়াছে—কিছু কৃষ্ণকথা শুনি; তাই তোমার শ্রী-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছি; কৃপা করিয়া আমায় কিছু কৃষ্ণকথা শুনাইলে কৃতার্থ হইতে পারি।"

প্রভু আমার দৈন্য-বিনয়ের খনি; তাই বলিলেন—"মিশ্র! কৃষ্ণকথায় তোমার রুচি জন্মিয়াছে, তুমি বড়ই ভাগ্যবান্। কিন্তু মিশ্র! আমি তো

কৃষ্ণকথা জানিনা; রামানন্দ কৃষ্ণ-কথা জানেন; আমারও যখন কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়, আমি তাঁহার মুখেই শুনি।"

প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তার মুখে শুনি॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পঃ।

প্রভু স্বয়ং ভগবান্; তাই ভক্তের মর্য্যাদা তিনি যত জানেন, অপর কেহ তত জানেন না; ভক্তের মর্য্যাদা বাড়াইবার নিমিত্ত ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় ভক্ত রামানন্দকে নিজের অপেক্ষাও বড় করিয়া দেখাইলেন। এই ব্যাপারে প্রভু ইহাও দেখাইলেন যে, ভগবানের নিকটে, ভক্তির উপরে আর কিছুই নাই; ভক্তির মর্য্যাদার নিকটে জাতিকুলাদির মর্য্যাদা অতি তুচ্ছ। তাই, ভক্তি-মর্য্যাদা-প্রদর্শক প্রভু আমার, ব্রাহ্মণ-প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত শূদ্র-রামানন্দ-রায়ের নিকটে পাঠাইলেন। কেবল জাতি-কুলের গৌরব নহে—ভক্তির গৌরবের নিকটে বিদ্যার গৌরব, এমন কি সন্ন্যাস আশ্রমের গৌরবও যে অতি তুচ্ছ, তাহাও প্রভু অনেক সময়ে দেখাইয়া গিয়াছেন;

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব-প্রেম কহে, রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্রসহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারায় নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পঃ।

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-বংশে প্রভুর আবির্ভাব, তাতে আবার তিনি আশ্রম-শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি তিনি বলিয়াছেন—"আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই; আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বান-প্রস্থাবলম্বী নই, সন্ন্যাসী নই—আমি নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি গোপী-জন-বল্লভ-শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস-দাসানুদাস।"

নাহং বিপ্রো নচ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।

কিন্তু প্রোত্থন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ ॥
—পদাবলী ।৭২ ॥

* * * * * * *

যাহাহউক, প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একদিন প্রাতঃকালে প্রদ্যুম্নমিশ্র রামানন্দরায়ের গৃহে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, রামানন্দ গৃহে নাই; রামানন্দের সেবক মিশ্রকে যত্ন করিয়া উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। মিশ্রের প্রশ্নে সেবক বলিল—"রায়মহাশয় এখন গৃহে নাই; তিনি এক নিভৃত উদ্যানে আছেন; সেই স্থানে আমাদের কাহারও যাওয়ার আদেশ নাই; আপনি বসুন, তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন; তিনি আসিলেই, আপনার যাহা আদেশ হয়, তিনি পালন করিবেন।"

রায়মহাশয় নিভৃত উদ্যানে কি কার্য্যে নিয়োজিত আছেন, জানিতে চাহিলে সেবক মিশ্রকে বলিল—"রায় মহাশয় একখানা নাটক লিখিয়াছেন; তাহা অভিনয় করাইবার উদ্দেশ্যে নৃত্যগীতে নিপুণা দুইটী পরমসুন্দরী যুবতী দেবদাসীকে তিনি নাটকের নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতেছেন।"

দুই দেবদাসী হয় পরমসুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণা সেই বয়সে কিশোরী ॥
তাঁহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিক্ষা আবর্ত্তনে ॥
তুমি ইহাঁ বসি রহ, ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন ॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পঃ।

রামানন্দরায় দেবদাসীদ্বয়কে লইয়া নিভৃত উদ্যানে কি করিতেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-চরণও স্পষ্ট-ভাষাতেই উল্লেখ করিয়াছেন—

রামানন্দ নিভৃতে সেই দুইজনা লঞা ॥
স্বহস্তে করেন তাঁর অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জ্জন ॥

স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ-মণ্ডন।
তভু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন॥
কাষ্ঠ-পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামরায়ের ঐছে স্বভাব॥
সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম-মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব-ভক্তিপ্রেমসীমা॥
তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিক্ষাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারি-সাত্ত্বিক-স্থায়ি-ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাব-প্রকটন-লাস্য রায় যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥
তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করয়ে সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্রজীব কাঁহা তাঁর মন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পঃ।

রামানন্দরায় দেবদাসীদ্বয়ের স্নান ও বেশ-ভূষাদির পরে তাঁহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রথমে নিজহাতে তৈল-হরিদ্রাদি দ্বারা তাঁহাদের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন করিতেন; তারপর নিজ হাতেই তাঁহাদিকে স্নান করাইতেন, স্নানের সময় তাঁহাদের গাত্র-মার্জ্জনাদিও তিনি নিজ হাতেই করিতেন। স্নানের পরেও তিনি নিজ হাতেই তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে উপযুক্ত বেশ-ভূষা পরাইতেন। তারপর, তিনি তাঁহাদিগকে অভিনয়-শিক্ষা দিতেন; নৃত্য শিক্ষা দিতেন, গীত শিক্ষা দিতেন; নৃত্য-গীতাদি-সময়ে কিরূপে মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গীদ্বারা সঞ্চারিভাব, সাত্ত্বিকভাব ও স্থায়িভাবাদির লক্ষণ প্রকাশ করিতে হয়, তাহাও তিনি শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষার ফলেই,

শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে নাটক-অভিনয়ের সময়ে, নানাবিধ কৌশলপূর্ণ নৃত্য-গীতাদি দ্বারা দেবদাসীদ্বয় ব্রজগোপীদিগের দুর্গম ভাবসকল যেন সাক্ষাৎ প্রকটিত করিত। যাহা হউক, অভিনয়-শিক্ষার পরে, রামানন্দরায়, দেবদাসী-দ্বয়কে শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া নিভৃতেই তাহাদের নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। যতদিন এই অভিনয়-ক্রিয়া চলিতেছিল, তাহার প্রত্যেক দিনই রামানন্দ এইরূপ করিতেন। দেবদাসীদের অঙ্গ-সেবা-সময়ে রামানন্দরায়ের চিত্তের অবস্থা-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, কাষ্ঠ কিম্বা পাষাণ স্পর্শ করিলে যেমন কাহারও চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ সুন্দরী-তরুণী-স্পর্শেও রামরায়ের কোনওরূপ চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইত না। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বা পাষাণ-নির্ম্মিত স্ত্রীলোক-স্পর্শেও কামুক লোকের চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু কাষ্ঠ-খণ্ড বা পাষাণ-খণ্ড স্পর্শ করিলে কাহারও চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। যেরূপ নির্ব্বিকার-চিত্তে লোকে কাষ্ঠ-খণ্ড বা পাষাণ-খণ্ড লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ নির্ব্বিকার-চিত্তেই রামরায় তরুণী দেবদাসীদের অঙ্গ-সেবা করিতেন।

সুন্দরী-যুবতী-রমণীর-অঙ্গস্পর্শে যাহার চিত্ত-বিকার জন্মে না, এমন লোক মায়িক জগতে অতি বিরল। অঙ্গ-স্পর্শের কথা দূরে থাকুক, সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের দর্শনেও চিত্ত-বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা আছে।* সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের নাম শুনিলে, কিম্বা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের স্মৃতির উদ্দীপক কোনও বস্তু দেখিলেও অনেক সময় চিত্ত-বিকার জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় চিত্ত-বিকার সময় সময় এমনই প্রবল হইয়া উঠে যে, লোক হিতাহিত-জ্ঞান হারাইয়া ফেলে, এমন কি সম্পর্কের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। স্বয়ং ব্রহ্মা নিজ কন্যার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন! অন্যের কথা আর কি বলা যাইবে? তাই শাস্ত্র-কারগণ বলিয়াছেন, মাতা, ভগিনী, এমন কি নিজের কন্যার সঙ্গেও একাসনে বসিবে না, কারণ বলবান্ ইন্দ্রিয়-গ্রাম বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে,

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়-গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

—মনুসংহিতা ২।২১৪।

কিন্তু রামানন্দরায়ের শক্তি অসাধারণ, অলৌকিক। রামানন্দরায় যে দেবদাসীদের সংসর্গে ছিলেন, তিনি যে তাহাদিগকে দর্শন এবং স্পর্শ মাত্র করিয়াছেন, তাহা নহে—তিনি নিজ হাতে তাঁহাদিগের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন করিতেন, নিজ হাতে তাঁহাদের স্নান করাইতেন, গাত্র-মার্জ্জন করিতেন, নিজ হাতে তাঁহাদের বেশ-ভূষা রচনা করিতেন ;—তাহাও আবার নিভৃত উদ্যানে !! কিন্তু তথাপি তিনি নির্ব্বিকার-চিত্ত ! এইরূপে অঙ্গ-সেবার সময়ে দেবদাসীদের বক্ষঃস্থলাদি গুহ্য-অঙ্গের দর্শন-স্পর্শনও তাঁহার হইত ; কিন্তু তখনও তাঁহার মনের অবস্থা—"কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব !" তারপর, তিনি যাহাদের অঙ্গ-সেবা করিতেন, তাহারাও বৃদ্ধা ছিল না, কুৎসিত ছিল না, গুণহীনা ছিল না ; তাহারা যুবতী, পরম-সুন্দরী, নৃত্য-গীতে-নিপুণা। এই কয়টী গুণের একটীই নিভৃত উদ্যানে পুরুষের চিত্ত-চঞ্চলতা জন্মাইবার পক্ষে যথেষ্ট ; কিন্তু সমস্ত গুণের সমবায়ও রামানন্দের নিকটে কাষ্ঠ-পাষাণতুল্য !! কেবল ইহাই নহে ; কোনও যুবতীর সঙ্গে কোনও পুরুষের যদি কোনও একটা বিরুদ্ধ-সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধই মিলন-স্পৃহাকে খর্ব্ব করিয়া দেয় ; দেবদাসীদের সঙ্গে রামানন্দের সেইরূপ কোনও সম্বন্ধই ছিল না। যুবতীর যদি স্বামী থাকে, বা অন্য কোনও অভিভাবক থাকে, তাহা হইলেও একটা ভয়ের উদয়ে মিলন-স্পৃহা খর্ব্ব হইয়া যায়। দেবদাসীগণের স্বামী ছিল না, তাহারা জগন্নাথের চরণে উৎসর্গীকৃতা চির-কুমারী, অভিভাবকহীনা। তাঁহারা স্বাধীনা ; তাঁহাদের এই স্বাধীনতা মিলন-স্পৃহার আনুকূল্য বিধানই করিয়া থাকে। তাতে আবার, তিনি তাহাদিগকে যে সমস্ত হাব-ভাব শিক্ষা দিতেছিলেন, প্রাকৃত দৃষ্টিতে, সে সমস্তও চিত্তের বিকার উৎপাদনে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। নিভৃত উদ্যান-বাটিকায় এত সব অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও রামানন্দের মন নির্ব্বিকার—কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় নির্ব্বিকার। তাঁহার এই অসাধারণ শক্তির উল্লেখ করিয়াই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

রামানন্দরায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে, আশ্চর্য্য কথন ॥
একে দেবদাসী, আরে সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ-সেবা করেন আপনি ॥

স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তাঁহা দর্শন-স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায়রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্‌গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহমন কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, রামানন্দের মত শক্তি আর কাহারও আছে বলিয়া জানিনা। প্রাকৃত জগতে ইহা থাকিতেও পারে না; কারণ, প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্মই এই যে ভোগ্যবস্তু সাক্ষাতে থাকিলে ভোগের স্পৃহা জাগ্রত হইয়া উঠে। রামানন্দ-রায়ে যখন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, রামানন্দের দেহ প্রাকৃত নহে—অপ্রাকৃত, চিন্ময়; তাই প্রাকৃত বস্তুর আকর্ষণে তাঁহাতে কোনও রূপ বিকার উপস্থিত হয় না।

যাহাহউক, দেবদাসীদের অঙ্গ-সেবা-সময়ে রামানন্দ মনে মনে কিরূপ ভাব পোষণ করিতেন, তাহাও চরিতামৃত বলিয়া দিতেছেন :—

সেবা-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ॥

রামানন্দ নিজের উপরে স্বাভাবিক-দাসী-ভাব আরোপ করিয়া এবং দেবদাসীদ্বয়ে সেবা-বুদ্ধি আরোপ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। এই পয়ারের আলোচনা পরে করা যাইবে।

দেবদাসীদ্বয়ের সঙ্গে রামানন্দ রায়ের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। আমাদের দেশে এরূপ দুই চারিটী সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা মনে করেন, রাগানুগীয়-ভজনের পক্ষে স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য অপরিহার্য্য, তাঁহারা রামানন্দ-রায়কে তাঁহাদের আদর্শ-স্থানীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, দেবদাসীদ্বয় রামানন্দের ভজনের সহায়-কারিণী

ছিলেন এবং নিভৃত উদ্যানে দেবদাসীদের অঙ্গ-সেবাদি রামানন্দ-রায়ের ভজনের অঙ্গীভূত ছিল।

এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অভিপ্রায় কি, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া তাহাই আমরা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, উদ্যান-গমনে রামানন্দ-রায়ের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কি বলেন।

জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক নামে রামানন্দরায়-লিখিত একখানা গ্রন্থ আছে, আজকালও এই গ্রন্থ খানি প্রচলিত আছে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন নীলাচলে, তখনই এই গ্রন্থের লেখা শেষ হয়। এই গ্রন্থখানি শ্রীজগন্নাথ-দেবের সাক্ষাতে অভিনীত করিবার নিমিত্ত রামানন্দরায়ের অভিপ্রায় হয়; তিনি দেবদাসী-দিগকে এই নাটকের অভিনয় শিক্ষাই দিতেছিলেন, রামানন্দ-রায়ের সেবক প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের নিকটে স্পষ্ট ভাষায়ই ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন :—

তাহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিক্ষা-আবর্ত্তনে ॥

কেবল রামানন্দের সেবক নহে, কবিরাজ-গোস্বামীও এ কথা বলিয়াছেনঃ—

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥
সঞ্চারি-সাত্ত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥
ভাব-প্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায়।

রামানন্দ দেবদাসীদ্বয়কে তাঁহার নাটকের বিষয়োপযোগী নৃত্য শিক্ষা দিলেন; গীতের মধ্যে যে ভাবের পদ লিখিত হইয়াছে, গীত-কালে অঙ্গ-ভঙ্গী-আদি দ্বারা কিরূপে সেই ভাব প্রকটিত করিতে হইবে, তাহাও তিনি শিক্ষা দিলেন। সঞ্চারি-ভাব, সাত্ত্বিক-ভাব এবং স্থায়িভাবের অনুভাব (বাহ্যিক-চিহ্ন)-গুলি মুখে বা নেত্রে কিরূপে দেখাইতে হইবে, তাহাও শিক্ষা দিলেন; কি ভাবে নৃত্য করিলে অভিনীত বিষয়গুলির ভাব শ্রোতাদের সাক্ষাতে প্রকটিত হইতে পারে, তাহাও (ভাব-প্রকটন-লাস্য) শিক্ষা দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও এ কথাই বলিয়াছেন :—

নানা ভাবোদ্গার তারে করায় শিক্ষণ।

দেবদাসীদের সঙ্গে রামানন্দের উদ্দেশ্য-বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্য কোনও পদই পাওয়া যায় না। তাহা হইলে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নাটকের অভিনয় শিক্ষা দেওয়াই দেবদাসীদের সঙ্গে নিভৃত উদ্যানে রামানন্দের অবস্থিতির একমাত্র কারণ। ইহাই চরিতামৃতের মত।

এবিষয়ে অনেক আপত্তিও উঠিতে পারে। আমরা একে একে তাহা আলোচনা করিতেছি।

প্রথম আপত্তি এই :— রামানন্দরায়-রচিত জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকে পাত্র-পাত্রী অনেক,—দুইজন মাত্র নহেন। নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সখা মধুমঙ্গল, এই দুইজন পাত্র, আর নায়িকা শ্রীরাধিকা, তাঁহার প্রিয়সখী মাধবিকা, শশীমুখী, অশোকমঞ্জরী ও মদনমঞ্জরী, অলৌকিক উপায়ে রাধাকৃষ্ণের লীলা-সংঘটন-কারিণী মদনিকা এবং বনদেবতা বৃন্দা—এই কয়জন পাত্রী আছেন। কিন্তু নাটকের অভিনয়-শিক্ষা দেওয়াই যদি রামানন্দ-রায়ের দেবদাসী সংসর্গের একমাত্র হেতু হইত, তাহা হইলে এতজন পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র দুইজন দেবদাসীকেই শিক্ষা দিতেছিলেন কেন? অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের ভূমিকা কে কাহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন?

ইহার উত্তর বোধহয় এই :— জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকে পাত্র-পাত্রী অনেক থাকিলেও, পাত্রীদের মধ্যে নায়িকা শ্রীরাধিকার এবং পাত্রদের মধ্যে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাই মুখ্য। ইহাঁদের ভূমিকায় নানাবিধ দুর্গম ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে; রামানন্দের ন্যায় রসিক-ভক্তব্যতীত অপরের পক্ষে এই সকল নিগূঢ় ভাবের অনুভব এবং অভিনয়-শিক্ষাদান বোধ হয় অসম্ভব ছিল; তাই তিনি স্বয়ং কেবল এই দুইজনের ভূমিকা-অভিনয়ই দুইজন দেবদাসীকে শিক্ষা দিতে-ছিলেন;—একজনকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা এবং অপরজনকে শ্রীরাধিকার ভূমিকা শিক্ষা দিতেছিলেন। অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের ভূমিকায় এইরূপ দুর্গম ভাবের বিকাশ নাই, সুতরাং তাঁহাদের ভূমিকা অপর কোনও নাট্যাচার্য্যই হয় তো শিক্ষা দিতেছিলেন।

শ্রীরাধিকাব্যতীত অপর পাত্রীগণের মধ্যে মদনিকার ভূমিকাই মুখ্য।

তাই কেহ কেহ বলেন, রামানন্দরায় একজন দেবদাসীকে শ্রীরাধিকার ভূমিকা এবং অপরজনকে মদনিকার ভূমিকা শিক্ষা দিতেছিলেন।

দ্বিতীয় আপত্তি এই :— অভিনয় শিক্ষা দেওয়াই যদি রামানন্দরায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে নৃত্য গীতে নিপুণা, পরমসুন্দরী এবং কিশোর-বয়স্কা দেবদাসীর কি প্রয়োজন ছিল?

নৃত্যগীতে শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের নিপুণতা সর্ব্ব-শাস্ত্রে প্রশংসিত; সুতরাং তাঁহাদের ভূমিকা যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের পক্ষেও—মানুষের মধ্যে নৃত্যগীতে যতটুকু নিপুণতা থাকা সম্ভব, ততটুকু নিপুণতা থাকা দরকার। এই জন্যই বোধহয় রায়মহাশয় নৃত্যগীতে নিপুণা দুই দেবদাসীকেই অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন।

আবার, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা, এই উভয়েই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা; তাঁহাদের ভূমিকা যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদেরও যথাসম্ভব সৌন্দর্য্য থাকিলে অভিনয়ের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা, উভয়েই কিশোর বয়সে অবস্থিত, সুতরাং তাঁহাদের ভূমিকা যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহারাও কিশোর-বয়স্কা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রীলোক-দেবদাসীদ্বারা পুরুষ-শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনীত করাইবার হেতু বোধ হয় এই যে, সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ কিশোরী-দের অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং কমনীয়তাই অধিকতর চিত্তাকর্ষক; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং কমনীয়তার একটা ক্ষীণ আভাস মানুষের দ্বারা প্রকাশিত করা যদি সম্ভব হয়, তবে সুন্দরী কিশোরী-রমণীর চেষ্টাই কিয়ৎপরিমাণে সার্থক হইতে পারে।

তৃতীয় আপত্তি এই :—অভিনয় শিক্ষা দেওয়াই যদি রামরায়ের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তিনি দেবদাসীদের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন ও গাত্র-সম্মার্জ্জন করিলেন কেন? তাঁহাদের স্নান করাইলেন কেন? তাঁহাদের বেশভূষাই বা রচনা করিলেন কেন? এ সব তো অভিনয়-শিক্ষার অঙ্গীভূত নহে? আর নিভৃত উদ্যানেই বা অভিনয়-শিক্ষার স্থান-নির্ব্বাচনের কি প্রয়োজন ছিল?

সর্ব্বপ্রথমে আমরা অভ্যঙ্গ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনুজ্-ধাতুর অর্থ ম্রক্ষণ বা মর্দ্দন (মাখাইয়া দেওয়া) ; সুতরাং অভ্যঙ্গ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল "পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন।" এইরূপে পুনঃ পুনঃ তৈল-মর্দ্দনকেও অভ্যঙ্গ বলে ; "অভ্যঙ্গঃ তৈল মর্দ্দনম্—শব্দকল্পদ্রুমঃ।" যাহা দ্বারা অভ্যঙ্গ (অর্থাৎ যে বস্তুটী পুনঃ পুনঃ শরীরে মর্দ্দন) করা হয়, অভ্যঙ্গ শব্দে সেই বস্তুটীকেও বুঝায় ; এই অর্থে অভ্যঙ্গার্থ তৈলকেও অভ্যঙ্গ বলা হয়। উড়িষ্যা-দেশের স্ত্রীলোকেরা এখন পর্য্যন্তও স্নানের পূর্ব্বে তৈলের সঙ্গে হরিদ্রা-মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন (অভ্যঙ্গ) করিয়া থাকে ; সুতরাং উড়িষ্যাদেশে হরিদ্রামিশ্রিত তৈলকেও অভ্যঙ্গ বলে ; তাই শ্রীচরিতামৃতের টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"অভ্যঙ্গেন তৈলহরিদ্রাদিনা মর্দ্দনং—তৈল-হরিদ্রাদিরূপ অভ্যঙ্গ দ্বারা গাত্র-মর্দ্দনই অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন।"

এই অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন সমস্ত দেহেও হইতে পারে, অথবা হস্তপদাদি অঙ্গ-বিশেষেও হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অভ্যঙ্গের অনেক গুণ বর্ণিত আছে:—

অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা।
শিরঃশ্রবণ-পাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥

"প্রত্যহ অভ্যঙ্গ-আচরণ করিবে ; মস্তকে, কর্ণে ও চরণে বিশেষরূপে অভ্যঙ্গ করিবে। অভ্যঙ্গের ফলে জরা (বৃদ্ধত্ব), শ্রম ও বাতরোগ দূরীভূত হয়।"

অভ্যঙ্গের আরও অনেক গুণ আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে ; যথা, মার্দ্দবকারিত্বম্—দেহের মৃদুতা বা স্নিগ্ধতা-সম্পাদক ; কফ-বাত-নাশিত্বম্—কফ ও বাতনাশক ; ধাতুপুষ্টিজনকত্বম্—ধাতুর পুষ্টিকারক ; ত্বগ্‌বর্ণ-বল-প্রদত্বঞ্চ—চর্ম্মের বর্ণ উজ্জ্বল করে এবং দেহের বল বৃদ্ধি করে।

পাদদেশে অভ্যঙ্গের ফলে চক্ষুর উপকার হয়। অতশ্চক্ষুর্হিতার্থিনা পাদাভ্যঙ্গঃ করণীয়ঃ॥

*　　*　　*　　*

যাহা হউক, অভিনয়কারিণী দেবদাসীদ্বয়ের দেহের লাবণ্য, স্নিগ্ধতা এবং বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির এবং কফ-দোষাদি দূর করিয়া কণ্ঠস্বরের মধুরতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রায়রামানন্দ তাহাদের স্নানের পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ-

মর্দ্দন করিতেন। এবং এই সকল উদ্দেশ্যেই তিনি পরিপাটীর সহিত স্বহস্তে তাঁহাদের গাত্র-মার্জ্জন করিতেন, স্বহস্তে তাঁহাদের স্নান করাইতেন। যাঁহারা ব্রজ-লীলার অভিনয় করিবে, বিশেষতঃ যাঁহারা অসমোর্দ্ধ-রূপ-লাবণ্যবতী শ্রীরাধিকাদির ভূমিকা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের দেহের স্নিগ্ধতা, লাবণ্য ও উজ্জ্বলতা এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বরের মধুরতা বৃদ্ধির নিমিত্ত যত রকম লৌকিক উপায় অবলম্বন করা সম্ভব, অভিনয়ের সফলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রায় মহাশয় তৎসমস্তই করিয়াছেন।

রায়রামানন্দের পক্ষে স্বহস্তে দেবদাসীদের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দনাদি করার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে;—প্রথমতঃ, অপর কাহারও দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ পরিপাটীর সহিত অভ্যঙ্গাদি সম্পন্ন হইতে পারিত বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ বিশ্বাস করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, অভিনয়-দর্শকদিগের চমৎকারিতা-বিধানের উদ্দেশ্যে অভিনয়-শিক্ষা-রহস্যটী তিনি যথাসম্ভব গোপন রাখিতেই হয় তো অভিলাষী ছিলেন; তাই অপর কাহাকেও ইহার সংশ্রবে আনিতে ইচ্ছা করেন নাই। নিভৃত উদ্যানে অভিনয়-শিক্ষার স্থান নির্ব্বাচন করার উদ্দেশ্য ও বোধ হয় ইহাই।

তৃতীয়তঃ, পয়ার-সমূহের মর্ম্মে বুঝা যায়, অভিনয়-শিক্ষাদানের পূর্ব্বেই দেবদাসীদের স্নান-ভূষণাদির কার্য্য নির্ব্বাহ হইত; অভিনয়-শিক্ষা-ব্যাপারে বেশ-ভূষার অভিপ্রেত পারিপাট্য এবং গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্যাদির প্রকটন অপরিহার্য্য বলিয়া পূর্ব্বেই স্নান-ভূষণাদির প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, দেবদাসীদ্বয়ই যদি পরস্পর পরস্পরের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দনাদি করিতেন, তাহা হইলে এই কার্য্যেই দুর্ব্বলা কোমলাঙ্গী তরুণীদের যে শ্রম ও ক্লান্তি জন্মিত, তাহাতে শিক্ষানুরূপ অভিনয়-অভ্যাসের পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা করিয়াও হয় তো রায় মহাশয় নিজেই অভ্যঙ্গাদি নির্ব্বাহ করিতেন।

তারপর, বেশ-ভূষা রচনার কথা। রামানন্দরায় নিজ হাতেই দেবদাসীদের সমস্ত অঙ্গে যথাযোগ্য বেশ-ভূষা রচনা করিয়া দিতেন।

স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গমণ্ডন।

মণ্ডন অর্থ ভূষণ (শব্দকল্পদ্রুম)। মণ্ডন চারি-রকমের; বস্ত্র, অলঙ্কার,

মাল্য ও অনুলেপ (চতুঃসমাদি)। এই চারি-রকমের মণ্ডনের দ্বারাই রামানন্দ দেবদাসীদ্বয়কে সাজাইতেন।

অভিনয়-অভ্যাসের পূর্ব্বেই রামানন্দরায় নিজ হাতে দেবদাসী দুইজনকে স্নান করাইতেন; স্নানের পরেও তিনি নিজ হাতেই তাঁহাদের বেশ-ভূষা রচনা করিতেন। এই যে বেশ-ভূষা রচিত হইত—দেবদাসীদ্বয় সচরাচর যেরূপ বেশ-ভূষা করিতেন, তাহা সেরূপ বেশ-ভূষা ছিল না; অভিনয়ের উপযোগী বেশ-ভূষণেই রায় মহাশয় তাঁহাদিগকে সজ্জিত করিতেন। এই কার্য্যটী রামানন্দরায় ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারাই সম্ভব হইত না—এমন কি, দেবদাসীদ্বয়ও নিজেরা নিজেদের ভূমিকা-উপযোগী বেশ-ভূষা রচনা করিতে পারিতেন না। কারণ, যে পাত্র বা পাত্রীর ভূমিকা তাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের কে কি বর্ণের কিরূপ বসন কিভাবে পরিধান করেন, কোন্ বর্ণের কি আকারের মণিমুক্তাদির, বা কি ফুলের কি রকম মাল্যাদি কি ভাবে বেশ-ভূষার অন্তর্ভুক্ত করেন, কি কি অলঙ্কার কোন্ কোন্ অঙ্গে ধারণ করেন, এবং কি রকম অনুলেপাদি কোন্ কোন্ অঙ্গে ধারণ করেন,—ব্রজরস-রসিক বিশাখা-স্বরূপ রায়রামানন্দই তাহা জানিতেন, দেবদাসীদের পক্ষে তাহা জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তাই রায়মহাশয় নিজ হাতে তাঁহাদিগকে অভিনয়ের অনুরূপ বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়াছিলেন।

* * * *

এক্ষণে আবার আপত্তি উঠিতে পারে যে, যদি কেবল মাত্র অভিনয়-শিক্ষার আনুকূল্যার্থই রামানন্দ এ সব করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে দেবদাসীদের অঙ্গ-সেবা-সময়ে তিনি তাঁহাদিগের প্রতি সেব্যবুদ্ধির আরোপ এবং নিজেদের প্রতি দাসী-ভাবের আরোপ করিতেন কেন?

সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসী-ভাব করে আরোপণ॥

উক্ত পয়ারটীর আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিষ্কার হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইনি আমার সেব্য (সেবনীয়), আর আমি তাঁহার সেবক, এইরূপ বুদ্ধিই

আরোপ-শব্দের অর্থও বিবেচনা করা দরকার। যে বস্তু স্বরূপতঃ যাহা নহে, সেই বস্তুকে তাহা বলিয়া মনে করাকে আরোপ বলে। একজন দরিদ্র-ভিক্ষুক যদি কোনও অভিনয়ে রাজা সাজে, আর যদি তখন কেহ তাহাকে রাজা বলিয়া মনে করে, এবং তাহার সহিত রাজোচিত ব্যবহার করে, তাহা হইলেই বলা যায় যে, ভিক্ষুকে রাজ-বুদ্ধি আরোপ করা হইয়াছে।

দেবদাসীতে সেব্যবুদ্ধির আরোপ করিয়া রামানন্দ তাঁহাদের সেবা করিতেন; এস্থলে, "আরোপ" শব্দ হইতেই বুঝা যায় যে দেবদাসীদ্বয়, স্বরূপতঃ রামানন্দের সেব্যা ছিলেন না, তিনিও স্বরূপতঃ তাঁহাদের সেবক ছিলেন না; তথাপি, তাঁহাদের অঙ্গ-সেবা-সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের সেব্যা বলিয়া মনে করিতেন।

রামানন্দের "স্বাভাবিক দাসীভাব" সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা দরকার।

রামানন্দের স্বাভাবিক ভাব—স্বরূপগত ভাব কি? গোস্বামি-শাস্ত্রানুসারে রামানন্দ ব্রজলীলায় বিশাখা-সখী ছিলেন। শ্রীমতী ভানু-নন্দিনীর সখীবর্গও নিজেদিগকে শ্রীমতীর দাসী বলিয়াই অভিমান করিতেন; দাসী-অভিমানেই তাঁহারা আনন্দ পাইতেন; ইহাই তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব ছিল। রামানন্দের "স্বাভাবিক ভাব" বলিতে স্বরূপতঃ বিশাখার ভাবকেই—সেবাপরায়ণা স্ত্রীলোকের ভাবকেই বুঝায়।

রামানন্দ ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধ পরিকর বিশাখা-সখী হইলেও, সুতরাং তাঁহার পক্ষে সাধনভক্তির কোনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন না থাকিলেও, কলিহত জীবকে ভজন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও যেমন সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিকরবর্গও তদ্রূপ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাই, রায়-রামানন্দও সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের ভজন কিরূপ ছিল, তাহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানিতে পারা যায়। রামানন্দ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন:—

ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥

হৃদরোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয় ॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥
যে শুনে যে পায় তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥
তার ফল কি কহিব কহন না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায় ॥
রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহতুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পঃ।

উক্ত পয়ারসমূহ হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—রামানন্দ রায় রাগানুগীয়-মার্গে মধুর-ভাবের উপাসক ছিলেন; এইরূপ উপাসক নিজেকে শ্রীমতী ভানু-নন্দিনীর কিঙ্করী বা দাসী বলিয়া অভিমান পোষণ করেন। রামানন্দরায়ের এই অভিমান—আমি শ্রীশ্রীরাধারাণীর দাসী এই অভিমান—এতই পরিস্ফুট এবং দৃঢ় ছিল যে, এই ভাবটি তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াই গিয়াছিল; তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁহার ভাবকে "স্বাভাবিক দাসীভাব" বলিয়াছেন।

দেবদাসীদের অঙ্গ-সেবা-সময়ে রামানন্দরায় নিজের উপরে দেবদাসীদের দাসীত্ব আরোপ করিতেন; তিনি স্বরূপতঃ দেবদাসীদের দাসী না হইলে, তাঁহাদের অঙ্গ-সেবা-সময়ে নিজেকে তাঁহাদের দাসী (দাস নহে—স্ত্রীলোক দাসী) বলিয়া মনে করিতেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, রামানন্দের দাসী ভাব তো স্বাভাবিকই; তবে আর "আরোপ করেন" বলা হইল কেন? উত্তর—তাঁহার স্বাভাবিক দাসীভাব কেবল শ্রীমতী রাধারাণী-সম্বন্ধে, দেবদাসীদের সম্বন্ধে নহে। "আমি রাধারাণীর দাসী"—এই ভাবটিই তাঁহার স্বাভাবিক ছিল, "আমি দেবদাসীদের দাসী" এই ভাবটি তাঁহার স্বাভাবিক ছিলনা। তাই যে দাসী-ভাব শ্রীরাধারাণী-সম্বন্ধেই স্বাভাবিক ছিল, তাহা দেবদাসীদের-সেবার সময়ে দেবদাসীদের সম্বন্ধে নিজের উপর আরোপ করিলেন।

সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া এই পয়ারটী সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা দ্বারা, ইহার তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ উপলব্ধির চেষ্টা করা যাউক।

শ্রীল রামানন্দরায় দেবদাসীদ্বয়ের প্রতি সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিলেন, আর নিজের উপর তাহাদের দাসীভাব আরোপ করিলেন। কিন্তু এখানে সেব্য বলিতে কি বুঝায়? রামানন্দরায়ের সেব্য কে? তিনি রাগানুগা-মার্গে মধুর-ভাবের উপাসক, সুতরাং সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দই তাঁহার মুখ্য সেব্য; তবে কি তিনি দেবদাসীদ্বয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দরূপ-সেব্যবুদ্ধিরই আরোপ করিয়াছিলেন? না কি শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিকর-বুদ্ধির আরোপ করিয়াছিলেন? দেবদাসীদ্বয়ের একজনকে শ্রীকৃষ্ণ, অপরজনকে শ্রীরাধারাণী, অথবা একজনকে শ্রীমদনিকা এবং অপরজনকে শ্রীরাধারাণী বলিয়াই কি রাম-রায় মনে করিতেন? বোধ হয় তাহা নহে। রামানন্দরায় পরম-ভাগবত, সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যও ছিল। জীবে ঈশ্বর-বুদ্ধি যে অপরাধজনক, তাহা তিনি জানিতেন; তিনি জানিতেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

তিনি জানিতেন,

জীবে ঈশ্বর-বুদ্ধি এই অপরাধ চিন॥

তিনি জানিতেন—শ্রীভগবত্তত্ত্বে ও ঈশ্বর-কোটি-স্বরূপ চিচ্ছক্তির-বিলাসরূপ ভগবৎ-পরিকর-তত্ত্বে কোনও প্রভেদ নাই, তাই কোনও জীবকে শ্রীরাধা-ললিতা-মদনিকাদি ভগবৎপরিকর বলিয়া মনে করাও অপরাধজনক। সুতরাং দেবদাসীদ্বয়কে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, অথবা শ্রীরাধা-মদনিকা বলিয়া মনে করা রামানন্দ-রায়ের মত পরমপণ্ডিত ও পরমভাগবতের পক্ষে সম্ভব নহে।

কেহ হয় তো প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে কেন, ইহা অসম্ভব হইবে কেন? অদ্যাপিও তদ্রূপ আচরণ ব্রজধামাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবনে যে সমস্ত ব্রজবালক শ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজলীলার অভিনয় করেন, অভিনয়-কালে তাঁহাদের পিতামাতাদি গুরুজন পর্য্যন্তও তাঁহাদের সেবা-পূজা

দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া থাকেন ; যে বালক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনয় করেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ-বুদ্ধিতে পূজা করেন, যে বালক শ্রীরাধার ভূমিকা অভিনয় করেন, তাঁহাকে শ্রীরাধা-বুদ্ধিতে পূজাদি করেন।

এ সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই:—ব্রজবাসীরা যে এইরূপ আচরণ করেন, ইহা সত্য ; কিন্তু ইহা দুইভাবে সম্ভব হয়। প্রথমতঃ, অভিনয়-দর্শকগণের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা-অভিনয়কারী বালকে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হইয়াছে, তাঁহারা ঐ আবিষ্ট বালকেই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে পারেন—ইহা অস্বাভাবিক নহে। বালকই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—এই বুদ্ধিতে পূজাদি হয়না, বালকে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হইয়াছে, এই বুদ্ধিতেই পূজাদি। শ্রীরাধিকাদির ভূমিকা-অভিনয়কারী বালকদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারীতে যখন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল, তখন দর্শকবৃন্দ ব্রহ্মচারীকেও মহাপ্রভুবৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা, যতক্ষণ আবেশ ছিল, ততক্ষণ ; যতক্ষণ ব্রজবালকগণ লীলার অভিনয় করেন, ততক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদিগে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবেশ মনে করিয়া তাঁহাদিগের সেবা-পূজাদি করা হয়। অভিনয়ের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও যদি কেহ তাঁহাদের সেবা-পূজা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবর্গের অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন মনে করিয়াই তাহা করিয়া থাকেন। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হয়, কি, শ্রীরাধার আবেশ হয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার যে বিশেষ অনুগ্রহভাজন, বিশেষ প্রিয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সুতরাং ভগবৎ-প্রিয়বোধে তাঁহার সেবা-পূজাও অস্বাভাবিক নহে। দ্বিতীয়তঃ, অভিনয়-দর্শনকারীদের মধ্যে যদি এমন কোনও সুরসিক পরমভাগবত কেহ থাকেন যে, অভিনয়-দর্শনে তন্ময় হইয়া তিনি তাঁহার বাহ্যস্মৃতি হারাইয়া ফেলেন, তিনি যে অভিনয় দর্শন করিতেছেন, এই জ্ঞানই তাঁহার লোপ পাইয়া যায়, তিনি তখন একেবারে অভিনীত লীলাতেই প্রবিষ্ট হইয়া যায়েন, নিজের সিদ্ধদেহের আবেশে তিনি তখন মনে করেন, উক্ত লীলা-বিলাসোচিত পরিকরবর্গের সঙ্গে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই লীলা-বিলাস করিতেছেন, ভগ্যক্রমে তিনি তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। নিজের এইরূপ আবেশের অবস্থায় তাঁহার পক্ষে অভিনয়কারী ব্রজবালকদের সেবাপূজাদিও অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার নিজের যথাবস্থিত

দেহের স্মৃতি যেমন তখন তাঁহার থাকেনা, তদ্রূপ অভিনয়কারী বালকদের ব্রজবালকত্বের স্মৃতিও তখন তাঁহার থাকেনা; ব্রজবালকে কৃষ্ণবুদ্ধি আরোপ করিয়া তিনি সেবা-পূজাদি করেন না, তিনি সেবা পূজাদি করেন—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার পরিকরবর্গকে। এস্থলে জীবে ঈশ্বর-বুদ্ধি নাই। ইহা কিন্তু অভিনয়ের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সম্ভব নহে; কারণ, অন্য সময়ে তত্তৎলীলা-উপযোগী বেশ-ভূষা-আচরণাদির অভাবে তত্তৎ-লীলার উদ্দীপন সাধারণতঃ সম্ভব নহে।

রামানন্দরায় অভিনয় শিক্ষাদান আরম্ভের পূর্ব্বেই দেবদাসীদ্বয়ের অঙ্গসেবা করিতেন, তাঁহাদের অভ্যঙ্গমর্দ্দন করিতেন, স্নানাদি করাইতেন, বেশভূষাদি রচনা করিতেন। তখন তাঁহাদের অভিনয়োচিত বেশভূষা বা আচরণ থাকিত না; তখন থাকিত তাঁহাদের সহজ বেশ-ভূষা, সহজ আচরণ। সুতরাং তখন তাঁহাদের দর্শনে বা তাঁহাদের আচরণ দর্শনে ব্রজলীলার স্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধার বা মদনিকার আবেশ হইয়াছে, ইহা মনে করার কোনও হেতু তখন থাকেনা। অথবা লীলার অভিনয়-দর্শনে দর্শকের নিজের নিবিড় আবেশবশতঃ যে অভিনয়কারী-দের সেবাপূজাদি, তাহাও এস্থলে সম্ভব নহে; কারণ, এস্থলে কোনও অভিনয়ই নাই। সুতরাং অভিনয়ের পূর্ব্বে দেবদাসীদের অঙ্গসেবা-কালে শ্রীরাধাগোবিন্দ-বুদ্ধিতে, অথবা তাঁহাদের পরিকর-বুদ্ধিতে, কিম্বা তাঁহাদের আবেশবুদ্ধিতে দেবদাসীদের সেবা সম্ভব নহে।

তাহা হইলে "সেব্য-বুদ্ধি"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? মুখ্য সেব্য শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার পরিকর ব্যতীত ভক্তের পক্ষে আরও সেব্য আছেন। বৈষ্ণব-ভক্তও ভক্তের সেব্য, ভগবানের প্রিয়-ব্যক্তিরাও ভক্তের সেব্য, যাঁহারা ভগবানের সুখজনক কোনও কাজ করেন, তাঁহারাও পরমভাগবতদিগের সেব্য। ভগ-বানের প্রিয়পাত্রী, বা ভগবানের সুখবিষয়ক কার্য্যের সাধিকা-জ্ঞানেই বোধ হয় রামানন্দ রায় অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে দেবদাসীদের অঙ্গসেবা করিয়াছেন। কিন্তু দেবদাসীদ্বয়কে ভগবানের প্রীতিভাজন বা প্রীতিজনক কার্য্যের সাধিকা বলিয়া মনে করার পক্ষে রামানন্দরায়ের কি হেতু ছিল? হেতু এই—দেবদাসীগণ সাধারণ সাংসারিক-কার্য্যরতা রমণী নহেন। তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের

শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃতা, তাঁহারা শ্রীজগন্নাথেরই দাসী। বিশেষতঃ শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে নৃত্যগীতাদিদ্বারা শ্রীজগন্নাথের চিত্তবিনোদনের চেষ্টাই তাঁহাদের মুখ্য কাজ। তাঁহাদের নৃত্যগীতও সাধারণ লোকসমূহের মনোরঞ্জনের উপযোগী অসার উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যগীত মাত্র ছিলনা; তাঁহারা জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ-কীর্ত্তন করিতেন এবং তদুপযোগী নৃত্যাদিদ্বারা পদের ভাবসমূহকে শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে যেন একটা প্রকট রূপ দিতেন। রসিক-কবি শ্রীজয়দেব তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য শ্রীগীত-গোবিন্দে ব্রজরসের নিত্যনবায়মান যে অফুরন্ত অনাবিল উৎসের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, দেবদাসীদিগের নৃত্যগীতে তাহাই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের চিত্তকে অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতায় উন্মাদিত করিয়া দিত। দেবদাসীগণ যে জগন্নাথদেবের এইরূপ চিত্ত-বিনোদন-সেবা-কার্য্যের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হইতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের সৌভাগ্য এবং ইহাই তাঁহাদের প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপার পরিচায়ক। আর, শ্রীকৃষ্ণের অসোমোর্দ্ধ মাধুরীময় ব্রজলীলারসের সুনিপুণ পরিবেশনদ্বারা তাঁহারা যে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীতি-সম্পাদনের-প্রয়াস পাইতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীতির নিদর্শন। সুতরাং দেবদাসীগণ যে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রীতিভাজন এবং কৃপাপাত্রী, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভাজন জনগণের প্রতি পরমভাগবতদিগের যেরূপ সেবাবুদ্ধি জন্মে, রায়রামানন্দ দেবদাসীদ্বয়ের উপরে সেইরূপ সেব্যবুদ্ধির আরোপ করিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন। আর তাঁহার নিজের স্বাভাবিক দাসীভাব-আরোপ সম্বন্ধে কথা এই যে, শ্রীশ্রীরাধারাণীর দাসীত্বের অভিমান তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিকই হইয়া গিয়াছিল; অর্থাৎ স্ত্রী-লোক-অভিমান এবং তদনুরূপ মানসিক ভাব ও চেষ্টাদি রায়রামানন্দের প্রায় সহজ ভাবই ছিল। দেবদাসীগণ স্ত্রীলোক, তাঁহাদের অঙ্গসেবায় স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রীজনোচিত ভাবেরই প্রয়োজন; তাই রায়-মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্ত্রীলোক-অভিমান এবং স্ত্রী জনোচিত ভাব লইয়াই দেবদাসীদের সেবা করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের সেবা স্ত্রীলোক করিলে কোনওরূপ কুণ্ঠা, সঙ্কোচ বা চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা থাকেনা; তাই

দেবদাসীদের অঙ্গ-সেবা সময়ে রামানন্দরায়েরও কোনওরূপ কুণ্ঠা, সঙ্কোচ বা চিত্তবিকারের অবকাশ ঘটে নাই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। দেবদাসীদের অঙ্গসেবা রামানন্দ রায়ের নিত্যকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা; নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতে যত সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, তত সময় ব্যাপিয়াই তিনি অভিনয়-শিক্ষা-বিষয়ে নিতান্ত প্রয়োজন-বোধে তাঁহাদের অঙ্গসেবা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার অভিনয়-শিক্ষার আনুষঙ্গিক সাময়িক কার্য্যমাত্র।

আরও একটি কথা। দেবদাসীদের অঙ্গসেবা রায় রামানন্দের ভজনের অঙ্গ ছিলনা। তাঁহার সেবক প্রদ্যুম্নমিশ্রের নিকটে স্পষ্টই বলিয়াছেন, কেবল-মাত্র অভিনয়-শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি দেবদাসীদের নিয়া উদ্যানে গিয়াছিলেন।

তাহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিক্ষা আবর্ত্তনে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন, দেবদাসীদিগকে লইয়া রামানন্দ নিজ নাটকের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে

নানা ভাবোদ্গার তারে করায় শিক্ষণ॥

গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন,

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারি-সাত্ত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ॥
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥

রামানন্দ রায়ের ভজন-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন, "রাগানুগা-মার্গে জানি রায়ের ভজন।" তিনি রাগানুগীয়মার্গে মধুরভাবের ভজন করিতেন। রাগানুগীয় ভজন বলিতে প্রভু কি মনে করেন, তাহা সনাতন-শিক্ষাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু বলিয়াছেন, রাগানুগীয় ভজনের দুইটী অঙ্গ—বাহ্য ও অন্তর। যথাবস্থিত দেহের সাধনই বাহ্যসাধন; এই বাহ্যসাধনে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব-বিধা বা চতুঃষষ্টি-অঙ্গ-ভজনের কথাই প্রভু উপদেশ করিয়াছেন।

বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন ॥

—মধ্য, দ্বাবিংশ পঃ।

আর, অন্তর-সাধন-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন,

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন চিন্তে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

অন্তর সাধন যথাবস্থিতদেহের সাধন নহে; যথাবস্থিতদেহের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার কোনও সংশ্রব নাই। ইহা গুরূপদিষ্ট অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ-দেহের সাধনমাত্র—এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে নিজের অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের পরিকরদের আনুগত্যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবার মানসিক চিন্তা মাত্র। গোদাবরী-তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সাধনতত্ত্ব বিচার-প্রসঙ্গে রামানন্দ রায় নিজেও একথাই বলিয়াছেন; সুতরাং প্রভুর উপদিষ্ট রাগানুগীয় ভজন-প্রণালীই যে রায় মহাশয়েরও ভজন-প্রণালী, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। কিন্তু রামানন্দরায়ের নিজের মুখে ব্যক্ত তাঁহার ভজন-প্রণালীতে, কিম্বা সনাতনের নিকটে প্রভুর নিজমুখে ব্যক্ত ভজনপ্রণা-লীতে—কোনও স্থানেই স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে ভজনের কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না। প্রভু বরং পরিষ্কাররূপে স্ত্রীলোকের সংশ্রব-ত্যাগের নিমিত্তই উপদেশ দিয়াছেন—স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু ইত্যাদি বাক্যে। ছোট হরিদাসের বর্জ্জনে এবং দামোদরের বাক্যদণ্ডেও প্রভু ঐ শিক্ষাই প্রকট করিয়াছেন। অধিকন্তু, সাধকের পক্ষে স্ত্রীলোকের দর্শন পর্য্যন্তও যে বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অকল্যাণকর, ইহাই প্রভু বলিয়াছেন।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষো র্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হা হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

দেবদাসীদের অঙ্গসেবা সেবকের বাহ্যদেহের বা যথাবস্থিত দেহেরই কাজ, ইহা অন্তশ্চিন্তিতদেহের কাজ নহে। কিন্তু চৌষট্টি-অঙ্গ বা নববিধা সাধন-ভক্তির মধ্যে কোনও রমণীর অঙ্গসেবা-রূপ, অথবা কোনও রমণীর সাহচর্য্যরূপ কোনও ভজনাঙ্গের উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং দেবদাসীদের

সাহচর্য্য যে রায়রামানন্দের ভজনাঙ্গ নহে, বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িক কার্য্য-মাত্র, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

আমার কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাইব?

এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে আদিতে আমি নিত্য বীজ বা জীবরূপে আদি-পুরুষ ভগবানের মধ্যে ছিলাম। বাসনায় চালিত হইয়া এই প্রপঞ্চ-রঙ্গমঞ্চে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার অনুকূল-বিষয়ে রাগ এবং প্রতিকূল-বিষয়ে দ্বেষ আছে। এই রাগ-দ্বেষ হইতে শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-বিষয়ে সম্যকরূপে মোহ উপস্থিত হইয়াছে। এই মোহেই আমার মৃত্যু হয়; এই মোহেই আমার জন্ম হয়। মোহে মোহে ক্রমেই আমার সম্যক্ মোহ বা সম্মোহ হইয়া পড়ে। আলোর বিপরীত যেরূপ অন্ধকার, সেইরূপ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত আমার সম্মোহ। সম্মোহই বিস্মৃতির কারণ; বিস্মৃতিতে যাহা সত্য তাহা স্মরণ হয় না এবং জানা যায় না। তাই কে আমার পিতা, কে আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কিছুই মনে নাই। আমার এই শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা শ্রীভগবানই বলিয়া দিতেছেন—

> ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
> সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥
>
> গীতা—৭।২৭

ভবিষ্যতে আমি কোথায় যাইব এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত থাকিতে পারে। কিন্তু এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, এখানে আমি এইরূপে এই অবস্থায় চিরকাল থাকিব না। একদিন না একদিন আমাকে এই দেহত্যাগ করিয়া যাইতে হইবেই। আমার নীচে সাতটী পাতাল বা অধঃলোক এবং উপরে

ছয়টী স্বর্গ বা উর্দ্ধলোক আছে। আমি বর্ত্তমান সময়ে ভূলোকে আছি। ইহার উর্দ্ধে ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক আছে। পিতৃলোক চন্দ্রলোক প্রভৃতি ভুবর্লোকের মধ্যে বলিয়া মনে হয়। স্বর্লোক স্বর্গ—দেবতাদের লোক এখানে অশেষ বিশেষে প্রাকৃত বিষয় ভোগ হইয়া থাকে। ইহাকে ভোগলোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যজ্ঞানুষ্ঠানকারী মুনি-ঋষিগণ মহস্ত জনলোকে থাকেন। এখানে ভৃগ্বাদি ঋষিগণ আছেন। তপলোক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ধ্যানপরায়ণ ঋষিগণের বাসস্থান; এখানে চতুঃসন আছেন। সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোক। এখানে নারায়ণের পুত্র ব্রহ্মার হেড-কোয়ার্টার। এই গেল প্রাকৃত-লোকের সীমা। ইহার উপরে চিন্ময় কারণ সমুদ্র। কারণ-সমুদ্রের উপরে সিদ্ধলোক। ইহাকে নির্বিশেষ-ব্রহ্মলোক বা মুক্তিপদও বলা হয়। যাঁহারা নিরাকার বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, এবং প্রপঞ্চে মধ্যে শ্রীভগবান যে সব অসুরকে নিহত করেন, তাঁহারা এই লোকে স্থান প্রাপ্ত হন। এই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে বৈকুণ্ঠ-লোক। বৈকুণ্ঠ অনন্ত; অনন্ত ভগবৎস্বরূপের নিত্যধাম। বৈকুণ্ঠের উপর গোলাক বৃন্দাবন বা কৃষ্ণলোক। কৃষ্ণ স্বরূপ-শক্তির বিলাস অন্তরঙ্গগণ লইয়া অনাদিকাল হইতে এই নিত্যধামে অলৌকিক নরলীলা করিয়া থাকেন। সনাতন হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিলে এই নিত্যধামের বিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যায়। গীতায় ইহার দিগ্‌দর্শন আছে—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগত॥

এই জগত আমার পরা-প্রকৃতি দ্বারা ধৃত হইয়া আছে। "এই জগত" বলাতে—ঐ জগত, সেই জগত, বা অন্য আর একটী জগত সূচিত হইতেছে। সেই জগত বা নিত্যধাম ভগবানের স্বরূপ-শক্তির দ্বারাই নিত্যধৃত। এই জগতের চন্দ্র-সূর্য্য সেই জগত প্রকাশ করিতে পারে না। সেই জগতের কিরণ-কণাভাস পাইয়াই দৃশ্যমান চন্দ্র-সূর্য্য এই জগত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই ধাম-সম্বন্ধে ভগবান বলিতেছেন—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

গীতা—১৫।৬

সেই ধাম সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশিত করিতে পারে না।

যেখানে জন্ম-মৃত্যু নাই, সেই অমৃত-জগতে যাইতে পারিলে আর এই মর্ত্ত জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"—গীতা ১৫।৬

এখন দেখা যাউক মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাইব।

মৃত্যুকালে আমার যে ভাব থাকিবে সেই ভাবানুসারেই আমার গতি হইবে। ইহাই হইতেছে দেহাবসানে প্রাপ্তি বিষয়ের প্রধান সূত্র—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
—গীতা ৮।৬

যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে নিবিষ্টচিত্ত থাকায় সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ আমার জীবনব্যাপী সাধনা বা ভাবের প্রাধান্যই অন্তিমকালে বিদ্যমান থাকিবে। আমি যদি তমোগুণে আসুরভাবাপন্ন হইয়া জগতে অসুরের অভিনয় করি, স্বপরদেহে অবস্থিত পরমাত্মা ভগবানকে দ্বেষ করিয়া সংসার অশান্তিময় করিয়া তুলি, তবে নরাধম আমি আসুর-যোনি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পশু-যোনির দিকেই অগ্রসর হইব। শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥
গীতা ১৬।১৯—২০

আমি স্বপরদেহে আমার বিদ্বেষী সেই সকল ক্রূরকর্ম্মা নরাধম পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে সংসারে আসুরী-যোনিতেই নিরন্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়, সেই মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী-যোনি প্রাপ্তি হওয়ায় আমাকে না পাইয়া তদপেক্ষাও নিকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয়।

তমোগুণে অধোগতিই হইয়া থাকে,

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥
গীতা—১৪।১৮

জঘন্য গুণবৃত্তিতে অবস্থিত তমঃ-প্রধান-জনগণ অধোগামী হয়।

"প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।"—গীতা ১৪।১৫

তমোগুণের বৃদ্ধিকালে প্রাণত্যাগ করিলে, লোক পশ্বাদি মূঢ়-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

মৃত্যুকালে যদি আমার তৃষ্ণামূলক রজোগুণ প্রবল থাকে, তবে আবার আমি মনুষ্যকুলেই জন্মগ্রহণ করিব।

"মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ॥"—গীতা ১৪।১৮

রজঃ-প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যলোক অর্থাৎ ভূলোকে জন্মগ্রহণ করে।

"রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে॥"

গীতা—১৪।১৫

রজোগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যাঁহারা লয়প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য-লোকে জন্মগ্রহণ করেন।

ভোগ-বাসনায় যদি যথাবিধানে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করি, তবে আমি মেনকা উর্ব্বশীর স্বর্গলোক লাভ করিব।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

গীতা—৯।২০

বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্মপরায়ণ জনগণ যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞ-শেষ সোমরস পান করেন এবং তদ্দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। ঐ সকল ব্যক্তি পুণ্যফলরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবফল-সকল ভোগ করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে সত্বগুণ প্রবল থাকিলে আমার উর্দ্ধলোকেই গতি হইবে।

"উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা"। গীতা—১৪।১৮

সত্ত্ব-প্রধানগণ উর্দ্ধলোকে গমন করেন।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥

গীতা—১৪।১৪

যখন সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত, তখন যদি দেহধারী লয়প্রাপ্ত হন, তবে তিনি উত্তম হিরণগর্ভাদি দেবোপাসকগণের প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হন। সত্ত্বগুণের তার-তম্যানুসারে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আমার গতি হইতে পারে।

আমি যদি ব্রহ্ম উপাসনা করিয়া সিদ্ধ হইতে পারি, আমি যদি অন্তকালে ব্রাহ্মী স্থিতিতেই থাকিতে পারি, তবে আমি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করিয়া পরপারে মুক্তিপদে প্রবেশ করিব।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।

গীতা—২।৭২

হে পার্থ, ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী; ইহা পাইয়া লোক সংসার-মোহ প্রাপ্ত হননা; মৃত্যুকালেও ইহাতে অবস্থান করিতে পারিলে তিনি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। আমি যদি যোগসাধনায় সিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারি, তবে যোগসাধ্য অন্তর্যামী পরমাত্মা পরমপুরুষকে লাভ করিব।

প্রয়াণকালে মনসাচ বলেন—

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ গীতা—৮।১০

যিনি অন্তকালে ভক্তিযুক্ত হইয়া অবিচলিত চিত্তে যোগবলে ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে আবেশিত করিয়া পরম পুরুষকে ধ্যান করে, তিনি সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে লাভ করেন। আমি যদি ভক্তিযোগে স্বয়ং ভগবানের ভজনা করিয়া, সিদ্ধ হইতে পারি, তবে নিত্যধামে প্রবেশ করিয়া ভগবানকেই লাভ করিব।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

গীতা—৮।১৪

যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে সর্ব্বদাই স্মরণ মনন করেন, হে পার্থ, নিত্যযুক্ত সেই বিশুদ্ধ ভক্তযোগীর পক্ষে আমি অনায়াসলভ্য।

যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্‌।

গীতা—৯।২৫

যাঁহারা আমার আরাধনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন।

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।

গীতা—১৮.৬৫

শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমার শুদ্ধ ভক্ত হইলে আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে। তুমি আমার প্রিয়, অতএব তোমাকে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—ইহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে।

গুণাতীত হইয়া ব্রহ্ম পরমাত্মা বা ভগবানকে লাভ করিলে আর আমাকে জন্মমৃত্যুর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।

গীতা—৮.১৫

শ্রীভগবান বলিতেছেন—মহাত্মাগণ আমার অভিন্ন অংশ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এবং স্বয়ং আমাকে প্রাপ্ত হইয়া আর দুঃখের আলয়স্বরূপ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হনন', তাহারা পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

কিন্তু ভূবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপ এমন কি ব্রহ্মলোক হইতেও ফিরিবার ভয় আছে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

গীতা—৮।১৬

শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, ব্রহ্ম-লোক হইতেও জীবগণ পুনরায় ভু-লোকে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে পাইলে আর লোকের পুনর্জ্জন্ম হয় না।

উর্দ্ধে যাইবার দুই পথ আছে,—যেটীতে গেলে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহার নাম কৃষ্ণাগতি; সাধারণতঃ প্রবৃত্তিমার্গের সাধকগণ এই পথে গমন করিয়া থাকেন। যেটীতে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না—তাহার

নাম শুক্লাগতি। সাধারণতঃ নিবৃত্তিমার্গের সাধকগণ এই পথে গমন করিয়া থাকেন।

শুক্ল কৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥

শুক্লাগতি এবং কৃষ্ণাগতি—জগতের এই দুই মার্গ জ্ঞানাধিকারী ও কর্ম্মাধিকারীগণের পক্ষে অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে, প্রথমটী দ্বারা আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, অন্যটীতে গেলে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়।

ভক্তকে ঐ দুই পথের কোনও পথেই যাইতে হয় না। তাঁহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত—স্বয়ং ভগবানই তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈবযোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎপার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥

গীতা—১২। ৬—৭

স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন—যাহারা আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপর হইয়া—অনন্য ভক্তিযোগ সহকারে ধ্যান-নিরত হইয়া আমার উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই শুদ্ধ ভক্তগণকে আমি—এই আমিই—অচিরাৎ মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে সম্যকরূপে উদ্ধার করিয়া থাকি।

অতএব আমি যদি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হইয়া মরিতে পারি,—তবেই আমার পরম এবং চরম প্রাপ্তি।

এই পরম এবং চরম প্রাপ্তির জন্যই অন্তিমকালে এই মহামন্ত্রদানের ব্যবস্থা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন।

[সম্পন্ন-রসোদ্গার]

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'সম্পন্ন সম্ভোগের যে রসোদ্গার, তাহাকেই 'সম্পন্ন-রসোদ্গার' বলা হয়। রসশাস্ত্রের মতে সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ,—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ সম্ভোগের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্পন্ন-সম্ভোগ ও উহার রসোদ্গার-বিষয়ক গোবিন্দদাসের পদাবলীর আলোচনা করিব।

'উজ্জ্বল-নীল-মণি-গ্রন্থে লিখিত আছে—

"মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্ব্বিধঃ।
তান্ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়ঃ ক্রমাৎ।
জাতান্-সংক্ষিপ্ত-সংকীর্ণ-সম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ॥

অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় যে মুখ্য সম্ভোগ হয়, উহা চতুর্ব্বিধ; উহা যথা-ক্রমে পূর্ব্ব-রাগ, মান, অদূর-প্রবাস ও সুদূর-প্রবাসের পরে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে এবং উহাদিগকে যথা-ক্রমে সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও ঋদ্ধিমান্ কিংবা সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলা হয়। তাহা হইলেই জানা গেল যে, অদূর-প্রবাসের পরে যে সম্ভোগ ঘটে, উহাই সম্পন্ন-সম্ভোগ এবং উহার রসোদ্গারের নামই 'সম্পন্ন-রসোদ্গার'।

রস-শাস্ত্রে 'অদূর' ও 'সুদূর'—দুই রকম প্রবাস উক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ইত্যাদি কার্য্য-উপলক্ষে অল্প সময়ের জন্য যে প্রবাস, উহাকে 'অদূর প্রবাস' ও কংস-বধের জন্য মথুরায়, দীর্ঘ-কালের প্রবাসকে 'সুদূর-প্রবাস' বলা হয়।

শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনারা কেবল রূপ ও যৌবনে অতুলনীয় ছিলেন না; তাঁহাদের বৈদগ্ধীও অতুলনীয় ছিল। "রস-মঞ্জরী" নামক সুপ্রসিদ্ধ রস-গ্রন্থে 'বিদগ্ধা' নায়িকার লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—

"গুপ্ত-প্রেমে নিপুণা যে **বিদগ্ধা** সে হয়,—
বাক্যে ও **ক্রিয়ায়**— দুই মতে পরিচয়; *

* এই 'বাক্-বিদগ্ধা' ও 'ক্রিয়া-বিদগ্ধা' নায়িকার সরস বর্ণনা ও উহার

শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে গো-চারণ জন্য গমন করিতেন, তখন শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরী-গণ অনেক সময়েই 'স্বয়ং দূতী' সাজিয়া তাঁহার নিকট অভিসারে গমন করিতেন। এই 'স্বয়ং-দৌত্য'-অভিসারে তাঁহাদের বাক্-বিদগ্ধতা ও ক্রিয়া-বিদগ্ধতা—উভয়েরই অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যাইত। পদাবলী-সাহিত্যের "স্বয়ং-দৌত্য-লীলাটী বড়ই অপূর্ব্ব; আমাদের গোবিন্দদাস আবার এই লীলার বর্ণনায় সম্পূর্ণ অতুলনীয়; তিনি 'স্বয়ং-দৌত্য-লীলার যে সকল বিচিত্র ও উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অল্প একটু পরিচয় দিতে হইলেও সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কুলাইবে না; সুতরাং আমরা সে প্রয়াস করিব না; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অদূর-প্রবাসের সময়ে সঙ্ঘটিত এই "স্বয়ং দৌত্য" লীলা ও উহার পরিণাম 'সম্পন্ন-সম্ভোগ' রসের অপূর্ব্ব পদাবলীর রসাস্বাদন করিতে উৎসুক হইবেন, তাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত, মৎসম্পাদিত, 'পদ-কল্পতরু' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পল্লবগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। উহাতে গোবিন্দদাসের বিচিত্র অলঙ্কার ও ধ্বনি-পূর্ণ পদ-গুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও রস-বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

'পদকল্পতরু' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস উক্ত পল্লবগুলিতে 'স্বয়ং-দৌত্য' ও সম্পন্ন সম্ভোগ'-বিষয়ক পদাবলীর ও ৫ম পল্লবে 'রসালস' পদাবলীর সন্নিবেশ করিয়া, ৬ষ্ঠ পল্লবে সম্পন্ন-রসোদ্গারের পদাবলী সন্নিবেশিত করিয়াছেন; আমরা উহা হইতে গোবিন্দদাসের পদগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই সম্পন্ন-রসোদ্গারের সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, প্রেম ও উৎকণ্ঠার নিতান্ত প্রাবল্য না ঘটিলে কোনও নায়িকা স্বাভাবিক লজ্জা-সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া, এভাবে 'স্বয়ং-দূতি' সাজিয়া দিবা-অভিসারে গমন করিতে পারেন না। সুতরাং উহার পরিণামে যে 'সম্পন্ন-সম্ভোগ' ঘটে, তাহা অতিরিক্ত-মাত্রায় রস-সম্পন্ন বলিয়া 'সম্পন্ন' * নাম গ্রহণের উপযুক্ত বটে। এ অবস্থায় উহার

রস-বিশ্লেষণ মৎকৃত সংস্কৃত 'রসমঞ্জরীর পদ্যানুবাদের ২০—২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* 'সম্পন্ন' শব্দটী অধিকাংশ হস্ত-লিখিত পুথি ও মুদ্রিত সংস্করণে ভ্রষ্ট

রসোদ্গারও যে নিতান্ত উচ্ছ্বাস-পূর্ণ ও বেশ খোলাখুলি ভাবের হইবে, সহৃদয় পাঠক-বর্গ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। গোবিন্দদাসের সখীর প্রশ্নের পদ পাওয়া যায় নাই ; বৈষ্ণব দাস সেখানে জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসের দুইটী সুন্দর পদ দিয়াছেন। সখীর প্রশ্নেও শ্রীরাধার প্রেম-বিহ্বল-পরিস্ফুট হইয়াছে, যথা—

"চলিতে না পার রসের ভরে।
আলস নয়ান অলপ ঝরে॥" ইত্যাদি

শ্রীরাধা উত্তরে বলিতেছেন—

সুহই।

"অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক-মুকুট-মণি নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেনে করে॥ধ্রু॥
মোর অঙ্গ-সঙ্গ-আশে লালসা পাইয়া বৈসে
রসে পহুঁ বোলে জিলুঁ জিলুঁ (১)।
নিজ-অনুগত জনে গণিয়া রাখিহ মনে
এ তনু তোমারে দিলুঁ দিলুঁ (২)॥
আউলাঞা কবরী-ভার বেশ করে বার বার
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাঞা আপন উরে (৩) নূপুর পরায় মোরে,
চরণ পরশে কর-তলে॥
বধুঁয়া বলয়ে ধনি কালিয়া কস্তুরী (৪) খানি
ও রাঙ্গা চরণ-তলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর
নিগূঢ় মরম (৫) তার সাখী (৬)॥

---

(১) বাঁচিলাম। (২) দিলাম। (৩) উরুতে। (৪) 'কালিয়া কস্তুরী' শব্দের অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার দ্বারা এখানে কস্তুরীর সুগন্ধ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণ-বর্ণ অঙ্গটি বুঝানো হইয়াছে। (৫) মনোবাসনা (৬) সাক্ষী।

বিদগধ শ্যাম-রায় বসনে করয়ে বায়
আপনে যোগায় গুয়া-পাণ।
গোবিন্দ দাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনি
তেঞি (১) তুমি শ্যামের পরাণ॥"

এই সরল ও উচ্ছ্বাস-পূর্ণ বাঙ্গালা পদটীর রস-বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া আমরা রস-ভঙ্গ করিব না; সহৃদয় পাঠক নিজেই উহার আস্বাদন গ্রহণ করিবেন। আমরা এখানে শুধু একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। বাঙ্গালার বৈষ্ণব-কবিদিগের "ব্রজ-বুলী" ভাষা মিষ্টতায় বোধ হয়, একরকম অতুলনীয়ও বলা যাইতে পারে। আবার যে সকল কবি এই 'ব্রজ-বুলী" ভাষায় পদ-রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গোবিন্দদাস সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে অদ্বিতীয়; এখানে কিন্তু মহাকবি গোবিন্দদাসকেও শ্রীরাধার প্রাণের কথাটী ব্যক্ত করিতে যাইয়া, আমাদের সেই পণ্ডিত-কুল-অনাদৃতা চির-দুঃখিনী মাতৃ-ভাষারই শরণ লইতে হইয়াছে! গোবিন্দদাসের মাতৃ-ভক্তির ইহাই এক মাত্র দৃষ্টান্ত নহে; আমরা ইতিপূর্ব্বেও এরূপ দুই একটী পদ পাইয়াছি, আগে আরও পাইব। পাঠক মনে করিবেন না যে, গোবিন্দ দাসের হাত দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এখানে একটা বাঙ্গালা পদ বাহির হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস যে, সরল ও মর্ম্মস্পর্শী উক্তির জন্য মাতৃ-ভাষার সাহায্য না লইলে চলিতে পারে না, ইহা উত্তম-রূপে জানিতেন বলিয়াই গোবিন্দদাস এখানে মাতৃ ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন; আর যদি তিনি সেরূপ কিছু না ভাবিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই এই বাঙ্গালা-পদটী লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও উহা দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থিত হইবে; কেন না, এরূপ স্থলে একজন মহাকবির নিজের অজ্ঞাত-সারে যে ভাষা বাহির হইবে, উহাই যে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক সুতরাং ভাব প্রকাশের অধিক উপযোগী, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। উচ্ছ্বাস-পূর্ণ-প্রেম-কবিতার রচনায় এ জন্যেই সংস্কৃত হইতেও প্রাকৃতের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইয়াছে; সেইরূপ কবিতায় এ জন্যেই "ব্রজ-বুলী" হইতেও বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে।

(১) তাই।

বাঙ্গালার চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস আমাদিগের বিবেচনায় গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কবি না হইলেও, অনেক কৃতী সমালোচকও যে উহঁাদিগের সরল ও উচ্ছ্বাস পূর্ণ পদাবলীকে গোবিন্দদাসের পদাবলী হইতে উচ্চে স্থান দিয়া থাকেন—উহার ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা হয়। যাহা হউক, আমরা কথা-প্রসঙ্গে একটু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, এখন আবার আলোচ্য বিষয়েরই অনুসরণ করিব।

গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা প্রেম-গদ্‌গদ-কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—

সিন্ধুড়া।

"পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছনি দিয়ে (১)।
গইড়ের (২) কুটা-গাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই-বালাই তার নিয়ে (৩)॥ ধ্রু॥

হাত দিয়া দিয়া মুখানি মোছাঞা
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
কতেক যতনে পাইয়া রতনে
থুইতে ঠাঞি না পায়॥

কত না আদরে রসের বাদরে (৪)
নিমগন কৈল মোরে।
তিলে না দেখিলে নিমিখ তেজিলে
ভাসয়ে নয়ান-লোরে॥

সে হেন নাগর রসের সাগর
গুণের নাহিক সীমা।
দাস গোবিন্দে কহল আনন্দে
তুমি সে জান মহিমা॥"

পুনশ্চ—

গান্ধার।

"কাহারে কহিব কানুর পিরিতি
তুমি সে বেদনী (১) সই।
সে রস-সাধনে (২) ধস ধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই॥

ও নব নাগর রসের সাগর
আগর (৩) সকল গুণে।
সে সব চরিতি আদর পিরিতি
বুঝিয়া মরিব মেনে॥

পিরিতি-বোলে কত না ছলে সে
কি না সে আকুতি (৪) সাধে।
মান নাশিয়া মধুর ভাষিয়া
হাসিয়া মরম বাঁধে॥

সে মোরে কোলেতে করিয়া ভরিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া (৫)
পরাণ লইল পিয়া॥

কাঁচুয়া (৬) ফাঁড়িয়া সে রস লুটিয়া
ভাঙ্গিয়া মধুপ জনু (৭)।
কমল-কোরক ভরমে (৮) কি হেন
গুণে ত ঘূর্ণিত (৯) তনু॥

---

(১) দরদী (২) ব্যাকুলতায় (৩) পরিপূর্ণ (৪) (সংস্কৃত—'আকূত') অভীষ্ট (৫) নিন্দা করিয়া অর্থাৎ আমার মুখের কাছে চন্দ্র কোন্ ছার—এইরূপ মুখের প্রশংসা করিয়া (৬) (সংস্কৃত—'কঞ্চুক') কাঁচুলি (৭) যেন

ও দিঠি-চাতুরী   মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে   বুঝ না মরমে
দাস গোবিন্দ ছার॥

পুনশ্চ—

পঞ্চমঞ্জরী।

"সিনান (১) দোপর (২) সময়ে জানি।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি (৩)॥
কি কহিব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা॥ধ্রু॥
তাম্বুল ভখিয়া (৪) দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে (৫) পিয়া পাতয়ে হাথে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ-চিহ্ন-তলে লুঠয়ে (৬) তাই (৭)॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে (৮)॥
গোবিন্দদাসের জীবন-হেন।
পিরিতি বিষম মানহ কেন॥"

সাধারণ কোনও নায়িকা প্রিয়তমের একটু আদর-সোহাগ পাইলে গলিয়া যান ও আনন্দে আটখানা হন; শ্রীরাধার প্রিয়তম গোকুলের রাজ-কুমার শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তমার প্রতি যে আদর-সোহাগ দেখাইতেছেন, তাহা উদ্দাম কবি-কল্পনাকেও পরাস্ত করে। দ্বিপ্রহর বেলায় শ্রীরাধা স্নানে যাইবেন বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ আগে যাইয়া উত্তপ্ত পথে জল ঢালেন; শ্রীরাধা পান খাইয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন দেখিতে পাইলে চর্বিত তাম্বুলের প্রসাদ পাইবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যাইয়া হাত পাতেন; উহাতে সঙ্গিনীদের নিকট লজ্জা পাইয়া যদি শ্রীরাধা

(১) স্নান (২) দ্বিপ্রহর (৩) জল (৪) ভক্ষণ করিয়া (৫) বেলায় (৬) লোটায় (৭) সেখানে (৮) ভ্রমণ করে।

ঘরের ভিতরে চলিয়া যান, তাহা হইলে আরও বিপরীত ফল হয় ;—শ্রীকৃষ্ণ সেই রাস্তায় শ্রীরাধার পদ-ধূলির উপর গড়াগড়ি দিতে থাকেন ; সাক্ষাৎ দর্শন দূরের কথা,—যদি কখনও কোনও দিকে প্রিয়তমার অঙ্গের সৌরভও পান, তাহা হইলে মাতাল ভ্রমরের মত শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই চারিদিকে ঘুরিতে থাকেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাধারণ নায়িকার মত শ্রীরাধা ইহাতে আনন্দে আটখানা না হইয়া তাঁহার প্রিয়তম যে তাঁহার জন্য এ সকল অচিন্তনীয় প্রেমোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু নানা কারণেই তাঁহার পক্ষে উহার একাংশেরও প্রতিদান করার উপায় নাই, ইহা ভাবিয়া, তাঁহার এ আনন্দেও বিষাদ রাখিবার স্থান নাই ! আদর্শ-প্রেমের এরূপই অচিন্ত্য মহিমা বটে ; উহার আনন্দের নিকট যেমন সংসারের সকল সুখ তুচ্ছ ; তেমনি উহার বিষাদের নিকটও সংসারের সকল দুঃখ অকিঞ্চিৎকর বটে। শ্রীরাধার এ আনন্দ ও বিষাদ কেবল সহৃদয় প্রেমিকই কল্পনায় কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারিবেন ; ইহা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা সংসারে নাই। মহাকবি গোবিন্দদাস যে, শ্রীরাধার এই উক্তির মধ্যে তাঁহার প্রেম-সৌভাগ্যের বিশাল আনন্দটাকে সম্পূর্ণ উহ্য রাখিয়া, পুনঃ পুনঃ গেয়পদের ধ্রুব কলিটীতে তাঁহার অফুরন্ত বিষাদেরই প্রকাশ দ্বারা আমাদিগকে আদর্শ-প্রেমের একটা ধ্যান-গম্য অপূর্ব্ব আস্বাদন দিয়া গিয়াছেন, এ জন্যই আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ রহিব। সখী-স্থানীয় গোবিন্দদাস এই পদের ভণিতায় তাঁহার প্রিয়-সখীকে যে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তাহাও তাঁহারই উপযুক্ত বটে। তিনি বলিতেছেন—"ওগো গোবিন্দদাসের জীবন-তুল্য প্রিয় শ্রীরাধা ! তুমি কি জন্য প্রেমকে এরূপ বিষম মনে কর ? অর্থাৎ তুমি কি জাননা যে—

"অধিক জ্বালা তার, যার অধিক পিরিতি"।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, এম, এ।

ব্রজ-লীলা।

[২]

প্রেম।

শ্রীপত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় ব্রজলীলার তত্ত্বাংশ কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, যিনি করুণা করিয়া অবতীর্ণ হইয়া কলিহত জীবকে বৃন্দাবিপিনের রসকেলি-লীলা, ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমের মহিমা জানাইয়া গিয়াছেন, সেই পরমকরুণ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপাকণা যাচ্ঞা করিয়া ব্রজের ভাব বা প্রেমের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভাবই কার্য্যের প্রাণ। ভাবই কার্য্যের গৌরব দান করে। কোন কার্য্যের মূল্য বুঝিতে হইলে, যে ভাবের সঙ্গে উহা সম্পাদিত হয়, তাহা বুঝিতে হয়। তাই ব্রজসুন্দরীগণের লীলা-বিলাস বুঝিতে হইলে তাঁহাদের ভাবের সহিত পরিচয় আবশ্যক। ব্রজসুন্দরীগণ প্রেমময়ী। তাঁহাদের চিত্তেন্দ্রিয়-কায় প্রেমে গড়া। তাঁহাদের অখিল চেষ্টা প্রেমপ্রসূত, সুতরাং ব্রজপ্রেম বুঝিলেই ব্রজলীলা কথঞ্চিৎ বোঝা সম্ভব হইবে। ব্রজসুন্দরীগণের কেলিকলাপ লীলারসানভিজ্ঞ বিষয়-রস-মত্তচিত্ত সাংসারিক ইতর জনের নিকট অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হইলেও, তত্ত্বজ্ঞ রসিক জনের নিকট উহা পরম পবিত্র—প্রেমের পবিত্রোজ্জ্বল কিরণে সমুদ্ভাসিত। সেই প্রেম কি?

ব্রজপ্রেম অগাধ ও অনধিগম্য। "যিনি বলেন, আমি জানি প্রেমের পরিমাণ এই, প্রেমের এই প্রকার, ইহাই প্রেমের স্বরূপ, বা ইহাই প্রেমের স্বরূপ নয়, তিনি বেদবেত্তা হইলেও প্রেমের বিষয় কিছুই জানেন না।" সুতরাং আমি আজ প্রেমের দুই একটী লক্ষণের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব মাত্র। উপলব্ধির সৌকার্য্যার্থে আমরা লৌকিক প্রেমের বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিব।

আমরা কাব্যে, নাটকে, ইতিহাসে, উপন্যাসে সর্ব্বত্র প্রেমের কথা শুনিতে পাই। সর্ব্বত্রই প্রেমের ছড়াছড়ি, প্রেমে গলাগলি, প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন, আর প্রেমের সাধনা। বিলাতী উপন্যাস ত প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমসম্মিলন ব্যতীত উপন্যাসই হয় না। ইংলণ্ডের নাট্যাচার্য্য সেক্সপীয়রের নায়িকা সম্বন্ধে

জুলিয়েত আর বাংলার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাদিগের মধ্যে সূর্য্যমুখী প্রসিদ্ধা প্রেমবতী। ইহাদের প্রেম বা ভালবাসা সহিত—তথা লৌকিক প্রেম বা ভালবাসার সহিত—ব্রহ্মপ্রেমের সম্বন্ধ কি? অনেকে এই দুইকে এক অর্থে গ্রহণ করিয়া মহাভ্রমে পতিত হন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও এই ভ্রমে পড়িয়া শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া থাকেন।

কোন শাস্ত্র বা কথা বুঝিতে হইলে, তাহার পরিভাষার সাহায্যে বুঝিতে হইবে। সেক্ষপীয়র ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষায় নাটক লিখিয়াছেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত অনেক ইংরাজী শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেক্ষপীয়রের নাটক বুঝিতে হইলে ষোড়শ শতাব্দীতে কোন শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহা জানিয়া, তদনুসারে বুঝিবার চেষ্টা করিলেই যথাযথ বোঝা হইবে। অন্যথা, বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী শব্দার্থ দ্বারা সেক্ষপীয়রকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে পদে পদে তাহাকে ভুল বুঝাই হইবে। এস্থলে একটা গল্প মনে পড়িল। একদা জনৈক ইংরাজ এক পণ্ডিত মহাশয়ের উপর কোন কারণে রাগ করিয়া তাহাকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন, "রাস্কেল"। পণ্ডিত মহাশয় ইংরাজী জানিতেন না। তিনি ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন, "সাহেব, আমি কি রাস্কেল হইতে পারি। রাসে কেলি করেন যিনি তিনিই রাস্কেল—স্বয়ং শ্রীহরি। আমি তাঁহার দাসানুদাস।" পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে সাহেবের ইংরাজী বুলি বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও সেইরূপ তাঁহাদের ইংরাজী বা বাংলা ভাব ও ভাষার সাহায্যে শাস্ত্র বুঝিয়া ফেলেন। বলা বাহুল্য, অনেকের বোঝাই পণ্ডিত মহাশয়ের তুল্য হয়, সন্দেহ নাই।

লৌকিক প্রেমের বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? লৌকিক প্রেমের পাত্র মানুষ (জীব), আর উহার উদ্দেশ্য, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন—আত্মসুখ কামনা। বঙ্কিমচন্দ্র সূর্য্যমুখীর প্রেমের ক্রমোৎকর্ষের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, প্রথমস্তরে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের কুন্দ প্রেমের বিরোধী। কারণ, আত্মদৃষ্টি—স্ব-সুখানুসন্ধান। নগেন্দ্রনাথের কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পাইলে সূর্য্যমুখী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগিনী হইলেন, এমনকি, প্রাণত্যাগ করিতেও উদ্যতা হইলেন।

কিন্তু ক্রমে তিনি তাহার ভুল বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, তিনি আত্মসুখই খোঁজেন, নগেন্দ্রনাথের সুখ খোঁজেন না। তখন তিনি কুন্দের সহিত নগেন্দ্রনাথের মিলন, এমনকি, বিবাহ পর্য্যন্ত সংঘটন করাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু হৃদয়াবেগ যুক্তি মানেনা। তিনি যুক্তিদ্বারা হৃদয়াবেগকে সংযত করিতে প্রয়াস পাইলেন বটে, কিন্তু ভিতরে তুষানলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। কারণ ঈর্ষা, এবং ঈর্ষা আত্মসুখকামনাদ্যোতক। দোষ সূর্য্যমুখীর নহে, দোষ মায়িক প্রেমের স্বভাবের। মায়িক প্রেমের স্বভাবই এই—উহা সর্ব্বতোভাবে আত্মসুখানুসন্ধান-শূন্য হইতে পারেনা। আর লৌকিক প্রেমের পাত্র মানুষ চিরকাল মানুষই থাকে। চরমোৎকর্ষাবস্থায়ও উহা মনুষ্যাতিরিক্ত আর কিছু হইতে পারেনা। এই মায়িক প্রেম ধ্বংসশীল।

পক্ষান্তরে বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে ভগবানের প্রতি ভালবাসার সাধারণ নামই প্রেম বা ভক্তি। শাণ্ডীল্যসূত্রকার ভক্তির সংজ্ঞা করিয়াছেন, সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। শ্রীল রূপ-গোস্বামিচরণ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে ভগবৎ প্রীতির সাধারণ নাম করিয়াছেন, "রতি" এবং তরল, গাঢ় গাঢ়তর ইত্যাদি ভেদে উহাকে সাত শ্রেণীতে ভাগ করিয়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নাম ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সাতটীর এক বিশিষ্টস্তরের নামও প্রেম। কিন্তু যেমন প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুর অন্তর্গত একটি বায়ুর বিশিষ্ট নাম প্রাণ হইলেও, উহাদের সমষ্টিগত নামও প্রাণ; সেইরূপ এই সাত স্তরের একটির বিশিষ্ট নাম প্রেম হইলেও উহাদের সকল-গুলিকেও সাধারণ ভাবে প্রেম বলা হয়। এই প্রেমের পাত্র ভগবান্, আধার ভগবানের নিত্যপার্ষদগণ এবং নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ জীব। এই প্রেম অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু। এই প্রেমে প্রেমবান্ সর্ব্বতোভাবে আত্মসুখানুসন্ধান রহিত এবং প্রিয় অর্থাৎ ভগবৎসুখনিষ্ঠ। স্ব-সুখানুসন্ধান আসিয়া পড়িলে ভগবানে অর্পিত ভালবাসাও প্রেম হয় না, কামশব্দবাচ্য হইয়া পড়ে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-চরণ বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সার-নির্য্যাসরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রেমের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন,

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

শুধু আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা নহে, ভগবৎ সুখানিষ্ঠাময়ী প্রীতির সহিত ভগবৎ সেবাতে, ভক্তের বাসনা-ভাবসত্ত্বেও, ভক্তহৃদয়ে যে প্রেমানন্দের অমৃত-ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার প্রতি লিপ্সা জন্মিলেও, সে প্রীতি প্রেম-আখ্যা লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে, আত্মসুখানুসন্ধান-পূর্ণ ভগবৎ-প্রীতিই যদি কাম হয়, তবে ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসাময়ী মনুষ্যপ্রীতির ত কথাই নাই। উহা কামেরও কাম—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রোক্ত কামের ছায়া বা প্রতিবিম্ব। এস্থলে আমাদিগকে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রেমে যে আত্মসুখানুসন্ধান-রাহিত্য আছে, উহা বিচারমূলক হইতে পারে না। "প্রেম এমন এক পরম পদার্থ; যাহা বিবেচনার বিষয় হইলে অন্তর্ধান করে, এবং অবিবেচনার বিষয় হইলেও অন্তর্ধান করে। যখন শুদ্ধ অর্থাৎ অন্যাভিলাষ-শূন্য রাগযুক্ত মন বিবেচনা ও অবিবেচনা এই দুইটী রহিত হইয়া স্বভাবরূপ সিংহাসনোপরি বিরাজ করিতে থাকে, তখন প্রিয়সুখে যে সুখ হয়, সেই সুখই স্বভাবে অধিরূঢ় হইয়া প্রেমকে দেখাইয়া দেয়।" এখানে একটি বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মায়াবদ্ধ জীবের জ্ঞান ও বিচার লইয়াই সাধন আরম্ভ হয়। অথচ পরিপক্ব ভাবলাভের সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান ও বিচার লোপ পায়। সাধারণতঃ অজ্ঞানের পর জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে জ্ঞানের পর অজ্ঞান, বিচারের পর বিচারাভাব জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ সাধনের এমনি ইন্দ্রজালবৎ শক্তি আছে যে, যদি কাহারও ভাগ্যে ভক্তিরাণীর কৃপা হয়, তবে ভগবন্মাধুর্য্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ভগবদৈশ্বর্য্যের জ্ঞান ও বিচার বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এক্ষণে স্পষ্ট দেখা গিয়া থাকিবে যে, লৌকিক ভালবাসা আর ব্রজপ্রেম সম্পূর্ণ দুই বস্তু—ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত—একটি ঘোর তমিস্রা, আর একটি উজ্জ্বলতম ভাস্কর। একটি মায়িক সুতরাং ধ্বংসশীল, আর একটি চিন্ময় সুতরাং নিত্য, শাশ্বত।

এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে। কোন কোন সময় কোন বাক্য-বিশারদ প্রবীণ দার্শনিককেও বলিতে শুনা যায় যে,অনুশীলন দ্বারা লৌকিক ভালবাসা ব্রজপ্রেমে পরিণত হয়। তাঁহারা বলেন, যখন আমার বন্ধুর প্রতি ভালবাসা এমন গাঢ় হইয়া উঠে যে, বন্ধুর দেশের উপর দিয়া হাওয়া বহিয়া আসিয়া আমার শরীরে লাগিলেও, দেহে রোমাঞ্চাদির

সঞ্চার হয়, শুধু বন্ধু-স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, এমন নহে, বন্ধু-প্রীতিতে আমাকে গলাইয়া ফেলে। যখন একখণ্ড মেঘ বন্ধুর দেশের উপর দিয়া বহিয়া আসিয়া বন্ধুর বার্ত্তাবহরূপে আমার কানে কানে কত কথা বলিয়া দেয়, তখন সে বন্ধুর প্রতি ভালবাসা ব্রজপ্রেমান্তর্গত সখ্যরসে পরিণত হয়।' মধুর-রসাদি সম্বন্ধেও সেই কথা। এখানে একটা মস্তবড় কিন্তু আছে। যেমন লোহা পোড়াইয়া সোনা করা যায় না, ইহাও তেমনি অসম্ভব। সূর্য্যমুখীর প্রেম-বিশ্লেষণ-সময়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, লৌকিক ভালবাসার স্বভাবই এই যে, উহাতে ব্রজপ্রেমের লক্ষণসকল বর্ত্তিতে পারে না। উহার উৎকর্ষাবস্থায় কতকটা সাদৃশ্য জন্মিতে পারে বটে, (যেমন কায়ার সঙ্গে ছায়ার সাদৃশ্য) কিন্তু একত্ব একেবারেই অসম্ভব। উহা সর্ব্বতোভাবে স্ব-সুখানুসন্ধান-রহিত হইতে পারে না এবং উহার পাত্র মানুষ চিরকাল মানুষই থাকে। অধিকন্তু, কৃষ্ণপ্রেম সাধন বা অনুশীলনজাত নহে—উহা নিত্যসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনীশক্তি ভক্তহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া এক অসাধারণ বৈচিত্র্য ধারণ করতঃ প্রেম এই আখ্যা-প্রাপ্ত হয়।

এই প্রেম ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে পরাবধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীগণের অকৈতব প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা এক চমৎকার বস্তু—ব্রজলীলা যে এক বিস্ময়কর প্রেমের খেলা, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রজসুন্দরীগণ প্রত্যেকে এক একটি প্রেমের মূর্ত্তি; তাঁহাদের অখিল চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য। অন্যের কি কথা, তাঁহাদের জীবন-ধারণ, আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সকলই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির জন্য। আমরা আহার করি, রসনা-তৃপ্তির জন্য ও দেহ-পুষ্টির জন্য, ব্রজসুন্দরীগণ আহার করেন দেহ রক্ষার জন্য। দেহের প্রতি মমতাবশতঃ দেহরক্ষা বা দেহরক্ষার জন্য দেহরক্ষা তাঁহাদের কল্পনারও অতীত। তাঁহারা দেহরক্ষা করেন শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য,—এই দেহরক্ষা হইলে তাহা শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত হইবে, তাহা শ্রীকৃষ্ণসুখের হেতু হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা দেহরক্ষা করেন এবং দেহরক্ষার জন্যই আহার করেন। উপাদেয় আহার্য্য গ্রহণে তাঁহাদের আনন্দ হয় না, এমন নহে, কিন্তু আমাদের আনন্দ হয় জিহ্বা তৃপ্ত হয় বলিয়া, আর ব্রজসুন্দরীগণ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের

অধরামৃত ভক্ষণ করেন, তাঁহারা আনন্দিত হন, এহেন সুস্বাদু বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ভক্ষণ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া। শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত ভিন্ন যখন তাঁহারা আহার করেন, তখন তাহার স্বাদ বা স্বাদাভাবের দিকে তাঁহাদের কোন দৃষ্টিই থাকে না। ব্রজসুন্দরীগণ নিজদিগকে বস্ত্র-ভূষণে ভূষিত করেন বটে, কিন্তু আমরা উত্তম উত্তম পোষাক পরিধান করি দম্ভতৃপ্তির জন্য, সৌন্দর্য্য-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য, অথবা লোকরঞ্জনের জন্য, আর ব্রজসুন্দরীগণ, শ্রীকৃষ্ণ এই বসন-ভূষণ দেখিয়া সুখী হইবেন, এই ভাবিয়া—তাঁহাদের মনে ভাবান্তরের স্থান নাই।

সময় সময় ব্রজসুন্দরীগণের প্রেম বাহ্যদৃষ্টিতে কামের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও, উহা বস্তুতঃ কাম-গন্ধশূন্য। বিরহকালে কোন কোন প্রেয়সী বলিয়া থাকেন, "সখি, আমি অতিশয় তপ্তা হইয়াছি, শীঘ্রই আমাকে প্রাণনাথ-সমীপে লইয়া চল।" তখন তাঁহাকে আপাততঃ কামিনী বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার চিত্ত প্রেমপূর্ণ; যেহেতু তখনও স্বভাবতঃ তাঁহার চিত্ত প্রিয়-সুখনিষ্ঠ। সন্তাপ তাঁহার নিজের জন্য নহে, তাঁহার দেহ, তাঁহার বসন, তাঁহার ভূষণ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্য হইল না, এই ভাবিয়া তাঁহার অন্তরে দারুণ সন্তাপ উপস্থিত হয়। প্রিয় (ভগবৎ)—সুখের জন্য যে কাম উপস্থিত হয়, সে কামকে কাম বলা যায় না, তাহাকে প্রেম বলে।

কোন কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে সঙ্কেত-গামিনী করিয়াও আগমন করেন না। তখন শ্রীমতী মনস্তাপে অতি করুণভাবে ক্রন্দন করিয়া থাকেন। ইহাও প্রেমেরই পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীতে একান্ত অনুরক্ত হইয়াও, অন্য কোন প্রেয়সী কর্তৃক রুদ্ধ হইয়াই আগমন করেন না। সেই রমণীর সহিত রমণ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে সুখ পান না; সমস্ত রাত্রি শ্রীমতীর দুঃখচিন্তায় আকুল থাকেন। এ দিকে প্রেমধর্ম্ম-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, শ্রীমতী তখনই তাহা জানিতে পারেন। তাঁহার দুঃখ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দুঃখী হইতেছেন, এই কথা ভাবিয়াই তাঁহার অতিশয় মনস্তাপ জন্মিয়া থাকে, এবং আমার বেশ-ভূষণ বিলাস-পরিচ্ছদাদি বিফল হইল, তাঁহার সুখের জন্য হইল না।" এই ভাবিয়া তিনি ক্রন্দন করেন। শ্রীমতী যে মান করেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণসুখেরই জন্য। প্রাতঃকালে যখন

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট আসিয়া অতিশয় অনুনয় করিতে থাকেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তর্জ্জন করিয়া ক্রোধসহকারে বলিয়া থাকেন, 'তুমি সেই স্থানে যাও, পুনর্ব্বার সেই রমণীর সঙ্গসুখ অনুভব কর' ইহাও শ্রীকৃষ্ণসুখেরই জন্য, সুতরাং প্রেমজনিত।

মান করি প্রিয়া যদি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥—চৈঃ চঃ।

উভয়ের হৃদয় প্রেমে ভরপূর হইলেও উভয়েই যত্নপূর্ব্বক উহা গোপন করিয়া রাখেন। যেহেতু প্রেমরূপ প্রদীপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখদ্বারে বহিষ্কৃত না হয়, ততক্ষণ উভয় রসিকের হৃদয়রূপ গৃহকে স্থিরভাবে আলোকিত করিয়া রাখে; কিন্তু বাহির হইলে শীঘ্রই নিবিয়া যায় বা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রেম গোপন করিয়া শ্রীমতীর মুখ ও নয়নের সুষমা ও নিরুপম-মাধুরী বর্ণনা করিতে করিতে বিহারের নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকটন পূর্ব্বক কামই প্রকাশ করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ উহা কাম নহে, কামের ভাণ মাত্র।

রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে যে শ্রীমতীকেও ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেও আমরা প্রেমের এক অপূর্ব্ব খেলা দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই শ্রীমতীতে সমধিক অনুরক্ত। তিনি রাসবিলাসের মধ্যস্থলে হঠাৎ অন্য গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীমতীকে লইয়া অন্তর্ধান করিলেন, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বহুবিধ রমণ করিলেন, অন্যকান্তাগণকে একেবারে বিস্মৃত হইলেন, তখন রাগ সম্বন্ধ-প্রযুক্ত শ্রীমতী মনে ভাবিলেন, এই অপার সুধামৃত-সমুদ্র আমার সখীগণ দেখিতে পাইলেন না, তাহারা আমাদের বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইতেছে, সুতরাং যদি আমরা উভয়ে এস্থলে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করি, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া মিলিত হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন "প্রিয়তম, আর চলিতে পারিতেছি না। আমরা কিয়ৎকাল এখানেই অবস্থান করি।" রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর অভিপ্রায় জানিয়া মনে ভাবিলেন, 'এখন যদি প্রেয়সীকে লইয়া এখানেই অবস্থান করি, তবে কোন সুখই হইবে না; কেননা, প্রেয়সী সখীদের দুঃখচিন্তা করিয়া ব্যথিতা, তাহাতে আবার যদি সখীগণ এখানেই মিলিত হন, তবে আমার প্রতি কুটীল কটাক্ষ

করিবেন এবং রাধিকাকেও তিরস্কার করিবেন—তাহাতে আমাদের আরব্ধ-কেলিরস ভঙ্গ হইবে। পক্ষান্তরে তাহারা ক্রোধ করিয়া গৃহে গমন করিলেও রাস-বিনোদ-নৃত্যাদি সম্পন্ন হইবে না। তাহা হইলে শ্রীমতী যে আমাকে কৌতুকবশতঃ বলিয়াছিলেন, 'প্রিয়তম, অর্ব্বুদ ও লক্ষকোটী কুলবতীকে তুমি কি একসময়ে আলিঙ্গন করিতে পার? যদি পার, আমার দেখিতে বড় সাধ হইতেছে।" তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। এই সকল কথা ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, রাধিকাকে কিছুকালের জন্য ত্যাগ করিব—ইহাতে অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। গোপীগণ রাধিকাকে দোষ দিতে পারিবে না, সকল দোষ আমার ঘাড়েই পড়িবে।

রাধিকার অনুপম বিচ্ছেদজ্বর প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিবে ও আপনাদের গর্ব্ব দূর করিবে। আর সম্ভোগরস যেমন রাধিকাতেই অধিকরূপে সিদ্ধ, তেমনি বিপ্রলম্ভও তাহাতেই শতকোটীগুণ অধিক, ইহাও দেখিবে এবং মধুররস-সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভদ্বারা যে পরম পুষ্টিলাভ করে, তাহা দেখিয়াও লজ্জিত হইবে। তিনি এইরূপ স্থির করিলেন, কিন্তু মনোগতভাব খুলিয়া বলিলেন না, অনুরাগের সহিত রাধিকাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক কয়েকপদ যাইয়া, 'প্রিয়ে, ক্ষণকাল এইস্থানে বসিয়া থাক।" এই বলিয়া কোন মৃদুল প্রদেশে তাহাকে রাখিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অদৃশ্য হইলে, শ্রীমতী বিরহানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে ব্যাকুলিতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি দর্শন দিতে ব্যাগ্র হইলেন, এমন সময় গোপীগণও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুতরাং সকলের পুনর্মিলন হইল।

মিলনে সম্ভোগকালে যে গোপীগণের সুখ হয়, তাহাও বিচিত্র—প্রেমজনিত। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলনে যে সুখ হয়, তাহা আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থতা জন্য; কিন্তু গোপীগণ যে সুখ পান, তাহা নিজেন্দ্রিয় চরিতার্থতাজনিত নহে, আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সুখেরই জন্য।

এতদ্বারা ব্রজভূমির অনুরাগ ব্যাপারের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে কেবল বৃন্দাবিপিনের এই সকল অপূর্ব্ব রস-কেলির বার্ত্তা শুনাইয়াছেন, এমন নহে, মায়াবদ্ধজীবও ভগবৎকৃপায় বন্ধনমুক্ত হইয়া সেই প্রেমের খেলার সাথী হইতে পারে, ইহাও জানাইয়াছেন। তিনি

কেবল আমাদিগকে আমাদের সেই অত্যুচ্চ অধিকারের বাণী শুনাইয়াছেন, এমন নহে, তাহা পাবার উপায়ও তিনি আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়া-গিয়াছেন। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব এমনি প্রবল যে, আমার তাহাতে রতি জন্মিল না—মায়ার সেবায়, কামিনী-কাঞ্চনের সেবায় এ দুর্ল্লভ জন্ম বৃথা গোঁয়াইনু। শুনিয়াছি, সাধু-বৈষ্ণবের কৃপাই এ দুর্দ্দৈব-শক্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু সাধু-বৈষ্ণবে ভক্তিহীন এ অধমের সে কৃপার আশাই বা কোথায়? তবে বৈষ্ণব মহাত্মগণ অদোষদরশী ও পরম কৃপালু; এই ভরসা করিয়া তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা করি, এ পতিতকে নিজগুণে কৃপা করিয়া ব্রজের পথে টানিয়া লউন।

বৈষ্ণব-কৃপা-ভিখারী—
শ্রীহরিনারায়ণ মজুমদার।

ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।

দাক্ষিণাত্য দেশীয় জনৈক ভক্ত-রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী পদ্যাবলীতে গৃহীত হইয়াছে—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ঃ বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কুব্জায়াঃ কিমুনাম রূপমধিকং কিন্তৎসুদাম্নোধনং।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তি প্রিয়ো মাধবঃ।

বঙ্গানুবাদঃ—

ব্যাধের কি আচরণ ছিল, ধ্রুবের বয়ঃক্রম কি ছিল, গজেন্দ্রের কি বিদ্যা ছিল, কুব্জার কি রূপ ছিল, সুদাম-বিপ্রের কি ধন ছিল, বিদুরের কিবা বংশ ছিল এবং যাদবপতি উগ্রসেনেরই বা পৌরুষ ও পরাক্রম কি ছিল? তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন, ইহাতেই বেশ জানা যায়, ভক্তি-প্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই পরিতুষ্ট হয়েন, সদাচারাদি গুণ-সকলের দ্বারা কখন সন্তোষ লাভ করেন না॥

শ্লোকটীর মর্ম্মাবগ্রহ করিলে জানা যায়, বিদ্যা বুদ্ধি,রূপ যৌবন, বাগ্মিতা, কুলগৌরব, ধনসম্পত্তি, বলবিক্রম, বা সদাচার প্রভৃতি (১) কোন গুণেই ভগবান্ বশীভূত হয়েন না, তিনি কেবল ভক্তিই ভালবাসেন। এই জন্য তাঁহাকে ভক্তিপ্রিয় বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। ভক্তগণ কেবল ভক্তিসাধন দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে ও পাইতে পারেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলার বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীযুক্ত কবিরাজ গোস্বামী ভক্তির প্রাধান্য প্রদর্শনার্থ লিখিয়াছেন—

'ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্মজ্ঞানযোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥"

---

(১) শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারোহ্যপেক্ষ্যতে ॥ ৩৩

"যেহেতু সদাচারব্যতীত কাহারও কোনও কর্ম্ম সিদ্ধ হয়না, সুতরাং সকল বিষয়েই সদাচার আবশ্যক।"

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে সদাচারের নিত্যত্বও স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ, সদাচার-গ্রহণে মঙ্গল এবং সদাচার-ত্যাগে প্রত্যবায়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

যাহাহউক, সদাচারের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার অভিপ্রায় বোধহয় এই যে, অন্তরে যদি ভক্তি (অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সেবায় প্রবৃত্তি) না থাকে, তাহা হইলে কেবল বাহ্যিক সদাচারে শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন না। শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুও একথাই বলেন— "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।" এই কথাই আরও পরিস্ফুট-ভাবে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

সাক্ষাৎ-সেবায় প্রবৃত্তিহীন ব্যক্তি

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥"

সাক্ষাৎ-সেবায় যাঁহার প্রবৃত্তি নাই, অথচ যিনি যন্ত্রের ন্যায় ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানাদিরূপ সদাচার পালন করিয়া যাইতেন, তাঁহার ভজনকে প্রাণহীন ভজন বলা যায়; এইরূপ ভজনে অভীষ্ট-প্রাপ্তি সুদূরপরাহত।— সাঃ সঃ।

এবং নিজ উক্তির সমর্থনের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা উদ্ধবকে উপদেশচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেই সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও নিম্নে সে সকল তুলিয়া দিলাম।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

২০।২১ শ্লোকা—

শ্রীভগবান কহিলেন, 'হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িনী দৃঢ়া ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাস আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করিতে পারে না॥

আবার কহিলেন :—

হে উদ্ধব! আমি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কেবলা ভক্তিদ্বারা ক্রমে ক্রমে বশীভূত হই। যেহেতু আমি সাধুজনের আত্মা ও প্রিয়। অধিক কি আমাতে দৃঢ়তা প্রাপ্তা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।

এই জন্য শাস্ত্রে আছে—

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি (১) পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহিনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুভক্তি-বিহীন দ্বিজও চণ্ডালের অধম।

যখন চণ্ডালের কথা উঠিয়াছে, তখন ভক্তপ্রবর গুহক-চণ্ডালের কথার সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রামায়ণে লিখিত আছে শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষণের সহিত বনগমন করিয়া গুহক-চণ্ডালের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আবাস ত্যাগ করিতে উদ্যত ও প্রস্তুত হইলে গুহক নিতান্ত অধীর হইয়া বলিতেছেন—

"ভাই যাস্‌নে রে রামা মিতে ভ্রমিতে কাননে,
বড় হবি কাতর—বাজিবে রে তোর রাঙ্গাচরণে।

[১] কোন কোন গ্রন্থে বিষ্ণুভক্তি স্থানে 'হরিভক্তি' পাঠ আছে।

আমার যে চণ্ডালের কায়া,
জগতে নাই কারু মায়া,
তোরে দেখে কি হ'লো আমার,
প্রাণ কাঁদে কেনে ?
পুনরায় "গুহক বলে ছেরে ভাই,
যে চরণ তোর দেখ্তে পাই,
মনে মনে ভাবছি তাই,
কেমনে ভ্রমণ করিবি বনে।

কাঁদিবি রে ভাই ঘোর বিপদে,
কুশাঙ্কুর ফুটিলে পদে,
পাবি দুঃখ পদে পদে,
কি হবে ভাই সয়না আমার প্রাণে॥

দুগ্ধ-ফেন শয্যামাঝে,
কিংবা বাণি হৃৎসরোজে,
তথাপি তোর পদে বাজে,
কমল-পদ এমনি তোর রে মিতে।

এ চরণ দেখে নয়নে,
দয়া কি হ'লো না মনে,
কোন্ প্রাণে পাঠালে বনে,
কেমন পাষাণ তোর পিতে॥"

গুহক ত মায়ায় মোহিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে স্বরূপতঃ বিস্মৃত হইয়াই তাঁহার প্রতি "হা রে, ওরে" সম্বোধন করিয়া নিজ স্বভাবানুরূপ নিজ ভাষায় আপন মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন। ওদিকে অন্য ভক্ত ভ্রাতৃপ্রেমানুরক্ত লক্ষ্মণ তাহাতে সাতিশয় ব্যথা অনুভব করিয়া গুহকের অতভ্রোচিত আচরণের জন্য তাহাকে যথোচিত শিক্ষা প্রদান উদ্দেশে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার প্রাণ-নাশে উদ্যত হইলে অপার করুণা-নিধান জগদারাধ্য শ্রীরামচন্দ্র প্রেম-ভক্তিতে বাধ্য হইয়া লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :—

"কার প্রাণ-নাশন্ কর্‌বিরে ভাই শোন্
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই।
ওযে প্রেমে ওরে হারে, বলিছে আমারে,
ওরে আমি বড় ভালবাসি তাই॥
ভক্তিতে আমি চণ্ডালেরও হই,
ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণেরও নই,
ভক্তিশূন্য নর, সুধা দিলে পর,
সুধাই নারে তারে,
ভক্তজনে আমায় বিষ দিলেও খাই॥
—দাশরথি রায়।

এই ত শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাক্য। এই জন্য শাস্ত্রে ভক্তির মহিমা গরিমা নানাভাবে বর্ণিত ও কীর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রেই আছে:—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে বা যে পুরাণে হরিভক্তির বিষয় দেখা না যায়, সেই শাস্ত্রের কথা বলা বা শোনা উচিত নয়, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও সেই শাস্ত্রের বক্তা হইয়া তাহার অভিমত প্রচার করেন।

পূজ্যপাদ দেবর্ষি নারদ-কৃত ভক্তিসূত্রে আছে:—

"ভক্তা ঐকান্তিনো মুখ্যাঃ॥ ৬৭॥
কণ্ঠাবরোধ-রোমাঞ্চাশ্রুভিঃ
পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি
কুলানি পৃথিবীঞ্চ॥ ৬৮॥
তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্ম্মী
কর্ম্মাণি সচ্ছাস্ত্রী শাস্ত্রাণি॥ ৬৯॥
নাস্তি তেষু জাতি-বিদ্যা-রূপ-
কুল-ধন-ক্রিয়াদি-ভেদঃ॥ ৭২॥"

বঙ্গানুবাদ:—

একান্তী ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাঁহাদের ভক্তি অন্তঃকরণে নিবদ্ধ থাকে,

এবং বাহ্যাড়ম্বরে; তাহা প্রকাশিত হয় না; এ জন্যই তাঁহাদের গৌরব অধিক। ৬৭।

ভক্তগণ পরস্পর সম্ভাষণ-সময়ে কণ্ঠরোধ, রোমাঞ্চ ও অশ্রুযুক্ত হইয়া বাক্যালাপ-পূর্ব্বক আপন আপন কুল এমন কি পৃথিবীকে পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকেন। ভক্তির উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হয়, ভাবে হৃদয় যখন বিগলিত হইয়া পড়ে, অনুরাগে প্রাণ যখন পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন কথা কহিতে চেষ্টা করিলে কণ্ঠ-রোধ হইয়া আইসে, পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এবং প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া নয়নদ্বয় অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে। এ অবস্থার সাধকভক্তগণ অতি দুর্লভ। ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তাঁহারা যখন পরস্পর প্রেমালাপচ্ছলে কথোপকথন করেন, সে সময় সমস্ত পৃথিবীই পবিত্র হইয়া যায়। ৬৮।

এই জন্যই পরে বলিতেছেন ;— (ঐ সকল ভক্তগণ) তীর্থকে তীর্থ, কর্ম্মকে সুকর্ম্ম এবং শাস্ত্রকে সচ্ছাস্ত্র করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পাপীগণ তীর্থগমন করিলে, তীর্থ তাহাদিগকে নিষ্পাপ ও পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু পাতকীদিগের সমাগমে তীর্থে যে মলিনতা-দোষ স্পর্শ করে, ভক্তগণের সমাগমে তীর্থের সেই সকল কলুষরাশি বিদূরিত ও তীর্থের পবিত্রতা সংসাধিত হয়। কর্ম্ম অনেক থাকিলেও ভক্তগণ যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল কর্ম্মই সুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্র অনন্ত, কিন্তু তথাপি যে সকল শাস্ত্র ভক্তগণ অধ্যয়ন, প্রণয়ন অথবা ব্যাখ্যান করেন, সেই সকল শাস্ত্রই সৎ শাস্ত্র বলিয়া সাধুভক্তগণের আদরণীয়। ৬৯।

তাঁহাদিগের (ভক্তগণের) মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল এবং ক্রিয়ায় কোন ভেদ-বিচার নাই। ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছ, মনুষ্য বা পশু, কীট বা পতঙ্গ, যে জীবই ভক্তিযুক্ত হইয়া ভক্তবৎসল ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হয়—ভক্তিপ্রিয় মাধব জাতি-বিদ্যা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া করুণ-কটাক্ষপাতে তাহাকেই কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আবার ভক্তগণও পরস্পরের মধ্যে জাতিবিদ্যাদির গৌরব-লাঘব-বুদ্ধি রাখেন না। অথবা তজ্জনিত কোন ভেদ-বিচারও করেন না।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি, এখনও সেই

কথারই প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া প্রবন্ধের শেষ করিতে ইচ্ছুক। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
২।৩।১০

অর্থাৎ অকাম একান্ত ভক্ত, সর্ব্ববিধ কামনাশালী, মোক্ষকামিগণ উদার-বুদ্ধি হইলে দৃঢ় ভক্তিযোগে পূর্ণ পুরুষ শ্রীভগবান্‌কেই ভজনা করিবে। এই জন্যই হরিভক্তি-সুধোদয়ে আছে—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতি শাস্ত্রং জপ স্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥
৩।১২

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিহীন জনের জাতিগৌরব, শাস্ত্রাধ্যয়ন, পুরশ্চরণাদি জপের কার্য্য এবং পঞ্চতপ-আদি তপস্যা এসমস্তই প্রাণহীন দেহের অলঙ্কার ধারণের ন্যায় কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।

ভক্তবৎসল ভগবান্ ত ভক্তিপ্রিয়। এখন ভক্তগণ কি চায়, তাহারা ভগবানের নিকট কি প্রার্থনা করিয়া থাকে, অথবা তাঁহার কাছে কি পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। একজন ভক্ত ভক্তিমাত্র প্রার্থনা করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণসরোজে নিজ নিবেদন জানাইয়া কহিতেছেন :—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেঽপি
ত্বৎ পাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

বঙ্গানুবাদ :—

হে ভগবন্ ! ধর্ম্মে, অর্থে বা কামভোগে আমার কিছুমাত্র আস্থা বা স্পৃহা নাই। পূর্ব্বজন্মে যেমন যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, সেই সেই কর্ম্মানুসারে যাহা হইবার তাহাই আমার ভাগ্যে ঘটুক। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর এই স্থির করিলাম যে, জন্মজন্মান্তরেও তোমার চরণকমল-যুগলে আমার যেন নিশ্চলা ভক্তি হউক।

কি অটল বিশ্বাস, কি স্বার্থ-কামনা-শূন্যতা ও প্রগাঢ় ভাবোদ্দীপিনী কাতর প্রার্থনা! প্রভো, 'আমি কিছুই চাইনা। যেমন কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি ও আসিতেছি, তাহার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে যাহা হউক, সে সকল বিষয়ে আমি কুণ্ঠিত বা সঙ্কোচিত নই। আমার এই প্রার্থনা—যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার চরণকমলে অচলা ভক্তি থাকে।'

আবার ঐ শুনুন, আর একজন সাধক-ভক্ত কেমন স্থির ধীর ভাবে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়াসে কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ পিশাচ মনুজেষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী ৮॥

—পাণ্ডবগীতায় দ্রুপদোক্তিঃ।

অর্থাৎ—

হে কেশব! কীট, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, রাক্ষস, পিশাচ অথবা মনুষ্য-যোনিতে আমার জন্ম হউক। তোমার প্রসাদে তোমার চরণে আমার যেন অব্যভিচারিণী অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্তা ও অচলা ভক্তি থাকে।

এখন ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের প্রার্থানার কথা শুনুন।

নাথ যোনি-সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

বঙ্গানুবাদ :—

হে নাথ, হাজার হাজার যোনিতে আমার জন্ম হউক, কিন্তু তোমার চরণে আমার অচলা ভক্তি হউক। হে অচ্যুত, তোমার যেমন চ্যুতি নাই আমার ভক্তিও যেন সেরূপ সদা চ্যুতি-দোষশূন্যা হউক।

পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবীর করুণ প্রার্থনার কথা লিখিয়াই আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

স্বকর্ম্মফল-নির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে॥

বঙ্গানুবাদ :—

হে হৃষীকেশ, হে সর্ব্বেন্দ্রিয়-পরিচালক-পতি, নিজ কর্ম্মানুসারে যে যে যোনিতে আমার জন্ম হউকনা কেন, সেই সেই জন্মগ্রহণ করিলেও আমার ভক্তি যেন তোমার শ্রীচরণে সুদৃঢ় থাকে।

আবার বলি, ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তিপ্রিয়। ভক্তগণ ভগবানের নিকট তাঁহার চরণে অচলা ভক্তির জন্য লালায়িত। আমরা সেই ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের কৃপারই ভিখারী রহিলাম।

ভক্তদাস—শ্রীদুর্গাদাস রায়।

বঙ্গের বাহিরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

[প্রসিদ্ধা মার্কিন মহিলা শ্রীমতী অভয়ানন্দ-স্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ]

[শ্রীমতী অভয়ানন্দ একজন প্রসিদ্ধা মার্কিন-মহিলা। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকাল বেদান্ত-চর্চ্চা করেন। দর্শন ও বিজ্ঞানে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। স্বামীজীর নিকটে দীক্ষা-গ্রহণ করিবার পর তিনি এদেশে আসেন এবং নানাস্থানে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। যে বৎসর কলিকাতায় প্রথম শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব হয়, সে বৎসর তিনি কলিকাতায় ছিলেন। উক্ত মহোৎসব-সংক্রান্ত সংকীর্ত্তন স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পরে শিশির বাবুর "লর্ড গৌরাঙ্গ"-নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার প্রাণ একেবারেই গলিয়া গেল। তিনি চিরদিনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আপনার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আত্মা সমস্তই সমর্পণ করিলেন। তদবধি শ্রীগৌর-নাম স্মরণ—শ্রীগৌর-নাম-কীর্ত্তন ও শ্রীগৌর-নাম প্রচারই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। তাঁহার মধুময় সঙ্গ-লাভ করিয়া এবং তাঁহার মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের অমৃতময়ী প্রেমভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া কত লোকের জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার পূত চরিত্র ও

মনোরম উপদেশাবলীর সাহায্যে অনেককেই শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রুতকর্ণরসায়ন-নামে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় আমেরিকার বহু স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব আলোচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গৌরগত-প্রাণা শ্রীমতী লুই লিষ্ট ও শ্রীমতী জি, বি, এডামস্ নাম্নী আরও দুইজন মার্কিণ-মহিলার নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী অভয়ানন্দ ১৯০২ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা হরিতকীবাগান নাট্য-মন্দিরে "কলিযুগে মুক্তির উপায়"-সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ও সুললিত বক্তৃতা করেন। "সাধনার" পাঠকবর্গের জন্য বক্তৃতাটি নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইহার স্থানে স্থানে পুনরুক্তি-দোষ এবং সম্ভবতঃ কিছু সিদ্ধান্ত-বিরোধ দৃষ্ট হইলেও একজন আমেরিকাবাসিনী শিক্ষিতা মহিলা কি ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে সত্য সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। আশা করি, বক্তৃতাটি সকলের উপাদেয় বলিয়া বোধ হইবে। *]

কলিযুগে মুক্তির উপায়।

ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহ নানাদিক দিয়া পাঠ করা যায়—একটী সাহিত্যের দিক, অপরটী আত্মার দিক। এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। আমরা যেন একটী হইতে অপরটিকে চিনিয়া লইতে পারি। মনে করুন, আমরা চারি-যুগ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশসমূহ আলোচনা করিতে চাই। শাস্ত্রে এই চারি-যুগের কথা আছে— (১) সত্য, (২) ত্রেতা, (৩) দ্বাপর, (৪) কলি। এই কথাটি আমরা কেবলমাত্র সাহিত্যের দিক দিয়া অথবা কেবলমাত্র অধ্যাত্মের দিক দিয়া বিচার করিতে পারি। সাহিত্যের দিক দিয়া ইহার দ্বারা যুগহিসাবে জগতের চারিটী বিভাগ বুঝায়। আদিযুগে পুণ্য ও পবিত্রতাই ভগবদ্জ্ঞানের

---

* সিদ্ধান্তের কথা বিবেচনা করিলে এই প্রবন্ধটি বৈষ্ণব-পাঠকগণের তৃপ্তিদায়ক হইবে না। পৃথিবীর অপর-পৃষ্ঠস্থ জনৈক মহিলার শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি এবং শ্রীকৃষ্ণ-কথা-প্রচারে প্রীতি দেখাইবার নিমিত্তই এই প্রবন্ধ। সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনও লোকের মুখে প্রিয়জনের প্রীতি-শ্রদ্ধাপূর্ণ গুণকথা অসম্পূর্ণ এবং অনিচ্ছাকৃত-বিকৃতিদুষ্ট হইলেও কর্ণরসায়ন হইয়া থাকে।—সাঃ সঃ।

লক্ষণ ছিল। ত্রেতায় ঐ উচ্চ আদর্শভ্রষ্ট হইয়া মানবের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। তারপর, দ্বাপরযুগে সেই অধঃপতনের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে কলিযুগে উহা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। সত্যযুগে ধর্ম্মের চারিটী পাদ ছিল—ত্রেতায় উহা কমিয়া তিনটি হইল। ক্রমে দ্বাপরে দুইটি, অবশেষে উহার একটী মাত্র পাদ অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে, আসুন আমরা আধ্যাত্মের দিক্ দিয়া এই বিষয়টির আলোচনা করি। আমাদের বিশ্বাস, জগতের সৃষ্টি ও স্থিতির গতি নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই যুগভেদের প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা অনেক পরিমাণে মনের এবং মানবজাতির ক্রমিক বিকাশ ও পরিণতি সূচিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি। কি কি পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি এবং কেমন করিয়াই বা আমাদের এইরূপ পরিণতি ঘটিল। আজ আমি আপনাদিগের নিকটে সেই কথারই আলোচনা করিব। কলিযুগে আমরা এই ক্রমবিকাশের প্রায় মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমরা এক্ষণে মানবত্বের উচ্চতম স্তরে অথবা একেবারেই নিম্নতম দশায় উপনীত নহি; অধুনা আমরা এই উভয়ের মাঝামাঝি একটা স্থানে অবস্থিত।

ভগবান বিষ্ণু নয়বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম, জীবজগতে চেতনার নিম্নতম বিকাশ মৎস্যরূপেই তাঁহার প্রকাশ। দ্বিতীয়, চেতনার কিঞ্চিৎ উচ্চতর অভিব্যক্তি কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান বিষ্ণু ধরিত্রীর বিপুলভার বহন করিয়াছিলেন। তৎপরে বরাহাবতার। এই সকল অবতারতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই নয়টি অবতারের প্রত্যেকটীর উদ্দেশ্যও বিভিন্ন এবং কার্য্যও বিভিন্ন। তারপর আরও উচ্চতর অভিব্যক্তি—নৃসিংহাবতার। এখানে ভগবান অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ পশু—নর ও সিংহের আকৃতির একত্র সমাবেশ। দৈত্যনিপীড়িত ধরিত্রীর উদ্ধার সাধনই ইঁহার কার্য্য। অনন্তর বামনাবতার। এখানে ভগবান ক্ষুদ্রকায় নরমাত্র, মনুষ্যদেহের পূর্ণতা তাহাতে ছিলনা। তৎপর রামাবতার—এইবার আমরা শ্রীভগবানের পূর্ণমানবদেহ দেখিলাম—এখানে আমাদের নিকৃষ্ট পশুদেহ ঘুচিয়া মানবত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছে। ভগবান রামচন্দ্র আসিয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া গেলেন অর্থাৎ আমাদিগকে কেমন করিয়া শত্রুদমন

করিতে হইবে এবং কাম-ক্রোধাদি রিপুজয় করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া গেলেন। রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তারপর আমরা কৃষ্ণাবতারে শ্রীভগবানকে পার্থ-সারথিরূপে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিলাম। ইহাই শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা এই অবতারের কার্য্য অতীব গভীর। রামচন্দ্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর। রামচন্দ্র স্বীয় পত্নীর উদ্ধার সাধনার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই পত্নী যেন মানবের মন, আর তিনি মানবের আত্মা। আত্মার শক্তিতে মানব মনের উদ্ধার-সাধনই এই যুদ্ধের অর্থ।

তারপর কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখি, এই অবতার কি বিরাট—ইহার তত্ত্ব এত মহৎ, এত জটিল যে, সমগ্রজীবন ধরিয়া আলোচনা করিলেও কেহ তাহার সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। আমরা তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি দ্বারকায় কর্ম্মযোগ, মথুরায় জ্ঞানযোগ এবং বৃন্দাবনে—তাঁহার শিক্ষার যাহা চরম তাহাই অর্থাৎ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতেছেন। দ্বারকায় তিনি গৃহস্থ, কুরুক্ষেত্রে তিনি যোদ্ধা—বৃন্দাবনে তিনি প্রেমিক।

কৃষ্ণ বিষ্ণুর পূর্ণাবতার। আমরা আদিতে বীজের যে অঙ্কুর দেখিয়াছিলাম, তাঁহাতেই তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিলাম। এই অবতার অপর সকল অবতার অপেক্ষা পূর্ণতর ও গরীয়ান্। বৃন্দাবনলীলায় আমরা দেখিলাম যে, তাঁহাকে যাগযজ্ঞ, আচার অনুষ্ঠান বা শাস্ত্রানুশীলনের ভিতর দিয়া লাভ করা যায়না। তাঁহাকে লাভ করিতে গেলে চাই প্রেম—চাই প্রার্থনা—বন্দনা ও ভক্তি। তিনি বৃন্দাবনে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং ইহাই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা।

শাস্ত্রে আছে—বিষ্ণু কেবলমাত্র তিনযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বাপরেই তাঁহার শেষ অবতার। তিনি প্রথম তিনটি যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কিন্তু, চতুর্থযুগে নহে, কেননা, যে হেতু অধিকাংশ শাস্ত্রের মতে কলিযুগে অবতার নাই, সেইহেতু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার নহেন।

এক্ষণে, আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে অবতার বলি কেন, তাহারই আলোচনা করিব। ভগবান বিষ্ণু ক্রমাগত উচ্চতর দেহ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐ সকল দেহে আবির্ভূত হইবার এক একটি কারণ

ছিল। পূর্ব পূর্ব অবতার অপেক্ষা তৎ তৎ পরবর্ত্তী অবতারে এই কারণের অধিকতর গুরুত্ব ও উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। জীবজগতে তাঁহার যে সকল অবতার হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকটির কার্য্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অবতারের কার্য্য অপেক্ষা মহীয়ান্। প্রথমে বিষ্ণুর মৎস্যাবতার; তৎপরে কূর্ম্মাবতার—এই-রূপ হইল কেন? মানব-জাতির ক্রমোন্নতিই ইহার কারণ? পূর্ণাবতারের অর্থ—শ্রীভগবানের পূর্ণ-মানবরূপে আবির্ভাব। এই জন্যই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলি। ভিন্ন ভিন্ন অবতারের দ্বারা মানবজাতির ক্রমিক উৎকর্ষই সূচিত হইয়া থাকে। মানবজাতির এরূপ অবস্থা ছিল—যখন লোকে মৎস্য অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের কল্পনা করিতে পারিতনা। তাহা-দিগের নিকটে মৎস্যই ভগবানের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং তাহাদের তৃপ্তির জন্যই শ্রীভগবানকে মৎস্যরূপে আবির্ভূত হইতে হইয়াছিল। আমরা যদি তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকি, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণরূপেই আমাদের নিকটে আসিবেন—'গোবিন্দ' বলিয়া ডাকিলে গোবিন্দরূপে আসিবেন। যদি আমরা তাঁহাকে 'শিব' বলিয়া ডাকি, তাহা হইলে তিনি শিবরূপে আসিবেন—'গণেশ' বলিয়া ডাকিলে তিনি সেই ভাবেই আমাদিগকে কৃপা করিবেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মানব যাহাতে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে, তিনি তদনুরূপ মূর্ত্তি লইয়াই মানব-সমাজে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মানব-মনের পরিণতি ও বিকাশের উপরেই অবতারের প্রকৃতি নির্ভর করে। মানবজাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অবতারের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রীভগবানে কোনরূপ অপূর্ণতা নাই, সুতরাং তাঁহার উৎকর্ষ বা বিকাশ হইল—এ কথার কোন অর্থ হয় না। আমাদেরই বিকাশ হয়, তজ্জন্যই তিনি, আমরা তাঁহার যতটুকু ধারণা করিতে পারি, সেই ভাবে অবতীর্ণ হইয়া যেন ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতেছেন, এইরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়া এই শিক্ষা দিয়া গেলেন যে, উপাসনা করিয়া—তাঁহাকে ভালবাসিয়া—তাঁহার নাম উচ্চারণ ও কীর্ত্তন করিয়া—এক-কথায় "শ্রীহরি" এই নাম সাধনা করিয়াই তাঁহাকে লাভ করিতে হয়। তাঁহাকে

পাইতে গেলে কোনওরূপ কৃচ্ছ্র সাধনা অথবা পুষ্পনৈবেদ্যাদির প্রয়োজন নাই—ধনুর্ব্বাণধারী শ্রীরামচন্দ্র যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সে শিক্ষারও প্রয়োজন নাই,—কেবল হরিনাম কর, "হরি বোল" বলিয়া তাঁহাকে ডাক—"হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে বলিতে পাগল হইয়া যাও এবং সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-দর্শন কর, তবেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়।

আমেরিকায় শ্রীমতী অভয়ানন্দের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার।

"পৃথিবীর মধ্যে যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম॥" —(শ্রীচৈতন্য-ভাগবত)

৪১৬ গৌরাঙ্গ-অব্দের "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়" এবং ইংরাজী "অমৃত-বাজার পত্রিকায়" শ্রীমতী অভয়ানন্দ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১ খানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীমতী অভয়ানন্দ কলিকাতা "শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের" সম্পাদককে ২৫শে সেপ্টেম্বর পত্র লিখেন :—

"আমি এখন কালীফরনিয়ার অন্তঃপাতী ফ্রান্‌সিস্‌কোতে অবস্থান করিতেছি। শ্রীগৌর-ভগবানের কৃপায় ও তাঁহার প্রেমময় নামে এখানেও তাঁহার প্রেমময় নাম-মাহাত্ম্য বিশেষরূপে প্রচারিত হইতেছে। শত শত বাধা-প্রতিবন্ধক পদে পদেই আসিয়া উপস্থিত হয়, শ্রীগৌরাঙ্গের এমনই কৃপা যে, সেই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রভুর কৃপাতে আমি প্রভুর ধর্ম্ম প্রচারে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছি।

গত ১১ই আগষ্ট রবিবার স্যান্‌ ফ্রান্‌সিস্‌কোর আর একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে শ্রীগৌরধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি। ইহাঁর নাম শ্রীমতী লুই স্মিষ্ট। যখন তিনি দীক্ষাগ্রহণের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন ইহাঁর বাক্য গদ্‌গদ হইয়া

উঠিয়াছিল। ইনি কম্পিত-কণ্ঠে এই বলিয়া আত্মসমর্পণের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন :—

"আমি অদ্য হইতে আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা, স্বামী পুত্র, গৃহ ও বৈভব ইত্যাদি আমার বলিয়া যাহা কিছু আছে, অথবা যাহা কিছু হইবে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমর্পণ করিলাম। হে কৃষ্ণ; আমি তোমার দাসী।"

আমি এই আত্মনিবেদনের মন্ত্র তাঁহার কর্ণে অর্পণ করিলাম; তিনি কোমল-কণ্ঠে ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে এই মন্ত্র পাঠ করিলেন ও নয়ন-জলে তাঁহার বদন পরিপ্লুত হইল। অবশেষে আরও একটী বীজ-মন্ত্র প্রদান করিলাম। তাহা এই :—

"ওঁ নমো ভগবতে গৌরচন্দ্রায়।"

তাঁহাকে আরও একটী উপদেশ শুনাইলাম, তাহা এই :— শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যখন তাঁহার প্রিয়তম নিতাইকে প্রচারে প্রেরণ করিলেন, তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন :—

"শ্রীপাদ! ছোট বড়, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী, নির্দ্ধন, পাপী, পুণ্যবান্ কেহই যেন আপনার কৃপায় বঞ্চিত না হয়। অবিচারে সকলেরই পরিত্রাণ করিবেন। যে যত অধিক পাপী, সে-ই আপনার কৃপার তত অধিক যোগ্য। আপনার অনেক প্রতিবন্ধক হইবে; কিন্তু প্রেমভক্তিতে সকল প্রতিবন্ধকই ভাসিয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণই শরণীয়।"

শ্রীমতী লুই সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

"আমাদের এই অভিনব গৌর-দাসীর হৃদয় জীবের প্রতি ও শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমপূর্ণ। তাঁহার প্রেমপূর্ণ আত্মা এতদিন বিশুদ্ধ প্রেমময় শ্রীভগবানের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। খৃষ্ট-ধর্ম্ম বা অপরাপর ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে প্রিয়তম আরাধ্য-দেবতাকে দেখাইয়া দিতে পারে নাই। শ্রীভগবদ্গীতাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। কিন্তু সে কৃষ্ণ দার্শনিক ও কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা। তিনি খুব প্রশংসার ও সম্ভ্রমের পাত্র। কিন্তু হৃদয়ের আদান প্রদান তাঁহার সহিত চলে না। এইরূপ দার্শনিক পণ্ডিত ও যোদ্ধার কাছে প্রেমের কথা কহিতে যাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় কি?

সুতরাং দূর হইতে তিনি গীতার শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিতেন ও দিবানিশি প্রেমের স্বয়ং ভগবান্ খুঁজিয়া বেড়াইতেন।"

এক দিবস "স্তান্ ফ্যানসিসকো ক্রণিকল"-নামক পত্রে আমার প্রচারাদি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি তাহা পাঠ করেন, তাঁহার দেহে একপ্রকার কম্পন ও পুলক অনুভূত হয়। তখন তিনি অনুসন্ধান করেন। কোন সময়ে তাঁহার সহিত আমার দেখা হয়। প্রথমতঃ আমি তাঁহাকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে উপদেশ প্রদান করি। তিনি অনায়াসে সেই সকল নিয়ম পালন করেন। তিনি বলেন, "এই সমুদয় নিয়ম লইয়া আর কতদিন কাটাইব? অবশ্যই এই সকল নিয়ম আমি সারাজীবন প্রতি-পালন করিব, কিন্তু আপনি আমাকে আরও কিছু অন্তরঙ্গ-বস্তু দয়া করিয়া প্রদান করুন।"

আমি দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকি, তাহাতেও অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব অভিব্যক্ত করা হয়। তাঁহাকে বলিলাম, আপনি এই সকল বক্তৃতা আরও কিয়দ্দিন শ্রবণ করিয়া লউন। কিন্তু দেখা গেল, তাহাতে তাঁহার রুচি নাই, তিনি বলিলেন—"আমি অপর কোন উপদেশ চাই না। কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা যায়, আমাকে সেই উপায় বলিয়া দিন। আমি তাঁহার নিকট আর কিছু চাই না, কেবল তাঁহাকে ভালবাসিতে চাই।"

অতঃপর আমি তাঁহার নিকট শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-লীলার প্রসঙ্গ করিলাম। তিনি আমার মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল, তাঁহার বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তার পরে আমি যখন বলিলাম, এই শ্রীকৃষ্ণই ভক্তবেশে চারিশত বৎসর হইল নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন; শ্রীমতী রাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে উন্মাদিনীর বেশে "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া আকুল হইতেন, ইনিও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইতেন—আর সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়া জীবদিগকে কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা দিতেন। আমার এই কথার পরিসমাপ্তি না হইতে হইতে শ্রীমতী লুই লিষ্ট আনন্দে অধীর হইয়া করতালি দিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমার মন যে ঠাকুরকে খুঁজিয়া বেড়ায়, এতদিনে তাহা পাইলাম।

আমি এই ঠাকুরকেই চাই। আমি এখনিই এই লর্ড গৌরাঙ্গ গ্রন্থের জন্য টাকা পাঠাইতেছি।"

শ্রীরাধাপ্রেমের কথা যেন এই মহিলাতেও বুঝি বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের জন্য ইহাঁর বিশেষ ব্যাকুলতা। সেই জন্য ইহাঁর দীক্ষার সময় আমি ইহাঁর দীক্ষা-নাম রাখিয়াছি "রাধা"। এই নাম শুনিয়া তাঁহার প্রেম যেন আরও উথলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—"এই নামই আপনার মন্ত্র হইল। আপনি রাধা-মন্ত্রে দীক্ষিতা বলিয়া মনে করিবেন।" শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় যেন তিনি তাঁহার এই বিশ্বাস হইতে বিচলিত না হয়েন।

আরও একটী সংবাদ লিখিতেছি। শ্রীমতী জি, বি, এডামস নাম্নী আরও একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা চিকাগো হইতে অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে 'লর্ড গৌরাঙ্গ' গ্রন্থের জন্য পত্র লিখিয়াছেন। আমি চিকাগো হইতে কালীফর-ণীয়া যাইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে ইঁহার সহিত ঘন ঘন সাক্ষাৎ করিতাম এবং নদীয়া-অবতারের কথা তুলিতাম। কিন্তু তাঁহার সহিত আমি একটু ভয়ে ভয়েই এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতাম। কেননা, এই মহিলাটীর জ্ঞানের বড়াই খুবই অধিক, চালচলন রাজরাণীর মত, কতকটা গর্ব্বিতাও বটে। তিনি ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণকথা পড়িয়াছেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানের উহাই যথেষ্ট হইয়াছিল। একদিন আমি তাঁহার নিকট লর্ড-গৌরাঙ্গ হইতে শ্রীবৃন্দা-বন-লীলার অধ্যায় পাঠ করিলাম। 'লর্ড গৌরাঙ্গ' গ্রন্থের এই অধ্যায়ের এমনই এক প্রকার মোহিনী শক্তি যে, উহাতে তাঁহার হৃদয়ের পাষাণ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিল; তখন তাঁহার উন্মুক্ত হৃদয়ে বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমের মধুর জ্যোতি প্রবেশ করিয়া চারি দিক আলোকিত করিয়া তুলিল। সেই দিনই তিনি পত্রিকা আফিসে 'লর্ড গৌরাঙ্গ গ্রন্থখানির' জন্য পত্র লিখিলেন। তাঁহার হৃদয়ের আবরণী উন্মোচন করিয়া দিয়াই আমাকে অন্যত্র আসিতে হইল, ইহাতে আমার মনে প্রকৃতই বড় দুঃখ হইল। কিন্তু যেই মাত্র তিনি 'লর্ড গৌরাঙ্গ' গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলেন, আর অমনি তিনি অতীব যত্ন ও প্রীতির সহিত উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতি ছত্রেই তাহার নিকট সুধা অপেক্ষাও মধুর বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন ভ্রমরের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া তাহা পান করিতে

আমি কালীফরণীয়াতে আসিয়া প্রথমেই তাঁহার যে পত্র পাইয়াছি, তাহাতে দেখা গেল যে, সেই জ্ঞান-গর্ব্বিতা মহিলা এখন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীভগবান গৌরচন্দ্র যে এই জ্ঞানগর্ব্বিতা রমণীকেও এই ভাবে কৃপা করিয়াছেন, তাঁহার এই অদ্ভুত লীলা দেখিয়া আমি এই মহিয়সী মহিলার পত্রোত্তরে লিখিয়াছি—"আপনি যে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ধর্ম্ম-সুধা আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাতে আমার মনে হইতেছে, আমি যে এত কষ্ট করিয়া ভারতবর্ষে গিয়াছিলাম, এত দিনে আমার সে সমস্ত শ্রম ও ক্লেশ সফল হইল।" তিনি গত ২০শে জুন আমাকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহার কিয়দংশের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

"আপনি ভারতে গিয়া যত কষ্ট সহিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গে আমার মতি হওয়ায় আপনার সে শ্রম ও ক্লেশ সার্থক মনে করিবেন। সম্ভবতঃ আমার পরিত্রাণের জন্যই আপনি ভারতে গিয়াছিলেন। আপনি মাণিক সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার উজ্জ্বলতায় আমি চমৎকৃত, বিস্মিত ও আকৃষ্ট হইয়াছি। অর্থোন্মত্ত পাশ্চাত্য প্রদেশে একটী জীবের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-ধন প্রদান করা এক জীবনের প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার। লর্ড-গৌরাঙ্গ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি বিহ্বল হইয়াছি। আমার মনে হইতেছে, যখন প্রভু আমাদের ন্যায় জীবের জন্য এই লীলা প্রকট করিলেন, তখন সেই দেশে আমার জন্ম হইল না কেন? আমার কি দুর্ভাগ্য! রাসলীলায় প্রত্যেক গোপীই কেবল তাহার পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণ বুঝি তাঁহারই। যিনি সকলের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, যিনি এই অখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, প্রত্যেক গোপীই তাঁহাকে কেবল আপন ধন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কি অপূর্ব্ব ও প্রমত্ত ভাব! আমি যত যত অবতারের কথা পাঠ করিয়াছি, কোনও অবতারই প্রেমের এমন পূর্ণ লীলা আর কখনও প্রকাশ করে নাই। এমন রসিক-শেখর প্রেমময় অবতারের কথা আর শুনিতে পাওয়া যায় কি? শ্রীগৌর-ভগবান্ জীবদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উপদেশ দিতে অবতীর্ণ হইলেন, জীব সেই উপদেশে কৃতার্থ হইল। যখন সাধক সর্ব্বশক্তিপূর্ণ প্রেমময় প্রাণবল্লভের শরণ প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার পিতার

আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না, তখন সে আপন প্রাণবল্লভের প্রেম-সোহাগে আদরে গৌরবেই বিহ্বল হইয়া পড়ে। জীবের উপাসনার উচ্চ লক্ষণও সেইরূপ। জীব যদি আপন প্রাণের প্রাণ প্রেমময় রসিক-শেখরকে চিনিয়া লইতে পারে, তবে আর তাহার অপর কাহারও প্রয়োজন হয় না। শ্রীমতী রাধা বলেন—"কৃষ্ণ, আমি তোমায় না দেখিলে মরি।" সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী রাধা, জীবের আত্মায় বিরাজমানা (?)। তিনি অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করেন। তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন না হইলে বাস্তবিকই তিনি মৃতবৎ হইয়া পড়েন। এই জগতেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমাধুরী উদ্ভাসিত; তাঁহার সৃষ্টিতেই তাঁহার প্রেমলীলা বিরাজমান। আমরা যদি তাহা দেখিয়া লইতে পারি, বুঝিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে এই সংসারে কি সুখের হয়, কি মধুর হয়! জীবে প্রীতি সমাজের পক্ষে কি মঙ্গলজনক! জীবে দয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের অতি উচ্চতম উপদেশ। এই সংসারেই শ্রীভগবৎ-প্রেমের সোপান। কি মহোচ্চ ধারণা! শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অপর কেহই জীবকে এই উচ্চ লক্ষ্যে উন্নীত করেন নাই।"

শ্রীমতী এডামসের পত্র হইতে যাহা উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই জ্ঞানৈশ্বর্য্য-গর্ব্বিতা মহিয়সী মহিলা শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এই কৃপা চিরকাল জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমতী অভয়ানন্দ—

এবটস্‌ফোর্ড, ব্রডওয়ে, লার্কিন ষ্ট্রীট,

ফ্রান্‌সিস্‌কো, কালিফর্ণিয়া, আমেরিকা।

ইঁহার সম্বন্ধে বারান্তরে আরও নূতন কাহিণী জানাইতে বাসনা রহিল।

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

সাধনা।

নাম গতি নাম মুক্তি
নাম পরম বন্দনা,
নাম শক্তি নাম ভক্তি
নাম সর্ব্ব-আরাধনা।
নাম নাশয়ে ভব-শোক-তাপ,
নামে যায় দূরে মনোগত পাপ,
লহ অবিরাম হেন পুণ্য নাম
নাম পরম সাধনা॥
শয়নে ভ্রমণে কিবা উপবেশনে
মধুর এ নাম জপনা,
নাহি কালভেদ নাহি স্থান ভেদ
নাম মধুর সাধনা।
নাম-সলিলে ডুবায়েরে মন,
হৃদয়ে কর গঙ্গাবগাহন,
নাম-তরঙ্গমালা হৃদয়ে করিলে খেলা
ডুবে যাবে মোহ কামনা॥
হরিনাম-ঋতে নাহি এ জগতে
নাশিতে হৃদয়-যাতনা,
কলির ভূষণ অমূল্য রতন
হৃদয়ে সতত রাখনা।
দিন চলি যায় মহাদিন পানে,
নিতি-নিতি আয়ু যায় অবসানে,
হায় মূঢ় জন এ হেন রতন
দেখিয়াও কভু দেখনা॥
নাম শক্তি নাম মুক্তি
নাম পরম ভজনা।
নাম ধর্ম্ম নাম কর্ম্ম
নাম মধুর সাধনা॥

বিনীত—
শ্রীসুবোধচন্দ্র আয়কাত বি, এ,।

সাধনা।

(মাসিক-পত্রিকা।)

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা ॥

১ম বর্ষ, } ভাদ্র—১৩৩৩ { ৫ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীহিন্দোলিকা।

দোলে শাওন পূর্ণিম-রাতি দোলে উজোর চন্দ
মৃদুল বায়ে দোলত মেহ মন্দ।
বরষি সুধাবিন্দু কিয়ে সরস ঋতু দোলই
দোলত শাখী বিতরি ফুল-গন্ধ ॥
ঝুলতরে মূরতিময় প্রেম-আনন্দ।
কিয়ে উজল যুগল ব্রজ-পিরিতি-রস-মাধুরী
কিয়ে সাধনা-সাধ্য পরদ্বন্দ ॥
ধীর সমীর কুঞ্জবন বিটপী লতা দোলই-
দোলই শুক-পিক-নিকর শাখে।
ফুলহি ফুলে লুঠই মধু ভ্রমরা-কুল দোলই
পরাগ-দল ঝুলই লাখে লাখে ॥
দোলা উপরি ঝুলই গোপী গাওত মেঘ মল্লার
দোলত কত তাল তালে তালে।
নাচত শিখী পুচ্ছ তুলি উচ্চ দোলা পেখই
হেরই কত গোপিকা-প্রাণ দোলে ॥

শ্রীগোপীনাথ বসাক।

শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি-লিখিত]

সর্ব্ব মহাপাপে পাপীয়ান্ জনকে উদ্ধার করিতে শ্রীকৃষ্ণ-নাম ব্যতীত আর কেহই সমর্থ নহে। শ্রীনামের কথা দূরে থাকুক, শ্রীনামাভাসও নিখিল পাপ-রাশি বিনাশ করিয়া মায়াময় বন্ধন হইতে মোচন করতঃ পরমানন্দস্বরূপ অনুভব করাইয়া থাকে। এই বিষয়ে প্রমাণরূপে—অজামিলকে যম-যাতনা ভোগ করাইবার জন্য বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত যমদূতগণের সহিত শ্রীবিষ্ণু-দূতগণের কথা-প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাইতেছে—

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্ম-কোটাংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম-স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥

—শ্রীমদ্ভা-৬।২।৭

শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বলিলেন, হে দূতগণ! তোমরা যদি বল যে, এই অজামিল হাজার হাজার জন্ম যাবৎ বহু পাপাচরণ করিয়াছে; এযাবৎ ঐ সমস্ত পাপের কোন প্রায়শ্চিত্তও হয় নাই। অতএব ঐ পাপাচরণ হইতে শোধন করিবার জন্য ইহাকে আমরা নরকে লইয়া যাইতেছি। ইহাতে বা আমাদের প্রভুর কি অপরাধ আছে যে, আপনারা এইরূপ বাধা দিতেছেন? হে যমদূতগণ! তোমরা একথাও বলিতে পারনা যে, এই শ্রীহরিনাম কেবল যে একজন্ম-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ; কারণ, ইহা কোটি কোটি জন্মের সঞ্চাত পাপরাশিকেও ধ্বংস করিতে সমর্থ। পাপ-সমূহকে নাশ করিতে শ্রীহরিনাম যে শক্তিধারণ করেন, পাতকী ব্যক্তি তত পাপ করিতে পারেনা। সর্ব্বপাতকান্বিত ব্যক্তি যদি অপসন্ন হইয়াও শ্রীনাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও সিংহের ভয়ে মৃগসমূহ যেরূপ ত্রস্তভাবে পলায়ন করে, তদ্রূপ পাপ-সমূহও শ্রীনামের ভয়ে ভীত হইয়া ঐ পাপীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এই কথা স্মৃতি-শাস্ত্র বলেন :—

নাম্নোঽহি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি-পাতকং পাতকী নরঃ॥

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।

পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগৈরিব ॥

আরও শ্রীনাম কেবল মাত্র পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নহে, ইহা স্বস্ত্যয়ন—মোক্ষ-সাধনস্বরূপ। অর্থাৎ ইহা উচ্চারণমাত্রেই জীব মোক্ষপথের পথিক হইতে সমর্থ হয়। স্মৃতিও এই কথার সমর্থন করেন, যথা—

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।

বদ্ধঃপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥

"হরি" এই অক্ষর দুইটী একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে, জীব মোক্ষলাভের যোগ্যতা লাভ করে।

এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।

যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥ ভাঃ ৬।২।৮

শ্রীবিষ্ণুদূতগণ আরও বলিলেন—

"হে দূতগণ! তোমরা যদি বল, এটী শ্রীহরির নাম, এই বুদ্ধিতে যদি কেহ নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে ইহা তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইতে পারে; কিন্তু এই অজামিল বুদ্ধিপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করে নাই, আমাদিগকে অবলোকন করিয়া ভীত-বশতঃ নারায়ণ-নামধারী নিজ পুত্রকে আহ্বান করিয়াছে॥ অতএব, এই নাম ইহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিরূপে হইতে পারে?

তদুত্তরে বলিতেছেন "রে দূতগণ! তোমরা বহির্ম্মুখ, তোমরা তত্ত্ববিষয় অবগত নও; যদিও অজামিল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষ না করিয়াও পুত্রকেই আহ্বান করিয়াছিল, তথাপি ইহাতেই, মহাপাতকী হইলেও সে সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। কেবল যে এই মৃত্যুসময়েই অজামিল নারায়ণ-নামোচ্চারণ পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইল, তাহা নহে; পূর্ব্বে পুত্রের নাম-করণকালে 'হে পুত্র নারায়ণ! মাতার ক্রোড় হইতে আমার নিকটে আগমন কর' এই ব্যবহারিক ভাষায় উচ্চারিত শ্রীনারায়ণ-নামাভাসেই ইহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আরও নারায়ণ-পদটির একটী বা দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করিলেই যখন সর্ব্বপাতক নাশ হয়, তখন অজামিল সমগ্র নারায়ণ-পদটী উচ্চারণ করিয়া যে মুক্ত হইবে, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি

শ্রীকৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে বিষ্ণুদূতগণ আরও বলিলেন—

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহাগুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যেচ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥

—ভাঃ ৬।২।৯—১০।

হে যমদূতগণ! তোমরা যদি বল যে, 'শ্রীনাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বপাতক নাশ হয়, একথা সর্ব্বোতোভাবে সত্য বটে; কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত হাজার হাজার বার পুনঃ পুনঃ আচরিত এবং কোটি কোটি দ্বাদশ-বাৎসরিক ব্রতেও নিবৃত্ত হয়না যে সমস্ত মহাপাতক, একবার মাত্র নামাভাসেই তাহাদের কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে?' কিন্তু ইহাও তোমাদের বলা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু স্বর্ণস্তেয়ী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোবধকারী, রাজা ও মাতাপিতা ঘাতক এবং অন্যান্য যে সকল মহাপাতকী আছে, এই শ্রীনামই তাহাদের সকল প্রকার পাপ নির্মূল করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ।

দ্বাদশ-বার্ষিক ব্রতাদিও এই নামের তুল্য শক্তিসম্পন্ন নহে। কারণ, ব্রতাদির পাপ-নাশকত্ব সামর্থ্য আছে বটে, কিন্তু তাহারা পাপের মূল বাসনা এবং বাসনার মূল অবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে পারে না। শ্রীনামের যে কেবল এই মাত্র ফল তাহা নহে, ইহা উচ্চারিত হইবা মাত্র কেবল মাত্র যে নামোচ্চারক ব্যক্তিগণের শ্রীভগবানে সেব্যরূপে মতি হয়, তাহা নহে; শ্রীভগবানেরও উঁহাদের বিষয়ে মতি হয় অর্থাৎ শ্রীভগবান মনে করেন যে, এই ব্যক্তি আমার নিজ-জন। অতএব ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষণ করা আমার কর্ত্তব্য। অতএব অজামিলকেও নিজ-নাম উচ্চারণ করিতে শ্রবণ করিবা মাত্র শ্রীভগবান ইহাকে শ্রীবৈকুণ্ঠে নেওয়ার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।

যেমন তোমাদের প্রভু অসংখ্য পাপে পাপীয়ান্ অজামিলকে নিবার জন্য তোমাদের তিনজনকে পাঠাইয়াছেন (কারণ, অসংখ্য পাপ কায়িক, বাচিক ও মানসভেদে তিনপ্রকার), তদ্রূপ আমাদের প্রভুর শ্রীনামের প্রতি অক্ষরই ভক্তকে রক্ষা করে—এইটী দেখাইবার জন্য 'নারায়ণ' এই চতুরক্ষর নাম উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া আমরা চারিজন আসিয়াছি।

অজামিলের মৃত্যুকালে নামোচ্চারণই তাহার সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইয়াছে—সাক্ষাৎরূপে ইহাই দেখাইবার জন্য শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে পূর্ব্বোক্ত রূপ কথা বলিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পুত্রের নামকরণ-সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, পুত্রের আহ্বানকালে যতবার নামোচ্চারিত হইয়াছে,তাহাদের মধ্যে যে নামটী সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত, তাহার দ্বারাই সর্ব্বপাপের উপশম হইয়া গিয়াছিল এবং অন্যান্য বারে উচ্চারিত নামসকল তাহার ভক্তির সাধন হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বশ্লোকের "ব্যাজহার" এই ক্রিয়াপদটিতে পরোক্ষকালের বিভক্তি নির্দ্দেশ করিয়া প্রথমতঃ উচ্চারণকেই লক্ষ্য করাইতেছে এবং বিবশ-পদের অর্থে "পুত্রস্নেহ-বিবশ" এরূপ অর্থ করাই কর্ত্তব্য। এক্ষণে এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অজামিল যেরূপ পুনঃ পুনঃ নাম গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ বারংবার বেশ্যাগমন ও মদ্যপানাদি অসৎকর্ম্মও আচরণ করিয়াছে; অতএব তাহার অন্তিম-সময়ে উচ্চারিত নাম হইতেই সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইবে; যেহেতু ইহার পরে আর কোন পাপাচরণের সম্ভাবনাই নাই—এরূপ ব্যাখ্যাও করা সঙ্গত নহে। যেহেতু শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে—

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥

এই প্রমাণ-বাক্যে অশেষ পদ গ্রহণ হেতু—

বর্ত্তমানঞ্চ যৎপাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ ॥

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের নাম-কীর্ত্তনরূপ অনল বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ, সকল প্রকার পাপকে দগ্ধ করিয়া থাকে। আরও বর্ণিত আছে—

যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।

অর্থাৎ যে নাম একবার মাত্র শ্রবণে পুক্কশ প্রভৃতি অতি অন্ত্যজ জাতিও সংসার হইতে বিশিষ্টরূপ মুক্তি অর্থাৎ সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করে। আরও বিশেষতঃ শ্রীনাম-গ্রহণ-বিষয়ে কোন সময়-বিশেষের নিয়ম না থাকা হেতু, প্রথম নাম গ্রহণে সর্ব্বপাপ এবং পাপ-সমূহের বাসনা ও বাসনার মূলভূতা অবিদ্যারও নাশ হয়—ইহা বেশ প্রতীত হইতেছে। কারণ, এই সকল উপাধির নিবৃত্তি না হইলে মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

যখন শ্লোকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন এই সকল উপাধি-নাশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, মুক্তির লক্ষণ দ্বিতীয় স্কন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে—

মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

বহির্মুখভাবে অর্থাৎ জড়ীয় সম্বন্ধ-রহিত হইয়া পরমানন্দ-স্বরূপ সাক্ষাৎকারকেই মুক্তি বলে। এই লক্ষণে অবিদ্যাবৃত্তির নিবৃত্তি না হইলে মুক্তিলাভ হইতে পারে না। অতএব শ্রীনাম-গ্রহণে যখন মূলভূতা অবিদ্যার পর্য্যন্ত নাশ হইল, তখন আর কিরূপে পুনরায় পাপের অঙ্কুরোদ্গম হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে?

এক্ষণে এরূপ একটী আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, প্রথমতঃ নাম-গ্রহণ মাত্র যখন অজামিলের পাপরাশির অঙ্কুর পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইল, তখন সে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সংসার হইতে অপসৃত হইল না কেন? বরং তৎপরিবর্ত্তে সে দাসীতে আসক্ত হইয়া পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপকার্য্যসমূহ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আচরণ করিতে লাগিল। এবিষয়ে সমাধান হইতেছে এই যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ যেরূপ দেহকৃত্য স্নান-ভোজনাদি কার্য্য করিয়া থাকে, সেই প্রকার অজামিলও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মচরিত সংস্কারবশতঃ পাপকর্ম্ম সাধন করিয়াছিল। কিন্তু সর্পের বিষদন্ত উৎপাটিত হইলে তাহার দংশন যেরূপ নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ যদিও অজামিল দুষ্কর্ম্ম করিতেছিল, তথাপি অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ঐ সমস্ত কর্ম্ম আর তাহাকে বন্ধন-দশাপ্রাপ্তি করিতে সমর্থ হয় নাই।

অতএব এই উদ্দেশ্যেই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত-প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিৎ যেরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, "হস্তীকে স্নান করাইলেও সে যেমন পুনরায় স্বীয় গাত্রে ধূলি কর্দ্দমাদি নিক্ষেপ করে, অতএব তাহার স্নানক্রিয়া যেরূপ ব্যর্থ, তদ্রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যদি লোক পুনরায় পাপকর্ম্মে আসক্ত হয়, তবে আর প্রায়শ্চিত্ত-করণের প্রয়োজনীয়তা কি আছে?" এ স্থলে কিন্তু ভক্তি-প্রসঙ্গে শ্রীনামের সর্ব্ব-পাতক-প্রায়শ্চিত্তত্ব-সামর্থ্য থাকিলেও ভক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও কাহারও পুনঃ পুনঃ পাপে প্রবৃত্তি দর্শনে সেই প্রকার আক্ষেপ করিতেছেন না।

আরও নামাভাস-সামর্থ্যে অত্যন্ত দুরাচার অজামিলও যেরূপ বৈকুণ্ঠলাভ

করিয়াছিল, সেই প্রকার সদাচার-সম্পন্ন শাস্ত্রবিশারদ স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণও বহুবার নামগ্রহণ করিয়াও নামে অর্থবাদ-কল্পনাদিরূপ নাম-অপরাধযুক্ত হইয়া ঘোর সংসারে আবদ্ধ হয়। অতএব শ্রীনামের মাহাত্ম্য শ্রবণমাত্রেই যে সর্ব্বথা মুক্তি লাভ হইবে, এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

প্রেম ও ঐশ্বর্য্য।

সগর্ব্বে ঐশ্বর্য্য কহে "শোন্ ওরে প্রেম,
বড়ই সাহস তোর হ'তেছে বর্দ্ধিত।
আজ তোরে নাহি দিব প্রকাশ হইতে,
আমাদের প্রভু এই ঈশ্বর সাক্ষাতে॥"
হাঁসিয়া কহিল প্রেম, "আমার কি দোষ ?
অহঙ্কারে অন্ধ হ'য়ে না করিহ রোষ।
আপন ইচ্ছায় ঐ তোমার ঈশ্বর,
তোমাদেরে ভুলি হ'য়েছেন মোর বশ।
তাহার প্রমাণ দেখ, মাতা ব্রজেশ্বরী
বাঁধিলেন রজ্জুদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী।
অধিক কি চাও, দেখ আমার শকতি,
হ'য়ে গেছে ত্রিভঙ্গ ঐ মোহন-মূরতি।
প্রেমের ঠাকুর তিনি প্রেম-পরবশ ;
প্রেম ভুঁখা প্রভু, নহে ঐশ্বর্য্যের বশ।
কেন বৃথা গর্ব্ব কর, কি পার করিতে ?
কোন শক্তি ধর তুমি আমায় রোধিতে ?"

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী, কাব্যতীর্থ।

ভক্তিদেবীর আত্ম-পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

পূর্ব্বে আমি স্ব-মাহাত্ম্য কিছু প্রখ্যাপিত করিয়াছি। তা'তে অনেকে মনে করিতে পারে যে, আমি যথেষ্ট আত্মশ্লাঘা করিতেছি! বস্তুতঃ ইহা আমার আত্মশ্লাঘা নয়, দুঃখের সুতীব্র উদ্গারণ। আমি বহুকাল হইতে বিশ্বের দিকে চেয়ে আছি। কবে বিশ্ববাসী আমার নিকট আসিবে, আমার স্নেহাশীষ্ ও স্নেহচুম্বন প্রাপ্ত হইরা অজেয় ও অমর হইবে। কিন্তু হতভাগ্য তারা, পেঁচার মত কোন অন্ধকারাবৃত গহ্বরে আশ্রয় লইতেছে; আমি তা'দিগকে খুঁজেই পাই না। ইহা কি খুব দুঃখের বিষয় নয়? তাই বলি, ওরে, তোরা মানুষ হ; আয়, আমার কাছে আয়; আমার হস্তস্পর্শ পাইয়া তৃপ্ত ও শান্ত হ। সাফল্য এসে তোদেরে বরণ করুক।

অন্য পরে কা কথা, যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই হইল, যোগাঙ্গ যম-নিয়মাদিকে বিশ্বের চক্ষে পরিস্ফুট ক'রে দেখাইয়া দেওয়া—সেই যোগশাস্ত্র পর্য্যন্ত আমাকে সব সাধন হইতে উচ্চ আসন দিয়াছে। শমদমাদি সাধন অনেক দিন পরে যে সিদ্ধি যে সমাধি দিতে পারে, ভক্তি তা' অল্পদিনের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া দেন, এরূপ বলিয়াছে। "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রের 'বা' শব্দে যে আমারই শ্রেষ্ঠতা খ্যাপিত করিতেছে। ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, "ভক্তেরন্যান-পেক্ষত্বাদীশ্বরো হি ভক্ত্যাভিমুখঃ সন্নিদমিষ্টমস্যাস্ত্বিতি অনুগৃহ্নাতি।" "ভক্তি, যম নিয়ম প্রভৃতি কা'রো অপেক্ষা রাখে না; ভক্তি দ্বারা ভগবান তুষ্ট হন, উন্মুখ হন, ভক্তকে অনুগ্রহ করেন এবং সঙ্কল্প করেন, ভক্ত স্বীয় কাম্যবস্তু লাভ করুক। তা'তেই ভক্তের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়।

ভগবান ত একটী স্বচ্ছ বস্তু; তাঁতে কোনো দাগ নাই, সুন্দর, শুভ্র ও নিরাবিল। ভগবানে রঙ্গ ধরাইতে আমিই সমর্থা, অন্য কেহ নয়। যেমন শুভ্র স্বচ্ছ নির্ম্মল কাচের নিকট যে বর্ণের ফুল রাখা যায়, সে বর্ণটাই কাচের সর্ব্বা-য়বে ছাইয়া পড়ে; সেরূপ সর্ব্ববিষয়ে অলিপ্ত নিরভিমান যে ভগবান্, তাঁর সবটা বুকভরা অভিমানের নানা বর্ণ আমিই সংক্রমিত করি।

ভক্তের হৃদয়ে যখন "তোমার দাস আমি" এই অভিমানের সাহচর্য্যে আমার উদয় হয়, তখন ভগবানে 'প্রভু' অভিমান ফুটিয়া উঠে, তখন তিনি হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতাপুরুষ। তখন তাঁর চরণের রেণুটুকু কতশতজন্মের সাধনার ফল।

"জন্মে জন্মে প্রাণসখা তুমি গো আমার" এই ভাব অবলম্বন করে' যখন আমার অভিব্যক্তি, তখন কোথায় তাঁর প্রভুত্ব দৌড়ে' পলায়, খুঁজে' পাওয়াও দায় হয়। ভক্তের সাথে একখানে একপাতে না খাইলে তখন তার তৃপ্তি হয় না। তখন ভগবান 'ওগো আমার প্রাণসখা' ব'লে, ভক্তের গলা জড়া'য়ে আকুল হইয়া পড়েন।

প্রাণনাথ তুমি মোর জীবনে মরণে,
তোমার চরণ-রেখা শুধু—
আমার প্রাণের সবখানে।

এই ভাব-রাজ্যে যখন আমি পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়াই, তখন, আমি একটা নূতন সৃষ্টি করি—যা'কে লোকে বলে সৎকাব্য—যাহা সুন্দর, শুচি, উজ্জল ও ও উন্মাদক। যেমন বহিঃপ্রকৃতিতে দেখা যায়—আকর্ষণে বিকর্ষণে, সংযোগে বিয়োগে নিত্য নূতন নূতন বস্তু তৈরী হইতেছে—ঘটপট রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি। সেইরূপ অন্তর্জ্জগতের গভীর স্থলে আকর্ষণ বিকর্ষণ, সংযোগ বিয়োগে ভাবরাজ্যের সৃষ্টি বা কাব্য সৃষ্টি, যার সবটা দিক সুন্দর, যা'কে ধরিলে হৃদয়ে গভীরতম কোমলতা ও রস-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, সেইতো কাব্য। তাহা কি আমি ভক্ত-ভগবানের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সংযোগ-বিয়োগে অভিব্যক্ত করিনা? লতাবিতান-কুঞ্জবনে বসে' বসে' কিসের জন্য চিন্তা? কেনই বা চলিতে ফিরিতে চোখের জলে বুকভাসান? কা'র জন্যই বা আকুল প্রাণে সর্ব্বাঙ্গে থর থর কম্প? কেনই বা গভীর রজনীতে বিজন কুঞ্জে হাস্যপরিহাসের মহা-মহোৎসব? কেনই বা বিদায়-গীতিতে চোখের জল? মর্ম্মবিদারি-ব্যথা, দীর্ঘ-নিশ্বাস, ব্যাকুলতা, এইসব কা'র সৃষ্টি? ইহা কি ভক্ত-ভগবানের কেহই অনু-ধাবন করেন না? তাই আমি অন্তর্জগৎ হইতে একটা নূতন কাব্য সৃষ্টি ক'রে—বাহিরে বিকসিত ও উদ্ভাসিত করি। এ কথা বেশ জোরের সহিত বলিতে পারি।

অতভাবে আমি ভক্তের সহিত ভগবানকে নাচাই। নিত্য নূতন কাব্য সৃষ্টি করি। আমায় কে চিনে? কেই বা জানে? তাই ভগবান বলেন 'যদা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা'। "আমার তেজস্বিনী ভক্তিদেবীর মত জগতে কে আছে?"

(৭)

আমি যা'কে যতটা উপরের দিকে টানিয়া তুলি, তার হৃদয়ে অধিক দীনতা প্রকাশ পায়। দীনতাই হইল আমার কৃপা মাপিবার মাপকাঠি। আর বাজারে দাঁড়াইয়া কতকগুলি বুজরুকী দেখাইয়া হৈ চৈ করে' "আমি বড্ড বিশুদ্ধ ভক্তিশীল" বলে' হাঁকিলে বাঁদরামী ছাড়া, ভক্তিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐ অভিমানীগুলির ছায়া মাড়ানো পর্য্যন্ত দোষাবহ। ইহা আমার কৃপাপ্রার্থীদের জানা।

যার মন যতটা কপটতা-শূন্য, শরতের বারিধারার মত নির্ম্মল, আকাশের মত নিরাবিল, তার প্রতি তত অধিক আমার কৃপা। শ্রুতি অকর্ণা বলে' ভগবানকে বলিলেও তিনি সরল ভক্তের ডাক অবশ্যই শুনেন।

চোখের আড়ালে রহে বটে
ডাকলে আড়াল নয়,
সরল প্রাণে ডাক না দিকি
লুকিয়ে কেমনে রয়।
ও যে বড়ই মজার খেলা—
কা'রো কাছে কান নেই তার
কান হয় তাঁর ভক্তের ঠাই,
এই যে তিনি ভক্তসনে
কইছে কথা সংগোপনে
তবু শুনি মুখ নেই তার
দেখে' অবাক্ হই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক।

অধরামৃত।

পূর্ব্ব সংখ্যায় আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদন করাইবার কিছু সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এবারে সেই অধরামৃতের মাহাত্ম্যসূচক একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

পূর্ব্বকালে কান্যকুব্জ নগরে এক মহা মূর্খ দরিদ্র যাজক ব্রাহ্মণ বাস করিত। গ্রামবাসীদের দেবতা-পূজাই তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। কৃষ্ণভক্তি কাহাকে বলে, তাহা সে স্বপ্নেও জানিত না। এবং জীবনে ক্ষণকালও ভক্তসঙ্গ তাহার অদৃষ্টে মিলে নাই। তবে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ সে শ্রীকৃষ্ণের সুদুর্লভ অধরামৃত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিজপুত্র সমুদ্রকে সঙ্গে লইয়া দূরদেশে যাইতেছিল। পথশ্রমে তাহারা অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে তাহারা দেখিল যে, পথিমধ্যে একস্থানে কিছু খাবার পড়িয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ভোগের পরে বৈষ্ণবগণ ভক্ষণ করিয়া, ভুক্তাবশেষ রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। পরে কুকুরে খাইয়া গিয়াছে এবং ধূলায় মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই ব্রাহ্মণ ও পুত্র সমুদ্র তাহা দেখিয়া ক্ষুধাবশতঃ কুড়াইয়া লইয়া নিজেরা কিছু উদরসাৎ করিল, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণীর জন্য বাড়ী লইয়া আসিলে ব্রাহ্মণীও কিছু খাইল। অজ্ঞাতসারে তাহাদের এই সৎকার্য্যটুকু হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের কি অবস্থা হইল শুনুন।

একদিন সেই ব্রাহ্মণ ভিন্ন-গ্রামস্থিত কোন এক বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সমুদ্রের সহিত সেস্থানে গিয়াছিল। সেখানে মহোৎসব শেষ হইলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া তাহারা গৃহে ফিরিবার পথে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সমুদ্র ব্রাহ্মণকে বলিল "আসুন আমরা এইখানে স্নানাহার সমাপন করি। ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমাকে বড় কাতর করিয়াছে।" তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল "দেখ, এই নদীর তীরে ভীষণ জঙ্গল, এখানে নানাপ্রকার ভয়ের কারণ আছে। সম্মুখেই গ্রাম দেখা যাইতেছে। ওখানে একটী রমণীয় সরোবর আছে। সেইখানে গিয়াই স্নানভোজনাদি সমাপন করা যুক্তিযুক্ত।"

পিতার কথা শুনিয়া সমুদ্র একটু হাসিয়া বলিল "বাবা! আপনি এমন কথা বলেন কেন? যদি আমাদের অদৃষ্টে মৃত্যু লেখা থাকে, তবে কে খণ্ডাইবে? অদৃষ্টলিপির কখনও অন্যথা হয় না। চরাচর বিশ্বের কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। "রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে?" অতএব সেই সর্ব্বশক্তিমান্ গোবিন্দের চিন্তা করুন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।"

দশ বৎসরের সেই বালকের মুখে এত বড় কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আনন্দের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তখন সমুদ্র সেই চন্দ্রভাগার শীতল জলে স্নান করিয়া, কিছু মিষ্ট ভক্ষণ করিল। ইহাতে তাহার ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হইল। পরে পিতাকে অবগাহন করিতে দেখিয়া সে সমীপস্থ বন হইতে পিতার আহ্নিকের জন্য ফল-ফুলাদি আনিতে কানন-মধ্যে প্রবেশ করিল।

সেখানে সে পিতার ভোজন-পাত্রের জন্য পাতা, ও ইন্দ্রাদি দেবতা পূজার জন্য নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্প এবং দাড়িম্ব আম্র প্রভৃতি বিবিধ সুপক্ক ফল সংগ্রহ করিল। সেই সকল লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে একটি সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইল। তথায় কিছু জলপান করিয়া কতকগুলি পদ্ম চয়ন করিল। ইহাতে তাহার পক্ষে বেশ একটা বড় বোঝা হইল। অতি কষ্টে সেইগুলি মাথায় লইয়া সে পিতার নিকটে ফিরিতেছে, এমন সময় পথে দেখিল, সম্মুখে একটা ভীষণ ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।

তাহাকে দেখিয়াই সমুদ্র ভয়ে পিতা পিতা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ বহুদূরে ছিল, কিছুই শুনিল না। পিতার কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া সে পুনরায় তাড়াতাড়ি সরোবর-তীরে ফিরিয়া গেল।

সেখানে বসিয়া বালক সমুদ্র জন্মমৃত্যু-জরা-হর শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজ ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইল। বুকের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপখানি চিন্তা করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া গেল। এবং ভক্তিভাবে পুটাঞ্জলি হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।

বালকের স্তব শুনিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁর প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে নারায়ণ-ঋষি বালকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া [illegible]

প্রণত-বালকের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে বলিলেন, "বৎস! কিছুকাল পূর্ব্বে তোমরা রাস্তায় পতিত ধূলামাখা, কুকুরের ভক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ভক্ষণ করিয়াছিলে, সেই জন্যই আজ শ্রীকৃষ্ণকে ভজিবার জন্য তোমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, এবং এই ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। এ জন্য অবশ্যই তোমাদের গোলোকধাম প্রাপ্তি হইবে। বৎস! তোমার তুল্য সৌভাগ্যবান আর কে আছে? তুমি আমার নিকট তোমার অভীষ্ট কিছু বর প্রার্থনা কর।"

ইহা শুনিয়া সমুদ্র বলিলেন, "প্রভো! যদি এতই সদয় হইয়াছেন, তবে এই কৃপা করুন, যেন শ্রীকৃষ্ণে আমার দাস্যভক্তি লাভ হয়, আমার আর অন্য কিছুই কামনা নাই।"

নারায়ণ-ঋষি বালকের কথায় পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং তাহার দক্ষিণ কর্ণে কল্পতরু-সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র ও তাহার ধ্যান-কবচাদি প্রদান করিয়া ঐ মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে বলিলেন, এবং আরও বলিলেন যে, দুই জন্মে সমস্ত কর্ম্মভোগ ক্ষয় হইলে, তুমি গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের দাস্যগতি লাভ করিবে। এ জন্মে ত্রিশ হাজার বৎসরকাল তোমাকে রাজ্যভোগ করিতে হইবে। তবে আমার আশীর্ব্বাদে ও মন্ত্রের কৃপায় তোমার এই রাজ্য সর্ব্ব-সুখাস্পদ হইবে। পরজন্মে তুমি মৃকণ্ডু মুনির পুত্র মার্কণ্ডেয় নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। তাহার পরে তোমার শ্রীকৃষ্ণ-লোকপ্রাপ্তি হইবে।" এই কথা বলিয়া ঋষি-নারায়ণ স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু সেই ঋষি সমুদ্রের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন না; কারণ তিনি যখন সমুদ্রকে বর লইবার জন্য বারম্বার আগ্রহ পূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন, তখন সমুদ্র তাঁহার গলদেশে যে উজ্জ্বল কবচটী ছিল, তাহাই চাহিয়া বসিল। ঐ কবচটি নাকি সকলের সকল অভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ, এবং আরও অনেক রকম অদ্ভুত ও অলৌকিক ক্ষমতাপূর্ণ। কিন্তু কি করিবেন, পূর্ব্বেই সমুদ্রের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; বালককে কব-চটি দিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

যাহা হউক, ঋষির বরে ও কবচের প্রভাবে সমুদ্র ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত

হইয়া, সরোবর হইতে উঠিয়া, তাহার তীরে একটী বটবৃক্ষের মূলে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র জপ ও তাঁহার পূজায় চিত্ত নিয়োগ করিলেন।

এদিকে সমুদ্রের পিতা সেই ব্রাহ্মণ তাহার বিলম্ব দেখিয়া, ইতস্ততঃ বহু অনুসন্ধান করিলেন। অবশেষে বিফল-মনোরথ হইয়া পুত্রের মৃত্যু-সম্ভাবনা করিয়া আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

মাতা ব্রাহ্মণী সমস্ত ঘটনা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিতে সমুদ্যতা হইয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রে একটী স্বপ্ন দেখিয়া দেহত্যাগে বিরত হইয়া স্বামী স্ত্রী উভয়ে পুত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহারা সেই সরোবরতীরে বনমধ্যে বহু অন্বেষণ করিয়া, বটমূলে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন পুত্রকে পূজানিরত দেখিয়া, আনন্দাপ্লুতহৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং পরমাহ্লাদিতচিত্তে পুত্রকে লইয়া গৃহে আসিলেন।

সেই দেশের রাজা বালক সমুদ্রের অলৌকিক তেজস্বিতা দেখিয়া, তাহাকে বহুমূল্য রত্নালঙ্কারভূষিতা তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভা কমলাকলানাম্নী স্বীয় যুবতী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তৎসঙ্গে হাজার হস্তী, দশলক্ষ অশ্ব, এক সহস্র দাসদাসী এবং বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার যৌতুক-স্বরূপ দান করিলেন। কিন্তু কন্যাকে বিদায় দিয়া নববিরহ সহ্য করিতে পারিবে না ভাবিয়া কন্যার সহিত জামাতার গৃহে গমন করিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া রাজা দেখিলেন, অমরাবতী হইতেও শ্রেষ্ঠ রাজপ্রাসাদ-তুল্য বিপ্রের গৃহ শোভা পাইতেছে। সেই শুদ্ধস্ফটিক-নির্ম্মিত প্রাসাদ সাতটী প্রাচীরও তিনটী পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত। আরও সেখানের গৃহের কপাটগুলি হীরকমণ্ডিত, প্রাঙ্গণ ও সিঁড়ি সোনা দিয়া জড়িত। বিবিধ মণিমাণিক্য-সংযুক্ত আকাশ-স্পর্শি-অট্টালিকাশ্রেণী দেখিয়া রাজা পিতামাতা ও সমুদ্র সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

তাঁহারা নগরসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র, লক্ষ লক্ষ হাতী ঘোড়া ও পদাতি সৈন্য আসিয়া তাহাদের অনুগমন করিল। বহুসংখ্যক নর্ত্তকী তাহাদের সম্মুখে নাচিতে নাচিতে চলিল। যখন তাঁহারা প্রাসাদের সম্মুখে আসিলেন, তখন একজন মন্ত্রী গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া সমুদ্রকে প্রণাম করিল। এবং তাঁহাকে রত্ননির্ম্মিত একটি মন্দিরে প্রবেশ করাইয়া সাদরে সিংহাসনে বসাইল।

ঐ সঙ্গে কন্যা রাজা পিতামাতা প্রভৃতি সকলকেই এক একখানি রত্নসিংহাসনে বসিতে দিল। নিজে শ্বেতচামর দ্বারা সমুদ্রকে বীজন করিতে লাগিল এবং একজন দাস তাহার মস্তকে রত্নছত্র ধরিল।

কয়েকদিন জামাতার গৃহে বাস করিয়া রাজা স্ব-রাজধানী চলিয়া গেলেন।

এইভাবে প্রায় ত্রিশহাজার বৎসর অতিক্রম হইতে চলিল। একদিন বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের নিকটে বিদায় লইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ বনগমন করিলেন। সেখানে হঠাৎ একদিন এক বাঘ ব্রাহ্মণকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিল। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইলেন। এবং উভয়ে রত্ননির্ম্মিত রথে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণলোকে চলিয়া গেলেন। ইহার কারণ—তাঁহারা উভয়েই একদিন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ভক্ষণ করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া সেই বাঘটাও পবিত্র হইল, এবং তাহাদের সহিত তৎক্ষণাৎ গোলোকে চলিয়া গেল।

কিছুকাল পরে সমুদ্রও পুত্র-হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের উপরে মন্দাকিনীর তীরে তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। অবশেষে সেখানে মানবলীলার সম্বরণ করিয়া পুনরায় মৃকণ্ডুমুনির পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। সে জন্মে নাম হইল তাঁর মার্কণ্ডেয়-মুনি। সাতকল্প পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সেই দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনান্তে শ্রীকৃষ্ণধাম গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বলাভ করিলেন।

যদিও শ্রীকৃষ্ণাধরসুধা-পানে তাহাদের কোন কামনা ছিলনা, তথাপি অজ্ঞাতসারে তাঁহারা ইহা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ সেই দরিদ্র মূর্খ ব্রাহ্মণেরও পত্নী এবং পুত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণলোকপ্রাপ্তি ঘটিল।*

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।
বৈষ্ণবদর্শন-বিদ্যালয়, নবদ্বীপ।

---

*এই উপাখ্যানটী শ্রীনারদ-পঞ্চ-রাত্র-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। —লেখক।

মৌচাক।

(শ্রীআনন্দভট্ট লিখিত)

শ্রীল মধ্ব-মুনি যে অভিনব মধুচক্র তৈরী ক'রে গেছেন, তার কিছু সবার সাম্‌নে উপস্থিত করছি; বোধ করি, আস্বাদন করিলে সুখ হ'বে।

বিশ্ব যা'কে নিত্য খোঁজে, যা'কে জগতের সবাই ভালবাসে, সেই আনন্দ দিয়ে যাঁর মূর্ত্তিখানা গড়া; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, যাঁর শক্তির বিকাশ; যিনি আনন্দ জ্ঞান ও সত্তা বিজড়িত বিভুবস্তু; রমাসাথে যাঁর নিত্য বিলাস; যিনি চিরসত্য, চিরসুন্দর, চিরমধুর; এবং অন্য নিরপেক্ষ সমর্থ; তিনিই পরতত্ত্ব; তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

সেই চির সুন্দর, চিরমধুরকে হাতে ধরা পরশমণির মতন জানা'তে, বুঝা'তে, দেখা'তেই বেদ-ইতিহাস-পুরাণের কথা কওয়া। বেদ, তাঁর অনন্তস্ফুরণ লোকের সাম্‌নে অনন্তভাবে কইয়ে দেয়।

এই সত্যের স্পন্দে অভিব্যক্ত বিশ্বও সত্য। ঐ নিত্য সত্যের অনন্তস্ফুরণ, বিকৃত নয়, নিত্য; আর বিশ্বের অনন্তস্ফুরণ হ'ল বিকৃত, তাই ধ্বংসশীল; এইটুকুই দুইয়ে ভেদ।

বিশ্ব ও বিশ্বকর্ত্তা এক নয়, ভেদশীল। মূলীভূত বস্তু হ'ল বিশ্বকর্ত্তা। তিনি খাঁটী এবং অনাবিল। বিশ্ব হ'ল তাঁর মায়াময়ী ও জৈবী শক্তির বিবিধ স্ফূর্ত্তি।

তিনি এক, তিনি সবার প্রভু। আর এ বিশ্ববাসী তাঁর দাস। তিনি মায়াধীন, বিশ্ববাসী মায়াবশ, পেত্নীতে পাওয়ার মতন একটা মাটীর ঢেলা দেহে আমি বুদ্ধি করে, নিজে স্বভাবতঃ চেতন হয়েও অভিমানে বিশ্ববাসী জড়ীয় একটা মৃৎপিণ্ড। সেই সত্যবস্তুকে সেই চিরমধুরকে ভুলে বিকৃত এই বিশ্বের

স্ফুরণ নিয়ে খেলা করে বলে আগুন মাঝে ফড়িংএর দশার মত বিশ্ববাসীর দুঃখ। তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়াই হ'ল বিশ্বের সফলতা ও অভীষ্ট প্রাপ্তি।

সেই বিশ্বপতির অনন্ত স্ফুরণের পারম্পরিক মধুরতার বেশ কম আছে, তাই যে যেমনি স্ফূর্ত্তির সাথে দেখা কর্ব্বে, তার তেমনি শক্তি আস্‌বে। সুতরাং ও পারের জগতেও কতকটা তরতমতা থাক্‌বে।

সেবা, সাধনার সিদ্ধি। তাঁর দেওয়া দেহে তাঁ'কে সুখী কর্‌তে ইচ্ছা হলেই তাঁর সাম্‌নে গিয়ে মিশ্‌লেই বুঝতে হ'বে, সাফল্যের পরাকাষ্ঠা এসে সাধককে বরণ ক'রেছে। সেখানেই অনন্ত স্ফূর্ত্তিতে আনন্দধারা, নিত্যই নূতন ভাবে উধাও হ'য়ে প্রবাহিত, ভিতর বাহিরে এ আনন্দধারার অনুভূতিই পরম মোক্ষ।

সেই পরম মোক্ষ লাভ কর্ত্তে সেই মধুরকে হৃদয়ে জাগিয়ে তুল্‌তেই সাধনার প্রয়োজন, তাঁর সাধনা বিশ্বকে তাঁর সাম্‌নে এগিয়ে নিয়েছে ও নিবে, তাঁর নিত্যসঙ্গী কর্ব্বে ও ক'রেছে।

এ জগতের বিষয় বুঝ্‌তে হ'লে শাস্ত্রের আশ্রয় নিতে হ'বে, তা না হলে হয়তো মরীচিকা ভ্রান্ত-হরিণ-শিশুর মত ভ্রমাবর্ত্তে লাফিয়ে পড়্‌তে হবে, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দোষ অনেক সময় ধরা যায়। খেলোয়াড়ের নিজের মাথা কাটা মিছা। পাহাড়ের আগুন, বৃষ্টিতে নিভ্‌লে ধূম দিয়ে অনুমান অলীক। তাই, শাস্ত্রের অধীনে প্রত্যক্ষ ও অনুমান যথার্থ হ'তে পারে; ভগবানের উপদেশই হ'ল শাস্ত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর বিশ্বের জন্য এই নবমধু দিয়ে গেছেন, সবাই আস্বাদন করিয়া সুখী হোক্।

বিরহে।

গীত।

আমার হৃদয়কুঞ্জে বাঁশী কি বাজিবে আর
আর কি হেরিব নয়নে আমার
চরণ পদ্ম তাঁর।
ফুটেনাক ফুল ছুটে না গন্ধ,
বহেনাক হেথা পবন মন্দ,
কি আছে তাহার নয়নানন্দ
কি সুখে আসিবে আর।
বিরহের সাগর মরমের শ্বাস
সারা জীবনের যত হাহুতাশ
আছে শুধু তাহে কোমল প্রাণে
ভাল কি লাগিবে তার।

শ্রীকালীপদ ভাক্ষিত, এম্ বি।

পুরুষ-প্রয়োজন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে—যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে একমাত্র পরতত্ত্ব বা পরব্রহ্মানন্দেই আনন্দের চরম পর্য্যবসান। এই পরব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তিই অত্যন্ত-সুখপ্রাপ্তি ও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ। এসকল বিষয় শ্রুতি-প্রমাণাদিদ্বারা ইতিপূর্ব্বে সামান্যাকারে স্থিরীকৃত হইয়াছে, বিশেষভাবে পরে বর্ণিত হইবে। এখন আমাদের জানা আবশ্যক,—অখণ্ড-আনন্দ-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুকে লাভ করিয়া যে জীব সুখী হইয়া থাকে এবং যে জীবের নিখিল দুঃখরাশি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই জীবের স্বরূপ কি? ঐ পরতত্ত্ব বা পরব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধই বা কি? এবং জীবের দুঃখ বা কি?

এসকল বিষয় ভালরূপে জানা না থাকিলে, ঐ পুরুষার্থের প্রতি প্রয়োজনবুদ্ধি উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এজন্য এবার আমরা এই জীবতত্ত্ব সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা আরম্ভ করিতেছি। জীবের পরমহিতৈষী পূজ্যপাদ শ্রীসনাতন-গোস্বামিচরণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে এই জীবতত্ত্বটিই সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কে আমি? আমারে কেন জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি মুঞি, কৈছে হিত হয়? ॥

অথ জীবশ্চ তদীয়োঽপি তজ্জ্ঞান সংসর্গাভাবযুক্তত্বেন তন্মায়াপরাভূতঃ স্বস্বরূপজ্ঞানলোপান্মায়া-কল্পিতোপাধ্যাবেশাচ্চানাদিসংসারদুঃখেন সংবধ্যতে।
—প্রীতিসন্দর্ভ—১ অঙ্ক।

জীব, ঐ অখণ্ড-আনন্দস্বরূপ পরতত্ত্বেরই অংশ; অতএব স্বরূপে অণু-আনন্দ। তথাপি জীব, পরতত্ত্বজ্ঞানের সংসর্গাভাবযুক্ততাহেতু * তদীয় মায়াকর্তৃক পরাভূত হইয়াছে, মায়া হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াই নিজ স্বরূপের (জীবস্বরূপের) জ্ঞান হারাইয়াছে; তজ্জন্য ঐ মায়াকল্পিত দেহরূপ উপাধিতে আবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ দেহে আমিত্ববুদ্ধি রচনা করিয়া অনাদি-সংসার-দুঃখে সংবদ্ধ হইতেছে।

---

* ন্যায়শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, অভাব প্রধানতঃ দুই প্রকার—অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব। ঘটে আছে পটাভাব, আবার পটে আছে ঘটাভাব, এই অভাবের নাম অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব তিন প্রকার,—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। ঘটোৎপত্তির পূর্বে যে ঘটের অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব, আবার ঘট বিনষ্ট হইলে ঘটের যে অভাব উপস্থিত হয়, তাহার নাম ধ্বংসাভাব। এই গৃহে ঘট নাই—বলিলে, গৃহমধ্যে ঘটের যে অভাব প্রতীত হয়, তাহার নাম অত্যন্তাভাব (অর্থাৎ গৃহের কোনও প্রদেশে ঘট নাই বটে কিন্তু স্থানান্তরেও যে ঘট নাই, এমত নহে)।

জীব যে পরতত্ত্বজ্ঞানের সংসর্গাভাবযুক্ত হইয়াছে, উহা ঐ সংসর্গাভাবের অন্তর্গত তিনটী ভেদের মধ্যে শেষোক্ত অত্যন্তাভাব। কারণ,—প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব, জন্য বস্তুরই সম্ভব হয়, নিত্যবস্তুর নহে। পরতত্ত্ব-জ্ঞানটী নিত্য-

মায়াবাদপ্রবর্ত্তক আচার্য্য শঙ্কর বলেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ং, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, বিজ্ঞানানন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, এই বিজ্ঞানানন্দে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ত্বাদি কোন প্রকার ভেদ নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জানা যাইতেছে যে, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদত্রয় শূন্য (১) অদ্বয়জ্ঞানই পরতত্ত্ব বা ব্রহ্মবস্তু। ঐসকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের কোন শক্তি-বিশেষের প্রতীতি হইতেছেনা, অতএব নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র অদ্বৈত-ব্রহ্মই বাস্তবিক সত্য, তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। তবে ঈশ্বর ও জীব বলিয়া যে ভেদব্যবহার দেখা যাইতেছে, উহা অজ্ঞানকল্পিত মাত্র।

অজ্ঞান বা মায়া বলিয়া একটি বস্তু অদ্বৈতবাদীগণ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাহাদের মতে উহা সৎ বস্তুও নহে, আবার অসৎ বস্তুও নহে। কারণ, অজ্ঞানকে সৎ-বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে অদ্বৈতের হানি হয়। আবার অসৎ বলিলেও অজ্ঞানরূপে যে প্রতীতি আছে—যাহাদ্বারা মিথ্যাবস্তুর কল্পনা জল্পনা হইতেছে, উহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব মায়া বা অজ্ঞান—সৎ ও অসৎ বস্তু হইতে বিলক্ষণহেতু অনির্ব্বচনীয়। এই মায়া বা অজ্ঞানের দুইটি বৃত্তি আছে,—একটী বিদ্যাবৃত্তি অপরটী অবিদ্যাবৃত্তি। একই চিন্মাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম, অজ্ঞানের এই বিদ্যাবৃত্তি দ্বারা উপহিত (আচ্ছাদিত) হইয়া ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত, আবার অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা উপস্থিত হইয়া জীব বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা ঐ অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া গেলে ঈশ্বর ও জীবরূপ ভেদজ্ঞান স্বতঃই তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব ঈশ্বর ও জীব বলিয়া পৃথক দুইটী তত্ত্ব নাই; একমাত্র নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় চিন্মাত্র ব্রহ্মই সত্য, ঈশ্বর ও জীবরূপে ভেদজ্ঞান মিথ্যা; ইহাই আচার্য্যশঙ্কর বলেন।

পরতত্ত্বজ্ঞানের অত্যন্তাভাবই বুঝিতে হইবে। যে গৃহে ঘট ছিল না, সেই গৃহে স্থানান্তর হইতে ঘট আনয়ন করিলে যেমন গৃহের ঘটসম্বন্ধীয় অত্যন্তাভাব দূর হয়, পরতত্ত্বজ্ঞানের অত্যন্তাভাবযুক্ত জীবে সেইরূপ পরতত্ত্বজ্ঞানটী যখন আবির্ভূত হইবে, তখন জীবের পরতত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অত্যন্তাভাবটী স্বতঃই দূরীভূত হইয়া যাইবে।

(১) আম্র কখনও পনস নহে, এইটী সজাতীয় ভেদ। আম্র কখনও ইষ্টক নহে, এইটী বিজাতীয় ভেদ। আম্র-মুকুল আম্র নহে, এইটী স্বগতভেদ।

আচার্য্য-শঙ্করের এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক। যেহেতু—একই সময়ে একই অজ্ঞানের যোগহেতু ব্রহ্মের একটী অংশ হইতেছে বিদ্যার আশ্রয় [ঈশ্বর], আর অপর অংশ হইতেছে অবিদ্যাকর্ত্তৃক পরাভূত [জীব]! যদি আমি মায়াবাদী আচার্য্যপাদের দেখা পাইতাম, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম যে,—ব্রহ্ম এমন কি অপরাধ করিয়াছিল, যে অপরাধের দণ্ডস্বরূপ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপজনিত নানাবিধ ক্লেশ, ব্রহ্মকে সহ্য করিতে হইতেছে?

আচার্য্য-শঙ্কর আরও বলেন,—ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে—ইন্দ্র মায়া-দ্বারা নানাপ্রকার রূপধারণ করে—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে অদ্বৈত ব্রহ্মই মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঈশ্বর ও জীবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। টঙ্ক (পাষাণবিদারক যন্ত্রবিশেষ) দ্বারা ছিন্ন (খণ্ডিত) পাষাণখণ্ডবৎ অজ্ঞানোপাধিদ্বারা ছিন্ন ব্রহ্ম-খণ্ডবিশেষই—ঈশ্বর ও জীব।

আচার্য্যশঙ্করের এরূপ সিদ্ধান্ত কখনও সঙ্গত হয় না। কারণ, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য ও অখণ্ডবস্তু। ঈশ্বর ও জীব উভয়ই অনাদিসিদ্ধ। যে বস্তু গ্রহণ বা স্পর্শের যোগ্য, সেই বস্তুরই উপাধি সম্ভব হয়। যাহা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপক ও সকলের গ্রহণ বা স্পর্শের অযোগ্য * সেই ব্রহ্মবস্তুর কখনও উপাধি সম্ভব হয় না। একটী বস্তুকে দুই বা তদধিকরূপে বিভাগ করার নাম ছেদ; ইষ্টকাদি জড় বস্তুর ন্যায় ব্রহ্মের অংশ বা বিভাগ যদি সম্ভব হইত, তবে ব্রহ্মের এক অংশ আবৃত এবং অপর অংশকে অনাবৃত বলা যাইত। আবার সমগ্র ব্রহ্মই উপাধি-যুক্ত হইয়া, ঈশ্বর ও জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে,—একথাও অদ্বৈত-বাদীগণ বলিতে পারিবেন না। কারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বাংশেই যদি সর্ব্বদা উপাধিযুক্ত থাকে, তবে "অনুপহিত ব্রহ্ম বা চৈতন্য" এরূপ প্রয়োগ তাঁহারা কোন কালেও করিতে পারেন না। অতএব উপাধিযোগে ব্রহ্মে ঈশ্বর ও জীবভাব কখনও সম্ভব হয় না।

অদ্বৈতবাদীগণ যদি বলেন যে, ব্রহ্মসম্বন্ধে অজ্ঞান আছে বলিয়া, ব্রহ্মে ঈশ্বর ও জীবভাব কল্পনামাত্র। যেমন—কুণ্ডলীবদ্ধ একগাছা রজ্জু দূর হইতে সামান্যা-কারে দৃষ্ট হওয়ায়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের অভাব থাকাতে, ঐ রজ্জুতে

---

* অগৃহ্যোহয়ং ন গৃহ্যতে।—শ্রুতি

সর্পকল্পনা করিতে দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকাতে ঐ ব্রহ্মে ঈশ্বর ও জীব কল্পিত হইয়া থাকে। একথাও তাঁহারা বলিতে পারেন না, কারণ—জড় বস্তুর দর্শন যেমন দুই প্রকারে সম্ভব হয়,—সামান্যাকারে ও বিশেষাকারে ; সামান্যাকারে দর্শনের পরও বিশেষাকারে দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত জড়বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞানটী থাকিয়া যায়, ব্রহ্ম সম্বন্ধে তেমন নহে। যে কোনও-রূপে একবার ব্রহ্মদর্শন ঘটিলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানের আর কোনই অভাব থাকিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে সমস্ত অজ্ঞান স্বতঃই বিদূরিত হইয়া যায়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

—শ্রুতিঃ।

সর্ব্বব্যাপক অখিলাত্মা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার যিনি একবার লাভ করিতে পারেন, তাঁহার হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থি-সকল সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, ব্রহ্ম সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় ভঞ্জন হয়, যাবতীয় কর্ম্মরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব একবার ব্রহ্মদর্শন ঘটিলে ব্রহ্মসম্বন্ধে কোনই অজ্ঞান থাকিতে পারে না, কাজেই অজ্ঞান-হেতু ঈশ্বর-জীব-কল্পনা সম্ভব হয় না। আবার ব্রহ্মদর্শন না হইলে তাহাতে কল্পনাই বা কিরূপে করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি রজ্জুর স্বরূপ কিছুমাত্র দেখিতে পাইতেছে না, সে আবার রজ্জুতে সর্পকল্পনা কিরূপে করিবে? অভ্যুপগমন্যায়ে অর্থাৎ তোমার কথাই স্বীকার করিলাম—এরূপভাবে অদ্বৈতবাদীগণের ঐ কল্পনাটীও যদি বা স্বীকার করা যায়, তবে সেই কল্পনাকারীই বা আবার কে হইবে? অদ্বৈতবাদীগণ যদি বলেন,—ঈশ্বর বা জীব এই উভয়ের মধ্যে যে কেহ কল্পনাকারী হইতে পারে। তাহাদের এরূপ উত্তর অতীব হাস্যাস্পদ ; কারণ—রজ্জুতে যে সর্প কল্পনা হয়, সে কল্পনা কি সর্প নিজে করে? কখনই নহে, রজ্জু ও সর্প ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তিই ঐরূপ কল্পনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মেতে ঈশ্বর ও জীবের কল্পনাকারী যদি সেইরূপ (ব্রহ্ম ও মায়া ভিন্ন) অপর কাহাকেও স্বীকার করা যায়, তবে অদ্বৈতের হানি হয়, ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু স্বীকার করিতে হয়। মায়া ত জড় চেতনাবিহীন, তাহার কল্পনা করিবার শক্তিই নাই। অদ্বৈতবাদী যদি বলেন, ব্রহ্মই কল্পনাকারী হইবে ; তবে অদ্বৈতবাদী যে দোষ দেখাইয়া অদ্বৈতবাদ আপনের

জন্য অত খিচিমিচি করিতেছেন, সে দোষ তাঁহারই গলদেশে নিপতিত হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মেতে কল্পনাকারিত্বরূপ ধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া পড়িবেন। অতএব ঐরূপ স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বই রক্ষা করিতে পারিবেন না। সুতরাং অদ্বৈতবাদীগণের ঈশ্বর ও জীব সম্বন্ধে অভেদবাদটী বিচারসহ নহে, পরন্তু বেদার্থনির্ণায়ক ব্রহ্মসূত্রের অভিধাবৃত্তি (১) ত্যাগ করিয়া নিরর্থক লক্ষণা (২) স্বীকার মাত্র।

যেখানে অভিধাবৃত্তিদ্বারা অর্থসঙ্গতি না হয় এবং বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে, সেই স্থলেই পণ্ডিতগণ লক্ষণা স্বীকার করেন। যেমন "গঙ্গাতে ঘোষ বাস করে" এই বাক্যে ভগীরথখাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহময়ী গঙ্গাতে ঘোষগণের বাস অসম্ভবহেতু, এস্থলে গঙ্গা-শব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূমিতে ঘোষবাস কল্পনা করিতে হইতেছে। এস্থলে "গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে" একথা না বলিয়া, "গঙ্গাতে ঘোষ বাস করে"—বলিবার আরও প্রয়োজন আছে এই—ঘোষগণ গঙ্গার এত নিকটে বাস করে, যাহাতে গঙ্গার শৈত্যাদিগুণ তাহারা অনবরত অনুভব করিতে পারে; ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত গঙ্গাশব্দে লক্ষণা স্বীকার করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যে স্থলে অভিধাবৃত্তিদ্বারাই অর্থ-সঙ্গতি হয় (যেমন—গঙ্গাতে মৎস্য বাস করে—এস্থলে গঙ্গাশব্দের অভিধা-বৃত্তিতে জল-প্রবাহকেই বুঝিতে হইবে, তীরে লক্ষণা করিবার আবশ্যক নাই) এরূপস্থলে লক্ষণা স্বীকার করিলে সত্যেরই অপলাপরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়!

আচার্য্য-শঙ্কর বিনা প্রয়োজনে ব্রহ্ম-সূত্রের লক্ষণা স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতার হানি করিয়াছেন, ঈশ্বর ও জীবতত্ত্বের অপলাপ করিয়া ফেলিয়াছেন। এজন্য কলিপাবনাবতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু,

---

(১) অভিধাবৃত্তিঃ—তত্র সঙ্কেতিতার্থস্য বোধনাদগ্রিমাভিধা॥
—সাহিত্যদর্পণ।

(২) লক্ষণাবৃত্তিঃ—মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণা শক্তিরর্পিতা॥—ঐ।

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের ভাষ্যের খণ্ডন ও দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন;—

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি কর সেই সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥

* * * *

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া কর শব্দের লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।

* * * *

লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি হয়॥

* * * *

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বর-জীব-ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে কহত অভেদ?॥

* * * *

জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য—৬ষ্ঠ।

ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব এই চতুর্ব্বিধ দোষপরিশূন্য ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের বাক্যই যাবতীয় তত্ত্বনিরূপণ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ; তিনি সমাধি-অবস্থাতে ঈশ্বর ও জীবের ভেদ স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যথা—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৪—৫

শ্রীব্যাসদেব সম্যক্‌রূপে প্রেম-সমাধিযুক্ত বিমলচিত্তে, স্বয়ং ভগবান্ ও

তদাশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন—যে মায়াতে বিমোহিত হইয়া জীব ত্রিগুণাত্মক জড়দেহের অতীত (চিন্ময়) হইয়াও নিজকে ত্রিগুণাত্মক দেহাদি-সংঘাতরূপ জড় পদার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য সংসাররূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহাও দর্শন করিয়াছিলেন। এস্থলে ঈশ্বর হইতে জীবের সম্পূর্ণ বিলক্ষণতা (পার্থক্য) দেখা যাইতেছে। ঈশ্বরের আশ্রিতা যে মায়া, সেই মায়া জীবকে বিমোহিত করিতেছে। অতএব ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়ার কিঙ্কর,—ইহাই ঈশ্বর ও জীবে ভেদ।

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বর-জীব-ভেদ।

কামাচ্চ—এই বেদান্তসূত্রের (১।২।১৯) ভাষ্যে আচার্য্য শ্রীরামানুজস্বামী বলিয়াছেন—জীবস্ত্ববিদ্যা-পরবশস্তু—জীব মায়ার একান্ত বশীভূত। ভেদ-ব্যপদেশাচ্চ (১।২।১৮) এই সূত্রেও জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে।

ঈশ্বর, জীব, মায়া ও কাল এই চারিটী তত্ত্বই ব্যাসদেব দর্শন করিয়াছিলেন; এই চারিটী তত্ত্বই নিত্য।

অথ হ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কালঃ।

—ভাল্লবেয়শ্রুতিঃ॥

বিভু-বিজ্ঞান ঈশ্বর আর অণু-বিজ্ঞান জীব। সত্ত্বাদি গুণত্রয়-বিশিষ্ট জড় দ্রব্যই মায়া। গুণত্রয়শূন্য ভূতবর্ত্তমানাদি ব্যবহারের মূল-কারণরূপ জড়পদার্থই কাল। এতদ্ভিন্ন আরও একটী তত্ত্ব আছে, তাহার নাম কর্ম্ম; ইহাও জড়-পদার্থ—এটী অনাদি অথচ বিনাশী। ঈশ্বর শক্তিমান্ তত্ত্ব, অপর চারিটী তাঁহার শক্তি। অতএব ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন হইলেও, জীব ঈশ্বরেরই শক্তি।

জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্। —চৈঃ চঃ আদি ৭ম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরহরি দাস ভাগবতভূষণ কাব্য-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ।
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

আশা।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

তোমায় দেখিব বলিয়ে নয়ন মুদিনু কভু দেখিবারে পাইনা।
বহু আশা বুকে ধরিয়ে রয়েছি, আশার অবধি হলনা ॥১॥
অৰ্দ্ধেক জনম নিদ্রা-মোহবশে, কাটিয়ে দিয়েছি প্রভু গো।
বাকী অর্দ্ধকাল ধনযশ-তৃষা সদাই তাহার ভাবনা ॥২॥
জীবনের সন্ধ্যা সমাগত প্রায় কবে দীপ নিভে যায় গো।
ভরসা কেবল করুণা তোমার এই যে আমার সাধনা ॥৩॥
এই জন্মে না হয় কোন জন্মে হবে এ ভরসা আমার আছে গো।
এই ভিক্ষা প্রভো জন্মে জন্মে আমি (যেন) সেবায় বঞ্চিত হইনা ॥৪॥
ভীক্ষা-ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমার দুয়ারে প্রভু গো।
পূর্ণ করে দাও কাঙ্গালের ঝুলি আশীর্ব্বাদ কৃপা করুণা ॥৫॥

শ্রীঈশানচন্দ্র কর পুরকায়স্থ বি, এল, (রায় বাহাদুর)
বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যভারতী।

প্রাচীন মায়াপুরে "চাতুর্ম্মাস্য নাম-যজ্ঞ।"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত বৈষ্ণব ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিনীত নিবেদন এই,—

আপনারা অবগত আছেন, শ্রীনবদ্বীপ সহরের উত্তরদিগবর্ত্তী মাঠে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির উদ্ধারের ব্যবস্থা ও আয়োজন হইতেছে। ঐ মন্দিরটি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জন্মস্থানের একটি স্মৃতি-কীর্ত্তি বিশেষ। ভজনানন্দ বহু বৈষ্ণব-মহাত্মার অনুভব দ্বারা যেরূপ প্রতীতি হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি, "ঐ স্থানে নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান না হওয়া

পর্যন্ত শ্রীমন্দির-উদ্ধার সম্ভবপর নহে।" সে জন্য ঐ স্থানে "চাতুর্মাস্য নাম-যজ্ঞানুষ্ঠান" কার্য্যের আয়োজন করিতেছি। কেবল ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারাই এই কার্য্য সম্পাদিত হইবে। প্রত্যহ অহোরাত্র কীর্ত্তনে ন্যূনকল্পে ১৬ জন লোককে স্থায়িভাবে নিযুক্ত না করিলে কার্য্য সুসিদ্ধ হইবেক না। এ কার্য্যে প্রতি মাসে ১৭৫৲ টাকার প্রয়োজন। অথবা ৩০ জন ভক্ত বা দাতা দৈনিক ব্যয়ভার সম্পাদনের ব্যবস্থা করিলে, চারি মাসের জন্য চারিদিনের সেবাধিকারী হইতে পারেন। দৈনিক ৬।০ টাকা হিসাবে উক্ত চারি দিবসে ২৫৲ টাকা মাত্র ব্যয় পড়িবে। এ কার্য্যের জন্য মাননীয় কাশীমবাজার-মহারাজ বাহাদুর ২৫৲ টাকা মঞ্জুর করিয়া অন্যান্য দাতা ভক্তগণকেও এরূপ-ভাবে নাম-যজ্ঞ সম্পাদনের সাহায্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন। আমরা ত্রিশজন ভক্তের প্রতিশ্রুতি-পত্র পাইলে নিশ্চিন্তমনে কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারি। ঐ সমস্ত সাহায্যদাতাগণের নাম সংবাদ-পত্রে প্রচার করিয়া "নাম যজ্ঞ-মণ্ডপে" একখানা বিজ্ঞাপন-পত্রে তাঁহাদের প্রতিমাসের দৈনিক সেবার দিন নির্দ্ধারণ দ্বারা যেন আমরা নিশ্চিন্তভাবে এই অনুষ্ঠান কার্য্যটী সম্পাদনের সুযোগ প্রাপ্ত হই, এই অভিপ্রায়েই এই আবেদন-পত্রখানা সংবাদপত্রে প্রচার করিতেছি। সাহায্যদাতাগণ তাঁহাদের পালানুসারে "নাম-যজ্ঞ" স্থানে স্বয়ং যোগদান করিয়া অথবা তাঁহাদের যে কোন বিশ্বাসী প্রতিনিধি দ্বারা তত্তৎদিবসীয় ব্যয় বিধানের ব্যবস্থা করিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

এই চাতুর্মাস্য যজ্ঞের এই একটি বৈশিষ্ট্য থাকিবে যে, নাম-কীর্ত্তন-কালীন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সাময়িক-লীলা-কীর্ত্তন, আরতি কীর্ত্তন, ঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনাদি কীর্ত্তন প্রভৃতির সুযোগ দেওয়া হইবে। আর শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের ইচ্ছায়,—

আগামী ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার শুক্ল-দশমী তিথিতে অধিবাসের আয়োজন-দ্বারা পরদিবস বুধবার হইতে চাতুর্মাস্য "নাম-যজ্ঞ ব্রত" আরম্ভ হইবে। এ কার্য্যটি ব্যক্তিগত কোন কিছুই নহে, কেবল উপলক্ষ মাত্র; কিন্তু এ কার্য্যটি সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মণ্ডলীর অবশ্য-কর্ত্তব্য বিষয়। অতএব প্রার্থনা করি, প্রস্তাবিত কার্য্য-সম্পাদন করিতে আপনারা প্রসন্নমনে যোগদান

করিয়া আপনি আপন শক্তিসামর্থ্য অনুরূপ আনুকুল্যবিধান দ্বারা এ দরিদ্র ও ভিক্ষুক বৈষ্ণবের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করিবেন। এই আবেদনপত্র দ্বারা পূজ্যপাদ বৈষ্ণব আচার্য্যগণের বিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

উক্ত "নাম-যজ্ঞের" জন্য কেহ কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক, ঐ সমস্ত টাকা কাশীমবাজার মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর নামে অথবা শ্রীনবদ্বীপ-বৈষ্ণবপাড়া ঠিকানায় পূজ্যপাদ প্রভু শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী জিউর নামে পাঠাইলেই চলিবে। নিবেদন ইতি ১৮ই আষাঢ়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীব্রজমোহন দাস।
প্রাচীনমায়াপুর, পোঃ নবদ্বীপ; নদীয়া।

কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব।

সন ১৩৩৩ সাল, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা "সাধনা" পত্রিকায় শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী মহাশয় "কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ কেন?" তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; তজ্জন্য নিম্নে সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলাম। ভবিষ্যতে অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবেন বলিয়া আশা করি।

সাধারণতঃ তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা মানবকে জ্ঞানার্জ্জনে প্রণোদিত করে, এবং উন্নতির চেষ্টা তাঁহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করে। কিন্তু ভক্তি মানবকে ভগবানের কাছে লইয়া যায়।

ধর্ম্মবাক্যে চিরকালই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন—এই বিষয় লইয়া বহু বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মধ্যে অনেকেই বলেন—কর্ম্মই জীবনের স্বভাব, কর্ম্মই প্রকৃতির নিয়ম, এই পরিদৃশ্যমান জগত কর্ম্মেরই অভিব্যক্তি। অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহ কর্ম্মের গতি। দেবী ভাগবত বলেন—

"সদা সমুত্থিকং চৈতদ্ ব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাত্মকম্।
কর্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ।

অনাদিনিধনাজীবাঃ কর্ম্মবীজ-সমুদ্ভবাঃ।
নানা যোনিষু জায়ন্তে ম্রিয়ন্তেচ পুনঃ পুনঃ ॥"

মীমাংসাদর্শন বলেন, কর্ম্মই ভগবান, সুতরাং পৃথগ্‌ভাবে ভগবৎ-আরাধনার কোন আবশ্যক নাই। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্মবাদেরই ব্যাখ্যা। বেদেও ক্রিয়াবিশেষ-বহুল কর্ম্মের প্রশংসা পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেব জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার জ্ঞানবাদীগণ বলেন —জ্ঞানেই মুক্তি। তাঁহাদের মতে—

"ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।"

এই মতে জীবই ব্রহ্ম, মধ্যে মায়ার ব্যবধান। যেই সেই মায়া দূর হইল, অমনি জীব ব্রহ্ম হইলেন; সুতরাং "আমিই ব্রহ্ম" অনুক্ষণ এই ধারণা হৃদয়ে পোষণ করাই জ্ঞানবাদীর সাধনা। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," "সোহং" আমি সেই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানেই মোক্ষ; "ন স পুনরাবর্ত্ততে।" তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই; সুতরাং জ্ঞানবাদীদের তর্কমূলক ব্রহ্মকারণবাদের পরিবর্ত্তে বেদমূলক ব্রহ্মকারণ-বাদ আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা নতাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্‌॥"

"শ্রুতিস্তু শব্দমূলত্বাৎ" অচিন্ত্যবিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। এই প্রকারে শাস্ত্রকার-গণের মধ্যে কেহ কর্ম্মের, কেহ জ্ঞানের, কেহবা যোগের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

"শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ" বিংশ অধ্যায়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার শিষ্যগণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। যথা—

"পূর্ব্বে জ্ঞান বড় কহি চিত্তের বৈষম্যে।
এবে বিচারিয়া দেখি নাহি ভক্তির সাম্যে॥
জ্ঞানেতে ঈশ্বরে জানি ভক্ত্যে তাঁরে পাই।
জ্ঞান হৈতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ বহু শাস্ত্রে গাই॥
জ্ঞানের চরমে মুক্তি জানিহ নিশ্চয়।
মুক্তজনের শেষে হয় অভিমানোদয়॥

মুক্তি অভিমানী কৃষ্ণসেবা নাহি করে।
সেই অপরাধে পুনঃ ডুবয়ে সংসারে ॥
অতএব ভক্তিযোগ হয় সর্ব্বোত্তম ।
ভক্তিযোগে প্রবর্ত্তকের নাহিক পতন ॥
ভক্তি-মহিমার অন্ত অনন্ত না জানে।
ভক্তিদেবীর দাসী মুক্তি শাস্ত্র-পরমাণে ॥
নিষ্ঠাভক্তি হারা কর শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ॥"
অনায়াসে ভববন্ধন হইবে মোচন ॥

গীতা-ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রেও একবাক্যে ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"
"যৎকর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চযৎ।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ॥

কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা আছে; কিন্তু ভক্তি সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র। যথা—

"ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেন ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"

কর্ম্ম ও জ্ঞান-সাধনে কালাদির কিছু না কিছু অপেক্ষা আছে, কিন্তু ভক্তি-সাধনে দেশ-কাল বা পাত্রাদির কোনও আবশ্যক নাই। কর্ম্ম মোক্ষের উপায় নহে। কি নিষিদ্ধ, কি বিহিত কোনও কর্ম্মই মোক্ষের উপায় নহে। বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি-কর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি-ভোগ সিদ্ধ হইলেও, তদ্দ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয় না। কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর জ্ঞানোদয়েই মোক্ষ। কিন্তু ভক্তি-বর্জ্জিত কেবল-জ্ঞান মোক্ষ দিতে পারে না। যথা,—

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্ব ফলে।"

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

এইরূপে কৃতকর্ম্মের ফল ভগবানের উদ্দেশে অর্পণ ভক্তি না হইলেও ফলগত সাদৃশ্য দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপ হেতু আরোপ সিদ্ধা ভক্তি-নামে উক্ত হইয়া থাকে। ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া যে জ্ঞান মোক্ষফল উৎপাদন করে, তাহাকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলে। যথা,—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥"
(গীতা ৭ম অধ্যায় ১৭ শ্লোক)

অর্থাৎ আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী এই চতুষ্টয় উপাসকের মধ্যে মদ্ভক্তিপরায়ণ যে জ্ঞানী, তিনি শ্রেষ্ঠ এবং ঈদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আমার প্রিয় এবং আমিও তাহার প্রিয়। সঙ্গ-সিদ্ধাভক্তির পর শরণাপত্তি যথা,—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"
(গীতা ১৮ অধ্যায় ৩৬ শ্লোক)

শরণাপত্তি মোক্ষ-প্রতিবন্ধক পাপ-সকল দূর করে মাত্র। একমাত্র শুদ্ধা-ভক্তিই সাক্ষাৎ মোক্ষদায়িকা। এই জন্যই গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

'সর্ব্ব গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥"
(গীতা ১৮ অধ্যায় ৬৪।৬৫ শ্লোক)

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—

"আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জুন।
মাং প্রাপ্যেবতু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশভুবনের যে কোন লোকে গমন করা হউক—পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। কিন্তু আমাকে পাইলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।

"যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

যে স্থানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই আমার নিত্য-ধাম।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হও। আমার প্রসাদে পরাশান্তি ও নিত্যধাম অর্থাৎ গোলোকধাম লাভ করিবে।

ভগবানের শরণাগত না হইলে কোন উপায়েই মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

সুতরাং ভক্তি ভিন্ন কেবল কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা মায়াকে অতিক্রম করিয়া ভগবানকে প্রাপ্ত করা যায় না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেই বলিয়াছেন,—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদকে বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্ত॥"

ভাগবতে ভক্তির লক্ষণ নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত আছে,—

"লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্ব মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥"

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শুদ্ধাভক্তির নিম্নলিখিত লক্ষণ করিয়াছেন। যথা,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অর্থাৎ অন্যাভিলাষশূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত যে কৃষ্ণানুশীলন তাহাই উত্তমা ভক্তি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন,—

"শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি-অধিকারী।"

মুক্তি আদি বাসনারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত ভক্তি উদিতা হয় না। ভক্তি-লতা উৎপাদন করিতে হইলে হৃদয়-ক্ষেত্রের কর্ষণ চাই, আগাছা উৎপাটন করা চাই, এবং মূলে জল সেচন চাই। ইহার নাম ভক্তির সাধন, ইহাই সাধনভক্তি। এই—

"সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥
প্রেম-বৃদ্ধি-ক্রমে নাম স্নেহ মান, প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥"

এই মহাভাবই সাধনের চরম অবস্থা। শ্রীরাধাই মহাভাব-স্বরূপা। শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"জ্ঞানযোগে ঈশ্বরোপাসনা যেই করে।
মুক্তিমাত্র প্রাপ্তি জ্ঞানের শক্তি অনুসারে॥
সুচতুর সাধু মুক্তি বাঞ্ছা নাহি করে।
নিত্য মুক্তি না পায় জীব জ্ঞানযোগ দ্বারে॥
দ্বিজ কহে জ্ঞান বিনু আছে কিবা আর।
যাতে প্রাপ্তি হয় পরব্রহ্ম সারাৎসার॥
ব্রহ্ম হরিদাস কহে ভক্তিযোগ সার।
তাহে লভ্য হয় নিত্য ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর॥
ভক্তির স্বভাবে হয় দাস্য অভিমান।
দাস্যে হরি নিত্যসিদ্ধ তনু করে দান॥

নিত্য ব্রহ্মবস্তু হয় স্বয়ং ভগবান।
সচ্চিৎ আনন্দময় সর্ব্বশক্তিমান॥
হরিনাম হয় শুদ্ধ ভক্তির কারণ।
অবিশ্রান্ত জপে পায় নিত্য প্রেমধন॥
ক্রমে প্রেম গাঢ় হৈলে গোপীভাব পায়।
শ্রীমাধুর্য্যরসে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়॥"

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই পরম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভের যে ক্রম লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হয় ফলে প্রেম-ফল।
ইহা মালী নিত্য সিঞ্চে শ্রবণাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতিমাতা।
উপাড়ে বা ছেড়ে তবে শুষ্ক হয় লতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হাতির যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু লতার অঙ্গে যদি উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটি নাটি জীব হিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখার গণ॥

সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হয় মূল শাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥
প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥
তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেম-ফল-রস করে আস্বাদন ॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥"

এই প্রেম দ্বারা শ্রীভগবানের ভজনে জাতিকুলের বিচার নাই, ছোট বড় ভেদ নাই, বিদ্বান্ মূর্খের পার্থক্য নাই, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই তুল্য অধিকার যথা:—

"শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র, কিবা শূদ্র, কি পুরুষ নারী ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও আমরা জানিতে পারি—কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ যথা :—

"শুন ভাই সব সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধন ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে ॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥"

মহাপ্রভুর সহিত শ্রীপাদ কেশবভারতী গোস্বামীর ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া যে আলোচনা হয়, তাহাতেও আমরা ভারতী গোস্বামীর মুখ দিয়া ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এই প্রেম-ভক্তি-লাভের উপায় শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়; সেই জন্য আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়া উপসংহারে শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনার সুরে সুর মিলাইয়া ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া ভক্তিভরে নৃত্য করিতে করিতে বলি :—

"গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুরলীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত-পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজ-ভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধা-মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

দীনহীন—

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ।

শ্রীপাদ কেশবভারতী প্রভুর বাল্যাশ্রম, শ্রীপাটদেনুড়।

প্রশ্ন।

নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন প্রকাশিত হইল। আশাকরি অভিজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন; আমরা সংক্ষেপে আমাদের মত নিবেদন করিতেছি।

(১)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় বি, এ, মহাশয় (ঢাকা, ফরিদাবাদ) দুইটী প্রশ্ন পাঠাইয়াছেন :—

১ম প্রশ্ন — অচিন্ত্যভেদাভেদবাদটী জীব-ব্রহ্মের-তত্ত্ব-বিচার জন্য? না কি শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব-বিচারের জন্য?

উঃ—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদটী জীব-ব্রহ্মের তত্ত্ব-বিচারে এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব-বিচারে সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রীরাধা পূর্ণ-শক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। শক্তিমান্ হইতে শক্তির পূর্ণভেদ কল্পনা করা যায় না—শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ আছে বলিয়াও চিন্তা করা যায় না, অভেদ আছে বলিয়াও চিন্তা করা যায় না। তাই শ্রীজীবগোস্বামিচরণ এই তত্ত্বটীর "অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব" নাম দিয়াছেন। "ভেদত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদঃ অভেদত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাৎভেদঃ, অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদঃ — সর্ব্বসম্বাদিনী।" অথবা, অন্য ভাবেও ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ॥

তাই,………রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। তথাপি কিন্তু তাঁহারা
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ॥

স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও যে তাঁহারা ভিন্নরূপে প্রকটিত হইয়া আছেন, ইহাই অচিন্ত্যত্ব। অভেদেও তাঁহাদের ভেদ, অথবা ভেদেও অভেদ। তাই তাঁহাদের তত্ত্ব অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব।

২য় প্রশ্ন — রাধাকৃষ্ণের লীলা কি জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন?

উঃ —শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন নহে; ইহা পূর্ণশক্তি ও পূর্ণ শক্তিমানের ক্রীড়া। কারণার্ণব-শায়ী, গর্ভোদক-শায়ী ও ক্ষীরোদক-শায়ী—এই তিন পুরুষই অন্তর্য্যামী বা পরমাত্ম-শব্দ-বাচ্য, ইঁহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ; আর জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জীব-শক্তি বা তটস্থা-শক্তি। কিন্তু শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি। তটস্থাশক্তির সহিত স্বাংশের মিলন ও স্বয়ংরূপের সহিত স্বরূপ-শক্তির মিলন এক কথা নহে।

আনন্দ-স্বরূপ ভগবান্ আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহিত লীলা করেন; তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত তটস্থাদি অন্য কোনও শক্তির

তাঁহাকে সম্যক্ আনন্দদানের সামর্থ্য নাই। কারণ, তাঁহারে এই আনন্দ আস্বাদনের স্পৃহাও তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস বিশেষ। স্বরূপ-শক্তির আনুগত্য গ্রহণ করিয়া তটস্থাশক্তি ঐ আনন্দাত্মক-লীলায় আনুকূল্যমাত্র করিতে পারে—স্বরূপ-শক্তির ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে লীলা করিতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধেও এই কথা, শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য-স্বরূপের লীলা-সম্বন্ধেও এই কথা।

(১)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব চৌধুরী মহাশয় (পাইলগাঁও, শ্রীহট্ট) চারিটি প্রশ্ন পাঠাইয়াছেন :—

১ম প্রশ্ন ঃ গৃহীর পক্ষে ত্যাগী (ভেকধারী) বৈষ্ণবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ সঙ্গত কিনা ?

উঃ—গৃহীর পক্ষে ত্যাগী বৈষ্ণবের নিকটে দীক্ষাগ্রহণে বোধ হয় কোনও দোষ নাই। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামী ত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন ; শ্রীমদদ্বৈত-প্রভু এবং মথুরাবাসী সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ গৃহী ছিলেন ; অথচ তাঁহারা উভয়েই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর দীক্ষার শিষ্য।

২য় প্রশ্ন ঃ পিতৃগুরু ত্যাগ করিতে পারা যায় কিনা ?

উঃ—পিতৃগুরু যদি অসম্প্রদায়ী এবং অবৈষ্ণব হয়েন, এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত না হয়েন, তাহা হইলে অন্য গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণে কোনও দোষ হয় না।

কারণ শাস্ত্রবলেন,

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।"

অসম্প্রদায়ীর প্রদত্ত মন্ত্র নিষ্ফল ; এবং "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ"।

অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিলে নিরয়-গামী হইতে হয়।

৩য় প্রশ্ন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে কেহ দুই লহর, কেহ তিন লহর মালা ধারণ করেন ; ইহার তাৎপর্য্য কি ? কাহার পক্ষে কয় লহর মালাধারণ করিতে হয় ?

কয় লহর মালা ধারণ করিতে হইবে, এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোনও বিধি আছে কিনা জানিনা। বৈষ্ণবদের মধ্যে কবিরাজ-পরিবারের বৈষ্ণবগণকে এক লহর এবং অপরাপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে অম্লান দুই লহর মালা ধারণ করিতে দেখা যায়।

৪। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় দীক্ষা গ্রহণ বিধেয় কিনা?

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এ সম্বন্ধে কোনও নিষেধ দেখা যায় না।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ভাদ্র ঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রারম্ভ	২রা বৃহস্পতিবার।
একাদশী, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ।	৩রা শুক্রবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন। শ্রীশ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা। }	৬ই সোমবার।
শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত।	১৩ই সোমবার।
একাদশী	১৬ই বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত।	২৯শে বুধবার।

আশ্বিন ঃ

পার্শ্বৈকাদশী। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবামনদেবের অর্চ্চনা। সন্ধ্যায় শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন। }	১লা শনিবার।
একাদশী।	১৫ই শনিবার।
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব	২৯শে শনিবার।
একাদশী।	৩০শে রবিবার।

পূর্ব্বরাগ।

(তাল—দশকুশী, রাগিণী—কামোদমঙ্গল।)

স্বরূপের গলে ধরি বিষাদে শ্রীগৌর হরি,
দুনয়নে বহে জলধার।
কি হবে কি হবে বলে বিরহে পরাণ জ্বলে
কহ স্বরূপ কি উপায় আমার॥
কি করিব কোথা যাব কিসে প্রাণ জুড়াইব,
—কিসে বা রহিব ধৈর্য্য ধরি।
কি জ্বালা হইল মোর অন্তর জর জর
মন-প্রাণ বুঝাইতে নারি॥
ক্ষণে করে হায় হায় "কৃষ্ণ" পাবার কি উপায়
কেবা মিলাইয়া দিবে তায়।
ক্ষণে বসি অধোমুখে অঙ্গুলিতে ভূমি লিখে
ভাব কিছু বুঝা নাহি যায়॥
অরুণিত লোচন নিঃশ্বাস ছাড়ে ঘন
গোরাভাব কে বুঝিতে পারে।
এদাস গোপালে কয় গোরা আমার রসময়
ব্রজভাব পড়েছে অন্তরে॥

৺গৌরগোপালদাস বৈষ্ণব।

সমালোচনা।

"কর্ণামৃতং সূক্তিরসং বিমুচ্য
দোষেষু যত্নঃ সুমহান্ খলস্য।
অবেক্ষতে কেলিবনং প্রবিশ্য
ক্রমেলকঃ কণ্টক-জালমেব।"

"সুনিষ্ঠীতোঽপি বেদান্তে সাধুত্বং নৈতি দুর্জ্জনঃ।
চিরং জলনিধৌ মগ্নোমৈনাক ইব মার্দ্দবম্॥"

সে'দিন কলিকাতার গৌড়ীয়-মঠে পূজ্যাপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ, মহোদয় আমায় একখানি "সত্যার্থ-প্রকাশ" সমালোচনার জন্য দিয়াছিলেন। এই পুস্তক হিন্দীতে বহুবৎসর পূর্ব্বে রাঁচিতে দেখিয়াছিলাম। শ্রীভাগবতের ও অন্যান্য বিষয়ের নিন্দা দেখিয়া পুস্তক খানি আর পাঠ করি নাই। ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়া কি দয়ানন্দ-মহারাজের পাণ্ডিত্য দেখান হইয়াছে? এ পাণ্ডিত্য যত অপ্রকাশিত থাকে ততই ভাল; কারণ, যে শ্রীমদ্ভাগবতের গুণ এই বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃত-সাগরম্॥ ১৪॥
সর্ব্ববেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ১৫॥
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানা মচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥১৬॥
ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥ ১৭॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥ ১৮॥*
শ্রীভাগবতে ১২।১৩ অধ্যায়ে।

সেই শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দা শুনিলে ভক্তগণ প্রাণে ব্যথিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দাকারীকে পণ্ডিত বলিবে এই উদ্দেশ্য? কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহার কথা শুনিবেন কেন? মনে করিবেন—পাগলের প্রলাপ! অনুবাদকও ঐ দলভুক্ত, তজ্জন্য সরস্বতী-মহারাজের পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। অনুবাদকের নামটীও অদ্বৈত-মতের বটে; তিনিও নিরাকার মনুষ্য দর্শন করেন। বোধ হয়, সরস্বতী-মহারাজের শিষ্য, নচেৎ অনুবাদে এত যত্ন কেন? এ অনুবাদ অনেকেই দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা উপেক্ষাবশতঃই কোন কথাই কহেন নাই, কারণ—

* পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ১৯৪ অধ্যায়ে (পুনামুদ্রিত)।

অসুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনি—ন্নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী ॥ —মাঘে ১৬।২৫।

কিম্বা হস্তী পথ দিয়া গমন করিলে কুক্কুরে চীৎকার করে; কিন্তু হস্তী সে চীৎকারে দৃকপাতও করে না। তজ্জন্য মহাত্মা তুলসীদাস কহিয়াছেন—

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার্।
সাধুন্‌কে দুর্ভাব্ নহি যঁও নিন্দে সংসার্॥

দ্রব্য এক, কিন্তু অবস্থাভেদে নানা রূপ ধারণ করে; যেরূপ শিশু মাতৃস্তন পাইলে তাহা হইতে দুগ্ধ বাহির করে, কিন্তু জলৌকা তাহা হইতে রুধির বাহির করিয়া থাকে; যুবতীর স্তন, কামুক কামচক্ষে দেখে; কিন্তু যোগী তাহা দর্শন করিয়া দরদরিত অশ্রু বাহির করিয়া বক্ষ ভাসাইয়াছেন, কারণ কখন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে তাহার পূর্ব্ব হইতে সেই স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া ভগবান তাঁহার দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন! মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে সকলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-শ্রবণ-অসহিষ্ণু শিশুপাল তাঁহার অনেক নিন্দা করিয়াছিলেন—

সদাপতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ।
যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৪ ॥
বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
স্বৈরবর্ত্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৫ ॥
যযাতি নৈষাং কিং কুলং সপ্তং সদ্ভির্বহিষ্কৃতম্।
বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥৩৬॥
ব্রহ্মর্ষি-সেবিতান্ দেশান্ হিত্বৈতে ব্রহ্ম-বর্চ্চসম্।
সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ ॥৩৭॥

শ্রীভাগবতে ১০।৭৪ অধ্যায়ে।

অন্যত্র— অপরস্বয়া ন্ত্ববধি কোঽপি মধুরিতি কথম্প্রতীয়তে।
দস্তুদলিত সরঘঃ প্রথসে মধুসূদনস্তমিতি হৃদয়ম্মধু ॥ —মাঘে ১৫।২৩

*   *   *   *

অনবীক্ষ্য জনঙ্গমইবৈষ যদিহত বৃষো বৃষঘ্নস্তু।
স্পর্শমশুচি বপুরর্হতি ন প্রতিমাননাস্তু নিতরাম্নৃপোচিতাম্॥
খদিনাঙ্গনেতি মতিরস্তু মুহুরজনি পূতনাম্প্রতি।

স্তন্ত্য মঘুণ মনসঃ পিবতঃ কিলধর্ম্মতো ভবতি সা জনন্যপি ॥

—ঐ ১৫।৩৫—৩৬।

ইত্যাদি অনেক প্রকার নিন্দা করিয়াছিলেন। ইহার অন্য কিছু কারণ নাই, স্বভাব। কথায় বলে—

স্বভাব যায় না ম'লে। অঙ্গার যায় না ধু'লে॥ অথবা—

সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা

পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি॥ —মাঘে ১।৭২॥

এক ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় গ্রহণ করিলেই তাহার অবস্থা এই প্রকারই হইয়া থাকে। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণ হইতে মুসলমান হইয়া কত দেব-দেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন; দয়ানন্দের জীবনেও এই শুনিয়াছি যে, তিনি প্রথমে পৌত্তলিক ছিলেন, একবার এক মোকদ্দমার জন্য তিনি শিবকে মানসিক করিয়াছিলেন; পরে দেখিয়াছিলেন যে, শিবের নৈবেদ্যের চাউল একটা ইন্দুর ভক্ষণ করিতেছে; তাহা দেখিয়া তিনি কহিয়াছিলেন যে, যে শিবের একটা ইন্দুর তাড়াইবার ক্ষমতা নাই, তিনি আমার মোকদ্দমায় জয়ী করিয়া দিবেন! সুতরাং পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া নিরাকারবাদী হইয়া এইরূপে হিন্দুধর্ম্মে ভাগবতে, বিদ্বেষী হইয়াছিলেন! যে শিব ভগবান, সেই শিবকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন (সত্যার্থ প্রকাশ ৫১ পৃষ্ঠা)। যিনি যোগিকুলধ্যেয় যোগী, তিনি সংসারের চিন্তা করিবেন, না একটা ইন্দুর তাড়াইবেন? আর তাহা মন্দই বা কি যে সন্তানের ভুক্তদ্রব্য পিতা ভক্ষণ করেন! তাহা কি মহত্ত্ব নহে? যিনি বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহার ইন্দুর-স্পৃষ্ট দ্রব্যে কি করিবে? সত্যার্থ-প্রকাশ সমুদয় পাঠ করি নাই, পাঠে ইচ্ছাও নাই, কারণ মহত্বের নিন্দা করা মহাপাপ, মহতের যে নিন্দা করে সে-ই যে কেবল পাপের ভাগী তাহা নহে, তাহা অপেক্ষা যে শ্রবণ করে সে পাপী—

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে

শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্॥ —কুমার সম্ভবে ৫।৮৩।

যথায় ভগবানের কিম্বা সাধুলোকের নিন্দা হয়, সে স্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য—

নিন্দাং ভগবত শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।

ততোনাপৈতি যো মূঢ়ো পততি সুকৃতাচ্চ সঃ ॥ —শ্রীভাগবতে ১০।৭৪।৪০
ভগবন্নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিবার বিধিও দেখা যায়:—

কর্ণৌপিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে।
ধর্ম্মা বিতর্গাশৃণিভির্নৃভি রস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্যরুষতীমসতাং প্রভুশ্চে—
জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ সধর্ম্মঃ ॥ —শ্রীভাগবতে ৪।৪।১৭

যে শ্রীমদ্ভাগবতকে কলিযুগ-পাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু কত সুখ্যাতি করিয়াছেন, "জয়তি তেঽধিকং" শ্লোক শ্রবণ করিয়া যাঁহার আবেশ হইত; যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের ১০৮ প্রকার অর্থ; যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের সমুদায় ঘটনা পর্য্যবসিত করিয়া "শ্রীমদ্ভাগবত-লীলাকল্পদ্রুম" পুস্তক হইয়াছে, যে—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥
—শ্রীভাগবতে ১২।১৩।১৮;
পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ১৯৪ অধ্যায়ে (পুনামুদ্রিত)

সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে দয়ানন্দ-সরস্বতী-মহারাজ অত্যন্ত বিদ্রূপ করিয়াছেন—অপরাধ যে, তাহাতে লেখা আছে— রথেন বায়ুবেগেন। ১০।৩৯।৩৮
এবং অন্যস্থানে— জগাম গোকুলং প্রতি ॥ ১০।৩৮।২৪

দয়ানন্দ শ্রীভাগবতকে বিদ্রূপ করিবার জন্য এই দুইটি শ্লোকের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি একস্থানে এই শ্লোক হইত ও "বায়ুবেগবান রথে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যায় গোকুলে গমন করিয়াছিলেন" এরূপ অর্থ হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতে পারিতেন, যে দুই ক্রোশ পথ বায়ু-বেগ রথে গমন করিতে সন্ধ্যা হইয়াছিল, তাহা হইলে পথ-শ্রান্তি হওয়াতে ভাগবত-রচয়িতার গৃহে অশ্বচালয়িতা এবং অক্রূর উভয়ে আসিয়া কি নিদ্রা গিয়াছিলেন?" কিন্তু বিদ্রূপ করিবার জন্যই কি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন? আরও ভগবানের রথ "বায়ুবেগেন" হইবে না ত কি ভগ্নচক্র হইবে? আমি যাহাকে তাহ

বাসি, তাহার কোন দোষ দেখিতে পাইনা; তজ্জন্য পাশ্চাত্য অমর-কবি কহিয়াছেন যে, 'ভালবাসা অন্ধ'—

"Love looks not with the eyes, but with the mind
And therefore is wing'd cupid painted blind."

Shakspeare—Mid summer night's dream. —Act I, sc I.

দয়ানন্দ-মহারাজের কি পিতামাতার প্রতিও ভালবাসা ছিল না? সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্ক মানিতে লজ্জা বোধ করেন, যেন মাতৃগর্ভে থাকেন নাই, মাতাও যেন প্রসব-বেদনা প্রাপ্ত হন নাই, কিম্বা পুত্রকে স্তনদুগ্ধ দেন নাই! কিম্বা জ্ঞানী হইলে পিতামাতার প্রতি ভক্তি কিম্বা ভালবাসা থাকেনা!

যাহা হউক, দয়ানন্দ-মহারাজ যদি পিতামাতাকে ভাল না বাসিতেন, নিজের শরীরটাকেও ত ভালবাসিতেন? শরীরের মূল্য কি? শরীর ত দ্বিতীয় নরক; যমালয়ের নরক কল্পনা করিতে হয়, এ শরীর প্রত্যক্ষ নরক—

মাংসাসৃক্ পূয-বিণ্মূত্র স্নায়ু-মজ্জাস্থি সংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণে ১।১৭।৬৩।

অন্যত্র— অস্থি স্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিত লেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥
জরাশোক-সমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ৩২৯ অধ্যায়ে;

অন্যত্র— মানুষ্যে কদলীস্তম্ভ-নিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদ সন্নিভে॥

শুদ্ধিতত্ত্বে শোকাপনোদনাদি প্রকরণে ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনম্।

অন্যত্র— কোবাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহঃ॥

মণিরত্নমালায়াং

যাহা হউক, নিজের এই অমেধ্য শরীরকে যিনি ভালবাসেন, তিনি চিন্ময়-দেহ—নরলীলায় স্বীকৃত দেহকে ভালবাসিবেন না? কি দুর্ভাগ্য!

তিনি জয়-বিজয়ের কথা যে উত্থাপন করিয়াছিলেন,তাহাও তাঁহার ভগবানে

বিশ্বাস না থাকার জন্য হইয়াছে। জয়-বিজয়কে রক্ষা করা নারায়ণের কর্ত্তব্য ছিল, তাহা তিনি করেন নাই, কারণ তাহা হইলে হিরণ্য-কশিপু, রাবণ প্রভৃতির বধ কি প্রকারে হইবে? নারায়ণ আমাদের মত অদূরদর্শী নহেন; আমাদের অপেক্ষা নারায়ণের বিদ্যাবুদ্ধি অধিক ছিল এবং সপ্তদশ অবতার ব্যাসদেবেরও ছিল; পণ্ডিতম্মন্যতাবশতঃ দয়ানন্দ না মানিতে পারেন, কারণ—

গঙ্গাদীনাং সকল-সলিলং প্রাপ্যতেহয়ং সমুদ্রঃ
কিঞ্চিদ্গর্ব্বং ন কলোতি মুদা প্রাপ্যাপি ভূর রত্নম্।
একো ভেকো পরমমুদিতো প্রাপ্য গোষ্পদনীরং
কোমে কোমে রটতি নচ্যা বাক্যমুচ্চৈঃ সমুচ্চৈঃ॥

জয়-বিজয়কে অভিশাপ না দিলে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি কি প্রকারে জন্ম-গ্রহণ করিবেন? সুতরাং নারায়ণ উঁহাদিগকে রক্ষা করেন নাই বা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তবে এ সমুদয় তিনি কেন করেন? তাহা তাঁহার ইচ্ছা; তিনি লীলাময়, লীলাভিন্ন থাকিতে পারেন না—

লোকবৎ তু লীলা কৈবল্যম্। —বেদান্তদর্শনে ২।১।৩২

দয়ানন্দ লিখিয়াছেন (সত্যার্থ-প্রকাশ ৫৫ পৃষ্ঠা)—

তখন এক লৌহময় স্তম্ভ অগ্নিতে উত্তাপিত করিয়া উঁহাকে বলিলেন যে "তোমার ইষ্টদেব রাম যদি সত্য হয়, তবে ইহা স্পর্শ করিলে দগ্ধ হইবে না" ইত্যাদি কথা ত শ্রীভাগবতে নাই। ইহা তিনি কোথায় পাইলেন?

পুনরায় তিনি লিখিয়াছেন—

"তাহা হইলে প্রহ্লাদও না হয় দগ্ধ হইয়া থাকিবে।"

ভক্ত প্রহ্লাদকেও বিদ্রূপ! ভগবান্ অপেক্ষা ভক্তের মান্য অধিক—ইহা তিনি নিজের শ্রীমুখেই কহিয়াছেন—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" —শ্রীভাগবতে ১১।১৯।২০

তিনি আরও কহিয়াছেন, আমার অপমান আমি সহ্য করিতে পারি, কিন্তু ভক্তের অপমান সহ্য করিতে পারি না। পুনরায় কহিয়াছেন—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং ৯,৩১

আমার মাতার পিতৃস্বসা জমিদারের কন্যা ছিলেন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। আমার পিতৃদেব কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার কিরূপ লেখা পড়া তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বিদ্যা-নন্দপুর গ্রামে তাঁহাকে সকলে "গুরুমা" বলিত। ভক্ত-প্রাধান্য সম্বন্ধে গুরুমার নিকট এই শ্লোকটী শ্রবণ করিয়াছিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

দেশীয় রাজ্যে ধর্ম্মানুরাগ। ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ত্রিবাঙ্কুর একটি দেশীয় হিন্দুরাজ্য। ইহার বর্ত্তমান মহারাজা নাবালক; তাঁহার মাতা-মহারাণীই তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করেন। আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশ—ঐ রাজ্যে "বর্ত্তমানে ২৯টি পূজাবাড়ী সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে পরিচালিত হইতেছে। পুরাতন অনেক দেব-মন্দিরের সংস্কার করা হইতেছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ আরও ১৪৬০টি পূজাবাড়ী অল্পাধিক সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে। গতবৎসর এই বিভাগে মোট ১৬, ১৩, ৯২৪৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং দান-বিভাগে মোট ৩৩২৭১০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।"

হরিবাসরের অবমাননা। শুনা যায়, কোনও এক অভিনব বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুখ-পত্রের জনৈক সম্পাদক কিছুদিন পূর্ব্বে নাকি এতদঞ্চলে তাঁহার অনুগত কোনও এক অবস্থাপন্ন ভক্তের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভক্তমহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। হরিবাসরের দিন গৃহস্থ-ভক্তমহাশয় সম্পাদক-মহাশয়ের নিকটে তদ্দিনের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সম্পাদক-মহাশয় নাকি বলিয়াছেন—হরিবাসরে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ করিতে

দোষ নাই। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে সরল-বিশ্বাস ভক্তমহাশয় মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ করিয়াছেন; বলা বাহুল্য, ব্যবস্থাদাতা সম্পাদক-মহাশয়ও নাকি মহাপ্রসাদান্নই গ্রহণ করিয়াছেন।

হরিবাসরের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে :—

তচ্চ কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্বিধপ্রাপ্তত্বতস্তথা।
ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ॥—১২। ৪॥

একাদশী-ব্রতের নিত্যত্ব চারি রকমের—শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-বিধান, শাস্ত্রোক্ত বিধিপ্রাপ্তি, আহারের নিষিদ্ধতা ও ব্রতের অকরণে প্রত্যবায়।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন :—"যদ্যপি অকরণে প্রত্যবায়ত এব মুখ্যং নিত্যত্বং, তথাপি শ্রীবিষ্ণু-পরাণানাং শ্রীভাগবৎ-প্রীণনত্বেনৈব পরমং মুখ্যং তৎ লিখিতম্"—ব্রত পালন না করিলে অনিষ্টোৎপত্তির কথা যদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, ঐ ব্রতের নিত্যত্ব আছে; ইহাই নিত্যত্বের মুখ্য লক্ষণ; তথাপি, শ্রীভগবানই যে সমস্ত ভক্তের প্রাণ-সর্ব্বস্ব, তাঁহারা, অকরণে প্রত্যবায়ের কথায় নিত্যত্বের মুখ্যতম লক্ষণ না ধরিয়া শ্রীভগবানের সন্তোষ-বিধানেই মুখ্যতম নিত্যত্ব মনে করেন—অর্থাৎ, যাহাতে শ্রীভগবানের প্রীতি-লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহাই তাঁহারা অবশ্য-করণীয় বলিয়া মনে করেন; বাস্তবিক এইরূপ ভাবই ভক্তির প্রাণ—ইহাই ভগবানে প্রীতির লক্ষণ। ভজনানুরাগী ভক্ত ভগবৎ-প্রীতি-সাধনের অভিপ্রায়েই হরিবাসর-ব্রত পালন করিয়া থাকেন। আহার-ত্যাগই এই ব্রত-পালনের মুখ্য বাহ্য-অঙ্গ। তাই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস আদেশ করিতেছেন যে,

একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ। —১২। ৮।

একাদশীতে উপবাস করিতে হয়, কখনও একাদশী অতিক্রম করিবে না, (অর্থাৎ একাদশীতে আহার করিবে না)। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শচীমাতাকে এই কথাই বলিয়াছেন :—

প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবা। —চৈঃ চঃ আদি ১৫

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, একাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন-ভোজন নিষিদ্ধ কি না?

শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতাকে একাদশীতে অন্ন ভোজন করিতে নিষেধ করিলেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, শচীমাতা অনিবেদিত অন্ন ভোজন করিতেন না—তিনি মহাপ্রসাদান্নই গ্রহণ করিতেন। সুতরাং একাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিতেই যে প্রভু নিষেধ করিলেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

আহার-ত্যাগেই উপবাস; বৈষ্ণব কখনও মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু আহার করেন না; সুতরাং উপবাসের দিন মহাপ্রসাদান্নও ত্যাগ করাই বৈষ্ণবের জন্য ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস যখন একাদশীতে ভোজন করিতেই নিষেধ করিয়াছেন, (একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতদ্ধি বৈষ্ণবম্—১২। ৫) তখন ঐ দিনে বৈষ্ণব যদি মহাপ্রসাদ ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রতভঙ্গই হইয়া থাকে।

ভক্তিসন্দর্ভে গৌতমীয়-বচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন, প্রমাদ-বশতঃ কোনও বৈষ্ণব যদি একাদশীতে আহার করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিষ্ণু-অর্চ্চনা বৃথা হইয়া যায়, তাঁহাকে ঘোর-নরকে পতিত হইতে হয়:—

বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।
বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ॥

স্কন্দপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একাদশীতে আহার করে, তাহার পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যার ন্যায় পাপ হয়, তাহাকে বিষ্ণু-লোক হইতে চ্যুত হইতে হয়।

মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যাং তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকচ্যুতো ভবেৎ॥

শ্রীজীবগোস্বামিচরণ আরও বলিয়াছেন যে, আহার ত্যাগ বলিতে বৈষ্ণবের পক্ষে মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই বুঝায়; কারণ মহাপ্রসাদ ব্যতীত বৈষ্ণব কোনও সময়েই অন্য কিছু ভোজন করেন না:—

অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগ এব। তেষাং অন্য ভোজনস্য নিত্যমেব নিষেধত্বাৎ।—ভক্তিসন্দর্ভ। ২৯৯।

তথাপি, আচার্য্যাভিমানী সম্পাদক-মহাশয় কোন্ প্রমাণের বলে যে

একাদশী-দিনে মহাপ্রসাদ-ভোজনের ব্যবস্থা দিলেন, এবং নিজেও ভোজন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস কিন্তু বলেন, "যে ব্যক্তি হরিবাসরে অপরকে আহার করিবার জন্য বলে, তাহার অধোগতি হয়।

ভুঙ্ক্ষ্ব ভুঙ্ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
গোব্রাহ্মণস্ত্রিয়শ্চাপি জহীহি বদতি কচিৎ॥
মদ্যং পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ॥ —১২।১৭।

আর যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সে পিতৃগণ সহ নরকগামী হয়। একাদশ্যন্ন-ভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ গচ্ছতি। —১২।২৬॥

স্বাতন্ত্র্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আনুগত্যময়। বৈষ্ণবের সিদ্ধাবস্থায়ও আনুগত্য, সাধক-অবস্থায়ও আনুগত্য; স্বাতন্ত্র্য তাঁহার কোনও সময়েই নাই। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য এবং যোগ্য-বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করিয়াই বৈষ্ণব-সাধকের ভজন। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন,

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সম্পদ শুন ভাই! হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ॥

যিনি বৈষ্ণব-চরণ আশ্রয় করিয়া ভজন করেন, তাঁহার ভজনই সার্থক; আর যাঁহারা বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজনের প্রয়াস পায়েন, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই বৃথা।

আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল কিন্তু এই আনুগত্যময় বৈষ্ণব-ধর্ম্মে স্বাতন্ত্র্যেরই তাণ্ডবনৃত্য দেখিতে পাইতেছি। রাজনৈতিক জগতে আজকাল স্বাধীনতার একটা হাওয়া বহিতেছে; বৈষ্ণব-জগতেও কি এই হাওয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিল? মুখে বা কাগজে-কলমে যিনি যাহাই বলুননা কেন, যতই আনুগত্য বা দীনতার ভাব প্রকাশ করুননা কেন, কার্য্যতঃ কিন্তু অনেকেই স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। দীক্ষা গ্রহণের কিছু কাল পরেই অনেকে এমন সব আচরণ করেন, যেন তিনি সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, অন্ততঃ সাধনরাজ্যের অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছেন। অপর বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করা তো দূরে, কেহ কেহ যেন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত; যেন তাঁহারা আনুগত্যের স্তর অতিক্রম করিয়া কোনও এক অদ্ভুত স্তরে উপস্থিত হইয়াছেন!

ইহার দৃষ্টান্ত গৃহী-বৈষ্ণবদের মধ্যেও দেখা যায়, বাবাজীদের মধ্যেও দেখা যায়।

আমাদের মনে হয়, এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের ফলেই পরম-নির্ম্মল বৈষ্ণব-ধর্ম্মে নানাবিধ অবাঞ্ছনীয় আবিলতা প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। মায়াবদ্ধ জীব আমরা প্রবৃত্তির দাস—প্রবৃত্তির ইঙ্গিতেই আমরা উঠি বসি। প্রবৃত্তিকে দমন করিবার শক্তি সাধারণতঃ আমাদের নাই। তাই কোনও মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত দরকার—তাঁহার কৃপায় ও শক্তিতে প্রবৃত্তি হয়তো প্রশমিত হইতে পারে; আমাদের চিত্ত হয়তো ভগবদুন্মুখ হইতে পারে। কিন্তু এই স্বাধীনতার যুগে আমরা কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে যেন নিতান্ত নারাজ। তাই প্রবৃত্তির স্রোতে আমাদিগকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আমরা তাহার খোঁজই রাখি না।

এইরূপ অবৈধ স্বাতন্ত্র্যের ফলে আমরা এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, আমরা যেন এখন আর গুরুদেবের শাসনকেও গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। এক বৈষ্ণবের কথা জানি, তাঁহার চরিত্র-দোষের জন্য তাঁহার গুরুদেব শাস্তি-স্বরূপে তাঁহার কৌপীন-বহির্ব্বাস খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে বাজারে নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাসের অভাব হয় নাই এবং তাঁহার চরিত্রেরও কোনও পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় নাই। আর একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণবের কথা জানি—তিনি বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ পরিচিত, কয়েকখানা পুস্তকও লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতির সংশোধনের জন্য তাঁহার গুরুদেব অনেক উপদেশ দিলেন, তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণও অনেক বুঝাইলেন। কিছুতেই কিছু না হওয়ার শেষকালে প্রকাশ্য পত্রিকায় পত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন এবং তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবগণকে অনুরোধ করিলেন, যেন কেহ ঐ বৈষ্ণবের সঙ্গ না করেন, এবং তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকাদি পাঠ না করেন। ইহার ফল হইল এই যে, ঐ শিষ্যটী উক্ত পত্র উপলক্ষে মানহানির মোকদ্দমা আনিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন! বন্ধুবান্ধবের পরামর্শেই হউক, কিম্বা উকিলের পরামর্শেই হউক, মোকদ্দমা আর করেন নাই।

পরে গুরুবর্জ্জিত হইয়া বৈষ্ণব-সমাজে থাকা দুষ্কর মনে করিয়া অন্যত্র দীক্ষা লওয়ার চেষ্টা করিলেন!! কিন্তু কোথাও দীক্ষা মিলিল না; গুরুবর্জ্জিত

ব্যক্তিকে কেহই বা দীক্ষা দিবেন? কিন্তু তাহাতেও তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না—নিজের মান বজায় রাখার চেষ্টা করিলেন—এক পত্রিকায় পরে প্রচার করিলেন যে, যিনি তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি তাঁহার দীক্ষাগুরুই নহেন!!! তিনি এখনও জয়ডঙ্কা বাজাইয়া বুক-ফুলাইয়া বৈষ্ণব-সমাজে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার স্তাবক-মহলে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত-তেজের জয় জয়কার পড়িয়া গিয়াছে! এই তো বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজের অবস্থা। এ সম্বন্ধে আচার্য্য-সন্তানগণের কি কোনও কর্ত্তব্যই নাই?

চণ্ডীদাস ও রজকিনী। চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে অনেক পদে রজকিনী রামীর নাম উল্লেখ আছে; এই সকল পদের অনেকগুলি হেঁয়ালীর মত, কতকগুলিতে দেহতত্ত্বের কথাও আছে, কতকগুলি আবার বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। সহজিয়া-সম্প্রদায়ের লোকগণ মনে করেন, রজকিনী রামী চণ্ডীদাসের ভজন-সহায়-কারিণী ছিল। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণের অনুগত বৈষ্ণবগণ এরূপ মনে করেন না; এরূপ মনে করার কোনও হেতুও নাই। কারণ, গোস্বামি-শাস্ত্রে ভজন-বিষয়ে কোনও স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যের কোনও বিধিই নাই, বরং তাহার বিপরীত বিধিই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, কেহ কেহ মনে করেন, রজকিনীর নাম-সংযুক্ত পদগুলি সহজিয়া-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রচিত হইয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই মতের অনুকূলে কি প্রমাণ আছে, তাহা আমরা জানি না।

আমাদের মনে হয়, ইহার অন্যরূপ সমাধানও হইতে পারে। সকলেই জানেন, চণ্ডীদাস নাকি প্রথমে বামাচারী শাক্ত ছিলেন; পরে তাঁহার সেবিত বাশুলী দেবীর কৃপায় তিনি বৈষ্ণব হয়েন। শাক্ত-উপাসনা সময়ে রজকিনী তাঁহার সাধন-সঙ্গিনী ছিল। পরে যখন বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হয়েন, অথচ যখন পর্য্যন্ত তিনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন নাই, তখনকার রচিত পদ-সমূহেই পূর্ব্ব-সংস্কার-বশতঃ রজকিনীর নাম আদি সংযোগ করিয়াছেন। এই সকল পদে তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার ভাবও কিছু কিছু প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

নিবেদন। শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহেই শ্রাবণ-মাসের "সাধনা" প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে তাহা হইল না। মাতাঠাকুরাণীর সাংঘাতিক অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া আষাঢ়ের শেষভাগে আমাকে দেশে যাইতে হয়। ২৫শে আষাঢ়, কিঞ্চিন্ন্যূন নব্বই বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ভজন-নিষ্ঠা আমার পক্ষে বড়ই আনন্দদায়ক ছিল; বহু বৎসর যাবত নিয়মিতভাবে তিনি প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম করিতেন; শেষ মুহূর্ত্তেও, শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে নিজেও শ্রীহরিনাম-স্মরণ করিতে করিতে প্রশান্তচিত্তে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণববৃন্দের চরণে প্রার্থনা, তাঁহারা কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন মাতাঠাকুরাণী তাঁহার অভীষ্ট ভগবচ্চরণ-সেবা লাভ করিতে পারেন, এবং তাঁহার এই হতভাগ্য অযোগ্য সন্তান যেন তাঁহারই ভজনাদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়।

শ্রাবণের পত্রিকা-প্রকাশে বিলম্ব হইল বলিয়া শ্রাবণ-ভাদ্র একসঙ্গেই প্রকাশিত হইল। এখন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইলে প্রতিমাসের পত্রিকা সেই মাসের প্রথমভাগেই প্রকাশ করার বাসনা রহিল।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

গ্রন্থ-পরিচয়।

১। শ্রীশ্রীকারুণ্যব্রহ্মোদয়। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সাচার গ্রাম-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন গোস্বামিকর্ত্তৃক পয়ারাদি-ছন্দে বিরচিত; ১৫০+1০পৃষ্ঠা; মূল্য ৸০ আনা মাত্র। ছাপা ও কাগজ উত্তম। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীব্রজমোহন গোস্বামী, পোঃ সাচার জিং ত্রিপুরা।

সাচারের শ্রীজগন্নাথ অত্যন্ত বিখ্যাত; রথযাত্রায় এখানে বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে; বহুদূরদেশ হইতে বহুসহস্র যাত্রী রথোপরি শ্রীজগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকেই হয়তো সাচারে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা-বিবরণ জানেন না। পরমকরুণ শ্রীনীলাচল চন্দ্র ত্রিপুরাবাসী জীবসমূহের মঙ্গলের নিমিত্ত পরমভাগবত ৺গঙ্গা-

গোবিন্দ সেন মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া যে ভাবে শাচারে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিলেন, তাহা এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয় এই গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহের প্রতি আধুনিক কোনও কোনও ব্যক্তি বৌদ্ধত্বের আরোপ করিয়া থাকেন; কিন্তু এইরূপ আধুনিক মত যে ভিত্তিহীন, পরম ভাগবত গ্রন্থকার শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রসঙ্গক্রমে তাহাও সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। কৌশলক্রমে বৈষ্ণবের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ও এই গ্রন্থের স্থলবিশেষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাঁহার ভজন-নিষ্ঠা এবং বৈষ্ণবোচিত দৈন্য আদর্শ-স্থানীয়; পাঠক, শ্রীশ্রীদারুব্রহ্মোদয়ের সর্ব্বত্রই তাহার পরিচয় পাইবেন।

শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা ৺গঙ্গাগোবিন্দ সেন মহাশয়ের বংশবিবরণও প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং পারিবারিক ইতিহাস হিসাবেও এই গ্রন্থখানির একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই উপাদেয় গ্রন্থখানির বহুল প্রচলন দেখিলে আমরা সুখী হইব।

২। শ্রীশ্রীপদরত্নাকর। ঢাকা জেলার অন্তর্গত পোঃ ফিরিঙ্গিবাজার নিবাসী সুরসিক ভক্ত শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৩৬২+৵০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।৹ টাকা, উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ২৸৹ টাকা; ছাপা অতি উত্তম; গ্রন্থকারের নিকটে এবং ১৮।২৬ নং শুকলালদাসের লেন মদন-কুটীর, কাগজিটোলা, ঢাকায় শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই গ্রন্থে বহু প্রাচীন বৈষ্ণব-কবির সংস্কৃত, মৈথিল, হিন্দী ও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদ, গায়কদিগের সুবিধার জন্য পালাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ, পদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য্যাদিও অতি প্রাঞ্জলভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্থল-বিশেষে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বাদিও প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হইয়াছে।

পরমভাগবত সম্পাদক-মহাশয়ের ব্যাখ্যা বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অথচ বেশ সরল; বিস্তৃত, অথচ অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জ্জিত; ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতায় ও হৃদয়-গ্রাহিতাতেই ব্যাখ্যাকারের কৃতিত্ব।

তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার বেশ সুন্দর ধারাবাহিকতা আছে; মূল পদ না পড়িয়া তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাটি পড়িলেই মূলপদের মর্ম্ম, ব্যঞ্জনাদি সমস্ত আস্বাদন করা যায়—

অথচ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাটী সুখপাঠ্য মৌলিক রচনার ন্যায়ই চিত্তাকর্ষক এবং ব্যাখ্যাকর্ত্তার রসজ্ঞতার পরিচায়ক।

স্থলবিশেষে ব্যাখ্যাকর্ত্তার সঙ্গে কাহারও কাহারও মতভেদ হইতে পারে; কিন্তু মতভেদ-মাত্রই দূষণীয় নহে।

আমাদের বিশ্বাস, মহাজনী পদাবলীর গায়ক, শ্রোতা, পাঠক ও আস্বাদক সকলের নিকটেই এই গ্রন্থখানা আদরণীয় হইবে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী।

ভাদর ঘন কৃষ্ণরজনী স্তব্ধ-সুগভীর।
ভাদর ঘন-পূর্ণ-গগন রিমি ঝিমি ঝরু নীর॥
"কঠোর মাথুর কংস-কারা,
দাও দরশন দাও হে সাড়া"
শিলা-চাপা বুক ফুকারিল মুখ
বাসুদেব দেবকীর॥

দীর্ঘ যুগের নিগড় বাঁধা
দীর্ঘ তাড়ন-বেদন সাধা
দীর্ঘ তপত নিশ্বাসে পিয়াসে
নিরাশের ঝরু নীর।
শিলাচাপা বুক ফুকারিল মুখ বসুদেব দেবকীর—
না চাহি মুক্তি-যাতনাবসান
নাহি ক্ষতি যদি যায় যা'ক প্রাণ
দেখ কি ধ্বংস আনল কংস
সারা এ যমুনা-তীর॥

শিশু-নারায়ণ ব্রাহ্মণ-গোধন
নিতি দেব, সাধু, মহৎ নিধন,
শাসন-শোষণ লোক-নির্য্যাতন
নিজসুখ মহাধীর॥

দেখ কি ধ্বংস আনল কংস সারা এ যমুনাতীর ॥

তখন— ভেদি নিবিড় কারা-তামসী
কোটী বিজ্যুৎ জ্যোতি বিকাশি
স্নিগ্ধ মধুর প্রেম-মূরতি
প্রকটল যদুবীর ॥

মুক্ত আকাশে প্রবল বাত
দুয়ারে দুয়ারে করু আঘাত
কোই না উঠত কোই না দেখত
আওল প্রেমবীর ॥

স্নিগ্ধ মধুর প্রেম-মূরতি প্রকটল যদুবীর
দুয়ারি গভীর নিঁদে বিভোর
নাসায় শবদ বিকট ঘোর
পৈঠল কিয়ে ছুটল চোর
কো করু ইহ থির ॥

খলিত শিলা শিথিল ভার
মুক্ত নিগড় শ্লথ দুয়ার
ভরল দিক দিব্য গন্ধে, মূর্চ্ছনা রাগিণীর।
পৈঠল কিয়ে ছুটল চোর—কো করু ইহ থির।

রাজ স্বরূপে বচন মিঠ
লাখ অমিয় করুণ দিঠ
বন শ্যামল ফুল কোমল মাল্যকিরিটী শির ॥

দেবগম্ভীর মাভৈঃ রব
দীব্য বাদন গীতিকা স্তব
দিব্য সুষমা নাহি উপমা
জনম-অষ্টমীর ॥

শ্রীগোপীনাথ বসাক।

(মাসিক-পত্রিকা।)

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা ॥

১ম বর্ষ, } আশ্বিন—১৩৩৩ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বর্ষাভিসার।

আমার পরম মর্ম্মী তিমির
এসেছে লো সখি এসেছে।
অম্বর'পরে হের অম্বুদ
মহা আড়ম্বরে ভেসেছে।
নাচি নাচি উঠে জীবন মম
বজ্র নিনাদ শ্রবণে,
এ দুর্যোগ নহে পরম সুযোগ,
কেন রব কারা ভবনে?
কণ্টক হবে কুসুম মম
ভুজগী অমিয়-দায়িনী—
শঙ্কট মাঝে হাঁটি যদি হই
বল্লভ-ক্রোড়শায়িনী।

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থের তালিকা।

[গৌড়ীয় শ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থগুলির বিবরণ, অর্থাৎ এ পর্য্যন্ত যতগুলির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আবার যতগুলি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পুঁথিগুলির মধ্যে যতগুলি মুদ্রিত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ক একটী তালিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য আমরা বহুদিন হইতেই সচেষ্ট। কিন্তু একের দ্বারা এ কার্য্য সম্ভবপর নহে, ভক্তগণের কৃপা বা সহায়তা বিশেষভাবেই আবশ্যক বিবেচনায় এই শ্রীপত্রিকার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বে দুই খানি বৈষ্ণব-পত্রিকাতে (১) এই তালিকার কিয়দংশ প্রকাশিত করিয়া ভক্তগণের সাহায্য প্রার্থী হইলে, বৈষ্ণব-পুরাতত্ত্ব-বিশারদ বা অদ্বিতীয় বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক শ্রীল শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান ও বহু অপ্রকাশিত ও অশ্রুত বৈষ্ণব-গ্রন্থের নাম তালিকামধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে সকলেই যদি কৃপা করিয়া তালিকাটীকে পুষ্ট ও নির্ভুল করিবার জন্য চেষ্টা করেন, বা স্ব স্ব গৃহে রক্ষিত পুঁথিগুলির নাম ও বিবরণ আমাকে প্রেরণ করেন, বা এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তবে অতি সহজেই একটী বিস্তৃত বৈষ্ণব-গ্রন্থ-তালিকা প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারে। এরূপ একটী তালিকা যে বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা আর বলিতে হইবে না। প্রাচীন মহাজনগণ লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রবণ করা যায়, কিন্তু তন্মধ্যে কয়খানিরই বা নাম আমরা জানিতে পারিয়াছি, এবং কয়খানি বা পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে! এখনও বহু অমূল্য গ্রন্থরত্ন বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে, যাহাদের নাম পর্য্যন্ত আমরা শ্রবণ করি নাই। আবার কত পুঁথিই যে নিত্য ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। এজন্য "সাধনার" ভক্ত গ্রাহক বা অনুগ্রাহকবর্গের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন,—এই তালিকার বহির্ভূত বৈষ্ণব-গ্রন্থগুলির নাম ও বিবরণ প্রদান করিলে, অথবা তালিকা মধ্যে যে সকল ভ্রম প্রমাদাদি আছে, তাহার সংশোধন করিয়া দিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব।

---

(১) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা—১৩২২। ১৬ ভাদ্র

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক—১৩২৯। কার্ত্তিক সংখ্যা ২৭১ পৃঃ

এবিষয়ে অচ্যুতবাবু আমাকে যেউপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে দ্রষ্টব্য। তিনি লিখিয়াছিলেন ;—(উক্ত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা) "* * শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থ-তালিকা প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের নাম পাওয়া যাইবে। এই তালিকাটী ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া পড়িবে আশা করিতে পারি। তালিকার সহিত কেবল গ্রন্থকারের নাম দিলেই কার্য্য শেষ হইল বলিয়া মনে হয় না। কোন্ গ্রন্থ কোন্ মতানুযায়ী, তাহার নির্দ্দেশ থাকা উচিত। কেননা সহজিয়া প্রভৃতি মতানুযায়ী অনেক গ্রন্থই এখন বৈষ্ণব-গ্রন্থ নামে বিকাইতেছে।" (তালিকাটী এই ভাবে হইবে :—)

(ক) উহাতে বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীর নাম থাকিবে।

(খ) গ্রন্থ-কর্ত্তার নাম থাকিবে।

(গ) সে গ্রন্থ মুদ্রিত কিনা ?

(ঘ) এবং ইহা সংস্কৃত, কি বাংলা, কি হিন্দি অথবা উড়িয়া ভাষায় লিখিত তাহাও থাকিবে।

(ঙ) গোস্বামিগ্রন্থ কিনা, অথবা সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী লিখিত, মন্তব্যে তাহা বিশেষ ভাবে লিখিতে হইবে।

"শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় তাঁহার তালিকাটী বর্দ্ধিত করিয়া লইলে এবং উহাতে ঐসব বিষয় সন্নিবেশিত করিলে ভাল হয়।"

পুনরায় অন্যত্র লিখিয়াছেন ;—(শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকায়) "***দুষ্প্রাপ্য বিবিধ ভাষার গ্রন্থাদির তালিকা (Catalogue) ইংরাজিতে আছে। উল্লেখিত গ্রন্থাদির সকল বিবরণই উহাতে থাকে এবং তাহা দেখিলে যেকোন গ্রন্থের সকল তত্ত্বই জ্ঞাত হওয়া যায়। কোন্ গ্রন্থ কোন্ ভাষায়, কাঁহা কর্ত্তৃক, কখন, কোন্ বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, ইত্যাদি যতদূর সম্ভব দেওয়া থাকে। ইহাতে মূল গ্রন্থ না দেখিলেও শুধু তালিকা দৃষ্টে গ্রন্থের মর্ম্ম ও উদ্দেশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে।

অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ এখনও অমুদ্রিত রহিয়াছে। তৎসম্বন্ধে বিবরণ সংগৃহীত হইলে ঐ তালিকা প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু অগ্রে তালিকায় উল্লেখিতব্য গ্রন্থসমূহ পাঠ করা ব্যতীত তাহা প্রস্তুত করা অসম্ভব এবং তাহাই

ঈদৃশ তালিকা প্রকাশের প্রধান অন্তরায়। তবে সমবেত চেষ্টায় তাহা যে অনায়াসসাধ্য হইতে পারেনা, এমন নহে। সকলের সকল সময় সকল গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ ঘটে না; কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ-তালিকা প্রস্তুত হইলে প্রত্যেক পাঠকের লক্ষ ঐ দিকে থাকিলে এবং প্রত্যেকেই ঐ বিষয় কিছু কিছু চেষ্টা করিলে ইহা সহজ হইতে পারে বোধ হয়।

"শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ও এই নাট্টোর জন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ-পাঠককে আহ্বান করিয়াছেন; তাঁহার এই সাগ্রহ আহ্বান উপেক্ষিত হইবে না বলিয়াই আশা করি। তাঁহার সংগৃহীত ও প্রকাশিত তালিকায় যৎসামান্য ত্রুটি থাকিলেও তাহার মূল্য বড় কম নহে। ঐ তালিকায় লিখিত গ্রন্থ বৈষ্ণব-গ্রন্থ কিনা, তাহার পরিচয় প্রসঙ্গ না থাকা ইত্যাদিকেই ত্রুটি বলিতেছি।" ইত্যাদি।

তৎপর যে রূপ আদর্শে গ্রন্থ-তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, তিনি তাঁহার প্রেরিত তালিকায় (৪৮৮ সংখ্যা হইতে ৫৬২ সংখ্যায়) প্রদর্শন করিয়াছেন।]

গ্রন্থ-তালিকা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে বলিয়াছেন;—

"ভক্তির প্রচার, ভক্তি-শাস্ত্রের গ্রন্থন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, তিন প্রয়োজন॥ (অদ্বৈত প্রকাশ)

অ

	গ্রন্থ	প্রণেতা
১।	অভিরামলীলামৃত—	রামদাস।
২।	অভিরাম বন্দনা—	রাইচরণ দাস।
৩।	অদ্বৈত বিলাস—	ঈশান নাগর।
৪।	অনুরাগবল্লী—	মনোহর দাস। (১৬১৮শক)
৫।	অলঙ্কার কৌস্তভ —	কর্ণপুর।
৬।	ঐ টীকা	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
৭।	অনন্ত সংহিতা—	(?) প্রাচীন।
৮।	অভিরামদাসের শ্রীপাট ভ্রমণ—	অভিরাম দাস।
৯।	অকিঞ্চন সর্ব্বস্ব—	বৃন্দাবন দাস।

১০। অদ্বৈতবিলাস— হরিচরণ দাস।

১১। অদ্বৈত মঙ্গল— নরহরিদাস।

১২। অভিরাম পটল— (?)

১৩। অগ্নিপুরাণোক্ত গায়ত্রীভাষ্য,— শ্রীজীবগোস্বামী।

১৪। অদ্বৈত তত্ত্ব— শ্যামানন্দ।

১৫। অন্তঃস্নাপিকা— রঘুনন্দন গোস্বামী।

১৫। (ক) অমৃত-রত্নাবলী— মুকুন্দ দাস।

আ

১৬। আনন্দ চন্দ্রিকা— উজ্জ্বলনীলমণি-টীকা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

১৭। আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ— কর্ণপুর।

১৮। আচার্য্য শতক— ঐ

১৯। অমৃত রসাবলী— (?)(মুকুন্দ দাসের আজ্ঞায় লিখিত)

২০। আচার্য্য চরিত্র— (শ্রীনিবাসের) (?)

২১। আনন্দ ভৈরব— প্রেমদাস।

২২। আনন্দ লতিকা— লোচন দাস।

২৩। আত্ম-প্রকাশ-তত্ত্ব—গতি-গোবিন্দ। ২৪। আটরস— গোবিন্দদাস।

২৫। আত্মজিজ্ঞাসা—কৃষ্ণদাস। ২৬। আত্মনিরূপণ— কৃষ্ণদাস।

২৭। আত্মসাধন—কৃষ্ণদাস। ২৮। আনন্দ লহরী— (?)

উ

২৯। উজ্জ্বলনীলমণি— শ্রীরূপ। ৩০। ঐ টীকা—শ্রীজীব।

৩১। উদ্ধব-দূত বা উদ্ধব-সন্দেশ— শ্রীজীব।

৩২। ঐ— মাধব-গুণাকর—

৩৩। উৎকলিকাবল্লী— ঐ

৩৪। উপাসনা-সার-সংগ্রহ— শ্যামানন্দ।

৩৫। উপাসনা পটল— নরোত্তম দাস—

৩৬। উপাসনা তত্ত্বসার— (?)

৩৭। উদ্ধব-সংবাদের অনুবাদ— দ্বিজ নরসিংহ

৩৭। (ক) উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ— বিশ্বনাথ

এ

৩৮। একাদশী-ব্রতকথা,— শ্যামদাস।

ঐ

৩৯। ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী — বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

ক

৪০। কর্ণানন্দ (১৫২৯ শকে)— যদুনন্দন দাস।

৪১। কর্ণানন্দ রস— ঐ

৪২। কৃষ্ণ-মিশ্র-চরিত— হরিপ্রিয়া—(শ্রীসীতাদেবীর শিষ্যা)

৪৩। কেশকণ্টক— কর্ণপুর।

৪৪। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যোদয়াবলী প্রদ্যুম্নমিশ্র।

৪৫। কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী— ভাগবতাচার্য্য।

৪৬। কৃষ্ণমঙ্গল— মাধবাচার্য্য।

৪৭। কুঞ্জমাধুরী— রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

৪৮। ঐ অনুবাদ— রাধাবল্লভ দাস।

৪৯। কৃষ্ণকর্ণামৃত— বিল্বমঙ্গল।

৫০। ঐ সারঙ্গরঙ্গদাটীকা— কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৫১। ঐ অনুবাদ— যদুনন্দন দাস।

৫২। কিশোরিষ্টকং— শ্রীশ্রীমহাপ্রভু।

৫৩। কৃষ্ণভক্তি-সুধার্ণব— রাধামোহন গোস্বামী।

৫৪। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা— কর্ণপুর।

৫৫। করচা— গোবিন্দ কর্ম্মকার।

৫৬। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় (১৪০৫ শক) গুণরাজ খাঁন।

৫৭। কৃষ্ণভজনামৃত বা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

৫৮। কৃষ্ণভাবনামৃত— নরহরি ঠাকুর।

৫৯। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ— শ্রীরূপ।

৬০। কৃষ্ণকেলী সুধাসার— রঘুনন্দন গোস্বামী।

৬১। কৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ সন্তোষ

৬২। কর্ণানন্দ রস— (?)

৬৩। কর্ণামৃত— গোবিন্দ কবিরাজ।

৬৪। কড়চা গ্রন্থ— নরহরি সরকার।

৬৫। কুঞ্জরাস্তব— যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।

৬৬। কেশব সঙ্গীত— কেশব।

৬৭। কৃষ্ণজন্ম-তিথি-বিধি— শ্রীরূপ।

৬৮। কারিকা— ঐ

৬৯। কৃপাম্বুধি স্তব— শ্রীজীব।

৭০। কৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা— ঐ

৭১। কৃষ্ণসন্দর্ভ— ঐ

৭২। ক্রমসন্দর্ভ— ঐ

৭৩। কৃষ্ণলীলামৃত— বলরাম দাস।

৭৪। কিরণ দীপিক— দীনহীন দাস।

৭৫। কুঞ্জ বর্ণন— নরোত্তম দাস।

৭৬। কৃষ্ণের এক পদী চৌতিশা— ভবানন্দ।

৭৭। ক্রিয়াযোগসার— রামেশ্বর নন্দী।

গ

৭৮। গোপাল চরিত্র— শ্রীশ্রীমহাপ্রভু।

৭৯। গোবিন্দলীলামৃত— কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৮০। ঐ অনুবাদ— যদুনন্দন দাস।

৮১। গোবিন্দ লীলামৃত— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

৮২। গোবিন্দমঙ্গল— (১০১১ সাল) দুঃখীশ্যাম দাস।

৮৩। গোবিন্দভাষ্য— বলদেব বিদ্যাভূষণ।

৮৪। গোবিন্দ চরিত্ত— রঘুনন্দন গোস্বামী।

৮৫। গোবিন্দ রূপামৃত— ঐ

৮৬। গোবিন্দ মহিষী— ঐ

৮৭। গোবিন্দ রতিমঞ্জরী— (?)

৮৭ (ক) ঐ অনুবাদ— ঘনশ্যামদাস।

৮৮। গোবি ামঙ্গল— (পুরীধামের কোন রাজা)

৮৯। গৌর-চরিত-চিন্তামণি— নরহরি চক্রবর্ত্তী

৯০। গীত চন্দ্রোদয়— ঐ

৯১। গীতাভূষণ ভাষ্য— বলদেব বিদ্যাভূষণ।

৯২। গৌরাঙ্গ উদয়— মুকুন্দ পণ্ডিত (নবদ্বীপ)

৯৩। গোপীনাথ বন্দনা— (অগ্রদ্বীপের) বাঞ্ছারাম রায় ভট্ট,

৯৪। গুরু-শিষ্য সংবাদ— নরোত্তম।

৯৫। গোপাল চম্পু— শ্রীজীব

৯৬। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা বা চৈতন্য-গণোদ্দেশ দীপিকা— কর্ণপুর-

৯৭। গোবিন্দ বিরুদাবলী— শ্রীরূপ।

৯৭ (ক) গৌর গণোদ্দেশ চন্দ্রিকা বা গৌরগণ চন্দ্রিকা— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

৯৮। গীতকল্পতরু— (?)

৯৯। গীতাবলী— শ্রীসনাতন গোস্বামী।

১০০। গৌরাঙ্গাষ্টকং বলরাম দাস।

১০১। গোপলতাপনীয়টীকা— শ্রীজীব।

১০২। ঐ ঐ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

১০৩। গৌরাঙ্গলীলামৃত— ঐ

১০৪। গৌরাঙ্গ বিজয়— শচীনন্দন দাস।

১০৪। (ক) গৌরাঙ্গলীলামৃত (২য়) বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

১০৫। গোপাল বিজয়— রায় শেখর।

১০৬। গৌরাঙ্গচরিত— যদুনন্দন দাস।

১০৭। গৌরাখ্যান— গোবিন্দ দাস।

১০৮। গুরুদক্ষিণা— শঙ্কর দাস।

১০৯। ঐ অযোধ্যারাম।

১১০। গোপাল বিজয়— কবি শেখর।

১১১। গোপী-ভক্তিরস— (?)

১১২। গোলক-বস্তু-বর্ণন— গোপাল ভট্ট।

১১৩। গৌরগণাখ্যান— দেবনাথ।
১১৪। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার অনুবাদ,— দ্বিজরূপচরণ।
১১৫। ঐ হৃদয়ানন্দ।
১১৫। (ক) গোপীপ্রেমামৃত— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

চ

১১৫। (খ) চিন্ময়সুন্দর স্তোত্র (কোষকাব্য) (?)
১১৬। চৈতন্য-মহাপ্রভু— হরিদাস।
১১৭। চৈতন্যতত্ত্বসার— রামগোপাল দাস।
১১৮। চৈতন্যচন্দ্রামৃত— প্রকাশানন্দ-সরস্বতী।
১১৯। ঐ অনুবাদ— গোপীচরণ দাস।
১২০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
১২১। ঐ সংস্কৃত টীকা— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
১২২। চৈতন্য বিলাস— লোচন দাস।
১২৩। চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী— প্রেমদাস।
১২৪। চৌষট্টি দণ্ড নির্ণয়— কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
১২৫। চমৎকার চন্দ্রিকা (১ম)— মুকুন্দদাস।
১২৬। চাটুপুষ্পাঞ্জলি— শ্রীরূপ।
১২৭। চিন্তামণি টীকা— (?)
১২৮। চৈতন্যরসকারিকা— যুগলকিশোর দাস।
১২৯। চৈতন্যভাগবত— বৃন্দাবন দাস।
১৩০। চৈতন্যমঙ্গল— লোচনদাস।
১৩১। ঐ জয়ানন্দ মিশ্র।
১৩২। চৈতন্য-রত্নাবলী— (?)
১৩৩। চৈতন্যমত-মঞ্জুষা— রাধামোহন ঠাকুর।
১৩৪। চৈতন্য-সংগীতা— ভগীরথ বন্ধু।
১৩৫। চমৎকার চন্দ্রিকা (২য়)— নরোত্তম দাস।
১৩৬। ঐ টীকা— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

১৩৭। ঐ অনুবাদ— কৃষ্ণদাস।

১৩৮। চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য— কর্ণপুর।

১৩৯। চৈতন্য শতক— ঐ

১৪০। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক— ঐ

১৪১। ঐ অনুবাদ— প্রেমদাস।

১৪২। চৈতন্যচন্দ্রোদয়— বৃন্দাবনদাস।

১৪৩। চৈতন্যচরিত বা মুরারি গুপ্তের করচা— মুরারি গুপ্ত।

১৪৪। চৈতন্যমত-মঞ্জুষা [ভাগবতের টীকা] শ্রীনাথ পণ্ডিত।

১৪৫। চৈতন্য-লীলামৃত— বৃন্দাবন দাস।

১৪৬। চৈতন্য-সহস্র নাম— কর্ণপুর।

১৪৭। চৈতন্য-তত্ত্ব-দীপিকা— (?)

১৪৮। ঐ অনুবাদ— শশিভূষণ গোস্বামী।

ছ

১৪৯। ছন্দ সমুদ্র— নরহরি চক্রবর্ত্তী

১৫০। ছন্দোমঞ্জরী— (?)

১৫১। ঐ টীকা— রঘুনন্দন গোস্বামী।

১৫২। ছন্দোঽষ্টাদশ— শ্রীরূপ।

জ

১৫৩। জগন্নাথ মঙ্গল— দ্বিজমুকুন্দ।

১৫৪। জগন্নাথবল্লভ-নাটক— রায় রামানন্দ।

১৫৫। ঐ অনুবাদ— লোচনদাস।

১৫৬। জগন্নাথাষ্টকং— শ্রীশ্রীমহাপ্রভু।

১৫৭। জগন্নাথ চরিতামৃত— (?)

১৫৮। জগন্নাথ মঙ্গল বা পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য— গদাধর দাস— [কাশীরাম দাসের ভ্রাতা]

ত

১৫৯। তত্ত্ববিকাশ— বৃন্দাবন দাস।
১৬০। তত্ত্ববিলাস— বৃন্দাবন দাস।
১৬১। তত্ত্ব-সন্দর্ভ— শ্রীজীব।
১৬২। তুলস্যাষ্টকং— শ্রীরূপ।
১৬৩। তুলসী চরিত্র— দ্বিজ ভগীরথ।

দ

১৬৪। দশোপনিষদ্ ভাষ্য— বলদেব বিদ্যাভূষণ।
১৬৫। দীপান্বিতা— বংশীবদন।
১৬৬। দানকেলী কৌমুদী— শ্রীরূপ।
১৬৭। দূতীবোধ— অতি বড় জগন্নাথ দাস।
১৬৮। দূতী সংবাদ— কবি কৃষ্ণদাস।
২৬৯। দুর্লভসার— লোচন দাস।
১৭০। দধিখণ্ড— বৃন্দাবন দাস।
১৭১। দীপকোজ্জ্বল— বংশীবদন
১৭২। দাসচরিত— রঘুনাথ দাস।
১৭৩। দেহনিরূপণ— লোচন দাস।
১৭৪। দিনমণি চন্দ্রোদয়-মনোহর— (রায় রামানন্দের পৌত্র]
১৭৫। দশমচরিত— শ্রীসনাতন গোস্বামী।
১৭৬। দশমটিপ্পনী— ঐ
১৭৭। দেশীক নির্ণয়— রঘুনন্দন গোস্বামী।
১৭৮। দ্বৈত-সিদ্ধান্ত দীপিকা— ঐ
১৭৯। দুর্জ্জনসিংহের কালানল— ঐ
১৮০। দর্পণচন্দ্রিকা— নরসিংহ দেব।
১৮১। দানখণ্ড— জীবন চক্রবর্ত্তী।
১৮২। দাসগোস্বামীর সূচক— রাধাবল্লভ দাস।
১৮৩। দ্বাদশপাট নির্ণয়— লীলাচন্দ দাস।
১৮৪। দ্বারিকা বিলাস। দ্বিজ জয়নারায়ণ।

গ্রন্থ

১৮৫। ধামালী— লোচন দাস।

১৮৬। ধ্রুব-চরিত— ভরত পণ্ডিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

রথোপরি।

হেরিনু মধুর মূরতি সুন্দর—
শ্যাম নটবর কিশোরী সনে।
কিবা তাঁর ঠামে নবঘনশ্যাম—
রূপের ছটায় বিজুলি জিনে।

(২)

ব্রজের বসন-ভূষণ শ্রীঅঙ্গে
সাজিয়াছে শ্যাম ধরি গোপবেশ
বংশী লয়ে করে শিখিপাখা শিরে
কিবা মনোহর চাঁচর কেশ।

(৩)

ভকতের সাথে চলে ভগবান্
নামের ধ্বনিতে ভুবন কাঁপায়;
পরম সুন্দর ভুবন ভুলান
রথের সাজনি নয়ন জুড়ায়।

(৪)

বরষে বরষে ভকতের হিতে
ব্রজেন্দ্র-নন্দন গোপীমন-চোর,
ভকতের প্রাণে ঢালে প্রেমধারা
করে এই লীলা প্রেমে ভরপুর।

(৫)

যখনি নেহারি না পড়ে পলক
দেখিবার সাধ কভু না মিটে
যুগল-রূপের যাই বলিহারী,
প্রাণে শান্তিধারা আপনি ছুটে।

(৬)

ধন্য এ জনম জীবন সফল,
রূপোপরি হেরি যুগল-কিশোর।
সাধু সঙ্গে নাম পূর্ণমনস্কাম
এ হৃদে নাহিক বাসনা মোর।

ভক্তপদরজপ্রার্থী
দীন—যতীন্দ্রমোহন দে দাস।

গৌড়চন্দ্র—শ্রীনিবাস আচার্য্য।

সূচনা।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাঠানেরা এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সহিত লাঠি লইয়া স্থানবিশেষে লড়াই করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লাঠিতে পল্লীসমূহের হাড় ভাঙ্গিয়া যায় নাই। একজনের হস্ত হইতে আর একজনের হস্তে রাজ্য গিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মী পল্লী ছাড়িয়া একপদও এদিক ওদিক হন নাই। সরস্বতী পর্ণশালাতে বাঁধা ছিলেন, মা অন্নপূর্ণাও অন্নছত্র খুলিয়া উৎসব করিতে-ছিলেন। মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের জন্য কাহাকেও বিশেষ ভাবিতে হইতনা, সকলেই একরূপ না একরূপ স্ফূর্ত্তি করিয়া দিন কাটাইত। এই গেল সাধারণ পল্লীগ্রামের কথা; কিন্তু এই সব সাধারণ পল্লীর ভিতরও অনেক

অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ লীলা খেলা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিব—চাখন্দী।

হিন্দুস্মৃতি-অনুসারে আমরা চাখন্দীকে ভাগ্যবতী বলিতে বাধ্য। গঙ্গাতীরে যাহার বাস, সে যদি ভাগ্যবতী না হয়, তবে আর ভাগ্যবতী কে হইবে? রাঢ়দেশের এই চাখন্দীপল্লীতে এক শুকৃতীর জন্ম হয়, তাঁহার নাম গঙ্গাধর। তিনি বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের বংশধর। গঙ্গার ধারে গঙ্গার ধারায় গঙ্গাধর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিলেন। তাঁহার পিতার অবস্থা তত ভাল ছিলনা, তিনি একজন "চাল-কলার" ভট্টাচার্য্য ছিলেন। সেই চাল-কলাতেই গঙ্গাধর মানুষ হইয়া "নরঃ নরৌ নরাঃ" করিতে করিতে গ্রাম্য টোলে নাম লিখাইয়া দিলেন। তিনি যে অধ্যাপকের নিকট মাথা বিক্রয় করিয়াছিলেন, দেশের মধ্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি ছিল।

গঙ্গাধর যখন "ডুকৃঙ" করিতেছিলেন, তখন ভুবনমঙ্গল শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। তাঁহার বড় ইচ্ছা, তাঁহাকে একবার নবদ্বীপে গিয়া দেখিয়া আসেন, কিন্তু দৈব প্রতিকূল ছিল, যাই যাই করিয়া তাঁহার যাওয়া হইতনা। যাওয়া না হউক, দর্শন ভাগ্য ঘটিয়া না উঠুক, তাঁহার স্বাভাবিক চৈতন্যপ্রীতি টুটিয়া যায় নাই, বরং বাধায় বাধায় ফুটিয়াই উঠিয়াছিল।

সে সময় গৌড়মণ্ডলের গৌরবস্থল রূপ ও সনাতন রামকেলীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা হুসেনশাকে রাজপাটে দেখিলেও কার্য্যতঃ এই রূপ-সনাতনই গৌড়ের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহারা রাজকার্য্য কোনওরূপে সমাধা করিয়া ভজন-সাধনে এবং ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া কাল কাটাইতেন। বঙ্গদেশের গণ্যমান্য এমন পণ্ডিত ছিলেন না, যাঁহারা এই পুণ্যতীর্থ রামকেলীতে নিমন্ত্রিত হন নাই। আমাদের গঙ্গাধরও একবার তাঁহার বরেণ্য অধ্যাপকের সহিত কয়েকদিনের জন্য তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাধরকে যদি আমরা "ভাবকঠাকুর" বলি, তবে বিশেষ দোষ হয়না। অনেকেরই ধারণা, সংস্কৃতের কটমট শ্লোক পড়ায়, অনেক পণ্ডিত মহাশয়েরই হৃদয় কঠিন হইয়া পড়ে; কিন্তু গঙ্গাধরের সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই। রূপ-সনাতনকে দেখিয়া, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বিচার শুনিয়া, তিনি যেন কেমন কেমন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভিতরে নদীয়ার গোরা উকি ঝুকি মারিতেছিলেন,

রামকেলীর রূপ-সনাতন আবার চোখে চোখে ফিরিয়া দিলেন। অধ্যাপকের সহিত দক্ষিণা পাইয়া তিনি বাড়ীতে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তিনি রূপ-সনাতনের হাত এড়াইতে পারিলেন না, বাধ্য হইয়া তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থান দান করিতে হইল।

কোন্ বৎসর কোন্ মাসে কোন্ দিনে গঙ্গাধরের "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" শ্লোকের সার্থকতা হয়, ঠিক করিয়া বলা যায় না ; তবে এ কথা দৃঢ়স্বরে বলিতে পারা যায়, যাজিগ্রামে পূজনীয় বলরাম আচার্য্যের গৃহে তাঁহার পুত্রপিণ্ডলাভের আয়োজন হয়। বলরাম অনেক তপস্যা করিয়া একটী মা-লক্ষ্মী পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম সত্য সত্যই লক্ষ্মীদেবী। তিনি তাঁহার বড় সাধের লক্ষ্মীকে গুণবান গঙ্গাধরের হাতে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন; দরিদ্র ভট্টাচার্য্যও লক্ষ্মীদেবীকে লাভ করিয়া সর্ব্বশূন্য দরিদ্রতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

গৃহী কখন সুখী হয় ? ইহার সোজাসোজি একটী উত্তর আছে,—গৃহিণী যদি মনের মত হয়, গৃহিণী যদি সহধর্ম্মিণী হয়। আমাদের লক্ষ্মীঠাকুরাণী অলক্ষ্মীরূপে গৃহে প্রবেশ করিলেন না, সহধর্ম্মিণীরূপেই তাঁহার শুভাগমন হইল। তিনি তাঁহার স্বামী-দেবতার নিকট কোনও সুখের আশা করিয়া আসিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতেই আসিলেন। স্বামীর নিকট কিছু লইতে আসিলেন না, কিন্তু তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যাহা ছিল, তাহা প্রীতিপূর্ব্বক দান করিতেই আসিলেন। তিনি স্বামীর অভাব বৃদ্ধি করিলেন না, কিন্তু ভাব-বৃদ্ধিরই কারণ হইলেন। তিনি স্বামীর ভজন-পথের কণ্টক হইলেন না, বরং পরম সহায়ই হইলেন। গঙ্গাধর সংসার-সমুদ্রে একা ভাসিতেছিলেন, বিধাতার বিধানে পরপারে যাইবার একখানি সোণার তরী পাইলেন ; তাঁহার আনন্দ দেখে কে ? এমন লক্ষ্মী পাইলে গঙ্গাধর কেন সকল দরেরই আনন্দ, তবে এ বড় দুর্লভ,—"কোটীকে গোটিক মিলে।"

এ কালের পাশ্চাত্য-সভ্যতার তুলনায় লক্ষ্মীদেবীকে অবশ্য অসভ্যের শ্রেণীতেই বসিতে হয়। তিনি যখন স্বামীর নিকট তাঁহার ন্যায্য দাবীদাওয়া উপস্থিত করিলেন না, তাঁহার স্বত্বটা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইলেন না, "সবাই স্বাধীন মনের গৌরবে" এই গানটী শুনাইয়া দিতে পারিলেন না, "তুমি আমারই" এইটী হাতে কলমে দেখাইয়া দিলেন না, অন্ধের মত কেবল

স্বামীর অনুসরণ করিয়া চলিলেন, মাটীর মানুষ হইয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকিলেন, তখন তাঁহাকে কেমন করিয়া আমরা আধুনিক সভ্যতার আলোকে স্থান দিতে পারি? তবে সুখের বিষয় এই যে, গঙ্গাধরের তথাকথিত এরূপ অসভ্য গৃহিণীরই আবশ্যক হইয়াছিল, নতুবা অভাবের সংসারে তাঁহার ভাবকালী মাথায় উঠিয়া পড়িত।

এক বিষয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কিছু গোল ঘটিয়াছিল। তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। বিষয়টী এই:—বাঙলা দেশের গগনে পবনে চৈতন্যের ধ্বনি। যেমন বাহিরে, তেমন ভিতরে, কেবল সেই প্রেমময়ের প্রতিধ্বনি। তাঁহার বড় ইচ্ছা—একবার নবদ্বীপে গিয়া নব-গৌরাঙ্গকে দেখিয়া আসেন; কিন্তু প্রভুর কি ইচ্ছা বলা যায় না, তাঁহার সে ইচ্ছা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। যাত্রার সময় ঠিকঠাক, অমনি একটী দৈববাধা আসে। দিনে দিনে মাস যায়, মাসে মাসে বৎসর যায়, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় না। বাধার সহিত তাঁহার বিরোধ বাড়িয়াই চলিল। বাধার জয় হইল বটে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাকে কমাইতে পারিল না, বরং শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিল। তিনি শেষে প্রতিজ্ঞা করিয়া উঠিলেন—"দেখিব দেখিব তারে নিশ্চয় দেখিব।"

সাধুসন্ন্যাসীর নিকট উঠা বসা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চিরস্বভাব। এই কারণে তদানীন্তন কালের অনেক মহাত্মার সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল। কণ্টকনগরের স্বনামধন্য কেশবভারতীর নিকট তিনি অবসর পাইলেই হৃদয় খুলিয়া বসিতেন। সেই মহাপুরুষ তাঁহার একরূপ পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি একদিন শ্বশুরবাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া সঙ্কল্প করিলেন, —আগে যাইব কণ্টকনগরের সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকট, তারপর "দেখিব দেখিব তাঁরে নিশ্চয় দেখিব।"

সঙ্কল্প অনুসারে চাখন্দীর ঠাকুর-মহাশয় কাটোয়ার পথে উঠিয়া অবাক্ হইলেন। পথে আর হাটিবার উপায় নাই, দেশই যেন ভাঙ্গিয়া কাটোয়ার দিকে চলিয়াছে। কাহারও কোন কথা নাই, সকলেরই দ্রুতপদে গমন, যেন মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে। ঠাকুর-মহাশয় অনেক কষ্টে একটু আভাস পাইলেন যে, কাটোয়ার ঘাটে সর্ব্বনাশই হইবে; যে দেবতাকে দর্শন

করিবার জন্য তিনি ছুটাছুটি করিতেছেন, সেই সর্বজনবরেণ্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব গঙ্গার ঘাটে বটবৃক্ষতলে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। বিনা মেঘে তাঁহার শিরে বজ্রাঘাত হইল, তিনি বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে সময় মত লক্ষ লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন।

চতুর্দ্দিকে সমবেত নরনারী হাহাকার করিয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—এই সুন্দরের সুন্দর যেন সন্ন্যাসী না হয়। পক্ষান্তরে সেই চিরসুন্দর শ্রীশচীনন্দন আপামর সাধারণ সকলের নিকট করুণস্বরে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন—আপনারা দশমুখে বলুন, আমি শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-দাস হই। সকলের অরণ্য-রোদন হইল, এক অজেয় লক্ষ লক্ষকে জয় করিল, সুশীল মধুশীল কাঁপিতে কাঁপিতে সর্ব্বনাশের ক্ষুর ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন।

স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া ও কে? ও কি চেতন মানুষ, না জড় পুত্তলিকা? উঁহার রক্তমাংসের শরীরে কোনও সাড়াশব্দ নাই কেন? বিশাল লোচন—অথচ পলক নাই—ইহার হেতু কি? লক্ষ লক্ষ নরনারীর ভিতর এমনটী আর দেখিতেছি না কেন? এই অলৌকিক মূর্ত্তিকে আপনারা চিনিতে পারিয়াছেন? উনি যে আমাদেরই সেই চাখন্দীর গঙ্গাধর, উনি যে আমাদেরই সতী-লক্ষ্মীর স্বামী সেই সরলপ্রাণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। চিরকাল শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিব বলিয়া তিনি কামনা করিয়া আসিতেছিলেন, আজ বোধ হয় চিরদিনের সাধ মিটাইবার জন্য চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন।

কিন্তু কতক্ষণ আর পুতুলের অভিনয় চলিবে? মধুশীল কাঁদিতে কাঁদিতে যেই সেই জগন্মঙ্গলের শিরে ক্ষুর তুলিয়া দিলেন, অমনি পুতুল নড়িয়া উঠিল, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, অচেতন হইয়া সেই বিসর্জ্জনের ঘাটে পড়িয়া গেল। একজন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেছেন, আর তাঁহার জন্য—দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মর্ম্মভেদী স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, জগতের রঙ্গমঞ্চে এইরূপ করুণ দৃশ্য আর কোথায়ও দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। এই হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্যকে আরও করুণ করিয়া তুলিলেন আমাদের ভাবুক ঠাকুর ঐ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। সন্ন্যাসের সময় যখন শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নূতন নাম দশদিকে বিঘোষিত হইল, তখন ঐ

জগন্মঙ্গল নামের অংশ "চৈতন্য" টুকু যেই তাহার কর্ণকুহর দিয়া বরাবর মর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইল, অমনি তিনি এমনভাবে "হা চৈতন্য" বলিয়া ধ্বনি করিলেন যে, সে কথা কেহ কখন ভুলিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হুঙ্কার গর্জ্জনের সহিত গঙ্গাধরের "হা চৈতন্য" নাম ভক্তগণের হৃদয়ে চিরকালই উত্থিত হইবে।

শচীনন্দন বিষ্ণুপ্রিয়া-স্বামী শিথাসূত্র ত্যাগ করিয়া মহা ত্যাগের পথে উঠিলেন, ইহাতে সকলেই নিজের নিজের ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিল। প্রাণাধিক পুত্রের লোকান্তর হইলে যত শোক না হয়, তত শোক হইল নিমাইচাঁদের আশ্রম পরিবর্ত্তনে। এই জন্য যে কত জন অন্নজল ত্যাগ করিয়া পাগল হইল, কে তাহার সংখ্যা করিবে? এই জন্য কতজন সংসার ছাড়িয়া তাঁহারই মত করতলে ভিক্ষা এবং তরুতলে বাস স্বীকার করিলেন, কে তাহার হিসাব দিতে সক্ষম হইবে? তবে আমরা দুইজনের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। একজন তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য। তিনি সন্ন্যাসের নামগন্ধ পাইয়া "হা চৈতন্য" রবে কাশী অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। আর একজন হইতেছেন আমাদের এই ভাবক ঠাকুর। প্রভু কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই কাঁদিয়া কাটিয়া ঘরে মাথা দিলেন, কিন্তু গঙ্গাধর আর ঘরে যাইতে পারিলেন না। গঙ্গাধর-মহাদেব যেরূপ শ্মশানে মশানে হরিনাম করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া সতত নৃত্য করিতে থাকেন, এই গঙ্গাধরও সেইরূপ একা একা গঙ্গার ধারে ধারে "হা চৈতন্য" রবে দিবানিশি দিঙমণ্ডল মুখরিত করিয়া অভিনব দৃশ্য প্রকটিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার সেই মোহন-মন্ত্রে দেহ-ধর্ম্ম গেহ-ধর্ম্ম প্রভৃতি অনেক দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, চক্ষু উর্দ্ধদিকে উঠিল, বায়ু উর্দ্ধগামী হইল, আকৃতি প্রকৃতি উভয়েরই উপর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আসিল, কাটোয়ায় শুরুগৌরাঙ্গ দর্শনের ফলে গঙ্গাধর সম্পূর্ণরূপেই নূতন হইলেন।

এই অবস্থায় তাঁহার ভিতর আর কিছুই ছিল না, কেবল "হা চৈতন্য" ধ্বনি মাত্র ছিল। তিনি অনাহারে অনিদ্রায় উন্মাদের ন্যায় ঘাটে বাটে মাঠে বহুদিন কাটাইয়া অবশেষে জন্মভূমিতে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের সকলের মুখেই কেবল একটী কথা—"ভাল মানুষ গঙ্গাধরের এ কি দশা!" তিনি সকলের লক্ষ্যস্থল হইলেন, দলে দলে সকল শ্রেণীর লোক আসিয়া তাঁহাকে

দেখিয়া যাইতে লাগিল; অবশ্য তাঁহার সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, সেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে কেহই কোনরূপ ত্রুটী করিলেন না। আমাদের সকলের কথা শুনিবার অবসর নাই, এ সম্বন্ধে চাথন্দীর পণ্ডিতমণ্ডলীর কিছু মন্তব্য শুনিয়াই ক্ষান্ত হইব।

যাঁহারা কেবল শ্লোক আওড়াইয়াই পণ্ডিত, তাঁহারা একতরফা রায় দিয়া বসিলেন—"গঙ্গাধর পাগল হইয়াছে।" যাঁহাদের হৃদয় আছে, যাঁহারা ভাবরাজ্যের কিছু ধার ধারেন, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন—"হাঁ, পাগল হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধারণ পাগল নয়, অসাধারণ চৈতন্যপাগল, বহু ভাগ্য না থাকিলে এরূপ পাগল হওয়া যায় না। কাটোয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস দর্শন করিলেন, কিন্তু "হা চৈতন্য" রবে গঙ্গাধরের মত পাগল কয়জন হইলেন? কয়জন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, গেহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, "হা চৈতন্য" ধ্বনিই সার করিতে পারিলেন? গঙ্গাধর আর নাই, তিনি এখন প্রকৃত "চৈতন্য-দাস" হইয়াছেন; সুতরাং এখন হইতে তাঁহার চৈতন্যদাস নূতন নাম হইল, আমরা আজ হইতে তাঁহাকে চৈতন্যদাস বলিয়া ডাকিব।" আমরাও বিজ্ঞগণের মত অনুসরণ করিয়া আর গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বলিব না, এখন হইতে তাঁহাকে চৈতন্যদাস বলিব।

চৈতন্যদাস উন্মাদ হইয়াই গিয়াছিলেন, তাঁহার ঘরে মাথা দিবার উপায় ছিল না, তবে তিনি তাঁহার গৃহলক্ষ্মীর গুণে গৃহে দাঁড়াইতে সক্ষম হইলেন। তিনি তাঁহার রূপজমোহে আবদ্ধ হন নাই, আত্মসুখের জন্যও ঘর করিতে বাসনা করেন নাই, তবে তিনি শিকল পরিয়া বসিলেন কেন? তিনি "হা চৈতন্য" বলিয়া কাঁদিতে খুব ভালবাসিতেন, আর তাঁহার লক্ষ্মীকে দেখিয়া সেই ক্রন্দনটী খুব ভালরূপে হইত। লক্ষ্মীদেবী প্রকৃতপক্ষেই বৈষ্ণবী, তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার ইতরকামের কথা মনে পড়িত না, কিন্তু চৈতন্যস্মৃতিই পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিত, চৈতন্যদাস তাহারই প্রার্থী, তাই তিনি সতী লক্ষ্মীর সহিত চৈতন্যের ঘর করিতে লাগিলেন।

যাহারা ঘর করিয়া বাস করে, তাহাদের পক্ষে পুত্র-কামনা দোষের কিছুই নহে। চৈতন্যদাসের প্রথম প্রথম মনে যাহাই থাকুক, শেষে তাঁহার মনে অন্য কোন কামনার গন্ধ ছিল না, তাঁহার সকল কামনা জুড়িয়া বসিয়াছিলেন

এক চৈতন্যগোঁসাই। কিন্তু গোঁসাই শেষকালে এ কি করিলেন? চৈতন্যদাসের হঠাৎ পুত্রকামনা হইল। ভাবুক ঠাকুর গঙ্গার ধারে বসিয়া বসিয়া বিচার করিতে লাগিলেন—"হায়, হায় আমার এ কি হইল? চৈতন্যকে ডাকিয়া শেষে কি এই ফল পাইলাম! একটী পুত্র চাই—না হইলেই নয়,—মনের কি দুর্ব্বার কামনা! ইহার স্রোতে আমায় চিরস্মরণীয় শ্রীচৈতন্যও যে ভাসিয়া গেল, আমার পুত্রই কিনা শেষে চৈতন্যের আসন অধিকার করিল! হায়, হায় করি কি? উপায় কি? এ কথা যে জগতের কাহাকেও বলিবারও উপায় নাই! কে আমাকে পথ দেখাইবে? কে আমাকে সৎ উপদেশ দিয়া এই অসময়ে রক্ষা করিবে? ঘর করিতে বসিয়া আমি কি শেষে কামকীট হইয়া পড়িলাম? কিন্তু যাহার সহিত আমার ঘর, সেই ঘরণীর ত কোন দোষ নাই, সে ত প্রীতিরই প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার স্পর্শে ত আমি অচেতন হই না, বরং চৈতন্যই লাভ করি। তাঁহার মুখ দেখিলেই চৈতন্য যেন আমার বুকের ভিতর নাচিয়া উঠে, তবে আমার জীবনমরণের সাথী সেই চৈতন্যদায়িনীর নিকটই মনের কথা খুলিয়া বলি, দেখি সে কোন প্রতীকার করিতে পারে কি না, আমি ত মনকে বুঝাইয়া অকৃতকার্য্য হইলাম, তাহার এক কথা একটী পুত্র চাই-ই চাই। হায় হায় আমি চৈতন্য সার করিয়া শেষে পুত্রকামী হইলাম?"—ইত্যাকার চিন্তা করিতে করিতে চৈতন্যদাস কেমন কেমন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মী কেবল কথায় অর্দ্ধাঙ্গিনী ছিলেন না, তিনি তাঁহার স্বামীর দেহ ও মনের সব খবরই সময়মত পাইতেন, তিনি তাঁহার ভিতর বাহির সত্য সত্যই দেখিতে পাইতেন। চৈতন্যদাসের কোনও চিন্তাই তাঁহার চক্ষুকে এড়াইতে পারিত না। তিনি তাঁহার হৃদয়খানি না খুলিয়া দিতেই সেই অভিন্নহৃদয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? তোমার মুখে ত কোনদিন অন্য চিন্তার ছায়া পড়িতেও দেখিতে পাই না। অকস্মাৎ এ কি হইল?" চৈতন্যদাস দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর দিলেন, "প্রাণের কথা তোমাকে বলিব না ত আর কাহাকে বলিব? তোমাকে বলিব বলিবই করিতেছিলাম, কিন্তু এ কি বলিবার কথা?—মনে মনে ভাবিতেও যে লজ্জা হয়, জানি না কি-জন্য আমার পুত্রকামনা হইতেছে। আমার মনের ভিতর শ্রীচৈতন্য আর পুত্রে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়াছে, চৈতন্য তাহাকে ঠেলিয়া

ফেলিয়া দিতেছে না, বরং আরও ভাল করিয়া বসাইতেছে, বল বল লক্ষ্মী আমার উপায় কি?" সতী লক্ষ্মীর উত্তর হইল,—আমরা গৃহস্থ, আমাদের ভিতর কামনা ত আসিবেই, কেবল উপদেশে সে কামনা ফিরিয়া যাইবে না। গঙ্গা সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়াছে, সে কাহারও কোন কথায় প্রতিনিবৃত্ত হইবে না, তাহাকে ফিরাইতে হইলে যথাবিহিত সাধনা চাই, কামনাকে দূর করিতে হইলে কামনার কামনাকে অগ্রে দেখা চাই। ভগবানের চাঁদমুখখানি দেখিতে পাইলে অন্য কোন কামনাই থাকিতে পারে না। সেই চাঁদমুখ দর্শনের এখন বিশেষ সুবিধা। পুরীতে গেলে এক চাঁদমুখ নয়, অচল সচল দুই চাঁদমুখই দেখিতে পাওয়া যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে গৌরাঙ্গসুন্দরের চাঁদমুখখানি দর্শন করিলেই, পুত্রের চাঁদমুখ দর্শনের সাধ মিটিয়া যাইবে। আমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, বিবেচনা করিয়া দেখ আমার কথাটী ঠিক কি না।" উদ্‌ভ্রান্ত গৃহী সেই আদর্শ গৃহিণীকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী, তোমার চাঁদমুখের কথা শুনিয়া আমার নাচিতে ইচ্ছা করিতেছে। আমি চাহিতেছি পুত্র, তুমি আমাকে জগন্নাথ আর চৈতন্যের নিকট টানিয়া লইতেছ। বাস্তবিক তাঁহাদের চাঁদবদনেই ত আমি যাহা কিছু চাই সব আছে। তবে চালাও চালাও লক্ষ্মীপ্রিয়া, আমাকে সেই পুরীতে চালাও—যথায় আমার দুর্ব্বার পুত্র-কামনা মিটিয়া যাইবে। শুভস্য শীঘ্রং, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, চল আমরা চাঁদমুখ দর্শন করিতে শীঘ্রই অগ্রসর হই।"

যেই কথা, সেই কাজ। ঠাকুর ঠাকুরাণীর ঘর বন্ধ হইল,—তাঁহারা পুরীর পথে উঠিয়া প্রথমতঃ যাজীগ্রামে গেলেন। বলরাম আচার্য্য ঝি জামাই পাইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, অগত্যা তাহাদের পুরীযাত্রা সমর্থন করিতে বাধ্য হইলেন। যাত্রাকালে প্রাণ খুলিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন—হে জগন্নাথ, এই যাত্রা যেন নিষ্ফল না হয়। তোমার কৃপায় আমার বড় সাধের লক্ষ্মীর কোলে শীঘ্রই যেন একটী সোনার চাঁদ আসে। বলরাম আচার্য্যকে এ জন্য আমরা নিন্দা করিতে পারি না, নাতির চাঁদমুখ দেখিতে কোন্ ঠাকুরদাদার ইচ্ছা না হয়? যাহা হউক গুরুজনের আশীর্ব্বাদ লইয়া চৈতন্যদাস তাঁহার সতী লক্ষ্মীর সহিত পুরীর পথের পথিক হইলেন।

পথে।—"হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই প্রেমিক দম্পতি

কঠিন পথকে সরস করিয়া চলিতে লাগিলেন। পথে কিছুরই অভাব হইল না। কতজন প্রভুকে দেখিতে সেই পথে চলিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রভুপ্রিয় ভক্ত-যুগলকে দেখিয়া বিশেষভাবে আদর করিলেন। হরি যাঁহাদের হৃদয়-দেবতা, তাঁহাদের অভাব কোথায়? হরিকে যাঁহারা সার করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের পথে কি অসুবিধা আসে? হরি তুষ্ট হইলে জগতে সকলেই তুষ্ট হন, তবে এই হরি-শরণাগত নিঃস্ব স্বামী-স্ত্রীর প্রতি কেন সকলে প্রসন্ন না হইবেন? তাঁহাদের কোন অভাব অসুবিধা অসন্তোষ অসুখ কিছুই নাই, তবে তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পশুপক্ষীকে কাঁদাইয়া চলিলেন কেন? বাহিরে তাঁহাদের দুঃখ নাই বটে, কিন্তু ভিতরে যে তাঁহাদের বড় দুঃখ,—তাঁহারা যে দর্শনীয় চাঁদ-মুখখানি দেখিতে পাইতেছেন না, তাঁহাদের মনে হুহু করিয়া কেবল উঠিতেছে, আমরা সংসারে আসিয়া কি করিলাম? দিন যে আমাদের বৃথা গেল! আমাদের যে একদিনও ভগবানের ভজন হইল না! যে জীবনে ভগবানকে ভালবাসা গেল না, সে জীবন ধরিয়া লাভ কি? আমাদের মৃত্যু হয় না কেন? একদিন নিশীথকালে এইরূপ বিলাপ চরম সীমায় পৌঁছিল। মৃত্যু না আসিলেও নিদ্রা আসিয়া তাঁহাদিগকে অচেতন করিয়া ফেলিল, বাহিরের দ্বার রুদ্ধ হইল; চৈতন্যদাস ভিতর-ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতেই অবাক হইয়া রহিলেন, তাঁহার দৃষ্টিপথে একটী বহুরূপী আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—প্রথমে ছিলেন মদনগোপাল, তারপর হইলেন গৌরগোপাল, তারপর তিনিই আবার হইলেন সন্ন্যাসী, দেখিতে দেখিতে আবার সন্ন্যাসীই মদনগোপাল হইলেন! বহুরূপী খেলা দেখাইয়া চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু সেই খেলা দীনহীন ব্রাহ্মণের প্রাণের উপর উঠিল। চৈতন্যদাস নিশীথকালে চেতন হইয়া আকাশ ফাটাইতে লাগিলেন। ভাগ্যে তাঁহার লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার হৃদয়খানি বাঁধিয়া দিতে সক্ষম হইলেন। ঘোর নিরাশায় আশা আসিল, তাঁহারা আশায় আশায় কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্যস্থলে ছুটিয়া চলিলেন।

সিংহদ্বারে। "যে যাহা চায়, সে তাহা পায়"—এই কথাটীর ভিতর গভীর সত্য নিহিত আছে। চৈতন্যদাস যাঁহার জন্য স্ত্রীর সহিত পথের ভিখারী হইয়াছেন, তাঁহাকে পুরীর ভিতর অন্বেষণ করিতে হইল না। তাঁহাদের চিরলক্ষ্যস্থল গৌরসিংহ অনুচরগণের সহিত জগন্নাথ দর্শনের আছিলায় পূর্ব্ব হইতেই সিংহ

দ্বারে উপস্থিত! যে ঠাকুর কাটোয়ায় সন্ন্যাসের কালে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাড়াইয়াছিলেন, তিনি আজ পার্শ্বে আর একটী স্ত্রীপুত্তলিকা লইয়া বড়সুন্দর নীরব অভিনয় করিলেন। দর্শকবৃন্দ বড় গোলে পড়িলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দেখিবেন, না তাঁহার আগন্তুক দাসদাসীকে দেখিবেন? দুইই দর্শনীয়, দুইই আকর্ষণকারী। ইতিপূর্ব্বে কোন দিন প্রভুকে তাঁহার সহিত কথা কহিতে দেখা যায় নাই। প্রভু কিন্তু তাঁহার প্রতি এমনভাবে চাহিলেন, যেন কত আলাপ, কত পরিচয়, কত আত্মীয়তা! তিনি স্বভাব-সুলভ মধুর হাস্য করিয়া চিরপরিচিতের মত বলিলেন—"কি তুমি আসিয়াছ? বেশ ভাল, দর্শন কর" ঠাকুর কিন্তু এ দিকে দাঁড়াইয়ে! তাঁহার প্রতি প্রভুর প্রসন্নতা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তিনি—গোবিন্দকে বলিলেন—এই সরল ব্রাহ্মণকে তোমার হাতে দিলাম, কোন বিষয়ে যেন তাহার অসুবিধা না হয়।

তাঁহারা সুদূর চাখন্দী হইতে পুত্রকামনায় যে দুই চাঁদমুখ দর্শন করিতে আসিয়াছেন, সে দুই চাঁদমুখই সম্মুখে! তাঁহাদের বড় বিপদ হইল—দুই চক্ষু—কোন চাঁদমুখ দেখিবেন? দুই দিকেই দুইএর টান, তাঁহারা কোন দিকে চাহিবেন? ভাগ্যে তাঁহারাও দুইজন, কোনরূপে ভাগাভাগি করিয়া দর্শন সমাধা করিলেন। প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নিজের নিজের বাসায় গেলেন। তাঁহারা আশার পুরীতে একটী আশার বাসা করিয়া থাকিলেন।

ভক্তগণের ভিতর বড় গোল বাধিয়া গিয়াছে। "এ কোন ঠাকুর ঠাকুরাণী? তাঁহারা যখন আমাদের স্মৃতিপথে দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহাদের ভিতর অবশ্যই কিছু না কিছু আছে। গৌড় হইতে দিবারাত্রি কত নূতন যাত্রী আসিতেছে, কই, কেহই ত এরূপভাবে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না; আর ইঁহাদের প্রতি প্রভুই বা এত আকৃষ্ট কেন?" ভক্তদের ভিতরে ভিতরে এইরূপ নানা কথা চলিতেছে, গোবিন্দ কিন্তু বাহিরেই তাঁহাদের প্রসঙ্গ তুলিয়া দিয়াছেন। প্রভু তাকাইয়া কথা বলিতেছেন না,—চক্ষু বুঁজিয়া ভাবাবেশে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন,—"গোবিন্দ, ইহারা আমার শুদ্ধভক্ত। আমাভিন্ন ইহারা আর অন্য কিছুই জানে না, আমার প্রেরণায় ইহারা পুত্রকামনা করিয়া পুরীতে আসিয়াছে। যে জীব ত্রাণ করিবে, আমার সেই প্রেমের মূর্ত্তি শ্রীনিবাস ইহাদের যোগে গৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত হইবে। আমার ধর্ম্ম আমার

মর্ম্মীগণ শ্রীবৃন্দাবনে লিপিবদ্ধ করিতেছেন, আমার শ্রীনিবাস তাহা গৌড় হইতে জগতে প্রচার করিবে। এই ভক্তদম্পতিকে তুমি শীঘ্র দেশে পাঠাইয়া দাও।" গভীর রহস্য অবগত হইয়া ভক্তগণ উচ্চবাচ্য করিলেন না, আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন।

চৈতন্যদাস কাটোয়া হইতেই স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, দিবানিশি কেবল তাঁহার স্বপ্ন চলিতেছে। পথে বহুরূপীর স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছেন, স্বপ্নের পুরীতে জগন্নাথের আদেশবাণী সেই অভিনব দম্পতি সত্যই শ্রবণ করিলেন—"শুন শুন চৈতন্যদাস, শুন শুন লক্ষ্মীপ্রিয়া, আমি তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার বরপুত্র গ্রহণ কর। আমার বরে শীঘ্রই তোমাদের এক প্রেমাবতার অসাধারণ পুত্র হইবে। তোমরা অবিলম্বে দেশে গমন কর—শুভমস্তু।" স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, দুইজনই কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন। তাঁহাদের বড় আশা দুই চাঁদবদন দর্শন করিয়া পুরীতে থাকিবেন, কিন্তু এক চাঁদবদনে বিদায়বাণী উঠিল! তাহাদের বড় দুঃখ! কি করা যায়? স্বপ্নাদেশে পুরী ত্যাগ উচিত কিনা ভাবিতে ভাবিতে যখন তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, তখন গোবিন্দ আসিয়া নিবেদন করিলেন—"প্রভুর আদেশ, আপনারা শীঘ্র দেশে গমন করুন।" স্বপ্নে অচল চাঁদের যে কথা, জাগরণে সচল চাঁদেরও সেই কথা—দুই চাঁদবদন একমুখে তাঁহাদিগকে দেশে যাইতে বলিতেছেন! তাঁহারা আশায় আশায় পুরীতে আসিয়া বেশী দিন বাস করিতে পারিলেন না, আবার আশায় আশায় ঘরে ফিরিতে হইল। যে চৈতন্যদাস প্রভুর কেশের অদর্শনে অন্নজল ত্যাগ করিয়া পাগল হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপ করুণ দৃশ্য প্রকটিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তিনি দেশে না ফিরিয়া করিবেন কি? তিনি শ্রীচৈতন্যের হাতের পুতুল মাত্র। তাঁহারই অলক্ষ্য সূতায় নাচিতে নাচিতে তিনি সস্ত্রীক পুরীতে আসিয়াছিলেন, আবার তাঁহারই সূতায় নাচিতে নাচিতে জন্মভূমিতে যাইতে বাধ্য হইলেন। যাত্রাকালে অবশ্যই প্রেমময় প্রভু গুরুগম্ভীর স্বরে গম্ভীরা হইতে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তোমারা যে চাঁদমুখ দেখিতে পুরীতে আসিয়াছিলে, সেই চাঁদমুখ ঘরে বসিয়া দেখিতে পাইবে। শুভমস্তু! শুভমস্তু!! শুভমস্তু!!!

ঠাকুর ঠাকুরাণী যে পথে আসিয়াছেন, সেই পথেই চলিলেন। পথের যিনিই দেখেন, তিনিই বলেন "এমন সতীলক্ষ্মীর কোলে মাণিক না থাকিলে কি শোভা পায়? আমরা আশীর্ব্বাদ করি, শীঘ্রই যেন মা-ষষ্ঠীর কৃপা হয়।" এইরূপে দেশের ভিতর দশের আশীর্ব্বাদ লইতে লইতে তাঁহারা যাজীগ্রামে বলরাম-আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। জগতে ঝি-জামাইকে সকলেই ভালবাসে, তবে স্থান-বিশেষে ভালবাসার মাত্রা কমবেশী দেখা যায়। বলরাম-শর্ম্মার ভালবাসাটা কিন্তু বড় বেশী! তাঁহার পাগল ঝি-জামাইএর জন্য তিনিও পাগল। পুরীতে যাইবার পর তাঁহার বড়ই চিন্তা হইয়াছিল। ঘরের ধন ঘরে পাইয়া তাঁহার বড় আশা হইল। তিনি কয়দিন তাঁহাদিগকে লইয়া বেশ উৎসব করিলেন। বিদায়-কালে বলরাম কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চাখন্দীতে চলিলেন। আজ যাই কাল যাই করিয়া সেখানে কয়েক দিন থাকিতে হইল। তিনি গৃহে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু মন সেখানেই থাকিল। তাঁহার চোখের জল পড়িয়াছিল কিনা আমরা দেখি নাই, তবে তিনি যে ভিতরে ভিতরে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে গিয়াছেন, একথা দৃঢ়স্বরে বলিতে পারা যায়। ধন্য ঝি-জামাইর মমতা!

ঠাকুর-ঠাকুরাণীর আগমন-সংবাদে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের সংখ্যা যে বেশী একথা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের অর্থবিত্ত কিছুই নাই, পর্ণশালায় বাস করেন, তবু তাঁহাদের এত আকর্ষণ কেন? পল্লীবাসি-গণের মুখেই ইহার উত্তর পাই—"লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রতি নিশ্চয়ই দেবদেবীর দৃষ্টি পড়িয়াছে, নতুবা তাঁহার মুখে ওরূপ আলো কেন? দেশে কি আর সুন্দরী গুণবতী স্ত্রীলোক নাই? কিন্তু এমনটী আর দেখাইতে পার কি? এ যে দিন দিনই ফুটিয়া উঠিতেছে! হয় পথে, না হয় পুরীতে ইঁহাদের কিছু হইয়াছে,—যেমন ঠাকুর, তেমন ঠাকুরাণী!" অন্যদিকে ধ্বনি হইল—"তোমরাও যেমন, যাহাদের প্রতি দেবদেবীর দৃষ্টি হয়, তাঁহাদের ধনদৌলত হয় না কেন? ধন-দৌলত নাইবা হইল, একটী ছেলেও কি তাহাদের হইতে পারে না? কোলে যাহার ছেলে নাই, সে আবার লক্ষ্মীপ্রিয়া! তাহাকে লক্ষ্মীছাড়া বলিলে দোষ কি?"

ঠাকুর-ঠাকুরাণী কিন্তু অচল অটল। যে যা বলে তাই ভাল, কোন

দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই—তাঁহারা দিবানিশি ভজন-সাধন করিয়া শ্রীচৈতন্যের সংসার করেন।—তাঁহাদের ভজনকুটীরের চারিদিকে স্বচ্ছন্দ-বনজাত শাকের অভাব নাই—তেঁতুলগাছ নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে,—চাই চারিটা চাউল, তা ঠাকুর-মানুষের ঘরে একদিক না একদিক হইতে আসেই। তাঁহারা ছেঁড়া কাঁথাতে শুইয়া কত রাত্রিতে কত লক্ষটাকার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার ঠিক হিসাব দিতে অক্ষম; তবে শ্রীচৈতন্য-চিন্তামণি যে একদিন আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রেমবিলাসের শ্রীনিত্যানন্দ দাসের মুখে শুনিতে পাই। লক্ষ্মী-প্রিয়ার মাথায় হাত দিয়া নাকি তিনি বলিয়া গেলেন,—"ভয় কি মা, শীঘ্রই তুমি চিন্তামণি-ধন পাইবা, আর বেশী দেরী নাই, আঁধার ঘরে অতিসত্বরই মাণিক জ্বলিয়া উঠিবে।" ইহার পর হইতেই লক্ষ্মীপ্রিয়া আরও যেন কেমন কেমন হইয়া উঠিলেন। পরিবর্ত্তন যে কেবল তাঁহারই হইল, তাহা নহে; সেই অঞ্চলেই যেন যুগান্তর উপস্থিত হইল। গঙ্গা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার নৃত্যকীর্ত্তন বড় বেশী। যে বৃক্ষে কোন দিন ফুল ছিলনা, সেখানে ফুলের হাসি দেখে কে? নিরাশ চাষার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনা ফলিল! সকলদিকেই ফূর্ত্তি, সকলদিকেই হাসি—দেশ ভরিয়া যেন আশার গান উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

প্রশ্ন-সমালোচনা।

(৩)

শ্রীযুক্ত দীনদয়াল গোস্বামী মহাশয় (শ্রীনগর, শ্রীহট্ট) সাতটী প্রশ্ন পাঠাইয়াছেনঃ—

১ম প্রশ্ন। বৈষ্ণবের পক্ষে মহানির্ব্বাণ, বৃহদ্গৌতমীয়, মহাভাব এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-তন্ত্রানুযায়ী সাধনের কোনও ব্যবস্থা ভক্তিশাস্ত্রে আছে কিনা এবং ইহা বিশুদ্ধ রাগানুগা ভক্তির বিরোধী কিনা?

উত্তর। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের আলোচ্য-বিষয় ভক্তি-সাধন নহে।

বৃহদ্‌গৌতমীয়-তন্ত্রে ভক্তি-সাধনের অনুকূল শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাদি আছে। মহাভাব নামে স্বতন্ত্র কোনও প্রাচীন গ্রন্থ আছে বলিয়া জানিনা; শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিগ্রন্থের স্থায়িভাব-প্রকরণের একটি অংশে ব্রজ-প্রেমের চরম পরিণতি মহাভাবের আলোচনা আছে। মধুর-ভাবের রাগানুগীয় সাধকদের উপাস্য ভাবই মহাভাব।

২য় প্রশ্ন। ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ত্যাগী বৈষ্ণবের যজ্ঞসূত্র দেওয়ার ব্যবস্থা ভক্তি-শাস্ত্রে আছে কিনা?

উত্তর। এরূপ ব্যবস্থা কোনও ভক্তি-শাস্ত্রে আছে বলিয়া জানিনা।

৩য় প্রশ্ন। চণ্ডীদাসের মতে সাধন-ভজন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মিগণের করণীয় কিনা? যদি না হয়, তবে মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদের এত আদর করিলেন কেন? যদি বলেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতি বলিয়া—তবে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অন্য যে সাধনের পদ আছে, তাহা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আস্বাদন করেন নাই বলিয়া প্রমাণ কি?

উত্তর। "চণ্ডীদাসের মতে সাধন-ভজন" বলিতে প্রশ্নকর্ত্তা কি রকম সাধন-ভজনের কথা মনে করেন, বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যদি রজকিনীর সাহচর্য্যের কথা মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, তাঁহার ধারণা ভিত্তিহীন। চণ্ডীদাস-ঠাকুর যখন বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, তখন রজকিনী তাঁহার সাধন-সহচরী ছিলেননা—রাগানুগীয় ভজনে কোনও স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যের আবশ্যকতা কোনও ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায় না; বরং স্ত্রীলোকের সঙ্গত্যাগের ব্যবস্থাই বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় (সাধনার শ্রাবণ-সংখ্যা ২০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। চণ্ডীদাস ও রজকিনীর সম্বন্ধ-বিষয়ে আমাদের অভিমত সাধনার ভাদ্র সংখ্যায় ৩০০ পৃঃ ব্যক্ত করিয়াছি।

"চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অন্য (শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীতি ব্যতীত অন্য) যে সাধনের পদ আছে, তাহা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আস্বাদন করেন নাই বলিয়া প্রমাণ" এইরূপ বলিয়া মনে হয়:—

লীলাই আস্বাদনীয়; সাধন-সম্বন্ধীয় উপদেশ আস্বাদনের বস্তু হইতে পারে না; তাহা অনুসরণের বস্তুমাত্র হইতে পারে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নীলাচলে শেষ কয় বৎসর সর্ব্বদাই শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন; শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-

বিরহে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন; তাঁহার ব্যাকুলতার শান্তির নিমিত্ত স্বরূপ-দামোদরাদি চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে মহাপ্রভুর ভাবের অনুকূল পদকীর্ত্তন করিয়া শুনাইতেন; এই সমস্ত পদ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাসম্বন্ধীয় পদই—সাধন-সম্বন্ধীয় পদ নহে; কারণ, সাধন-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পদের কীর্ত্তনে শ্রীরাধা-ভাবাঢ্য প্রভুর ভাব-শান্তির সম্ভাবনা নাই।

চণ্ডীদাসের পদ-সমূহের মধ্যে যে সমস্ত পদে রজকিনীর বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশই প্রায় সাধনের প্রণালী-সম্বন্ধে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কান্তা শ্রীরাধার ভাবে যিনি আবিষ্ট, সাধন-প্রণালীর আলোচনায় তাঁহার কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারেনা। তাহার আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহও প্রশমিত হওয়ায় সম্ভাবনা দেখা যায়না। সুতরাং স্বরূপদামোদরাদির পক্ষে কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর রাধাভাবাঢ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে এই সমস্ত পদকীর্ত্তনের কোনও হেতুই দেখা যায়না। এই সমস্ত পদে যে সাধন-প্রণালীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও গোস্বামি-শাস্ত্রানুমোদিত সাধন-প্রণালী নহে; চণ্ডীদাস নিজেও যে এই প্রণালী-অনুসারে সাধন করিয়াছেন, তাহাও মনে হয়না। তথাপি তিনি এ সমস্ত পদ কেন লিখিয়াছেন, তাহার হেতু ভাদ্র-সংখ্যায় (৩০০ পৃঃ) আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

৪র্থ প্রশ্ন। (শ্রীচরিতামৃতে)—

"বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়।"

এই "রসিক"-শব্দের অর্থ কি ?

উত্তর। প্রশ্নকর্ত্তার উদ্ধৃত পয়ারার্দ্ধের পরবর্ত্তী পয়ার এই :—

হৃদয়ে ধরয়ে যেই চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥

—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ।

এই পয়ারের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ বলেন :—

পূর্ব্ব-পয়ারে যে 'রসিক-ভক্ত' বলা হইয়াছে, এই পয়ারে সেই রসিক-ভক্তেরই লক্ষণ বলা হইয়াছে; যিনি শ্রীশ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দকে হৃদয়ে ধারণ করেন, শ্রীশ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ভজন করেন, তিনিই রসিক-ভক্ত;

পারে—রসিক-ভক্তস্য লক্ষণং বদন্ তস্য তদ্বোধে হেতুমাহ "হৃদয়ে" ইতি। চৈতন্য-নিত্যানন্দং যো হৃদয়ে ধরতি চৈতন্য-নিত্যানন্দং ভজতীত্যর্থঃ স এব রসিক-ভক্তঃ। তথা তদ্ভজন প্রভাব-হেতুনৈব তস্য তদ্বোধঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥

ব্রজরসের অনুভব যাঁহার আছে, তিনিই রসিক-ভক্ত, ব্রজরসের অনুভব লাভ করিতে হইলে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের কৃপা অপরিহার্য্য; আবার পরম দয়াল শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের ভজন করিলেই তাঁহারা প্রেম ও ব্রজ-রসের অনুভব-সামর্থ্য দান করিয়া থাকেন, তাই শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের ভজনকারীকে রসিক-ভক্ত বলা হইয়াছে।

৫ম প্রশ্ন । যদি স্ত্রীলোক নিয়া কোনও ধর্ম্ম যাজনের পন্থা না থাকে, তাহাহইলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে এত আদর করিতেন কেন ?

উত্তর । ভজন-সহায়-কারিণীরূপে কোনও স্ত্রীলোকের সাহাচর্য্যে ভজনের উপদেশ গোস্বামি-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না বরং স্ত্রীলোকের, এমন কি স্ত্রীলোকের কৃত্রিম প্রতিকৃতির পর্য্যন্ত ত্যাগের উপদেশই দেখিতে পাওয়া যায়। রামানন্দ রায় ভজন-সহায়-কারিণী কোনও স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে ভজন করেন নাই; দেবদাসীদ্বয় তাঁহার ভজন-সহায়কারিণী ছিলেন না। শ্রাবণমাসের সাধনায় (১৮৫—২০৬ পৃঃ) এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন । শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্ত্রীদর্শনের জন্য ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু আজকাল ত্যাগী বৈষ্ণব সমাজে স্ত্রীলোকের মেলা কেন ? (স্ত্রীলোক) ভেকধারী বৈষ্ণব হওয়ার শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ আছে কিনা ?

উত্তর । ত্যাগী-বৈষ্ণব সমাজে "স্ত্রীলোকের মেলা" কোথাও আছে বলিয়া আমরা জানিনা। আজকাল, মাতাজীওয়ালা যে সকল ভেকধারী বাবাজীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে ত্যাগী বলা যায় না। যাঁহারা সমস্ত ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়াছেন, তাঁহারাই ত্যাগী; শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ ত্যাগীর আদর্শ দেখাইয়াছেন। মাতাজীওয়ালা বাবাজীগণের মধ্যে নিষ্কিঞ্চনের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না।

কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ—সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-কৃপালাভের নিমিত্ত নিষ্কিঞ্চন বা ত্যাগী হইতে পারেন। কিন্তু উল্লিখিত বাবাজীগণের সঙ্গিনী মাতাজীদের

৭ম প্রশ্ন ঃ ত্যাগী বৈষ্ণবদিগের কি ভাবে ভজন করা কর্ত্তব্য ?

উত্তর ঃ নববিধাভক্তি (অথবা অন্য অঙ্গের উপেক্ষা না করিয়া বাহুল্যে নববিধা ভক্তির যে কোনও একটী অঙ্গ) বৈষ্ণব সাধক মাত্রেরই অনুষ্ঠেয়। ত্যাগী বৈষ্ণবদের জন্য কোনও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে বলিয়া জানি না। ভক্তি-অনুষ্ঠান যাঁহার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, তিনি ততটুকুই করিবেন—তিনি গৃহীই হউন, আর গৃহত্যাগীই হউন।

(৪)

শ্রী :—(নামধাম গোপন রাখিয়াছেন) ছয়টী প্রশ্ন পাঠাইয়াছেন ঃ—

১ম প্রশ্ন ঃ অনেকেই বাহিরের তিলক-মালাদি জাক-জমক ও বৈষ্ণবাচার দেখিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন ; পরে সহজিয়া ও কিশোরী-ভজনের প্রধান নেতা জানিতে পারিলে শিষ্যের কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর ঃ সহজিয়া বা কিশোরী-ভজনকারীরা সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব নহেন। প্রমাদবশতঃ কেহ অসম্প্রদায়ীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিলে পুনরায় কোনও সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের নিকটে শাস্ত্রীয় মন্ত্রে তাহার দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য।

সম্প্রাদয়ী-বৈষ্ণবগণের যে দীক্ষামন্ত্র, তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁহাদের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ; কিন্তু সহজিয়া সম্প্রদায়ের পরমহংস (সোহহং) -মন্ত্রে উপাসনা ; এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে সেব্য-সেবকভাব তিরোহিত হয় ; মায়াবাদীদের ন্যায় "অহং ব্রহ্ম—আমি ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ"-এইভাবই স্থাপিত হয়। সুতরাং ইহা ভক্তি-বিরোধী ; এই হিসাবে সহজিয়াগণ ভক্তিমার্গে ভজনাকাঙ্ক্ষী কাহাকেও দীক্ষাদানযোগ্যতাশালী বৈষ্ণব নহেন। বৈষ্ণব-সাধককে বৈষ্ণব-গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে ; বৈষ্ণবের গুরু হইতে হইলে কিরূপ বৈষ্ণবের গুরু হওয়া দরকার, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে :—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।
বৈষ্ণবোভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥১।৪১

"যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে-দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়েন ; তদ্ভিন্ন অন্যব্যক্তি (দীক্ষাগুরু হওয়ার যোগ্যতা হিসাবে) অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত"।

যিনি গুরু হইবেন, তাঁহাকে শাস্ত্রজ্ঞ হইতে হইবে (নচেৎ শিষ্যের সন্দেহ দূর করিতে পারিবেন না) এবং পরব্রহ্মে (শ্রীকৃষ্ণে) অপরোক্ষ অনুভূতি-সম্পন্ন হইতে হইবে (নচেৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শিষ্যের কোনও বোধ জন্মাইতে পারিবেন না।

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত * * * শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতম্‌॥

—শ্রীভাগবত।

সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌।

—শ্রুতি

তাঁহাকে আবার সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবও হইতে হইবে; কারণ

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥

যিনি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব নহেন এবং শাস্ত্র-মতানুরূপ বৈষ্ণব নহেন, প্রমাদ-বশতঃ তাঁহার নিকটে যদি কেহ দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহাকে পুনরায় শাস্ত্র-বিহিত লক্ষণযুক্ত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের নিকটে দীক্ষিত হইতে হইবে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্‌ গ্রাহয়েদ্‌ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥

—ভক্তমালধৃত বচন।

সহজিয়া সম্প্রদায়ের আচরণ ভক্তি-শাস্ত্রানুমোদিত নহে; ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে তাহারা উৎপথগামী, কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানও তাহাদের নাই; বৈষ্ণবের ভাব তাহা-দের মধ্যে নাই বলিয়া তাহারা অবৈষ্ণব-সংজ্ঞাবাচ্য, সুতরাং তাহাদের প্রদত্ত মন্ত্র অবৈষ্ণবোপদিষ্ট মন্ত্র বলিয়া, সহজিয়া গুরুত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-সম্মত সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; এইরূপই শ্রীজীব-গোস্বামিচরণের অভিপ্রায়।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

তস্য বৈষ্ণব-ভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনেত্যাদি বচন-বিষয়-ত্বাচ্চ।—ভক্তিসন্দর্ভ। ২৩৮।

২য় প্রশ্ন। ঐ সকল গুরুমধ্যে অনেকেই নিজকৃত ভ্রূণহত্যা এবং অন্যের কৃত ভ্রূণ, অর্থ প্রত্যাশায় হত্যা করিলে এবং গুরুমহাশয়, পরমহংস ও ঊর্দ্ধরেতা নামের মর্য্যাদারক্ষা জন্য আপন সহধর্ম্মিণীর গর্ভপাত করিলে এবং

স্ত্রী অসম্মত হইলে মাইরপিট ও পরপুরুষ কর্ত্তৃক হওয়া প্রকাশ করিলে ও অখাদ্য ভোজন করিলে শিষ্যের কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর ঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৩য় প্রশ্ন ঃ অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন যে, গুরু যে কোন মন্ত্র অর্থাৎ "ধর ছাগলা পাতা খা"ও সাপ, ব্যাঙ আদি যাহা দেন, তাহাই জপ করিলে সকল কাজ সিদ্ধ হইবে, ১।২ নং প্রশ্নের কার্য্য, পরীক্ষার জন্য করিতেছেন— শিষ্য ইহাই মনে করিবে, কখনও ঐ গুরু পরিত্যাগ করিবেনা এবং অবজ্ঞাবুদ্ধি মনে করিবেনা ; এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-সঙ্গত কিনা ?

উত্তর ঃ শাস্ত্রীয় মন্ত্র ব্যতীত দীক্ষা সিদ্ধ হয় না। "ধর ছাগলা পাতা খা" ইত্যাদি তথাকথিত গুরুবাক্য নিষ্ঠার সহিত জপ করিলেও কোনও ফল হইবে না ; শাস্ত্রের উপর যাহার ভিত্তি নাই, এমন কার্য্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত করিয়া গেলেও শাস্ত্র তাহাকে উৎপাত-বিশেষই বলিয়া থাকেন ;

স্মৃতি-শ্রুতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥—ভঃ রঃ সিন্ধু।

শ্রীজীব গোস্বামিচরণ বলেন, যে ব্যক্তি ন্যায়রহিত কথা বলে, আর যে ব্যক্তি সেই ন্যায়রহিত কথা শুনে, তাহাদের উভয়কেই অক্ষয় কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে যাইতে হয় :—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥
—ভক্তিসন্দর্ভ।২৩৮।

গুরু কেন, যে কোনও বৈষ্ণবের আচরণই সাধকের দৃষ্টিতে অসঙ্গত আচরণ বলিয়া মনে হইলে অপরাধের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, "ঐ সমস্ত আচরণ তিনি আমার পরীক্ষার জন্যই করিতেছেন, অথবা আমার অন্তরের অসদ্বৃত্তিগুলিই তাঁহার শুদ্ধ-দর্পণরূপ নির্ম্মল চিত্তে, আমার সতর্কী-করণের নিমিত্ত প্রতিফলিত হইয়াছে"—এইরূপ মনে করিলে সাধকের পক্ষে মঙ্গলজনক হওয়ারই সম্ভাবনা। কাহারও প্রতিই অবজ্ঞাবুদ্ধি পোষণ করা উচিত নহে। ২য় প্রশ্নের উত্তরও দ্রষ্টব্য।

৪র্থ প্রঃ। যে গুরু মন্ত্র-প্রদানান্তর শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-সেবা পাইবার জন্য, রাগানুগীয় ভজন শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, যিনি রাগানুগার 'র'ও অবগত নহেন—এইরূপ স্থলে শিষ্যের কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর। তিনি যদি শাস্ত্রীয় লক্ষণযুক্ত গুরু হয়েন, তবে তাঁহার নিকট হইতে কোনও কারণে রাগানুগীয় ভজন শিক্ষা পাওয়ার অসুবিধা হইলে, অন্য অভিজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকটে ভজন-শিক্ষা করা যায়। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের নিকটে ভজন শিক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য তখন দেশে ছিলেন।

৫ম প্রঃ। অনেকে বলেন, গুরুদেব বিষ দিলে, প্রসাদ বলিয়া দিলে তাহাও বিশ্বাস করিয়া খাইতে হইবে; একথা সত্য কিনা ?

উত্তর। যিনি বাস্তবিক সদ্‌গুরু, তিনি কখনও মহাপ্রসাদ বলিয়া অন্য বস্তু শিষ্যকে দিতে পারেন না—তাহাতে মহাপ্রসাদের প্রতিই অবজ্ঞা করা হইবে। মহাপ্রসাদে শিষ্যের বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেও যদি কেহ এইরূপ করেন, তবে তাহা গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে কোনও সাধারণ বিধি থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না; মহাপ্রসাদে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি এরূপ স্থলে হয়তো তাহা গ্রহণই করিবেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে তাঁহার কোনও শত্রু নাকি মহাপ্রসাদের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল—প্রভুপাদ তাহা জানিয়াও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩য় প্রশ্নের উত্তরও দ্রষ্টব্য।

৬ষ্ঠ প্রঃ। শুনা যায়, অনেক স্থলে শিষ্যের স্ত্রীকে গুরু, প্রসাদী করিয়া তাহার বংশে হরিভক্তির বীজ দান করেন।

উত্তর। ইহা এক অদ্ভুত কথা; কোথাও এরূপ রীতি আছে বলিয়া জানি না। এই উপায়ে হরিভক্তির বীজ সঞ্চারিত করিবার ধারণাও অদ্ভুত। হরিভক্তি কি রক্ত-মাংস-শুক্র-শোণিতের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে ? ইহাকে ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

(৫)

শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ দাস মহাশয় (মেউয়া, চুড়খাই, শ্রীহট্ট) লিখিয়াছেন :—

আমার বাড়ীতে "গৃহপ্রবেশ" উপলক্ষে শালগ্রাম-চক্রে বিষ্ণুকে তুলসীপত্র দান, শিবপূজা ও চণ্ডীপাঠ করান হয়। আমরা গৃহস্থ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী এবং

চিরদিনই বৈষ্ণব-পদরেণু-প্রার্থী। তাই গ্রামের আখড়ার ভেকধারী জনকয়েক বৈষ্ণবকে সেবা করাইতে মানস করিলে, কতক বৈষ্ণব এই বলিয়া আপত্তি করেন যে যে দিবস কোন বাড়ীতে শিবপূজা, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি ব্যাপার হয়, সেই দিবস সেই বাড়ীতে বৈষ্ণবের পক্ষে আহারাদি করা নিষিদ্ধ। যেহেতু তাঁহারা বলেন যে, বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেব-দেবীর দর্শনাদিতে বৈষ্ণবধর্ম নষ্ট হয়। আবার কতক বৈষ্ণব ঐ আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া যথারীতি রন্ধনাদি করিয়া আখড়ার বিগ্রহ স্থাপন-ক্রমে ভোগ দিয়া সেবা করেন। আপত্তিকারী বৈষ্ণবগণ তৎপর দিবস সেবা করেন। এইরূপে দুইটী বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। * * এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দুইটী মতের মধ্যে কোনটী গ্রহণীয়?

উত্তর। বিষ্ণুব্যতীত অন্যদেব-দেবীর দর্শনাদিতেও যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নষ্ট হয়, এরূপ কথা আমরা শুনি নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন বহু শিবমন্দিরে এবং দেবীমন্দিরে গিয়াছেন, শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার উক্তি আছে। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণেই শ্রীবিমলা-দেবী ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির আছেন; ইহাঁদের দর্শনে কখনও কোনও বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ার কথা শুনা যায় নাই। শ্রীবৃন্দাবনে যাঁহারা যায়েন, তাঁহাদের সকলেই শ্রীগোপেশ্বর-মহাদেবের দর্শন করেন—তাতে কাহারও ধর্ম্ম নষ্ট হয় না।

যে বাড়ীতে শিবপূজা হয়, সেই বাড়ীতে পূজার পরের দিন যাঁহারা আহার করিতে পারেন, পূজার দিন আহার করিতে তাঁহাদের আপত্তির হেতু কি থাকিতে পারে, বুঝিতে পারিলাম না। শিবপূজার দরুণ বাড়ী কি অপবিত্র হইয়া যায় বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন? তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, শিব বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।" আর আদ্যাশক্তি ভগবতী শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর-লীলার প্রারম্ভে যশোদা-মাতার গর্ভেই জন্মলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুজা বলিয়াও খ্যাতা; তিনিও পরমা বৈষ্ণবী; উভয়েই কৃষ্ণভক্তি দিতে সমর্থ; তাঁহাদের উপেক্ষায় অপরাধেরই সম্ভাবনা।

সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কোনও বৈষ্ণব যদি স্ব-স্ব নিয়মানুসারে আহারাদি করেন, তাহাকে কোনও অন্তরায়ের সম্ভাবনা নাই।

[এই সমালোচনায় কোনও ত্রুটী অনুগ্রহপূর্ব্বক কেহ দেখাইয়া দিলে কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধিত হইবে।]

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

গোবিন্দ দাসের কড়চার প্রামাণিকতা-বিচার।

১। কড়চার বর্ণনা অনুসারে ইহা কর্ম্মকার-জাতীয় গোবিন্দ দাস কর্ত্তৃক ১৫০৮ হইতে ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিরচিত দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহার বয়স চারশত চৌদ্দ কি পনর বৎসর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এত প্রাচীন পুস্তকখানির প্রারম্ভে ইষ্টবন্দনা-সূচক কোনরূপ মঙ্গলাচরণই নাই। লিপিকর-প্রমাদে উহা বিচ্যুত হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রাচীন কোন গ্রন্থকার কিম্বা লিপিকর আস্তিকাবাদী হইলে তাহার লিখার সর্ব্বপ্রথমে পরমেশ্বরের নাম ও নমস্কারটি লিখিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক, না থাকাই অস্বাভাবিক। ইহা আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার সূচক। গোবিন্দ কর্ম্মকার ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত বলিয়া কড়চায় দৃষ্ট হন কিন্তু; তাহার লিখামুখে ইষ্ট নামটি নাই, তৎপরিবর্ত্তে প্রথমেই রহিয়াছে—"বর্দ্ধমানে কাঞ্চন নগরে মোর ধাম। শ্যামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম॥" এ ধারা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। ইহা কড়চা বহিখানির প্রাচীনত্বের দাবী নাশ করিতেছে।

২। প্রতিপক্ষ বলেন, বহিখানি শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচর কর্ত্তৃক লিখিত সুতরাং সুপ্রাচীন; কিন্তু বহিখানি পাঠ করিলে উহার ভাষা ও রচনাপ্রণালী দৃষ্টে তদ্বিপরীত ভাবই মনে উদিত হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ ৩।৪ শত বৎসর কাল ধরিয়া অসংখ্য লিপিকরের হাতের ভিতর দিয়া, কিম্বা জয়গোপালগণের কৃপায়, বর্ত্তমান আকারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বঙ্গের ঘরে ঘরে এই দুই পুস্তক প্রচারিত। ইহাদের এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। ইহাদের ভাষা এত পরিবর্ত্তিত যে প্রাচী-

নের সমক্ষে আধুনিককে দাঁড় করিলে উহারা যে একই গোত্র-সম্ভূত, তাহা বুঝা অনেক সময় কঠিন হয়। চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন গীতিক-বিগণের পদাবলীর ভিতরে তদপেক্ষাও অধিকতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পদাবলীর গায়কগণ গীতি-সৌকর্য্যের নিমিত্ত পদগুলি ভাঙ্গিয়া সরল ও দেশকালোপযোগী করেন। ইহা তাহাদের করিতেই হয়, নতুবা লোকরঞ্জন হয় না। এইরূপে চণ্ডীদাসের পদগুলি স্থানে স্থানে আমরা বহু পরিবর্ত্তিত আকারে পাইতেছি। উহা যে সাবেকী চণ্ডীদাসী ভাষা হইতে কত পরিবর্ত্তিত, চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" হইতে তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের একটি পদের নমুনা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

দেখিলোঁ প্রথম নিশী, সপন শুনতোঁ বসী
সব কথা কহি আঁরো তোহ্মারে হে।
বসিয়া কদমতলে, সে কৃষ্ণ করিল কোলে,
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়িল।
সে কৃষ্ণ আনিয়া দেহ মোরে হে॥ ইত্যাদি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, গোবিন্দ কর্ম্মকারের কড়চা কি প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারত ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর মতন বহু হস্তস্পর্শে, বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া উহার প্রাচীনত্ব-গন্ধ বর্জ্জিত হইয়া বর্ত্তমান ভাষা ও রচনা-প্রণালীতে আসিয়া পৌছিয়াছে? যদি কড়চা বহুল-প্রচারিত পুস্তক হইত, রামায়ণ, মহাভারত ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর মতন ঘরে ঘরে উহার পঠন, পাঠন ও গায়ন প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহার পরিবর্ত্তন-সম্ভাবন স্বীকার করিতে পারিতাম; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানেই স্বীকার করিতে হইবে যে, কড়চা আদৌ সুপ্রচারিত কিম্বা সামান্য প্রচারিত পুস্তকও নহে। ইহার এ পর্য্যন্ত একটী বই দুইটী সংস্করণ হয় নাই। তাহাও ৩০ বৎসর পূর্ব্বে। আর সমগ্র বঙ্গদেশে ইহার কোন প্রাচীন পুঁথি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" লিখক বহু আহ্বান সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত কড়চার প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কড়চা-প্রকাশক ৺জয়গোপাল গোস্বামীর হাতে ইহার কোন প্রাচীন পুঁথি ছিল, ইহা কোনরূপেই প্রমাণিত হইতেছে না।

এ অবস্থায়ও কি বলিব গোবিন্দ-কর্ম্মকারের কড়চার ভাষার আধুনিকত্ব লিপিকর-বাহুল্যে সঞ্জাত হইয়াছে ? কখনই নহে।

এক্ষণে কড়চার ভাষার নমুনা প্রদর্শিত হইতেছে। পাঠকগণ বিচার করুন, ইহা আধুনিক কবির আধুনিক ভাষা ও কবিত্ব কি না। নীলগিরি-বর্ণনা, কড়চা পৃঃ ১২৬—

কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরি রাজে।
ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়।
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥
বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আরোহিয়া।
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥
ঝর্ ঝর্ শব্দে পড়ে ঝরণার জল।
তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতুহল॥
পর্ব্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই।
নবীন নবীন শোভা দেখিবারে পাই॥ ইত্যাদি।

এই ভাষা ও রচনা-প্রণালী ৪১৪ বৎসর পূর্ব্বের হওয়া কতদূর সঙ্গত ও স্বাভাবিক বঙ্গভাষার, সুধী পাঠকগণ বিচার করুন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "নীলগিরির বর্ণনাটী আধুনিক কবির রচনার ন্যায় সরল ও সুন্দর ভাবে গ্রথিত।" আমরা কিন্তু আধুনিক কবির রচনাই ইহাতে জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাই। আধুনিক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব-শতক' হইতে নিম্নলিখিত ছত্র কয়টি উক্ত কবিতাংশটির সহিত পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করুন, তাহা হইলে কোন্‌টি কোনটির সাদৃশ্যে রচিত বুঝিতে কিছু মাত্র কষ্ট হইবে না।

"ঝর্ ঝর্ করিতেছে প্রেমাশ্রু পতন।
ভ্রমে ভাবে তুহিনের পাত নরগণ॥"
"রঞ্জিত বিবেকাঞ্জনে যাহার নয়ন।
সে-ই পায় সে পুরের দ্বার দরশন॥"

নিরখি নয়নে আমি নিরখি নয়নে॥"
"মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে।
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে॥"—শত্রুঞ্জয়শতক।

সুতরাং ভাষার ভিতর দিয়া গোবিন্দের কড়চার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা ফলবতী হয় না।

৩। কড়চার প্রথম পৃষ্ঠায় গোবিন্দ লিখিতেছেন,—

"চৌদ্দশ ত্রিশ শকে বাহিরেতে যাই।
অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই॥
ক্রমে পহুছিনু আমি কাটোয়ার ধাম।
সেথা আমি শুনিলাম শ্রীচৈতন্যের নাম॥"

বহিখানি গোবিন্দ-কর্ম্মকার কর্ত্তৃক লিখিত রোজনাম্চা (diary) বলিয়া প্রতিপক্ষ বলিতেছেন। গোবিন্দ ১৪৩০ শক অর্থাৎ ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে গৃহ হইতে বাহির হইয়া কাটোয়া আসিলেন এবং তথায় শ্রীচৈতন্যের নাম শুনিলেন। কাটোয়ার প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে জানা যায় যে, উহার প্রাচীন নাম ছিল কাঞ্চননগর। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পর উহা কণ্টকনগর বা কাটোয়া নামে অভিহিত হয়। আর সন্ন্যাসকালীন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রভুর সন্ন্যাস ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা। কিন্তু গোবিন্দ ১৫০৮ খৃষ্টাব্দেই কাটোয়া আসিয়াছেন এবং তথায় শ্রীচৈতন্য-নাম শুনিয়াছেন, সুতরাং রোজ্‌নাম্চা হিসাবে গোবিন্দ-কর্ম্মকারের এই দুইটি কথাই সর্ব্বৈব মিথ্যা।

৪। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসের সংক্রান্তি-দিবসে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গোবিন্দের বর্ণনা অনুসারে গোবিন্দ (কর্ম্মকার) ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে প্রভুর সহিত মিলিত হন। ঐ কালে গোবিন্দ চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত-স্বরূপে যাহাকে যাহাকে দেখিয়াছেন, তাহাদের নাম করিতেছেন যথা, কড়চা পৃঃ ৭—

অদ্বৈত আচার্য্য আর স্বরূপ শ্রীবাস।
আচার্য্যের দুই পুত্র অচ্যুত কৃষ্ণদাস॥
মুকুন্দ মুরারিগুপ্ত আর গদাধর।

নরহরি বিদ্যানিধি শেখর শ্রীধর ॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত আরো দুই চারিজন।
যাহাদের সঙ্গে হয় গোপনে ভজন ॥

এস্থলে আমরা ৩টি নাম লইয়া বিচার করিব। স্বরূপ, অচ্যুত ও কৃষ্ণদাস। স্বরূপের পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। স্বরূপ একটি সন্ন্যাসের নাম। যাহারা সন্ন্যাস লইয়া যোগপট্ট গ্রহণ না করেন, তাহাদের নাম স্বরূপ হয়। পুরুষোত্তম চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের সংকল্প শ্রবণ করিয়া সংসারে বীতরাগ হইয়া কাশীতে চলিয়া যান এবং তথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ইহার সন্ন্যাসের পূর্ণ নাম স্বরূপ-দামোদর। চৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভ্রমণ শেষ করিয়া ১৫১১ খৃষ্টাব্দের মাঘমাসে নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে স্বরূপ-দামোদর ঐ সংবাদ অবগত হইয়া পুরীতে আসিয়া প্রভুর সহিত পুনর্ম্মিলিত হন। এই মিলন ১৫১২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা বলিয়া ধরিতে পারা যায়। এই সময়ে তাঁহার সন্ন্যাসের নাম স্বরূপ-দামোদর প্রথম প্রকাশ ও প্রচার হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা এই গোবিন্দ-কর্ম্মকারের কড়চায় অর্থাৎ তাহার লিখিত রোজ্‌নামচায় ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের বিবরণের মধ্যেই স্বরূপের নাম পাইতেছি। অথচ পুরুষোত্তম সন্ন্যাস লইয়া স্বরূপ হইলেন ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁহার স্বরূপ নাম প্রচার হইল ১৫১২ খৃষ্টাব্দে। ইহা কতকটা রাম জন্মিবার পূর্ব্বে রামায়ণ লিখার মত বিস্ময়কর মনে হয়। কড়চার রচনাকাল ইহার স্ব-বর্ণনা অনুসারে ১৫০৮ হইতে ১৫১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহাতে গোবিন্দ কর্ম্মকারের চৈতন্যদেবের সঙ্গী হওয়া, কিম্বা গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক কোন শ্রীচৈতন্য-সঙ্গী কর্ত্তৃক এই কড়চা লিখিত হওয়া—এই দুইয়ের অন্যতর বিবরণ একান্ত অসত্য প্রতীয়মান হয়।

তৎপর অচ্যুতের কথা। অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতের জন্ম ১৪১৪ শকে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের জন্মের ৭ বৎসর পরে। সুতরাং সন্ন্যাসের এক বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রভুর বয়স ২৩, তখন অচ্যুতের বয়স ১৬, এই ১৬ বৎসরের বালকের সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী হওয়া বিচিত্র বটে। তৎপর অচ্যুতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস তাহা হইতে আনুমানিক ৪।৫ বৎসরের ছোট ধরিলে

এই ১১।১২ বৎসরের বালকের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী হওয়া অত্যধিক বিচিত্র—এমনকি মিথ্যা বলিতে স্বভাবতঃ আমাদের কোন দ্বিধা হয় না।

৫। আরও বিশেষ কথা—"যাহাদের সঙ্গে হয় গোপনে ভজন," (কড়চা পৃঃ ৭)। শ্রীচৈতন্য-প্রভু উহাদের সহিত এবং আরও কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া গোপনে ভজন করিতেন। নবদ্বীপে অবস্থানকালে তাঁহার ধর্ম্মচর্য্যায় এই "গোপনে ভজন" ব্যাপারটি কি, তাহা আমরা বুঝি না। প্রভুর অন্ত্যলীলায় রাধাভাবে গাঢ় অভিনিবেশ বশতঃ তিনি নির্জ্জনে গম্ভীরায় অবস্থান করিতেন। তখন স্বরূপ ও রামানন্দ প্রভুর সন্নিকটে থাকিয়া সময়োচিত পদ ও আলাপ দ্বারা তাঁহার ভাবের পুষ্টিসাধন করিতেন। ইহা আমরা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাই। শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ ব্যাপার যাহা কিছু, তাহা আমরা ইহাই বলিয়া জানি। কিন্তু নবদ্বীপে অবস্থানকালে প্রভুর শ্রীবাস কিম্বা চন্দ্রশেখরের ভবনে কীর্ত্তন-লীলায় আমরা এমন কিছু পাই না, যাহাকে গোপন ভজন সম্বন্ধে অভিহিত করা যায়। অবশ্য ভক্তিবিদ্বেষী, নিন্দুক পাষণ্ড ব্যক্তির কীর্ত্তনাঙ্গিনায় প্রবেশ-অধিকার ছিলনা; তাহারা শুধু সাধনার ব্যাঘাতই জন্মাইত; কিন্তু কীর্ত্তনাঙ্গিনায় ভক্তমণ্ডলীর ভিতরে তাঁহার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ছিল না এবং অন্তরঙ্গ গুটি কতক লোক লইয়া গোপন ভজনও কিছু ছিলনা। বিশেষতঃ সন্ন্যাসের এক বৎসর পূর্ব্বে যখন গোবিন্দ-কর্ম্মকার প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছে, তৎকালে জগাই-মাধাই উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, কাজী-দমন হইয়াছে, সর্ব্ব নবদ্বীপময় শ্রীহরি-কীর্ত্তন প্রচার হইয়া গিয়াছে। তৎকালে তাঁহার হরিনাম-কীর্ত্তনটিকে কিছুতেই 'গোপন ভজন' বলা যাইতে পারে না।

আমাদের কিন্তু আর একটী মনে হয়। আমরা অবগত আছি, আমাদের দেশবাসী সহজিয়া মতের নরনারীগণ অতিশয় গোপনে ভজন করেন। তাহারা নিশীথে সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি সংগোপনে অন্তরঙ্গ জনগণকে লইয়া তাহাদের ভজনপ্রণালী অনুসরণ করেন। তাহাদের সম্মিলন ও ভজন ব্যাপারটি নীতি-ধর্ম্মের ব্যভিচার ঘটায় বলিয়া উহা সংগোপনে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের এই কড়চাকারকের "গোপনে ভজন" কথায় সেই বৌদ্ধ সহজ-যানের প্রণালীটি ধ্বনিত হইতেছে কিনা, সুধিগণ বিবেচনা করুন। আর ঈদৃশ আচরণ

কথাটাতে সহজেই মনে হয়—পুস্তকখানি সহজিয়া কিম্বা বাউলিয়া মতের ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক লিখিত।

৬। গোবিন্দ দাসের কড়চায় লিখিত আছে—গোবিন্দ শ্রীচৈতন্য-প্রভুর সহিত একই সময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা কড়চাপৃঃ ২৮—"প্রভুর সন্ন্যাসকালে ধরেছি কৌপীন। অহঙ্কার তেজিয়া হয়েছি অতি দীন॥" সংসারাশ্রম-ত্যাগী সন্ন্যাসী তাহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম, ধাম ও পরিচয়াদি কখনো ব্যক্ত করেন না। ইহা সন্ন্যাসের রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সন্ন্যাসী গোবিন্দ তাহার কড়চার প্রারম্ভেই অনায়াসে লিখিয়াছেন, "বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম। শ্যামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম॥ অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।" শুধু ইহাই নহে। "আমার নারীর নাম শশীমুখী হয়।" ইত্যাদি। ইহাতে সহজেই মনে হয়, গোবিন্দ নিতান্তই বিকৃতমতি ছিলেন, না হয় সন্ন্যাসের রীতি-নীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি-বিশেষ এই পুস্তক খানি লিখিয়া উহা গোবিন্দের নামে চালাইয়া দিয়াছে।

৭। তদুপরি আর একটি কথায় আমরা সমধিক বিস্মিত হই। কড়চার ২৮ পৃষ্ঠায় গোবিন্দ বলিতেছে, সন্ন্যাসের পরে ভক্তগণসহ বর্দ্ধমানে পৌছিবার পর, "মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে। চল যাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে॥" চৈতন্যদেব গোবিন্দকে লইয়া তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য যাইতে চাহিতেছেন। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং সন্ন্যাসী, গোবিন্দও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাশ্রমের (গার্হস্থ্যাশ্রমের) আত্মীয়-স্বজনগণের সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া ধর্ম্ম ও রীতিবিরুদ্ধ। উহাতে সন্ন্যাস-ব্রতের বিঘ্ন সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় চৈতন্যদেব গোবিন্দকে লইয়া তাহার গৃহে গমন করিতে চাহিতেছেন, ইহা চৈতন্য-চরিতের সহিত কিছুতেই সামঞ্জস্য হয় না। সন্ন্যাসের কালে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ ও দেহস্মৃতিশূন্য চৈতন্যদেবের কাহারও গৃহে আতিথ্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ এরূপ অস্বাভাবিক। তৎপরে কড়চার বর্ণনা-অনুসারে গোবিন্দের গৃহ-সন্নিধানে যাহা ঘটিয়াছিল—গোবিন্দের স্ত্রী গোবিন্দকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে—"তত্ত্বকথা বলি প্রভু তাহারে বুঝায়।" অতুলনীয় রূপবান্ নবীন যুবক কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। এহেন সন্ন্যাসী নিঃসঙ্গী হইয়া

তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য আবার একটি ভৃত্য সঙ্গে লইয়াছেন, এবং তজ্জন্য আবার সন্ন্যাসের রীতি নীতি ভুলিয়া সেই ভৃত্যের যুবতী স্ত্রীকে নানা কথা কহিয়া বুঝাইতেছেন, ইহা শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেননা। সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম প্রতিপালনকারী শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থের পরিচয় এই—তিনি সন্ন্যাসের পরে স্ত্রীলোক-সম্ভাষণ কখনও করেন নাই—এমন কি, স্ত্রী শব্দটিও উচ্চারণ করেন নাই। "স্ত্রী" শব্দের পরিবর্ত্তে বলিতেন "প্রকৃতি।" ইহা চৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়। যথাঃ—শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবত হেথায়। মোর অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায়॥ (অন্ত্য, ১২শ পরিচ্ছেদ)

সন্ন্যাসের কালে তাঁহার ভাববিহ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শত শত লোক অশ্রুসিক্ত ও নির্ম্মল হইয়াছিল। ইহা বর্ণন করিবার জন্য তৎকালে শত শত করুণ-রসাত্মক গীতির উদ্ভব হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রেমবিহ্বল শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন-অভিমুখে প্রধাবিত হন এবং অর্দ্ধবাহ্য সমাধির অবস্থায় ৫ দিন রাঢ়-দেশে ভ্রমণ করেন। এই অদ্ভুত ভ্রমণ-ব্যাপার শ্রীচৈতন্যের জীবনে এক চির প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গোবিন্দ-কর্ম্মকার প্রভুর সঙ্গে তাবৎকাল রহিয়াছে বলিয়া বর্ণন করিয়াছে, অথচ এ ঘটনার কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এত কতকগুলি অস্বাভাবিক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যাহা বিশ্বাস করিতে কাহারও কখনো প্রবৃত্তি হইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ।

মহাভাব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দিব্যোন্মাদ—প্রতিজল্প।

শ্রীকৃষ্ণ কখনও দ্বন্দ্ব-(মিথুনী)-ভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার নিকটে যাওয়া উচিত নহে—এই ভাবের উক্তি যাহাতে থাকে এবং যাহাতে দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও করা হয়, তাহাকে প্রতিজল্প বলে।

তুষ্টাজল্পবন্ধভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নাহে তাহুদাহৃতম্।
দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র সঃ প্রতিজল্পকঃ॥
—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৫২।

* * * * * * * * * * * *

শ্রীরাধা নিজের মনের ভাবেই বিভোর ; তাঁহার নিকটবর্ত্তী কোনও বস্তুর প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য নাই ; তাই তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে অবস্থিত ভ্রমরটিকেও তিনি লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন না ; তিনি মনে করিলেন, ভ্রমর বুঝি চলিয়া গিয়াছে। অথবা, এমনও হইতে পারে ভ্রমরটি নিজেই হয় তো ক্ষণেকের জন্য ভানু-নন্দিনীর চরণসান্নিধ্য হইতে একটু দূরে উড়িয়া গিয়াছে, তাই তিনি তাহাকে দেখিতে পায়েন নাই। যে কারণেই হউক, শ্রীরাধা মনে করিলেন, অথবা দেখিলেন যে, ভ্রমর সেখানে নাই ; অমনি তিনি মনে করিলেন, "ভ্রমর চলিয়া গিয়াছে—আমার রূঢ়-উক্তিতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াই বোধ হয় চলিয়া গিয়াছে ; কোথায় গেল ? ভ্রমর নিশ্চয়ই মথুরায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রভুর নিকটে —কৃষ্ণের নিকটে। মথুরায় গিয়া ভ্রমর নিশ্চয়ই কৃষ্ণের নিকটে আমার দুর্ব্যবহারের সমস্ত কথাই বলিয়াছে। হায়! হায়! আমি কি মূর্খ! কেন ভ্রমরকে কটু বাক্য বলিলাম ? ভ্রমরের মুখে আমার নিষ্ঠুর-আচরণের কথা শুনিয়া আমার প্রাণবল্লভের মনে কতই না কষ্ট হইবে ? তাঁহার কোমল প্রাণে তিনি কতই না দুর্ব্বিসহ আঘাত পাইবেন ? পাইবেনই বা বলি কেন ? ভ্রমরের কথা শুনিয়া তিনি খুবই কষ্ট পাইয়াছেন, প্রাণে খুবই আঘাত পাইয়াছেন ; তাই তো তিনি আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন—ভ্রমরকে আর পাঠাইতেছেন না।"

কলহান্তরিতার ভাবে এইরূপ মনে করিয়াই ভানু-নন্দিনী আবার ভাবিলেন—'না না, তিনি আমার প্রতি রুষ্ট হয়েন নাই ; রুষ্ট তিনি হইতে পারেন না ; আমার আচরণের কথা ভাবিলে তাঁহার রুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বটে ; কিন্তু তাঁহার চিত্তের কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, তিনি রুষ্ট হয়েন নাই। আমার প্রাণবল্লভ যে প্রেমের সমুদ্র ; রৌদ্রে, উত্তাপে সমুদ্রের জল যেমন কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না বরং অনুকূল বাত-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়া থাকে—আমার বঁধুর প্রেমও তদ্রূপ—নানাবিধ

প্রতিকূল ঘটনায়ও তাঁহার প্রেমের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় না; অনুকূল ঘটনায় বরং সর্ব্বদাই মনঃপ্রাণ-মুগ্ধকর বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া থাকে—তাঁহার প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যে সময় সময় বরং প্রতিকূল ঘটনায়ও তাঁহার প্রেম-সমুদ্রে সর্ব্বাত্ম-স্নপন-বৈচিত্রী-লহরী খেলা করিতে থাকে। আমার প্রতি রুষ্ট তিনি হয়েন নাই—ভ্রমরের মুখে আমার নিষ্ঠুর আচরণের কথা শুনিয়াও রুষ্ট হয়েন নাই; রুষ্ট হওয়ার মতন স্বভাবও তাঁহার নয়; তিনি পরম দয়াল, পরম উদার, পরম প্রেমিক—তিনি সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণের আকর। তিনি রুষ্ট হইতে পারেন না—তিনি রুষ্ট হয়েন নাই; পরম-প্রেমিক বঁধু আমার শীঘ্রই ভ্রমরকে পাঠাইবেন—হা বিধাতঃ, তুমি তাহাই কর— আমার বঁধু যেন তাঁহার দূতরূপে শীঘ্রই ভ্রমরকে আবার আমার নিকট পাঠায়েন।"

ভানু-নন্দিনী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, আর উৎকণ্ঠিতচিত্তে ভ্রমরের পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় ভ্রমরটী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল; অমনি অত্যন্ত আদরের সহিত তিনি ভ্রমরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিম্
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্ব-পার্শ্বম্
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে॥

—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৫৩।

"হে মধুকর! হে প্রিয় সখা! হে আমার প্রিয়তমের সখা! তুমি আসিয়াছ! আমি তীক্ষ্ণ কটুবাক্য-বাণে তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছি, তথাপি তুমি পুনরায় এই দুর্ম্মুখীর নিকটে আসিয়াছ! জানিলাম, তুমি অত্যন্ত উদার, তোমার সদ্‌গুণের তুলনা বিরল; নিজের সাদ্‌গুণ্যবশতঃই তুমি আমার অপরাধকে গ্রাহ্য না করিয়া পুনরায় আমার নিকটে আসিয়াছ। আমি জানি, আমার প্রিয়তম আমার প্রতি অত্যন্ত প্রেমবান্; তোমার মুখে আমার কটূক্তির কথা শুনিয়াও, আমার কোটি কোটি অপরাধকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াও তাই বুঝি তিনি তোমাকে পুনরায় আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন? তুমি নিজেও পরম উদার; তাতে আবার আমার প্রতি পরম-প্রেমবান বঁধু তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমার সাধ্যানুসারে আমি তোমার বাক্য পালন করিতে

চেষ্টা করিব। বল ভ্রমর, তোমার কি প্রার্থনা আছে, আমি তোমার কি অনুরোধ রক্ষা করিব ?"

এমন সময় ভ্রমরটী একবার গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের উদারতা, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত ভানু-নন্দিনীর চিত্তে সম্ভবতঃ বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল; তাই ভ্রমরের গুন্ গুন্ শব্দ শুনিয়া তিনি মনে করিলেন, ভ্রমর যেন বলিতেছে—"রাধে, তোমার মথুরাগমনই আমার প্রার্থনীয়; ইহাই আমার অনুরোধ; দয়া করিয়া আমার এই অনুরোধটী রক্ষা কর।"

ভ্রমরের এইরূপ উক্তি মনে করিয়া ভানু-নন্দিনী বলিলেন—"নয়সি—নাও ভ্রমর, আমাকে মথুরায় লইয়া যাও, আমি মথুরায় যাইব।" কিন্তু মথুরায় যাওয়ার কথা বলিবা মাত্রই প্রেমের অনির্ব্বচনীয় গতিবশতঃ, মথুরা-নাগরীদের কথা স্মরণ করিয়া ভানু-নন্দিনীর চিত্তে অসূয়ার উদ্রেক হইল; অমনি তিনি আবার বলিলেন—"না ভ্রমর, আমার মথুরায় যাওয়া হইবে না; কেন আমাকে মথুরায় নিবে ? সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই পুরস্ত্রীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন; এখানে দূরে থাকিয়া আমরা তাহা শুনি মাত্র, শুনিয়া আমাদের মনের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, সেইস্থানে যাইয়া চক্ষুর সাক্ষাতে তাঁহার ঐ অবস্থা দর্শন করিলে নিশ্চয়ই আমার মানের উদয় হইবে—তাহাতে তাঁহার কষ্টই হইবে। তাই বলি ভ্রমর, আমাকে মথুরায় নিয়া কাজ নাই, আমার মথুরায় যাওয়া হইবে না।"

ভ্রমরটী আবার গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া উঠিল; শ্রীমতী মনে করিলেন, সে যেন তাঁহারই কথার উত্তর দিতেছে—যেন বলিতেছে :—"রাধে! কেন বৃথা সন্দেহ করিতেছ ? মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ মাথুর-নাগরীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন না—তিনি সেখানে সর্ব্বদা একাকীই থাকেন; একথা আমি তোমাকে শপথ করিয়া বলিতে পারি।"

এইরূপ মনে করিয়া ভানুনন্দিনী বলিলেন—"ভ্রমর! তুমি যে ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছ, তাহা বলিতে পারি না; তবে ইহা নিশ্চয় যে, তুমি গূঢ় রহস্যটি বুঝিতে পার নাই—তুমি নিতান্ত সরল-প্রকৃতি,তাহা বুঝিবেই বা কিরূপে ? তুমি যখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছ, তখন হয়তো কোনও

মথুরা-নাগরী তাঁহার নিকটে ছিলেন না; কিন্তু তুমি নিতান্ত সরল-হৃদয় না হইলে লক্ষ্য করিতে পারিতে যে, আর একটী নাগরী তাঁহার নিকটে ছিলেন; তিনি অত্যন্ত রূপসী এবং শ্রীকৃষ্ণে বিশেষ অনুরক্তা; শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত; তিনিও এক মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণও এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন না; তবে তাঁহাদের এই নিত্য-সঙ্গের কথা সাধারণতঃ কেহই জানিতে পারে না। এই রমণীটী আর কেহ নহেন—ইনি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী স্বয়ং লক্ষ্মী; শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বনাশা-রূপে আকৃষ্ট হইয়া বাঁধা পড়িয়াছেন। তিনি আমাদের মত সাধারণ-মানবী নহেন, তিনি দেবী; তাই তাঁহার ইচ্ছামত যে কোনও রূপ তিনি ধারণ করিতে পারেন। যখন অন্য রমণী বা অন্য কোনও লোক নিকটে থাকে, তখন তিনি, অপরের চক্ষুতে ধূলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, একটী ক্ষুদ্র স্বর্ণ-রেখার রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে বিরাজ করেন; তাই কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারে না। আর যখন নিকটে কেহ থাকে না, তখনই তিনি অপূর্ব্ব-রূপ-যৌবন সম্পন্না রমণী-রত্নরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস করিতে থাকেন। তাই বলিতেছি, ভ্রমর, শ্রীকৃষ্ণের দ্বন্দ্ব-ভাব দুর্জ্ঞেয়—আমার মথুরায় যাওয়া হইতে পারে না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

বেদান্তে ঈশ্বরের লীলাবাদ।

শিশুর শরীর ক্রমশঃ বাড়ে, পুষ্ট হয়, শক্তিশালী হয়; একটি একটি দল ফুটে' পদ্ম শতদল হয়; সেরূপ বেদান্তে ভগবানের লীলাবাদ ও শঙ্করের যুগ হইতে আরম্ভ করে' ক্রমশঃ বিকশিত, বর্দ্ধিত, পুষ্ট ও শক্তিশালী হইয়াছে; সুন্দর হইয়াছে। তাহাই এ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

সুপ্ত বেদান্তকে প্রথম জাগাইয়া তুলিয়াছিল আচার্য্য শঙ্করের নূতন সুর—যে সুরের উন্মাদনায়, যে সুরের মোহনতায়, যে সুরের সজীবতায়, জড় স্বার্থশীল (যে কেবল আপন সুখ খুঁজে' বেড়াইত) কর্ম্মের জাকজমক শুষ্ক ও নিস্তেজ

হইয়াছিল, জন্মের মত ভারতে নাস্তিকের নাস্তিকতা তলাইয়া গিয়াছিল; সমস্ত ভারতকে জাগাইয়া দিয়াছিল, আকৃষ্ট করিয়াছিল—আধ্যাত্মপথে নিজের চিরন্তনী সম্পত্তির দিকে। যদি বেদান্তবাদের আদিগুরু শঙ্কর, সে সুরের মোহনলায় জগৎকে না নাচাইত, তবে বেদান্ত নিয়া এতটা নাড়াচাড়া গবেষণা হইত কিনা, খুবই সন্দেহ ছিল। তাই বেদান্তের সিদ্ধান্তরাজি প্রায়শঃ দেখা যায়—হয় তো আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্তের পরিস্ফুট অবস্থা, না হয়, আচার্য্য শঙ্করের মতের খণ্ডন। ঈশ্বরের লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে আচার্য্য-শঙ্করের মতই পরবর্ত্তী বেদান্তাচার্য্যেরা স্ফুটতর করিয়াছেন। লীলাবাদে আচার্য্য শঙ্করের সহিত অন্যান্য বেদান্তাচার্য্যগণের অনৈক্য খুব অল্প।

প্রথমতঃ ঈশ্বরের লীলাবাদ-সম্বন্ধে আমাদের যাহা সন্দেহ হয়, তাহাই উত্থাপিত করিব। তারপর, এ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর এবং অন্যান্য বেদান্তাচার্য্যেরা কি বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ সন্দেহ উঠে—ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহাতে নিত্যই অনন্তশক্তি বিকশিত; শুধু তিনি শক্তিশালী নহেন, তিনি আত্মারাম, আপ্তকাম এবং নিত্যতৃপ্ত। তাঁর কোনও অভাব নাই; তিনি সতত নিজের স্বরূপস্থ আনন্দে তৃপ্ত হইয়াই আছেন।

জীব মাত্রেই সতত অতৃপ্ত এবং অপূর্ণ। তাই, অপূর্ণ বাসনার পরিপূরণের জন্যই জীবের কার্য্য করা। কিন্তু ভগবান তো তেমন নহেন, তিনি সদাসর্ব্বদা স্বরূপানন্দে বিভোর, তাঁর কার্য্য করিবার কোনও প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায়না। শাস্ত্রকারেরা বলেন, "অপূর্ণস্য নিজপূর্ত্ত্যর্থা চেষ্টা কর্ম্ম।" পরন্তু নিত্যপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত ভগবান, তাঁর ক্রিয়ার চেষ্টা কোথা হইতে? তিনি কেনই বা সৃষ্টি-স্থিতি-পালন করেন। তাঁর কেনই বা মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার গ্রহণ করা। পুরাণের কথা দূরে থাকুক, বেদেও তো অবতারের কথা সৃষ্টি প্রভৃতির কথা শুনা যায় (১)। তিনি জীবের জন্যই ঐ সমস্ত লীলা বিস্তার করেন, ইহাও বলা যায় না। যেহেতু পরম দয়াল ভগবানের পক্ষে দুঃখপ্রদ বৈষম্যময় এ সংসারের সৃষ্টি করা ছাড়া না করাই বরং যুক্তিসঙ্গত।

(১) বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রাবোচং যঃ পার্থিবান্যপি বিমমে রজাংসি, যোঽস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণ স্ত্রেধোরুগায়স্তা বিষ্ণবে। (ঋগ্বেদ)।

এই সকল প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটার উত্তর দেওয়ার জন্য মহামুনি বেদব্যাস, ব্রহ্মসূত্রে লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ (২।১।৩৩) প্রভৃতি চারিটি সূত্রের অবতারণা করেন। ঐ সকল সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করের নিম্নোক্ত অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। "ঈশ্বর একটি পরম নির্লিপ্ত বস্তু; এ বিশ্বটি তাঁরই সৃষ্ট বটে, পরন্তু খুব নির্লিপ্তভাবে। বিশ্বের সৃষ্টি করিতে তাঁকে চিন্তা করিতে হয় নাই, খাটিতেও হয় নাই। আমরা যেমন নিতাই শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি, তাতে কোনও চিন্তা কিম্বা প্রয়াস করিতে হয় না; খাইতে বসিতে শুইতে অনায়াসেই হইয়া যায়; সেরূপ ভগবানের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি অনবধানেই সম্পাদিত হইয়া যায়।"

এখানে এরূপ প্রশ্ন করা যায় না যে, এত বড় সংসারটা শ্বাস-প্রশ্বাসের মত কিরূপে ভগবান হইতে প্রাদুর্ভূত হয়? অন্ততঃ কিছুটা প্রয়াসেরও তো প্রয়োজন। "একীভূত বহু পিপীলিকার একটা অন্ন নিতেই হাঁপাইয়া পড়িতে হয়; আর একজন মানুষ পাঁচসের চাউলের অন্ন অনায়াসে নিয়া যাইতে পারে। অসীম শক্তিশালী হইয়াছেন ঈশ্বর; তাঁর পক্ষে এ জগৎটা শ্বাস প্রশ্বাসের মত অনায়াস-সাধ্য হওয়াটা অসম্ভব নহে। আর জীবগণ স্ব-কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ উচ্চ নীচগতিকে প্রাপ্ত হয়। যেমন মেঘ জলে স্থলে সর্ব্বস্থানেই সমভাবে জল বর্ষণ করে, ক্ষেত্রানুসারে বিবিধ ফল উৎপত্তি হয়, সেরূপ সর্ব্বজীবেই ভগবানের সমদৃষ্টি; তাঁহারা স্ব-স্ব কর্ম্মফলানুসারে বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে ভগবানের কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই।"

আচার্য্য শঙ্করের ভগবান হইতে রামানুজাচার্য্যের ভগবানের অনেক পৃথকত্ব আছে, তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। তবে লীলাবাদ সম্বন্ধে যতটুকু প্রভেদ, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। শঙ্কর যেমন বলেন, ভগবানের

তস্মিন্ প্রজাপতি র্বায়ুর্ভূত্বা চরৎ, স ইমামপশ্যৎ, তং বরাহো ভূত্বাহরৎ।
(তৈত্তরীয়সংহিতা)।

স বরাহোরূপং কৃত্বোপন্যমহত স পৃথিবী মধ অচ্ছিৎ।
(তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ)।

প্রোবাচ ভার্গবেয়ো বিশ্বান্তরায়ঃ। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)।

অনুসন্ধান থাকে না জগৎ-সৃষ্টির সময়ে, রামানুজ তা' বলেন না। তিনি বলেন, সৃষ্ট্যাদি-সময়ে ভগবানের বিলক্ষণ অনুসন্ধান থাকে, ভগবান জড় কিম্বা অল্পজ্ঞ নহেন যে তাঁর অনুসন্ধান থাকিবে না; তিনি চেতন এবং সর্ব্বজ্ঞ। তাই ভগবানের জগৎ-সৃষ্ট্যাদি রাজার কন্দুক-খেলার মত। যেমন, রাজার কোনও অভাব নাই, তিনি তৃপ্ত এবং পূর্ণ, তথাপি দেখা যায়, শুধু কৌতুক-বশতঃ তিনি হয় তো খেলিতে থাকেন, ঐ খেলাতে তাঁহার কোন লাভ নাই। সেরূপ, ভগবান্ নিত্যতৃপ্ত, নিত্যপূর্ণ হইলেও কৌতুকবশতঃ সৃষ্ট্যাদি-ক্রিয়া করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহাতে তাঁহার কোনও আবশ্যকতা নাই, কিম্বা সৃষ্টি-কার্য্য তাঁহার পক্ষে আয়াসসাধ্য নহে। অন্যান্য অংশে রামানুজের লীলাবাদ আচার্য্য শঙ্করের সহিত প্রায়শ সমান।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলেন, পরিপূর্ণ, পূর্ণকাম যে ভগবান্, তাঁরও সৃষ্ট্যাদি-ক্রিয়াতে যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহা লীলাই (২) বুঝিতে হইবে—অপূর্ণ অবস্থার পরিপূরণের জন্য বাসনাসম্ভূত কর্ম্ম নহে। যেমন কোনও কারণ-বশতঃ অত্যন্ত আনন্দিত ব্যক্তির নৃত্য গান প্রভৃতি ফলানুসন্ধি-রহিত অনায়াসসাধ্য ক্রিয়া দেখা যায়; তদ্রূপ, স্বরূপস্থ আনন্দের উচ্ছ্বসনে ভগবানের সৃষ্ট্যাদি-ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি; সুতরাং তাহা শুধু লীলা, আয়াসসাধ্য প্রয়োজনযুক্ত কর্ম্ম নহে। রামানুজাচার্য্যের প্রদর্শিত রাজার কন্দুক-খেলায় রাজার স্বীয় আনন্দ-বাঞ্ছা দেখা যায়।

তাই নারায়ণ-সংহিতায় বলা হইয়াছে যে,

> সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্যতু
> কুরুতে কেবলানন্দাদ্ যথা মর্ত্তস্য নর্ত্তনম্॥
> পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ
> মুক্তাঽপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমুতস্যাখিলাত্মনঃ
>
> গোবিন্দভাষাধৃত শ্লোক॥

"হরি সৃষ্ট্যাদি-কর্ম্ম প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া করেন না, পরন্তু মানুষ যেমন আনন্দোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করেন, সেরূপ, ভগবান, শুধু আনন্দ-বশীভূত হইয়া

(২) হর্ষেণ স্বপ্রয়োজনমনভিসন্ধায় অনায়াসসাধ্যা যা ক্রিয়া সা লীলা।

সৃষ্ট্যাদি-ক্রিয়া করিয়া থাকেন। যিনি পূর্ণকাম পূর্ণানন্দ, তাঁর প্রয়োজনীয়তা-বুদ্ধি কোথা হইতে আসিবে? তাঁর চরণাশ্রিত মুক্তগণেরই আবশ্যকতা বুদ্ধি থাকে না; তিনিতো আত্মারামগণেরও অধীশ্বর। তাঁর যে প্রয়োজনীয়তা-বুদ্ধি থাকেনা তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।"

আনন্দোন্মত্ত হইয়া ফলানুসন্ধান-রহিতভাবে ভগবান্ ক্রীড়া করেন বলিয়া তাঁর অসার্ব্বজ্ঞতা-দোষ আপতিত হইতেছে—একথা বলা যায়না। সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ফলানুসন্ধান-রহিত ভাবে কেবল আনন্দোন্মত্তায় তিনি ক্রীড়াও করেন, সর্ব্বদিকে লক্ষ্যও রাখেন। এইজন্য তাঁহার অসার্ব্বজ্ঞতা-দোষ হয়না। তাই শ্রীরূপ-গোস্বামিচরণ লঘুভাগবতামৃতে বলেন, "সার্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ মুগ্ধত্বং সার্ব্বভৌম-মিদং মহঃ।"

• জীব, স্ব-স্ব-কর্ম্মফল-বশতঃ উচুনীচু গতিকে এবং সুখ দুঃখকে প্রাপ্ত হয়, এসিদ্ধান্ত সকলেরই সমান। যেমন সভাপতি যিনি হয়েন, তিনি পক্ষপাত না করিয়া যে পক্ষ দুর্ব্বল, সে পক্ষের দুর্ব্বলতা বলিয়া দেন, ইহাতে সভাপতির বৈষম্যাদি-দোষ ঘটেনা, সেইরূপ ভগবান্ কর্ম্মানুরূপ ফল দেন বলিয়া পক্ষ-পাতিত্ব নির্দ্দয়ত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটেনা।

এখন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মতের প্রতি একটা আশঙ্কা আসিতে পারে যে, আনন্দের উদ্রেক হেতু ভগবানে নিখিল ক্রিয়ার অভিব্যক্তি, নিত্যপূর্ণ-নিত্যানন্দ-স্বরূপ ভগবানে আবার আনন্দের উদ্রেক কোথা হইতে? তাতেই বৈষ্ণবা-চার্য্যগণ বলেন,

ভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইলেও, তিনি সতত-পূর্ণ এবং তৃপ্ত হইলেও, তাঁহার স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী (যে শক্তি-বলে তিনি আনন্দ অনুভব করেন এবং আনন্দ দেন) সম্বন্ধ বৈচিত্রী-বিশেষ ভক্তিতে তাঁর পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও অভাব আছে। নিত্য পূর্ণ হইলেও ভক্তি তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারেন; প্রীতিরস আস্বাদন করিতে তিনি ভাল বাসেন। এটী তাঁর স্বরূপগত স্বভাব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্"॥

"আমি সর্ব্বজীবে সম, আমার কেহ প্রীতির বিষয়ও নাই, দ্বেষের বিষয়ও

নাই, কিন্তু যে আমাকে প্রীতি করে, আমি তাঁদের অনুগ্রাহক অবশ্যই হইয়া থাকি, ইহাতে আমার বৈষম্যদোষ হয়না। অগ্নির নিকট গেলেই যেমন অগ্নি, শীত এবং অন্ধকার নাশ করে, যে অগ্নির নিকট যায়না, তার শীত ও অন্ধকার নাশ হয়না। বস্তুতঃ ইহা অগ্নির বৈষম্যদোষ নহে; অগ্নির নিকটে যে যায়না, তারই দোষ। সেরূপ আমার প্রতি উন্মুখ যে হয়, তা'কে আমি রক্ষা করি; ইহা আমার বৈষম্য-জনিত নহে, ইহা ভক্তগত একটা গুণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

প্রীতিজ আনন্দ, তাঁর স্বরূপগত ও স্বরূপ-শক্তিগত নিখিল আনন্দরাশিকে অভিভূত—তাঁকে (ভগবানকে) পাগল করিয়া তুলে, তাই তাঁর প্রতি উন্মুখ ভক্তের ভক্তিতে তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

ভক্ত-হৃদয়-মন্দির-গতা ভক্তি-প্রেয়সীর শুভ সন্দর্শনে আনন্দময় ভগবানের অনন্তক্রিয়া বিকশিত হইয়া থাকে। উক্ত ক্রিয়া-সমূহকেই লীলা বলে। লীলাতেই ভগবানের আনন্দের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি; এই লীলা তাঁতে বিকাশ পায় বলিয়াই তিনি সবিশেষ; অন্যথা তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব হইয়া পড়েন।

এস্থানে একটা উদাহরণ দিতেছি। যেমন, সমুদ্র সততই জলপূর্ণ, জলাভাব সমুদ্রে কদাপি নাই; অন্য কোন অভাব সমুদ্রের আছে বলিয়াও অনুমিত হয় না; তথাপি সমুদ্রের স্বভাব—চাঁদ দেখিতে সমুদ্র ভাল বাসে। যখন চন্দ্র উদিত হয়, তখন সে পূর্ণ হইয়াও, তৃপ্ত হইয়াও উচ্ছসিত হইতে থাকে; আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া যেন নৃত্য করিতে থাকে। এইটী তাঁর আগন্তুক স্বভাব নহে, নিত্যই এই স্বভাব বিদ্যমান। সেরূপ আনন্দ-সমুদ্র ভগবান নিত্যতৃপ্ত নিত্যপূর্ণ হইলেও ভক্তহৃদ্গত ভক্তিচন্দ্র সন্দর্শনে তাঁর আনন্দরাশি উচ্ছসিত হয়। আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নানাবিধ লীলা বিস্তার করেন। এইটী তাঁর স্বরূপগত ধর্ম্ম, আগন্তুক নহে।

ভক্তি-প্রভাবে আকৃষ্ট ভগবান, ভক্তকে রক্ষা করিতেই অসুর-মারণ প্রভৃতি লীলা করেন, তাহাতে বস্তুতঃ অসুরগণের প্রতি তাঁহার কৃপাই প্রকাশ হইয়া থাকে; ভগবানের হস্তে মৃত হইয়া অসুরগণ শুভমতি ও ক্রমিক উন্নতির পথেই অগ্রসর হয়। যেমন দুষ্ট সন্তানকে শাস্তি দিয়া পিতা ভাল করেন। সেরূপ ভক্ত-রক্ষার জন্য অসুরগণকে বধ করিয়াও প্রকারান্তরে তাহাদের উপকারই করেন।

সৃষ্ট্যাদি-লীলাও ভগবান, ভক্তি-বশীভূত হইয়াই করেন। যখন এ সংসারে সাধক-ভক্তের সাধনের উপযোগ্য সামগ্রীর অভাব ঘটে, তখন সংহার করেন। নূতন সৃষ্টি করিয়া সাধককে সাধন করাইয়া সাধনের উপযোগ্য সামগ্রী দিয়া নিজের পার্শ্বে নেওয়ার জন্যই পুনরায় ভগবানের সৃষ্টিলীলা; এ ভাবে অনাদিকাল হইতে সৃষ্টিসংহার-লীলা চলিতেছে। ইহা দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হইয়া গেল, ভক্তি-হেতুকই ভগবানের স্বরূপস্থ আনন্দের উদ্রেক্, এবং সেই আনন্দোদ্রেগ-হেতুই ভগবানের অনন্ত লীলা।

এখানে একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক; এই প্রবন্ধে কেহ যেন না বুঝেন, আচার্য্য-শঙ্করের ভগবত্তত্ত্ব এবং বৈষ্ণবীয় ভগবত্তত্ত্ব এক করিয়া বর্ণন করাই আমার উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আমার উদ্দেশ্য লীলাবাদকেই পরিস্ফুট করা। ভগবত্তত্ত্ব নিয়া এ প্রবন্ধে আমি কিছুই বলি নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ।

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা।

কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসযাত্রা	৩রা বুধবার।
একাদশী	১৫ই সোমবার।
অন্নকূট ও গোবর্দ্ধন যাত্রা	২০শে শনিবার।
গোপাষ্টমী	২৭শে শনিবার।
একাদশী অপরাহ্নে শ্রীহরির উত্থান। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-সমাপন।	৩০শে মঙ্গলবার।

[গত ১২ই ভাদ্র রবিবারে সপ্তমী ছিল ৫৬।৩৭।২৫ বিপল; অর্থাৎ ১৩ই

জন্মাষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা বলিয়া উপবাসের অযোগ্যা কিনা, ইহা জানিবার নিমিত্ত অনেকেই চিঠি দিয়াছেন। যথাসময়ে সকলের চিঠিরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

একাদশী ব্যতীত প্রতিপদাদি অন্য সমস্ত তিথি, এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্যান্ত বিদ্যমান থাকিলে সম্পূর্ণা বলিয়া খ্যাত হয়; কিন্তু যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেও চারিদণ্ড একাদশী থাকে, তাহা হইলেই একাদশী সম্পূর্ণা হয়।

প্রতিপৎ-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর-বর্জ্জিতাঃ॥
উদয়াৎ প্রাক্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্‌গৃহী॥

—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২।১২০—১২১।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ডের মধ্যে যদি দশমী অল্পপরিমাণেও থাকে, তবে ঐ একাদশীকে অরুণোদয়বিদ্ধা বলে; তাহা ব্রতযোগ্যা নহে।

অরুণোদয়-বেধ কেবল একদশী-সম্বন্ধেই বিবেচনীয়; অন্য কোনও তিথিতে অরুণোদয়-বেধ বিবেচ্য নহে; কারণ, সূর্য্যোদয়ের পরে পূর্ব্ববর্ত্তিনী তিথি না থাকিলে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়-সময়ে থাকিলেও অন্য তিথির যখন পূর্ণত্ব-হানি হয় না, তখন অন্য তিথিতে অরুণোদয়-বেধ সিদ্ধ হয় না; তাই অরুণোদয়-কালে সপ্তমী থাকিলেও সূর্য্যোদয়ের পরে যদি সপ্তমী না থাকে, তাহা হইলে অষ্টমী, সপ্তমীবিদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ইহাই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর মীমাংসা :—

"কেচিদেবং মন্যন্তে। অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা, তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যাপি ত্যাজ্যা। * * * *। (ইহা পূর্ব্বপক্ষ; ইহার উত্তরে শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণ বলিতেছেন) তচ্চ ন সুসঙ্গতম্। একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়-বেধাসিদ্ধেঃ। তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব।"

—১৫শ বিলাসে ১৭৪শ শ্লোকের টীকা।

সুতরাং গত ১৩ই ভাদ্রের অষ্টমী, সপ্তমীবিদ্ধা হয় নাই ; সূর্য্যোদয়ের পরে সপ্তমী থাকিলেই সপ্তমীবিদ্ধা হইত।

—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

নৈমিত্তিক-লীলার উপাস্যত্ব।

জ্যৈষ্ঠমাসের সাধনায় প্রশ্ন-সপ্তকের দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, কংসবধ-কালিয়দমনাদি নৈমিত্তিক-লীলার উপাসনা প্রচলিত দেখা যায় না ; পড়ুয়া-পণ্ডিতাদি গর্ব্বিত লোকদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রকটিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসি-স্বরূপের—সন্ন্যাস লীলারও উপাসনা নাই। শ্রাবণ মাসের সোনার-গোরাঙ্গ পত্রিকায় পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণপদ দাস বাবাজীমহাশয় আমাদের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, কংসবধ-কালিয়দমনাদি এবং ঝুলন শরৎ-রাস প্রভৃতি নৈমিত্তিক-লীলার উপাসনা আছে। শ্রীমন্ প্রভুর সন্ন্যাস-লীলার উপাসনাও আছে ; শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রামাণ্যগ্রন্থে তত্তৎ-লীলার বর্ণন, গোস্বামি-শাস্ত্রাদিতে তত্তৎ-লীলাবিলাসী ভগবানের স্তোত্রাদি এবং বৈষ্ণব-গণ কর্তৃক তত্তৎ-লীলার আলোচনাদিই তাহার প্রমাণ। আমরা এসম্বন্ধে দু'একটী কথা পাঠকবৃন্দের চরণে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ উপাস্যত্ব সম্বন্ধে। প্রকট-লীলার যোগে অপ্রকট ভগবদ্ধামে প্রবেশ করিয়া নিজের অভীষ্ট-লীলায় ভগবানের সেবা করাই ভক্তিমার্গের সাধকের কাম্য বস্তু। সুতরাং অপ্রকট ভগবদ্ধামে যে যে লীলা আছে, সেই সেই লীলার উপাসনাই সম্ভব,—সেই সেই লীলার উপাসনা-মন্ত্রাদিও থাকা সম্ভব ; আর, অপ্রকট ভগবদ্ধামে যে যে লীলা নাই, সেই সেই লীলার উপাসনা এবং উপাসনা-মন্ত্র থাকা সম্ভব নহে। নৈমিত্তিক-লীলার উপাস্যত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, সর্ব্ব-প্রথমে দেখিতে হইবে, অপ্রকট ভগবদ্ধামে নৈমিত্তিক-লীলা আছে কিনা।

উপাস্যত্ব-বিষয়ে আরও একটী কথা বিবেচ্য। আনন্দময়ী লীলারই উপাসনা কর্তব্য, দুঃখময়ী লীলার উপাসনা কর্তব্য নহে, ভক্তগণ করেনও না ; এই

রূপই শ্রীজীব-গোস্বামিচরণের সিদ্ধান্ত। "উপাসনা চ যস্মিন্নংশে সুখং স্যাৎ তত্রৈব কর্ত্তব্যেতি সর্ব্বসম্মতম্।"—উঃ নীঃ সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের ২য় শ্লোকের লোচনরোচনী টীকা। সুতরাং অপ্রকট ভগবদ্ধামে যদি কোনও নৈমিত্তিক-লীলা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যে সকল লীলা আনন্দময়ী, কেবল সেই সকল লীলারই উপাস্যত্ব সম্ভব।

নৈমিত্তিক-লীলাকে মোটামোটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, ঝুলন, শারদীয়-রাস, বসন্ত-রাস, হোরি, নৌকা-বিলাস ইত্যাদি; এই সমস্ত নৈমিত্তিক-লীলা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা; স্বরূপানুবন্ধিনী বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ, রসিক-শেখর; রস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার ব্রজ-লীলা; রস-নির্য্যাসের মধ্যে কান্তা-প্রেম-রসের নির্য্যাসই সর্ব্বাতিশায়িরূপে আস্বাদ্য—তাহাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা হৃদ্য; সুতরাং যে সমস্ত লীলাতে এই কান্তা-প্রেম-রস-নির্য্যাসের বিকাশ, সে সমস্ত লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের রসিক-শেখরত্বের—রস-স্বরূপত্বের—তাঁহার ভগবত্তার চরম বিকাশ। ঝুলনাদি নৈমিত্তিক-লীলাতে তাহা সিদ্ধ হয় বলিয়া ঐ সমস্ত লীলা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী। দ্বিতীয় প্রকারের নৈমিত্তিক-লীলা—অঘ-বক-পূতনা-কংস-বধাদি-লীলা—স্থূল কথায়, অসুর-সংহার-লীলা। এই সকল নৈমিত্তিক-লীলায়, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—ইহাদের কোনও একটি রস-আস্বাদনের জন্যই অনুষ্ঠিত হয় নাই; ভূ-ভার-হরণের উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত লীলা—এই সমস্ত, শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের আনুষঙ্গিক কার্য্য। প্রকৃত প্রস্তাবে, ভূ-ভার-হরণার্থ কংসবধাদি-নৈমিত্তিক-লীলা স্বয়ং ভগবানের কাজও নহে; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই বলিয়া গিয়াছেন :—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥

*   *   *   *

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে॥
—আদি, ৪র্থ পঃ।

সুতরাং অসুর-সংহার-লীলা শ্রীকৃষ্ণের কাজ নহে, ইহা শ্রীবিষ্ণুরই কাজ। তাই এই অসুর-সংহাররূপ নৈমিত্তিক-লীলা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা নহে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, অপ্রকট ভগবদ্ধামে এইরূপ অসুর-সংহার-লীলা আছে কিনা। বোধ হয় তাহা নাই; কারণ সে স্থানে সংহার-লীলা থাকার সম্ভাবনা নাই।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড বলেন, অপ্রকট ভগবদ্ধামে অসুর-সংহার-লীলা নাই:—

গমনাগমনং নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরঘাতনম্॥—৫২ অঃ।৫।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ, উজ্জ্বল-নীলমণির সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের প্রথম শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা-নাম্নী টীকায় স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, অপ্রকট ভগবদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ হইতে মথুরাগমন-লীলা নাই, এবং প্রকট-লীলায় রজক-বধ হইতে কালযবনের আগমন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা করিয়াছেন, সে সকল লীলাও নাই (রজক-বধের পরেই কংস-বধ; সুতরাং কংসবধ-লীলাও যে অপ্রকট-প্রকাশে নাই, তাহাই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিলেন)। "কিন্তু (অপ্রকট প্রকাশে) মথুরা-প্রস্থান-লীলা নাস্তি, মথুরায়া অপ্রকট-প্রকাশেষু সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিত-লীলাবিশিষ্টস্য সদৈব তত্র বিদ্যমানত্বাৎ। * * ব্রজভূমেঃ প্রকাশান্মথুরাপুরীং প্রতি গমনং আগমো দ্বারকাতঃ দন্তবক্রবধানন্তরং আগমনং প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাম্ নতু অপ্রকট-লীলায়াম্। * * * তথা যদি ব্রজান্মথুরা-প্রস্থানং নাস্তি তদা মাথুরলীলা কুতঃ প্রবর্ত্তেত সাহি (মাথুরলীলা) রজকবধাদ্যা কালযবনাগমান্তা। রজক-বধশ্চ ব্রজাৎ প্রস্থিতেনৈব শ্রীকৃষ্ণেন কৃত ইতি। * * * মথুরায়া অপ্রকট-প্রকাশস্থৈর্লীলাপরিকরৈঃ শ্রীকৃষ্ণেন ব্রজাৎ আগতেন রজকবধাদ্যাঃ লীলাঃ কৃতাঃ ক্রিয়ন্তে চেত্তাবদীয়তে কিন্তু রজকবধাৎ প্রাক্ শ্রীকৃষ্ণো নাসীৎ ইতি চানুসন্ধাতুং ন শক্যতে।"

কংসবধাদি নৈমিত্তিক-লীলা যদি অপ্রকট ভগবদ্ধামে না-ই থাকে, তাহা হইলে সেই ধামে কংসবধাদি-লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাও সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং তদুচিত-উপাসনা এবং উপাসনা-মন্ত্রই বা কিরূপে থাকিতে পারে, তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজি-দমন-লীলা এবং সন্ন্যাস-লীলাও শ্রীকৃষ্ণের অসুর-সংহার-লীলারই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় অসুরদিগের প্রাণ-সংহার করা হইয়াছে; কিন্তু গৌর-লীলায় কাহারও প্রাণ-সংহার করা হয় নাই, অসুরত্ব নষ্ট করিয়া চিত্তশুদ্ধি করা হইয়াছে—এই মাত্র পার্থক্য।

রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে, অসুরেরে করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধ'রিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সভার॥

এই সমস্ত লীলার উদ্দেশ্য যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন; যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে—ইহা যুগাবতারেরই কার্য্য—যিনি স্বয়ং ভগবানের অংশ মাত্র।

"—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥"
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।"—চৈঃ চঃ।

সুতরাং এই জাতীয়-নৈমিত্তিক-লীলা রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপানুবন্ধিনী লীলাও নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল অসুরত্ব-সংহাররূপ নৈমিত্তিক-লীলাও অপ্রকট নবদ্বীপে থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, অপ্রকট-নবদ্বীপে প্রাকৃত অসুরত্ব থাকাই সম্ভব নয়। সুতরাং কাজি-দমন ও সন্ন্যাস-লীলার উপাসনা বা উপাসনা-মন্ত্র থাকাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পরমদুঃখময়ী লীলা বলিয়াও সন্ন্যাস-লীলার উপাসনা সঙ্গত হয় না।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রথম ছয় বৎসরই প্রভু ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া জীব উদ্ধার করিয়াছেন; এই ছয়বৎসরেই প্রভুর সন্ন্যাস-লীলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। ইহার পরে, প্রভুর সন্ন্যাস-বেশ থাকিলেও, সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য-সাধক কার্য্য সাধারণতঃ ছিল না বলিয়া, উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে, তখন তাঁহাকে আর সন্ন্যাসী না বলিলেও বোধহয় চলিতে পারে। তখন প্রভুর মধ্যে রাধাভাবের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ—স্বরূপের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। অবশ্য, প্রথম ছয়বৎসরেও যে তাঁহাতে রাধাভাব ছিল না, এমন নহে;

ইহা প্রভুর স্বরূপানুবন্ধী-ভাব, এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই ভাব প্রভুকে ত্যাগ করিতে পারে না; তবে তখন রাধাভাবের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য-সাধক কার্য্য ছিল বলিয়া সাধারণ-দৃষ্টিতে রাধাভাব সময় সময় যেন একটু প্রচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইত। যাহাহউক, আমাদের বক্তব্য এই যে, কালিয়-দমন-লীলায়, কি সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য-সাধিকা লীলায় অপ্রকট ভগবদ্ধামে প্রভুর সেবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনও উপাসনা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, আমাদের মনে হয়, তত্তৎলীলা দ্বাপরের রজক-বধাদ্যা কালযবনবধান্তা লীলার ন্যায় অপ্রকট ভগবদ্ধামে থাকিতে পারে না।

ঝুলন, রাস, দান-লীলাদি স্বরূপানুবন্ধিনী নৈমিত্তিকলীলা সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই; এই সমস্ত লীলা অপ্রকট ভগবদ্ধামে আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে মত-ভেদ আছে; দানকেলী-কৌমুদীগ্রন্থের ৩১৭শ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিচরণ এই রূপ বলিয়াছেন। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যুক্তেঃ প্রকট-প্রকাশ-গতৈবেয়ং দানলীলেতি কেচিদাহুঃ। অন্যেতু কদাচিৎ সান্দোলিকয়া কৰ্হিচিন্নূপচেষ্টয়েতি দশমপ্রমাণিতৈব হিন্দোলন-দানলীলা প্রকটলীলাগতাপি ইত্যাহুঃ।"

যাহাহউক, যদি অপ্রকট ভগবদ্ধামে এই সমস্ত স্বরূপানুবন্ধিনী নৈমিত্তিক-লীলা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উপাস্যত্ব-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারেনা; বিশেষতঃ এই সমস্ত লীলা যখন আনন্দময়ী। এমতাবস্থায় শ্রীমদ্দশাক্ষর বা অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্রের উপাস্য-লীলাবলীর মধ্যেই এই সমস্ত লীলাও বোধহয় অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

আর যদি অপ্রকট ভগবদ্ধামে এই সমস্ত লীলা না-ও থাকে, তাহা হইলেও তাহারা স্বরূপানুবন্ধিনী ও আনন্দময়ী লীলা বলিয়া রসিক-শেখরের উপাসকদের স্বাভীষ্টভাবের অনুকূল ও পরিপুষ্টিসাধিকা; তাই তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই সমস্ত লীলার অনুশীলন করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে উপাস্য-লীলা সম্বন্ধে আরও পরিচয় পাওয়া যায়। সদাশিব নারদকে ভজন-বিষয়ক উপদেশ দিয়া বলিলেন—"আপনাকে এইরূপে শ্রীরাধিকার সহচরীরূপে ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশা পর্য্যন্ত ভক্তিভরে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিবে:—

ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মং মুহূর্তমারভ্য যাবৎ স্যাত্তু মহানিশা॥—৫২।১১

ইহার পরে শ্রীনারদ স্মরণীয়া লীলার বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে, সদাশিব তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাদেবীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ; নারদ বৃন্দাদেবীর নিকটে যাইয়া স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। বৃন্দাদেবী তাঁহাকে যে লীলার বিবরণ বলিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন-নিত্যলীলা মাত্র ; বৃন্দাদেবীও তাহাই বলিলেন :—

ইতি তে সর্ব্বসমাখ্যাতং নৈত্যকং চরিতং হরেঃ।—৫২।১০৫

নারদও বলিলেন, "দেবি ! আপনি অদ্য আমার নিকটে শ্রীহরির দৈনন্দিন-লীলা প্রকাশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত ও ধন্য করিলেন।

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ত্বয়া দেবি ন সংশয়ঃ।
হরে র্দৈনন্দিনী লীলা যতো মেঽদ্য প্রকাশিতা॥—৫২।১০৬

শ্রীবৃন্দা-বর্ণিত স্মরণীয়লীলার মধ্যে নৈমিত্তিক-লীলার কোন উল্লেখই দেখা যায় না।

গ্রন্থাদিতে অসুর-সংহারাদি নৈমিত্তিক-লীলার বর্ণনা, স্তোত্রাদি এবং সাধকগণের পক্ষে তত্তৎ-লীলার অনুশীলনাদি সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ মনে হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে ভগবানের যাবতীয় প্রকট-লীলাই বর্ণিত হইয়াছে ; কোনও লীলা বাদ দিলে লীলাবর্ণন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই সমস্ত লীলার অনুশীলনে এবং এই সমস্ত লীলার উপযোগী স্তোত্রাদি-পাঠে, ভগবানের মহিমা, জীবের প্রতি তাঁহার করুণা, অক্ষজ-বস্তু হইতে অধোক্ষজ বস্তুর পরমোৎকর্ষ-আদির উপলব্ধি হইতে পারে এবং বহির্ম্মুখ চিত্তকে ভগবদুন্মুখ করার সুবিধা হইতে পারে বলিয়াই এই সমস্তের অনুশীলন মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক। আর যাঁহাদের চিত্ত ভক্তিরসনিষিক্ত, তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যেন ঐ রসে পরিপ্লুত হইয়া যায় ; তখন ভগবানের যে কোনও লীলাতেই তাঁহাদের ভাবের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ; তাই নিজেদের অভীষ্টরসে নিষিক্ত করিয়া তাঁহারা যে কোনও লীলাই আস্বাদন করিতে সমর্থ হন। এই ভাবে অসুরসংহারাদি-লীলা স্বয়ং ভগবানের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা না হইলেও ভক্তদের নিকটে উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু, তাহা বলিয়া অসুরসংহার-ভাবাবিষ্ট ভগবৎস্বরূপের সেবাপ্রাপ্তির জন্য তাঁহারা উপাসনা করেন বলিয়া মনে হয় না।

নৈমিত্তিক-লীলার এইরূপ অনুশীলনকে সাধনভক্তির অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করা যায়; আনুষঙ্গিক-সাধনাঙ্গ হিসাবে এই সমস্ত লীলার উপাসনা সমীচীন বটে। স্বরূপানুবন্ধিনী-লীলাবিলাসী ভগবৎস্বরূপ উপাস্যও বটেন; অসুরসংহার-লীলাবিলাসী ভগবৎস্বরূপের উপাস্যত্বের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ভাবই সাধ্যবস্তু; সেই ভাব পাওয়ার নিমিত্ত যে অনুষ্ঠান, তাহাই মুখ্য উপাসনা; অন্যান্য আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, তাহার আনুকূল্য বিধান করে মাত্র। সাধ্য-ভাবানুকূল ভগবৎস্বরূপই মুখ্য উপাস্য; কংসবধ-লীলার ভাবাবিষ্ট কিম্বা সন্ন্যাস-লীলার ভাবাবিষ্ট ভগবৎস্বরূপের উপাস্যত্ব আমাদের বোধগম্য হয় না।

বাবাজীমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে প্রভুপাদের নিত্যনৈমিত্তিক-লীলার যে ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের পূর্বোল্লিখিত আলোচনার সহিত তাহারও কোনও অসামঞ্জস্য আছে- বলিয়া মনে হয় না—আমাদের মূল প্রবন্ধের সঙ্গেও তাহার কোনও অসামঞ্জস্য দেখা যায় না।

প্রশ্নসপ্তকের দ্বিতীয়প্রশ্নে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভজন ধন্য, শ্রীগৌরাঙ্গভজন ধন্যতর, শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভজন ধন্যতম" এইরূপ কথা ছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীগৌরাঙ্গ—এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্য পৃথক্ হইলেও এই দুইটি নামের বাচ্য একই বস্তু। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভজন ও শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে কোনও প্রভেদ নাই। তথাপি প্রশ্নে, ধন্য ও ধন্যতর শব্দদ্বয়ের প্রয়োগহেতু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভজন ও শ্রীগৌরাঙ্গভজনে কিছু পার্থক্য অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়; অথচ এই পার্থক্যটি যে কি, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তাই, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য", প্রভুর সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম বলিয়া আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে, প্রভুর সন্ন্যাসিস্বরূপের (অর্থাৎ সন্ন্যাস-লীলার ভাবাবিষ্ট প্রভুর) ভজনই বোধ হয় প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রেত। তাই আমরা সন্ন্যাসি-স্বরূপের উপাসনার কথা আলোচনা করিয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন একই স্বরূপ, তখন একের ভজন স্বীকারে যে অন্যের ভজনও স্বীকৃত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু বাবাজী-মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে বুঝা যায়,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কোনও ভজনই নাই, ইহাই যেন আমরা মূল প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তাই তিনি বিস্মিত ভাবে তাঁহার প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন নাই !!"

এবং তিনি তাঁহার প্রবন্ধে ইহাও লিখিয়াছেন যে, আমরা "চূড়ান্ত নিষ্পত্তি" করিয়াছি যে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভজন তো ধন্য নহেই, তাঁহার রূপ গুণ নাম লীলাদির কায়িক বাচনিক বা মানসিক কোনওরূপ অনুকূল অনুশীলনরূপা শ্রবণ-কীর্ত্তন ধ্যান মনন অর্চ্চন বন্দন আত্মনিবেদনাদি কিছুই উপাসনা বা ভজন শব্দে গণনীয় নহে, সুতরাং কর্ত্তব্যও নয় !!!" আমাদের প্রার্থনা, পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের মূল প্রবন্ধটী (প্রশ্ন-সপ্তক-সম্বন্ধে) পড়িয়া দেখিবেন—তাহার কোনও স্থানেই বাবাজী মহাশয়ের উল্লিখিত কথাগুলি নাই।

বাবাজী-মহাশয়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যে কেবল কৃষ্ণভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, ঐ কৃষ্ণভাবও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শারদীয় রাসে শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানের পরে কোনও গোপী যেমন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া ছিলেন, অথবা শ্রীললিতমাধবে, শ্রীরাধা যেমন নিজেকে ললিতাজ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ; কারণ, রাধাভাব শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বরূপানুবন্ধী, সুতরাং কোনও সময়েই তাহা স্বরূপকে ত্যাগ করিতে পারে না ; অন্য যে ভাবই প্রকটিত হউক না কেন, তাহাও রাধাভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাবাজী মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—"পঞ্চতত্ত্বের আহ্নিকার্চ্চনেও শ্রীমন্‌-মহাপ্রভু রাধাভাবাঢ্য নহেন ; পূজ্যপাদ শ্রীগদাধর গোস্বামীই এ লীলায় রাধাভাবাঢ্য" (—সোঃ গৌঃ ৪৬ পৃঃ)। বাবাজী মহারাজের এই সিদ্ধান্ত আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। প্রভুর স্বরূপানুবন্ধী রাধাভাব কিরূপে অর্চ্চন কালে প্রভুকে ত্যাগ করিয়া যাইবে ? যদি ভাব-বিশেষে কাহারও চিত্তে অর্চ্চন-কালে এরূপ স্ফুরিত হয় যে, প্রভু তখন কৃষ্ণভাবাবিষ্ট, তাহা হইলে সেই কৃষ্ণ-ভাবও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে—সুতরাং প্রভু তখন রাধাভাবাঢ্য নহেন, একথা বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। অধিকন্তু, পঞ্চতত্ত্বের অর্চ্চনকালে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে রাধাভাবের বিকাশেরই বা অসঙ্গতি কোথায় ? শ্রীমন্‌মহা-প্রভুতে রাধাভাব, শ্রীগদাধরে ললিতার ভাব, এবং শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদে অনঙ্গ মঞ্জরীর ভাব—এইরূপই স্বারসিক-ভজনের অনুকূল বলিয়া আমাদের মনে হয়।

গম্ভীরা-লীলায় যে রাধাভাবের কথা বাবাজীমহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করে না ; কিন্তু গম্ভীরায় এই রাধাভাবের বিকাশের সঙ্গে প্রভুর সন্ন্যাসের কোনও সম্বন্ধই নাই ; গম্ভীরালীলা করার উদ্দেশ্যেও প্রভু

সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই ; সুতরাং সন্ন্যাস-ভাবাবিষ্ট স্বরূপের উপাসনার অভাবে গম্ভীরা-লীলাবিলাসী শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনার কোনও বাধাই হয় না। ভাব-বস্তুটীই উপাস্য—ভাবাঢ্য স্বরূপই উপাস্য স্বরূপ ; ভাব-নিরপেক্ষ কেবল বিগ্রহ উপাস্য বলিয়া মনে হয় না। ব্রজেন্দ্র-নন্দনের একই বিগ্রহে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের ভক্ত চারিটী পৃথক্ পৃথক্ ভাবের উপাসনা করিয়া থাকেন—ঐ একই বিগ্রহ যশোদা-মাতার কোলের ছেলে, সুবলের মর্ম্ম সখা, আবার গোপীগণের প্রাণবল্লভ। যোগীর-বেশে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের নিকটে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া গোপীগণ তাঁহার যে সেবা করিয়াছিলেন—তাহা যোগীর সেবা নহে, তাঁহাদের প্রাণবল্লভেরই সেবা।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

নৈমিত্তিক-লীলা-সম্বন্ধে পত্র।

[প্রভুপাদের প্রিয় শিষ্য ও ছাত্র বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকটে নৈমিত্তিক-লীলা-সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। আমাদের "নৈমিত্তিক-লীলার উপাস্যত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ কম্পোজ হইয়া কিছু অংশ মুদ্রিত হওয়ার পরে তাঁহার উত্তর পাইয়াছি; নচেৎ আমাদের প্রবন্ধ না ছাপিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিঠিখানা মুদ্রিত করিয়া দিলেই চলিত। যাহা হউক, নিম্নে আমরা তাঁহার পত্রের উত্তরগুলি মুদ্রিত করিয়া দিলাম। সময়াভাব-বশতঃ তিনি অতি সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছেন।]

আপনার প্রশ্নের উত্তর :—

১। অপ্রকট-লীলা-সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামিচরণের মত—"কাসাঞ্চিল্লীলানাং প্রকট-প্রকাশগত তত্তল্লীলাতুল্যানাং তত্তন্মন্ত্রোপাসক-সম্প্রদায়াবচ্ছিন্ন পরম্পরানুরোধেন নিত্যস্থিতিরবগম্যতে নতু সর্ব্বাসামপি প্রকট-লীলানাং, নিত্যত্বেন চ কালিয়-প্রবেশাদি-লীলানাং মহাদুঃখময়ত্বেন কাসাঞ্চিন্মুহুরাগন্তৃভয়-ব্যাকুলীকৃতত্বেন প্রাকৃতমিশ্রত্বেন বিরোধাৎ।"

—শ্রীউজ্জ্বল, মুখ্যসম্ভোগ। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা আপনার প্রশ্নগুলির মীমাংসা করা যায়।

ঝুলন, দানলীলা-সম্বন্ধে দানকেলী-কৌমুদীর ১৮৮ (বহরমপুর) পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মতভেদ স্বীকার করিয়াছেন—শ্রীজীবচরণ। প্রকটাপ্রকট উভয় লীলাগত বলিয়া অভিপ্রেত। নৌকাবিলাস-সম্বন্ধে সে কথা। অপ্রকট-লীলায় প্রতি পূর্ণিমায় রাস—এইরূপ জানি। প্রকট-লীলায়—শারদ ও বসন্তকালীন রাসে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই সকল লীলা মহাদুঃখময়ী নহে, উদ্বেগ-সম্ভাবনা নাই, প্রাকৃতমিশ্রিতাও নহে, পক্ষান্তরে পরমানন্দের নিধান।

২। অঘ-বকবধ-লীলা-সম্বন্ধে—

গমনাগমনং নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুর-ঘাতনং॥—পাদ্মপাতাল ৫২ অঃ।

পূতনাবধ-লীলা বাৎসল্যরসের পরিকরগণের পক্ষে দুঃখময়ী।

এ সকল লীলার নিত্যত্ব-বিষয়ে শ্রীজীবচরণের অভিমত—"তাসাং নিত্যত্বে চিত্রতুল্যত্বে প্রাপ্ত্যা লীলাত্বহানাচ্চ।"—উজ্জ্বল, মুখ্যসম্ভোগ।

৩। অপ্রকট-ব্রজে যে সকল লীলা নাই, সে সকল বিষয়ক অর্থাৎ অসুর-বধাদি লীলার উপাসনা-মন্ত্র থাকিতে পারে না। অপ্রকট-প্রকাশে যে সকল লীলা নাই, সে সকল লীলা কাদাচিৎকী। উপাস্যের অভাবে উপাসনা-প্রবর্ত্তনে শাস্ত্র-সম্বন্ধে বিপ্রলিপ্সা-দোষ উপস্থিত হয়। মহাদুঃখময়ী কালীয়-দমন-লীলা-বিষয়ে মন্ত্র—

হুংকালীয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নিত্যং করোতি চ।
নমামি দেবকী-পুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতং॥
গৌতমীয়তন্ত্র, ১৮শঃ অধ্যায়।

অপ্রকট-ব্রজে আবার সেই লীলার অভিব্যক্তির কথা বৃহদ্ভাগবতামৃতে আছে। অপ্রকট-প্রকাশে যে লীলা নাই, তাহার উপাসনা-মন্ত্র নাই বলিয়া, মনে হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে ও নারদ-পঞ্চরাত্রে তাদৃশ কোন মন্ত্র দেখি নাই। মন্ত্র-কোষেও তাদৃশ কোন মন্ত্র দেখা যায় না।

৪। কাজি-দমন, জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলা প্রাকৃতমিশ্র, সন্ন্যাস মহা-দুঃখময়, সুতরাং লোচন-রোচনী মতে অপ্রকট-প্রকাশে স্থিতি অসম্ভব। মহাপ্রকাশ-সম্বন্ধে আপত্তি করা যায় না, মনে হয়।

৫। অসুর-মারণ বিষ্ণুর কার্য্য।—"শ্রীচৈঃ চঃ আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

৬। কাজি-দমনের উদ্দেশ্য যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন।

তারপর— যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হইতে।

ইহাতে বুঝা যায় কাজিদমন রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত স্বরূপের কার্য্য নহে, যুগাবতারের কার্য্য।

সন্ন্যাস রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত স্বরূপের কার্য্য। তাহার উদ্দেশ্য পাষণ্ডীকে প্রেমদান। (১)

সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে প্রণত হইবে॥
প্রণতি মাত্রে হইবেক অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥

"হরিণা চাপ্যদেয়া" ভক্তি; প্রণতি মাত্রে (২) সেই ভক্তি উদয় করিবার সকল্প "কৃষ্ণাদন্যঃকোবা" করিতে পারেন?

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস।

---

(১) সন্ন্যাস কিরূপে রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত স্বরূপের কার্য্য হইল, তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। পড়ুয়া-পণ্ডিতাদি গর্ব্বিত লোকগণ প্রভুর নিন্দা করিয়া অপরাধ করিয়াছিল, তাহার খণ্ডনের নিমিত্তই প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ।

মোরে নিন্দা করে—যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হইবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিবে উদয়॥

প্রেমদান-কার্য্য সন্ন্যাসের অপেক্ষা রাখে নাই। সন্ন্যাসের পূর্ব্বেও শচীমাতাও জগাই-মাধাই প্রভৃতিকে প্রভু প্রেম দিয়াছেন। পড়ুয়া-পণ্ডিতাদির চিত্তে প্রভুর নিন্দাজনিত অপরাধ না থাকিলে প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বেই তাহাদিগকে প্রেম দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাদের অপরাধের জন্যই তাহা পারেন নাই। তাহাদের অপরাধ-খণ্ডনের জন্যই প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ। তাই আমাদের মনে হয়, সন্ন্যাস-গ্রহণ রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত স্বরূপের কার্য্য নহে, প্রেমদানই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত স্বরূপের কাজ। —সম্পাদক।

(২) প্রণতিমাত্রে প্রেমপ্রদান বলিয়া মনে হয় না, অপরাধ খণ্ডন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অপরাধ খণ্ডন হইয়া গেলে চিত্ত নির্ম্মল হইত, সেই নির্ম্মল চিত্তে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত স্বরূপ প্রেমদান করিতেন। এইরূপই আমাদের ধারণা। —সম্পাদক।

(মাসিক-পত্রিকা।)

—:০:—

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা ॥

১ম বর্ষ, } কার্ত্তিক—১৩৩৩ { ৭ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য।

(প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন লিখিত)

শ্রীকৃষ্ণের নাম একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ মূলের সহিত পাপ-রাশিকে বিধ্বংস করতঃ, বৃক্ষ যেমন যথাযোগ্য কালে ফল ধারণ করে, তদ্রূপ ইহাও যথাযোগ্য কালে স্বীয় ফল প্রকাশ করে। কখন কখন বা বহির্ম্মুখ শাস্ত্রমত রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় ফল জগতে না দেখাইয়া অপরাধ-রহিত নামোচ্চারক জনকে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন।

এস্থলে কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, নাম গ্রহণ করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় কি না? যদি বলা যায় হয়, তবে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত এবং তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও পরদারাভিমর্ষণ ও পরহিংসা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম জনিত নরকে গমন কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি বলা যায় যে নাম গ্রহণ করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় না, তাহা হইলে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি জনগণের ন্যায় ভক্তগণকেও পাপ ভোগ করিবার জন্য নরকে অবশ্যই গমন করিতে হইবে। এসম্বন্ধে কি সমাধান হইতে পারে?

এ বিষয়ে উত্তর এই :—

যেমন কোনও সমর্থ ব্যক্তি নিজ আশ্রিত জনকে আশ্রয় গ্রহণের তারতম্যা-নুসারে রক্ষা করেন বটে, কিন্তু সে আশ্রয়দাতার নিকট অপরাধ করিলে অব্যাহতি পায় না। এখানে যেমন আশ্রয়দাতার রক্ষা করিবার শক্তি নাই একথা বলা যায় না, কিন্তু আশ্রিতের অপরাধের আধিক্য-বশতই আশ্রয়-দাতা রক্ষা করে না এরূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তি যদি স্বকৃত অপরাধজন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া একান্ত শরণাগত হয়, তা'হলে শরণ্য-ব্যক্তি, আশ্রিতের দোষ ক্রমশঃ ক্ষমা করিয়া অনুগ্রহ করে, ফল প্রদান করে। আনুগত্যের তারতম্যানুসারে যেমন সর্ব্বত্র কৃপার বাহুল্য, সেরূপ নামোপলক্ষিতা ভক্তিদেবীকে যদি কর্ম্মাদির ফল সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করা হয়, ভক্তি, তাঁদের নিকটে ঠিক ফল প্রকাশ না করিয়া গৌণ রূপেই ফল প্রকাশ করে। তা'তেই মুখ্য-রূপে নামকে আশ্রয় করে না বলিয়াই কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি ভক্ত-সংজ্ঞায় অভি-হিত না হইয়া কর্ম্মী জ্ঞানী নামে অভিহিত হয়। যেমন দশজন ব্রাহ্মণের সহিত দুই জন শূদ্র থাকিলেও ব্রাহ্মণগণ যাইতেছে—এই প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তী—এই ন্যায়ানুসারে কর্ম্মী জ্ঞানীর ভক্তি থাকিলেও তাহাদিগকে কর্ম্মী জ্ঞানী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। তাহা-দিগকে বৈষ্ণব-শব্দে অভিহিত করা যায় না। কারণ, যাহারা কর্ম্মাদির অঙ্গ-রূপে ভক্তিকে গৌণরূপে আশ্রয় করেন, তাহারা নামাপরাধী। যেহেতু নামা-পরাধ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে ধর্ম্মব্রত ইত্যাদি সর্ব্ব শুভক্রিয়ার সহিত নামের ফলের সমতা বোধ করিলে নামাপরাধ হয়। অর্থাৎ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, একবার মাত্র নামোচ্চারণ করিলেই সেই ফল হয়, এইরূপ মনে করিলেই যখন নামাপরাধ হয়, তখন কর্ম্মাদির অঙ্গরূপে শ্রীনামের কীর্ত্তনে যে নামাপরাধ হইবে ইহা বলা বাহুল্য।

যদ্যাপি ভক্তিদেবীর অপকর্ষ সম্পাদন করিয়া কর্ম্ম-ভোগাদির গৌরব রক্ষা, কর্ম্ম প্রভৃতির অনুষ্ঠানকারীর অত্যন্ত দৌরাত্ম্যের সূচক, তথাপি কৃপাময়ী ভক্তিদেবী নিজ প্রভাবে অপকর্ষ স্বীকার করিয়াও আশ্রিত জনের কর্ম্মাদি সাধ-নের ফল প্রদান করেন। যাহারা প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে নামোচ্চারণ করে, তাহাদের যে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি, নাম সকল পাপ নাশ করিতে

সমর্থ হইলেও সেই পাপকে মাত্র বিধ্বংস করেন। কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত পূর্ব্বকৃত কিম্বা পরকৃত পাপের নাশ করেন না। অথবা অবিদ্যার নাশ করেন না।

সুতরাং উক্ত পাপরাশির ভোগ করিবার জন্য নরকগমন ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। আর যাঁহারা বৈষ্ণব অর্থাৎ যাঁহাদের ভক্তিই প্রধান অবলম্বন, যাঁহারা মুখ্যরূপে নামকেই আশ্রয় করিয়াছেন, শ্রীনামই তাঁহাদের সকল পাপের, এবং অবিদ্যার নাশ করেন। অতএব পাপক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া তাঁহাদিগকে আর দুষ্কর্ম্মজনিত নরক-ভোগ করিতে হয় না।

সেই কর্ম্মাদি-সাধন অনুষ্ঠানকারী যদি সাধু-নিন্দা করে ও নাম-মাহাত্ম্য প্রশংসা-বাক্য মাত্র মনে করে, তাহা হইলে সে জন নামাপরাধী। ঐ নামাপরাধী গৌণরূপে ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তি তাহাদের ঐ কর্ম্মাদি-সাধনজন্য ফল অর্পণ করেন না। যেহেতু শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে

কে তে২পরাধা বিপ্রেন্দ্র, নাম্নোভগবতঃ কৃতাঃ।
বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং সর্ব্বান্ তানন্থবর্ণয়।

"হে বিপ্রেন্দ্র, যাহা হইতে মনুষ্যের নানা প্রকার সাধন বিনষ্ট হয়, এমন যত প্রকার নামাপরাধ আছে, তৎসমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন।" এই বাক্যে নামাপরাধীর সাধারণ ফল পাওয়াও দুষ্কর। তবে যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে কৃত অপরাধের উপশমক শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি আশ্রয় করে, তবে অপরাধের ক্ষয়ের তারতম্যানুসারে ভক্তি ফল দিয়া থাকেন।

মুখ্যরূপে কর্ম্মাদি-সাধনকারী যদি বিশুদ্ধ ভক্তিমান কাহারও সঙ্গ পায়, তবে তাঁহাদের বিশুদ্ধ ভক্তিলাভ হইতে পারে। তখন কর্ম্মাদি-সাধনে ও তৎফলে তুচ্ছ বুদ্ধি হয়, তখন ভগবন্নামও প্রসন্ন হইয়া শ্রীভগচ্চরণারবিন্দে প্রেমভক্তি দিয়া থাকেন। মূলকথা, অপরাধ না থাকিলে নামাশ্রয়-মাত্র নিখিল পাপ নাশ হইবে, মায়াবন্ধন ছিন্ন হইবে ও শ্রীহরি-চরণে প্রেম লাভ হইবে, অন্যথা নহে।

প্রভুপাদের পত্র।

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ রাধাগোবিন্দ নাথ
নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু।

স্নেহাস্পদেষু—

স্নেহের ভাই রাধাগোবিন্দ, অত্র পত্রে আমার শত শত আশীর্ব্বাদ জানিবে। "সাধনা" পত্রিকা-পরিচালন-কার্য্যে আমার পরামর্শ গ্রহণ বৃথা মনে করি; কারণ, আমি বোকা; বিশেষতঃ ব্যবহারিক-বিষয়ে সর্ব্বথা অনভিজ্ঞ; মনোবৃত্তিও সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখিনী।

প্রীত্যাস্পদ কৃষ্ণপদ-দাদার সহিত তোমার সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে মতের অনৈক্য ঘটিবার মূল কারণ—দুইজনারই স্বরূপ-অন্তরঙ্গ-রাজ্যে অপ্রবিষ্ট হইয়া বাহ্যদৃষ্টিতে—বাহ্যবিষয় লইয়া সমালোচনা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব অতীব নিগূঢ়। সর্ব্বদা যাঁহারা ঐ পদযুগল অন্তর্মুখী-দৃষ্টিতে ভাবনা করেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে শ্রীপ্রভুর করুণা উদয় হইয়া থাকে এবং শ্রীপ্রভুর করুণাতেই শ্রীপ্রভুর রহস্য-আস্বাদন যথাকথঞ্চিৎ অনুভব-গোচর হইয়া থাকে। ইহা বিবাদ করিবার বিষয় নহে। বিশেষতঃ প্রতিপক্ষতামূলক প্রতি-স্পর্দ্ধতার সর্ব্বথাই অবিষয়। যে বুঝিবে, সে মজিবে; সে অন্যের সহিত কোনও সমালোচনা করিতে পারিবে না বা করে না।

প্রথমতঃ শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবাঢ্য শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ। এই পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটি বিশেষণ ছাড়া শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর মুখ্য রহস্যত্ব অভিব্যক্ত হয় না। শ্রীরাধা-ভাবাঢ্য হইয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ-নামে শ্রীশচীগর্ভ-সিন্ধু মধ্যে উদিত হইয়াছেন। "তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।" বাল্যাবস্থায় রাধাভাব ছিলেন না, পরে হইলেন—বহিরঙ্গ লোকই এই সকল কথা বলিয়া থাকে।

কাজীদমন ও সন্ন্যাস-লীলা এই দুইটী লীলার মধ্যে কাজীদমন-লীলাটী ভক্তবাৎসল্য-গুণের একটী অনুভাব-বিশেষ। কারণ, কাজীর ভয়ে ভীত ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য-রসে ও কারুণ্য-রসে বিগলিত হৃদয় হইয়াই কাজীকে দমন করিয়াছিলেন। কাজীদমন-লীলা হইতে অন্তরঙ্গ গৌরভক্তবৃন্দ বাৎসল্য-গুণই আস্বাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলাটী বাহ্যদৃষ্টিতে জগৎকে কৃতার্থ করা বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু অন্তরঙ্গ-দৃষ্টিতে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবেরই একটী বিশেষ অনুভাব-রূপে প্রকাশ পায়। মাদনাখ্য-মহাভাবের এতাদৃশ প্রভাব-বিশেষ যে, প্রেমরস-লম্পট শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ব-প্রণয়ি-জনার প্রণয় হইতে উদাসীন করিয়া একমাত্র স্বৈকনিষ্ঠতা সম্পাদন করে। দ্বিতীয়তঃ, "যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবল মুদ্যমঃ"—অন্য সকল প্রীতিতে অনভিরুচিতা সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যৈক তন্ময়তা বিধান করে। সেই জন্যই পরম-পবিত্র-স্নেহময়ী শ্রীশচীদেবী, জগদারাধ্য-স্বরূপা দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রণয়েও উদাসীন হইয়া নিজ বেশ, কেশ প্রভৃতির প্রতি নির্ব্বিন্ন হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ মাধুর্য্যামৃতে লুব্ধতা—ইহাই সন্ন্যাসগ্রহণের মূল হেতু।

এই সঙ্গে আরও ২।১টী কথা বলিতেছি যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-কালে যেমন অন্য সকল অবতার তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হয়েন, এবং সেই সকল অবতার-শক্তি দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পাদন করেন—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন বলিয়া ঐ সকল অবতার-শক্তিতে অধিক সামর্থ্য অভিব্যক্ত হয়—যথা "হতারিগতিদায়কত্ব" প্রভৃতি গুণরাশির অধিক উচ্ছ্বাস শ্রীকৃষ্ণেই অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে—সেই প্রকার শ্রীমন্মহাপ্রভুতেও অন্যান্য অবতার সকলের মিলন থাকা-জন্য বহিরঙ্গ জগতের সম্পর্ক লইয়া অনেক অবতার-লীলা-শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সকল স্থানেই এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না। মুখ্য অন্তরঙ্গ-লীলা—রাধাভাবাঢ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যামৃত আস্বাদনময়ী।

অপ্রকট-লীলাতে সন্ন্যাস-লীলা রক্ষা করা সর্ব্বথা অসম্ভব। কারণ, সন্ন্যাসী হইলেই দেশ ছাড়িতে হইবে, দেশ ছাড়িতে হইলেই, ধাম-হীন শ্রীপ্রভুকে চিন্তা করিতে হয়—ইহা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ। এই জন্যই শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মহাশয় নিশান্তলীলায় গাহিয়াছেন—

শেষ রজনী মাহা শুতল শচীসুত
তবহি ভাব ভেল ভোর।
বামচরণ ভুজ, পুনঃ পুনঃ আগুরই
নয়নহি আনন্দ লোর॥
অনুভবে বুঝল রঙ্গ।

যৈছন গোকুল-নায়র-কোরহি
নায়রী শয়ন-বিভঙ্গ ॥
তৈছে বচন পুনঃ কহত পুন আঁখি মুদি
বদনে রসাল সুহাস।
যা কর ভাবহি প্রকটিন নন্দসুত
গৌর বরণ পরকাশ ॥
সতত শ্রীনবদ্বীপ মাঝ সোই বিহরই
ভক্ত রাধামোহন দাস।

সোনার-গৌরাঙ্গ পত্রিকার সহিত আমি কোন প্রকার সংশ্রব রাখিনা বা রাখিতে পারিবনা। যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত-বিরুদ্ধ বেশ ও আবেশ পোষণ করে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও আচার্য্য-সন্তানগণের অমর্য্যাদা করাই যাহাদের কার্য্য—সেই গৌড়ীয়-নামধারীদের সহযোগিতা রাখিবার জন্য যোগেন্দ্র বাবু যত্নবান্; তাঁহার সহিত—অপরাধ-ভয়হীন হুজুগ-প্রিয় ভক্ত ভিন্ন অপর কেহই সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন না।

আমার সময় অতি কম, তাই বিস্তারিত লিখিতে অসমর্থ। এই পত্র খানি সাধনায় প্রকাশ করিবা। আর বাদ-বিবাদের কোনও প্রয়োজন নাই। জলের স্রোতের মত পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে। এইক্ষণ নিজ প্রাণেশ্বর-যুগলের মাধুর্য্যামৃত আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল-হৃদয়ে অন্তর্মুখ হও। এই আমার মুখ্য অনুরোধ ও আশীর্ব্বাদ। ইত্যলং পল্লবনয়া।

আশীর্ব্বাদক—
তোমার প্রাণের দাদাপ্রভু
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

[আশ্বিনের শ্রীপত্রিকা মুদ্রিত হওয়ার পরে ২৩শে ভাদ্র তারিখে প্রভুপাদের উক্ত কৃপালিপি পাওয়া গিয়াছে; তাই আশ্বিনে ইহা মুদ্রিত করিতে পারি নাই। —সাঃ সঃ]

সঙ্কীর্ত্তন-মহারাস।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

সঙ্কীর্ত্তন মহারাস, সঙ্কীর্ত্তন মহারাস
সদা ভজ আমার মন, সদা চিন্ত আমার মন॥
ধন্য কলিযুগ অভিনব নবযুগ
যাতে, সঙ্কীর্ত্তন-মহারাস হ'ল প্রকটন,
সদা ভজ আমার মন॥
আপনি শ্রীগৌরহরি সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করি
খোল করতালে হরিনামে পূরিল ভুবন,
সদা চিন্ত আমার মন॥
অজভবের চিরদিন বাঞ্ছিত যে গূঢ়ধন
বৃন্দাবনে মহারাসে কৈল আস্বাদন।
সঙ্কীর্ত্তন মহাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণইন্দু
সেই প্রেমে সর্ব্বলোক কৈল প্লাবন,
সদা চিন্ত আমার মন॥
প্রেমের হাট, প্রেমের নাট, মধুর তান, মধুর গান,
মক্কে অপ্রপক্কে একই রঙ্গে মহাভাবের ঘূর্ণন
সদা ভজ আমার মন॥
সঙ্কীর্ত্তনে হরিধ্বনি মহাভাবের প্রেমবাণী
সেই চলন সেই দোলন সেই মধুরভাষণ
সদা ভজ আমার মন॥
ব্রজের বিলাস রাস মহারাস তাস্য নাট্য প্রেমপ্রকাশ
কীর্ত্তনে, ভক্তভাবে নর্ত্তনে গোপীভাবে আবর্ত্তন
সদা ভজ আমার মন॥
নবদ্বীপ নববৃন্দাবন, মহাপ্রভু মদনমোহন,
রসরাজ মহাভাব একত্র মিলন,
সদা ভজ আমার মন॥

জাহ্নবী শ্রীযমুনা, ন'দের ধূলা রত্ন-ভূষণ,
প্রেমের পাথার শ্রীবাসাঙ্গন, নিকুঞ্জ-কানন,
সদা ভজ আমার মন,
সদা চিন্ত আমার মন॥

শ্রীগোপীনাথ বসাক বি, এ, বি, টি।

শ্রীশ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির বংশ-পরিচয়।

১। সাবর্ণগোত্রঃ পরতত্ত্ব-সেবী শ্রীমান্ সুধীরো বাঘিয়া নিবাসী—বাণেশ্বরোঽসৌ শিবরামপুত্রঃ প্রখ্যাত শাক্তঃ কিল ধর্ম্মবেত্তা—॥

২। তৎপত্নী পরমা সাধ্বী গঙ্গাদেবীতি বিশ্রুতা। বভূব করুণামূর্ত্তিঃ—ছায়েব প্রিয়গামিনী॥ ৩। তস্যাশ্চ রত্নগর্ভায়া গর্ভজাতো বভূব সঃ বিদ্যানিধি রিতিখ্যাতঃ পুণ্ডরীকো বিদাংবরঃ॥

৪। ভুবনহিতপ্রাণায়ঃ শ্রীল গৌরাঙ্গনামা পতিতজনহিতৈষী পূতধন্যাবতারঃ। কলিকলন-মহাস্ত্রং যস্যসংশিক্ষনন্তং পরিকরঋত মাসীৎ পুণ্ডরীকঃ স তস্য॥ ৫। রামপ্রিয়া তস্য পত্নী তদ্‌গর্ভে পণ্ডিতাগ্রণীঃ রামপ্রসাদনামাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥ ৬। তৎপুত্রঃ প্রাণকৃষ্ণঃ সকলগুণযুত স্তৎসুতো রামকান্তঃ বিদ্যাবাগীশ নাম্না গুণিগণবিদিতো ধর্ম্মকর্ম্মানুরাগী। বেদান্তে পারদর্শী তদজনিতনয়ঃ স্তোত্রমেককারঃ নাম্না গোবিন্দরামঃ প্রথিতকুলপদোদেব—ভক্তোবারেণ্যঃ॥ ৭। তস্যপুত্রঃ সদাচারঃ ভবাণীচরণঃ সুধীঃ। বাগীশ ইব সিদ্ধান্তে তেন নাম্নোদিতঃ ক্ষিতৌ॥ ৮। বিষ্ণুপ্রিয়া—তস্যপত্নী কৃষ্ণরায় সুদগ্রজঃ। আসীৎ তস্য সুতঃ শ্রীমান্ রাম-গোপালসংজ্ঞকঃ॥ ৯। নাম্নেন্দ্র-নারায়ণ ইত্যবাদি তস্যৈব পুত্রঃ স্বজনৈঃ সদাসঃ। পত্নীদ্বয়ং তস্যচ ধর্ম্মবৃদ্ধ্যাঃ পদ্মাবতী শ্রীললিতা তাচ সাধ্বী॥ ১০। ললিতায়াং সুতৌজাতৌ বিদুষস্তস্য সন্মতী শ্রীদুর্গাচরণঃ পশ্চাৎ অভয়াচরণঃ কৃতী॥ ১১। অভয়াচরণঃ শান্তো বৈষ্ণবানাং সদাগ্রণীঃ পরোপকারী ধর্ম্মজ্ঞঃ সৌম্যমূর্ত্তিঃ কুলোদ্বহঃ॥ ১২। মহদায়াং মহামত্যাং তস্য পত্ন্যাং কুলপ্রভঃ। প্রতিভাপ্রতিভাতোয়ং

অভয়া-চরণাত্মজঃ ॥ ১৩। অজ্ঞানি পরম ধন্যো বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তিঃ বিবিধগুণসমেতো লোকপালোপ যোঽস্মিন। সকল বিষয় বিদ্যা পার দর্শী মহর্ষিঃ গুণ সুবিনয় বাণ্যা দার লোকাবণিকঃ ॥ ১৪। বিদ্যালঙ্কারবিখ্যাতঃ সস্ত্রীকঃ কৃষ্ণকিঙ্করঃ ধার্ম্মিকানাং—বরেণ্যোসৌ কর্ম্মণঃ কৃষ্ণকিঙ্করঃ ॥ ১৫। সুশীলায়াং সুশীলায়াং ভার্য্যায়াং তস্যাধীমতঃ। চত্বারশ্চাভবন্ পুত্রাঃ সর্ব্বেপিতৃগুণান্বিতাঃ ॥ স্মৃতি-তীর্থঃ স্মৃতোকাব্যে কবিরত্নোপনামকঃ। তর্কপঞ্চাননস্তর্কেউপাধিত্রয়ভূষিতঃ ॥ ১৬। শ্রিয়া হরকুমারোসৌ দ্বিতীয়ঃ পরমকৃতী—প্রসন্নাদাঃ কুমারান্তঃ সিদ্ধান্ত-ভূষণোঽভবৎ ॥ ১৭। শিরোরত্ন স্তৃতীয়শ্চ শ্রিয়া শশিকুমারকঃ। কুমারান্তঃ সারদাদি শ্চতুর্থোধর্ম্মযাজকঃ ॥ ১৮। বিহায় বিষয়াসক্তিং স্বজনানুরক্তিঞ্চ সঃ। নবদ্বীপে বসত্যস্মাৎ পুণ্ডরীকশ্রীপাটতঃ ॥ ১৯। শ্রীপ্রসন্নকুমারস্য সিদ্ধান্ত-ভূষণস্যচ। চত্বারঃ পুত্রাবর্ত্তন্তে জানীত ক্রমনামতঃ ॥ ২০। রুক্মিণীরঞ্জনঃ শ্রীমান্ কাব্যতীর্থোপনামকঃ। নলিনীরঞ্জনঃ শ্রীমান্ এম এ উপাধিভূষিতঃ। ২১। স্মৃতিকাব্যোপাধিযুতো যামিনীরঞ্জনঃ শ্রিয়া—মেট্রকুলেশনোত্তীর্ণঃ মোহিনীরঞ্জনঃ শ্রিয়া।

(বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী, পত্নী গঙ্গাদেবী)

পুত্র—

১। শ্রীশ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। ২। রামপ্রসাদ ৩। প্রাণকৃষ্ণ ৪। রাম-কানু ৫। গোবিন্দরাম ৬। ভবাণীচরণ ৭। কৃষ্ণরাম ৮। রামগোপাল ৯। ইন্দ্রনারায়ণ ১০। অভয়াচরণ ১১। কৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার। (পুত্র ১২। হরকুমার। শশিকুমার। সারদাকুমার (সরোপানন্দ) ক্রমান্বয় পুত্র নলিনীরঞ্জন। যামিনীরঞ্জন। মোহিনীরঞ্জন। বর্ত্তমানে) রুক্মিণীর পুত্র শ্রীননীগোপাল (বালক)

বৈষ্ণবদাস কৃপাভিখারী—
শ্রীহরকুমার স্মৃতিতীর্থ গোস্বামী।
মেখলা—শ্রীপাট। (চট্টগ্রাম)

[সকল কথা আমারা পড়িতে পারি নাই, বুঝিতেও পারি নাই; তাই পাণ্ডুলিপির অনুরূপই মুদ্রিত হইল। সঃ সঃ]

দয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার ॥
বিচার করিলে চিত্তে পাইবে চমৎকার ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৮মঃ

আমরা "দয়া" বলিতে ইহাই বুঝি যে, শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে শীতবস্ত্র দান, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান, এবং পীপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে জল দান করা ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এই প্রকার কার্য্যকে প্রকৃত দয়া বলা যায় না। কেন না, ক্ষুধার্ত্তকে আজ আমি অন্ন দিলাম; আজ তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল বটে; কিন্তু কাল তো ক্ষুধা লাগিবে? তৃষ্ণার্ত্তকে আজ আমি জল দিলাম, কাল তো তাহার আবার তৃষ্ণা জন্মিবে? আমি চিরকালের জন্য কাহারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করিতে পারি না, চিরকালের জন্য কাহারও দুঃখ দূর করিতে পারি না।

যদি কেহ কাহারও দুঃখের বীজ চিরকালের জন্য দূর করিতে পারেন, যদি কেহ কাহাকেও চিরকালের জন্য সুখী করিতে পারেন, তবেই তাঁহাকে প্রকৃত দয়ালু বলা যায়, আর তাঁহার দয়াকেও প্রকৃত দয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। পরদুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছাকেই দয়া বলে—সুতরাং পরদুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিকেই প্রকৃত প্রস্তাবে দয়া বলা যাইতে পারে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেই এইরূপ দয়ার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবের দুঃখের মূলই—সংসার-বাসনা, প্রাকৃত বস্তুতে অভিনিবেশ, স্বরূপের বিস্মৃতি—শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি। পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবের সংসার-বাসনার মূল ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন, প্রেম দিয়া তাহাকে আনন্দময়ের চরণসেবার অধিকারী করিয়াছেন—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ভাণ্ডার তাহার সাক্ষাতে খুলিয়া দিয়াছেন।

তাই তাঁহারই মহিমা অদ্যাবধি জগদ্ ব্যাপী—আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার মুখে শুনা যায়। মহাজনগণও কৃপাপরবশ হইয়া গ্রন্থাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রভুর দয়ার কথা লিখিয়াছেন। যথা—

সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥

চৈঃ চঃ আঃ ৮মঃ

আরও—

অধমার দুর্ল্লভ প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি।

কাঙ্গালে পাইয়া খাইয়া নাচয়ে বাজাইয়া করতালি ॥

তাই—বিচার করিলে চিত্তে পাইবে চমৎকার ॥

পরম-রসিকপ্রবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-চরণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুপম কৃপাবলোকন করিয়া, কৃপাম্বুধি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রভুকে বন্দনা করিতেছেন,—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবং তং করুণার্ণবং।

কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥১॥

চৈঃ চঃ মধ্য দ্বাবিংশ।

এই ঘোর কলিতেও যিনি অতি নিগূঢ় "অভিধেয়"—মাধুর্য্যময়ী ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, করুণার্ণব সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥১॥

এখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুকে অন্য কোনও বিশেষণ না দিয়া কেবলমাত্র "করুণার সাগর" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুতেই সর্ব্বাতিশায়ি কৃপাধিক্য।

সাগরে মৎস্যাদি অনেক আছে বটে, কিন্তু জলের প্রাধান্য-হেতু সাগরকে জলধিই বলা হয়। তেমনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে করুণার আধিক্য বলিয়া তাঁহাকে অন্য বিশেষণ না দিয়া "করুণার্ণবই" বলা হইল।

এই জাগতিক সাগরের একটা সীমা আছে, তাহা শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে গেলেই দেখা যায়। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপারূপ সাগরের সীমা নাই ; "অপার সাগর" ; তবে সীমাবদ্ধ সাগরের সঙ্গে তুলনা দিলেন কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ইহ জগতের জীবগণকে জাগতিক বস্তুদ্বারা দৃষ্টান্ত দিয়া না বুঝাইলে তাহারা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না, তাই ; নতুবা সাগরের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার সঙ্গে তুলনা চলে না। কেননা—"সিন্ধুর্ব্বিন্দুমপি ন প্রযচ্ছতি" পিপাসিত ব্যক্তি সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া জল জল বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কিন্তু সাগর নিকটে থাকিয়াও একবিন্দু জল দান করিতেছে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাহা নহে। তিনি যে কেবল পিপাসু ব্যক্তিকেই প্রেম-বারি বিতরণ করিয়াছেন, এমন নহে। অযাচিত ভাবে নিজে মাইর খাইয়াও জগাই মাধাইকে প্রেম দিয়াছেন। যথা—

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥

ইহাকেই ত প্রকৃত করুণা বলে। যে করুণা বিচারের অপেক্ষা রাখে না, এবং যে করুণায় জ্ঞানাদি-সাধন-সহস্রেরও দুর্ল্লভ প্রেম, যাকে তাকে বিলাইয়া দিয়াছেন।

উপরোক্ত পয়ারে "হেন প্রেম" বলিতে যে প্রেমের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপ—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

তথাহি ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ১। ২২

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি র্ভুক্তি র্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥

জ্ঞানদ্বারা মুক্তি এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মে স্বর্গাদি সুখ-ভোগ সহজেই লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও অতি দুর্ল্লভ।

আরও—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম-ভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও প্রেমদান করেন না এমন নহে। যে পর্য্যন্ত অন্য বাসনার গন্ধ মাত্রও থাকে, যে পর্য্যন্ত ভগবানে গাঢ় আসক্তি না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত তিনি প্রেমদান করেন না, লুকাইয়া রাখেন।

যেমন পুত্রই পিতার সর্ব্ব সম্পত্তির মালিক, কিন্তু উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা যেমন পুত্রকে সম্পত্তির ভার অর্পণ করেন না, যখন বুদ্ধি প্রগাঢ় হয় এবং সম্পত্তির মর্য্যাদা বুঝে, তখনই সম্পত্তি ভোগের অধিকার বা ভার অর্পণ করেন, তেমনি জীবগণেরও প্রেম পাইবার অধিকার আছে বটে, কিন্তু প্রেমের মর্য্যাদা না বুঝা পর্য্যন্ত প্রেমটী দেন না।

লুকাইয়া রাখেন—অর্থাৎ পিতা পুত্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বহু মূল্যের মাণিক্যাদি যেমন লুকাইয়া রাখে—তদ্রূপ। কেননা পুত্র যদি আখুট করিয়া চাহিয়া বসে, এই ভয়ে লুকাইয়া রাখেন। পুত্র নিকটে আসিলে,

পুত্রকে সামান্য একটী খেলিবার জিনিস দিয়াই বিদায় করেন। বহুমূল্যের মাণিক্যাদি দেন্ না। যেহেতু মাণিক্যের মর্য্যাদা জানে না।

ইহাদ্বারা ইহাই সূচিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমটী বড়ই ভাল বাসেন। তিনি বড়ই প্রেমের ভিখারী—তাই তিনি কাহাকেও সহজে দিতে চাহেন না।

তা'তো হবেই ;—নতুবা তিনি স্বতন্ত্র হইয়াও প্রেমের অধীন হইয়াছেন কেন ?

তথাহি গীতাং—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু—নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহং॥

তাই—হেন প্রেম বলা হইয়াছে। অন্যান্য যুগাবতারের কার্য্য ছিল—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ঘরে চোর ঢুকিতেছে, তখন গৃহস্থ টের পাইয়া দাও দিয়া চোরের মাথা কাটিল, ইহাতে গৃহস্থের কি কৃতিত্ব ? যদি চোরকে ধরিয়া, তাহার চৌর্য্যবৃত্তি নষ্ট করিয়া সৎপথে চালিত করিতে পারিত,তবেই গৃহস্থের কৃতিত্ব ছিল। করুণার সাগর গৌর আমার তাই করিয়াছেন ; অসুরকে প্রাণে বধ করেন নাই, কিন্তু অসুরের অসুরত্ব বিনাশ করিয়া তাহাকে ভক্ত করিয়াছেন, প্রেম দিয়াছেন। তাহার অনাদিকাল-প্রারব্ধ সংসার-যাতনা ঘুচাইয়া, প্রাকৃত-বস্তুতে তাহার অভিনিবেশ ঘুচাইয়া, তাহার স্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন ; তাহাকে নিজ চরণ-সেবার যোগ্যতা দিয়া তাহার সাক্ষাতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন।

রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে,
অসুরেরে করিল সংহার।

"কিন্তু"

এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল,
চিত্তশুদ্ধি করিল সবার॥

তাই—তং করুণার্ণবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দেবং বন্দে

ইহাই প্রকৃত করুণা—অতএব—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাইবে চমৎকার॥

শ্রীজগদানন্দ অধিকারী,

গোবিন্দদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন।

[সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ]

শ্রীরূপ গোস্বামিমহোদয় "উজ্জ্বল-নীল-মণি"-গ্রন্থে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণ-স্থলে লিখিয়াছেন—

"দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥"

এই শ্লোকের "পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ" এই বিশেষণটীর অর্থ লইয়া শ্রীজীব গোস্বামি-পাদ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি পাদের মধ্যে মতভেদ আছে। গোস্বামি-পাদ অর্থ করিয়াছেন—"(সর্ব্বপ্রকার) পরতন্ত্রতা অর্থাৎ পরাধীনতা হইতে বিযুক্ত কিনা বিমুক্ত, পরস্পরের নিকট দুর্লভ-দর্শন প্রেমিক ও প্রেমিকার সম্ভোগ-বিলাসের যে পরমোৎকর্ষ, তাহারই নাম সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।" তিনি বলেন যে, পাদ্ম-উত্তরখণ্ডে দন্তবক্র-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন ও তথায় মাসদ্বয়-কাল অবস্থান স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা শ্রীভাগবতেরও সম্মত বটে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন কংস-বধান্তে শ্রীনন্দ-প্রভৃতিকে বিদায় দেন, তখন তিনি জ্ঞাতি ও বান্ধবদিগকে দর্শন দেওয়ার জন্য ব্রজে যাইবেন, এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি অনুসারে শ্রীউদ্ধব-মহাশয়ও ব্রজে যাইয়া কৃষ্ণ-প্রিয়া গোপীদিগকে সেইরূপ আশ্বাস প্রদান করেন, ইত্যাদি প্রসঙ্গ ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। সত্য-সংকল্প শ্রীভগবানের বাক্য কখনও অসত্য বা ব্যর্থ হইতে পারে না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে দন্তবক্র-বধের পরে, ব্রজে যাইয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন এবং দ্বারকায়

প্রত্যাগমন করেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য বটে। এখন তর্ক হইতেছে এই বিষয় লইয়া যে,—যখন এই সুদীর্ঘ প্রবাসের পরে তিনি ব্রজে পুনরাগমন করেন, তখনও শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজ-দেবীদিগের সেই পরকীয়া-খ্যাতি বর্ত্তমান ছিল, না তাঁহারা সকলেই স্বীয়া ও কৃষ্ণ-বধূ বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন? শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদের রচিত "ললিত-মাধব" নামক নাটকে আছে যে, চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা প্রকৃতপক্ষে যথাক্রমে ভীষ্মক ও সত্রাজিতের কন্যা; যোগ-মায়ার কৌশলে তাঁহারা ব্রজে চন্দ্রভানু ও বৃষভানুর কন্যারূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, পরে আবার সেই যোগমায়াকর্ত্তৃকই দ্বারকায় নীত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পরিণীতা হ'ন এবং যথাসময়ে অর্থাৎ উক্ত নাটকের শেষ অঙ্কে, প্রকৃত অবস্থা সকলের নিকটই প্রকাশিত হয়। নিত্য অপ্রকট-লীলায় শ্রীরাধা প্রভৃতি স্বীয়া-রূপেই বিরাজিত, কেবল প্রকট-লীলায় তাঁহারা যোগ-মায়ার কৌশলে কিছুকালের জন্য পরকীয়া-রূপে পরিচিতা হইয়াছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলার অবসানে দন্তবক্র-বধের পরে পুনরায় তাঁহার শ্রীরাধা প্রভৃতির সহিত সম্মিলন ঘটিল, তখন ব্রজ-দেবীগণের প্রকৃত তত্ত্ব সকলের বিদিত হওয়ায় সে সময়ে আর কান্ত-সম্মিলনে গুরুজনাদির কোনও বাধা বা নিবারণ রহিল না; সুতরাং সেই সুসময়ের সকল প্রকার পরাধীনতা হইতে বিমুক্ত, অনিয়ন্ত্রিত সম্ভোগ-বিলাসের আতিশয্যই "সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ" বলিয়া গোস্বামি-পাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তি-পাদের মতে 'দুর্ল্লভতা' ও 'বার্য্যমানতা'—এই দুইটী অবস্থা প্রেমের পরাকাষ্ঠার জন্যে সকল সময়েই অপরিহার্য্য বলিয়া, অপ্রকট নিত্য-লীলায়ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য যোগ-মায়ার প্রভাবে ব্রজ-দেবীগণ তাঁহার নিকট পরকীয়া-রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন; প্রকট-লীলায়ও পরে যখন পুনরায় ব্রজ-দেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়াছে, তখনও তাঁহাদিগের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমের অপরিহার্য্য সহচর 'দুর্ল্লভতা' ও 'বার্য্যমানতা' অপনীত হয় নাই,—হইতেও পারে না; সুতরাং 'পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ' বিশেষণ-পদের অর্থ তাঁহার মতে 'পরাধীনতা হেতু বিযুক্ত;' তবেই শ্লোকের অর্থ হয়, পরাধীনতা হেতু পরস্পর বিযুক্ত ও দুর্ল্লভ-দর্শন প্রেমিক-যুগলের যে সম্ভোগাতিরেক, উহারই নাম 'সমৃদ্ধিমান' সম্ভোগ। পূর্ব্বরাগ, মান ও গোষ্ঠাদিতে গমন-জন্য অদূর-প্রবাসেও বিয়োগ অর্থাৎ বিরহ

দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা অল্পকাল-স্থায়ী; সুদূর অর্থাৎ বহুকাল স্থায়ী বিরহের পরে যে সম্মিলন, উৎকণ্ঠার আতিশয্য-হেতু উহাতেই সম্ভোগ-সুখের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়; সুতরাং উহাকেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বুঝিতে হইবে। উজ্জ্বল-নীল-মণির এই শ্লোকের "পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ" বিশেষণ-পদের কোন্ অর্থ অধিক সমীচীন ও গ্রন্থকার-মহোদয়ের অভিপ্রেত, তৎসম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিতে যাওয়া আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতার কার্য্য হইবে। (১) তবে ইহা এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের উপজীব্য "শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত", "শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত" 'সংকল্প-কল্পদ্রুম' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লীলা-বর্ণন গ্রন্থের বর্ণিত ও রাগানুগ-ভক্তদিগের ধ্যেয় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অষ্ট-কালীয় অপ্রকট নিত্য-লীলায় সর্ব্বত্রই ব্রজ-দেবীগণের পরকীয়া-সুলভ 'দুর্ল্লভতা' ও 'বার্য্যমানতা' বর্ত্তমান দেখা যায় (২); রাগানুগ-ভক্তগণ সে ভাবেই ব্রজ-লীলার অনুধ্যান করিয়া থাকেন; সুতরাং বস্তু-গত্যা প্রকট-লীলায় যদিও কোনও সময়ে কাহারও নিকটে ব্রজ-দেবীগণের পারমার্থিক স্বীয়াত্ব প্রকটিতও হইয়া থাকে, তথাপি যোগ-মায়ার প্রভাবে ব্রজ-যুগলের

---

(১) সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ, গ্রন্থকার শ্রীরূপ গোস্বামিচরণের শিষ্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্র; সুতরাং গ্রন্থকারের অভিপ্রায় জানিবার সম্ভাবনা তাঁহার পক্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বিশেষতঃ শ্রীজীবগোস্বামিচরণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন,তাহাই যে শ্রীরূপ গোস্বামিচরণেরও অভিপ্রায়,শ্রীজীব গোস্বামিচরণ তাহাও স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন। "শ্রীমদস্মদুপজীব্যচরণৈরপি ললিতমাধবে তথৈব সমাপিতম্।" শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।১৭৮।—সম্পাদক।

(২) এ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামিচরণের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রজসুন্দরীগণের পরকীয়াত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে উপপতিভাব প্রাতীতিকমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ তাঁহাদের পতি, যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে উপপতিভাব পোষণ করিয়াছেন। "মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।" সুতরাং ব্রজসুন্দরীগণের পতিই (শ্রীকৃষ্ণই) তাঁহাদের নিকটে উপপতি বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন "জারত্বঞ্চ প্রাতীতিকমাত্রম্।"—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ। ১৭৮। সম্পাদক।

নিকট তাঁহাদিগের নিত্য-লীলার অনুযায়ী প্রেম-রসাস্বাদনই অব্যাহত রহিয়াছে,—স্বীয়া-বাদের প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক শ্রীজীব গোস্বামি-পাদেরও বোধ হয় ইহা অনভিমত নহে। সে যাহা হউক, পদাবলী-সাহিত্যে কিন্তু আমরা সুদূর প্রবাসের পরবর্ত্তী সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ-মিলনের বর্ণনায়ও ব্রজদেবী-গণের সেই চির-কালের আরোপিত পরকীয়া-ভাবই দেখিতে পাই। এস্থলে ইহাও বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, অনেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের ধারণা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় কংস-বধের পরে আর ব্রজে প্রত্যাগমন করেন নাই; বিয়োগান্ত কাব্যরচনা আমাদিগের আলঙ্কারিকদিগের মতে অকর্ত্তব্য বলিয়াই, বৈষ্ণব-কবিগণ মাথুর-লীলার অন্তে কাল্পনিক সম্মিলনের পদ রচিয়া দিয়াছেন। এইরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক এবং শ্রীভাগবত-আদি শাস্ত্র-গ্রন্থের উক্তির বিরুদ্ধ, তাহা আমরা শ্রীজীব গোস্বামি-পদের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গেই বলিয়াছি। দুঃখের বিষয় যে, এই অবশ্য-জ্ঞাতব্য তত্ত্বটা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও অবিদিত বলিয়া কৃষ্ণ-গত-প্রাণা ব্রজাঙ্গনাদিগকে চির-কালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপর অপ্রেমিকত্ব-দোষের আরোপ করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না।

আমরা এখন গোবিন্দদাসের 'সমৃদ্ধিমান্' সম্ভোগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। যে জন্যই হউক, 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পদের সংখ্যা অধিক নহে। আমরা এ ভাবের মাত্র কয়েকটী পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; উহার মধ্যে আবার কয়েকটী পদ সাধারণ পাঠকের নিকট ব্যাখ্যার যোগ্য নহে বলিয়া বাদ দেওয়ায়, স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা নায়িকা সহ মাত্র চারিটী পদ এখানে উদ্ধৃত করার যোগ্য বলিয়া, ক্রমে উদ্ধৃত করা গেল। এক সখী অন্য সখীকে দেখাইয়া বলিতেছেন,—

শ্রীরাগ।

অধর-সুধা-রসে লুবধক মানস

তবহুঁ পরিরম্ভণ চাহ।

মুখ-অবলোকনে অনিমিখ লোচনে

কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥

দেখ সখি রাধা-মাধব-প্রেম।

তুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশন গাঁঠিক হেম ॥ধ্রু॥
আনন্দ নীরে নয়ন সব ঝাঁপয়ে
তবহি পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন
সুরত-জলধি অবগাহ ॥
মধুরিম-হাস- সুধা-রস-বরিখণে
গদগদ রোধয়ে ভায়।
চির-দিনে মিলন লাখ গুণ নিধুবন
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

১—৪। (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের) মন (পরস্পরের) অধর-সুধা-রস পানের জন্য লুব্ধ; (তাঁহাদের) তনু (পরস্পরের) আলিঙ্গন চাহে; লোচন (মনের সাধে) মুখ দর্শন করার জন্য অনিমিখ অর্থাৎ পলকের অভাব চাহে (অর্থাৎ কামনা করে); (কিন্তু) কি-প্রকারে (উহা) নির্ব্বাহ হইবে? (বাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া যে কিরূপে অসম্ভব হইয়াছে, পদ-কর্ত্তা তৃতীয় কলিতে তাহা বর্ণিত করিয়াছেন)।

৫—৭। হে সখি! শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম দেখ! (উভয়ে উভয়ের) দর্শন যেন তুর্ল্লভ রত্ন (এবং) স্পর্শ (তুর্মোচনীয়) গ্রন্থির (গাঁইট্ বা গিরার) স্বর্ণের ন্যায় অপ্রাপ্য মনে করে।

৮—১১। যখন আনন্দ-জনিত জল-ধারায় নয়ন আবৃত করে, তখনই (উভয়ের নিকট উভয়ে অদৃশ্য হওয়ায়, স্পর্শের সাহায্যে পরস্পরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়) বাহু প্রসারিত করিতে (সেই বাহুও) ঘন ঘন কম্পিত হয়, অর্থাৎ পরস্পরকে গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করিতে পারে না; (এ অবস্থায়) কি প্রকারে (উভয়ে) সুরত-সমুদ্রে অবগাহন করিবে? (ধ্বনি—সুরত-সমুদ্র উত্তরণ করিতে হইলে সবল বাহুর প্রয়োজন; নতুবা সমুদ্রে ডুবিয়া যাওয়াই সম্ভব বটে; আমাদের এই প্রেমিক-যুগল দৃষ্টি-শক্তি-রহিত ও অবশ বাহু-বিশিষ্ট বলিয়া তাহারা নিশ্চিতই বিলাস-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে, কোনওরূপেই আর উহা হইতে নির্গত হইতে পারিবে না; অর্থাৎ রস-বিলাসের চরম পরাকাষ্ঠাই এখন সঙ্ঘটিত হইবে)।

১২—১৫। (উভয়ের) সুমধুর (ঈষৎ) হাস্য-রূপ অমৃত-রসের বর্ষণ অর্থাৎ অজস্র বিকাশ ও (ভাবাতিশয্য-জনিত) গদ্গদ অর্থাৎ কণ্ঠের জড়তা বাক্যকে রুদ্ধ করে; গোবিন্দদাস কহে বহুদিনের পরে মিলন (হইয়াছে), সুরত-লীলা (স্বাভাবিক অবস্থা হইতে) লক্ষ-গুণ অধিক হইবে)।

রস-শাস্ত্রে অষ্ট-নায়িকার বর্ণন-প্রসঙ্গে 'প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা' নায়িকার পরে সকলের শেষে "স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা" নায়িকার বর্ণন দেখা যায়। মাথুর-লীলায়ই শ্রীরাধার প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা-অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং মাথুর-লীলার অবসানে বর্ণিতব্য সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পরেই শ্রীরাধার "স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা" অবস্থা সঙ্গত বটে; তাই দেখা যায় যে 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সমৃদ্ধিমান্। সম্ভোগের প্রকারান্তর বলিয়াই শ্রীরাধার স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

'উজ্জ্বল-নীল-মণি' গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদ "স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা" নায়িকার লক্ষণ-স্থলে লিখিয়াছেন—

"স্বায়ত্তাসন্ন-দয়িতা ভবেৎ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা।
সলিলারণ্য-বিক্রীড়া-কুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥

অর্থাৎ জল-বিহার, বন-বিহার, পুষ্প-চয়নাদি-কারিণী যে নায়িকার প্রিয়তম নিজের অধীন ও নিকটবর্ত্তী রহেন, সেই নায়িকাকে 'স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা" বলা হয়। গোস্বামি-পাদ উদাহরণস্থলে প্রথমে 'মৃদা কুর্ব্বন্ পত্রাঙ্কুরমনুপমং পীনকুচয়োঃ"* ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, যেন উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়াই পরে আবার শ্রীগীতগোবিন্দ হইতেই শ্রীরাধার উক্তি "রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়োঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন; কেননা প্রথম শ্লোকটীতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার অধীনত্ব শব্দবারা স্পষ্টভাবে উক্ত হয় নাই; দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরাধার আদেশ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বেশ-রচনা করায়, প্রিয়তমার অধীনত্ব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এজন্যই প্রাচীন রস-শাস্ত্রকার ভানুদত্ত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "রসমঞ্জরী" গ্রন্থে "স্বাধীনভর্ত্তৃকা" নায়িকার যে লক্ষণ ও 'ধীরা' আদি প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর নায়িকাভেদে উক্ত নায়িকাগণের যে অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ স্বরচিত

---

* অর্থাৎ (শ্রীকৃষ্ণ) হর্ষে (শ্রীরাধার) পীন স্তনযুগলে অনুপম (মৃগমদ-দ্রবের) চিত্রাবলী বিরচিত করিতেছেন, ইত্যাদি।

উদাহরণ দিয়াছেন, উহাতে এই প্রেমহেতু প্রেয়সীর অধীনত্বই নায়কের কার্য্যে বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ; আমরা সংস্কৃত শ্লোক না দিয়া, আমাদের অনুদিত "রসমঞ্জরী" হইতে এ স্থলে ঐ লক্ষণটী উদ্ধৃত করিলাম,—

"সদা কান্ত করে যার আদেশ পালন,—
স্বাধীন-ভর্তৃকা তারে কহে কবিগণ ;
মদন-উৎসব-যাত্রা, কানন-বিহার,
বাসনা, উল্লাস আর প্রেম-অহঙ্কার,
হেন বহুবিধ তার যত আচরণ—
কান্তের সোহাগ বটে তাহার কারণ ! *

রস-মঞ্জরীতে নানা শ্রেণীর স্বাধীন-ভর্তৃকা নায়িকাগণের যে বিচিত্র বর্ণনা আছে, অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম না ; কৌতূহলী পাঠক 'রস-মঞ্জরী' দেখিবেন। সমগ্র রস-সাহিত্যে 'অভিসারিকা' 'বাসক-সজ্জা ইত্যাদি অষ্ট নায়িকার 'মুগ্ধা', 'মধ্যা', 'প্রগল্‌ভা', 'পরকীয়া' ও 'গণিকা' ভেদে, অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও কবিত্ব-পূর্ণ স্ব-রচিত উদাহরণ প্রদর্শনে রস-মঞ্জরীর তুলনা নাই। আমরা গোবিন্দদাসের তিনটি মাত্র স্বাধীন-ভর্তৃকার পদ পাইয়াছি ; উহা নিম্নে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইল,—

কেদার।

ধনি ধনি রমণি-শিরোমণি রাই।
নয়নক ওত করত নাহি মাধব
নিশি-দিশি রস অবগাই ॥ ধ্রু ॥
কর-তলে কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোচনে পুন পুন হেরই
আকুল গদগদ বোল ॥

* মৎকর্তৃক প্রকাশিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আদি সম্বলিত রসমঞ্জরীর পদ্যানুবাদ

লোচন-খঞ্জনে অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি-মূল।
অতসি-কুসুম-সরি ললিত হৃদয়ে ধরি
কৃপণ হেম সমতূল ॥
যাবক-চীত চরণ-পর লীখই
মদন-পরাজয়-পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল
কামুক আরকত হাত ॥

১—৩। রমণি-শিরোমণি শ্রীরাধিকা ধন্য ধন্য! শ্রীকৃষ্ণ (তাঁহাকে) নয়নের আড়াল করেন না; নিশি-দিন (তাঁহার) প্রেম-রসে অবগাহন করেন।

৪—৭। (শ্রীকৃষ্ণ) কর-তল দ্বারা সেই (প্রিয়তমার) মুখ মার্জ্জন করেন, মুগ্ধ হইয়া (উহাতে) অলক-তিলক অঙ্কিত করেন; সজল-নয়নে পুনঃ পুনঃ (সেই মুখ) দর্শন করিয়া আকুল হন; (তাঁহার) বাক্য গদগদ অর্থাৎ জড়তা-পূর্ণ হয়।

৮—১১। (শ্রীকৃষ্ণ) অঞ্জন দ্বারা (শ্রীরাধার) খঞ্জনবৎ (নৃত্য-শীল ও চঞ্চল (লোচন-যুগলকে (এবং) নব নীলোৎপল দ্বারা (শ্রীরাধার) কর্ণ-মূল ভূষিত করেন; (শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অর্পিত) অতসী-কুসুমের * অর্থাৎ সুনীল-মসিনা বা তিসী ফুলের ললিত-মালাকে কৃপণের স্বর্ণের ন্যায় (অতি সযত্নে) হৃদয়ে ধারণ করেন।

১২—১৫। (শ্রীকৃষ্ণ) মদন-কর্ত্তৃক নিজের পরাজয়ের পত্র অর্থাৎ 'দলিল'-স্বরূপ (শ্রীরাধার) চরণ-তলের উপরে আলতার চিত্র অঙ্কিত করেন; গোবিন্দদাস কহে, ভাল হইল; শ্রীকৃষ্ণের হাত (স্বভাবতই) আরক্তিম বলিয়া

---

* 'অতসী' শব্দের 'তিসী' এবং 'শণ'—দুই অর্থই অভিধানে আছে। পদাবলী-সাহিত্যে ইহা 'তিসী' অর্থেই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তিসী' ফুলের রঙ সুনীল এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তির তুল্য, এ জন্যই অতসী-মাল্য শ্রীরাধার বিশেষ প্রিয়।—লেখক।

আল্তার রঙ্ উহাতে সহজে লক্ষিত হইবে না; সুতরাং তিনি সে জন্য দাদা বলরাম প্রভৃতির নিকট অপ্রতিভ বা লজ্জিত হইবেন না। পুরুষে হাতে বা পায়ে আল্তা পরে না; স্ত্রীলোককে আল্তা পরাইতে না গেলে পুরুষের হাতে আল্তার দাগ লাগিবার কোনই কারণ নাই; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের হাতের আলতার দাগ দেখিতে পাইলে বলরাম প্রভৃতি যে তাঁহাকে নিশ্চিতই সন্দেহ করিতেন, তাহা বলা বাহুল্য।)

"মদন-পরাজয়-পাত লীখই" বাক্যের সার্থকতা এই যে, শ্রীরাধা মদনের মূর্তিমতী জয়-শক্তি-রূপিণী বলিয়া, তাঁহার প্রেমের শক্তিদ্বারা পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আজ্ঞাকারী হওয়ায়, প্রকারান্তরে উহাকে মদনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় বলিয়াই বলা যাইতে পারে; সুতরাং শ্রীরাধার আদেশে তাঁহার চরণে শ্রীকৃষ্ণের অলক্ত-রচন কার্য্যকে কবি উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের সাহায্যে মদনের নিকট নিজের পরাজয়-সূচক পত্র-লিখন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীরাধা কন্দর্পের শ্রীকৃষ্ণ-জয় বিষয়ে "জঙ্গম-দেবতা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যথা—

"ভ্রূ-পল্লবং ধনুরপাঙ্গ-তরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণ-পালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গ-জয়-জঙ্গম-দেবতায়াং—
মস্ত্রাণি নির্জ্জিত-জগন্তি কিমর্পিতানি ॥"

অর্থাৎ—

"ভুরু-লতা—ধনু, বাণ—কটাক্ষ-বীক্ষণ,
শ্রবণের প্রান্ত তাহে গুণ সুশোভন,—
অনঙ্গের জয়-দাত্রী দেবী শ্রীরাধারে,
বিশ্ব জিনি' এ অস্ত্র কি কামে দিল ফিরে!"

পুনশ্চ—

ললিত।

আনন্দ-নীরে যতনে করি বারত (১)।
অলক-তিলক নিরমাই (২)।

কুঞ্চিত (৩) লোচনে হরি-মুখ হেরইতে
থরহরি কাঁপয়ে রাই ॥
দেখ সখি ! রাধা-মাধব-নেহ (৪)।
নাগরি-বেশ বনাওত নাগর
ভাবে অবশ দুহুঁ-দেহ ॥ ধ্রু ॥

কোরহিঁ ধাঁতি (৫) পুনহু হরি সাজত (৬)
পীন পয়োধর-জোর (৭)।
ঘামল (৮) কর-পঙ্কজ-জলে ধোয়ল
মৃগমদ-চীত (৯) উজোর (১০) ॥

মরমক বোল কহত দুহুঁ আকুল
রোদন গদগদ ভাষ।
অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল
না বুঝল গোবিন্দদাস ॥

"অধর বিলোকনে" ইত্যাদি পংক্তি-দ্বয়ের অর্থ—অধরের দর্শনে ইঙ্গিত দ্বারা কি কহিল, গোবিন্দদাস বুঝিতে পারিল না। অধরের প্রতি সস্পৃহ দৃষ্টি দ্বারা যে অধরপানের অভিলাষই ব্যক্ত হয়, ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না; দৃশ্যকাব্যে চুম্বন, অধর-পান ইত্যাদির প্রদর্শন আলঙ্কারিকদিগের মতে নিষিদ্ধ হইলেও, শ্রব্য-কাব্যে চুম্বন, অধরপান প্রভৃতির সরস ও সুন্দর বর্ণনা নিষিদ্ধ হয় নাই; বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদে তাদৃশ বর্ণনা বিরল নহে। এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অধর-পান-লালসা স্পষ্ট বর্ণিত না করিয়া,—এ ভাবে ব্যঞ্জিত করায়, তাৎপর্য্য-টা ধ্বনি-দ্বারা গম্য হইয়াছে বলিয়া, অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে উত্তম কাব্যের প্রযোজক হইয়াছে; স্পষ্টভাবে এ কথাটা বলিলে, অর্থ শব্দ-বাচ্য হওয়ায় উত্তম-কাব্যত্বের হানি হইত।

---

(১) নিবারণ করেন (২) নির্ম্মাণ করেন (৩) বঙ্কিম (৪) প্রেম (৫) ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিয়া (৬) সজ্জিত করেন (৭) যুগল (৮) ঘর্ম্ম-যুক্ত (৯) চিত্র (১০) উজ্জ্বল।

পুনশ্চ—স্বাধীন-ভর্তৃকা শ্রীরাধার উক্তি,—

ভূপালী।

আকুল কুটিল অলক-কুল সঙরী (১)।
সীঁথি বনাই (২) বান্ধ পুন কবরী॥
তহিঁ সঙাচ (৩) সিন্দূরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজ (৪) মুখ-ইন্দু॥
এ হরি! রতি-রস-অবশ! রসাল (৫)।
বিঘটিত (৬) বেশ বনাহ পুনবার॥ ধ্রু।
কাজরে উজোরহ (৭) লোচন ভ্রমরী।
শ্রুতি (৮) অবতংসহ (৯) কিসলয়-চমরী (১০)॥
পীন-পয়োধরে থির (১১) কর (১২) আপি (১৩)।
মৃগমদে রঞ্জহ নখপদ (১৪) ছাপি (১৫)॥
বিগলিত (১৬) কম্বু-বলয়-গণ (১৭) মোর।
সীধে [১৮] পিন্ধায়হ (১৯) নূপুর জোর॥
মেটল (২০) যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দদাস দেখউ (২১) পরতেখ (২২)॥

"পীন পয়োধরে" ইত্যাদি বাক্যের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ঘর্ম্ম, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক অনুভাবের উদ্রেক হওয়ায় শ্রীরাধার স্তনে কৃষ্ণবর্ণ মৃগমদ অর্থাৎ কস্তুরী দ্রব্যের দ্বারা চিত্ররচনা কালে ঘর্ম্ম-জলে সেই চিত্র ধুইয়া যাইতেছিল, যথা পূর্ব্ব-পদে—

"ঘামল কর-পঙ্কজ-জলে ধোয়াল
মৃগমদ চীত উজোর।

(১) সম্বরণ অর্থাৎ যথাস্থানে স্থাপন করিয়া (২) বানাইয়া (৩) যথাস্থানে স্থাপন কর (৪) সাজাও (৫) মনোহর (৬) স্খলিত (৭) উজ্জ্বল কর (৮) কর্ণ (৯) কর্ণ-ভূষণ বানাও (১০) নব পল্লব গুচ্ছ; (চামর আকৃতি-বিশিষ্ট বলিয়া গুচ্ছকে 'চমরী' বলা হইয়াছে কি?) (১১) স্থির (১২) হস্ত (১৩) অর্পণ করিয়া (১৪) নখ-ক্ষতের চিহ্ন (১৫) ঢাকিয়া (১৬) ভ্রষ্ট (১৭) শাঁখার বালাগুলি (১৮) সিধা, সোজা (১৯) পরাও (২০) লুপ্ত [২১] দেখুক [২২] প্রত্যক্ষ।

তা' ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কম্পিত হওয়ায়, চিত্র ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছিল না; যদিও শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবাবেশের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়া, শ্রীরাধা অন্তরে নিশ্চিতই আনন্দিত হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক 'অবহিত্থা' অর্থাৎ ভাব-সঙ্গোপন, 'বামতা' অর্থাৎ রস-বৃদ্ধির জন্য প্রতিকূলতা ও 'গর্ব্ব' প্রভৃতি গুণ-হেতু তিনি তাঁহার মনের আনন্দ গোপন করিয়া 'বামতা' 'গর্ব্ব' প্রভৃতির পরিচয় দিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—"এ কি? চিত্র-রচনা করিতে যাইয়া তোমার হস্ত-কম্পিত হয় কেন? চিত্র যে ঠিক মত হইতেছে না; হাত স্থির রাখিয়া, নখ-চিহ্ন ঢাকিয়া মৃগমদ-চিত্র অঙ্কিত কর!" পয়োধরে নখ-চিহ্ন গুরুজনদিগের দ্বারা লক্ষিত হইলে প্রমাদ হইবে এবং চিত্র অসুন্দর হইলে সুচতুরা সখীগণের নিকট উহার কারণ গুপ্ত থাকিবে না বলিয়া, লজ্জা পাইতে হইবে; সুতরাং "পীন পয়োধর" ইত্যাদি ধ্বনি-পূর্ণ বাক্যের ইঙ্গিতে অনেক তাৎপর্য্যই ব্যঞ্জিত হইতেছে। "সীথে পিন্ধায়হ" ইত্যাদি বাক্যেও ভাবাবেশজনিত জড়তাহেতু শ্রীকৃষ্ণের সোজাভাবে নূপুর পরাইবার অক্ষমতাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'গোবিন্দদাস' ইত্যাদি শেষ পঙ্‌ক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সখীর অনুগা গোবিন্দদাস যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে, শ্রীরাধার বেশ-ভূষা যেমন-তেমনই রহিয়াছে; তাহা হইলে সে কোনও বিলাস ঘটে নাই, মনে করিয়া প্রতারিত হইবে, এবং উহা লইয়া সখীদিগের মধ্যে বেশ একটা হাস্য-কৌতুক চলিবে!

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্‌-এ।

বঙ্গের বাহিরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার, আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহারই আলোচনা করিব—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলা হয় কেন? ইহার কারণ এই যে, তিনি এই শ্রীহরি-নামের মাহাত্মাই প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস—এইভাবে দেখিলে এবিষয়ে সকল মত-বিরোধের মীমাংসা হইয়া যায়। আসুন,

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে নদীয়ার কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহারই আলোচনা করি। শ্রীগৌরাঙ্গ কোন নূতন কার্য্য করিতে আসেন নাই—ইহাই তাঁহার অবতারত্বের প্রমাণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং—কোন অভিনব উদ্দেশ্য লইয়া তিনি অবতীর্ণ হন নাই। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—যাহা এতদিন গূঢ় ও রহস্যময় ছিল, তিনি তাহাই ব্যক্ত ও পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বৃন্দাবনলীলা এতই জটিল ও রহস্যাবৃত যে, আমরা উহার সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারিতাম না—এ জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় উপদেশ ও আচরণের দ্বারা আমাদিগকে ঐ লীলার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। তিনি প্রেমের দ্বারা শিক্ষা দিতেন। ব্যাসদেবের মতে কলিযুগে কেবলমাত্র হরিনাম, ভগবৎচিন্তা ও চিত্তের একাগ্রতার দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়। আপনারা জানেন—কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ মহামুনি বেদব্যাস বলিয়াছেন যে বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রসমূহে যে সকল আচার অনুষ্ঠান, বিধি নিয়ম বা ক্রিয়া কলাপাদির উপদেশ আছে—তাহা কলিকালের জন্য নহে। ঐ সকল সুন্দর সুন্দর শাস্ত্র রচনা করিয়াও তাঁহার প্রাণে শান্তি ছিল না—তিনি বিষণ্ণ মনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এত অলৌকিক শাস্ত্ররচনা—এত কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যার মধ্যেও তাঁহার প্রাণে কি যেন অভাব রহিয়া গিয়াছে। তাহা প্রেম। নারদ—কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার এবম্বিধ বিষাদের কারণ কি?" তিনি উত্তর করিলেন—"আমি অসুখী! প্রাণে শান্তি নাই। এত সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিলাম, তথাপি আমার হৃদয় বিষাদে পূর্ণ।" নারদ বলিলেন—"আপনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নস্তরের, সুতরাং শ্রেষ্ঠ পথের নির্দ্দেশক নহে। বৈদিক বিধিনিয়ম, আচার-অনুষ্ঠানাদিতে মুক্তিলাভ করা যায় না। কেবল মাত্র বিধিনিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—আত্মার মুক্তি সাধিত হয় না। আপনি ভগবৎ-মহিমা-কীর্ত্তন করেন নাই। ভগবৎ-মহিমা কীর্ত্তন ভিন্ন কেহই শান্তিলাভ করিতে পারে না। ইহাই উচ্চতম আদর্শ, ইহা আমাদিগের নিকটে স্বর্গের সুষমা আনিয়া দেয়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ এইবার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিলেন। তিনি ভগবৎ-মহিমা বর্ণনা করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত-নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি রচনা করিলেন। এই গ্রন্থে

ভগবৎ-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের মুকুটমণি এবং পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে কলিযুগে মুক্তির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, কলিযুগে কেবল নামকীর্ত্তনের দ্বারাই আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিতে পারি; অপিচ, এই গ্রন্থে চরম ভগবত্তত্ত্বেরও আলোচনা আছে। তাঁহাকে লাভ করিতে গেলে তাঁহাতে চিত্তসন্নিবেশ করা চাই। চিত্তসন্নিবেশের ফলে আমরা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা যে কলিযুগে কেবল মাত্র হরিনাম করিয়াই তাঁহাকে লাভ করিতে পারি, আমি যতদূর বুঝি—তাহার কারণ এই :—

ভগবান্ বিষ্ণু যখন মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন, মানবজাতির মানসিক গঠন অতীব স্থূল ছিল—মনের তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর তত্ত্বের ধারণা করিতে পারিত না। তৎপরে কূর্ম্মাবতার। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে—মনুষ্যজাতির অনুভূতি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম হইয়াছে। এইরূপে মানবের মনোবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুভবশক্তিও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও বিকশিত হয় এবং মানুষ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়ের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। আশা করি, আপনারা আমার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। অবতারের উৎকর্ষ হইতে মানবজাতির উৎকর্ষই সূচিত হয়। ভগবান্ যতই উচ্চতর ভূমিতে অবতীর্ণ হইতেছেন, বুঝিতে হইবে, মানুষ ততই উচ্চতর ভূমির স্পন্দন গ্রহণ করিবার শক্তিলাভ করিয়াছে। আমরা যতই ঊর্দ্ধে আরোহণ করি, ভগবানের অবতারও তত উচ্চপ্রকৃতির হইয়া থাকে। আমাদিগের আধ্যাত্মিক, শারীরিক বা মানসিক অনুভূতি আমাদিগের ক্রমবিকাশের অনুপাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এ যুগে মানবজাতি বহুলপরিমাণে স্বীয় মানবত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে—আমাদিগের অনুভবশক্তিও উহার চরমপরিণতি লাভ করিয়াছে; আমরা কি স্থূলজগৎ, কি মনোজগৎ, কি আধ্যাত্মজগৎ সকল ক্ষেত্রেই অতি সূক্ষ্মতম স্পন্দনসমূহে সাড়া দিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছি। হরিনাম করিয়া বা কৃষ্ণতত্ত্ব-কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া যায় এবং আমরা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎস্পর্শ-লাভ করিতে পারি। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, কলিযুগে কেবল ভগবানের নাম লইয়াই মানুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে।

মানুষ, যতই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকুক্না কেন, ছাগশিশু হত্যা করিতে পারে না ; কেননা তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং অনেকের সহজ-জ্ঞান-বিরুদ্ধ। ইহা নিকৃষ্ট স্তরের ব্যাপার। ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মধ্যে কেহই এরূপ শিক্ষা দেন নাই। মানুষ উন্নত হইলে, এমন কি নিজের জীবন রক্ষার্থেও কোন প্রাণহত্যা করিতে পারে না। প্রাণিহত্যার দ্বারা যে মুক্তিলাভ হইবে, একথা কেহই বলিবেনা। সুতরাং নিম্নদিগে দৃষ্টি না করিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করাই মুক্তিলাভের উপায়। এজন্যই বলা হয়—"কলিযুগ ধন্য স্ত্রী ও শূদ্র-জাতি ধন্য।" কেননা এইযুগে আমরা কেবলমাত্র শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিয়াই পবিত্রতা অর্জ্জন করিতে পারি এবং তাঁহার প্রেমদান করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারি। শ্রীগৌরাঙ্গ তদীয় জীবন ও কার্য্যাবলীর দ্বারা আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন নাই ; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একই দেহে শ্রীরাধা ও গোবিন্দের মিলিতভাব প্রদর্শন করাই তাঁহার কার্য্য। কিরূপে কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারা এবং শ্রীভগবানের নাম, গুণ ও লীলাদি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়, তিনি তাঁহার জীবনের আগাগোড়া সেই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার সমগ্র জীবনে কেবল ইহাই দেখিতে পাই। কখনও তিনি রাধাভাবে ভাবিত হইয়া ক্রন্দন করিতেন—আবার কখনও তাঁহাকে দেখি, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা ও রোদন করিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কখনও তিনি কেবল "কৃষ্ণ," "কৃষ্ণ" করিতেছেন, আবার কখনও দেখি, বলিতেছেন "বল কৃষ্ণ, জপ কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ-নাম"—বল "হরিবোল," "হরিবোল"। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা। এইজন্যই বলা হয়, তিনি অবতার নহেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি কেবল তাহাই সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ, অথবা দ্বারকার গৃহী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না—কেননা, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ গৃহী — কিরূপে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়া ভগবানকে লাভ করিতে হয়, কেবল সেই শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা পাই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিরূপে।

শ্রীকৃষ্ণের যাহা কার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গেরও তাহাই কার্য্য—কেননা উভয়েই

তত্ত্বতঃ এক। উভয়ে একই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন, সেইভাবে মৃদঙ্গ-করতাল প্রভৃতি যন্ত্রসংযোগে শ্রীহরির নামকীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে কলিযুগে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোচ্চতম শিক্ষা। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও শিক্ষা দিয়াছেন—কেমন করিয়া ভগবৎপ্রেমের উল্লাসে নৃত্য করিতে হয়; কেননা, হরি, হরি, শ্রীরাধাগোবিন্দ এই সকল নাম করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে ও ধ্যানের অবস্থা আসে। এই চিত্তের একাগ্রতা ও ধ্যানের অবস্থা আমাদিগের অন্তঃপ্রকৃতিকে পরিস্ফুট করিয়া তোলে। আমরা তাঁহাকে দেখি—প্রাণ খুলিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতেছেন, আর সকল অবস্থাতেই রাধাগোবিন্দ নাম-স্মরণ করিতেছেন। যখনই আমাদিগের চিত্ত একটিমাত্র বিষয়ে নিবিষ্ট হয়—তখনই আমরা তাহাই হইয়া যাই। রাধাগোবিন্দে আমাদের চিত্ত স্থির হইলে আমরা তাহাই হইয়া যাইব। শাস্ত্র বলিয়াছেন 'আমরা যাহাই ভাবি, তাহাই হইয়া যাই'। আপনারা জানেন অন্ততঃ আপনাদের জানা উচিত—ধ্যান-ধারণার দ্বারা আমরা ধ্যেয় বস্তুর ভাবে ভাবিত হইয়া যাই। ভাগবৎ-গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের চিত্ত তাঁহার মহিমায় নিবদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহারই ফলে আমরা পূর্ণ সমাধিলাভ করিয়া থাকি। সংকীর্ত্তনে আমরা শ্রীভগবানের মহিমা-গান করিয়া থাকি এবং আনন্দে নৃত্য করি। তখন আমরা একেবারে তন্ময় হইয়া যাই। শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন। এই নৃত্যের এতদূর শক্তি যে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের চব্বিশ বৎসর কেবল ভগবানের নাম-গান ও নৃত্য করিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন। কীর্ত্তনের অপার্থিব স্পন্দনে তাঁহার সর্ব্বদেহ কম্পিত হইত এবং এইভাবে তিনি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হন। যেহেতু ভগবন্নাম-কীর্ত্তন ও নৃত্যই কলিযুগে মুক্তিলাভের উপায়, সেই হেতু, আসুন্ আমরা অহরহঃ শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন ও গান করি—একমুহূর্ত্তও যেন নাম-স্মরণে বিরত না হই। তাহা হইলে, যাহা কিছু দেখিব ও স্পর্শ করিব, সবই কৃষ্ণময় হইয়া যাইবে। অতএব, আসুন্ আমরা অবিশ্রান্ত হরিনাম করি—"হরি-বোল" "হরি-বোল" বলি আর ভক্তির উল্লাসে নৃত্য করি। ইহাই মুক্তির উপায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়।

অসমোর্দ্ধ-কারুণ্য।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণধাম।
যছু গুণে সুর নর অসুর পরিপূরিত
চরাচর ভক্ত হরিনাম॥
বিহি বড়ি বাদী দোষ-নিধি কলিযুগ
সবহু ধরম-পথ বাঁধা।
তাহে অরু পাষণ্ড মত কত পরচার
লুপ্ত সাধন-মরিযাদা॥
তাহে অরু দুষ্ট- সঙ্গ-দোষ বিপাকহি
জনম জনম সেই সঙ্গ!
তছু রসে মাতি অথির অতি জীবন
সবহু ভরসা পথভঙ্গ॥
ঐছে হীন মতি অতিশয় ঘৃণাময়
নাহি যছু গতি লব লেশ।
তছুপর করই পরম কৃপা ঈক্ষণ,
মঙ্গল গুণহি অশেষ॥
যো সব গুণে অপুণ প্রতি অবতার
নিজ নিজ পূর্ণ স্বরূপে।
আজু দেখ সো সব আশ্রয়োচিত গুণ
বৈঠত বিষয়ক রূপে॥
পূর্ণ পরাবধি ঐছে করুণা রাশি
এক দেখি শ্রীমতিক-চিতে।
সো সব প্রকট লখই গোপী-বল্লভে
ভাব-কান্তি-ধারী পীতে॥

শ্রীগোপীনাথ বসাক।

শক্তি ও লীলা।

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসারী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের তিন প্রকার শক্তি স্বীকার করেন, যথা—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি—যেমন ব্রজদেবীগণ, মহিষীগণ ইত্যাদি; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—যাহা দ্বারা মায়িক জগৎ-সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়; ও তটস্থা জীবশক্তি। জীবকে তটস্থাশক্তি বলা হয়, তাহার একটী কারণ আছে; যেমন কোন লোক নদীর জলে বা স্থলে না থাকিয়া যদি তটে থাকে, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, সেইরূপ জীবেরও; সে যেন মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে—ঐশী শক্তি তাহাকে অন্তরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, আর মায়াশক্তি বহির্ম্মুখ করিতেছে। বিষ্ণুপুরাণে এই তিন প্রকার শক্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথাপরা
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।"

অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি ত্রিবিধ; যথা—পরা বা স্বরূপশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীব শক্তি ও মায়াশক্তি।

শ্রীগীতায় আমরা পরা ও অপরা শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই;

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।"

ভূমি, আপ প্রভৃতি অপরা প্রকৃতি ভগবান্ হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থান করিতেছে, তাহার ঠিক পরেই উক্ত হইয়াছে,

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।"

অর্থাৎ আর একটী জীব-নামক পরাশক্তি আছে, যাহা জগৎ ধারণ করিয়া আছে। শ্রুতি ও বলেন-"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ" অর্থাৎ ভগবানের পরাশক্তি নানাবিধ শ্রুত হইয়া থাকে; ইহা তাঁহার স্বাভাবিকী অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধা। এখানে পরাশক্তি ও তাহার বিভাগ পাওয়া যাইতেছে। ভগবান স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়; তাঁহার শক্তিও সদংশে সন্ধিনী; চিদংশে সম্বিৎ ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী। এই শক্তি ও শক্তিমানে অত্যন্ত ভেদ

সম্বন্ধ না হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন—যেমন সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্যে ভেদাভেদাত্মক সম্বন্ধ। যেরূপ জগৎ-প্রসবিতা সবিতা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইলেও তিনি জগৎকে আলোক দানে চেতনাসম্পন্ন করেন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ হইলেও তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি দ্বারা স্বীয় ভক্তগণকে আনন্দিত করেন, কারণ ঐ আনন্দদায়িনী চিদানন্দময়ী ভক্তি-শক্তি পার্ষদ-ভক্ত-কোটিতে ও আপনাতে সদাই বিরাজমানা আছেন। যেরূপ নিজ অঙ্গে নিজ হস্ত স্পর্শে মানুষের সবিশেষ সুখোদয় হয় না; কিন্তু প্রিয়জন-কর-স্পর্শে হৃদয়ে স্বতঃই আনন্দ উদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজ স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী শ্রীভগবানে নিত্যাবস্থিতা হইলেও তিনি তাহা দ্বারা সেরূপ আনন্দোল্লাস অনুভব করেন না; যেরূপ আনন্দাতিশয়তা উদয় হয়—যখন ভক্তগণে অবস্থিতা ঐ স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিই তাঁহার হৃদয় বিগলিত করে।

এই তিন স্বরূপ-শক্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে। যেরূপ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারি রসের ক্রমোৎকর্ষ অর্থাৎ মধুর রসে চারি রসেরই সমাবেশ হয়, সেইরূপ সন্ধিনীতে সত্তা, সম্বিতে জ্ঞান ও হ্লাদিনীতে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের স্থিতি হেতু তাহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রজদেবীগণ, অন্তরঙ্গা হ্লাদিনীর যে সার বৃত্তি প্রেম, তাহারই মূর্ত্তি এবং তাহাদের মধ্যে শ্রীরাধা মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী—ইহা শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় সন্দর্ভগ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ রসিক-ভক্ত-মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই মর্ম্মই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব।"
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥

সেই ভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী, সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। গোপীগণ শ্রীভগবানের নিত্যকান্তা—যাঁহারা নিত্য চিন্ময় গোলোকধামে অপ্রকট লীলার পরিকর, তাঁহারাই প্রকট-লীলা-পুষ্টির জন্য অবতীর্ণা। গোপীগণ নিত্য-সিদ্ধা ও সাধন-সিদ্ধা ভেদে দুই প্রকার এবং যে সকল সাধন-সিদ্ধা গোপী নিত্য-সিদ্ধার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও রাসোৎসবে বিলাসাদি করিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহারা কৃপাসিদ্ধা নামে অভিহিতা। তবেই শাস্ত্রে যে সকল গোপী

সাধন করিয়াছিলেন প্রকাশ আছে, তাঁহারা সাধন-সিদ্ধা; কিন্তু শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী ও তৎ তৎ যূথের অন্যান্য গোপীগণ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সী। তাপনী-শ্রুতিতে দুর্ব্বাসার বাক্যে তাই উক্ত হইয়াছে—"সঃ বো হি স্বামী" অর্থাৎ ইনি [অর্থাৎ কৃষ্ণ] তোমাদের স্বামী। এই সকল নিত্য কান্তাগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-লীলা-বিলাসাদি করিয়া থাকেন; সেই জন্য এই লীলা চিন্ময়ী, মায়িক নহে। কারণ, যাহা স্বরূপশক্তির সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনও প্রাকৃত হইতে পারে না। এই লীলা যে মায়িক নহে, তাহা শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ও প্রীতিসন্দর্ভে বহু শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়া সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছেন।

লীলা দুই প্রকার—প্রকট ও অপ্রকট অর্থাৎ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীভগবান্ তদীয় পরিকরসহ ক্রমিক-লীলা করেন, তাহা প্রকট-লীলা নামে অভিহিত হয়; আর যখন প্রকট লীলাবসানে নিত্যধামে সেই লীলা-পুরুষোত্তম নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন, তখন তাহা অপ্রকট লীলা নামে কথিত হয়। এই লীলাদ্বয় পাদ্মোত্তরখণ্ডে ভোগ ও লীলা-শব্দে কথিত হইয়াছে, "ভোগো নিত্যস্থিতিস্তস্য লীলাং সংহরতে কদা" অর্থাৎ তাহার নিত্যস্থিতি ভোগ, লীলা কোন সময়ে সংহার প্রাপ্ত হয়, গঙ্গা-প্রবাহের মত নিত্য-প্রবাহময়ী লীলা-ভোগ ইহাই অপ্রকটলীলা, আর যাহা কখনও তিরোভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রকট-লীলা বলিয়া কথিত। প্রকটলীলা যুগপৎ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত-স্বরূপে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাই উক্ত হইয়াছে যে, যেমন সূর্য্য জ্যোতিশ্চক্রে আবর্ত্ত করেন এবং ক্রমে ক্রমে সপ্তদ্বীপাম্বুধি অতিক্রম করিয়া পুনরায় উদিত হন, সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলাচক্র প্রকটিত হয়। এইজন্য লীলা বিরামরহিত—ইহার আদি অন্ত নাই, কিন্তু এই লীলা নিরন্তর হইলেও শুদ্ধ ভক্তের নিকট ভগবান্ চির কিশোররূপে প্রতীয়মান হন, তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে,—

> "বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তি-রসাশ্রয়ঃ
> ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্য লীলাবিলাসবান্।"

অর্থাৎ বয়সের (বাল্য পৌগণ্ডাদির) বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল ভক্তিরসের আশ্রয় গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনে কৈশোরধর্ম্মী হইয়া নিত্যলীলায়

নিরত আছেন ; কারণ, এই গোকুলধামেই শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যসম্বলিত পরিপূর্ণ মাধুর্য্যলীলার বিকাশ। তাই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে"। যেরূপ তরঙ্গবিরহিত সমুদ্র কল্পনা করা সম্ভবপর নহে, সেইরূপ লীলাশূন্য-ভগবানও অচিন্তনীয়—সেই নিত্যলীলা-বিনোদী স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্যই লীলামগ্ন। যেরূপ প্রাকৃত-লোকে রাজপুত্র থাকিলেই তাহার তদনুরূপ অনুচরবর্গও থাকে ইহা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানও স্বীয় পরিকরমণ্ডল-মণ্ডিত হইয়াই নিত্যধামে বিরাজ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ও তদুত্তরে শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রকট-অপ্রকট-লীলা-সমন্বয়-তত্ত্ব সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে যখন বলিলেন "রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে" ইত্যাদি অর্থাৎ অক্রূর যখন শ্রীবলদেবের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া গেল, বিরহবিধুরা ব্রজবালাগণ কোন বস্তুই সুখকর মনে করেন নাই ; এমন কি সখীদের সঙ্গও আনন্দপ্রদ হয় নাই এবং যে সকল রজনী প্রিয়তম আমার (কৃষ্ণের) সহিত বিলাস করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষণকালতুল্য, আর বিচ্ছেদ-রজনী কল্পসম অতি দীর্ঘ হইয়াছিল। এই সকল বাক্য ভগবান্ বলিলে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের হৃদয় সংশয়-দোলায় দোল্যায়িত হইয়াছিল এবং কোথায় কিরূপে ব্রজদেবীগণ পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার বিষয় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তদীয় ক্রমসন্দর্ভে যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, সেইরূপে আলোচনা করিলেই অপ্রকট ও প্রকট-লীলার রহস্য সুষ্ঠুভাবেই উপলব্ধি হইবে। ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

> "স এষ জীবো বিবর-প্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
> মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্যরূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥"—১১।১২।১৭

অর্থাৎ মল্লক্ষণ জীব—জগৎ-জীবন হেতু—বিশেষতঃ ব্রজের জীবন হেতু আমার প্রাণতুল্য ব্রজের সহিত বিবর-প্রসূতি অর্থাৎ অপ্রকট-লীলা হইতে প্রকট-লীলায় অভিব্যক্ত হইয়া পুনরায় গুহায় অর্থাৎ অপ্রকট-লীলায় ব্রজের

সহিত প্রবিষ্ট হই। কিরূপে তাই বলিতেছেন—মাত্রা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ বল স্বর—ভাবা, গান ইত্যাদি বর্ণ রূপ এই সকল সমন্বিত হইয়া স্থবিষ্ট অর্থাৎ নিজ পরিজনের নিকট প্রকট; কিন্তু বহিরঙ্গ অন্য সাধারণের নিকট মনোময় অর্থাৎ যথাকথঞ্চিৎ মনে অনুভবযোগ্য। প্রকট-লীলার আবির্ভাবও এইরূপে "আকাশে যেরূপ উষ্মানল কাষ্ঠে মথিত হইলে বায়ুর সাহায্যে সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হয়" ইত্যাদি বাক্যে গর্ভাদিক্রমে ভগবানের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। ইহাই শ্রীপাদ শ্রীজীব-গোস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্ম। অধিকন্তু পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে, ব্রজদেবীগণ কাহাকেও সুখের হেতু বলিয়া মনে করে নাই—এখানে অতীতকাল প্রয়োগহেতু বুঝা যাইতেছে যে, এখন সুখের হেতু বলিয়া মনে করেন; কারণ, অপ্রকট-লীলায় শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের নিত্য মিলন; কিন্তু বিগাঢ় বিরহদশায় শ্রীব্রজসুন্দরীগণ এরূপ প্রেমাতিশয়তা নিবন্ধন মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, প্রকট ও অপ্রকট-লীলার ভেদানুভূতি একেবারেই তিরোহিত হইয়াছিল।

অপ্রকট-লীলায় ও প্রকট-লীলাগত সংযোগ-বিয়োগাদির বৈচিত্রী নিবন্ধন অভিমান থাকিয়া যায়। এইরূপ বাক্য হইতে বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, শ্রীভগবান্ অপ্রকট-লীলায় কখনও শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করেন না। কারণ, ব্রজ তাঁহার জীবনতুল্য এবং ব্রজবাসীরাও কৃষ্ণবিরহে জীবনধারণ করিতে পারে না। এ বিষয় শাস্ত্রবচন এই,—

> "কৃষ্ণোঽন্যো যদু-সম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্র-নন্দনঃ।
> বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥"

অর্থাৎ যিনি যদু-সম্ভূত কৃষ্ণ তিনি এক, আর যিনি গোপেন্দ্রনন্দন তিনি অন্য। নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কদাচ কোথাও গমন করেন না, অর্থাৎ অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ গোপীজনবল্লভ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য-বিলাসস্থান ব্রজ কদাপি ত্যাগ করেন না। লঘুভাগবতামৃতে এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন "অপ্রকট-লীলামাদায় সঙ্গতিমৎ" অর্থাৎ অপ্রকট-লীলায় কখনই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীধাম ত্যাগ করেন না। উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্যে যে যদু-সম্ভূত কৃষ্ণ ও যশোদানন্দন কৃষ্ণের মধ্যে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বরূপগত নহে; কিন্তু মাধুর্য্যগত অর্থাৎ

'ব্রজেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণঃ' অর্থাৎ ব্রজেই পরিপূর্ণ মাধুর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। যিনি মথুরার কৃষ্ণ,তিনি স্বয়ং ভগবান্ নন্দ-নন্দন কৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ;সেখানে তাদৃশ মাধুর্য্য অভিব্যক্ত হয় নাই, ইহাই প্রভেদ ; নচেৎ ঈশ্বরত্বে ভেদ স্বীকার করিলে অপরাধ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও নীলাচলে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

[illegible] বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে॥"—চৈঃ চঃ অ।

তাহা হইলে দেখা গেল যে, প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ স্বজনসহ বিলাস করেন, অপ্রকট-লীলায়ও তাঁহাদের নিকট সেইরূপেই অবস্থান করেন। যাহারা বহির্মুখ, তাহারা দেখিতে পায় না ; কিন্তু যাঁহারা অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যোদয়ে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আজও সেই চিন্ময়ীলীলা ভাববিভাবিত-নেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। তাই উক্ত হইয়াছে "অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ভ্রমন্ বৃন্দাবনান্তরে।" প্রকট-লীলায় শ্রীভগবান্ নিজ প্রিয়জনসহ মিলনের অন্তরায়স্বরূপ ভূভার-হরণ কার্য্যাদি লইয়া ব্যাপৃত থাকেন ; কিন্তু অপ্রকট-লীলা বহিরঙ্গ জীবের স্থূলদৃষ্টির বহির্ভূত বলিয়া তথায় এরূপ বিঘ্ন সম্ভব নহে, সেই ভক্তাধীন ভগবান্ প্রকট-লীলাকে অপ্রকট-লীলায় একীভূত করেন। এইরূপে শ্রীভগবদ্ধাম ও লীলার নিত্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে—এটী গৌড়ীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আধ্যাত্ম-জগতে এক অভিনব অমূল্য দান। পূর্ব্বতন অদ্বৈত-আচার্য্যগণ লীলাটী মায়িক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ; কিন্তু যাহা তত্ত্বতঃ মায়িক, সেইটীর প্রতি মানুষের কখনও আদরবুদ্ধি সম্ভব হয় না। ভগবানের স্বরূপশক্তি সন্ধিনীই ধামরূপে পরিণত হন, সেই জন্যই উহা জড়ীয় বস্তুতে নির্ম্মিত নহে। শ্রুতিতে আমরা দেখিতে পাই, "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি 'স্বে মহিম্নীতি' দিব্যে ব্রহ্মপুরেহ্যেষস ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ' অর্থাৎ ভগবান আপনার মহিমায় নিত্যধামে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ।"

ধামের নিত্যতা শ্রীপাদ গোস্বামিগণ বহুল শাস্ত্র বচন দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন—বিষ্ণুপুরাণে দ্বারকার নিত্যতা সম্বন্ধে দেখা যায়,

"প্লাবয়মান তং শূন্যং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ
যদুদেব গৃহং ত্বেকং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ।" ইত্যাদি

সেইরূপ পাদ্মপাতালখণ্ডে শ্রীভগবান্ যে ব্রজের শ্রীযমুনায় নিত্য বিহার করেন, তাহার উল্লেখ আছে,—

"অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতঃ যমুনাজলং
গোবিন্দো গোপীকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা।"

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—'নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা' ইত্যাদি। ঋগ্বেদেও উক্ত হইয়াছে—'যত্র গাবঃ ভূরি শৃঙ্গা অয়াস' অর্থাৎ যেখানে গাভীগণ প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট ও শুভ-কল্যাণযুক্ত, এই সকল শাস্ত্রোক্তি হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, শ্রীভগবান্ স্বরূপশক্তি-সাহায্যে মায়াশক্তি পরাভূত করিয়া তদীয় পরিকরগণ সহ নিত্যধামে নিরন্তর লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। তাই উক্ত হইয়াছে,—

"ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি।"

এইরূপে শক্তিমান সদাই স্বীয় শক্তিবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। মহিষীগণ ও মথুরা-নাগরীগণ অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণের উৎকর্ষ শাস্ত্রে দেখা যায়। কারণ, মথুরা-রমণীগণ গোপীগণের সৌভাগ্য প্রশংসা করিয়া তল্লাভে একান্তভাবে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। যথা,—

"গোপ্যস্তপঃ কিমাচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্ত
ধাম যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বর্য্যস্য।"

অর্থাৎ গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিল, যাহাদ্বারা তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর নবনবায়মান রূপমাধুর্য্য নয়নদ্বারা পান করিয়া থাকেন—এ রূপ লাবণ্যের সার—ইহার সমান বা অধিক নাই। শ্রীমদুদ্ধবমহাশয়—যাহাকে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমান তাঁহার আর কেহই প্রিয় নহে, তিনিও বলেন, "বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভিক্ষ্ণশঃ" অর্থাৎ আমি সেই মহাভাবস্বরূপিণী ব্রজবালাগণের একটু শ্রীচরণ-ধূলি প্রার্থনা করি।

প্রীতি-সন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্ত ও পরিকরগণের মধ্যে কাহার কোন্‌রূপ ভাব প্রাপ্তি হইতে পারে, সে বিষয় বিচার করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, ব্রজদেবীগণের মহাভাব পর্য্যন্ত লাভ হয়—অন্যের তাহা সম্ভব নহে। সেখানে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বাস্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্য যুযাং দুরাপম্‌" অর্থাৎ গোপীগন শ্রীকৃষ্ণকে নয়নদ্বারা হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অত্যধিক আনন্দহেতু সকলেই তদ্ভাব অর্থাৎ মহাভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা 'নিত্য যুযাং' অর্থাৎ পট্টমহিষীগণেরও দুষ্প্রাপ্য। স্বাতী-নক্ষত্রের স্বভাবিক মুক্তাজনকত্বশক্তির মত কৃষ্ণের এইরূপ ভাবোৎপাদন স্বভাব হইলেও আধারের অপেক্ষা করে। আবার ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধা "সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা।" তিনি মাদনাখ্য অধিরূঢ় মহাভাব-স্বরূপিণী—তিনি কৃষ্ণময়ী অর্থাৎ তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম-বিভাবিত মূর্ত্তি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥

—আধ্য, অ, পঃ।

শ্রীরাধার শোভায় শ্রীকৃষ্ণ শোভান্বিত হন,—"রাধয়া মাধবোদেব মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে।"

"রাধা সঙ্গে যদাভাতি তদা মদনমোহনঃ
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ।"

এই সকল বাক্যে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাসমণ্ডলেও তাঁহার উৎকর্ষ পরিস্ফুট হইয়াছে—গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত হইয়া মধ্যস্থলে শ্রীরাধার সহিত ভগবান্‌ বিহার করিয়াছিলেন। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে "রাসলীলা-বাঞ্ছাতে রাধিকা শৃঙ্খলা"—এইরূপে সংক্ষেপে স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল।

বহিরঙ্গা মায়াকে শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভগবানের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদিগণের মত—ইহা যে মৃগ-মরিচীকার মত অবিদ্যমানতারই নামান্তর মাত্র, তাহা স্বীকার করেন না। মায়ার দুই প্রকার ক্রিয়া—আবরিকা ও বিক্ষেপিকা—মায়া জীবের স্বরূপ আবরণ করিয়া চিত্ত-বিক্ষেপ আনয়ন করে ও

দেহাত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া থাকে। বেদান্ত-গ্রন্থে মায়া "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়া" রূপে কথিত হইয়াছে ; কারণ ব্যবহার-দশায় উহার স্বত্ব স্বীকৃত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে উহার—অস্তিত্ব থাকেনা বলিয়া বস্তুত উহার ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্ত্বা স্বীকৃত হয় নাই ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাস-সমাধি হইতে আমরা অবগত হই যে, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জীব ও মায়া—যাহা জীবকে সম্মোহন করে তাহাও—দেখিয়াছিলেন।

জীব ও ব্রহ্মে চিদংশের একত্ব থাকিলেও অণুত্ব ও বিভুত্বগত ভেদ আছেই এবং এই ভেদ কেবল উপাধিগত নহে, নিয়ম্য নিয়ামক, অংশী ও অংশগত ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এই শ্রুতি-বাক্যে জীব যে ব্রহ্মের অংশ ; তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ "পাদ" শব্দে অংশই বুঝায়, গীতায়ও দেখা যায় "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ," তার পরই উক্ত হইয়াছে "উত্তমঃ পুরুষ স্বন্য পরমাত্মে ত্যুদাহৃতঃ।" অদ্বৈতাচার্য্যগণ শ্রুতির "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্য হইতে একমাত্র চিন্মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনিই বিদ্যোপহিত হইয়া ঈশ্বর ও অবিদ্যোপহিত, হইয়া জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন ; কিন্তু বস্তুতঃ এক ব্রহ্ম ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অপর এক শ্রুতি "ব্রহ্মৈবেদমখিলং জগৎ" হইতে প্রমাণ করিতে প্রয়াশ পাইয়াছেন যে,ব্রহ্মই সব ; কিন্তু সবই ব্রহ্ম নয় অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত কিন্তু প্রত্যেক বস্তুই যে পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ তাহা নহে, যেমন "সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রোন তরঙ্গঃ" অর্থাৎ তরঙ্গ সমুদ্রময়ই বটে,কিন্তু তরঙ্গই যে সমুদ্র তাহা নহে। জ্ঞানে কেবলমাত্র স্বরূপানুসন্ধান করা হয়, কিন্তু ভক্তিতে সম্বন্ধবিশিষ্ট স্বরূপানুসন্ধান দৃষ্ট হয়। কারণ, জ্ঞানী আপনাকে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত-স্বভাব শ্রীভগবানের দাস-রূপে অভিমান করেন, ইহাই প্রভেদ। সেই জন্য বৈষ্ণব-দর্শনে জীবকে সূর্য্য-পরমাণুর সঙ্গেও ভগবানকে সূর্য্যের সহিত তুলনা দেওয়া হয়। শ্রীভগবান্ শক্তিমান—প্রত্যেক জীব তাঁহারই সমষ্টি-জীব শক্তির অংশ। শক্তি ও লীলা-সম্বন্ধে ইহাই সংক্ষেপে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত।

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

গীত।

বেহাগ—কাওয়ালী।

[৺রজনীকান্ত সেনের "মরমে লুকায়ে রবে হৃদয়ে জুগায়ে যাবে "এই গানটির সুর ও ছন্দ অবলম্বনে লিখিত]

যদি মরমে লুকায়ে রবে,
হৃদয়ে না দেখা দিবে,
কেন— প্রাণ ভরা ব্যাকুলতা দিলে গো ?

মদনমোহন শ্যাম, নিখিল ভুবনারাম,
ভজ মন অবিরাম ভজ গো।
আমার— হৃদাকাশে পরকাশ, পুরাও ভক্তের আশ,
ভক্তাধীন প্রেমময় হরি গো ॥

চাঁচর চিকুর শিরে, শিখিচূড়া তাহে ধরে,
অলকা তিলকা ভালে শোভে গো।
অধরে মুরলী বাজে, বনমালা গলে রাজে,
নটবর সাজে হরি রাজে গো ॥

তুমি নাহি দিলে দেখা, কে পাবে তোমার দেখা,
কেবা হরি ধ্যানে তোমা ধরে গো।
আমার— হৃদি ভরা ব্যাকুলতা, মর্ম্ম মাঝে কত ব্যাথা,
দেখা দাও হরি দীন বন্ধু গো ॥

মোহন মুরতি ধরে, তৃষিত হৃদয় পরে,
দাও, দাও, দাও দেখা দাও গো।
তুমি পতিতের বন্ধু, অপার করুণা-সিন্ধু,
অধম দীনের বন্ধু হরি গো ॥

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বি-এল)।

প্রেষ্ঠ।

তখন দুঃখ ছিলনা। চারদিকে আনন্দ জমাট বাঁধা। মাঠে, ঘাটে, বনে আর মনে সর্ব্বত্রই আনন্দ-ছবি। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে আঘাত ক'রে ক'রে তখনও জীর্ণ করে দেওয়া হয়নি। সোনার শেকলেও সারা ভুবনের প্রাণ বাঁধা পড়েনি। এমনি একদিন ভৃগু তাঁর বাবা বরুণের কাছে গিয়ে বল্লেন "দেব, আমায় ব্রহ্মস্বরূপের উপদেশ করুন।" পিতা পুত্রকে বল্লেন, অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্য সকলই ব্রহ্ম। যা'তে এই প্রাণিগণ জন্মায়, যাঁকে বুকে ক'রে ক'রে বেঁচে থাকে আর শেষকালে গিয়ে যাতে আপন সত্তা ডুবিয়ে দেয়, সেই ব্রহ্ম। তাঁকে জানগে। যাও। ভৃগু তপস্যা ক'রে ফিরে এসে বল্লেন "দেব, আমি অন্নকেই ব্রহ্ম ব'লে জানলুম।" পিতা বল্লেন,—হয়নি, আবার যাও তপস্যা করগে। এমনি ক'রে ভৃগু প্রাণকে, মনকে, আর বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলে জানলে। পিতা তখনও বল্লেন "বৎস! ব্রহ্মস্বরূপ জানা হ'লনা, তপস্যা করগে, তপস্যাই ব্রহ্ম।" শুভমুহূর্ত্ত চারদিক থেকে তপঃপরায়ণ ভৃগুর প্রাণে কি যেন এক আনন্দের পুলক জাগিয়ে দিল। আনন্দভরে ভৃগু হাস্তে হাস্তে পিতাকে বল্লেন "দেব! আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ হ'তেই বিশ্বের চক্ষু ফুটেছে, আনন্দকেই বুকের মাঝে পেয়েছে বলে বিশ্ব বেঁচে আছে; আর সবটা বিশ্ব হেসে হেসে যখন যাবার সময় হবে, তখন এই আনন্দেরি মাঝে গিয়ে সারা জীবনের ক্লান্তি শ্রান্তি ভুলে যাবে। সেই পরতত্ত্বে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। শূন্য আকাশও তাঁকেই আশ্রয় ক'রে আছে।"

প্রিয়তমের সন্ধান প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে এই আনন্দের প্রতিষ্ঠায়। নিত্য নব নব ভাবের স্রোতে অভিনব আনন্দের তরঙ্গে জীব-জগৎ কত ভাবে নৃত্য ক'রে চলেছে, তার ইতিহাস চিরন্তন ক'রে রাখা কার সামর্থ্য? কত জনার প্রাণে অই আনন্দালোক অজানা কত রংএ প্রতিভাত হয়েছে! যাঁরা সে আলোক-রেখার অনুভব করেছেন, তাঁরাই তা বলে দিতে পারেন। ইন্দ্রধনুর বর্ণমালায় সে আস্বাদন-বৈচিত্র্যের ঠিকানা করা যায় না। এক হয়েও বহুভাবে তাঁর প্রকাশ—বহু হলেও একরূপে অনুভূতি। এ জগতে যাহা স্বাভাবিক, পর-তত্ত্বে তাহার পরিশুদ্ধি। পরতত্ত্বে যাহার বিলাস, তাহা নরজগতে খুঁজে পাওয়া

কঠিন। যেমন হেঁয়ালীর "হাতে আছে হাতে নেই, হাত বাড়ালে পেতে নেই" তেমনি তিনি কাছে থেকেও কাছে নেই। জগতের প্রাণের ভেতর থেকেও তিনি বহুদূরে—জগতের মায়ারাজ্যের ওপারে। আকাশ, গ্রহমণ্ডল জীব-জগৎ সবটা জুড়ে থেকে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র গণ্ডকীশিলার মধ্যেও তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ!

জীব যখন বাইরের সুখময় রাজ্যের অধিকারচ্যুত হ'য়ে জীবনটা কোনও অচেনা দেবতার অভিশাপ বলে মনে করে, তখনই তাঁর আপন স্বরূপের সন্ধান করবার স্বাভাবিকী বৃত্তি জেগে উঠে। ইহারই নাম তত্ত্বজিজ্ঞাসা। চক্ষু যেমন আপনার স্বভাবের গুণে রূপের দিকে আকৃষ্ট হয়, কর্ণ যেমন আপনা-আপনি গাছের পাখীর মধুর তান শুনিয়ে দেয়, জিহ্বা যেমন টক্ সামনে থাকলে নিজেই জল সঞ্চয় ক'রে তার রসনা নাম চরিতার্থ করে; ঠিক তেমনই জীবের চেতনা-শক্তি আনন্দের তালে তালে, আনন্দের গানের সুরে সুরে, নেচে গেয়ে আনন্দ উপভোগ করবার জন্য স্বাভাবিক ভাবে চঞ্চল হ'য়ে উঠে। সে চঞ্চলতা যে কত স্বাভাবিক, আর কেমন তার দ্রুত স্পন্দন, মানুষকে সেই আকাঙ্ক্ষা যে কতদূর পাগল ক'রে দেয়, সেটি কেবল স্বসংবেদ্য,—মুখের কথায় প্রকাশ অসম্ভব। গৃহ, সংসার, দেহ—কেউ তখন সেই পাগলের পথে বাধা দিতে পারে না, যায় সে আপন স্বাধীনতার সুখে মত্ত হয়ে পরমানন্দ-সমুদ্রান্বেষণে।

হ'তে পারে, দুঃখের আঘাত পেয়েই সুখের সন্ধানে প্রবৃত্তি। চিরদুঃখময়কে চিরসুখময় বলে, অনিত্যেরই ভেতর নিত্যের সন্ধান পাওয়াতে কিন্তু জিজ্ঞাসার উপসংহার। যে প্রিয়তা প্রাণকে ভালবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে সাধনার আনন্দে লুব্ধ করে, তাহারই পূর্ণতম অভিব্যক্তিতে জীব নিত্যকাল মুগ্ধ হয়ে থাকে। উপনিষদ অই চির আনন্দময়ের পরিচয় করাতে নানাসুরে গান গেয়েছেন। নানা ছন্দ আর ভঙ্গী বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা এক অদ্বিতীয় মহিমা-ময় রাগেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রথম থেকে শেস পর্য্যন্ত পূর্ণতম আনন্দেরই মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে। উপনিষদের বিশেষ বিশেষ অংশের প্রতি আস্থাবান, অনুভূতি-যোগে তারই অনুকূল ভাবে আস্বাদন ক'রে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় করেছেন। তাঁরই কৃপার আলোকে তাঁকে যেমন ভাবে দেখেছেন, তাঁকে তেমনিভাবে, তাঁরা বর্ণনা করে রেখেছেন। তা ব'লে এমন কিন্তু আমাদের কখনও মনে করা উচিত হবে না যে, কারুর দেখা ঠিক্ ঠিক্, আর কারুর দেখায় কিছু গলদ

আছে বা সে দেখা যথার্থ নয়। যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বরূপেই আছেন ও থাকতে পারেন। যদি বলা যায়, তিনি এই রূপেই চিরকাল আছেন, আর অইরূপে থাকতে পারেন না—তা হ'লেই তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়ে যায়। কেউ তা হ'লে স্বীকার কর্ব্বেন না যে, তাঁর সবকিছু করবারই ক্ষমতা আছে বা ছিল। এ সব কথাগুলি যে আমরা মেনে নিচ্ছি শুধু তাই নয়, অন্তরে ঢের যুক্তি আছে, যার পরিচয় দর্শন-শাস্ত্রগুলো প্রচার কচ্ছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। যে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে সে দেখ্‌ছে, অই মাঠের শেষে তালের বনের পেছন থেকে চাঁদ উঠ্‌ছে। গ্রামের ভেতর কেউবা দেখ্‌ছেন, ঘোষেদের বাড়ীর দিকে চাঁদ উঠ্‌ছে, পাহাড়ের নিকট হ'তে অন্য ব্যক্তি বল্লেন, পাহাড়ের পশ্চাদ্ ভাগ দিয়ে চন্দ্রোদয় হ'ল। এদের কারুর দেখা বা চন্দ্রোদয় সম্বন্ধে সংবাদ মিথ্যা নয়। তাঁরা যেমন স্থানে দাঁড়িয়ে যেমন ভাবে চন্দ্রোদয় লক্ষ্য করবার অধিকারী হয়েছেন, ঠিক তেমনই ব'লেছেন। পরম তত্ত্ব-সম্বন্ধেও তেমনই। অধিকারি-ভেদে তাঁর বিভিন্ন অনুভব ও আস্বাদন।

চরম আনন্দের খোঁজে এক পা যেতে না যেতেই মনে জেগে উঠে 'আমি কে'? কে আমি, আর কারই বা খোঁজ? এই প্রশ্ন সর্ব্বপ্রথম প্রাণের ভেতর একটা নূতন সাড়া এনে দেয়। তার পর মনে হয়, আমি কোথায় আছি? কোথা হ'তে কোথা চলেছি! কতদিন ধ'রে এই যাওয়া আসা? এর কি কোন পরিসমাপ্তি নেই! যদি থাকে সেটি কি? কেমন ভাবে সেই শেষ মীমাংসায় গিয়ে পৌঁছা যায়? যাঁর খোঁজে চলেছি তাতে আমায় কি সম্বন্ধ? কেনই বা অমনি করে তার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছি? জিজ্ঞাসার উপর জিজ্ঞাসা এসে হৃদয় আক্রমণ ক'রে ফেলে, অথচ উত্তর পেয়েও জাগতিক বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তরের মতন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায় না। কোন্ প্রেরণা এসে সংশয় জাগায়ে যায়। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎ হ'লে তবেই সংশয়হীন হওয়া যায়।

পরতত্ত্বের সাথে জগৎ জীব প্রভৃতির সম্বন্ধ অনুসন্ধান ক'রে নানা ভাষায় তাকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা খুব আগে থেকেই চলেছে। কিন্তু হ'লে হবে কি, মহতের কৃপা ভিন্ন তাদের গূঢ় অনুভবের অংশীদার হওয়া সহজ নয়। এরি ওপর গুরুবাদের ভিত্তি, আর এই গুরুবাদকে আশ্রয় করেই বিশেষ

বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রবর্তন। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, এই সম্প্রদায় —দলাদলি আর গোঁড়ামির নামান্তর। তাহাদের কথায় আমাদের কাজ নেই, কিন্তু তারাও খুব ভাল ক'রে চিন্তা করলে বুঝবেন, তাদেরও একটা "অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়" আপনা আপনি কারও অজ্ঞানিত ভাবে গ'ড়ে উঠেছে।

বেদপুরুষের শিরোভূষণ উপনিষদমালার এক একটি কুসুম সংগ্রহ ক'রে সুন্দর সুন্দর সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ মনোহর সৌগন্ধ বিস্তার করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। অদ্বৈতবাদের মূল কথাগুলো আজকাল কে না জানেন। এক অখণ্ড ব্রহ্ম সত্য, দ্বৈতরহিত, নিরঞ্জন, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্বব্যাপী। জলে সূর্য্যকিরণ প্রতিভাত হ'লে মনে হচ্ছিল সেখানেও সূর্য্য, জল দূর করে দিলে দেখা গেল, ও কিছু নয়। যেমন ছিল পূর্ব্বে, তেমনি এখন। সূর্য্য এক। ঘট কতকটা শূন্যস্থান অধিকার করে আছে তার উদরের মধ্যে, ঘট ভেঙ্গে দেও, ভেতরের শূন্য স্থানটুকু—যাকে শাস্ত্রের ভাষায় ঘটাকাশ বলা হয় তা মিশে যাবে মহাশূন্যে বা মহাকাশে। তেমনি ভ্রমের বশে এক ব্রহ্ম সত্য হলেও তাতে দ্বৈতের ভাণ বা প্রতীতি। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব-জগৎ মিথ্যা। মায়া যতক্ষণ অভিভূত করে রেখেছে, ততক্ষণ জীব-চৈতন্য ব'লে পৃথক এক সত্তার কল্পনা, আর সাথে সাথে মন, বুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে গোটা জগৎটা চক্ষের সামনে প্রতিভাসিক হয়ে উঠেছে। যজ্ঞাদি ক'রে যে স্বর্গাদি-লাভের কথা, সে কথাও ভ্রমবিজৃম্ভিত ; এমনি শুদ্ধ-অদ্বৈত-সিদ্ধি করতে গিয়ে মায়ারাজ্যে বাস ক'রেই প্রচার করা হয়েছে, ব্রহ্মই সত্য আর সকলই মিথ্যা। সুচতুর নৈয়ায়িক তার কথায় হেসে বলেছেন,—ভাল, ব্রহ্মাতিরিক্ত সকলই যদি মিথ্যা হইল, তবে বক্তার কথাও মিথ্যাই হউক। ফলে জগতের সত্যতাই লাভ হয়।

আচার্য্য শঙ্কর যুক্তির বলে অদ্ভুত ভাষ্য রচনা ক'রে অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের প্রচার করেছেন। তাঁর শিষ্যবর্গ বেদান্তের কেবল অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে জগতের সকল চিন্তার ধারাকে একমুখো করবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে-ছিলেন।

রামানুজ-আচার্য্যের যুক্তি যেন সে চিন্তার ধারাকে একটি নূতন প্রবাহে প্রবাহিত করলেন। মায়া-শব্দের অর্থ অজ্ঞান নয়, তার অর্থ প্রকৃতি। জীব

বিভু নয়—অণু। সে প্রভু নয়—দাস। অপৌরুষেয় বেদই পরতত্ত্ব-নির্দ্ধারণে একমাত্র প্রমাণ। পাঞ্চরাত্রবিধিই জীবের উপজীবিকা। অদ্বৈতব্রহ্মই সত্য, কিন্তু তাহাতে স্বগত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হইবে। জীব ও ঈশ্বরে একান্ত অভেদ কিছুতেই স্থাপন করা যায়না। দেহ এবং দেহীতে যেমন ভেদ, তেমনই জীব ও ঈশ্বরে। জীব ব্রহ্মের শরীর বলিয়া শাস্ত্র-প্রমাণও আছে। মাকড়সা যেমন আপনারই শরীর হইতে সূত্র উৎপাদন করে, অথচ আপনার ইচ্ছামতন তাহা আপন শরীরাভ্যন্তরে লইয়া যায়, তেমনই ব্রহ্মও জগতের বা সৃষ্ট পদার্থের সম্বন্ধ। ব্রহ্ম বা পরতত্ত্ব চারিরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক; অতএব সর্ব্বপ্রকারেই আছেন, এই বাক্য হইতে সর্ব্ববস্তু বা দ্রব্যের সহিত ব্রহ্মে অভেদত্ব সিদ্ধান্ত করিতে হয়। আবার সেই ব্রহ্মই নানারূপ ও চিৎ-অচিৎরূপে নানাভাবে আছেন—এই বাক্য হইতে তাঁহার সহিত সৃষ্ট জগতের ভেদত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচার করিলে ভেদাভেদই প্রতিপাদিত হয়; কিন্তু চিৎ, অচিৎ ও স্বরূপ ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এবং অসঙ্করত্ব-হেতু ভেদই সিদ্ধান্ত। জীব চিৎরূপ; নির্ম্মল জ্ঞানরূপ হইয়াও অনাদিকাল-কর্ম্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত। কর্ম্মানুযায়ী জ্ঞানের বিকাশ বা সঙ্কোচ হইয়া সুখ-দুঃখের ভোগ। সুখ-দুঃখ ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া পরম-প্রাপ্তিই তাহার স্বভাব।

অচিদ্বস্তু অচেতন। বিকার-প্রাপ্তিই তাহার স্বভাব। ইহাই ভোগ্যভূত বস্তু বলিয়া খ্যাত। জীব ভোক্তা।

ভোক্তা ও ভোগ্যই, চিৎ ও অচিৎ। এই উভয়ের অতিরিক্ত ঈশ্বর। ইহাদের অন্তর্য্যামীরূপে থাকিয়া আপন স্বরূপগত অপরিমেয় জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি ও তেজঃ প্রভৃতি প্রকাশ করেন। তিনি অসংখ্য কল্যাণ-গুণ-নিবাস। আপন সঙ্কল্প হইতে সৃষ্ট সমস্ত চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহের অধিষ্ঠাতা। আপনার অভিমত ও অনুরূপ, অথচ নিত্য একরূপ দিব্য, নানাবিধ, অনন্ত ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত থাকাই তাঁহার স্বভাব। পরম-করুণ পরব্রহ্ম বাসুদেব জীবের উপাসনার যথাযোগ্য ফল প্রদান করিতে পঞ্চপ্রকারে অবস্থিতি করিতেছেন। অর্চা বা প্রতিমাদিতে থাকিয়া ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট ও রামাদি বিভব বা অবতার আবির্ভাব করিয়া তিনিই

ধর্ম্ম-রক্ষার্থ অবতীর্ণ। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ। বাসুদেবরূপেই পরব্রহ্মের স্বস্বরূপ। তিনি শ্রুতিতে উল্লিখিত ষড়্গুণপূর্ণ। জীবের নিয়ামক-রূপটী তাঁহার অন্তর্যামীরূপ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তির উপাসনায় ধীরে পরমূর্ত্তির উপাসনার যোগ্যতা লাভ করিয়া সাধক পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাঁর উপাসনার ক্রম সময়ান্তরে আলোচনা করিব।

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কর্ম্মফলের ক্ষয়শীলত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান-ফলের অক্ষয়িত্ব-পরীক্ষার ফলেই বেদ কর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানের মোক্ষ-সাধনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করিয়াই জ্ঞানকাণ্ডের বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ পাঞ্চরাত্র-সমর্থিত শ্রুতির বিশেষ আদর করিয়া কর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানের প্রচার করিলেন। উপসনার সাহায্যে ভক্তগণে ঈশ্বরের সমান গুণ সকলের সমাবেশ হয় সত্য, কিন্তু ঈশ্বরই সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব দ্বারা তাঁহাদের অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হন। এই বিশিষ্টতাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তরের কথা।

মধ্বাচার্য্য আচার্য্য-রামানুজের অনেক সিদ্ধান্তই আপনার অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জীবের অণুত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, প্রমাণত্রিত্ব ও জীবের দাসত্ব ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতির প্রাধান্য উভয় বৈষ্ণব-আচার্য্যেরই অভিমত হইলেও পরতত্ত্ব-গত বিচারে বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। প্রিয়ত্বাই পরতত্ত্বের মূল গুণ। স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র এই দুই তত্ত্বের মধ্যে অশেষ সদ্গুণ-নিলয় বিষ্ণুই স্বতন্ত্র। আচার্য্য রামানুজ—পরতত্ত্ব-বিচারে পরস্পর বিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদ এবং ভেদাভেদ এই তিনপ্রকারই পক্ষের স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহার দোষ দেখাইয়া আনন্দতীর্থ ভেদবাদই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদ-রহিত প্রভৃতি বাক্য থাকিলেও শ্রুতি ও যুক্তিবলে ভেদই সকলের স্বীকার্য্য। ধর্ম্মিপ্রতিযোগীর জ্ঞান হইতেই ভেদের জ্ঞান হয়। বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে ভেদ স্থাপন করিতে পারেনা। এই বস্তু নীল, অইবস্তু শুভ্র, এই প্রকার জ্ঞানেই নীল এবং শুভ্রের ভেদ জ্ঞান। নীল এবং উৎপলের জ্ঞানে নীলত্ব ও উৎপলের ভেদ সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বর প্রভু, জীব দাস। প্রভু, দাস হইতে ভিন্ন। দাস আপনাকে প্রভু বলিয়া প্রচার করিয়া প্রভুর বিরাগভাজন হইয়া থাকে। কেহ আপন হীনতা খ্যাপন করিয়া কাহারও

স্তব করিলে স্তুত ব্যক্তি প্রীত হইয়া সমর্থ হইলে স্তবকারীর অভীষ্ট পূরণ করে। আমি রাজা, এই কথায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রকৃত নৃপতি বধ করিয়া থাকে। এইরূপে অনুমান-প্রমাণেও ভেদই সিদ্ধান্ত।

জীবের সেব্য বিষ্ণুকে সেবা করাই কর্ত্তব্য। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন এই তিন প্রকার সেবা। আত্মা সত্য, তেমনি জীবও সত্য। পরস্পরের ভেদ সত্য। জড়ও সত্য। জড়ের সহিত ঈশ্বরের ভেদ সত্য। এক জীবের সহিত জীবান্তরের ভেদ সত্য। জড়ের সহিত জীবভেদ বা জড়েরও ভেদ সত্য। এই ভেদসকল সত্য ও অনাদি। অনাদি না হইলে ভেদ নিরাস হইত। স্বয়ং বিষ্ণুই শাস্ত্রমুখে দ্বৈত প্রচার করিয়াছেন। এই দ্বৈতজ্ঞানেই মুক্তিলাভ। বেদান্ত সত্যই বলিয়াছেন "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তাহারই তুমি। অথবা তুমি তাহারই মত—এই সদৃশতা দেখাইবার জন্যই এই বাক্য-প্রচার। সদৃশতা হইলেও স্বরূপের একতা অস্বীকার্য্য। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও পূর্ণ, জীব পরতন্ত্র ও অপূর্ণ। রামানুজের সিদ্ধান্ত পরিণামবাদ। বাসুদেব এক অংশে জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। মধ্বাচার্য্য বলেন, শ্রীবিষ্ণু আপন শক্তিতে জগৎরূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত। শঙ্করাচার্য্য পরিণামের গন্ধও স্বীকার না করিয়া অবস্তুতে বস্তুর আরোপ বা বিবর্ত্তবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভেদবাদী বা জগতের নিত্যত্ববাদীর পরিণামবাদ স্বীকার করিতেই হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায় জগতের মিথ্যাত্ব মোটেই স্বীকার করেন নাই। নশ্বরত্বই স্বীকার্য্য। উপাসনা-ভেদেই পরতত্ত্বের অনুভব-বৈশিষ্ট্য। শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তগুলি এমনি করিয়া নানা ভঙ্গীতে পরতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া চিরকাল প্রচারিত রহিয়াছে। সকলেরই গতি সেই আনন্দকেন্দ্রে। আকর্ষক-আনন্দ, স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত আকর্ষণকারী পরমানন্দ নন্দ-নন্দনেই তাহাদের বিশ্রাম। যাঁহার কৃপায় সেই পরম-আনন্দভূমি শ্রীবৃন্দাবনের নিগূঢ় নিকুঞ্জ-লীলার চরম-সিদ্ধান্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রচারিত হইয়াছে, প্রবন্ধান্তরে তাঁহার মত আলোচনা করিতে বাসনা রহিল।

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী বিদ্যাভূষণ এম, এ।

ভিখারী।

(গীত)

এসনি এবার রাজ-বেশ ধরি
এসেছ ভিখারী-বেশে।
বিশ্ব মানব দুঃখ হরিতে
ভ্রমিয়াছ দেশে দেশে॥
পরিধানে শুধু কৌপিন ডোর
নয়নের কোণে নয়নের লোর
ওগো অধিরাজ সে যে শুধু এই
পতিতেরে ভালবেসে।
চন্দন-সম কত নিপীড়ন
কত উপহাস হে চিরন্তন
মাখিয়াছ গায়, বিনিময়ে দেছ
প্রেমভরা কোল হেসে॥
হে চির-ভিখারী নেছ তুমি যার
শূন্য করিয়া পাপ-তাপ-ভার
পূর্ণ ক'রেছ তারি ভাণ্ডার
শাশ্বত-ধনে শেষে॥

শ্রীকালীপদ ভাক্ষিত এম, বি।

গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা বিচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮। ইহারও পূর্ব্বের কথা লিখিতেছি। নিমাই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস করিতে চলিয়াছেন। কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না। সংসার ও সংসারের যাবতীয় সংশ্রব ত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে

হইবে। ইহাই শাস্ত্র যুক্তি ও সদাচারের আদেশ। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইতেছি, (এই কড়চায়) গৃহত্যাগের-কালে ভৃত্য-গোবিন্দকে সঙ্গে লইবার নিমিত্ত নিমাইর ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হইতেছে। যথা—

> ব্যগ্র হয়ে বলে মোরে চল মোর সনে।
> কাটোয়া নগরে যাই কাটিতে বন্ধনে॥
>
> (কড়চা পৃঃ ১৫)।

কাটোয়া নগরে বন্ধন কাটিতে যাইতেছেন, কিন্তু ভৃত্যের মায়ার বন্ধনটি কাটিলেন না। শুধু তাহা নহে। সেই গোবিন্দ-ভৃত্য আবার প্রভুর খড়ম দুইখানি মস্তকে বহন করিয়া চলিয়াছেন। "পশ্চাতে চলিনু মুই খড়ম লইয়া।" (কড়চা পৃঃ ১৬) যিনি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসারে যাবতীয় সুখের উপাদানে তৃণবৎ জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া সচ্চিদানন্দ-সাগরে ঝাঁপ দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছেন, ভূ-লুণ্ঠিতা উন্মাদিনী জননী ও পত্নীর প্রতি ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাইলেন না, তাঁহার একটি ভৃত্য দ্বারা খড়ম দুইখানি সঙ্গে লইবার স্পৃহা জাগ্রত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় এবং স্পষ্টতঃ গোবিন্দকে মিথ্যাবাদী বলিতে ইচ্ছা হয়। এই একান্ত প্রিয় ভৃত্যটিকে আবার দেখিতে পাই—সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরেই ইনি প্রভুর সঙ্গে 'খড়ী' লইয়া চলিয়াছেন। "পেছনে পেছনে আমি খড়ী লইয়া যাই।" (কড়চা পৃঃ ২৩) খড়ী অর্থ পাঠক বুঝিতেছেন, খড়ী—খাড়িয়া, বস্ত্রনির্ম্মিত বৃহৎ ঝোলা। আমাদের বাবাজী-মহাশয়গণ ইহার ভিতরে সকীয় দ্রব্যজাত পূরিয়া স্কন্ধে ঝুলাইয়া দেশ-পর্য্যটন করিয়া থাকেন। বাবাজীমহাশয়দের কাহারও ২।৩টি খাড়িয়াও দৃষ্টিগোচর হয়। ভৃত্য-গোবিন্দ সন্ন্যাসের পরে প্রভুর এরূপ একটি খাড়িয়া স্কন্ধে করিয়া চলিয়াছেন। এই খাড়িয়ার উল্লেখ আমরা কড়চার নানাস্থানে পাই। গোবিন্দের স্কন্ধে খাড়িয়া আমরা প্রথমে একটি দেখিতে পাই, ক্রমে দক্ষিণ-ভ্রমণের সময়ে এই খাড়িয়া দুইটি দেখিয়াছি।

—"অমনি স্কন্ধেতে তুলি লইলাম খড়ী।" কড়চা পৃঃ ৩৫
"স্কন্ধেতে লইনু তুলি দুইটি খাড়িয়া।" „ „ ৫৫
"দুই স্কন্ধে লইলাম দুইটি খাড়িয়া।" „ „ ৮৫

এই যে গোবিন্দ কল্পনা-নেত্রে চৈতন্যদেবকে কোন বাবাজীমহাশয়রূপে দর্শন করিয়া তাঁহার কল্পিত ভৃত্যত্ব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক স্বীয় স্কন্ধে তাঁহার দ্রব্যজাতপূর্ণ খড়িয়া বহন করিবার সাধ মিটাইতেছেন, ইহা স্বরূপভূক্ত বস্তুটির সঙ্গে কতটুকু খাপ খায়, একটিবার ভাবিয়া দেখিবার তিনি অবকাশ পান নাই। যিনি অর্দ্ধখণ্ড হরিতকী সঙ্গে লইবার অপরাধে অগ্রদ্বীপে গোবিন্দঘোষ-মহাশয়কে স্বীয় সঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন, "প্রতিগ্রহ না করিবে কভু রাজধন" বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য কমলাকরকে যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য আচরণ শিক্ষা দিবার ছলে শাসন করিয়াছিলেন, "রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ" বলিয়া উদাসীন সনাতনের শেষ কম্বলখানি পর্য্যন্ত ছাড়াইয়াছিলেন, রাজপুত্র রঘুনাথ-দাসের বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা যাঁহার উপদেশ-বাক্যে ফলিত হইয়াছিল, সন্ন্যাসের পরে দেহসুখে মহাবিরক্ত যিনি শুধু প্রাণ-ধারণের নিমিত্ত মুষ্টিপ্রায় অন্ন নামারন্ধ্রে ভোজন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এতাদৃশ অদ্ভুত সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের ত্যাগ-বৈরাগ্যপূত পুণ্যময় ব্রতের সঙ্গে দ্রব্য জাত-পূর্ণ খড়িয়া স্কন্ধেকারী আধুনিক সঞ্চয়ী সন্ন্যাসী কিম্বা বাবাজীর ছবি সমন্বয় করিবার চেষ্টা করাতে আমরা এই কড়চাকারক গোবিন্দ-কর্ম্মকার মহাশয়কে অদ্ভুত কল্পনাকারী ভিন্ন আর কোন বিশেষণ দিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছুক হইতে পারিতেছি না।

৯। বহিখানির কয়েকটী পাতা উল্‌টাইলেই ভৃত্যটির এক অদ্ভুত চরিত্র ধরা পড়ে। ভৃত্যটি অতিমাত্রায় ঔদরিক। উদরজ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া নিয়ত প্রভুর উদ্বেগ উৎপাদন করা তাহার স্বভাব। প্রভু গৃহস্থ-গৃহে (?) রন্ধন করিতে (?) বসিয়াছেন, গোবিন্দ বহির্দেশে ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া ভোগের দ্রব্যাদির পানে ঘন ঘন সতৃষ্ণ নেত্রে তাকাইতেছে। প্রভুর রন্ধন শেষ করিয়া ভোগ দেওয়া গোবিন্দের সহিতেছেনা। প্রভুটি আবার এমন ভৃত্যবৎসল যে তাড়াতাড়ি যেন তেন প্রকারে ভোগ নিবেদন করিয়া গোবিন্দকে আহারে বসাইয়াছেন। তাহাও আবার অল্পে গোবিন্দের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবার নহে। কাশীমিশ্রের গৃহে আট খানা কদলাভাজি ও নারায়ণ-গড়ে পাঁচ গণ্ডা লাড্ডুর হিসাব ভৃত্যটি নিজেই দিয়াছেন। ঔদরিকতা-দোষে কখনো ইহার পেট ফাঁপিয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে। গোবিন্দ নিজেই বলিয়াছেন, "প্রসাদ পাইয়া মুই হাস ফাঁস করি।" (কড়চা পৃঃ ৩৩)। পরে প্রভু তাহার পেটে হাত

বুলাইয়া দিয়াছেন। ঈদৃশ অদ্ভুত ঔদরিকতা সন্ন্যাসের লক্ষণ নহে। আর ঈদৃশ ঔদরিকের পক্ষে আদর্শ ত্যাগী সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের সাহচর্য্য লাভ করা কখনো সম্ভবপর মনে হয় না। এ সম্বন্ধে ত্যাগী রঘুনাথের প্রতি চৈতন্যদেবের উপদেশ একান্ত স্মরণীয়। যথা—

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ॥
জিহ্বার লালসে সেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

১০। কড়চায় সত্যবালা-বেশ্যার কাহিনী ইহার এক অদ্ভুত রহস্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। ঘটনাটি এই,—দক্ষিণ দেশে (Southern India) সিদ্ধবট নামক স্থানে তীর্থরায় নামে এক ধনী ব্যক্তি চৈতন্যদেবের ধর্ম্মনাশ করিবার নিমিত্ত সত্যবালা ও লক্ষ্মীবাই নামে দুইটি বেশ্যাকে নিয়োজিত করে। বেশ্যাদ্বয় নানা প্রকার হাব ভাব প্রকাশ করিয়া চৈতন্যদেবকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা পায়। তিনি উহাদিগকে মাতৃসম্বোধন করেন এবং হরিনাম জপিতে জপিতে ভাববিহ্বল হইয়া নগ্নকায় হইয়া পড়েন, তৎপর যুবতী বেশ্যা সত্যবালাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া তাহাকে হরিনাম উপদেশ করেন। যথা—

সত্যবাই লক্ষ্মী বাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবাই হাসে।
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলি খুলিয়া সত্যা দেখাইলা স্তন।
সত্যারে করিলা প্রভু মাতৃ-সম্বোধন॥
*　　*　　*　　*　　*
খসিল জটার ভার ধুলায় ধূসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর॥
গিয়াছে কৌপিন খসি কোথা বহির্ব্বাস।
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস॥

সভারে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি।

(কড়চা পৃ: ৫৬)

আধুনিক সম্প্রদায়-বিশেষের ভিতর কেহ তাঁহাদের স্বমত সমর্থনের জন্য কড়চার এ ঘটনা তাঁহাদের নজির স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু চৈতন্য-চরিত্র-সম্যক্ আলোচনা করিলে এ বর্ণনা সম্পূর্ণ অসত্য প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধ-দেব হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় ধর্ম্মসংস্থাপক ও আচার্য্যগণকেই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা স্ত্রীজাতির সংশ্রব সম্বন্ধে অত্যধিক সতর্ক। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর স্ত্রী-জাতির সংশ্রবে সহজেই পতন-সম্ভাবনা, ইহাই ব্যক্ত করিয়া বুদ্ধদেব স্বীয় জননীকেও তাঁহার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে গ্রহণ ও দীক্ষিত করিতে চাহেন নাই এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "আমার যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ৫ হাজার বৎসর অবিকৃতভাবে চলিবে, ইহার ভিতর স্ত্রী-জাতিকে গ্রহণ করিয়া তোমরা ৫ শত বৎসরেই ইহার পতন ঘটাইবে।" বুদ্ধদেবের উপদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় ফলতঃ তাহাই হইয়াছিল। চৈতন্যদেবকেও আমরা এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবেরই মতন সতর্ক ও কঠোর দেখিতে পাই। অশীতি-পর বৃদ্ধা পরমতপস্বিনী মাধবী দেবীর নিকট হইতে তণ্ডুল লইবার অপরাধে ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন চৈতন্যদেবের চরিত্রে এক বিশেষ ঘটনা। চৈতন্য-চরিত্রে এ ঘটনা কল্পিত বলিতে কেহই সাহসী হইবেন না। ত্যাগী বৈরাগী কিম্বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, স্থূলতঃ সমগ্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি শাসন-প্রবর্ত্তনের নিমিত্তই তাঁহার হরিদাস-বর্জ্জন—ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। তিনি স্বয়ং কঠোর সংযম আচরণ করিয়া উহা ভক্ত-সমাজকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। হরি-দাসের বর্জ্জনে হরিদাস ত্রিবেণীতে পড়িয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এ ঘটনায় চৈতন্যদেব উত্তর করিয়াছিলেন, "প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত। চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য়) অর্থাৎ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী কিম্বা বৈরাগীর স্ত্রীলোক দর্শন-সম্ভাষণা-দির ইহাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। দেবদাসীর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ভাব-বিহ্বল অবস্থায় চৈতন্যদেব তাহার গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া প্রধাবিত হইয়াছিলেন। সঙ্গীয় ভৃত্য-গোবিন্দ স্ত্রীলোক বলিয়া বারণ করিলে, উত্তর করিয়াছিলেন, "বাপ, আজ তুমি আমাকে বাঁচাইলে, আজ স্ত্রীলোক স্পর্শ হইলে আমার দেহত্যাগ করিতে হইত।" যথা—"প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন। স্ত্রী

স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ॥ এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ) সুতরাং যথার্থতঃ চৈতন্যদেবের কখনও ভাববিহ্বল অবস্থায় স্ত্রীলোক স্পর্শ হইলে ভাবাপগমে প্রকৃতিস্থ-অবস্থায় মর্য্যাদা রক্ষণের নিমিত্ত তাঁহার দেহত্যাগ করিতে হইত। কঠোর সত্যপ্রিয় চৈতন্যদেবের চরিত্রে ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। যেহেতু তাহা হয় নাই, সুতরাং কড়চাবর্ণিত সত্যবালা বেশ্যার কাহিনী আমাদের অসত্য মনে হয়। চৈতন্যচরিত্র মনোযোগের সহিত পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিলে আমরা একটি বিশেষত্ব উহাতে ইহাই দেখিতে পাই যে, তিনি ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়াছেন বটে, কিন্তু কখনও ভাববিহ্বল অবস্থায় অকরণীয় কিছু করেন নাই। তিনি সততই নিজের উপরে নিজের আধিপত্য রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ-দর্শনে সমাধিগ্রস্তা জনৈকা উড়িয়া-রমণী চৈতন্যদেবের স্কন্ধে পদার্পণ করিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব তাহাতে দূরে সরিয়া যান নাই। সাক্ষাৎ ভক্তিদেবীর মতন এই উড়িয়া-রমণীর চরণস্পর্শ, আর যুবক-সন্ন্যাসীর যুবতী বেশ্যাকে আলিঙ্গন-প্রদান একই কথা নহে, ইহা সহজেই বোধগম্য। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাজ্ঞব্যক্তির ভিতরে কেহ কেহ উভয় ঘটনাকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

১১। "খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।" (কড়চা পৃঃ ৫৬) কড়চা বলিতেছে, প্রভুর মস্তক হইতে জটার ভার খসিয়া ধূলায় ধূসর হইতেছে। ইহা সত্যবালা বেশ্যা-প্রসঙ্গে সিদ্ধবট-নামক স্থানের ঘটনা। চৈতন্যদেবের মস্তকে এই জটার ভার কোথা হইতে আসিল, আমরা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। চৈতন্যদেব যে সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা ভারতী-সম্প্রদায়। ভারতী-সম্প্রদায়ের নিয়ম এই, উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদিগের ছয় ঋতুতে ছয়বার ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এই ছয়টি ক্ষৌরের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যথা,—বৈশাখে আচার্য্য-ক্ষৌর, আষাঢ়ে ব্যাস-ক্ষৌর, ভাদ্রে বিশ্বরূপ-ক্ষৌর, কার্ত্তিকে জ্যোতিঃরূপ-ক্ষৌর, পৌষে ব্রাহ্মী-ক্ষৌর, এবং ফাল্গুনে দত্তাত্রেয়-ক্ষৌর। এই ক্ষৌরসমূহ উক্ত সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য-প্রতিপালনীয় এবং উৎসববিশেষ। এই নিয়ম অনুসারে চৈতন্যদেবের প্রতি ঋতুতে ক্ষৌরি হইতে হইয়াছে। সুতরাং যে কোন কালে তাঁহার মস্তকে জটা থাকা অসম্ভব। দূর-ভ্রমণে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে মস্তক রক্ষার নিমিত্ত

তিনি কৃত্রিম জটা ধারণ করিয়াছিলেন, এ কথা বলা যায় না। কারণ, শিখ-সূত্র-ত্যাগী সন্ন্যাসী কদাপি আর শিখা-সূত্র ধারণ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ মুণ্ডী অর্থাৎ মুণ্ডন-ব্রতাবলম্বী সন্ন্যাসীদিগের জটাধারণ সম্পূর্ণ বিধি-বহির্ভূত। এই জটার বিচারে কড়চাবর্ণিত চৈতন্যমহাপ্রভু প্রকৃত চৈতন্যদেব হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া পড়িয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ।

[শ্রীমন্‌মহাপ্রভু মাঘমাসে শিখা-সূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ফাল্গুন মাসে নীলাচলে উপনীত হন, চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করেন এবং পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসেই দক্ষিণ-দেশে যাত্রা করেন।

মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাহাঁ বহু নৃত্যগীত কৈল॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হইল মন॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৭ম পঃ।

সন্ন্যাস-গ্রহণের তিনমাস পরেই তিনি দক্ষিণে যাত্রা করেন। মুণ্ডিত-মস্তকে তিনমাসের মধ্যে জটাজুট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তারপর, দক্ষিণদেশে প্রভু মাত্র দুই বৎসর ছিলেন।

দক্ষিণ যাইয়া আসিতে দুই বৎসর গেল। চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ।

ক্ষৌর-কর্ম্ম না হইলেও একবৎসরে বা দুইবৎসরে মস্তকে জটাজুট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।—সাঃ সঃ]।

পুরুষ-প্রয়োজন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে।

শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তিই স্বাভাবিকী, তন্মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান; যথা—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও তটস্থাশক্তি। যে শক্তি শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপভূতা এবং স্বরূপের সঙ্গেই সতত যে যে শক্তির খেলা, তাহার নাম চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি। যে শক্তি বহিরঙ্গা অর্থাৎ বহির্মুখ-জীবের সঙ্গে যে শক্তির খেলা, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মক এই জড়-জগৎটা যাহার পরিণতিবিশেষ, তাহার নাম মায়াশক্তি। আবার যে শক্তি, ঐ মায়াশক্তির অতীত, অথচ অনাদি-বহির্মুখতা-দোষে মায়াশক্তিদ্বারা সংসারদুঃখরূপ পরাভব প্রাপ্ত হওয়ায় অন্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তির অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত, সেই শক্তির নাম তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি।

জীবতত্ত্বটী যদিও নিত্য (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে), তথাপি ইহাকে শ্রীভগবানের শক্তি বলিবার হেতু এই যে, এ (জীব) তত্ত্বটী তটস্থাশক্তিরূপে পরিগণিত এবং শ্রীভগবানের বহিশ্চর-রশ্মি-পরমাণু-স্থানীয়তাহেতু নিত্য তদাশ্রিত। যেমন সূর্য্যের বিদ্যমানতায় বহিশ্চর-রশ্মি-পরমাণুর বিদ্যমানতা, আবার সূর্য্যের অবিদ্যমানতায় রশ্মিপরমাণুরও অবিদ্যমানতা, তেমনি শ্রীভগবান আছেন বলিয়াই জীব আছে, তদ্ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে জীবের অস্তিত্ব নাই।

সূর্য্যের বহিশ্চর-রশ্মি-পরমাণু যেমন ছায়াদ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, জীব সেইরূপ অণুচৈতন্যস্বরূপ হইয়াও মায়াদ্বারা পরাভূত হয় বলিয়া, জীবকে বহিশ্চর-রশ্মি-পরমাণু-স্থানীয় বলা হইয়াছে। এ জন্যই (মায়া-পরাভূত হয় বলিয়াই) জীবশক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশও বলা হয়, যেহেতু স্বাংশ হইলে কখনও মায়াদ্বারা পরাভূত হইত না; যেমন অনন্ত ভগবৎস্বরূপাদি ও পরমাত্মাদি।

বিভিন্নাংশ জীব অনন্ত ও স্বরূপে অতিসূক্ষ্ম। একগাছা কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া, এক এক ভাগকে আবার শত খণ্ড করিলে যাহা হয়, জীবের স্বরূপ তাহা হইতেও অতিসূক্ষ্ম; অণু হইতেও পরমাণু।

অনাদি উন্মুখতা—এই অনন্ত জীবের আবার দুইটী দল আছে বলিয়া সাত্বত শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। একদল অনাদি-কাল হইতে শ্রীভগবদুন্মুখ, ইহারা কখনও কালের করাল কবলে নিপতিত হয় না। এমনকি মহাপ্রলয়ও নাকি ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, তখনও নাকি ইহারা অবাধে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় রত থাকে; কোনও কারণে ইহাদের এই সেবা-সুখ-ভোগের বিরতি ঘটে না; ধন্য তাঁহারা, কখনও তাঁহাদিগকে সংসার-দুঃখের মুখ দেখিতে হয় না। ইহাঁরা সততই অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির বিলাস-বৈচিত্রী অনুভব করিয়া থাকে। গরুড়াদি নিত্যপরিকরগণই নাকি এই দলভুক্ত। ইঁহারা জীবরূপে প্রসিদ্ধ বলিয়া এবং ঈশ্বর-কোটিতে অপ্রবিষ্টহেতুই, তটস্থা-শক্তিতে পরিগণিত।

অনাদি বহির্মুখতা—জীবগণের যে অপর একটি দল আছে, তাহারা অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্মুখ। পরতত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব বা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকার নামই বহির্মুখতা-দোষ। "শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সেবক" এইটী জীবের মুখ্য স্বরূপ। জীব এই সেবাকার্য্য ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছে, এই অপরাধে মায়া জীবকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়াছে,—তিনগুণ রজ্জুতে গলদেশে ফাঁসে বাঁধিয়াছে; উঃ! কি দুর্বিসহ যন্ত্রণা!

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরহরি দাস ভাগবতভূষণ
কাব্যবৈষ্ণবদর্শনতীর্থ।

বিনীত নিবেদন। যাঁহাদের নিকটে এখনও সাধনার মূল্য বাকী আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহারা তাহা পাঠাইয়া দিবেন, ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

সাধনা।

(মাসিক-পত্রিকা।)

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা ॥

১ম বর্ষ, } অগ্রহায়ণ—১৩৩৩ { ৮ম সংখ্যা।

তোমার স্মৃতি আলো।

কবে তোমার স্মৃতি আলো
ঘুচা'বে মোর অন্ধকার,
বিশ্ব জুড়ে' দেখব আমি
রূপটি তোমার সুধাসার ॥
উঠ্‌বে জ্বলে' হৃদয় মাঝে
নিব্‌ভেনি আর কোন কাল,
ঝর্‌বে তাতে সুধাধারা
কর্‌বে আলো চিরকাল।
চ'খে আমার ধূলো দিতে
পার্ব্বেনিক কুহক-জাল,
আশা যাওয়ার ঘূর্ণীপাকে
লাগবে না বিষম জঞ্জাল।
হাসব দেখে' মিছা খেলা
টলবেনি মোর অটল মন,

উল্টে' দেবে স্মৃতি-আলো
মন্দের দিকে আকর্ষণ ॥
বুকটি আমার ভরে' উঠবে
পূর্ণানন্দের চমৎকার।
ওগো, কবে তোমার স্মৃতি-আলো
ঘুচা'বে মোর অন্ধকার ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক।

প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থের তালিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ন

১৮৭।	নামামৃত সমুদ্র—	নরহরি সরকার।
১৮৮।	নন্দনন্দনাষ্টকং—	শ্রীরূপ।
১৮৯।	নবদ্বীপ-পরিক্রমণ—	(?)
১৯০।	ঐ	নরহরি
১৯১।	নিকুঞ্জ রহস্য স্তব— (গীতাবলীর অনুবাদ)	বংশীবদন দাস।
১৯২।	নিগম গ্রন্থ—	গোবিন্দ দাস।
১৯৩।	নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী—	গৌরীদাস।
১৯৪।	নিত্যবর্ত্তমান—	শ্রীজীব
১৯৫।	নিমাইচাঁদের বারমাস্যা—	(?)
১৯৬।	নিষ্কামী আশ্রয় নির্ণয়—	(?)
১৯৭।	নৌকাখণ্ড—	জীবন চক্রবর্ত্তী।
১৯৮।	নিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার গ্রন্থ—	বৃন্দাবন দাস।
১৯৯।	নিত্যানন্দ চরিত—	বৃন্দাবন দাস।

২০০।	নিত্যানন্দাষ্টকং—	শ্রীশ্রীমহাপ্রভু।
২০১।	নরোত্তম বিলাস।	নরহরি চক্রবর্ত্তী।
২০২।	নাটক চন্দ্রিকা—	শ্রীরূপ।
২০৩।	নিত্যানন্দ ঐশ্বর্য্যামৃত—	বৃন্দাবন দাস।
২০৪।	নিত্যানন্দ বংশমালা—	(?)
২০৫।	নির্য্যাস তত্ত্বসার।	(?)
২০৬।	নরহরি রঘুনন্দন শাখা নির্ণয়—	রামগোপাল দাস।
২০৭।	নৃসিংহানন্দ পদাবলী—	(শ্রীখণ্ড)

প

২০৮।	প্রমেয় রত্নাবলী—	বলদেব বিদ্যাভূষণ।
২০৯।	ঐ কান্তিমালা টীকা—	ঐ
২১০।	পদকল্পলতিকা—	(?)
২১১।	প্রেমপ্রভা—	(?)
২১২।	প্রেমসাধন—	অতি বড় জগন্নাথ দাস।
২১৩।	প্রেমরত্নাকর—	কৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা মাধবাচার্য্য
২১৪।	প্রেমভক্তি চিন্তামণি—	নরোত্তম।
২১৫।	প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা—	ঐ
২১৬।	ঐ সংস্কৃত টীকা—	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
২১৭।	প্রার্থনা (গীত)—	নরোত্তম।
২১৮।	প্রেমবিলাস—	নিত্যানন্দ দাস।
২১৯।	পদ্ধতি প্রদীপ—	ঘনশ্যাম বা নরহরি।
২২০।	পদকল্প-তরু—	সংগ্রহকার বৈষ্ণব দাস।
২২১।	পদামৃত-সমুদ্র—	ঐ রাধামোহন ঠাকুর।
২২২।	প্রেম-রসায়ন—	শ্রীশ্রীমহাপ্রভু।
২২৩।	পাটমালা—	(?)
২২৪।	পরিক্রমা পদ্ধতি—	(?)
২২৫।	প্রক্রিয়া পদ্ধতি—	নরহরি।
২২৬।	প্রীতি-সন্দর্ভ—	শ্রীজীব।

২২৭।	পরমার্থ সন্দর্ভ—	ঐ
২২৮।	পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন—	ঐ
২২৯।	প্রেমেন্দু কারিকা—	শ্রীরূপ।
২৩০।	প্রেমেন্দুসাগর—	ঐ
২৩১।	পদাবলী—	ঐ
২৩২।	(ক) ঐ টীকা—	বীরচন্দ্র গোস্বামী।
২৩৩।	প্রযুক্তার্থ্য চন্দ্রিকা—	ঐ
২৩৪।	পদ্ধতি—	রামাই পণ্ডিত।
২৩৫।	প্রার্থনা—	লোচন দাস।
২৩৬।	পাষণ্ড দলন—	কৃষ্ণদাস (?)
২৩৭।	প্রেম-রত্নাবলী—	ঐ
২৩৮।	পদ-সমুদ্র—	(আউল মনোহর দাস সংগৃহীত।)
২৩৯।	পরকীয়া মত খণ্ডন—	রঘুনন্দন গোস্বামী।
২৪০।	প্রেম-দাবানল—	নরসিংহ।
২৪১।	প্রেম-বিষয় বিলাস—	যুগলকিশোর দাস।
২৪২।	প্রেমভক্তি-সার—	গুরুদাস বসু।
২৪৩।	প্রেমামৃত—	গুরুচরণ।
২৪৪।	প্রেম-সম্পুট—	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
২৪৫।	পদরত্নাবলী—	(?)

ব

২৪৬।	বেশাশ্রয় বিধি—	(?)
২৪৭।	বৈষ্ণব-বোধিনী—	(?)
২৪৮।	বৈষ্ণব-ভাগবতামৃত—	(মহাকাব্য) বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
২৪৯।	বৃহৎ ভাগবতামৃত—	শ্রীসনাতন।
২৫০।	বৈষ্ণব-বন্দনা—	দৈবকীনন্দন দাস।
২৫১।	বৈষ্ণব-বন্দনা—	বৃন্দাবন দাস।
২৫২।	বৈষ্ণব-বন্দনা—	বৃন্দাবন দাস ঠকুর।
২৫৩।	বৈষ্ণব-অভিধান—	দৈবকীনন্দন দাস।

২৫৪।	বিদগ্ধমাধব—	শ্রীরূপ।
২৫৫।	রঙ্গজয়—	রামচন্দ্র কবিরাজ।
২৫৬।	বৈষ্ণব-চিন্তামণি—	(?)
২৫৭।	বৃহৎ তোষিণী টীকা।	শ্রীসনাতন।
২৫৮।	বৃহৎ পাষণ্ড দলন—	বীরচন্দ্র।
২৫৯।	বৈষ্ণবাষ্টকং—	কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
২৬০।	বসন্ত সুকুমার কাব্য।	বসন্ত রায়।
		(প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত)
২৬১।	ব্রহ্মসংহিতা—	(শ্রীশ্রীপ্রভুর আনিত)
২৬২।	ঐ টীকা—	শ্রীজীব।
২৬৩।	বিদগ্ধমাধব টীকা—	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
২৬৪।	ঐ অনুবাদ—	যদুনন্দন দাস।
২৬৫।	বৈষ্ণব-তোষণী টীকা—	শ্রীসনাতন।
২৬৬।	বেদান্ত শতক—	বলদেব বিদ্যাভূষণ।
২৬৭।	বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য—	ঐ
২৬৮।	বংশীশিক্ষা (ক)	রামাই ঠাকুর।
৩৬৯।	বিশ্বাষ্টকং—	(প্রভুর সন্ন্যাসের সময় রচিত নরসুন্দর কর্ত্তৃক)
৩৭০।	বিবর্ত্তবিলাস—	(?) সহজিয়া গ্রন্থ।
২৭১।	ব্রহ্মকমল—	(?)
২৭২।	বংশীলীলামৃত—	(?)
২৭৩।	বিশ্বমোহনাষ্টকং—	শ্রীশ্রীমহাপ্রভু।
২৭৪।	বিষ্ণুনৃত্যাষ্টকং—	শ্রীশ্রীমহাপ্রভু।
২৭৫।	বৈষ্ণবাচার-দর্পণ—	নবদ্বীপ গোস্বামী।
২৭৬।	বংশীশিক্ষা (খ)—	প্রেমদাস।
২৭৭।	বৈষ্ণবদিগদর্শনী—	(প্রাচীন) (?)
২৭৮।	বীরচন্দ্র চরিত্র—	নিত্যানন্দ দাস।
২৭৯।	বংশীশিক্ষা—	বল্লভ দাস।
২৮০।	বৃন্দাবন ধ্যান (ক)—	শ্রীজীব।

২৮১। বৃন্দাদেব্যাষ্টক— শ্রীরূপ।
২৮২। বৃহৎ গণোদ্দেশ-দীপিকা— ঐ
২৮৩। ব্রজরসপূর— রঘুনাথ দাস।
২৮৪। বাল্যলীলা (শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর)— লাউড়ীয়া কৃষ্ণদাস।
২৮৫। বস্তুতত্ত্বসার— লোচন দাস।
২৮৬। বংশীবিলাস— রাজবল্লব দাস।
২৮৭। বৃন্দাবন পরিক্রমা— কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
২৮৮। ঐ শ্যামানন্দ।
২৮৯। বৃন্দাবন ধ্যান (প)— কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
২৯০। ঐ শ্যামানন্দ।
২৯১। ব্রহ্মাণ্ড-ভূগোল— আতিরড় জগন্নাথ দাস।
২৯২। বীররত্নাবলী— রাধামোহন ঠাকুর।
২৯৩। ঐ গতিগোবিন্দ।
২৯৪। বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য— পরাশর পুত্র মাধবাচার্য্য।
২৯৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলী— রঘুনাথ দাস।
২৯৬। ঐ টীকা— রাধাবল্লভ দাস।
২৯৭। বিলাপবিবৃতি মালা— (?)
২৯৮। ব্রজতত্ত্ব নিবর্ত্ত— (?)
২৯৯। বৈষ্ণবামৃত— (?)

ভ

৩০০। ভজন-নির্ণয়— বৃন্দাবন দাস।
৩০১। ভাবামৃত-মঙ্গল— প্রেমদাস।
৩০২। ভক্তিসন্দর্ভ— শ্রীজীব।
৩০৩। ভাগবত-সন্দর্ভ। ঐ
৩০৪। ভক্তিরসামৃত-সিন্দুর টীকা— ঐ
৩০৫। ঐ সিন্ধু-বিন্দু— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
৩০৬। ভাবার্থ সূচক চম্পূ— শ্রীজীব।
৩০৭। ভক্তিরত্নাকর— গোপাল দাস।

৩০৮।	ভক্তিরত্নাকর—	ঘনশ্যাম বা নরহরি দাস।
৩০৯।	ভক্তিলহরী—	(?)
৩১০।	ভজনামৃত—	নরহরি সরকার।
৩১১।	ভ্রমরগীতার অনুবাদ—	দেবানন্দ দাস।
৩১২।	ভাবনাপ্রাশ—	রঘুনন্দন গোস্বামী।
৩১৩।	ভক্তলীলামৃত—	ঐ
৩১৪।	ভক্তমালা—	ঐ
৩১৫।	ভজন-মালিকা—	কৃষ্ণরাম দাস।
৩১৬।	ভক্তি-উদ্দীপন—	নরোত্তম।
৩১৭।	ভক্তিচিন্তামণি—	বৃন্দাবন দাস।
৩১৮।	ভক্তিরসাত্মিকা—	অকিঞ্চন দাস।
৩১৯।	ভাগবতামৃত-কণিকা—	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
৩২০।	ভক্তমাল (হিন্দি)—	নাভাজী।
৩২১।	ঐ টীকা—	প্রিয়দাসজী।
৩২২।	ঐ অনুবাদ—	লালদাস বাবাজী।
৩২৩।	ভাষাশব্দার্ণব—	জগদানন্দ (শ্রীখণ্ড)।
৩২৪।	ভক্তিচন্দ্রিকা পটল—	নরহরি দাস।
৩২৫।	ভক্তামৃতাষ্টকং—	ঐ
৩২৬।	ভাগবতাষ্টকং—	শ্রীশ্রীমহাপ্রভু।
৩২৭।	ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু—	শ্রীরূপ।
৩২৮।	ভোগনির্ণয়-পদ্ধতি—	সূর্য্যদাস সরখেল।
২২৯।	ভাগবতের অনুবাদ—	মালাধর বসু।
৩৩০।	ঐ সারার্থদর্শনী টীকা।	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
৩৩১।	ভাগবত-ভক্তিবিলাস—	মদনমোহন গোস্বামী।
৩৩২।	ভাগবতামৃত দিগ্‌দর্শনী টীকা—	শ্রীসনাতন।
৩৩৩।	ঐ অনুবন্ধ—	জয়গোবিন্দ দাস।
৩৩৪।	ভক্তিদিগ্‌দর্শনী—	(?)
৩৩৫।	ভাগবতের দশম টীকা—	কর্ণপূর।

৩৩৬। ভাগবত-ব্যাখ্যা— অতিবড়জগন্নাথ দাস।

৩৩৭। ভবিষ্যপুরাণ (গৌরলীলা) (?)

ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস প্রকাশিত।

৩৩৮। ভক্তিরসায়ণ— (?)

৩৩৯। ভক্তিবিবেক— (?)

ম

৩৪০। মুরলীবিলাস— (?)

৩৪১। মুরলীমন্দির— (বাগ্‌নাপাড়া হইতে)

৩৪২। মনঃসন্তোষিণী— জগজ্জীবন মিশ্র।

৩৪৩। মনঃশিক্ষা— প্রেমানন্দ দাস।

৩৪৩। (ক) মনশিক্ষা— রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

৩৪৪। মাথুরপদাবলী— জ্ঞানদাস।

৩৪৫। মুরলীশিক্ষা— ঐ

৩৪৬। মুক্তাচরিত— নারায়ণ দাস।

৩৪৭। মাধুর্য্যকাদম্বিনী— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

৩৪৮। মনঃশিক্ষা— গিরিধর দাস।

৩৪৯। মুকুন্দমুক্তাবলী স্তব— শ্রীরূপ।

৩৫০। মথুরা মাহাত্ম্য— শ্রীরূপ।

৩৫১। মহাপ্রসাদ বৈভব— (?)

৩৫২। মহাভাবানুসারিণী— রাধামোহন ঠাকুর।
(পদামৃত সমুদ্রের টীকা)

৩৫৩। মদনমোহন বন্দনা— জয় কৃষ্ণদাস।

য

৩৫৪। যমষটপদী— রঘুনন্দন গোস্বামী।

৩৫৫। যোগসার স্তবের টীকা— শ্রীজীব গোস্বামী।

৩৫৬। যমুনাচার্য্য স্তোত্র— আনন্দমন্দার মুনি।

র

৩৫৭। রামাই চরিতামৃত— (টীকাকার বিপিনবিহারী গোস্বামী)

৩৫৮।	রাগমালা—	নরোত্তম।
৩৫৯।	রামাষ্টকং—	মুরারি গুপ্ত।
৩৬০।	রসোদ্গার—	গোবিন্দ দাস।
৩৬১।	রাধারস মঞ্জরী—	শ্রীশ্রীমহাপ্রভু।
৩৬২।	রাধা-অষ্টোত্তর শতনাম—	(?)
৩৬৩।	রাধিকার মানভঙ্গ—	(?)
৩৬৪।	রামচন্দ্রের গীত—	গোবিন্দ কবিরাজ।
৩৬৫।	রাধাকৃষ্ণলীলা-রস-কদম্ব—	যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।
৩৬৬।	রসরাজ—	(?)
৩৬৭।	রাধিকার চৌতিশা—	মুক্তারামদাস।
৩৬৮।	রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা—	কবিচন্দ্র।
৩৬৯।	রাম রসায়ন—	রঘুনন্দন গোস্বামী।
৩৭০।	রাধামাধবোদয়—	ঐ
৩৭১।	রাধাকৃষ্ণ স্তব—	ঐ
৩৭২।	রাস ও ব্রজাদি নির্ণয়—	ঐ
৩৭৩।	রূপ গোস্বামীর কড়চা—	শ্রীরূপ।
৩৭৪।	রসোজ্জ্বল—	জগন্নাথ দাস।
৩৭৫।	রসভক্তি চন্দ্রিকা—	নরোত্তম দাস।
৩৭৬।	রসময় কণিকা—	শ্রীসনাতন।
৩৭৭।	রসিক মঙ্গল—	গোপীবল্লভ দাস।
৩৭৮।	রাগমালা—	কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
৩৭৯।	রাগ-রত্নাবলী—	ঐ
৩৮০।	ঐ	মুকুন্দ।
৩৮১।	রতিবিলাস—	রসিকানন্দ দাস।
৩৮২।	রাগানুগা লহরী—	(?)
৩৮৩।	ঐ অনুবাদ—	লোচন দাস।
৩৮৪।	ঐ সামান্যাংশের অনুবাদ—	শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু।
৩৮৫।	রসামৃত শেষ—	শ্রীজীব।

৩৮৬। রাগময়ী কণা— শ্রীরূপ।

৩৮৭। রসকল্পসার— বলরাম দাস।

৩৮৮। রসকদম্ব— বল্লভদাস কবি বল্লভ।

৩৮৯। রাগমার্গলহরী— (?)

৩৯০। রাধাচৌতিশা— দেবপাল।

৩৯১। রাধারাগসূচক— রঘুনন্দনদাস গোস্বামী।

৩৯২। ঐ অনুবাদ— রাধাবল্লভ দাস।

৩৯৩। রূপমঞ্জরী— কৃষ্ণদাস।

৩৯৪। ঐ অনুবাদ— বৈষ্ণব দাস।

৩৯৫। রাধিকার কর-পদ-চিহ্ন— শ্রীজীব।

৩৯৬। রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

৩৯৭। রূপ-রস-বল্লী— রামগোপাল দাস।

৩৯৮। রাস-পঞ্চাধ্যায় অনুবাদ— লোচন দাস।

৩৯৯। রস সংগ্রহ— (?)

৪০০। রসমঞ্জরী— পীতাম্বর দাস।

ল

৪০১। ললিত মাধব। শ্রীরূপ।

৪০২। লোচন রোচনী টীকা— শ্রীজীব
(উজ্জ্বল নীলমণির টীকা)

৪০৩। লঘু তোষিণী টীকা— ঐ

৪০৪। লঘু তোষিণী— পূর্ণানন্দ স্বামী।

৪০৫। লঘু গণোদ্দেশ টীকা— শ্রীরূপ।

৪০৬। লঘু ভাগবতামৃত— শ্রীরূপ।

শ

৪০৭। শান্তি-শতক টীকা— রঘুনন্দন গোস্বামী।

৪০৮। শিবশর্ম্মদ স্তোত্র— ঐ

৪০৯। শাখা বর্ণন— রসিকানন্দ দাস।

৪১০। শ্যামানন্দ প্রকাশ। কৃষ্ণদাস।

৪১১। শ্রীরূপ চিন্তামণি— শ্রীরূপ।
৪১২। শ্রীবল্লভ লীলা— বল্লভ দাস।
৪১৩। শ্রীনিবাসাষ্টকং— নরোত্তম।
৪১৪। শ্রীনিবাস চরিত— নরহরি চক্রবর্ত্তী
৪১৫। শ্রীবাস চরিত— বৈষ্ণবচরণ দাস।
৪১৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকং ও প্রলাপ—
কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

ষ

৪১৭। ষট সন্দর্ভ— শ্রীজীব।
৪১৮। ঐ টীকা— বলদেব বিদ্যাভূষণ।

স

৪১৯। স্তব মালা— শ্রীরূপ।
৪২০। ঐ ভাষ্য— বলদেব বিদ্যাভূষণ।
৪২১। সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকা— ঐ
(লঘুভাগবতামৃতের)
৪২২। স্মরণমঙ্গল স্তোত্র। শ্রীরূপ
৪২৩। স্বপ্নবিলাসামৃত— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
৪২৪। সীতা-চরিত্র— লোকনাথ দাস।
৪২৫। সদ্ভাবচন্দ্রিকা— ঐ
৪২৬। সিদ্ধ ভক্তি চন্দ্রিকা— ঐ
৪২৭। স্মরণ মঙ্গল—(ক) ঐ
৪২৮। সাধুপ্রেম-চন্দ্রিকা— ঐ
৪২৯। সারাবলী— (?)
৪৩০। স্তবাবলী— (?)
৪৩১। সর্ব্বসম্বাদিনী টীকা— শ্রীজীব।
(ষট সন্দর্ভের)
৪৩২। সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়— মুকুন্দ দাস।
৪৩৩। সুবল মঙ্গল— রামচন্দ্র কবিরাজ।

৪৩৪। স্মরণ মঙ্গল (খ)— (?)
৪৩৫। সঙ্গীত মাধব— সন্তোষ দত্ত।
৪৩৬। সঙ্গীতমাধব নাটক— গোবিন্দ কবিরাজ
৪৩৭। সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা— নরোত্তম।
৪৩৮। সূর্য্যমণি— ঐ
৪৩৯। সনাতন গোস্বামীর সূচক— রাধাবল্লভ দাস।
৪৪০। সহজ তত্ত্ব— ঐ
৪৪১। সংক্ষেপ বৈষ্ণব-স্মৃতি— মাধব।
৪৪২। সার গীতা— (?)
৪৪৩। সদাচার নির্ণয়— রঘুনন্দন গোস্বামী
৪৪৪। স্তব কদম্ব— ঐ
৪৪৫ সংশয় সাতনী টীকা— ঐ
(ভাগবতের)
৪৪৬। ঐ শ্রুতা ধ্যায় টীকা— ঐ
৪৪৭। স্তবামৃত লহরী— বিশ্বনাথ চক্রঃ
৪৪৮। সুখ বর্ত্তিনী— ঐ
(আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূর টীকা
৪৪৯। সারার্থ বর্ষিণী টীকা— ঐ
(গীতার টীকা)
৪৫০। সারার্থ-দর্শিনী— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
(ভাগবত টীকা)
৪৫১। সুবোধিনী— ঐ
(অলঙ্কার কৌস্তুভ টীকা)
৪৫২। সার সংগ্রহ— কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
৪৫৩। সূচক (৬ গোস্বামীর) ঐ
৪৫৪। স্বরূপ বর্ণন। ঐ
৪৫৫। সার্ব্বভৌম নিরুক্ত। বাসুদেব সার্ব্বভৌম
৪৫৬। স্বরূপদামোদর কড়চা— দামোদর।

৪৫৭। স্মরণ-দর্পণ— রামচন্দ্র কবিরাজ।

৪৫৮। স্তবাবলী— রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

৪৫৯। সঙ্কল্প কল্প-বৃক্ষ— শ্রীজীব।

৪৬০। সাধু-মহোৎসব— ঐ

৪৬১। সূত্রমালা— ঐ

৪৬২। সাধন-লক্ষণ— (?)

৪৬৩। সাধন-কথা— (?)

৪৬৪। সাধনোপায়— মুকুন্দ দাস।

৪৬৫। সাধ্যবস্তু সাধন— (?)

৪৬৬। সারাৎসার-কারিকা— (?)

৪৬৭। সিদ্ধসার— গোপীনাথ দাস।

৪৬৮। সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা— রামচন্দ্র দাস।

৪৬৯। সিদ্ধি-লক্ষণ— কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৪৭০। সুদামা চরিত্র— বিপ্র পরশুরাম।

৪৭১। সুবলমঙ্গল সূত্র— গিরিধর দাস।

৪৭২। সঙ্কল্প কল্পদ্রুম— বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

(মতান্তরে শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত)

৪৭৩। সংক্ষেপ ভাগবতামৃত— শ্রীরূপ।

৪৭৪। সনাতন শিক্ষা— (?)

৪৭৫। স্তবপুষ্পাঞ্জলি— (গোস্বামিগণ কৃত)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।
পাণিহাটি, ২৪ পরগণা।

মহা-আহ্বানে।

ওই ডাকে মোর প্রাণের দেবতা
　　ওই শুন!—ওগো যাই!
গৃহের করম থাক্ পড়ি' সব,
　　আর তাহে কাজ নাই!

কবে কোন্ দিন এসেছি এ পারে,
পথ ঘাট কিছু নাহি মনে পড়ে,
কেমনে ফিরিব নিজ ঘরে মোর—
কেহ সাথী আজ নাই!
রাজাধিরাজের মহা-আহ্বান,
কিসের ভাবনা?—ছুটি চল্ মন;
অচেনা সে দেশে কেমনে যাইবে
ভাবিছ কি বসি' তাই?
সে দেশ রে মন, অজানা তো নয়
—সেই ত' আপন ঘর;
যে ডাকে সে তোর বড় আপনার—
কেহ নাই তাঁর পর;
তাঁহার চরণ হৃদয়ে ধরিলে,
দুঃখ, শোক, ভয়, সব যায় চ'লে,
স্নেহ, দয়া, প্রেম,—অপার করুণা
কোথা'ও তেমন নাই!
ওগো জীবন-বন্ধু!—আসিয়াছি আজ
মরণ-সিন্ধু তটে;
প্রদীপ আমার নিবে এলো প্রায়
—খেয়া রাখ নাই ঘাটে!
দীপ নিবে গেলো—সব অন্ধকার!
ডাকিয়াছ যদি কর মোরে পার!
পারের কাণ্ডারি! তুমি ছাড়া আজ
আপনার কেহ নাই!
ওই ডাকে মোর প্রাণের দেবতা
ওই শুন!—ওগো যাই!

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী।

শ্রীবৃন্দাবন কলঙ্ক।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের আগমনে পাপাচ্ছন্ন কলিযুগ ধন্য হইয়াছে। তাঁহার চরণে একান্ত আশ্রয় ব্যতীত কলিজীবের পরম-কল্যাণের উপায়ান্তর নাই। প্রেমময় শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম-মধুপানে জীব প্রকৃত অমরত্ব লাভ করে, পরম প্রেমপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অন্তর-মর্ম্মে প্রবেশ লাভ করতঃ রস-সীমা প্রাপ্ত হয়।

প্রেয়সীর ভাব-কান্তি-ভোরা রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অন্তর-মর্ম্ম সম্বন্ধে রসিক-ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন,

"রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।" বস্তুতঃ প্রেয়সীর ভাব-আস্বাদন-লীলাতেই শৃঙ্গার-রস-সার-স্বরূপ উক্ত লীলাতেই রসিকেন্দ্র চূড়ামণির পরিপূর্ণ-রস-সার্থকতা; সুতরাং রসরাজ শ্যামসুন্দরের শ্রীরাধাভাব-আস্বাদন-রূপ-গৌরাঙ্গ-লীলা বিচিত্র-শৃঙ্গার-রহস্য; উক্ত লীলার সরোবরে শ্রীরাধামাধবের যুগল উজ্জ্বল লীলার শত শত ধারা প্রবাহিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একথাটিও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে —

কৃষ্ণলীলামৃত সার,　　　　তার শত শত ধার,
দশদিগে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয়,　　　　সরোবর অক্ষয়;
মন হংস চরাও তাহাতে।

কৃষ্ণ-লীলামৃত সার—যুগল উজ্জ্বল লীলা। তার শত শত ধার—পূর্ব্ব-রাগাদি লীলাক্রম। দশদিগ—সর্ব্বদিগ, সুতরাং গৌরাঙ্গলীলা রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মিকা। উক্ত ভাব-আস্বাদন-লীলার সিদ্ধান্ত-আরম্ভেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,

"যাহা হৈতে হয় গৌরবের মহিমার সীমা।" শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে সংকীর্ত্তন-আদিলীলা-রঙ্গেই শ্রীরাধার ভাব আস্বাদন করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেই শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের প্রকৃত প্রধান লীলা শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখেই বহুবার এইরূপ বলিয়াছেন, "সংকীর্ত্তন লাগিয়া মোহার অবতার" শ্রীকৃষ্ণের নিজ প্রয়োজন, প্রসিদ্ধ তিন বাঞ্ছা পূরণ, জীব-প্রয়োজন ব্রজপ্রেম দান; ভাব-আস্বাদনে সংকীর্ত্তন-লীলা-রঙ্গে উভয়ই সিদ্ধ হইয়াছে।

যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

কোন কারনে হৈল যবে অবতারে মন।
যুগ ধর্ম্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন॥
দুই হেতু অবতরি লইয়া ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম-সংকীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥

কবিরাজ গোস্বামিচরণ নিজেই "কোন কারণ" শব্দে তিন বাঞ্ছা-পূরণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং নিজ গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে এরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, কয়েকটি বিভ্রান্ত চিত্ত লোক প্রেম-ময় প্রভুর শৃঙ্গাররস-সার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন রাসোপলক্ষিত ভাব-আস্বাদন-লীলা-রঙ্গকে গৌণ ক্ষণিক প্রভৃতি পাপ-সিদ্ধান্তের দ্বারা উড়াইয়া দিতে উদ্যত। কলির কোন্ প্রেরণায় ইহাদিগের মধ্যে নায়ক-নায়িকার ক্রিয়া বিশেষের চমৎ-কারিতা উপস্থিত হইয়াছে, তাই ইহারা ভাব-আস্বাদন-রূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা আদৌ পছন্দ করেন না, বস্তুতঃ ভাব-আস্বাদনের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য শ্রীগৌর-গোবিন্দে অভেদ-দর্শী প্রকৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণেরই বেদ্য, প্রভুর পরম ভক্ত রসিক মহাজনগণ উক্ত শ্রীগৌরাঙ্গলীলার গাম্ভীর্য্যে বিস্মিতভাবে বলিয়াছেন।

প্রভুর ভাবাঢ্য লীলা সমুদ্র গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভাব-আস্বাদনলীলার মহিমা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত সিন্ধুর বিন্দুও ইহাদের অন্তর স্পর্শ করে না। এইরূপ স্পষ্ট বিচারেও বুদ্ধি প্রবেশের বাধকরূপ দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ নায়ক-নায়িকার ক্রিয়া বিশেষের সুখের দ্বারা লীলারসের অনু-মান।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিদ্বেষ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণে বিদ্বেষ প্রকাশে ইহারা সর্ব্বনাশের পথই আবিষ্কার করিতে-ছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাস্যই শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণে

শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং লীলারসে বিচিত্রতা বা মাধুর্য্য-বিশেষ থাকিলেও উভয়স্বরূপ অভিন্ন। রাধাভাবদ্যুতি-বিশিষ্ট কৃষ্ণ-ব্যতীত গৌরাঙ্গ ভিন্ন ব্যক্তি নহেন। সুতরাং কৃষ্ণবিদ্বেষে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার অপলাপে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই সর্ব্বনাশ করা হইতেছে। শ্রীরাধার চরণাশ্রয়ে তাঁহার ভাব-বোধ না হইলে গৌরাঙ্গসুন্দরের অন্তর-মর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়া অন্তরঙ্গ হওয়া যায় না, শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা ব্যতীত ও ভাব-আস্বাদন-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীপ্রভুর আনুকূল্য অনুশীলনরূপ ভজনের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং শ্রীরাধা কৃষ্ণ-উপাসনা ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বাক্যা-ড়ম্বর মাত্র(১)। ত্রিশের বসন্তদের দলভুক্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় নানারূপ আন্দোলন, পুস্তক প্রণয়ন (২) ও প্রবন্ধের দ্বারা স্বমনঃকল্পিত অভিনব গৌরবাদ প্রচারে মহাজন-সম্মত বাস্তব গৌরগোবিন্দ-উপাসনার ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় শিববিরিঞ্চি বন্দিত শ্রীরাধামাধবের মধুর-লীলার বিরুদ্ধে পরকীয়া-উল্লেখে হীনজনোচিত অকথ্য অনালোচ্য অতি কদর্য্য বিদ্রূপ প্রকাশিত হইয়াছে (৩) এবং শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের সংকীর্ত্তন-লীলা গৌণ হেয় করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীসংকীর্ত্তন-লীলা-শক্তি শ্রীগৌর-সুন্দরের অতি অন্তরঙ্গ শ্রীগদাধরের প্রতিও বিদ্রূপাত্মক কদর্য্য আক্রমণের ত্রুটি হয় নাই (৪)। পরে সম্পাদক ইহাতে তাদৃশ ফল না পাইয়াই হউক, অথবা ভক্ত-বিশেষের অসন্তুষ্টি প্রকাশ জন্যই হউক, পুনরায় বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীরাধামাধবের উন্নত উজ্জ্বল রসে সাধারণের অনধিকার নির্ণয় করিয়াই এবার তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার অকর্ত্তব্যতা

(১) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় "গৌরাঙ্গভজন ও তাহার মতানুযায়ী ভজন" এই অত্যদ্ভুত নামে প্রায়ই প্রবন্ধ বাহির হয়, উহার আমূল প্রতিবাদ আবশ্যক।

(২) বৈষ্ণব-ধর্ম্মনাশক সম্পাদকের মনঃকল্পিত সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী নামক পুস্তক সম্বন্ধে কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুর ও তত্রত্য সভা আলোচনা করিতেছেন—ইহাতে প্রতিকারের আশা হয়।

(৩) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা অগ্রহায়ণ।

(৪) ভাদ্র।

উপদেশ করিয়া তাহার মনঃকল্পিত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপের উপাসনার বিধান করিতেছেন।

ফলকথা, বিদ্রূপ করিয়াই হউক, আর প্রশংসা করিয়াই হউক, শ্রীরাধা-মাধবের মধুর উপাসনা ও সংকীর্ত্তন-লীলা-রঙ্গী শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনা প্রতিবাদ করাই সম্পাদকের ব্রত।

সম্পাদক সদল-বলে কেবল শ্রীগৌরগোবিন্দ উপাসনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় 'হরেকৃষ্ণ' নাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন বাধা করিবার উদ্দেশ্যেও তাহাদের উদ্যম অসীম। যখন শ্রীধাম-নবদ্বীপে বিভিন্ন আচার্য্য-বৈষ্ণববৃন্দের গৃহে প্রায় প্রাত্যহিন অনুষ্ঠিত অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের সহিত, মাড়োয়ারী ভক্তগণের শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ 'হরেকৃষ্ণ' নাম সংকীর্ত্তন-ধ্বনি গগন মুখরিত করিল, সেই সময়ই না কি কৃষ্ণনাম-অসহিষ্ণুদল বিবিধ উপায়ে, উহা বাধা করিবার চেষ্টা করিল। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তির তুলনায় তাহার নাম-মহিমা খ্যাপন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণনাম প্রতিবন্ধ চেষ্টা হইয়াছে। কৃষ্ণনামের মহিমা লাঘব করিয়া যখন বৈষ্ণব-সমাজে কোন ফল উৎপন্ন হইল না, তখন ইহারা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল "হরিনাম মহামন্ত্র, সুতরাং জপ্য, কীর্ত্তনীয় নহে।" নব্য গৌরবাদিগণ মনে করিল, কলিযুগে সংকীর্ত্তন-প্রধান উপাসনা; বিশেষতঃ সুযোগ সুবিধা ও সামর্থ্য অভাবে সাধারণের উপাসনা কেবল সংকীর্ত্তন মাত্রেই শেষ হয়। সুতরাং 'জপ্য' এই সিদ্ধান্তের দ্বারা সংকীর্ত্তন বন্ধ করিলে, আমাদের অভিপ্রায় অনেকটা সিদ্ধ হইবে। তখন সেইরূপই আন্দোলন উঠিল, নাম-মহামন্ত্র জপ্য, কীর্ত্তনীয় নহে। বস্তুতঃ শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র জপ ও সংকীর্ত্তন বিধান শাস্ত্রসম্মত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে চিরপ্রচলিত; সুতরাং এরূপ ছলনাময় বিরুদ্ধ আন্দোলনে আচার্য্য ও বৈষ্ণববৃন্দ অসন্তুষ্ট ও বিচলিত হইলেন।

ভারত-বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, আচার্য্য-সন্তান ও বৈষ্ণবগণ সমবেত ভাবে অভিমত প্রকাশ করিলেন "শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়।" ভক্তজন-প্রিয় মহানুভব শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বর্ম্মা মহাশয় শাস্ত্র-প্রমাণ সহ উহা পুস্তকাকারে ছাপাইয়া সাধারণে প্রকাশ করিলেন, গোলযোগ শান্ত হইল।

পুনরায় গত ফাল্গুন মাস হইতে এ যাবৎকাল শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাহির হইতেছে। ঐ প্রবন্ধে প্রতিবাদকের নাম লিখা আছে :—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীগোপাল দাস।
শ্রীধাম-বৃন্দাবন।

প্রতিবাদকের নাম-ধাম দেখিয়া আমরা শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব-সমাজ, বড়ই বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। আমাদের একমাত্র গতি প্রেমময়-প্রভু যে নাম জপ ও সংকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন, যাঁহার সাধনায় করুণাময় প্রভু কলিহত জীবকে অনর্পিত প্রেমদান করিয়াছেন, যাহা সম্প্রদায়ে মহাজন-পরম্পরা চিরপ্রচলিত, ভারত-প্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী ও শ্রীনবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র-ধামস্থ ও বিভিন্ন দেশীয় আচার্য্য ও বৈষ্ণববৃন্দ যে শ্রীহরিনামের সংকীর্ত্তন-বিধান শাস্ত্রযুক্তি ও সদাচার-সম্মত বলিয়া নিশ্চয় করিলেন, শ্রীপ্রভুর চরণাশ্রয়ে তাঁহার পরমপ্রিয় শ্রীবৃন্দাবন-ধামে এমন ধৃষ্ট ও গর্হিতকর্ম্মা বৈষ্ণব কেহ নাই যে, উহার প্রতিবাদ করে। শ্রীগোবর্দ্ধনে চিরব্যাপী "হরে কৃষ্ণ" নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সংবাদ প্রায় সর্ব্বস্থানে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণই পাইয়াছেন। ঐ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীবৃন্দাবন-ধামের সমগ্র বৈষ্ণব সমবেত ছিলেন; আমরা এখানে এ পর্য্যন্ত প্রতিবাদকের কোনও সন্ধান পাই নাই। সম্ভবতঃ ঐ নামটী কপট ভাবে যুক্ত হইয়াছে। ঐরূপ উপাসনা-বাধক বৈষ্ণব-অভিমতে আমরা শ্রীধামের কলঙ্ক আশঙ্কা করি। সম্পাদক মহাশয় যদি এই প্রবন্ধখানি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-কলঙ্ক বিদূরিত করেন, পরম প্রীত হইব। বহুল প্রচার জন্য প্রবন্ধটী পত্রান্তরেও প্রেরিত হইল।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস।
শ্রীধাম-বৃন্দাবন।

আমার কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমার অবনতি ও উন্নতি।

আমার ভিতরে যদি তমোগুণের প্রাধান্য থাকে, তবেই বুঝিতে হইবে, যে কোন বর্ণের হই না কেন, আমি অবনত,—সত্য সত্যই আমি নরাধম-পদবাচ্য। আমার ভিতর তমোগুণের প্রাধান্য হইয়াছে—তাহা কিরূপে জানিব? মনুষ্যেতর জীব এ বিষয় বুঝিতে না পারিলেও মানুষ আমি—শাস্ত্রানুসারে আমার লক্ষণ বিচার করিয়া জানিতে বা বুঝিতে পারি। তমোগুণে অজ্ঞানান্ধকার, ইহা প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রায় বিশেষ ভাবে আবদ্ধ করিয়া থাকে।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

গীতা—১৪। ৮

যখন ভগবান পরলোক শাস্ত্র প্রভৃতির যথার্থ অর্থ আমার নিকট প্রকাশিত হইবে না, সব অন্ধকার, শূন্য বা নাস্তি বলিয়া মনে হইবে, যাহা করা উচিত নহে, তাহা এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিকর্ম্মে যখন প্রবৃত্তি হইবে, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতে মন বসিবে না, যখন প্রমাদ এবং মোহ বাড়িয়াই উঠিবে, তখন বুঝিতে হইবে—আমার ভিতর তমোগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

গীতা—১৪। ১৩

আহার-গ্রহণ-সম্বন্ধে তখন আমি পশুর মত সর্ব্বভুক্ এবং উদার হইব,—দেশ-কাল-পাত্রের কোনও বিচার থাকিবে না। পচা, বাসি, অপবিত্র, অখাদ্য, কুখাদ্য, উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি আমার অপ্রিয় না হইয়া প্রিয় এবং রুচিকরই হইবে। পথে ঘাটে, রেলে ষ্টীমারে, যেখানে সেখানে ঐরূপ খাদ্য পাইলাম, আর আনন্দে খাইতে বসিলাম। পচা মাংসাদি পাইলে আমার স্ফূর্ত্তি দেখে কে?

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

গীতা—১৭।১০

আমি যাগযজ্ঞ করিব বটে, কিন্তু তাহাতে না থাকিবে শাস্ত্রীয় বিধি, না থাকিবে অন্নদান। ভূত প্রেতের মত একটা মনগড়া যজ্ঞ করিয়া, যোগ্য সঙ্গিগণের সহিত কেবল হুড়াহুড়ি পাছড়াপাছড়িই করিব। শ্রদ্ধার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায় ইহা বাস্তবিকই ভূতের শ্রাদ্ধেই পরিণত হইবে।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধা বিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥

গীতা—১৭।১৩

তপস্যাও আমি বাদ দিব না, কিন্তু সে বড় অদ্ভুত তপস্যা। পরের যাত্রা-ভঙ্গ করিতে আমি নিজের নাক কাটিব। পরের সর্ব্বনাশের জন্য হয়কে নয় করিয়া, নয়কে হয় করিয়া, দিনকে রাত্রি করিয়া, রাত্রিকে দিন করিয়া, তপস্যা করিতে আমি একটুও ত্রুটি করিব না।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎপীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥

গীতা—১৭।১৯

দানও যে করিব না এমন নহে—কিন্তু সে বড় বাহাদুরী দান। কুস্থানে (শৌণ্ডিকালয়,বেশ্যাবাড়ী,জুয়াখেলার আড্ডা প্রভৃতি স্থানে) অকালে—কি নিশায়, কি অমাবস্যায়, অপাত্রে (মাতাল, লম্পট, গুণ্ডা, জুয়াচোর প্রভৃতি সয়তান-গণকে) আমি মুক্তহস্তে দান করিব। কিসের সৎকার, কিসের ভক্তিশ্রদ্ধা,—গ্রহীতা হাত বাড়াইল, দাতা আমি "নে শালা" বলিয়া দান করিলাম।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্ তত্তামসমুদাহৃতম্॥

গীতা—১৭।২২

ভগবানের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। শাস্ত্রবাক্য উঠাইয়া দিয়া আমার প্রকৃতি যা বলে তাই করিব। বিনয়-নম্রতা আমার ভিতর থাকিবে না। ঘটীচোর, শঠ এবং ঠগ যাহাকে বলে, আমি তাহাই হইব।

অন্যের অপমান-সাধনে এবং মানীর মান নষ্ট করিতে আমি একটুও কুণ্ঠিত হইব না। কর্ম্মে আমার কোন উদ্যম থাকিবে না, একদিনের কাজ এক বৎসরেও করিয়া উঠিতে পারিব না। হাজার খাই-দাই, আর যাই করি,—আমার ভিতর হইতে বিষাদ এবং অবসাদ কিছুতেই যাইবে না। অন্ধকারের ভিতর এক কোণে পড়িয়া থাকিব,—আর মাঝে মাঝে বাহির হইয়া—যাহাকে তাহাকে বিনা কারণেই দংশন করিব। কেন আমি এরূপ করিব না, আমি যে তামস-কর্ত্তা!

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

গীতা—১৮। ২৮

যাহা ধর্ম্ম নয় তাহাই আমার নিকট ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইবে,—ধর্ম্ম কেন, সব বিষয়েই এইরূপ। সর্ব্ববিধ অর্থকে সর্ব্ববিধ অনর্থ বলিয়া ধরিয়া লইব—আর যতরূপ অনর্থ আছে—সে সব হইবে আমার বিবেচনায় প্রকৃত অর্থ। এই বিপরীত ধারণার কারণ হইতেছে তামসীবুদ্ধি।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

গীতা—১৮। ৩২

স্বপ্ন, ভয়, শোক,—বিষাদ, মদ আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না—এই সব ধারণ করিতে বাধ্য হইবার কারণ এই যে, আমাতে তামসী ধৃতি বর্ত্তমান।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥

গীতা—১৮। ৩৫

ভগবানের নাম লইয়া, শাস্ত্র পড়িয়া কি ভজন বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া আমার একটু সুখ হইবে না—বরং বিরক্তিই আসিবে। আমার সুখ অনুভব হইবে—নিদ্রা আলস্য প্রমাদে এবং অন্ধকারের ক্রিয়াতে। এই অলীক সুখ অনুভব কালেও আত্মাকে হারাইয়া বসিব এবং ইহার ফলেও আত্মবিস্মৃত হইয়া অনাত্ম জড়ে আবদ্ধ হইব।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥
গীতা—১৮।৩৯

আমার এই শোচনীয় অবস্থায় পরমাত্মা হইবে আকাশ-কুসুম, জীবাত্মা হইবে "নাস্তি"—জড়দেহ বসিবে আত্মার স্থানে। পশুর মত আহার নিদ্রা মিথুন প্রভৃতিই হইবে যথাসর্ব্বস্ব। এমন আমাকে পশু এবং অসুর নামে অভিহিত করিলে, সত্যের মর্য্যাদাই রক্ষা হইয়া থাকে। তমোগুণ হইতে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ। তমোগুণকে ঠেলিয়া রজোগুণ যদি আমার ভিতর প্রধান হইয়া উঠে, তবে আমি উক্ত অধঃপতিত অবস্থা হইতে কিছু উপরে উঠিব—আমার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইবে। এই পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি ও লক্ষণ দ্বারাই ধরা পড়িবে।

তমোগুণে যে আমি জড়ের মত পড়িয়াছিলাম—রজোগুণে সেই আমিই চঞ্চল হইয়া উঠিব। দেহ ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধির ভিতর একটা মারাত্মক "দেহি দেহি" রব পড়িয়া যাইবে—ইন্দ্রিয়গণ বিষয়তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া ছট্‌ফট্ করিবে, অনুকূল বিষয় পাইলে আর ছাড়াইতে পারিব না—কৃপণের ন্যায় বুকে বাঁধিয়া পড়িয়া থাকিবে,— কিন্তু অলসভাবে রহিতে না পারিব — অর্থ লাভ এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য দিবারাত্রি কাম্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইব।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
গীতা—১৪।৭

কর্ম্ম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিব, প্রাণান্তেও তাহা ত্যাগ করিতে পারিব না,—ভোগের অনুকূল বিষয় পাইতে ইচ্ছা হইবে,—পাইলে কিন্তু ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না—আবার পাইতে ইচ্ছা হইবে—সর্ব্বদাই মনে হইবে, সংসারের মধ্যে একজন হই—মনে মনে সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইতেও পশ্চাৎপদ হইব না,—কত গড়িব, কত ভাঙ্গিব,—কি যে একটা করিব, তা ঠিক করিয়াই উঠিতে পারিব না—"হা অর্থ হা অর্থ" করিয়া সর্ব্বদাই ছুটাছুটি—রাত্রিতেও নিদ্রা নাই, নিদ্রা হইলেও স্বপ্ন; স্বপ্নেও ঐ অনর্থ চিন্তা—সুখের চেষ্টা—কিন্তু সুখ নাই,— কেবল আক্ষেপ—"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল"—বাতশ্লেষ্মা ব্যাধিতে যেমন পিপাসায় সমুদ্র শোষণ করিতে ইচ্ছা হয়—এই অবস্থাতেও

সেইরূপ চতুর্দ্দশ ভুবনের সমুদয় বিষয় অশেষ বিশেষে ভোগ করিতে, বলবতী স্পৃহা হইবে।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ!
গীতা—১৪।১২

নাম যশের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে; সেইজন্য ইচ্ছা হইবে, যাগযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দি, বার মাসে তের পূজার ব্যবস্থা করিলেই বা ক্ষতি কি,—ইহকালে সকলেই গুণকীর্ত্তন করিবে—মরিলেও কীর্ত্তি থাকিবে, পরকালেও ফল পাইব—এইরূপ হিসাব নিকাশ করিয়া—মহা আড়ম্বরের সহিত ঢাকে ঢোলে যজ্ঞ ফাঁদাইয়া বসিব! সহস্র মুখে ধ্বনি উঠিবে—হাঁ ইনি একজন পুরুষসিংহ বটে।

"অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥
গীতা—১৭।১২

যজ্ঞ কি পূজা মহোৎসব করিয়াই ক্ষান্ত হইবনা—দাতানাম পাড়াইবার বিশেষ চেষ্টা করিব। আমি কিন্তু মূর্খের মত দান করিব না, আমার দানের ভিতর বেশ চতুরালি থাকিবে। যেখানে দেখিব, এক গুণ দান করিলে একশত গুণ পরিণামে অবশ্যই পাওয়া যাইবে, যে কার্য্যে দেখিব দান করিলে পরকালে বিশেষ ফললাভ হইবে, সেই সব স্থানে পাত্রে এবং কার্য্যেই আমি দান করিব। আমার এই ভবিষ্যৎ আশার দানে বর্ত্তমানে সুখী হইব না—প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ধনত্যাগে অন্তর্দাহ এবং অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করিব।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে পরিক্লিষ্টং চ তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥
গীতা—১৭।২১

আমি মাঝে মাঝে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া তপস্যাও করিব—উদ্দেশ্য—দেশের লোক সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলুক "হাঁ ইনি একজন সাধু বটে"। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করুক; দলে দলে শিষ্য সেবক হউক; ফুল চন্দন অর্থ বিত্ত

যোগে গুরু-ঠাকুর জ্ঞানে আমার পূজা করুক। আমার এই তপস্যায় বেশ রকমারিও থাকিবে—আজ একরূপ, কাল অন্যরূপও হইবে।

সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥
গীতা—১৭।১৮

বাসি পচা উচ্ছিষ্ট প্রভৃতিতে আর তত রুচি থাকিবে না—চাঞ্চল্যপ্রদ এবং এবং ক্লেশদায়ক আহার আমার প্রিয় হইবে। দুঃখ শোক ব্যধি হয় হইবে, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অতি কটু, অতি অম্ল অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ আহার গ্রহণ করিব। প্যাঁজ রসুন, অতিরিক্ত মাত্রায় লঙ্কা মরিচ প্রভৃতি না হইলে আমার চলিবে না।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।
গীতা—১৭।৯

বাহিরে যতই দান ধ্যান বা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিনা কেন—আসল ঘরে আমি ষোল আনায় ঠিক থাকিব। বিষয়াসক্তি আমার বাড়িয়াই উঠিবে ; কিন্তু কমিবে না,—ইহলোক পরলোক উভয়লোকেই কর্ম্মফল-ভোগের আকাঙ্ক্ষা বলবতী থাকিবে, পরের ধন আত্মসাৎ করিতে একটু কুন্ঠিত হইব না—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" আমার মুখের ব্যবহারিক ধর্ম্ম হইতে পারে ; কিন্তু আমার অন্তরের ধর্ম্ম থাকিবে হিংসা ; ভিতরে বাহিরে অশুচি থাকিব, অনুকূল বিষয় পাইলে হর্ষে ফুলিয়া উঠিব, হারাইলে শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িব। রাজসকর্ত্তা আমি এইরূপ স্বভাব প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইব।

রাগী কর্ম্ম-ফলপ্রেপ্সু র্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসং পরিকীর্ত্তিতঃ॥
গীত—১৮।২৭

পরমাত্মা এবং আত্মার স্বরূপজ্ঞান আমার কিছুতেই হইবে না—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আত্মা দর্শন করিব।

আমার যে বুদ্ধি থাকিবেনা তাহা নহে,—তবে যে বুদ্ধি থাকিবে, তাহার দ্বারা সত্য উপলব্ধি হইবেনা,—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য যথার্থরূপে নির্ণয় করিতে পারিব না, এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বসিব।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।

অযথাবৎ প্রজানাতিবুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ গীতা ১০।৩১

আমি—আমার ধারণানুরূপ ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি,—কিন্তু সেই ধর্ম্মের অর্থ হইতেছে কাম আর অর্থ,—তাহার উপরে অন্যকিছু আমার মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ধারণ করিতে পারিবে না। অর্থকাম পরায়ণ গৃহস্থেরা আমার আত্মীয়-স্বজন এবং ইষ্টকুটুম্ব হইবে। আমি তাহাদের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ করিয়া—ফল-ভোগের আকাঙ্ক্ষায়—জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।

প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ গীতা ১৮'৩৪

সুখের কাঙ্গাল আমি সুখের জন্য মাথা ভাঙ্গিব।—আমি সুখের জন্য ইন্দ্রিয়-গণ লইয়া যাইব—অনুকূল বিষয়ের নিকট। ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগে এক অলীক সুখের উৎপত্তি হইবে—তাহা অনুভব করিয়া অগ্রে মনে হইবে,

"স্বর্গেতে অমৃত থাকে লোকে তাই বলে,

তা তো নয় আমাদের বিষয়েতে ফলে।"

কিন্তু পরিণামে তাহাই আবার বিষবৎ প্রতীয়মান হইবে— শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে,—মন অবসন্ন হইবে—তবু ছাড়িব না,—চাই আবার ঐ সুখ,—মরিবার জন্য জানিয়া শুনিয়া ঐ বিষই অহর্নিশ পান করিতে থাকিব। আমার তখন যথার্থ বিশেষণ হইবে—"শিশ্নোদর-পরায়ণ"। আমি ভজন-সাধনই করি, আর যাহাই করি, শিশ্ন আর উদরের আপাতমধুর পরিণাম-বিষ সুখের জন্যই আত্মহারা হইয়া থাকিব।

বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।

পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥

গীতা—১৮।৩৮

আমার এই অবস্থায় সাধারণ মর্ত্তমানুষ যেরূপ হয়, আমিও সেইরূপ হইব। তমোগুণে একবারে অচেতন ছিলাম, এই গুণে উঠিয়া চেতন পাই—পূর্ব্বাবস্থায় জড়ের মত পড়িয়াছিলাম—এই অবস্থায় ঘূর্ণীবায়ুর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—বেড়াইতে বেড়াইতে সৎপ্রসঙ্গে সত্ত্বগুণে উঠিলেও উঠিতে পারি। ইহাই আমার উন্নতি। তমোগুণে আঁধারের মধ্যে কোনও চেষ্টাই

করিতাম না—রজোগুণে প্রখর সূর্য্যালোকে মরুভূমির মধ্যে বিষম তৃষ্ণায়—শীতল সলিলের জন্য মায়ামরীচিকার অনুসরণ করিতেছি। উভয় অবস্থা হইতেই সত্য এবং অমৃত অনেক দূরে।

সারা প্রকৃতি জুড়িয়া অন্ধকার ছিল,—ক্রমে ক্রমে সরিয়া দাঁড়াইবে, উষার আলোকে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল—নিদ্রিত বিহগগণ চেতন হইয়া গান ধরিয়াছিল—অচেতন আমি চেতন হইয়া বসিলাম। ইন্দ্রিয়মন উভয়ই প্রসন্ন। পূর্ব্ব জাড়াভাব এবং স্বপ্নচাঞ্চল্য বেশ মনে পড়িল। সুন্দর প্রকৃতি দর্শনে অন্তরে অনেক কথার উদয় হইল, কে আমি কোথা হইতে এই প্রকৃতির উপর আসিলাম? আমার লক্ষ্য কি? এই সব আমার জানা প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

পুরুষ-প্রয়োজন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীবের সংসার-দুঃখ।—

এই তিনগুণ রজ্জুতে বাঁধা পড়িয়া জীব নিজ স্বরূপ ভুলিয়া, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের পরিণতিরূপ এই জড়-দেহে আমিত্ব-বুদ্ধি রচনা করিয়া, নিজেই কর্ত্তা সাজিয়াছে। দেহে এমনি আবেশ লাগিয়াছে যে, বিষ্ঠার ক্রিমিকে লাঠি মারিলেও যেমন সে বিষ্ঠা ছাড়ে না, তেমনি দশা হইয়াছে।

এই অবস্থায় জীবের অফুরন্ত অনন্ত বাসনা জাগিতেছে, আর অনন্ত কর্ম্ম-স্রোতে গা-ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে। মায়া তখন করতালি দিতেছে, হি হি করিয়া হাসিতেছে; আর ঐ তিনগুণ রজ্জু ধরিয়া ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় নাচাইতেছে। কখনও উর্দ্ধে তুলিতেছে। তখন জীব মনে করিতেছে, বাঃ বাঃ! আমি ত স্বর্গের দেবতা! এই অভিমানে নন্দনকাননের পারিজাত-কুসুম-নির্ম্মিত-মালা গলে পরিধান করিয়া, উর্ব্বশীগণের নৃত্য-গীত দর্শন করিতেছে; তাদের সঙ্গে কতই না রঙ্গরস করিতেছে, আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। বহুই

ভোগ করিতেছে, ততই ভোগ-বাসনা বাড়িয়া যাইতেছে। আকাঙ্ক্ষার পূর্ত্তি হইতে না হইতেই আবার মায়া অতি নীচে ফেলিয়া দিতেছে।

তখন (নীচে নামিয়া) জীব, বিষ্ঠার ক্রিমি সাজিয়া তাহাতেই হাবুডুবু খাইতেছে। এইরূপে কর্ম্মস্রোতে পতিত হইয়া অনন্ত তির্য্যক্-যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। কখনও বা বলদ হইয়া বোঝা টানিতেছে, কলু চোখ বাঁধিয়া ঘানিতে জুড়িতেছে, পাথরচাপা দিয়া ঘুরাইতেছে। এমনি দুঃখভোগ করিতে হইতেছে।

জীব, সংসারের স্রোতোগতিতে ঘুরিতে ঘুরিতে কখনও বা মানবদেহ লাভ করিতেছে। এই মানবদেহই জীবের সংসার-দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র ক্ষেত্র। স্বর্গীয় দেবদেহ ও নারকীয় তির্য্যক্‌দেহ—উভয়ই ভোগের ক্ষেত্র, ত্যাগের নহে; তবে দেবদেহ সুখভোগের, আর তির্য্যক্‌দেহ দুঃখ-ভোগের—উভয়ই ঐ তিনগুণ-রজ্জুর বন্ধন। এ সুখও সুখ নহে, আর এ দুঃখও দুঃখ নহে; সমস্তই মায়া-মরীচিকার বিকার মাত্র। এ সমস্ত যাহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে, যাহা নিখিল দুঃখের আকর, সেইটাই জীবের বড় দুঃখ। এ দুঃখটী "ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা"—এই বৈমুখ্যদোষ হইতেই জীব মায়ার লাঞ্ছনা গঞ্জনা কত না ভোগ করিতেছে। এই মূল দুঃখটী দূর করিবার সুযোগ একমাত্র মানবদেহেই ঘটিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরহরি দাস ভাগবতভূষণ
কাব্য-বৈষ্ণব-দর্শন-তীর্থ।

পত্রের আত্ম-পরিচয়।

(গল্প)

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমি কলিকাতা মহানগরীর অট্টালিকারাশির মধ্যে একখানা দ্বিতল গৃহের একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাস করি। বাস্তবিক যে সেটা আমার বাড়ী তা নয়, ঐ কামরাটীর জন্য আমাকে গৃহের কর্ত্রীঠাকুরুনকে প্রতিমাসে কিছু কিছু প্রণামী দিতে হ'ত।

সেই সময়ে আমার কয়বার জ্বর হ'য়েছিল। জ্বর হ'লে যে মানুষের চিত্তের ভিতর দিয়া বিবিধ প্রকারের নূতন নূতন চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়, এ কথা বোধ হয় স্বীকার ক'রবেন সকলেই। সে চিন্তার মধ্যে অনেক সময়ে কবিত্বও খেলে যায়। তবে সকল সময়েই যে সেটা একটা সুসিদ্ধান্ত বা সুসঙ্গতিপূর্ণ কাব্য হবে, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহাই আমার মনে হয় যে, যাহা নাকি সুন্দর ও চিত্তগ্রাহী, তাহাই কাব্য। তা ছাড়া সবই দুর্ব্বল মস্তিষ্কের বিকার। আপনারা ইহাকে যাহাই বলুন না কেন, আমার কিন্তু সেই সময়ে একবার এই প্রকার অবস্থা হয়েছিল। বিষয়টা বিশেষ রহস্যপূর্ণ বলিয়া পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের কাছে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্য্যের তাপের সঙ্গে জ্বরের বেগটা সেদিন খুবই বেড়েছিল, বেলা দ্বিপ্রহরের পরে কিছু কমে গেছে। কিন্তু ঝোঁকটা সম্পূর্ণ কাটে নাই। এদিকে বাহিরে রুদ্রমূর্ত্তি মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তাপে সারাটা সহর যেন শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে গে'ছে। তার জীবনীশক্তির স্পন্দনও যেন অনেক শান্ত হয়ে গে'ছে। এমন সময়ে পাগড়ী মাথায় কোট-পেণ্টুলন আঁটা পিয়ন আসিয়া "বাবু! চিঠি হায়" বলিয়া একখানা খামে ভরা চিঠি ঘরে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

চিঠিখানা উঠাইয়া লইয়া অভিনিবেশ সহকারে দেখতে লাগলাম "এটা আসিল কোথা হ'তে।" কিন্তু মস্তিষ্ক ত দুর্ব্বল ছিলই, একদৃষ্টে তাকাবার জন্য মাথাটা কিছু বিকৃত হ'ল, দেখ্‌লাম অন্য প্রকার।

আমি দেখলাম, পত্রখানা একটা মানুষের মূর্ত্তি ধরিল। তখন বোধ হ'ল, তার মুখের ভঙ্গী দেখে, যেন সে কিছু বলবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তাকে হঠাৎ ঘরের মধ্যে দেখে আমার বুকটা যে একটু কেঁপে উঠে নাই, তা নয়, তবে মৌখিক সাহসে ভর করে বললাম "কে তুমি? কি চাও?"

তখন সেই অপূর্ব্ব মনুষ্যমূর্ত্তিধারী পত্র একটু মৃদু হাস্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কেন? চিনতে পারলে না আমাকে? আমি তোমার পত্র। আজ তোমাকে কিছু উপদেশ দিবার জন্য এসেছি। শোন,—যখন আমার মালিক প্রভু, আমার বুকে তোমার নামের দাগ লাগাইয়া ছাড়িয়া দিলেন, তখন মুখে ও

বুকে কেবল তোমারই নাম ও কথা দৃঢ়রূপে ধরিয়াছিলাম বলিয়া আজ আমি তোমার দেখা পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। প্রথমতঃ তোমার নামাশ্রয়ের পরে, একজন লোক আমাকে কারাগারের মত অন্ধকার একটা ছোট ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তথায় কিছুক্ষণ থাকার পরে, সেই জেলখানা হইতে আমাকে বাহির করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা আমার বুকে আঘাত করিতে লাগিল। আমাকে দড়ি দিয়া বাঁধিল, ছালার মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিয়া রাখিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও আমি তোমার নাম ভুলিলাম না। প্রথম প্রথম দুঃখ ও যন্ত্রণাগুলি একেবারে এই নূতন হ'লে খুবই অসহ্য হয়েছিল। তখন তোমার নামটী বুক থেকে মুছে ফেলবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম বটে কিন্তু সব ব্যর্থ হ'ল। এটা তোমারই গুণ, না আমার প্রভুদত্ত নামেরই গুণ তা ঠিক বলতে পারিনা। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি যতই নাম ভুলিতে চেষ্টা করি, ততই যেন অক্ষরগুলি খোদাই করে লেখার মত স্পষ্ট হ'তে লাগ্‌ল।

যাই হোক তোমাকে আমার একান্ত নিষ্ঠা দেখে, একজন কৃপালু ব্যক্তি, তোমার কাছে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, এ কৃপা টিঁকিবে কতক্ষণ? কিছু দূর যাওয়ার পরেই সে বাধা প্রাপ্ত হ'ল। তার আর যাওয়া হ'ল না।

কিছু সময় পরে বুঝিলাম, কে যেন আমার বন্ধন খুলিয়া দিতেছে। ভাবি-লাম, এই স্থানেই বুঝি নির্য্যাতনের সীমার ওপারে পা দিলাম। কিন্তু বাহিরে বাহির হইয়া তোমাকে দেখিতে পাইলামনা। যদিও তখন আমি তোমাকে ঠিক ঠিক চিনিতাম না, তথাপি আমার প্রভুর কাছে, তোমার রূপগুণের কথা, যেমন যেমন শুনিয়াছিলাম, তার দ্বারাই বুকের মধ্যে তোমার মূর্ত্তির একটা কাল্পনিক স্বরূপ আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম। তার সঙ্গে কোন অংশেই ঐ কারাগারের রক্ষিগণের মিল থাইল না। এখন দেখিতেছি, সেই স্বরূপটী কাল্পনিক হ'লেও একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ তোমার চেহারার সহিত তাহার বিশেষ কিছু অমিল নাই

যে রক্ষী আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিল, সে নিজ হাতে আমাকে ধরিয়া বলিল, "তুমি কোথা যেতে চাও?" আমি কিন্তু তোমার নাম ছাড়া অন্য

কিছুই জানিতাম না। আমার মুখে তোমার নাম শুনিয়া, আবার সে পূর্ব্বের মত আঘাত করিল, এবং বন্ধন করিয়া ফেলিয়া দিল। এটা কি পরীক্ষা, না প্রকৃত শাস্তি তা বুঝতে পারলেম না। যদি পরীক্ষার প্রণালী এই প্রকার হয়, তবে দুর্ব্বল হৃদয়ে তাহা কতক্ষণ সহ্য হ'বে? কারণ, সে যে কি যন্ত্রণা, কি হৃদয়-বেদনা, তা আর তোমার কাছে কোন্ ভাষায় ব্যক্ত করিব? যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে বোধ হয় কিছু কিছু অনুভব করিতে পারিবে।

তারপরে তোমার নামকেই একমাত্র সার ভাবিয়া ঐ নামের ছায়ায় থাকিয়াই কত দেশে ঘুরিলাম; কত নদ নদী পার হইলাম। কখনও মানুষের কাঁধে, কখনও বা গাড়ী জাহাজ প্রভৃতিতে কতদিন কতনা ভাবেই বেড়াইলাম কিন্তু কোথাও তোমার দেখা পেলাম না। আর যতক্ষণ তোমাকে না পাইতেছি, ততক্ষণ কোথাও শান্তি নাই। যেন সর্ব্বত্রই হু হু করে আগুন জ্বলছে।

শেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমি তোমার এই দেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। যাহার সহিত এখানে প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল, তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় গেলে তোমাকে পাওয়া যায়?"

সে বলিল, "তোমার চিন্তা নাই, তুমি যাকে খুঁজিতেছ, আমিই তোমাকে তার কাছে পৌঁছিয়ে দিব।" শুনে আমার বুকের মধ্যে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ব'য়ে গেল, হৃদয়ের বোঝা অর্দ্ধেক ক'মে গেল। ভাবিলাম, আকাশের চাঁদও আমার মুটোর মধ্যে। তবে এ কথাটা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি না যে, ইহারা আমার উপর কোন প্রকার উৎপীড়ন করে নাই। কিন্তু তা হ'লেও তাদের উপকারের কথা টী বুকের মধ্যে সকল চিন্তার উপরে স্থান পেয়েছে ব'লে তাদের অত্যাচারের কথাটা বুক ছাপিয়ে উঠ্তে পারছে না। জানই ত যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিটাও সহ্য হয়।

যাক্, বুকের ভিতরে বাহিরে সমান ক'রে তোমার নামটী আশ্রয় করেছিলাম ব'লে আজ তোমাকে পেলাম। দেখ, আমাকে কত দেশে যেতে হয়েছে, যেখানে যেখানে গিয়েছি, সে সে দেশের স্বরূপের দাগও আমার বুকে লেগে গে'ছে। কোথায় ছিলাম আমি কোন সুদূর বিদেশে, আর তুমি এখানে। কত গ্রাম কত নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে এই মহানগরীর একদেশে

এই দ্বিতল গৃহের তোমার এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পৌঁছিয়ে দিবার আমার একমাত্র সহায়, তোমার এই নাম। এই আমার জীবনে মরণের বন্ধু হ'য়েছিল।

আমার প্রভু আমাকে তোমার পরিচয় জানিয়ে ছেড়ে দিবার পরে, এ কয়েকটি কথা বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন, 'দেখ! যদি কেহ কাহাকেও পেতে চায়, কিন্তু মুখে তার নাম নিয়ে, এবং বুকের বাহিরে তার নাম লিখে, ভিতরে কেবল আত্মসুখ চরিতার্থের উপায় স্বরূপ তীব্র ভোগবাসনা পোষণ করে, তবে তার মত কপটীর আর নিস্তার নাই। যতদিন ভিতরে এক, বাহিরে আর এক প্রকার থাকিবে, ততদিন কিন্তু কিছুই হবে না। এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত হ'তে পারবে না। এই জন্যই গায়ক গেয়েছিল "ভিতর বাহির সমান করো ভাই মানুষ যদি হ'তে চাও"। তাই বলি, যত দিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা না হবে, ততদিন চীৎকার করাই সার হবে, কিছুই হবে না। এই কথাটা জলন্ত অক্ষরে চিত্ত ফলকে লিখে রাখো।"

এই কথা বলিতেছে, এমন সময়ে এক বন্ধু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তৎক্ষণাৎ পত্রও নিজের স্বরূপ গোপন করিল। চাহিয়া দেখি, পত্রখানা সেই অবস্থায় পড়ে আছে, আর সম্মুখে সেই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার ও প্রচার।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্রোপাসক বিষ্ণু-ভক্ত মাত্রই বৈষ্ণব নামে অভিহিত। বৈদিক যুগ হইতে বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত আছে এবং তাঁহার উপাসক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও আছেন। একথা বেদ, পুরাণ, সংহিতা তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়। স্কন্দ-পুরাণে বৈষ্ণবের নিম্নলিখিত লক্ষণ লিখিত আছে :—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।
বৈষ্ণবোভিহিতঃ প্রাজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥
পরমাপদমাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
নৈকাদশীং ত্যজেদ্ যস্তু তস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী ॥"

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন বলরাম-অবতার শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু এবং সদাশিব-অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আচার ও প্রচার বলিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মকেই বুঝায়।

বৃহৎ নারদীয় পুরাণ বলেন :—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন :—

"বাক্ত করি ভাগবতে কহে বার বার;
কলিযুগে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন সার।"

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু কলির যুগধর্ম্ম এই হরিনাম-মহামন্ত্র "আপনি আচরি" প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
* * * * *
হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলির পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম-সংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস ॥

কিরূপে এই নাম লইলে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে নিম্নে মহাপ্রভুর বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়॥
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা॥
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।)

নামের এত শক্তি কেন শুনুন—

"নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দ রূপ।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।)

এই নামে কত লোহা সোনা হইয়াছে, কত জগাই-মাধাই উদ্ধার হইয়াছে! শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, আবার তিনিই ভক্তরূপধারী জগদ্গুরু। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥"

অন্যত্র চরিতামৃত বলিয়াছেন :—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

তিনি নররূপে অবতীর্ণ হইয়া লোক-শিক্ষার জন্য ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সকল প্রকার আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাস-আশ্রম—উভয় আশ্রমেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং ভক্তি-ধর্ম্মের মর্য্যাদা সমানভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমে কোনদিন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন নাই; আবার সেই সঙ্গেই ভক্তি-ধর্ম্মের মর্য্যাদাও সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছেন। সন্ন্যাস-আশ্রমেও তিনি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ভিন্ন ব্রাহ্মণেতর উচ্চাধিকারী ভক্ত রায় রামানন্দের গৃহে পর্য্যন্ত ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার

আচরণ হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, ভক্তি-ধর্ম্মের সহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও অবশ্য পালনীয়। গৃহী বৈষ্ণবগণকে তিনি আত্মশ্লাঘা, কলহপ্রিয়তা গ্রাম্যকথা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসকল, অথবা কোন একটী অঙ্গ অবলম্বন করিয়া অনাসক্ত ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। যথা—

"যুক্ত বৈরাগ্য-স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক-বৈরাগ্য জ্ঞান সবে নিষেধিল।"

বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন অবশ্যকর্ত্তব্য হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে অযথা জাত্যভিমানের স্থান নাই। পতিত-পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী—

"জাতিকুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে।
প্রেম-ধন আর্ত্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে॥
যেই তেই কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।)

অন্যত্র—

"যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাই জাতি-কুলাদি-বিচার॥"

সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম; পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সকল দেশের সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই এই উদার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখের অমৃতবর্ষী বাক্য:—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবে, সেইদিন জগৎ আনন্দময় হইবে। জীবগণ চিরশান্তি লাভ করিবে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল দাস গোস্বামীকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সনাতনশিক্ষায় যাহা বলিয়াছেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ও বল্লভ ভট্টের সহিত বিচারে যাহা বলিয়াছেন এবং শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত যে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া সকল বৈষ্ণবের পক্ষেই আবশ্যক; কারণ সেই সকল বাক্য হইতেই আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার ও প্রচার প্রণালী জানিতে পারি। সংসার-ত্যাগী বৈষ্ণবদিগকে মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা :—

"বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন ধারণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তায় হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে জীব ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

অন্যত্র—

"গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ-নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"

কিন্তু বৈরাগ্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা স্ত্রী-সঙ্গ করেন, মহাপ্রভুর মতে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। মহাপ্রভুর ভক্ত ছোট হরিদাস শ্রীগোপাল আচার্য্যের ইচ্ছায় মহাপ্রভুর সেবার জন্য পরম বৈষ্ণবী বৃদ্ধা মাধবীদেবীর নিকট একদিন কিছু চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। যথা:—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"বৈরাগী হৈয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বেড়ায় প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥"

অনেক ভক্ত হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট অনুনয় বিনয় করিলেন; মহাপ্রভু সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। একবৎসর পরে হরিদাস প্রয়াগে গিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে জীবন-ত্যাগ করিলেন। তখন—

"শুনি হাসি প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥"

যে স্ত্রী-সম্ভাষণ বা দর্শন পর্য্যন্ত বৈরাগীর পক্ষে এতদূর নিষিদ্ধ, এক্ষণে সেই ঘৃণিত স্ত্রী-সঙ্গ ভেকধারী বাবাজীদের হরিভজনের অঙ্গ হইয়াছে। হায়রে! কি পরিতাপের কথা। মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া অনর্থযুক্ত ব্যক্তির গৃহত্যাগ উৎপাত-বিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে সাবধান করিয়াছেন:—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনোবসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন:—

"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

মহাপ্রভু নিজমুখে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন:—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য, পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথযোষিতাঞ্চ, হাহন্ত হাহন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।"

যিনি ভব-সাগরের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক ও ভগবদ্ভজনে উন্মুখ, সেই নিষ্কিঞ্চনজনের পক্ষে বিষয়ী-ব্যক্তি ও রমণী-দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও অনিষ্টকর। হায় কি কষ্ট! হায় কি কষ্ট!!

কিন্তু আজকাল এই অধঃপতনের যুগে বৈরাগী হইলেই সেবা-দাসী চাই,

আর সেবা-দাসী হইলেই অর্থের আবশ্যক, অর্থের আবশ্যক হইলেই বিষয়ীর আশ্রয় ভিন্ন গতি নাই।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যেরূপ ভাবে যুগধর্ম্ম হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নিম্নে একটু আলোচনা করিলাম। প্রভু নাগরিকগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

"দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়ে ঘরে॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত।)

কিরূপে এই সংকীর্ত্তন করিতে হয়, তাহাও প্রভু শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলেন॥ যথা :—

"শিষ্যগণ কহেন কেমন সংকীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥"

[শ্রীচৈতন্যভাগবত]

মহাপ্রভু কেবল যে কীর্ত্তন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা নহে ; তিনি মহামন্ত্র হরিনাম জপ করিতেও উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা—

"আপনে সভারে প্রভু করেন উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥"

মহাপ্রভু নাগরিকগণকে কেবল মুখে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই।

"দন্তে তৃণ ধরি প্রভু পরিহার করে।
অহর্নিশ ভাই সব বোলহ কৃষ্ণেরে ॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্বজন।
কায়মনোবাক্যে লইলেন সংকীর্ত্তন ॥"
[শ্রীচৈতন্যভাগবত]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও বলেন :—

"নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"

অনেক মুসলমানও সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। যবন-কুলজাত ব্রহ্মহরিদাস যবন হইয়া হরিনাম করিয়াছিলেন বলিয়া যবন-কাজী তাঁহাকে শান্তিপুরের বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া হরিনাম ত্যাগ করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মবলে বলীয়ান ঠাকুর হরিদাস গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন :—

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি-নাম ॥"

ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের সৎসাহসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভীরু, কাপুরুষ নহে—প্রকৃত বীর। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রাণ-শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের ধর্ম্ম। যিনি পশুবাদকে অবলীলাক্রমে পদদলিত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব।

মহাপ্রভুর এই প্রেম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য—

"প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম-সুখে ॥

তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দামে ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত।)

এক্ষণে এই ধর্ম্মে অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। সেই জন্য আমরা করযোড়ে প্রভু-সন্তানগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তাঁহারা কেবল গুরুগিরি ব্যবসায় করিয়া শিষ্যের অর্থ শোষণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যাজন করিতেছি মনে করিয়া জীবহিত-ব্রতসাধনে বিরত না থাকেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :—

"The soul can only receive impulse from another soul and from nothing else. The person from whose soul such impulse comes, is called the Guru."

মনু বলিয়াছেন :—

"বেদস্মৃতি সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতৎ চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্ম-প্রীতির সহিত ভগবৎ-প্রীতিই ধর্ম্মের লক্ষণ। বেদ ও স্মৃতি-বিহিত সদাচার ও আত্ম-প্রীতির সহিত ভগবৎ-প্রীতিপ্রদ পরমধর্ম্ম ভক্তির যাজন করিয়া সকলে অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করুন। আবার হরি-নামে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়" হোক্। শাস্ত্রবিধি না মানিয়া নিজে নিজে একটা কৃষ্ণ-বিষ্ণু হইবার ইচ্ছা বর্জ্জন করুন। শাস্ত্র বলেন :—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

দীনহীন—

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ
শ্রীপাদ কেশবভারতী প্রভুর বাল্যাশ্রম, শ্রীপাট দেহুড়।

প্রশ্ন-সপ্তকের আলোচনা।

(বহরমপুরের আলোচনা-সমিতি)

শ্রীসোনার-গৌরাঙ্গের পূর্ব্বতন সম্পাদক, অধুনা "সাধনা"-পত্রিকার সম্পাদক ভক্তিশাস্ত্রবিৎ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, মহাশয় শ্রীসোনার-গৌরাঙ্গের গত চৈত্র মাসে এবং সাধনার গত জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রশ্ন-সপ্তকের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রথা প্রশ্ন-সম্বন্ধিনী গবেষণা পাঠে আমরা আশানুরূপ সুমীমাংসা পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিনাই ; পরন্তু মৌলিক বিষয়ের কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় আমাদিগকে পুনরায় এই আলোচনা উঠাইতে হইয়াছে। তবে আমাদের বিশ্বাস, আজকাল আলোচনা-নামে আত্মকলহের ও বৈষ্ণব-নিন্দার প্রচুর পরিবেশন চলিতেছে ; আশা করি সুধী সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমান সন্দর্ভকে সে শ্রেণীভুক্ত করিবেন না। কোন আবেশের বশবর্ত্তী না হইয়া স্বাধীন-চিন্তাপ্রসূত শাস্ত্রপ্রমাণ-সমর্থিত আলোচনাতে ব্যক্তিগত কোন কলহ জন্মিবার কথা নহে ; পরন্তু তাহাতে আলোচ্য বিষয়ের প্রসারতা ও সমীচীনতা নির্দ্ধারণ-পক্ষে সুবিধা হয়। উল্লিখিত প্রশ্ন-সপ্তকের প্রথম প্রশ্নটী উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। সুতরাং তাহার শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ প্রমাণ সদাচার-সম্বলিত গবেষণা সকলেই তাঁহার নিকটে পাইবার আশা করিতেছেন। বিশেষতঃ রাধাগোবিন্দ বাবু প্রাচীন গোস্বামি-পাদগণের অনুগত, সর্ব্বথা প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভজনাদর্শের পরিপোষক ও সমর্থক। বর্ত্তমান প্রশ্ন-বিচারে তাদৃশ রাধাগোবিন্দ বাবুকে তাঁহার মত সমর্থন-হেতু আধুনিক প্রমাণের (১) আশ্রয় লইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন এবং পরমারাধ্য পূজ্যপাদ নিয়ামক প্রভুপাদকে স্ব-মত পরিপোষণের জন্য এখনও জড়িত করায় আমাদিগকে সমধিক বিস্ময়াপন্ন ও ক্ষুব্ধ করিয়াছে। (২)

---

(১) আধুনিক প্রমাণের আশ্রয় লওয়ার কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামিচরণগণের বচন এবং বৈষ্ণবাচার-সমর্থিত প্রমাণাদিই মূল প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। সাঃ সঃ।

(২) বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় আছে বলিয়া মনে হয় না। "প্রশ্ন-সপ্তক-

প্রথম প্রশ্নটী হইতেছে "শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে স্মরণ-মননে ব্রাহ্মণ কিশোর-কুমার এই সিদ্ধদেহ চিন্তনীয় কিনা?" সম্পাদক মহাশয়ও ঠিক্ তাহাই তুলিয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কলেবর শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে সিদ্ধদেহের প্রয়োজনীয়তা এবং সাধকদেহের অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণ করিতেই পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার সমর্থন জন্য সম্পাদক মহাশয়ের চিরদিনের অবলম্বন প্রাচীনাচার্য্যের অক্ষর বোধ হয় না পাইয়া (৩) "পাইন" মহাশয় প্রভৃতির সঙ্কলিত আধুনিক প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোনটাও বহরমপুর

সম্বন্ধে" প্রবন্ধটী লিখিয়া ৬।৫।২৬ তারিখে প্রভুপাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ১৭।৫।২৬ তারিখে তাহা ফেরত পাইয়াছি। প্রবন্ধটী তাঁহার অনুমোদিত বলিয়া প্রকাশ করার অনুমতিও প্রভুপাদই দিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের সাধনায় ১২৬-১২৭ পৃষ্ঠায় এবং অগ্রহায়ণ পৌষ-মাঘ-মাসের মাধুকরীতে প্রভুপাদের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও মূল প্রবন্ধের বক্তব্যই সমর্থিত হইয়াছে।

—সাঃ সঃ।

(৩) নবদ্বীপের ভজনে পার্ষদ-দেহ-ভাবনার প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার হেতু এই যে, আজকাল কেহ কেহ ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকারই করিতে চাহেন না। ইহার সমর্থনের জন্য আমরা যে প্রাচীন আচার্য্যের কোনও অক্ষর পাই নাই বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর এবং ভক্তিসন্দর্ভ হইতে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর বচনই আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। (জ্যৈষ্ঠ-সাধনা ৮৭।৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। গোস্বামিচরণগণ বলিয়া গিয়াছেন, ভক্তিমার্গে যে কোনও ভগবৎ স্বরূপের ভজনেই পার্ষদ-দেহ-ভাবনা আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের ভজন-পদ্ধতিতেও যে গোস্বামিচরণগণের অভিমত অনুসৃত হয়, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই পাইন মহাশয় প্রভৃতির প্রকাশিত আহ্নিক-পদ্ধতি গ্রন্থে সঙ্কলিত নবদ্বীপের আত্ম-ধ্যান-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল পদ্ধতি-গ্রন্থ আধুনিক-কালে প্রকাশিত হইলেও সঙ্কলিত প্রমাণগুলি আধুনিক নহে; যাঁহারা পাইন-মহাশয় প্রভৃতির মুদ্রিত গ্রন্থ দেখেন নাই, এমন অনেক বৈষ্ণবের নিকটে হস্তলিখিত পদ্ধতি-গ্রন্থেও ঐ সকল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।—সাঃ সঃ।

আলোচনা-সমিতির নির্দ্দিষ্ট প্রথম প্রশ্ন-ধৃত সিদ্ধদেহের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করে না (৪)। সুতরাং তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা প্রথম প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে কিনা সুধী পাঠকবৃন্দ তাহা বিচার করিবেন।

"গদাধর মোর কুল" অবশ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অক্ষর; এই প্রাচীন প্রমাণটী ব্রাহ্মণত্বের পোষক বটে, কিন্তু শ্রীল ঠাকুরমহাশয় সে অর্থে ব্যবহার করেন নাই। পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্নও তাঁহার প্রথম পত্রে ঐ প্রমাণটী উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত পত্রে আদেশ ও উপদেশ ছিল—"অন্তর-মুখ-ভাবে লীলাস্মরণকারীর অভিমত লইবেন।" কাজেই শ্রীবৃন্দাবনীয় ভক্তগণের অভিমত জানাইবার জন্য সমিতি হইতে অনুরোধ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। তদুত্তরে ব্রজচৌরাশী-ক্রোশবাসী বৈষ্ণবমণ্ডলী আরিন গ্রামে মিলিত হইয়া অন্যান্য প্রশ্নের সহিত শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের উক্ত কবিতার উত্তর যাহা দিয়াছেন, তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল যথা—"গদাধর মোর কুল" এই বাক্যের দ্বারা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভাবের আনুগত্য অবলম্বন করা হইতেছে অর্থাৎ তিনি যে কুলের অভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রীশ্রীমন্ গৌর-সুন্দরেতে পরমাসক্ত, আমারও সেই কুলেরই (আহিরীকুল) অভিমান হৃদয়ে আছে"। (৫)

---

(৪) জ্যৈষ্ঠের সাধনায় ৯২।৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—সাঃ সঃ।

(৫) ব্রজভাবাবিষ্ট শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর যে আহিরীকুলের অভিমান আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? নবদ্বীপ-পরিকরদের আনুগত্যে সাধক যখন ব্রজভাবে আবিষ্ট হইবেন, তখন তাঁহার আহিরীকুলের অভিমানই জাগিবে ; কিন্তু নবদ্বীপ-লীলার স্মরণ-মননেও যে সাধককে আহিরীকুলের অভিমানই পোষণ করিতে হইবে, ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ তাহা বলেন নাই।

নবদ্বীপ-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে ডুব দিতে পারিলেই ব্রজলীলারূপ-ধারায় প্রবেশ-লাভ সম্ভব হয়। "কৃষ্ণলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এবং "গৌর-প্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীল ঠাকুরমহাশয় তাহাই বলেন [illegible]
নবদ্বীপ-লীলারূপ সরোবরে ডুব দেওয়ার সময়ে সাধকের কি অভিমান পোষণ করিতে হইবে ?—সাঃ সঃ।

বহু স্বাক্ষরযুক্ত শ্রীব্রজমণ্ডলের গোস্বামী বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দের লিখিত অভিমত, "মহাজন পথ" মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগত উক্ত অভিমত মধ্যে আরও লিখিত আছে—"শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণে সাধককে যে "ব্রাহ্মণকুমার হইতে হইবে ইহার কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ-কিশোর না হইলে যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবক হওয়া যায় না, ইহার কোনও প্রমাণ নাই।"(৬)

উক্ত লিখিত অভিমতে আরও লিখিত আছে যে "ইহাতে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা সমস্তই পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহাশয়ের অনুমোদিত; তবে তাঁহার নিয়ম তিনি কোনও বিষয়ে নাম স্বাক্ষর করেন না। তাঁহার অনুগত স্বাক্ষর করিয়াছেন। (৭)

---

(৬) "ব্রাহ্মণ-কুমার-দেহ" যে হইতেই পারিবে না, এ কথা ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ বলেন নাই; তাঁহাদের উক্তি হইতে বুঝা যায়, নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ ব্রাহ্মণকুমার-দেহও হইতে পারে, ব্রাহ্মণেতর জাতীয় দেহও হইতে পারে। আমরাও লিখিয়াছি—"যদি কোনও সাধক—ব্রাহ্মণেতর-জাতীয় সিদ্ধদেহে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে বাধা দেওয়ার কোনও হেতুও বোধ হয় থাকিতে পারে না। তাঁহার সিদ্ধদেহানুকূল-সেবা তিনিও পাইতে পারেন।" (সাধনা জ্যৈষ্ঠ ৯৪ পৃঃ)। তবে ব্রাহ্মণ-কুমার-দেহকেই আমরা প্রশস্ত বলিয়াছিলাম; ইহা আমাদের পূর্ব্ব-সংস্কারের ফলেও হয়তঃ হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মণ-কুমারদেহ-ভাবনার প্রথাও যে সদাচার-সম্মত, তাহাই বা অস্বীকার করা যায় কিরূপে? এই প্রথাও প্রচলিত দেখা যায়; আমরাও কেবল আমাদের কল্পনার বলেই ব্রাহ্মণদেহের কথা লিখি নাই। যাহা হউক,ব্রাহ্মণকুমারদেহের ভাবনা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে,ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের অভিমত হইতে তাহাও বুঝা যায়। কারণ, সিদ্ধদেহের জাতিসম্বন্ধে শাস্ত্রনীরব। সাঃ সঃ।

(৭) পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীল রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ আরিল গ্রামের সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা এবং তিনি আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন কিনা,অথবা উল্লিখিত পত্রখানা তাঁহাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছিল কিনা, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। উক্তপত্রে কে কে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্তও একটু ঔৎসুক্য রহিয়া গেল। সাঃ সঃ।

পূজ্যপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন ৫।১১।৩২বাং তারিখের পত্রে লিখেন "ব্রাহ্মণকুমার পার্ষদরূপে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণ স্মরণ করিতে হইবে, এরূপ কোন প্রকট প্রমাণ নাই ; তবে ভগবান্ যখন যে জাতিতে আবির্ভূত হয়েন, নিজেকে তজ্জাতি চিন্তা করাই প্রশস্ত।"

পরমারাধ্য প্রভুপাদের অভিমত কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সম্পাদক মহাশয় ধীরভাবে দেখিলে ক্রমে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে মাধুকরীর নিম্নলিখিত মন্তব্যের একবর্ণও নিরর্থক নহে। (৮)

গত অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘের মাধুকরীতে মহাজন-পথ প্রবন্ধে "প্রভুপাদের দ্বিতীয় পত্রে এইমত (ব্রাহ্মণকিশোর-কুমার এই সিদ্ধদেহ হওয়া চাই) পরিবর্ত্তিত হইয়াছে" লিখিত থাকায় (৯) সম্পাদক মহাশয় তাহার

---

(৮) প্রভুপাদের মত যে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, এবং মাধুকরীর মন্তব্যও যে একেবারেই ভিত্তিহীন, তাহা পরবর্ত্তী পাদটীকায় আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। সাঃ সঃ।

(৯) সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃই শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এস্থলে খুব বড় রকমের একটা ভুল করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণ-কিশোর-কুমার এই সিদ্ধদেহ হওয়া চাই"—প্রভুপাদের এই বাক্যের পাদটীকায় প্রভুপাদের দ্বিতীয় পত্রের উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের কথা মাধুকরীতে লিখিত হয় নাই। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠের সাধনায় এই প্রসঙ্গে আমরা প্রভুপাদের পত্র উদ্ধৃত করিতাম না। "শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা আস্বাদন করিতে হইলে তদনুকূল পার্ষদ-দেহ-ভাবনা সাধককে অবশ্যই করিতে হইবে"—প্রভুপাদের এই বাক্যেই তারকাচিহ্ন দিয়া মাধুকরীতে মন্তব্য লিখিত হইয়াছে যে, "প্রভুপাদের দ্বিতীয় পত্রে এই মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"—(মহাজন পথ প্রবন্ধ, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) মাধুকরীর উক্ত মন্তব্য হইতে বুঝা যায়, "শ্রীগৌর-লীলার আস্বাদনে পার্ষদ-দেহ-ভাবনার কোনও প্রয়োজনই নাই"—ইহাই যেন প্রভুপাদের পরিবর্ত্তিত মত। কিন্তু ইহা একেবারেই ভিত্তিহীন ; আলোচ্য প্রবন্ধও তাহার প্রমাণ।

প্রতিবাদ-স্বরূপে লিখিয়াছেন, প্রভুপাদ অল্প একটুকু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন (১০) এবং তৎপোষকে প্রভুপাদ তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বে আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ইহার জবাবে বলিতে হইতেছে—পরমারাধ্য প্রভুপাদ "অল্পই" পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহা লইয়া প্রশ্ন, শেষে তাহাই পরিহার করিয়াছেন। প্রভুপাদের পত্রাংশ—

যথা—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাঢ্য-লীলায় কেবল ব্রাহ্মণ-ভাবিতে হইবে এমন কথা নাও হইতে পারে। চিন্তা করিলে মনে হয়, ব্রাহ্মণাভিমানী কিম্বা অন্য জাত্যাভিমানী যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভাবা যায়,তাহাতে লীলা-স্বারস্যের, কিম্বা রাধাভাবাঢ্য শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ শ্রীগৌরের উপাসনার কোন ক্ষতি হয় না।" (১১)

---

(১০) ইহাও প্রকৃত কথা নহে। "প্রভুপাদ অল্প একটুকু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন"—এ কথা আমরা লিখি নাই; এ সম্বন্ধে আমরা কোও মন্তব্যই লিখি নাই (জ্যৈষ্ঠ সাধনা ১২৬।১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আমরা কেবল প্রভুপাদের পত্রখানা মুদ্রিত করিয়াছি। এ স্থলেও পত্রখানা উদ্ধৃত করিতেছি :— "আমার দ্বিতীয় পত্রে বিশেষ কিছু মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। পূর্ব্বমতই সমর্থিত হইয়াছিল। তবে মহাপ্রভুর পার্ষদ-দেহের চিন্তা ব্রাহ্মণ-ভিন্ন-জাতিরূপেও করা যায়—যদি সাধকের ইচ্ছা হয়। তাহাতে বাধা দেওয়ার কোনও প্রমাণ বা যুক্তি নাই; অতটুকু মাত্র অধিক কথা ছিল। সম্পূর্ণ মত পরিবর্ত্তনের কথা অমূলক।" ৮।৫।২৬ তারিখের পত্র।

(১১) শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত পত্রে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকায় উদ্ধৃত ৮।৫।২৬ তারিখের পত্রের মর্ম্মে কোনও পার্থক্যই নাই। ইহাতে প্রভুপাদের মতের "আমূল পরিবর্ত্তন" সূচিত হয় বলিয়া মনে হয় না। প্রভুপাদ যদি বলিতেন যে, "কিশোর-ব্রাহ্মণ-কুমার দেহের ভাবনা সঙ্গতই নহে," তাহা হইলে তাঁহার মতের আমূল পরিবর্ত্তন বুঝা যাইত। প্রবন্ধলেখক এই প্রবন্ধেই প্রভুপাদের ৫।১।৩২ তারিখের যে পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে দ্বিতীয় পত্রের বড় বিরোধ দেখা যায় না। দ্বিতীয় পত্রে প্রভুপাদ তাঁহার পূর্ব্বমত বজায় রাখিয়া অন্যমতের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন মাত্র—এইরূপই আমাদের মনে হয়। (পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

এই পরিবর্ত্তন অল্প হইল কি আমূল হইল, সুধী পাঠকবৃন্দ ও সম্পাদক মহাশয় বিচার করিবেন। আর এক কথা—সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর রজক-কন্যা নাপিত-কন্যা দাসীও ছিলেন; তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সেবায় (১২) অধিকার নাই; তাহা কেবল বোধ হয় স্বজাতীয়া দাসীর অধিকার। কারণ, বোধ হয় শ্রীরাধারাণী গোপ-কন্যা বলিয়া। শ্রীনবদ্বীপ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের মধ্যে সকল জাতীয় লোকই থাকিতে পারেন, কিন্তু সকল সেবায় বোধ হয় সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ; বোধ হয় তাই অন্তরঙ্গ-সেবায় ব্রাহ্মণদাসের বেশী অধিকার।"

সম্পাদক মহাশয়ের স্বকপোল-কল্পিত এই যুক্তির সারবত্তা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার যুক্তি অনুসারে রায় রামানন্দ (বিশাখা-সখী) দাস রঘুনাথ (শ্রীরতিমঞ্জরী) নরহরি সরকার ঠাকুর (শ্রীমধুমতী সখী) প্রভৃতি

যাহা হউক, প্রভুপাদের মতে ও আমাদের মূল প্রবন্ধের মতে কোন পার্থক্য নাই। ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের যে মত এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও প্রভুপাদের এবং আমাদের মতের অনুমোদনই করিতেছে—তবে ব্রাহ্মণ-কুমার-দেহকে আমরা প্রশস্ত বলিয়াছি, ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ-কুমার-দেহ ও ব্রাহ্মণেতর দেহের মধ্যে কোনও পার্থক্য স্থাপন করেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মনে হয়, নবদ্বীপ-লীলার অন্তরঙ্গ-সেবায় যখন ভাবের আনুগত্যেরই প্রাধান্য তখন জাত্যভিমানের প্রাধান্য লইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি করার কোনও প্রয়োজনই থাকেনা। অন্ন-রন্ধন-পরিবেশনাদি-সেবায় নবদ্বীপ-লীলায় ব্রাহ্মণেতর জাতির অধিকার নাই বটে, কিন্তু রন্ধন-পরিবেশনাদি ভাবাঢ্য-গৌরের অন্তরঙ্গ সেবা হইলেও মুখ্য-অন্তরঙ্গ-সেবা বলিয়া বিবেচিত না হইতেও পারে।

(১২) প্রবন্ধলেখক মহাশয় এখানেও বোধ হয় একটু অনবধানতা প্রকাশ করিয়াছেন। "রজকন্যাদির অন্তরঙ্গ-সেবায় অধিকার নাই"—এ কথা আমরা লিখি নাই; আমরা লিখিয়াছি:—"**সর্ব্ববিধ** অন্তরঙ্গ-সেবায় তাঁহাদের অধিকার দেখিতে পাওয়া যায় না।" তাঁহাদের সেবাও অন্তরঙ্গ-সেবাই, কিন্তু বোধ হয় মুখ্য-অন্তরঙ্গ-সেবা নহে।—সাঃ সঃ।

গৌরপার্ষদগণের অন্তরঙ্গ-সেবা হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।(১৩) তাদৃশ জল্পনা-কল্পনাও ঠিক নহে; অপিচ অপরাধজনক মনে হয়। বিশেষতঃ দাস-গোস্বামীর সম্বন্ধে পাইতেছি—

ষোড়শ বর্ষ করিল প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধানে গেলা বৃন্দাবন॥

এই মহাজন বাক্যের পরে আর বিচার চলিতে পারে কি?

পরিশেষে সানুনয়ে নিবেদন, ভজন বা উপাসনা-বিষয়ক মত প্রকাশ করিতে হইলে আজকাল এই স্বতন্ত্রতার যুগে প্রাচীন প্রমাণাদি সঙ্গে সঙ্গে দিয়া আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ নিরাকরণ করাই কর্ত্তব্য মনে হয়, অনুমান বা যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন কথার অবতারণা না করাই ভাল। সম্পাদক মহাশয় উক্ত প্রশ্নের আলোচনায় "ব্রাহ্মণ" কুমার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ কোনও প্রমাণ না পাইয়াও যুক্তির সাহায্যে চারিটী "বোধ হয়"

---

(১৩) পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকায় উল্লিখিত অনবধানতার ফলেই বোধ হয় প্রবন্ধলেখক মহাশয় এইরূপ মন্তব্য করিতেছেন। শ্রীল রায়রামানন্দাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন—এ কথা কেহই বলে নাই। রন্ধন-পরিবেশনাদি-সেবায় তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইলেও ভাবাঢ্য-গৌরের ভাবানুকূল অন্তরঙ্গ-সেবা (যাহাকেই মুখ্য অন্তরঙ্গ-সেবা বলা যায়, তাহা) তাঁহারা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল স্বরূপ-দামোদরাদি ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত গৌর-পার্ষদ-গণ ভাবানুকূল-সেবাও করিয়াছেন, রন্ধন-পরিবেশনাদি সেবাও করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদিগকেই অধিক-সংখ্যক-সেবায় নিয়োজিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত কারণেই আমরা লিখিয়াছিলাম—"শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ, বোধ হয় তাই অন্তরঙ্গ-সেবায় ব্রাহ্মণ-দাসেরই **বেশী** অধিকার।" (জ্যৈষ্ঠ-সাধনা, ৯৩ পৃঃ)। "বেশী অধিকার" না লিখিয়া যদি আমরা লিখিতাম যে, "অন্তরঙ্গ-সেবায় ব্রাহ্মণ-দাসেরই অধিকার" তাহা হইলেই প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের—"রায়রামানন্দাদির অন্তরঙ্গ-সেবা-বিচ্যুতির" মন্তব্য সমীচীন হইত।—সাঃ সঃ।

লাগাইয়া তবু নিজমত ব্রাহ্মণ-কুমার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। উপদেষ্টার সিদ্ধান্তে যদি অতগুলি "বোধ হয়" থাকে (১৪) তবে সেরূপ উপদেশ বাহির না করাই ভাল; তাহাকে কে সিদ্ধান্ত বলিবে। তাঁহার মূল প্রবন্ধে যদি একটাও "বোধ হয়" থাকিত, তাহা হইলে কখনই এই প্রশ্নের উদ্ভব হইত না। পরমারাধ্য গুরুবর্গের এরূপ সিদ্ধান্তের পরে সম্পাদক মহাশয় আর কি বলিতে চাহেন, আমরা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। (১৫)

শ্রীশ্যামাচরণ বসু।

সহঃ সম্পাদক, আলোচনা-সমিতি।

(মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশানুসারে)।

---

(১৪) আমরা যাহা লিখিয়াছি, পাছে কেহ তাহাকে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন, এই আশঙ্কাতেই "বোধ হয়" "মনে হয়" প্রভৃতি সন্দেহ-সূচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা আচার্য্য নহি, সুতরাং উপদেষ্টাও নহি; আমরা উপদেশ-প্রার্থী। কোনও বিষয়ে মীমাংসা বা উপদেশ-প্রার্থী হইতে হইলে, প্রার্থীর মনে কোন্ স্থানে কিরূপ সন্দেহ জন্মে, উপদেষ্টা-আচার্য্যের চরণে তাহা জ্ঞাপন করা সঙ্গত মনে করি; তাই সন্দেহ-সূচক-শব্দের সাহায্যে আমরা আমাদের মনের ভাবসমূহের অবতারণা করিয়াছি মাত্র।

শাস্ত্রে সকল বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না; তাই সকলকেই শাস্ত্র-সদাচারের অনুকূল যুক্তির আশ্রয় লইতে দেখা যায়। মধুর-ভাবের উপাসকদের ব্রজ-সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শনই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; সখ্য-বাৎসল্যাদি-ভাবের উপাসকদের ব্রজ-সিদ্ধদেহ শাস্ত্র ও সদাচারের অনুকূল যুক্তি দ্বারাই নির্ণীত হয়। শাস্ত্র ও সদাচারের অনুমোদিত যুক্তি কখনও উপেক্ষিত হয় না।

—সাঃ সঃ।

(১৫) পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকা-সমূহেই আমরা আমাদের অভিমত আচার্য্য-বর্গের চরণে নিবেদন করিয়াছি। তাঁহারা যাহা মীমাংসা করিবেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য।

আলোচ্য প্রশ্নটী ছিল এই:—"শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে স্মরণ-মননে ব্রাহ্মণ-কিশোর-কুমার এই সিদ্ধদেহ চিন্তনীয় কিনা?" ইহার উত্তর হইতে পারে

মহাভাব—দিব্যোন্মাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সুজল্প।

সরলতানিবন্ধন গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চপলতা এবং উৎকণ্ঠা—এই সমস্ত ভাবের সহিত যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহাকে সুজল্প বলে।

যত্রার্জ্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলম্।
সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে॥
—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৫৩।

*   *   *   *

"দ্বন্দ্বভাব পরিত্যাগ করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং আমার মথুরায় যাওয়া হইতে পারে না"—এ কথা বলিতে বলিতেই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অবস্থানের কালে, নিজেদের সহিত তাঁহার বিরহাদির কথা, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের কথা—প্রেমময়ী ভানু-নন্দিনীর মনে উদিত হইল; শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সমাগত দূতকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত সাক্ষাতে পাইয়াও তিনি যে এখনও শ্রীকৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তজ্জন্য অত্যন্ত অনুতপ্তা হইয়া ভানু-নন্দিনী

এইরূপঃ—ব্রাহ্মণ-কিশোর-কুমারদেহ চিন্তনীয় নহে; অথবা ব্রাহ্মণ-কিশোর-কুমারদেহ চিন্তনীয়। ব্রাহ্মণ-কিশোর-কুমারদেহ যে চিন্তনীয় নহে—ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ তাহা বলেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন—"শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণে সাধককে যে ব্রাহ্মণ-কুমার হইতে হইবে, ইহার কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ-কিশোর না হইলে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবক হওয়া যায় না, ইহার কোনও প্রমাণ নাই।" এই উত্তরের মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মণ-কিশোর-কুমারদেহ এবং ব্রাহ্মণেতর-দেহও চিন্তনীয় হইতে পারে। প্রভুপাদের বা আমাদের উক্তির সহিত ব্রজবাসী-বৈষ্ণবদের উত্তরের কোনও বিরোধই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের অনুরোধ, বহরমপুর আলোচনা-সমিতি আমাদের মূল প্রবন্ধটী একটু ধীরভাবে আর একবার পড়িয়া দেখিবেন।—সাঃ সঃ।

মনে মনে বলিলেন :—"হায়, হায়, আমি নিশ্চয়ই উন্মত্তা হইয়াছি, তাই পাগলিনীর মত এতক্ষণ যেন প্রলাপ বকিয়াছি; নচেৎ—যে প্রাণবল্লভ তাঁহার সংবাদ জানাইয়া আমাদের বিরহ-যন্ত্রণার লঘুত্বসম্পাদনের নিমিত্ত আমাদের নিকটে তাঁহার মর্ম্মজ্ঞ দূতকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার কোনও কুশল-সংবাদই আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত দূতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম না কেন?" ইহা ভাবিয়াই, যেন একটু লজ্জিত হইয়াই তাড়াতাড়ি তিনি ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।

"হে সৌম্য, হে ভ্রমর! আর্য্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এখনও মধুপুরীতে (মথুরায়) আছেন তো?—অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে।"

কথা কয়টী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাদের অন্তর্নিহিত ধ্বনি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নহে। "শ্রীকৃষ্ণ এখনও মথুরায় আছেন তো?"—ইহা ভানু-নন্দিনীর সোল্লুণ্ঠ-বচন নহে, পরন্তু উৎকণ্ঠাভরা সরলপ্রাণের মর্ম্মস্থলোত্থিত ব্যাকুল-উক্তি। "হে সৌম্যদর্শন ভ্রমর! তোমার মুখ দেখিলেই বুঝা যায়, তুমি আমাদের সহিত প্রতারণা করিবে না, সত্য কথাই বলিবে। সত্য বল ভ্রমর, শ্রীকৃষ্ণ এখনও মথুরায় আছেন তো? না—কি—তিনি যেমন ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, তেমনি আবার মথুরা ছাড়িয়া আরও কোন দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন? মথুরা ব্রজ হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নয়; অতি নিকটেই; মথুরায় যদি থাকেন, তবে সুযোগ পাইলেই ব্রজে আসিতে পারিবেন। আসিবার ইচ্ছাও তাঁহার যথেষ্ট আছে; আমরা তাঁকে জানি, তাঁর মনের ভাবও আমরা জানি; ব্রজস্থিত তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে দেখিবার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত; তবে সুযোগ হয় না বলিয়াই আসিতে পারিতেছেন না—যদি নিকটবর্ত্তিনী মথুরায় তিনি থাকেন, তবে সুযোগ পাইলেই তিনি আসিতে পারিবেন—আসিবেনও। আসিবার পক্ষে

বিশেষ অসুবিধাও কিছু নাই ; মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে বিশ্রামাবসরে রওয়ানা হইলেও ব্রজে আসিতে পারেন, আবার অপরাহ্নের মধ্যেই ফিরিয়াও যাইতে পারেন। অথবা সন্ধ্যার পরে বিশ্রামার্থ যখন শয়ন-মন্দিরে তিনি গমন করেন, তখন রওয়ানা হইয়া আসিলেও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু মথুরা ছাড়িয়া যদি আরও কোনও দূরদেশে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলবতী ইচ্ছা এবং সুযোগ থাকিলেও এত সহজে যাওয়া-আসা সম্ভব হইবে না।" এ সমস্ত ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই ভানু-নন্দিনী বলিলেন, বল, বল ভ্রমর! শ্রীকৃষ্ণ এখনও মথুরায় আছেন তো?"

"ওঃ! আত্মীয়-স্বজনের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি কত কষ্টই না জানি ভোগ করিতেছেন! নন্দ-বাবার মত পিতাকে ছাড়িয়া, মা-যশোদার মত মাতাকে ছাড়িয়া, সুবল-মধুমঙ্গলাদির মত সুহৃদ্‌বর্গকে ছাড়িয়া, তিনি মথুরায় কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইতেছেন? নিশ্চয়ই না। হায়! ব্রজরাজের সরলতার জন্যই তাঁকে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। ব্রজরাজ সরলতার সমুদ্র (আর্য্য); তাঁহার নিকটে যিনি যাহা বলেন, তাহাই তিনি সরল প্রাণে বিশ্বাস করেন; তাহার ভিতরে কোনও গূঢ় অভিসন্ধি থাকিলে সরলপ্রাণ ব্রজরাজ তাহা বুঝিতে পারেন না; তিনি নিজে যেমন সরল, সকলকেই তেমনি সরল মনে করেন; কপটতাময় বাক্য তিনি নিজে যেমন কখনও জানেন না, বলেন না—অপরকেও তদ্রূপ মনে করেন; তাই তিনি কাহারও কপটতাময় বাক্যের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারেন না। তিনি এত সরল না হইলে অক্রূরের কৌশল ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন। কৃষ্ণকে চিরকালের জন্য মথুরায় লইয়া যাইবার দুরভিসন্ধি লইয়াই অক্রূর এখানে আসিয়াছিল। ব্রজরাজের সরলতার সুযোগ পাইয়া অক্রূর তাহার ধূর্ত্ততার জাল বিস্তার করিয়া—যেন কতই প্রাণভরা স্নেহ দেখাইয়া ব্রজরাজকে বলিলেন—"ধনুর্ম্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরশ্রিয়ম্—ধনুর্যজ্ঞ এবং যদুপুরীর বিচিত্র শোভা দর্শন করাইবার নিমিত্তই রাম-কৃষ্ণকে আমি নিতে আসিয়াছি; আপনি অনুমতি করুন, আমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই।" সরলপ্রাণ ব্রজরাজ মনে করিলেন,—"রাম-কৃষ্ণের প্রতি অক্রূরের বড়ই স্নেহ; তাই তাহাদিগকে যদুপুরীর অপূর্ব্ব শোভা দেখাইবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া মথুরা হইতে ব্রজে

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" রাম-কৃষ্ণের প্রতি স্নেহের স্মরণেই বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি ব্রজরাজের প্রাণ গলিয়া গেল, তিনি ধূর্ত্ত-অক্রূরের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না—অক্রূরের কথায় সম্মতি দিলেন—ব্রজাকাশের সুখ-শশী চিরকালের জন্য রাহুগ্রস্ত হইল।"

"যেমনি নন্দবাবা, তেমনি মা-যশোদা! উভয়েই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি; অক্রূরের দুরভিসন্ধি মা-যশোদাও বুঝিতে পারেন নাই—পারিলে তিনি কখনও তাঁহার প্রাণের গোপালকে অক্রূরের সঙ্গে যাইতে দিতেন না—দিলেও নিজে সঙ্গে যাইতেন। তিনি গেলেন না—সঙ্গে গেলেন ব্রজরাজ। মা-যশোদা মনে করিয়াছিলেন, ব্রজরাজও মনে করিয়াছিলেন—মধুপুরীর শোভা দর্শন করাইয়াই তিনি রামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু তাঁর সরলতা মথুরায়ও তাঁহার কাল হইল।"

"কেবল অক্রূরই যে ব্রজে কপটতা করিয়া গেল, তাহা নয়; ব্রজের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত মথুরাতেও আবার দুইজন কুহক-জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাঁহারা—বসুদেব ও দেবকী। সরলমনা ব্রজরাজ নিজের স্থানেই বসিয়াছিলেন, অক্রূরের সঙ্গে রাম-কৃষ্ণ নগরের শোভা দর্শন করিতে গেলেন; সেখানে তো কত রোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তারপর রাম-কৃষ্ণকে লইয়া যাওয়া হইল দেবকী-বসুদেবের নিকটে; সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা রাম-কৃষ্ণকে ফাঁদে ফেলিলেন—তাঁহাদিগকে নিজেদের পুত্র বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, কপট বাৎসল্যের বন্যা বহাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও নিতান্ত সরল; আর না হইবেনই বা কেন? সরলতার প্রতিমূর্ত্তি মা-যশোদা এবং নন্দবাবারই তো ছেলে (আর্য্য-পুত্র) তিনি? তাই দেবকী-বসুদেবের কপট-বাৎসল্যে গলিয়া গেলেন—নন্দবাবার নিকটে আসিয়া দেবকী-বসুদেবের ব্যবহারের কথা জানাইলেন, অল্প কিছুকাল পরে ব্রজে ফিরিয়া যাইবেন আশ্বাস দিয়া নন্দবাবাকে ব্রজে পাঠাইয়া দিলেন। সরলপ্রাণ নন্দবাবাও বন্ধু বসুদেবের প্রীতি-বিধানের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে মথুরায় রাখিয়া পুত্র-বিচ্ছেদ-ভারাক্রান্ত চিত্তে ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন।"

"কে জানিত—এমন-পুত্রবৎসল ব্রজরাজ তাঁহার প্রাণকোটিপ্রিয় পুত্রকে মথুরায় ফেলিয়া একাকী ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন? ব্রজরাজের সরলতাই তাঁহার কাল হইল, ব্রজের কাল হইল।"

"মা-যশোদা যদি সঙ্গে যাইতেন, তাহা হইলে তিনি কিছুতেই কৃষ্ণকে রাখিয়া আসিতেন না—কৃষ্ণও দেবকীর কপট-বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। দেবকীকৃত বাৎসল্যের অভিনয়ের কথা শুনিলে তিনি তৎ-ক্ষণাৎই তাঁহার প্রাণের গোপালকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া দৃঢ়হস্তে স্বীয় বক্ষঃস্থলে জড়াইয়া ধরিতেন, কিছুতেই ছাড়িয়া দিতেন না—বাৎসল্যের প্রবল আকর্ষণে তাঁহাকে টানিয়া ব্রজে লইয়া আসিতেন, আর শুদ্ধ-বাৎসল্যের উৎস-স্বরূপ মা-যশোদার স্নেহমণ্ডিত মুখখানা দেখিলে কৃষ্ণও থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু ব্রজের দুর্ভাগ্য—অসাধারণ সরলতাবশতঃ কৃষ্ণের সঙ্গে মথুরাগমনের কল্পনাও মা-যশোদার মনে স্থান পায় নাই।"

"বন্ধুবৎসল সরলপ্রাণ ব্রজরাজ বসুদেবের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার প্রাণের গোপালকে মথুরায় রাখিয়া ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন—আসিলেন কেবল দেহ খানা লইয়া, প্রাণ রাখিয়া আসিলেন তাঁহার প্রাণের গোপালের সঙ্গে। ব্রজে আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, দেখিয়া শুনিয়া সব বুঝিতে পারিয়া ব্রজ-রাজ্ঞীও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আজ তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া—ব্রজরাজ-পুরের অবস্থা দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যায়—গৃহ, প্রাঙ্গণ সমস্তই আবর্জ্জনাপূরিত; কোষাগার, রন্ধনাগার, শয়নাগার, সমস্তই তৃণ-ধূলি-পত্রাবৃত, লূতাতন্তুজালে বিজড়িত—কে সংস্কার করে? সংস্কারের কথাই বা কে ভাবে? মা-ব্রজেশ্বরীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত। * * * সমস্তই ব্রজরাজের সরলতা-নিবন্ধন অপরিণামদর্শিতার ফল। গাভীকুলের নয়ন-বারির বিরাম নাই; তাহারা তৃণভক্ষণ ছাড়িয়া দিয়াছে; বৎসতরীকে আর দুগ্ধ দেয় না। বনরাজীর দৃশ্য দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—প্রাণ হুহু করিয়া উঠে; বৃক্ষে আর ফল নাই, লতায় আর ফুল নাই; ময়ূরের সে নৃত্য নাই, কোকিলের সেই কুহুরব নাই; বাঁশীও আর বাজেনা, যমুনাও আর উজান বহেনা। রাখালদের মুখে আর সেই হাসি নাই, সেই উদ্দাম উল্লাস নাই। সকলেই যেন প্রাণহীন।"

"এই তো গেল ব্রজের অবস্থার কথা। মথুরায় কৃষ্ণই কি আর সুখে আছেন? তাঁহার দেহ মথুরায় আছে বটে, তাঁহার প্রাণ তো ব্রজেই পড়িয়া রহিয়াছে। দেবকীবসুদেব তাঁহার প্রতি বাৎসল্য দেখান বটে, কিন্তু তাহাতে কি শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যবুভুক্ষু হৃদয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়? ব্রজরাজ-

ব্রজরাজ্ঞীর মন-প্রাণ-ঢালা বাৎসল্যসুধা-পানে যিনি আশৈশব অভ্যস্ত, দেবকী-বসুদেবের কপটবাৎসল্যের অভিনয়ে তাঁহার প্রাণের পিপাসা কখনও মিটিতে পারে না; তাঁহাদের বাৎসল্যের অভিনয় বরং ব্রজ-রাজ-ব্রজরাজ্ঞীর কথাই শ্রীকৃষ্ণের মনে জাগাইয়া দেয়—তখন তাঁহাদের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার বৃশ্চিক-দংশনবৎ তীব্রজ্বালায় তাঁহার কোমল প্রাণ কতরূপেই না জানি জর্জ্জরিত হইতে থাকে! তাঁহার বিরহ-ক্লিষ্ট ব্রজরাজ-ব্রজরাজ্ঞীর শীর্ণ মলিন হাহুতাশপূর্ণ মুখমণ্ডলের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার অভাবে ব্রজরাজ-পুরের শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তিনি না জানি কত যাতনাই ভোগ করিতেছেন!"

নিমিষ-মধ্যে এ সমস্ত কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া যেন ভ্রমরের উত্তরে নিজের মনোগতভাবের নিঃসন্দিগ্ধ-যাথার্থ্য প্রতিপাদনের নিমিত্তই ভানুনন্দিনী বলিলেন—"স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য—হে সৌম্য ভ্রমর! শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁহার পিতা-মাতার কথা, তাঁহার পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করেন?" ভ্রমরের কোনও উত্তর না পাইয়া যেন "মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্" ন্যায়ানুসারেই নিজের মনোগত-ভাবের যাথার্থ্য সম্বন্ধে ভানুনন্দিনীর মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল।

"মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক সখাও বোধহয় কেহ কেহ জুটিয়াছে; কিন্তু তাহারা কি সখাবৎসল শ্রীকৃষ্ণের সখ্যরস-পিপাসা মিটাইতে পারে? সুবল-মধুমঙ্গলাদির অনাবিল সৌহার্দ্দে যাঁহার মন-প্রাণ পরিষিক্ত হইত, নব-পরিচিত তথাকথিত মাথুর-সখাদের সৌহার্দ্দের অভিনয়ে কি তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটিতে পারে? তাহা বরং তাঁহার ব্রজের সখাদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্রজের সুবলাদি তাঁহার অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ—শৈশব হইতেই এক সঙ্গে বৎস-চারণ,—এক সঙ্গে গোচারণ; কত রকমেই না তাহারা তাঁহাকে সুখী করিত? বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সুগন্ধি ফুল তুলিয়া কত যত্নেই না তাহারা তাঁহাদের প্রাণকানাইকে সাজাইত? শিখিপুচ্ছ গুঞ্জামালায় কতই না নটবর-সাজে তাঁহাকে সাজাইত? কত আদর করিয়া বনের সুমিষ্ট ফল আনিয়া কানাইয়ের মুখে দিত? নিজে খাইতে খাইতে যে ফলটী সুমিষ্ট মনে হইত, তাহা কত আগ্রহেই না কানাইয়ের মুখে তুলিয়া দিত? কত খেলাই না খেলিত? কতই না তাঁকে কাঁধে করিয়াছে, আর কতই না প্রীতিভরে তাঁহার কাঁধে চড়িয়াছে? আজ

সৌহার্দ্দ-বুভুক্ষু কৃষ্ণের চিত্তে এ সকল কথা উদিত হইয়া তাহাকে কতই না যাতনা দিতেছে? উঃ—"

এক নিমিষে এ সকল কথা ভাবিয়া ভানুনন্দিনী বলিলেন—

"স্মরতি স সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্"

"হে সৌম্য ভ্রমর! বল তো শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজবাসী গোপবন্ধুদের কথা স্মরণ করেন কি?" মৌনং সম্মতি-লক্ষণং ন্যায় এ স্থলেও বোধহয় ভানু-নন্দিনী ভ্রমরকে নিরুত্তর দেখিয়া নিজের মনোগতভাবের যাথার্থ্যই উপলব্ধি করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার কথা স্মরণ করেন কিনা, গোপবন্ধুদের কথা স্মরণ করেন কিনা,—ভানুনন্দিনী তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু নিজেদের কথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপসুন্দরীদের কথা শ্রীকৃষ্ণ কখনও স্মরণ করেন কিনা, ইহা ভ্রমরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই সংবাদটী জানিবার ইচ্ছা কি ভানু-নন্দিনীর চিত্তে উদিত হয় নাই? নিশ্চয়ই হইয়াছিল। যাঁহার জন্য তাঁহারা দেহ-গেহ-স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমের প্রতিদান দিতে অসমর্থ হইয়া যিনি তাঁহাদিগের নিকটে অপরিশোধনীয় ঋণে চিরকালের জন্য আবদ্ধ রহিলেন বলিয়া স্বমুখে প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া তিনি তাঁহাদের কথা স্মরণ করেন কিনা—একথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা সর্ব্বপ্রথমেই ভানুনন্দিনীর মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই ইচ্ছা মনে উদিত হইলেও,—তাঁহাদের প্রাণকোটিপ্রিয় দয়িত বিদেশে গিয়া তাঁহাদের কথা স্মরণ করেন কিনা—দয়িতের সখা ভ্রমরের নিকটেও একথা জিজ্ঞাসা করিতে অপরিসীম-গাম্ভীর্য্যশীলা শ্রীরাধিকার মনে বোধহয় একটা লজ্জামিশ্রিত সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। পাছে, এই বলবতী ইচ্ছার ছায়া তাঁহার মুখেনেত্রে প্রকটিত হইয়া ভ্রমরের নিকটে তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়া বিড়ম্বিত করে, তাই তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া অন্তরের গূঢ় বাসনাটীকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আছেন কিনা, তিনি পিতামাতার কথা স্মরণ করেন কিনা, পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করেন কিনা—ইত্যাদি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু যে কথাটী তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের প্রতি বাতায়নে উকিঝুকি দিতেছে, সেই কথাটীকে ব্যক্ত করিলেন না; তাহার জিহ্বার অগ্রভাগে পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়াও বোধহয়

গাম্ভীর্য্যের সুদৃঢ় আবরণে প্রতিহত হইয়াই ঐ কথাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কিন্তু নদীর স্রোত যতই বাধা প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; অবশেষে সঞ্চিত শক্তির প্রাচুর্য্যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন ধ্বংস করিয়া কল কল নাদে উচ্ছলিত বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। ভানু-নন্দিনীর অন্তর্নিহিত ইচ্ছাটীরও সেই অবস্থাই হইল; গাম্ভীর্য্যের কঠোর হস্তে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে গাম্ভীর্য্যকে পরাভূত করিয়া উচ্ছ্বসিত বেগে চপলতার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কিন্তু চপলতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণবিরহ-জনিত দৈন্যকে ভানু-নন্দিনী ত্যাগ করিতে পারিলেন না—যেই কৃষ্ণধনে তিনি ধনিনী ছিলেন, এখন তাঁহাকে হারাইয়া তিনি যেন দীনতার চরম-সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাই দৈন্যমিশ্রিত চপলতার সহিত তিনি ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে ?

ভ্রমর! শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাঁহার কিঙ্করী-আমাদের কথা কিছু কি বলেন ?"

গাঢ় প্রীতির একটা স্বভাব এই যে, প্রিয়ব্যক্তিকে অন্যের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রাণে কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যায় না। ছোট শিশুকে পিসী, মাসী, এমন কি পিতার নিকটে রাখিয়াও মাতার প্রাণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; মাতা মনে করেন, তাঁহার বাছাকে তিনি যত আদর যত্ন করেন, তেমনটী আর কেহই করিতে পারেনা—পারিলেও তাহাতে তাঁহার বাছার মনে তৃপ্তি জন্মেনা; তাহার মন সর্ব্বদা মাতার জন্যই ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ব্রজ-সুন্দরীদিগের গাঢ় প্রীতির স্বভাবও তদ্রূপই; প্রকৃত প্রস্তাবে তদপেক্ষাও অনেক বেশী। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের অন্য প্রেয়সীরা তাঁহার মরম বুঝিয়া সেবা করিতে পারে না, * তাঁহাদের সেবায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে তৃপ্তি জন্মে না।

তাই, ভানু-নন্দিনী—"শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কথা স্মরণ করেন কিনা"—একথা ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করিয়াই ভাবিতে লাগিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের

* সত্য কথাও তাহাই; প্রীতির আধিক্যেই প্রিয়ব্যক্তির মর্ম্মবোধ-শক্তির আধিক্য; ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম অসমোর্দ্ধ, সুতরাং তাঁহাদের মর্ম্মবোধ-শক্তিও অসমোর্দ্ধা। লেখক।

কথা স্মরণ করেন, আমাদের কথা বলেন। অন্য সময়ে তত বেশী স্মরণ না করিলেও তাঁহার মাথুর-প্রেয়সীদিগের সেবা-গ্রহণ-সময়ে নিশ্চয়ই স্মরণ করেন। একের সেবা-গ্রহণে অতৃপ্তি বোধ হইলে অপরের সেবায় তৃপ্তির কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। তাঁহার মাথুর-প্রেয়সীগণ কি তাঁহার মরম বুঝিয়া সেবা করিতে পারে? কিরূপেই বা পারিবে? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তো তাঁহাদের নূতন পরিচয় মাত্র; কিসে কৃষ্ণ তৃপ্ত হয়েন, কিসে তিনি তৃপ্ত হয়েন না, তাতো তাঁহারা এখনও জানেন না। শিশুকাল হইতেই আমরা কৃষ্ণের সব বিষয় জানি; কিসে তাঁহার সুখ হয়, কিসে তাঁহার দুঃখ হয়, তাহাও আমরা জানি; কিরূপ বনমালা তিনি পছন্দ করেন, কিরূপ তাম্বূল-বীটিকায় তাঁর তৃপ্তি হয়, কিরূপ নৃত্যগীতে, কিরূপ বীণাবাদনে, কিরূপ ক্রীড়া-কৌতুকে তিনি আনন্দ পায়েন, তাহা আমরা জানি; সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-বৈদগ্ধ্যাদিতে, প্রশ্নোত্তর-বিলাসে, নর্ম্ম-পরিহাসে, মান-প্রণয়াদিতে কিরূপে তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিতে হয়, আমরা জানি —শিশুকাল হইতে একত্রাবস্থানের ফলে তাঁহার রুচিতে এবং আমাদের রুচিতে একটা সামঞ্জস্য জন্মিয়া গিয়াছে; তাই আমরা তাঁহাকে সুখী করিবার উপায়-সমূহ অবগত আছি। কিন্তু মাথুর-নাগরীদিগের সেই সুযোগ তো কখনও হয় নাই? এক্ষণে আকস্মিক মিলনে তাঁহাদের রুচির সহিত শ্রীকৃষ্ণের রুচির সামঞ্জস্য-বিধানও সম্ভবপর নহে। তাই, তাঁহাদের সেবায়—তাঁহাদের নৃত্য-গীতে, তাঁহাদের বীণাবাদনে, তাঁহাদের পরিহাস-কৌতুকে—কোনও কিছুতেই যে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি-বোধ হইতেছে না, ইহা ধ্রুব সত্য; তাঁহাদের সেবায় প্রীতি-বুভূক্ষু শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রফুল্লতার পরিবর্ত্তে, ব্রজসুন্দরীদিগের সেবার তৃপ্তিদায়কতার-স্মরণে যে বিষাদের ছায়াই পতিত হইতেছে, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। কোনও মাথুর-সুন্দরী তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদের সেবার উৎপীড়নে এবং ব্রজসুন্দরীদিগের সেবার প্রাণমাতান স্মৃতিতে অধীর হইয়া তিনি হয়তো কখনও বলিয়া ফেলেন যে "কি বনমালা-রচনায়, কি বীটিকা-নির্ম্মাণে, কি নৃত্যগীত-কৌশলে, কি নর্ম্ম-পরিহাসে, কি মানপ্রণয়াদিতে—কোনও বিষয়েই, ব্রজগোপীদিগের ন্যায় তোমরা আমাকে সুখী করিতে পার না; তাঁহাদের তিরস্কারেও আমি আনন্দ পাই, কিন্তু সুন্দরি, তোমাদের নর্ম্ম-পরিহাসেও আমার চিত্তে প্রফুল্লতা আনয়ন করিতে

পারেনা, বরং ব্রজসুন্দরীদিগের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় নর্ম্ম-পরিহাসের কথা মনে জাগাইয়া আমাকে যেন বিষাদের অতল-সমুদ্রেই ডুবাইয়া দেয়।"

"ভ্রমর! সর্ব্বত্রই তোমার গতিবিধি আছে,ভ্রমর বলিয়া তোমার উপস্থিতিতে কেহ কোনও কথা বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। সত্য বল তো, ভ্রমর! শ্রীকৃষ্ণ কখনও কি তাঁহার কিঙ্করী-আমাদের সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন?"

এস্থলেও বোধহয় "মৌনং সম্মতি-লক্ষণং" ন্যায়েই ভানু-নন্দিনী নিজের মনকে বুঝাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও মনে করিলেন—"মাথুর-নাগরীদের সেবায় বীতস্পৃহ হইয়া এবং ব্রজ-নাগরীদের সেবার স্মৃতিতে প্রলুব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই ব্রজে আসিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠার অনুমানে, তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত ভানু-নন্দিনীর নিজের মনেই উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল; এই উৎকণ্ঠার বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গাম্ভীর্য্য-সমুদ্র-ভানু-নন্দিনী যেন মূর্ত্তিমতী চপলতার ন্যায় বলিয়া ফেলিলেন—

"ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু—

হায়, হায়! কখন আমার প্রাণবল্লভ ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন? আসিয়া কখন তিনি তাঁহার অগুরু-সুগন্ধি করতল আমাদের মস্তকে স্থাপন করিবেন? স্থাপন করিয়া বলিবেন—আমার প্রাণপ্রিয়-প্রেয়সীগণ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদিগকে ছাড়িয়া আমি আর কখনও কোথায়ও যাইব না; তোমাদের নিকটেই আমি চিরকাল থাকিব।"

"বল ভ্রমর! এমনটী আবার কখন হইবে? কখন আবার আমার প্রাণ-বল্লভকে ব্রজে ফিরিয়া পাইব? বল বল ভ্রমর! আবার আমি

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ-পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণ-প্রিয়া
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥
সে প্রাণ-নাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনা-পুলিনে।

ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া
সাজাইব নানা উপহারে ॥"

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা-বিচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১২। চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বহু পরে লিখিত হইলেও উহার একটা প্রামাণিকতা আছে। বিশেষ কথা এই যে, এই গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সন্নিকটে অবস্থান করিয়া লিখিয়াছিলেন। এই রঘুনাথ চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, সেবক ও সহচর। আর ইনি স্বরূপ-দামোদরের অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য। এই স্বরূপ-দামোদর আবার চৈতন্যদেবের এত মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন যে তাঁহাকে প্রভুর অভিন্ন-হৃদয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই স্বরূপ দামোদরের কড়চা এবং স্বয়ং রঘুনাথ—এই চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনার সত্যতার দৃঢ় প্রমাণ-স্বরূপে আমরা রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে নিঃসংশয়ে দাঁড় করিতে পারি। এই রঘুনাথ দাসের সমক্ষে প্রভুর যে সমুদয় লীলা সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের কোনরূপ ভ্রম থাকা সম্ভবপর নহে। আবার রঘুনাথ দাসের সমক্ষে তাঁহার (রঘুনাথের) সম্বন্ধে চরিতামৃতকার স্বীয় গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে ভ্রম একেবারেই সম্ভবপর নহে, ইহা একান্ত স্বীকার্য্য। এস্থলে আমরা একটি ক্ষুদ্র বিচার উপস্থাপিত করিব। চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত আছে, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে আসিলে বালক রঘুনাথ তাঁহার চরণে সমাগত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করেন, যথা— "সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুরে আইলা। তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ) তৎকালে রঘুনাথের প্রতি প্রভুর উপদেশ-বাক্য "স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল" প্রভৃতি চির প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া রহিয়াছে। ইহার ৩।৪ বৎসর পরে প্রভু বৃন্দাবন-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগত হইলে রঘুনাথ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া পুরীতে আইসেন এবং প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া নীলাচলে অবস্থিতি করেন। যথা— "স্বরূপাদি

সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া। হেন কালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ) কিন্তু গোবিন্দদাসের কড়চার বর্ণনায় রঘুনাথের সহিত প্রভুর প্রথম দেখা শুনা প্রভৃতি সবই বিভিন্ন রূপ। কড়চা লিখিতেছে, প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাইবার পথে সুবর্ণরেখা-নদীতীরে রঘুনাথকে প্রথম দেখিতে পান, যথা—"পরদিন সুবর্ণরেখার ধারে গিয়া। পুলকিত রঘুনাথ দাসেরে দেখিয়া॥" (কড়চা পৃঃ ৪২) অথচ এই সময় রঘুনাথ স্বগৃহে। কড়চার ৪৫ পৃষ্ঠায় আবার দেখিতে পাই, চৈতন্যদেবের নীলাচলে যাওয়ার অব্যবহিত পরে রঘুনাথ তাঁহার সঙ্গিরূপে নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, যথা— "রঘুনাথ দাস আর আচার্য্য শেখর। দামোদর নরহরি আর গদাধর॥ আমার প্রভুরে সবে লয়ে যান ঘিরে।" কড়চার ২১৯ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগত হইয়া আলালনাথ আসিলে রঘুনাথ পুরী হইতে ভক্তগণ সহ তাঁহাকে লইতে আলালনাথে আসিয়াছেন, যথা—"রঘুনাথ দাস নাচে আর দামোদর" ইত্যাদি। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা অনুসারে কড়চায় রঘুনাথের নাম যে কয়টি স্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, উহা সকলই মিথ্যা। স্বয়ং রঘুনাথের সমক্ষে লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতে রঘুনাথের জীবন-কাহিনী-বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের কোন ভ্রম হওয়া সম্ভবপর নহে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইরূপে কড়চা-বহিখানি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইহার বহু অভ্যন্তরীণ ঘটনা প্রামাণিক গ্রন্থের বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি-শূন্য।

১৩। কড়চাসম্বন্ধে একটি সহজ কথা এই যে, যথার্থতঃ ইহা চৈতন্যদেবের অনুসঙ্গী ভৃত্য কর্ত্তৃক লিখিত হইলে ইহা চৈতন্যদেবের বাস্তব জীবনীর সহিত এত সংস্রবশূন্য হইতে পারে না। আর যথার্থতঃ ইহাতে সত্য-লেশ বর্ত্তমান থাকিলে ইহাতে বর্ণিত প্রধান প্রধান ঘটনা পরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে অন্ততঃ সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ না হইয়া পারে না। আর চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের প্রধান প্রধান ঘটনা কড়চায় অবর্ণিত থাকিতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তাহা কিছুই হয় নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যায় যেমন কড়চা-বর্ণিত প্রধান প্রধান ঘটনা যথা—ত্রিবাঙ্কুরের রাজার সহিত প্রভুর মিলন, তীর্থরাম, সত্যবালা, বারমুখী, পন্থভীল, দস্যু নৌরজী প্রভৃতির

উদ্ধার এবং পুনা, নাসিক, বরোদা, সোমনাথ, দ্বারকা (১) গুজরাট প্রভৃতি স্থান ভ্রমণের আভাস পর্য্যন্ত চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় না। কড়চার এ সমুদয় বর্ণনা যথার্থ হইলে রঘুনাথ দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই সমুদয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিছুতেই থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ যখন চৈতন্য-চরিতামৃতেই দেখিতে পাই যে, প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রথম রজনী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে জাগরণ করিয়া সার্ব্বভৌমাদি প্রধান প্রধান ভক্তগণের সমক্ষে তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন, যথা—সার্ব্ব-ভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ। তীর্থ যাত্রা কথা কহি কৈলা জাগরণ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১০ম) আর যদি যথার্থই কড়চাখানি প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-কাহিনীই হয়, তাহা হইলে চরিতামৃতে বর্ণিত প্রধান প্রধান ঘটনা যেমন বেঙ্কট ভট্টের গৃহে প্রভুর চাতুর্ম্মাস্য ব্রত প্রতিপালন প্রভৃতি গোবিন্দদাসের কড়চায় কিছুতেই বাদ যাইতে পারে না। গোবিন্দ যদি প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণের খুঁটিনাটী পর্য্যন্ত লিপি-বদ্ধ করিতে পারেন, কাশী মিশ্রের গৃহে ৮ খানি কদলাভাজী ও নারায়ণগড়ে ৫ গণ্ডা লাড্ডু খাওয়ার সঠিক হিসাব লিখিয়া রাখিতে পারেন এবং নীলাচলে প্রত্যাগমনের পথে আমঝোড়ানগরে প্রভু কর্ত্তৃক ২০ খানা রুটি পাকানের হিসাব লিখিতে পারেন, তাহা হইলে তীর্থযাত্রায় দুই বৎসরে প্রভুর ৮ মাস চাতুর্ম্মাস্য যাপনের কোন ইঙ্গিত পর্য্যন্ত তাহার কড়চায় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহার হেতু কি? এমতাবস্থায় কেহ গোবিন্দের কড়চার ঐতিহাসিকতা কিম্বা প্রামাণিকতা রক্ষা করিতে পারেন কি?

ক্রমশঃ—

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ।

---

(১) প্রভু যে দ্বারকায় যায়েন নাই, তাহাই বরং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে জানা যায়; পাণ্ডুপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়; শ্রীরঙ্গপুরী সেইস্থান হইতে দ্বারকায় গেলেন, কিন্তু প্রভু কৃষ্ণ-বেণ্বাতে গেলেন।

এই মত দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠি করি।
দ্বারকা দেখিতে গেলা শ্রীরঙ্গপুরী॥
দিনচারি প্রভুকে তাঁহা রাখিল ব্রাহ্মণ।

ভীমরথী-স্নান করে বিট্‌ঠল দর্শন ॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণ-বেণ্বাতীরে।
চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম পঃ—দাঃ সঃ।

কতিপয় প্রশ্ন ও নিবেদন।

১। যাঁহারা গৌর-অনুরাগের দোহাই দিয়া শ্রীএকাদশী-ব্রতটি পর্য্যন্ত প্রতিপালন করেন না এবং তদ্দিনে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-বিগ্রহের সমক্ষে অন্নাদি ভোগ নিবেদন করিয়া মহানন্দে প্রসাদ ভক্ষণ করেন, তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইবেন কিনা ?

২। যাঁহারা, 'আমরা প্রেমিক,' "আমরা গৌর-অনুরাগী" ইত্যাকার দম্ভে বৈষ্ণবাচার গুলিকে দলিত করেন, এবং ঐ সমুদয় যাহারা প্রতিপালন করে, তাহাদিগকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব কিনা ?

৩। যাহারা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট দীক্ষাদি গ্রহণ অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে, মনঃ-কল্পিত ভাবে, অথবা স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রাদি অবলম্বনে, অথবা শুধু কীর্ত্তনাদি দ্বারা মহাপ্রভুর ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ী সদ্‌গুরুর নিকটে শাস্ত্রসঙ্গত দীক্ষাদি এবং সদ্‌গুরু প্রণালিকা গ্রহণের প্রয়োজন আছে কিনা এবং তাহা না করা পর্য্যন্ত তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইবেন কিনা ?

৪। দীর্ঘকেশ ও দাঁড়ি, গোঁফ রক্ষাকরা বৈষ্ণবাচার-সম্মত কিনা ?

৫। ত্রিপুরা জিলার ত্রিশগ্রামের অধিবাসী স্বধামগত সাধু বসন্ত দে মহাশয় কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন কিনা ? যদি তাহা না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

৬। নাগরীভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন গোস্বামি-শাস্ত্র সম্মত কিনা ? এরূপ ভজনীয়াদিগের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত চরিত্র-বিত্তটি রূপান্তরিত ও বিকৃত হইয়া পড়িতেছে কিনা এবং তদ্দ্বারা জগতের বিশিষ্ট অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে কিনা ?

শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী আমার একান্ত পূজ্য শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম

মহোদয় এবং কলিকাতা ২৫নং বাগবাজারবাসী শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় আমার উপরিউক্ত প্রশ্ন কয়টির সম্যক্ উত্তর প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ।
স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা।

সাধনার প্রবন্ধ-সম্বন্ধে।

সাধনায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে কোনও সিদ্ধান্ত-বিরোধ থাকিলে, কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা জানাইলে আমরা ধন্যবাদের সহিত তাহা সংশোধন করিব। পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ এবং পণ্ডিত শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকটে এ সম্বন্ধে প্রথম হইতেই আমাদের স্থায়ী অনুরোধ আছে।

সম্প্রতি আমরা প্রভুপাদের সঙ্গীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন গোস্বামী ভাগবতভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক, সাধনার সিদ্ধান্তাদি-সম্বন্ধে প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেন—অবশ্য আমরাও প্রতিমাসে প্রভুপাদের চরণে এই প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছি। ১।১০।২৬ ইং তারিখের পত্রে ভাগবতভূষণ মহাশয় জানাইয়াছেন :—

"প্রত্যেক মাসের সাধনা-পত্রিকা আসিবামাত্রেই প্রভুপাদ স্বয়ং পাঠ করেন। যদি বাস্তবিক সিদ্ধান্তবিরোধী কোনও কথা থাকে, তিনি স্বয়ংই তাহার ব্যবস্থা। করিবেন।"

(মাসিক-পত্রিকা।)

—:০:—

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা॥

১ম বর্ষ, | পৌষ—১৩৩৩ | ৯ম সংখ্যা।

গোরা। *

কে গো এসেছিল আমাদেরি ঘরে সার্দ্ধ চারিশ বছর আগে,
কোন্ নব কথা শোনাতে জগতে, যে কথা শুনিলে চমক্ লাগে!
যে কথা জগতে তার আগে কারো স্বপনে কখনো ওঠেনি মনে!
অনর্পিত সে উজ্জ্বল রস কেগো নিয়ে এল ঘরের কোণে?
বেদ-বেদান্ত "বাক্য-মানস-অগোচর" ব'লে যাহারে গায়,
মহিমার গীতি যার গাহি শ্রুতি 'নেতি' বলে শেষে মিলায়ে যায়!
ভয়েরো ভীষণ, পাবন-পাবন প্রাণের প্রাণ যে মহিমাময়!
নব ভাবে ভোরা বাহু তুলে গোরা বলে "ওগো সেতো শুধু এ নয়!"
বাক্য-গোচর না হলেও সে যে ভাবের গোচর, রসের গ্রাহী!
মানস-মাঝেই আসন তাহার, 'মতি' হ'তে তার প্রিয় যে নাহি।

---

* কলিকাতা ১।১ এ চালতা বাগান সেকেণ্ড লেন স্থিত "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর" সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, মুন্সেফ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রেরিত।

সে যে সুন্দর, সে যে প্রেমময়, ভালবাসা-লোভী প্রেমিক মম
'প্রাণ' নয় শুধু, প্রাণাধিক সে যে, আত্মা হ'তেও সে প্রিয়তম !
সে তোর পুত্র, সে তোর বিত্ত, সে সখা, সুহৃদ, প্রাণের প্রিয়
অন্তর তোর যারে ভালবাসে সেই ভাবে তুমি তাহারে নিও।
সে তো 'আমি' নই, সে যে সে-ই শুধু, ভালবাসা তার আকিঞ্চন !
আমি শুধু তারে ভালবাসি, এই 'সাধ্য', 'সাধনা', এ 'প্রয়োজন !'
সে যে ভালবাসে, ভালবাসা যাচে, চাহেনা কেবল মহিমাস্তুতি !
আপনার ধনে কেন পর ভাব, কেন কর শুধু প্রণতি, ভীতি ?
সে যে প্রাণ-বঁধু, চাহে সে যে শুধু ভালবাসা আর প্রাণের টান।
অন্ধ বধির নির্ব্বোধ ওরে শুনিস্নি কি সেই বাঁশীর গান ?"
স্তব্ধ জগৎ, স্তম্ভিত বেদ পুরাণ শাস্ত্র শুনি এ কথা !
'পাগল' 'পাগল' ! "একি ঘোর বাণী !" অসঙ্গত এ, 'নাস্তিকতা !'
নিখিলের ভূপ, বিরাট-স্বরূপ, সে মোর পুত্র সুহৃদ্ হবে ?
সে হবে আমার পরাণ কান্ত, কে মানিবে হেন অসম্ভবে ?'
তবু ছুটে গেল দিক্ হ'তে দিকে, পাগলের এই পাগল হাওয়া,
যার গায়ে লাগে সে হয় পাগল শুনে এই নব মধুর পাওয়া !
জগতের চোখে লাগে নব নেশা, বুকে জাগে এই নবীন লোভ,
ধনী, গৃহী ছাড়ে ধন জন, রাজা রাজ্য ত্যজিতে পায়না ক্ষোভ !
পণ্ডিত জ্ঞানী দণ্ডী তাহার শুষ্ক জ্ঞানের পাহাড় হ'তে
ছুটে নেমে এসে দুবাহু পসারি ঝাঁপ দিল এই নবীন স্রোতে।
কে বহালে এই ভাবের বন্যা, কি বলিল বাণী পাগল-করা ?
রূপের জগৎ অরূপে ফোটেনি, অধর মোদের ঘরেতে ধরা।
যার কথা ওগো সে ছাড়া এমন কে বলিতে পারে জগৎ-মাঝে ?
সেই এসেছিল আমাদেরি দ্বারে প্রেমের পাগল ভিখারী-সাজে !
চেয়ে গেল সেই হৃদয় তোমার কান্ত পুত্র সুহৃদ্ রূপে !
বাক্য-মানস-অগোচর ধন, ঘরে এলো তোর এমনি চুপে।

এস প্রেমরাজ ভিখারীর সাজ ধরি নিয়ে সাথে প্রেমিক দল,
ধরণী ধন্যা প্রেমের বন্যা হৃদয়ে তাহার আজি উথল,
যাহা চেয়েছিলে সে ভাবের 'ভাবি', ভুবন তোমারে খুঁজিছে অই !
বঙ্গের গোরা নিখিল-চিত্ত-চোরা-রূপে এস ভুবন-জয়ী ।

শ্রীনিরুপমা দেবী ।

গৌড়চন্দ্র—শ্রীনিবাস আচার্য্য ।

গর্ভে ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"জলদতলে চেনা চেনা
　　কেহে তুমি হাসিছ বসি ?
আমাদের সেই চির চেনা
　　তুমি কি শ্রীর নিবাস শশী ?"

স্বামী কিছু উপায়-উপার্জ্জন না করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বেশ উত্তম মধ্যম দিয়া থাকেন, অন্ততঃপক্ষে মিঠেকড়ার ব্যবস্থা করিতে প্রায় কেহই পশ্চাৎপদ হন না। কিন্তু ধনধান্যহীনা পর্ণশালা-নিবাসিনী লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামীকে অনুরোধের পর অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"তুমি ঘরের বাহির হইও না, ঘরে বসিয়া কেবল নামকীর্ত্তন কর।" চৈতন্যদাস গৃহীর ধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিলে, লক্ষ্মীপ্রিয়ার কণ্ঠে ভাগবতধর্ম্ম উঠিল—"ভগবানের রাজ্যে কোনও অভাব নাই, কেবল বিশ্বাসের অভাব। তোমার প্রভুর কেবল নামসঙ্কীর্ত্তনের আদেশ আছে। আমাদের কোন দিন অচল হয় নাই, বরং দিন দিন সচলই হইতেছে, আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন সব আপনা আপনি আসিতেছে।" তাহার পর তিনি চুপে চুপে কি বলিলেন! এ কি চিন্তামণির কথা ?

কথা আর গোপন থাকিল না, ধর্ম্মের ঢাক বাজিয়া উঠিল—লক্ষ্মীপ্রিয়া গর্ভবতী। তাঁহার জ্যোতি দিন দিন বাড়িয়া উঠিল! যে দেখিল, সে-ই বলিল—"ইহার ভিতর সোণার চাঁদ আসিয়াছে।" চাঁদ ভিতরে থাকিতেই পল্লীর যে অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ-দাসের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সময় গ্রামে নাকি অনেক অঘটনও ঘটিয়াছিল।

গ্রামের জমিদার-বাবুর নাম দুর্গাদাস রায়। বৃথাই তিনি দুর্গাদাস নাম ধারণ করেন নাই, তিনি বাস্তবিকই দুর্গার দাস ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে প্রতিবৎসরই মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইত। তখন মুসলমান রাজা। সাধারণ প্রজার কোন বিপদ না থাকিলেও জমিদারের পিছে পিছে যম ছিল। যেখানে জমি, সেখানেই যম, সেখানেই গোলযোগ। এই গোলযোগে রায়মহাশয়কে পল্লী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতে হইয়াছিল। অকস্মাৎ সব গোলযোগ মিটিয়া গেল। রাজকলহের উপশম হইলে, গ্রামের রাজা গ্রামের আসনে বসিলেন।

কিন্তু আর একটি দৈব-গোলযোগ উপস্থিত হইল। গ্রামের প্রায় সকলেই সংকীর্ত্তনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। যে কোনদিন গান করিতে জানে না, তাহারও গলায় রাগরাগিণী আসিল, দুর্গাদাসের গ্রাম হরিবোলা হইয়া উঠিল।

যাঁহারা প্রকৃত দুর্গাদাস, হরিনামে তাঁহাদের আনন্দ হয়। আবার যাঁহারা প্রকৃত হরিদাস, তাঁহারাও দুর্গানামে নাচিয়া উঠেন। দুই একটী আবার এদিক ওদিকও আছেন। এই চাখন্দীতেই এক শাক্তমহাশয় ছিলেন, হরিনামে তাঁহার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইত। তিনি দুর্গাদাসের ধামা না ধরিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। চাটুকারের সাময়িক জয় হইল, তাঁহার প্ররোচনায় জমিদার বাবু ঢাক ঢোল বাজাইয়া হুকুম জারি করিলেন—কেহ হরিনাম করিতে পারিবে না, সকলকেই দুর্গানাম করিতে হইবে। দুর্গার কিন্তু অন্যরকম ইচ্ছা হইল। ঢুলী দুর্গানাম ঘোষণা করিতে গিয়া হরিনাম ঘোষণা করিয়া আসিল, চাখন্দীতে হরিনামের জমাট বাঁধিয়া গেল। রাজার হুকুমে হরিনাম কমিল না, বরং বাড়িয়া উঠিল।

জমিদার বাবুর অবশ্য শুনিতে বা জানিতে বাকী নাই যে, চাথন্দীর হরিনামের গোড়া হইতেছেন দীনহীন চৈতন্যদাস। একজনের ব্যাধির বীজে যেমন সমগ্র গ্রাম সংক্রামিত হয়, এই ঠাকুরের নাম-সঙ্কীর্ত্তনেও চাথন্দী গ্রামে তাহাই ঘটিয়াছে। তার পর ঠাকুরের ঠাকুরাণী সম্বন্ধে নানা জনের নানা-কথাও তাঁহার কর্ণে উঠিয়াছে। তিনি চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে একদিন নিজেই তাঁহাদের পর্ণ-কুটীরে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদাসের দ্বারে কেহই অনাদৃত হন না। তাঁহার আদর অভ্যর্থনায়, মধুর বচনে এবং সাধু-ব্যবহারে জমিদার-বাবু তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ধনী লোক, জীবনে অনেক ভাল ভাল জিনিষ খাইয়াছেন, কিন্তু আজ চৈতন্য-দাসের লক্ষ্মীপ্রিয়ার হস্তে যাহা আস্বাদন করিলেন, তাহাতে তাঁহার সব ভুল হইয়া গেল। আমরা গ্রাম্য লোকের মুখে শুনিতে পাই—"যে লঙ্কায় যায়, সে রাক্ষস হয়," "যে কামরূপে যায়, সে ফিরিয়া আর আসে না, সে ভেড়া হইয়া যায়।" বৈষ্ণবের বাড়ীতে আসিয়া দুর্গাদাসের না জানি বা কি হয়? তিনিও গৃহে ফিরিতে পারিলেন না, রাত্রিতেও ঠাকুর-বাড়ীতে থাকিলেন। বাড়ীখানি বাস্তবিকই ভাল নয়—স্বপ্নরাজ্যের বাড়ী, সেখানে গেলেই অলৌকিক স্বপ্ন দেখিতে হয়। চৈতন্যদাসের নাম-সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে দুর্গাদাস যেই নিদ্রিত হইয়াছেন, আর যাবে কোথায়? জগদ্ব্যাপী খোল-করতালের ধ্বনি। তাহার পর নাচিতে নাচিতে যিনি কাজীদমন করিয়াছিলেন, তিনি দুর্গাদাসকে কি করিতে নাকি কি করিয়া ফেলিলেন। সকলেই নিজের নিজের স্বপ্ন দেখিয়া উঠিলেন, সকলেরই কাঁদাকাটি। অনেক কথাবার্ত্তা হইল, এক রাত্রিতে দুর্গাদাসেরও অনেক হইল। আমরা দূরে দূরে থাকিয়া এই মাত্র জানিতে পারিলাম—দুর্গাদাস প্রকৃত দুর্গাদাস হইলেন। তিনি গৌরদাস হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের জয়ঢাক বাজাইয়া দিলেন, দুর্গোৎসবের সহিত তাহার গৃহে রাধাকৃষ্ণের দোলের ব্যবস্থা হইল—সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যদাস ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার জয়পতাকা উড্ডীন হইল।

আবির্ভাব।

"নব-বর্ষের বৈশাখ মাসে,

কে ও নবকুমার হাঁসে?

পৌর্ণমাসীর কত হাসি,
ভাসি যায় যে গৌড়বাসী।"

পুরাতনের গান করিতে করিতে চৈত্র মাস চলিয়া গেল, নূতনের গান ধরিয়া বৈশাখ মাস সেই আসরে নামিল। আমরা যে বৈশাখের কথা বলিতেছি, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে! চৈত্র-সংক্রান্তিতে ঋতুরাজ বসন্তের মেয়াদ ফুরাইলেও এই বিশেষ বৈশাখে তাহার কার্য্যকাল বৃদ্ধি হইয়াছে। কাজে কাজেই কোকিল দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই, কি কালে কি অকালে তাহাকে ডাকিতে হইতেছে। মলয়ের আমল থাকাতে কাল-বৈশাখী ঝড়ও আসিতে পারিতেছে না। গ্রীষ্মকালেও যখন এরূপ বসন্তের অভিনয় চলিতেছে, তখন হাসিতে হাসিতে পৌর্ণমাসী আসিয়া শুভক্ষণেই তাহার লীলা-খেলার সূত্রপাত করিল। চাঁদের ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছে, আজ তাঁহার বড় হাসি! আমরা জানিনা, তবে শুনিতে পাই, লোকে আনন্দে নাকি আটখান হয়, কিন্তু এই বৈশাখের ভরা চাঁদটী চাথন্দীর গঙ্গার তরঙ্গে পড়িয়া যে কোটী কোটী হইল, তাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা; কিন্তু আমরা বাহিরে কি দেখিতেছি? ভিতরে যে হুলুধ্বনি পড়িতেছে, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে, এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে চৈতন্যদাসের আঙ্গিনা উদ্ভাসিত হইতেছে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার কোলে ও কে? লোকে যাহাকে সাত রাজার ধন এক মাণিক বলে, ও কি তাহাই? না, ও চাঁদের চাঁদ, চাঁদও ত অমন নয়, তবে কি ও সোনার চাঁদ? দশদিকে ধ্বনি হইল, "ও জগন্নাথের বরপুত্র, ও গৌরচন্দ্রের গৌড়চন্দ্র?" আমরা কিন্তু চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম, বলরাম শর্ম্মার নাতি,— চৈতন্য-দাসের পিণ্ডদাতা,— লক্ষ্মীপ্রিয়ার ভবিষ্যৎ আশা।

এই রাত্রে গৌরচন্দ্রের বড় হাসি, বড় আনন্দ,—তাঁহার নৃত্য-কীর্ত্তনে পুরীর ভক্তগণ একেবারে আত্মহারা! আর গৌড়ে নিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত কিরূপ স্ফূর্ত্তি করিয়া লইলেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। শান্তিপুরের "নাড়া" গোঁসাই যে দিগম্বর হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা হাতে হাতে দিতে পারি। আমরা কোন দিকে যাই, নানা দিকে নানা দেশেই বৈশাখী-পৌর্ণমাসীর মহোৎসব! বৃন্দাবনে গোস্বামিমহলে হাসাহাসি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাসা-ভাসিতে দাঁড়াইয়াছে।

গুরু-গম্ভীর গোপাল-ভট্ট কিছুতেই থামিতে পারিতেছেন না, অগাধ গম্ভীর রূপ-সনাতন হইতে গাম্ভীর্য্য সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, জীব-জীবন শ্রীজীব-চরণের কথা আর কি বলিব! তাঁহার প্রাণ অঙ্গই ফুলিয়া উঠিতেছে। কি জন্য এরূপ অভাবনীয় ভাব, কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না; তবে সকলেরই বুক ফুটিয়া এই সত্য বাহির হইল যে, এই পৌর্ণমাসীতে জগতের উপর এমন কাহারও আবির্ভাব হইল, যিনি মহা-মহোৎসবের উৎসব-দাতা।

পরের কথা পরে হইবে, এখন কিন্তু চাখন্দীতে সত্য সত্যই যে মহোৎসব হইল, একথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহারা রাজা, ধন-দৌলত যাহাদের ঘরে ধরে না, সাধারণতঃ তাহাদের ঘরে পুত্র হইলে একটা বিরাট ব্যাপারের আয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার ঘরে এক দিনের চাউলও জমা থাকে না, সেই চৈতন্যদাসের বাড়ীতে দেশের লোক সমবেত হইয়াছেন কেন? নিজের ঘর হইতে দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া আনন্দের হাট বসাইতে ব্যতিব্যস্ত কেন? আমরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিলাম—এই নব কুমারটীর নিকট কথায় নহে, কিন্তু বাস্তবিকই মার কু হইয়াছে, ইহার ভিতর এমন একটী কিছু আছে, যাহা মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর পুত্রের ভিতরও দেখা যায় না। জন্ম হইতেই এ একজন বিশেষ অধিকারী, তাহার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ এই যে, যাঁহারা তাঁহার দিকে চাহিলেন, সে তাঁহাদেরই হৃদয়-ক্ষেত্রে মৌরসী সত্ত্ব করিয়া বসিল। সকলের ভিতরই ধ্বনি হইল—আমরা অনেক ছেলে দেখিয়াছি, কিন্তু এ কি ছেলে?

আমাদের বড় তাড়াতাড়ি বাধিয়া গিয়াছে, নবকুমারকে শীঘ্র শীঘ্র বড় করিয়া লইতে হইবে, একারণ ইহার বাল্যজীবন বিশেষ ভাবে দেখিবার উপায় নাই। সূতিকাগার হইতে যথাযথ ভাবে আরম্ভ করিয়া চলিলে বাল্যকালেরই এক বৃহৎ ইতিহাস হইয়া পড়িবে। কিন্তু আমাদের আরও অনেক চাঁদ আছে, তাঁহাদের সহিত শীঘ্রই ইহার মিলন করিয়া দিতে হইবে। কাজে কাজেই স্বাভাবিক ভাবে পায়ে হাঁটিয়া গেলে চলিবে না, কলের গাড়ীর আশ্রয় লইতে হইবে।

জগন্নাথের মহাপ্রসাদে অন্নপ্রাশন হইল। নাম-করণের বেলা সর্ব্ববাদি-সম্মত শ্রীনিবাস-নাম তাহার উপর পড়িল। এ নাম পূর্ব্ব হইতেই তাহার

কপালে লেখা ছিল কি না, বিশেষজ্ঞগণ বলিতে পারেন। সে গোপালের মত সুবোধ ছিল কি চপল ছিল—তাহা ঠিকভাবে বলিতে পারি না। তারপর সে হাটিতে হাটিতে নৃত্য করিতে শিখিয়াছিল, কি নৃত্য করিতে করিতে হাটা শিখিয়াছিল, এ বিষয়েও একটা গোল আছে; তবে এটুকু আমরা জোরের সহিত বলিতে পারি, নৃত্যে সে সিদ্ধপদ ছিল। তাহার যেমন তাল, তেমন গলা। সেই অলৌকিক বালক কথা বলিলেই গান হইয়া পড়িত। ইতর প্রাণী বা তরুলতার ভিতর কি প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহা বলিতে না পারিলেও, ইহা বেশ বলা যায়, যিনিই তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন,—মনে মনেই হউক, আর বড় করিয়াই হউক, তিনিই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—এই বালক কোন্ দেশ হইতে এই গৌড়দেশে আসিল?

অল্পদিনের ভিতরই তাহার শব্দজ্ঞান হইল। মুখে কথা ফুটিতে না ফুটিতেই, সে কাহাকে কি বলে শিখিয়া লইল। সে কথা শুনিতে পাগল, কথাতে তাহার আহার-নিদ্রা ভুল হইয়া যাইত। কল-কল-রবে গঙ্গা চলিতেছে, পাতায় পাতায় মর্ম্মর-ধ্বনি হইতেছে, চাঁদ তাহার ভিতর দিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, প্রেমের বালক পিতার কোলে উঠিয়া বলিতেছে "বাবা সেই কথাটী বলিতেই হইবে।" সেই কথাটী হইতেছে—গৌরচন্দ্রের কথা। সেই কথা বলিতে চৈতন্যদাসও পাগল, যেমন বাবা তেমন ছেলে। ছেলে ঘুমাইলে বাবার কথা বন্ধ। শ্রীনিবাসের হাতে খড়ি হইতে না হইতেই সে গৌরচন্দ্রের কথা মুখে মুখে লইয়া বসিল। চৈতন্যদাসকে সাক্ষী মানিলে তিনি অবশ্যই বলিবেন, গৌরচন্দ্রের কথায় তাহার চাঁদমুখে এক এক সময় এক এক ভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সে প্রভুর সন্ন্যাস শুনিয়া যে কাঁদিয়াছিল, তাহার প্রমাণও তাহার বাবারই বক্ষঃস্থল, কারণ তাহা তাহার চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছিল।

লেখা পড়া। আমরা তাহার চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না, তবে তাহার লেখা পড়া সম্বন্ধে দু একটী কথা না বলিয়া উপায় নাই। তাহার যিনি গুরুমহাশয়, তাঁহার নাম ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতি। তাঁহার হস্তে বেত্র না থাকিলেও বিদ্যাদানে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, অনেক মূর্খ তাঁহার শিক্ষার গুণে পণ্ডিতের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্য সত্যই

তিনি অনেক গাধা পিটিয়া মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের গুণে আবার অনেকের মলিন বুদ্ধি উজ্জ্বল হইয়াছে। আর যাঁহারা প্রতিভা-বান, তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে দিগ্‌গজ হইয়া বাহির হইয়াছেন। এহেন বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় শেষকালে একটী বালক লইয়া গোলে পড়িলেন। ইহা বলাই বাহুল্য যে, সে বালকটী আমাদের চৈতন্যদাস-লক্ষ্মীপ্রিয়ার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র শ্রীশ্রীনিবাস।

বালকগণের ভিতর কাহারও স্মৃতিশক্তি আছে, অথচ বুদ্ধি ততটা নাই, আবার কাহারও বা বুদ্ধি আছে কিন্তু স্মৃতিশক্তি নাই, তাঁহার ভিতর দুইএরই কিন্তু মণিকাঞ্চনের ন্যায় যোগ হইয়াছিল। অসাধারণ মেধা এবং অলোকসামান্য প্রতিভাবলে, তিনি অল্পকালের মধ্যেই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিলেন। এক একদিনে তাহার বহুদিনের কার্য্য হইতে লাগিল দেখিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের বাক্য বাহির না হইয়া ক্রমে ক্রমে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি অবাক হইয়া বালকটী লক্ষ্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এ ছাত্র, না গুরু, না কে? কি ব্যাকরণ, কি কাব্য, কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি পুরাণ, সব বিষয়েই তাহার বিশেষ অধিকার! তাহার নখ-দর্পণে চারিবেদ চৌদ্দশাস্ত্র বাঁধা দেখিয়া গুরুমহাশয়ের সন্দেহ হইল—আমিই ইঁহার গুরু না এই আমার গুরু। ইহা বলিলেও বোধ হয় সত্যের অপলাপ হইবে না যে, এই বালকটি গুরুমহাশয়ের শেষে বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কারণ তাহার এক একটা জটিল প্রশ্নে তাঁহাকে চতুর্দ্দশ ভুবন ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। বিদ্যা কাহারও ঢাকা থাকে না, কুসুমের গন্ধের ন্যায় আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে। শ্রীনিবাসের বেলাও তাহাই হইল, চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্রই তাহার বিদ্যার কথা রটিয়া পড়িল। জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী বালক শ্রীনিবাসকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। যে চাখন্দীর মাটিতে এই বিজ্ঞান-বৃদ্ধ বালকের উদ্ভব হইয়াছিল, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা বলিতে পারিনা, তবে এটুকু জানি তাহার অভূতপূর্ব্ব বিদ্যাবত্তার জন্য অনেক মহাত্মাই তাহার জন্মভূমিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছেন।

তাহার অর্জ্জিত বিদ্যা অপেক্ষা তাহার একটী স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা ছিল, সেইটীর পরিচয় দিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা জানি

বিদ্বান হইলেই লোকে সকলকে আনন্দ দিতে পারেন না। এমন অনেক বিদ্বান আছেন, যাঁহার মুখ দেখিলেই অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠে, আবার অনেক বিদ্যাহীনকে দেখিয়াও প্রাণটী শীতল হয়। আমরা কাহাকেও দোষী করিতেছি না—এই জগতে কেহবা আনন্দদানকারিণী বিদ্যাটা সঙ্গে সঙ্গেই লইয়া আসেন,—কেহবা সকলকে জ্বালাইবার জন্য মূর্ত্তিমান হন। ধর না ঐ আকাশের চাঁদ; মনোহর গান কি প্রাণ জুড়ান কথাটী সে কোন কালেই বলে না,—সে কোথায়ও কোনও রাত্রিতে কাহারও ঘরে মোহর বর্ষণ করিয়াছে বলিয়াও শুনা যায় না, অথচ সে সকলকে শীতল করে, তাহার দিকে তাকাইলেই প্রাণে আনন্দ হয়; তাহার নিকট ধনী দরিদ্র নাই, বিদ্বান মূর্খ নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, সাদা কালো নাই, স্ত্রী পুরুষ নাই, ভাল মন্দ নাই, যে চাহিবে সেই বিনা পয়সায় হাতে হাতে আনন্দ পাইবে! চাঁদের এই আনন্দদানের বিদ্যা আমাদের শ্রীনিবাসচাঁদের মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছিল যে, যদি প্রাণ জুড়াইবার বস্তু জগতে থাকে, তবে সে চৈতন্যদাসের পুত্র। তাই ঠাকুর-ঠাকুরাণীর পর্ণশালাটীতে হাট লাগিয়াই থাকিত। জীবগণ আনন্দের জন্য স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল আলোড়ন করিয়া থাকে, সেই আনন্দের বাজার যদি তাহারা চোখের উপর দেখিতে পায় তবে সেখানে যাইবে না কেন? চাঁদ যদি আকাশ হইতে হাতের নিকট উপস্থিত হয়, তবে এমন কে আছে একবার ধরিতে ইচ্ছা করিবে না? এখানে এ কথাটি বলিয়া রাখি—যাহাদের ভিতর আনন্দ আছে, আনন্দের বস্তুর দিকে তাহারাই বেশী আকৃষ্ট হয়। যাহারা নীরস, তাহারা পূর্ণিমার রাত্রিতেও জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, আবার সরস কবি, বালক, ভক্তগণ সেই রাত্রিতেই নাচিয়া নাচিয়া মহোৎসব বাধাইয়া দেয়। শ্রীনিবাসকে দেখিয়া কাহারও গাত্রজ্বালা হইয়াছিল, এ সংবাদ পাওয়া যায় না, কিন্তু সাধু ভক্তগণ যে সেই অপরূপ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এ বার্ত্তা বিশেষরূপে পাওয়া যায়। সে বাল্যকাল হইতেই মহাত্মাগণের দর্শনীয় বস্তুরূপে দাঁড়াইয়াছিল, আবার তাঁহাদের প্রতিও তাহার টান খুব বেশীরকম ছিল, তাহার প্রমাণ অনেক আছে। সাধুভক্তের নাম শুনা দূরে থাকুক, তাহাদের গন্ধ পাইলে হয়—তাহাকে আর ধরিয়া রাখিবার উপায় ছিল না, সে সেখানে যাইবেই যাইবে। তাহাকে

অন্বেষণ করিতে হইলে অন্য কোথাও যাইবার আবশ্যক নাই, সাধুসজ্জনের কোন এক ঘরে গেলেই তাহাকে পাওয়া যাইবে। সাধুঘাঁটা কথাটার সার্থকতা এই সাধুনন্দনটিতে বিশেষ ভবে খাটে। কোন কোন মহাশয়ের সহিত এই সতীসন্তানের সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহার তালিকা দিতে হইলে আমাদিগকে অনেক দূর যাইতে হইবে; তবে এক চিরস্মরণীয় পুণ্যশ্লোকের নাম উল্লেখ না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না, উনি হইতেছেন আমাদের অগ্রদ্বীপের স্বনামধন্য সেই গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর—যাঁহার দেহরক্ষার পরে শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ সর্ব্বজনসমক্ষে পুত্রের ন্যায় পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। বালক শ্রীনিবাস এই ঘোষঠাকুরের হৃদয়খানি লইয়া টানাটানি করিয়াছে, অবশ্য ঘোষঠাকুরও ছাড়িয়া দেন নাই, শ্রীনিবাসকে তাঁহার নিকট ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতে হইত।

বালক বাস্তবিকই জীবনের প্রথম হইতে চৈতন্যপথের পথিক, তাঁহার কথা শুনিতে সে আত্মহারা; তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গ করিতে সে সদাসর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। এক একজনের নাম তাহার কর্ণে আসে, আর সে তাহার দর্শন জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার উৎকণ্ঠাটা বড় বেশী হইল শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের জন্য। কোন দিন দর্শন নাই, কেবল নাম শুনিয়াই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু সে বালক, পদে পদে তাহার বাধা। দর্শন না পাইয়া সে চতুর্দ্দিকে আঁধার দেখিতে লাগিল, কিছুই তাহার ভাল লাগিল না। শ্রীখণ্ডের গৌরাঙ্গনাগারীর সঙ্গ বিনা তাহার প্রাণ যেন আর থাকে না। মনের কথা তাহার মনে থাকিল বটে, কিন্তু তাহার ভাবান্তর দেখিয়া পিতামাতা প্রতিবেশী সকলেই চিন্তিত হইলেন। এই সময় সে তাহার ঠাকুরদাদার গ্রামের সঙ্গী পাইল, কাতর বালক তাহার সহিত যাজী গ্রামে চলিল। সেখানে সে পথে পথে আশায় আশায় ঘুরিয়া বেড়ায়, পথিক দেখিলে মনে করে বুঝি কোন ভক্ত আসিতেছেন, আর নরহরির মূর্ত্তি যেখানে সেখানেই দেখেন, কিন্তু কোথায় তাহার আশার ঠাকুর? সে প্রতিদিন আশার পথে উঠে, শেষে নিরাশায় ঘরে ফিরিয়া আসে, ক্রমে তাহার জীবনধারণ দুঃসহ হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

ভাগীরথি।

কৃষ্ণপদ হ'তে উদ্ভব তব
দেবি জাহ্নবি গঙ্গে।
ভগীরথ-স্তবে হইয়া তুষ্ট,
শঙ্কর-শিরে হ'লে আবির্ভূত,
ধরিয়া পিঙ্গল জটার গুচ্ছ
খেলিতেছ নানা রঙ্গে॥

লক্ষ বছরের সাধনার ফলে
আসিয়াছ তুমি মর্ত্ত্যে।
কপিল-অভিশাপে হইল ধ্বংস,
সগর রাজার বিপুল বংশ।
তুমিই তাদের হইলে সোপান
অনায়াসে যে'তে স্বর্গে॥

পাপী নিস্তারিতে আসিলে ধরায়
ধরিয়া তটিনী-মূর্ত্তি।
বসু-অষ্ট জনের করিতে উদ্ধার,
হ'লে রাজ্ঞী তুমি শন্তনু রাজার।
ভীষ্ম জন্মিল তোমারই গর্ভে,
রহিল জগতে কীর্ত্তি॥

মত্ত ঐরাবতের হরিলে দর্প
তুমি ত্রিভুবন-পুণ্যা।
তোমার গর্জ্জনে ভঙ্গ হ'ল ধ্যান,
ক্রুদ্ধ ঋষি তোমায় করিলেন পান;
পুনঃ জানু হ'তে হ'লে প্রবাহিত,
(তুমি) জহ্নু মুনির কন্যা॥

হিমাদ্রি হইতে সমুদ্র অবধি
পবিত্র সকল দেশ।
সারা ভারতের বক্ষ ব্যাপিয়া,
চলিয়াছ তুমি তরঙ্গ তুলিয়া,
তোমার পুণ্য-প্রবাহে ঘুচিল
জীবের ত্রিতাপ-ক্লেশ॥

মন্দদক্ষিণ মলয় অনিলে
উতলা ছুটেছ তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি ঢেউ ছলছলে,
লক্ষ মাণিক ঝলকে আঁচলে,
নেচে চল যেন নটিনী॥

গৌরাঙ্গ-সুন্দরের শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গিনী
(তুমি) নিত্য পরিকর ধন্যা।
তব তীরে নীরে চৈতন্য-বিহার,
হয়েছে প্রকট বিবিধ প্রকার।
অদ্যাপি তোমার দর্শনে বহে
হৃদয়ে ভাবের বন্যা॥

রসাতলে তোমার নাম ভোগবতী
মর্ত্ত্যেতে তুমি গঙ্গা।
ইন্দ্রালয়ে তুমি হ'লে মন্দাকিনী
(তুমি) পুনর্জ্জনমভঙ্গা॥

শ্রীমতী রাধাপ্রিয়া দত্ত।
তারকেশ্বর।

মহাভাব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দিব্যোন্মাদ-বৈচিত্রী।

উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প ব্যতীত দিব্যোন্মাদের আরও অনেক ভেদ আছে; শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থেও তাহা বলা হইয়াছে ;

উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥

কিন্তু অনেক ভেদ থাকিলেও, উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প ব্যতীত অন্য কোনও ভেদের উদাহরণ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে দেওয়া হয় নাই। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রলাপবাক্যে এই সমস্ত ভেদের উদাহরণ পাওয়া যায়। তাই, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত কয়েকটী প্রলাপবাক্যের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রলাপবাক্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে ভূমিকারূপে দু'একটী কথা বলা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধিকার ভাবে সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার প্রলাপবাক্যে তাহাই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন ; সুতরাং এই প্রলাপবাক্যগুলিকে মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার উক্তি বলিয়াই মনে করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, নীলাচলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সাধারণতঃ তিনটী অবস্থা ছিল— অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা এবং অর্দ্ধবাহ্যদশা। এই তিন দশার কোনও না কোনও একটী দশাতেই প্রভু অবস্থান করিতেন।

শ্রীরাধা-ভাবের নিবিড়তম আবেশের নাম অন্তর্দ্দশা। এই নিবিড়তম-আবেশের ফলে, মনে, প্রাণে এবং দেহে—সর্ব্বতোভাবেই প্রভু নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করিতেন ; আর মনে করিতেন—তিনি যেন শ্রীবৃন্দাবনেই আছেন। তাঁহার যথাবস্থিত দেহের অনুভূতি তখন তাঁহার থাকিত না ; তাঁহার এই যথাবস্থিত দেহ কোন্ স্থানে আছে, তাহার জ্ঞানও তখন থাকিত না। তাঁহার যথাবস্থিত দেহের নিকটে অপর কেহ আছে কিনা, তাহাও

তিনি জানিতে পারিতেন না। তখন তাঁহার যথাবস্থিত দেহের ইন্দ্রিয়াদিরও কোনও কার্য্য থাকিত না—তিনি যেন অসাড়-অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। ইহা যেন একটা গাঢ় নিদ্রার অবস্থার অনুরূপ।

যথাবস্থিত দেহের সহজ অবস্থার নাম বাহ্যদশা। ইহাতে যথাবস্থিত দেহের সম্যক্ জ্ঞান থাকিত, কোন্ স্থানে কাঁহাদের নিকটে তিনি অবস্থান করিতেছেন, তাহারও সম্যক্ জ্ঞান থাকিত; ইন্দ্রিয়াদিও যথাযথরূপে ক্রিয়াশীল থাকিত। ইহা যেন জাগ্রতাবস্থার অনুরূপ।

আর, অন্তর্দ্দশার ভাব-নিবিড়তা যখন সামান্য একটু তরলতা প্রাপ্ত হয়, পারিপার্শ্বিক বস্তুনিচয়ের ইঙ্গিতে দু'একটী ইন্দ্রিয়, যেন ভাবমুগ্ধতার সহিতই যখন একটু সাড়া দিতে থাকে—তখনকার অবস্থাকে অর্দ্ধবাহ্যদশা বলে। অর্দ্ধবাহ্যদশার সূচনায় অন্তর্দ্দশার ঘোর একটু কমিয়া যায়, বাহ্যদশার সামান্য একটু স্পর্শও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তখনও প্রভুর যথাবস্থিত স্বরূপের অনুভূতি ফিরিয়া আসে না—তখনও তিনি মনে করেন, তিনি শ্রীরাধিকাই, এবং তিনি বৃন্দাবনেই আছেন। তাঁহার যথাবস্থিত দেহের নিকটবর্ত্তী স্বরূপ-দামোদরাদির আহ্বান তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু সেই আহ্বানকেও তাঁহার ভাবের আবেশে তিনি শ্রীবৃন্দাবনস্থা তাঁহার (শ্রীরাধার) সখীগণের উক্তি বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদের কথার উত্তরে তিনি নিজেও কথা বলেন বটে, কিন্তু তাহাও তাঁহার অন্তর্দ্দশায় অনুভূত বা দৃষ্ট লীলারই বর্ণনা মাত্র—তিনি যেন শ্রীবৃন্দাবনস্থ তাঁহার সখীগণকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সকল কথা বলিতে থাকেন। ইহা অনেকটা আধ-জাগা-আধ ঘুমন্ত অবস্থার অনুরূপ। অন্তর্দ্দশা বা বাহ্যদশা অবিমিশ্রদশা—কেবলই রাধাভাবের আবেশ, যেমন অন্তর্দ্দশায়; অথবা কেবলই যথাবস্থিত সহজ ভাব, যেমন বাহ্যদশায়। কিন্তু অর্দ্ধবাহ্যদশাটী বিমিশ্রভাব—অন্তর্দ্দশা ও বাহ্যদশার মিশ্রিত অবস্থা; ইহাতে কিছু অন্তর্দ্দশা, আর কিছু বাহ্যদশা। এই দুইটী দশার তারতম্যানুসারে অর্দ্ধবাহ্যদশার গাঢ়তারও তারতম্য আছে। প্রভুর প্রলাপোক্তিগুলি অর্দ্ধবাহ্যদশার উক্তি—অন্তর্দ্দশার সহিত বাহ্যদশার সংক্রমণ-সময়ের উক্তি। অন্তর্দ্দশায় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিলুপ্তপ্রায় থাকে বলিয়া প্রলাপ অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃ শ্রীরাধিকা যেমন সময় সময় নিজেকে ললিতাদি সখী

বলিয়া মনে করিতেন, রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদ্রূপ উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃ সময় সময় নিজেকে (শ্রীরাধিকা ব্যতীত) অন্য গোপী বা সেবাপরা মঞ্জরী বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই ভাবেই প্রলাপাদি ব্যক্ত করিতেন।

(ক)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের শেষ কয় বৎসর নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে, শ্রীরাধিকার যে অবস্থা হইয়াছিল, রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুরও সেই অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির চিন্তায় এবং মথুরাগমনের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত লীলার চিন্তাতেই প্রভুর মন সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া থাকিত; বহির্ব্বিষয়ের কোনও অনুসন্ধানই যেন প্রভুর তখন ছিল না, কেবল পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃই যেন যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়াই, স্নান-ভোজনাদি-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেন।

এই মতে মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে॥
স্নান-ভোজনকৃত্য দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥

অন্ত্য ১৫শ পঃ।

এইরূপই যখন প্রভুর মনের অবস্থা, তখন একদিন তিনি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে গমন করিলেন। গমন সময় হইতেই, কিম্বা তৎপূর্ব্ব হইতেই বোধহয় প্রভুর চিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের সেই আত্ম-পর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্ত-হর অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-মণ্ডিত রূপের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; অভ্যাসবশতঃ গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রত্নবেদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রত্নবেদীতে সিংহাসনোপরি, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীমতী সুভদ্রা এই তিন শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। কিন্তু রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্ত সর্ব্ব-বিস্মারক শ্রীকৃষ্ণরূপেই নিবিষ্ট থাকায়, তিনি শ্রীবলদেব ও শ্রীমতী সুভদ্রাকে দেখিতে পাইলেন না, তাঁহাদের অস্তিত্বও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; দেখিলেন কেবল শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ; জগন্নাথদেবের স্বরূপও দেখিতে পাইলেন না; প্রভু দেখিলেন—রত্নবেদীর উপরে গোপবেশ-বেণুকর ব্রজেন্দ্রনন্দনই যেন সাক্ষাৎ মাধুর্য্যের প্রকট বিগ্রহরূপে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বদিকে মাধুর্য্যের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতেছেন।

জগন্নাথ দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন-সময়ে দিগন্তবিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যস্থলে ভ্রমণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত পথিক শীতল জলের সন্ধান পাইলে যেরূপ ব্যাকুলতার সহিত তাহা পান করিতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও বহুদিন পরে প্রাণবল্লভের দর্শন পাইয়া তদ্রূপ, বরং তদপেক্ষাও অধিকতর ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার মাধুর্য্য সুধা পান করিতে লাগিলেন। অপলক-দৃষ্টিতে প্রভু শ্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন—নয়নে তাঁহার দরবিগলিত প্রেমাশ্রু। তিনি সুভদ্রা-বলদেবকে দেখিতে পাইতেছেন না—রত্নবেদী দেখিতে পাইতেছেন না, শ্রীমন্দির দেখিতে পাইতেছেন না, সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভও দেখিতে পাইতেছেন না—অপর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না, কিছু শুনিতেও পাইতেছেন না—তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমগ্র শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাহরণে স্বতঃ নিয়োজিত। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য সাধারণতঃ পাঁচরূপে অভিব্যক্ত—তাঁহার রূপে, তাঁহার অঙ্গগন্ধে, তাঁহার স্পর্শে, তাঁহার অধর-সুধাদিতে এবং তাঁহার কণ্ঠ-বেণু-ভূষণাদির ধ্বনিতে। প্রভুর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির আস্বাদনের নিমিত্ত যুগপৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মদনমোহন-রূপ প্রকট করিয়া সাক্ষাতে দণ্ডায়মান; সেই রূপ-সুধা পান করিবার নিমিত্ত প্রভুর নয়ন লালায়িত হইল, যতই পান করিতেছে, নয়নের পিপাসা যেন ততই বর্দ্ধিত হইতেছে, কিছুতেই তৃষ্ণার শান্তি নাই। নাসিকারও ঐরূপ অবস্থা; প্রভু অনুভব করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে যেন কি একটা অননুভূতপূর্ব্ব সুগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছে—মৃগমদ-নীলোৎপলের মিলিত সুগন্ধও তাহার নিকটে অতি তুচ্ছ; প্রভুর নাসিকা তাহা আস্বাদন করিতেছে, কিন্তু আস্বাদন করিয়াও তাহার উৎকণ্ঠার শান্তি নাই। কর্ণ যেন শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ-শিঞ্জিত শুনিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছে—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্ত, তাঁহার বেণুধ্বনি শুনিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠায় যেন ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। ত্বক্ যেন ছুটিয়া যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের কোটিচন্দ্র-সুশীতল

শ্রীঅঙ্গের স্পর্শের নিমিত্ত লালায়িত; আর রসনা যেন ছুটিয়া যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পানের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত—বিধাতা কেন তাহাদিগকে উড়িবার শক্তি দিলেন না, তজ্জন্য তাহারা বোধহয় বিধাতাকে তিরস্কারই করিতে লাগিল। প্রভুর পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই একই সময়ে প্রভুর মনকে স্ব-স্ব-বিষয়ের দিকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে—তাহাতে, একটী অশ্বকে পাঁচজনে পাঁচদিকে রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিলে অশ্বের যে অবস্থা হয়, প্রভুর মনেরও যেন সেই অবস্থাই হইল—প্রভুর চিত্ত যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

এক মন পঞ্চ দিগে পঞ্চগুণে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে॥

ত্বক্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ পাইতেছে না, তাতে ত্বকের ব্যাকুলতা; রসনা শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস-পান করিতে পাইতেছে না, তাতে রসনার ব্যাকুলতা; কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মধুর-ভাষিত শুনিতে পাইতেছে না, তাতে কর্ণের ব্যাকুলতা। নয়ন রূপ দর্শন করিতেছে, নাসিকা অঙ্গগন্ধ আস্বাদন করিতেছে—তাহাতে নয়ন ও নাসিকার ব্যাকুলতা কিছু প্রশমিত হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তা নয়—তাদের ব্যাকুলতা তো কমেই নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে—স্বীয় অভীষ্ট-বস্তু লাভ করিয়া এই ব্যাকুলতার উৎসাহ এবং শক্তি যেন আরও বর্দ্ধিতই হইয়াছে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের বর্দ্ধনশীলা-ব্যাকুলতার নির্দ্দয় নিষ্পেষণে প্রভুর দেহ-মন যেন বিশেষরূপে নিপীড়িত হইতে লাগিল।

এই অবস্থায় প্রভু দাঁড়াইয়া আছেন; এমন সময় শ্রীজগন্নাথের উপল ভোগের সময় হইল—রত্ন-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইল। দীর্ঘ বিরহের পরে অপলক-দৃষ্টিতে প্রাণবল্লভকে দর্শন করিতেছিলেন—অকস্মাৎ দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত হইলেন; তীব্র বিরহ-যন্ত্রণায় রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু হতচেতন-প্রায় হইলেন। স্বরূপ-দামোদরাদি পার্ষদ-ভক্তগণ কোনও রকমে প্রভুকে তাঁহার বাসায়—গম্ভীরায় লইয়া আসিলেন।

হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা॥

এতক্ষণ প্রভু ছিলেন নিবিড় অন্তর্দ্দশায়—বাহিরে কি হইতেছে না

হইতেছে, তাঁহার নিকট কে আছেন, আর কে নাই—তাহার কিছু জ্ঞান তাঁহার ছিলনা। গম্ভীরায় আসার পরে প্রভুর অন্তর্দ্দশার ঘোর একটু কমিয়া গেল—তাঁহার নিকট যে লোক আছেন, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিলেন; কিন্তু নিকটে কে কে আছেন, তাহা জানিতে পারিলেন না; তিনি তখনও রাধাভাবে আবিষ্ট; তিনি মনে করিতেছেন—তিনি শ্রীরাধা আর যাঁহারা তাঁহার নিকট আছেন, তাঁহারা তাঁহার সখী—ললিতা-বিশাখাদি। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল; এমতাবস্থায় প্রিয় সখী ললিতা-বিশাখাকে (স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দকে) নিকটে অনুভব করিয়া দুই হাতে তাঁহাদের দুইজনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বিলাপ করিতে করিতে স্বীয় মর্ম্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন:—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষ-রম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে॥

[হে সখি! যিনি সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা ললনাগণের চিত্তরূপ পর্ব্বতকে সংপ্লাবিত করেন, যাঁহার রম্য বচন নর্ম্ম-পরিহাসময় এবং কর্ণসুখদ, যাঁহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র হইতেও সুশীতল, যিনি স্বীয় সৌরভ্যামৃত দ্বারা সমস্ত জগৎকে সংপ্লাবিত করেন এবং যাঁহার অধর অমৃত হইতেও রমণীয়—সেই গোপেন্দ্র-নন্দন বলপূর্ব্বক আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন।]

এই শ্লোকটী কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার উক্তি; শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির আকর্ষণে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয় কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, এই শ্লোকে শ্রীরাধা তাহাই বিশাখার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভুও স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের নিকটে এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন এবং বিলাপ করিতে করিতে ইহার অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

শঙ্কিতা।

ডাকি লহ মোর প্রাণের দেবতা
তোমার চরণ-তলে,
(সে যে) ঘৃণ্য তুচ্ছ চির লাঞ্ছিত
আকুল নয়ন-জলে।

মলিন বসনে, মলিন পরাণে,
তব মন্দিরে যাইব কেমনে
তোমার মোহন রূপ দরশনে,
চরণ নাহিক চলে।
ডাকি লহ মোর প্রাণের দেবতা
তোমার চরণ-তলে।

শিশিরসিক্ত কুসুম তুলিয়া
সাজায়ে পূজার ডালা,
মালতীর ফুলে তুলসীর দলে
যতনে গাঁথিয়া মালা ;

কত নিশি জাগি নীরবে গোপনে,
গিয়েছিনু নাথ, তব দরশনে,—
ভরসা-নিরাশা-হাসি-অশ্রু ল'য়ে
তব মন্দির-তলে।
সে যে ঘৃণ্য তুচ্ছ চির লাঞ্ছিত
আকুল নয়ন-জলে

সে পূজা আমার হয় নাই সারা
এসেছিনু ঘরে ফিরি'
সে মালা আমার লাগে নাই কাজে
বাসি হোয়ে ছিল পড়ি।

শঙ্কিত-চিত আপনি কি জাগে,
যদি তুমি নিজে নাহি ডাক তাকে,
যদি তুমি তারে না কর সিঞ্চিত
তোমার প্রেমের জলে।
ডাকি লহ মোর প্রাণের দেবতা
তোমারি চরণ-তলে।

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী বিজ্ঞানতীর্থ।

স্মরণের প্রভাব।

(১)

সেদিন গ্রামের মধ্যে হচ্ছিল পুরাণ পাঠ। বক্তাটি ছিলেন খুব ভক্ত, ভাবুক ও বাবদূক। তড়িৎ-শক্তির মত তাঁর কথাগুলি শ্রোতাদের উপর ক্রিয়া কর্‌ছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবলোক আত্মহারা হ'য়ে উঠেছিল। সব জগৎ যেন স্তব্ধ ও বাক্‌শক্তি-রহিত, জড় ও শক্তিহীন হ'য়ে গেছে, জগৎ যেন আর নেই—কেবল পাঠক ও পাঠকের কথাগুলিই যেন জগতে বিদ্যমান; বাতাসও যেন স্তব্ধ হ'য়ে পাঠকের কথাগুলি কান দিয়ে শুন্‌ছিল—এমনই বোধ হচ্ছিল। বক্তা, ক্রমশঃ প্রসঙ্গক্রমে ভগবৎ-পূজার মাহাত্ম্য বল্‌তে সুরু কর্‌লেন যে, "ভগবান্‌ অত দয়ালু, তাঁকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যা কিছু ভক্তিভরে দেওয়া যায়, তা'ই তিনি সাদরে সাগ্রহে গ্রহণ করেন—তা'তেই তাঁর অসীম তৃপ্তি। আর যথাসাধ্য উপকরণসহ ভক্তিভরে নৈবেদ্য দিলে যে ভগবান কত সুখী হন, তা'তো বলাই অসাধ্য। ভগবানের দয়ার কথা বিশেষ কি বল্‌ব, যার সাধ্য নেই ভগবান্‌কে মনের মত পূজা কর্‌তে, সে যদি মনে মনেও ঐ সব উপকরণ তৈরী ক'রে মনে মনেই পূজা দেয়, তাই ভগবান্‌ আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন"। বক্তা, এই সব কথা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে ও উদাহরণ দিয়ে এমন ভাবে মূর্ত্তিমতী ক'রে তু'লে

ছিলেন, যা'তে শ্রোতারা সকলেই হৃদয়ের মাঝে কথাগুলিকে নিখুঁত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

(২)

একপাশে ব'সে কথা শুন্‌ছিলেন একজন দরিদ্র-ব্রাহ্মণ, তাঁর নাম ছিল দামোদর। বাতাসে যেমন ধীরে ধীরে চাঁদের উপর থেকে কালোমেঘ খানিকে সরিয়ে নিলে, চাঁদ উজ্জ্বল ও জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত হ'য়ে উঠে, সেরূপ, পাঠকের কথা-চাতুর্য্যের মৃদু-বাতাসে সঞ্চালিত হ'য়ে ঐ দরিদ্র-ব্রাহ্মণের মানবাত্মার মেঘ কেটে' গেছিল, আত্মা-পুরুষটি, প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠে'ছিল।

তিনি যেন মানসচক্ষে দেখ্‌তে লাগলেন, তাঁর প্রভু যেন মণিরত্ন-খচিত এক বিচিত্র সিংহাসনে সমাসীন হ'য়ে আছেন। প্রভুর শ্যামল স্নিগ্ধ দেহের মৃদু ও কোমল আলোকে মণ্ডিত হ'য়ে দশ দিক যেন উদ্ভাসিত, তাঁর স্নেহ-কোমল নয়ন দুটী সবাইকে করুণা-ধারায় সিক্ত করতেই যেন উদ্‌গ্রীব। সমস্ত দেহখানা যেন প্রীতিময়, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-সুশোভিত চার হাত, আশ্রিত জনের সুখসৌন্দর্য্য দান করতেই যেন সতত উদ্যত। প্রভুর চরণতলে নিজে যেন পাদ-সম্বাহনে রত, এটাই যেন ব্রাহ্মণের ঠিকরূপ—এতেই যেন ব্রাহ্মণের বাস্তব সত্যের পূর্ণবিকাশ।

ব্রাহ্মণের মন গ'লে গেছিল। ঝর্ ঝর্ ক'রে দু'চোখ ব'য়ে অশ্রু নির্গত হ'তে লাগ্‌ল। ব্রাহ্মণ কাঁদ্‌ল, এ কান্না দুঃখের নয়—আনন্দের কান্না; এ কান্না, ভগবানের চিহ্নিত দাসেরই অনুভূত, অন্যে এর স্বাদ জানে না।

কথা শুন্‌বার পর, বক্তার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে ব্রাহ্মণ বাড়ী গেলেন।

(৩)

ওদিন হ'তে দামোদর-বিপ্রের ইচ্ছে হ'ল, রাজ-উপচারে ভগবানের পূজা করতে। কিন্তু সে দরিদ্র, তার কিছুই নেই; তবু মনের বলবতী বাসনা। মনে যা' তা' বাসনা হ'লেই তো হ'ল না—চাই টাকা—নইলে রাজ-উপচারে পূজা চল্‌বে কিরূপে? মনের এই অসমীচীন বাসনার জন্যে ব্রাহ্মণ, মনে মনে খুব লজ্জিত হ'লেন এবং ভাব্‌লেন, আমার অবস্থা হ'য়েছে বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেওয়ার মতন।

কিন্তু কি কর্বেন, মনকে তো মানান যায় না। মনকে ঠেকায় কে? এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে মন যেতে পারে না; মন, রাজা হ'তে চায়—ইন্দ্র হ'তে চায়—ব্রহ্মলোকে ভ্রমণ কর্‌তে চায়। মানুষকে জীবজন্তুকে বাধা দেবার সমাজ আছে—রক্ষক আছে; মনকে বাধা দেবার তো কেউ নেই। তার যখন যেদিকে রোখ চাপে, তখন সেদিক থেকে ফিরায় কার সাধ্যি? রাজ-উপচারে পূজা কর্‌বার অদম্য বাসনা ব্রাহ্মণ কিছুতেই ফেরা'তে পার্‌লেন না; বাসনার প্রবল প্রবাহ, তীব্র বেগে ব্রাহ্মণকে ভাসিয়ে নিয়ে চল্ল—অধীর ক'রে তুল্ল।

ব্রাহ্মণ, যখন নিজের মনের মতন ক'রে সাক্ষাৎ পূজা করতে পার্‌লেন না; তখন মন-রাজ্যেই রাজ-প্রাসাদ তৈরী ক'রে—রাজ-উপচারে ভগবানকে পূজা ক'রে মনকে খুশী করার বন্দোবস্ত কর্‌তে লাগ্‌লেন।

তিনি স্বরস্বতী নদীর পুণ্য সলিলে স্নান ক'রে পূত হ'য়ে নিজের নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে কল্পনার রাজ্যে মুহূর্ত্তের মধ্যেই এমন এক মন্দির গ'ড়ে তুল্লেন, যার মত মন্দির ভূ-ভারতে নেই, যা' সম্পূর্ণ নূতন; যার প্রতি অবয়ব একেবারে নিজের মনের মতন; শুধু মণি-রত্ন-হীরাময়। এমন সুন্দর প্রাসাদ মর্ত্ত্যের কথা দূরে, স্বর্গেও কেউ কখনো করতে পেরেছে কি না সন্দেহ। তার মধ্যে বড় সাধে মণিরত্নময় দিব্য সিংহাসনে নিজের প্রাণের দেবতাকে সাদরে বসিয়ে এবার বিভোর হ'য়ে একেবারে নিজের মনের মত রাজ-উপচারে এমন সেবা কর্‌তে লাগ্‌লেন, যা' মহারাজাধিরাজও চালা'তে পারে না। বহির্জ্জগৎ হ'তে ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ ক'রে কল্পিত রাজ্যেই ডুবিয়ে দিলেন। লোকে তাঁর অবস্থা দেখে' অবাক হ'য়ে বল্‌ত উনি একেবারে সমাধিস্থ হ'য়ে গেছেন; এজগতে আর নেই। বাস্তবিকই যতক্ষণ তিনি মানসিকী সেবায় রত থাকৃতেন, ততক্ষণ ব্যবহার-জগতের কোনো বিষয়ই তাঁর হৃদয়ের দরবারে উঁকি মার্‌তে পার্‌ত না। তিনি ডুববার মত ডুবে যেতেন; একেবারে বিভোর হ'য়ে আবিষ্ট হ'য়ে পড়তেন; এজগৎ হ'তে এমন এক আনন্দের দেশে গিয়ে যেন পৌছ্‌তেন, যে খানের প্রতিমুহূর্ত্তই শুধু সুখপ্রদ, শান্তিপ্রদ, এবং অসীম আরামপ্রদ।

এমন ভাবে ব্রাহ্মণের দিনগুলো ধীরে ধীরে অতিবাহিত হ'তে লাগল।

(৪)

একদিন ব্রাহ্মণ, মনে মনে ভগবানের রাজ-উপচারে পূজা সমাপ্ত ক'রে ব'সে আছেন। তখন গ্রামস্থ জনৈক বিশিষ্ট লোক, ব্রাহ্মণের সহিত দেখা করতে এসেছেন, তিনি এসে ব্রাহ্মণের একটি আঙ্গুল নেকড়া দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা দেখে' বলতে লাগলেন, "আপনার হাতে কি হয়েছে? আপনার হাতের আঙ্গুলটি বাঁধা কেন"

ব্রাহ্মণ, একটু লজ্জিত হ'য়ে বল্লেন, "আঙ্গুলটা পুড়ে' গেছে"।

"কি ক'রে পুড়ল"?

ব্রাহ্মণ, লজ্জিত ভাবেই বলতে লাগলেন, "খুব লজ্জার কথা, সেদিন গ্রামে পুরাণ পাঠ শুনা হ'তে আমার মনে বলবতী বাসনা জন্মে,—ভগবানকে রাজ-উপচারে পূজা করব—যেমন বৈকুণ্ঠে তাঁর নিত্য সেবা হয়। কিন্তু সেরূপ টাকাই বা কোথায়? সে সৌভাগ্যই বা কোথায় পাব? মনকে কতভাবে বুঝালুম, কিন্তু সে কিছুতেই প্রবোধ মান্‌লেনা; অগত্যা আমি মনে মনেই রাজ-পুরী নির্ম্মাণ করে মনে মনেই রাজ-উপচারে পূজা করতে সুরু করলুম।"

"বা! একেইতো রাগানুগা ভক্তি বলে, আমি এ রকম একটা স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আসতে পারে বলে' বিশ্বাস করতুমনা, আপনার অবস্থা শুনে' আমার সন্দেহ দূর হ'ল। তার পর?"

তারপর একদিন আমার চিন্তিত রাজ্যেই ভগবানের ভোগের উপযোগ্য কিনা পরীক্ষা করতে অন্তশ্চিন্তিত পরমান্নে আঙ্গুলটি ডুবিয়ে দেই। তখন যেন মনে মনেই বুঝলুম, ঐ পরমান্ন অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল এবং আমার আঙ্গুল পুড়ে গেছে। পূজা সমাপ্তির পর যখন একটু বাইরের জগতে দৃষ্টি দিলুম, তখন দেখ্‌লুম, বাস্তবিকই আমার আঙ্গুলটি পুড়ে' গেছে। তখন খুব বিস্মিত হলুম যে, অন্তশ্চিন্তিত পরমান্নও কি উত্তপ্ত হ'তে পারে? কিম্বা হাত পোড়া'তে পারে?

"তা' হ'লে ও'দিনকার পাঠক ঠাকুরের সব কথা যে সত্য, এর নজীর হ'য়ে গেল। কারণ, যদি মনের পরমান্নের উত্তাপেই বাইরের দেহের হাত পুড়তে পারে, তাহ'লে মনের পূজা যে ভগবান্ গ্রহণ করবেন, এতে আর সন্দেহ কি? এটাই জগতের নিকট দেখিয়ে দিতে বোধহয় আপনাকে দিয়ে ভগবান্ এ লীলার অবতারণা করেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ"।

আত্ম-প্রশংসা শু'নে স্বভাবতই ব্রাহ্মণের মস্তক অবনত হ'ল।

* * * * *

পুরাণে বর্ণিত আছে, ভগবান্ নিজে এসে ব্রাহ্মণকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ।

আমার প্রকৃত বন্ধু কে ?

এই জগতে বস্তুমাত্রেরই একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, একটী বস্তু অপর একটী বস্তুর সহায়তা অপেক্ষা করে। তদ্ব্যতীত তাহা তত দূর শোভা প্রাপ্ত হয় না। যেমন মাণিক অমূল্য হইলেও স্বর্ণের অপেক্ষা করে। কারণ, পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিয়া কেবল মাণিক অধিক সৌন্দর্য্যশালী হয় না। কিন্তু যখন ঐ মাণিক স্বর্ণ-নির্ম্মিত কোন অলঙ্কারের উপর সন্নিবেশিত হয়, তখন তাহা পরম মনোরম হয়। এইরূপ পদ্মের শোভা সূর্য্যোদয়কে অপেক্ষা করে; চন্দ্র রাত্রিকালকে অপেক্ষা করে ইত্যাদি।

এই প্রকার মানবচিত্তও অন্য একটি নিজের অনুরূপ মানবচিত্তের আনুকূল্য লাভের জন্য স্বতঃই উৎকণ্ঠিত থাকে। তাহাকে না পাইলে সে যেন জগৎ-সংসারটাকে ফাঁকা ফাঁকা মনে করে। কেবলই তাহার মনে হয়, তার বুকের মধ্যে যেন একটা আসন কাহারও জন্য শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। যতক্ষণ ঐ আসনে নিজের অভীষ্টকে উপবেশন করাইতে না পারে, ততক্ষণ স্বস্তি নাই।

কোন কোন দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ঐ আসনে একটা পশু বা পক্ষী বসাইয়াই তৃপ্তি লাভ করে। কেহ বা সৌভাগ্যবশতঃ সে স্থানে দেবতার স্থান নির্দ্দেশ করে। তবে মনুষ্যের প্রীতি মনুষ্যের প্রতিই সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়।

---

* প্রতিষ্ঠান-পুরের ব্রাহ্মণের কথা পুরাণে প্রসিদ্ধ। মানসিকী পূজার সার্থকতা দেখা'তে শ্রীজীব গোস্বামি-পাদ ভক্তিরসামৃতের টীকায় এবং ক্রম-সন্দর্ভে তা' উদ্ধৃত ক'রেছেন। তাহাই এ উপাখ্যানের উপাদান। —লেখক।

প্রীতির পাত্র বন্ধুর নিকটে আমরা হৃদয়ের কপাট খুলিয়া সকল কথা প্রকাশ করি। তার মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল অনুভব করি। তাকে কোন দ্রব্য দিতে পারিলেই দ্রব্যের সার্থকতা বোধ করি। এবং তাহার আনুকূল্য করাই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি। মহারাজ ভরত যখন মৃগশিশুতে প্রীতি করিতেন, তখন তিনি ভাবিতেন, "অয়ি বসুন্ধরে! তুমিই ধন্যা, যেহেতু তুমি আমার মৃগশাবককে বক্ষে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। হে চন্দ্র! তোমার তুল্য পুণ্যবান আর কে আছে? কারণ, তুমি তোমার কিরণ দ্বারা আমার মৃগশিশুর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ।"

প্রীতির স্বভাবই এই প্রকার। ইহাতে মানুষের বাহ্যবিষয়ের অনুসন্ধান পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া দেয়। প্রীতির আস্পদ মিত্রকে দর্শন করিলেও নয়নের আনন্দ-মহোৎসব উপস্থিত হয়।

"মিত্রং স্নিগ্ধরসাঞ্জনং নয়নযোরানন্দনং চেতসঃ॥"

কিন্তু আমরা যাহাদিগকে মিত্র বলিয়া অভিমান বা সম্বোধন করি, তাহারা প্রকৃত মিত্র নহে, তাহারা পদ্মের ভ্রমর। যত দিন পদ্মে মধু থাকে, ততদিন ভ্রমর থাকে। শেষে মধুশূন্য-পদ্মকে ত্যাগ করিয়া ভ্রমর অন্য স্থানে উড়িয়া যায়। আমরা যাহাদিগকে বন্ধু বলি, তাহারাও এইরূপ। স্বার্থের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। প্রকৃত বন্ধু কেহ নহে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

আবার আমরা যাহাকে মিত্র বলি, তাহার প্রতি আমাদের যে প্রীতি, তাহা কি পরিমাণ, একটু আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়।

আমরা প্রীতি করি আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে। কিন্তু যখন আমরা মস্তকের বা উদরের যন্ত্রণায় অস্থির হই, তখন যদি কোন আত্মীয় আসিয়া প্রীতি-সম্ভাষণ করে, তবে আমরা বলিয়া থাকি "এখন সরিয়া যাও ভাই! দেহ অসুস্থ, এ সময়ে এ সব কথা ভাল লাগে না।"

এ স্থলে দেহ সুস্থ নহে বলিয়া আমরা যাহাদিগকে বন্ধু বলি, তাহাদের সহিত প্রীতিময় ব্যবহার করিতে পারিলাম না। অতএব আত্মীয়-স্বজন

হইতেও দেহ আমাদের নিকট অধিক প্রিয়, ইহাই পরিলক্ষিত হইল। কারণ, আনুকূল্য করাই হইতেছে প্রীতির স্বভাব।

আমরা নিজ দেহের প্রতি প্রীতিবশতঃ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মীয়-পরিজন, স্ত্রী, এমন কি প্রিয়তম পুত্রকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি। ইহার প্রমাণের অভাব নাই। একব্যক্তি দুইটী বালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া জলপথে ভিন্নদেশে যাইতেছিল। পথিমধ্যে দৈবদুর্ব্বিপাকে হঠাৎ তাহাদের নৌকা জলমগ্ন হইল। পিতা দুই পুত্রকে দুই হস্তে ধরিয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। কিছু সময় পরে যখন শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, তখন নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটী পুত্রকে ছাড়িয়া দিল। অবশেষে যখন আরও ক্লান্ত হইল, তখন আর দ্বিতীয় পুত্রটীকেও ধরিয়া রাখিতে পারিলনা, তাহাকেও হাত হইতে জলে ফেলিয়া দিল। পরে তীরে উঠিয়া বলিল "আঃ ছেলে যাউক, নিজে ত বাঁচিলাম!" এই প্রকার আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য পুত্রকে বাঘের মুখে সমর্পণ করার কথাও শুনা যায়।

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে দেখা যায়, আমরা আমাদের দেহ রক্ষা করার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি। তবে এরূপ উদাহরণও দেখা যায় যে, কেহ কেহ প্রিয়ের জন্য পাগল হইতেছে, কেহ বা প্রণয় করিয়া সর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেছে। তাহার কারণ এই,—"তাকে (প্রিয়কে) চাই, এই সম্বন্ধে তাকে চাই এবং এই প্রকারে তাকে সুখী করিতে চাই" এই বাঞ্ছাত্রয়ের সমষ্টিই প্রীতি। যাহারা কোন প্রকার আত্মসুখানুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র এই তিনটী বাসনাই হৃদয়ে পোষণ করে, তাহারাই অভীষ্ট জনের অপ্রাপ্তিতে, কিম্বা তাহার অভাবে বিরহ-তাপক্লিষ্ট হইয়া উন্মত্ত বা সর্ব্বস্বান্ত হয়। অবশেষে উক্ত অভাব-বোধ অসহ্য হইলে নিজদেহ-প্রীতিকেও উপেক্ষা করিয়া মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করে। কিন্তু স্বার্থময় এই জগতে এ ভাব অতি বিরল।

আমরা ঐ বাঞ্ছা-তিনটী বুকে পোষণ করি বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য,—এরূপ করিয়া আমরা নিজে একটা সুখ পাই। যখন কাহারও বিষয়ে এ ভাব বুকে ধরিয়া সুখ না পাই, তখন তার বিষয়ে আমাদের প্রীতিও জন্মায় না। অতএব আত্মসুখ চরিতার্থ করার সূক্ষ্ম বাসনা থাকে

বলিয়া দেহের প্রতি লক্ষ্য আসে, এবং তজ্জনিত মমতা বশতঃ আমরা অভীষ্টের অভাব হইলেও, সে বিরহ সহ্য করিতে সমর্থ হই। অল্পদিন একটু কষ্ট হয় বটে, পরে কিন্তু তাহার স্থানে অন্য এক জনকে বসাইয়া চিত্ত বিনোদন করি।

কিন্তু দেহের প্রতি এ প্রীতিও স্থায়ী নহে। যখন লোকে বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত হয়, শরীরের মাংসসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে, চলিবার শক্তি থাকে না, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি চিরতরে অন্তর্হিত হয়, তখনও মানব মনে করে "দেহ যাউক, কিন্তু প্রাণটা থাকিলেই হয়।" মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া একদিনও বাঁচিয়া থাকা সকলেরই অভিপ্রেত।

অতএব দেহ হইতেও আত্মাতে অধিক প্রীতি দেখা যাইতেছে। শঙ্করাচার্য্যও বলেন,—"কিমু প্রিয়ং প্রাণিনামসবঃ।" অন্যত্রও দেখা যায়, "দেহোঽপি মমতাভাক্ চেৎ ন হসাবাত্মবৎপ্রিয়ঃ।"

কিন্তু এই যে আত্মপ্রীতি, ইহাও প্রতি দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মাতে নহে, পরমাত্মাতে। ইহার কারণ,—জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটী পক্ষী একত্রে সখ্যভাবাপন্ন হইয়া, দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে। তন্মধ্যে জীবাত্মা-রূপ পক্ষীটী সুখ দুঃখরূপ স্বকর্ম্ম-জনিত ফল নিরন্তর ভোগ করে। এবং পরমাত্মারূপ পক্ষীটী কোন প্রকার ফল ভক্ষণ না করিয়াও প্রদীপ্ত ভাবেই অবস্থান করে। এই ভাবে থাকিয়া জীবাত্মা মায়াজালে আবদ্ধ ও মুহ্যমান হইয়া অশেষ প্রকারে শোক ভাজন হয়। অনন্তর এই প্রকারে যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে যখন জীবাত্মা আপনা হইতে বিভিন্ন পরমাত্মাকে নিজের সেব্য এবং নিজেকে তার দাসরূপে বুঝিতে পারে, তখন তাহার শোকের মাত্রা লাঘব হয়। এবং সুস্থভাবে পরমাত্মার মহিমা ধ্যান করে। এই বিষয় শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে কথিত আছে, যথা,—দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি, নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনিশয়া শোচতি, মুহ্যমানং জুষ্টং যদা পশ্য-ত্যন্যমীশং অস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।

এক্ষণে বুঝা গেল, যখন জীবাত্মাই নিজে দুঃখভোগী ও মায়ামুগ্ধ, এবং সেই যখন সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে নিজের সেব্য বলিয়া পূজা করে, তখন

পরমাত্মাতে প্রীতি জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক। সুতরাং পরমাত্মাই বন্ধু।

এ মাসে এই স্থানেই এ প্রবন্ধের পরিসমাপ্ত করা হইল। কিন্তু এই পরমাত্মাও যে আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহে, তাহা আগামী সংখ্যায় দেখাইবার আশা রহিল।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত ব্যাকরণতীর্থ।

যমুনা।

বহেনা যমুনা উজান আজিকে
পূর্ণ মিলনানন্দে আর।
আপনার নীরে আপনি মিশায়
দুটী নয়নের অশ্রুভার।
নীরব কুঞ্জ পলকে শিহরি
তন্দ্রার ঘোরে গাহে যদি শারী
চমকিয়া যায়, দুরু দুরু দুরু
আসে নাকো হৃদিস্পন্দ তার।
পুলিনে তাহার বেজে গেছে কবে
রাধানামে সাধা বাঁশীটী
কুঞ্জকানন মুখরিত করি
উঠাইল তার হাসিটী—
সে সব কাহিনী স্মরিয়া স্মরিয়া
মরমের ব্যাথা মরমে দহিয়া
উপল-ব্যথিত সঙ্খলিত-চরণে
উছল গতি মন্দ তার।

শ্রীকালীপদ ভাক্ষিত এম, বি।

মঙ্গলময়।

তুমি মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ,
আমি অধম পাপিষ্ঠ অজ্ঞ,
বিফলতা-রূপে সফলতা দিয়ে,
মোরে মঙ্গল মাঝে রেখেছ।

বলি'—ইষ্ট জলে করিব স্নান
অনিষ্ট জলের ক'রেছি সন্ধান ;
মরুভূমিতে লইয়া গিয়া
স্নানের পিপাসা মিটায়েছ।

শ্রীসূর্য্যকান্ত মণ্ডল।

সম্পাদক-সঙ্কট।

রোগীর পক্ষে যেমন কখন কখন বৈদ্য-সঙ্কট উপস্থিত হয়, অর্থ্যাৎ দুই জন বৈদ্য রোগীর রোগ নির্ণয়ে ও নিজ মতানুসারে ব্যবস্থামত ঔষধ প্রয়োগে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন দ্বারা রোগীর অবস্থা রোগের যন্ত্রণা-কষ্ট অপেক্ষা আরও বিষম ও ভীষণ করিয়া ফেলেন, তখন রোগী মহাসঙ্কটে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। প্রবন্ধ-লেখকের পক্ষে তেমনই সম্পাদন-সঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনিও প্রায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকেন। আমি একজন ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-লেখক, আমারও দেখিতে'ছি সেই দশা উপস্থিত। তাই নিজ অবস্থা জানাইবার অভিপ্রায়ে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিলাম। আশা করি, সাধনার পাঠক-পাঠিকাগণ আমার এ প্রগল্‌ভতা বা ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

বিগত শ্রাবণ মাসের সাধনায় আমি "ভক্তিপ্রিয় মাধব" নামক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রবন্ধের প্রথমেই পদ্যাবলী হইতে একটী শ্লোক

উদ্ধৃত করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ লিখিয়াছিলাম :—"বল-বিক্রম বা সদাচার প্রভৃতি কোন গুণেই ভগবান্ বশীভূত হয়েন না। তিনি কেবল ভক্তিই ভালবাসেন।" 'সদাচার' কথাটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাধনার সম্পাদক মহাশয় 'সদাচারের নিত্যত্ব' সম্বন্ধে একটু মন্তব্য প্রকাশ-চ্ছলে লিখিয়াছিলেন "যাহা হউক, সদাচারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশ্য নহে।" ইত্যাদি। সম্পাদকের মন্তব্য পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, সদাচার সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া আমার মনোভাব প্রকাশ করিব এবং ঐ বিষয়ের আলোচনা করিয়া সকল বিষয় জানাইব। আমার আরও একটী বক্তব্য এই যে, বঙ্গানুবাদে যে "সদাচার" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তাহাও আমার নিজের নয়। উদ্ধৃত শ্লোকের অনুবাদে অনেক মহাশয়ই ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক, সম্পাদক-মহাশয় যে আমার ভুল ধরিয়াছেন, এ হৃদ্বোধ বা বিশ্বাস আমার হয় নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীসোনার-গৌরাঙ্গ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় ভাদ্র মাসের পত্রিকার ১২৭ পৃষ্ঠায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে যুগপৎ দুঃখিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন "দুঃখের কথা, অশীতিপর বৃদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি, এ, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের ভুল ভাঙ্গিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় নিজেই মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন।" সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, আমি এখনও অশীতিপর হই নাই, সপ্ততির মধ্যেই আছি। আমার বয়স নির্দ্দেশ বা উপাধি উল্লেখ দ্বারা আমার প্রবন্ধের গৌরব বা লাঘব সূচিত হইয়াছে কি না জানি না, তবে এ নির্দ্দেশের যে কোন প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা আছে, তাহাও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না।

সাধনার সম্পাদকের মন্তব্যও পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে তিনি যে আমার কি ভুল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও বুঝিলাম না। যাহাই হউক, সম্পাদকদ্বয়ের মধ্যে যে মত-পার্থক্য বা ভাব বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া লইবেন, অথবা আপন আপন মন্তব্যের সমর্থন জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহার ব্যবস্থা করিবেন, তৎসম্বন্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

আমার বিনীত নিবেদন, আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সম্বন্ধে যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। আর 'সদাচার' এই কথাটীর প্রয়োগে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাও সরলভাবে জানাইলে এবং সম্পাদকদ্বয়ের প্রকৃত মনোভাব অভিব্যক্ত করিলে সুখী হইব। আমার প্রবন্ধের কোন কথা লইয়া আন্দোলনে যদি তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব বা বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহাও অতীব আক্ষেপের বিষয়। সরল ভাবে ও সহজ কথায় যাহাতে আমার এ সঙ্কট মোচন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেই আমি অনুগৃহীত ও উপকৃত হইব। অলমধিকেন ইতি

বিনীত নিবেদক—

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

মন্তব্য।—শ্লোকের অনুবাদে শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধলেখক রায় মহাশয় যে "সদাচার" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করি নাই, এখনও করি না। মূলের "গুণৈঃ" শব্দের অনুবাদে তিনি "সদাচারাদি-গুণসকলের দ্বারা" লিখিয়াছেন; সদাচারও একটা গুণ; সুতরাং "গুণৈঃ" শব্দের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদে "সদাচারাদি গুণসকলের দ্বারা" লিখিলে দোষ হয় বলিয়া মনে হয় না।

তথাপি যে আমরা টিপ্পনী দিয়াছিলাম, তাহার হেতু এই:—আজকাল এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সদাচারের পক্ষপাতী নহেন; শ্রদ্ধেয় রায়মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক এবং অনুবাদের মর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া উক্ত শ্লোক ও অনুবাদকে তাঁহারা হয়তঃ তাঁহাদের অনুকূল প্রমাণ বলিয়াই মনে করিতে পারেন; তাই আমরা সদাচারের নিত্যতাজ্ঞাপক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি—প্রবন্ধলেখক রায়মহাশয়ের ভুল দেখাইবার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না; প্রবন্ধে কোনও ভুল আছে বলিয়াও মনে করি না।

রায়মহাশয়ের (এবং শ্লোকের) অভিপ্রায় আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহা টিপ্পনীতেই লিখিয়াছি; তাহা এই:—অন্তরে যদি ভক্তি (অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সেবায় প্রবৃত্তি) না থাকে, তাহা হইলে কেবল বাহ্যিক সদাচারে শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন না।" এই উক্তির অনুকূল শাস্ত্রীয় প্রমাণও আমরা দিয়াছি (সাধনা, শ্রাবণ, ২৩০ পৃঃ)।

সদাচার-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নাই। আমরা যাহা বুঝিয়াছি, সংক্ষেপে বলিব। বিধি-নিষেধের পালনই সদাচার। যত রকম বিধি আছে, তাহাদের মূল বিধি একটি—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি; আর যত রকম নিষেধ আছে, তাহাদের মূলও একটি—শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি। অন্য যত বিধিনিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই উক্ত মূল-বিধিনিষেধদ্বয়ের অনুপূরক ও পরিপূরক।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যু রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

নববিধ-সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির উন্মেষক ও পরিপোষক; তাই তত্তৎ অনুষ্ঠানের বিধি। গ্রাম্য-বার্ত্তা, বৈষ্ণব-নিন্দন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির আবরক, শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতির পোষক, তাই তাহাদের নিষেধ। এই সমস্ত বিধি-নিষেধের পালনই সদাচার।

সদাচার পালন দুই রকমে হইতে পারে—এক শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন পালন, অপর শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিযুক্ত পালন। ইষ্টদেবতার চরণে তুলসী দেওয়ার বিধি আছে; চিত্রপটে বা শ্রীবিগ্রহে তুলসীও দিলাম; কিন্তু তুলসী দেওয়ার সময় মনে শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিন্তা থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যদি শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিন্তা মনে থাকে, তাহা হইলেই তাহা প্রকৃত সদাচার হইল। আর তুলসী দেওয়ার সময় যদি শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিন্তা মনে না থাকে, মন যদি অন্য কোনও বিষয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে, মূলবিধি যে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি, তাহা পালিত হইল না—ইহা কেবল বাহ্যিক সদাচার মাত্র হইল। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন বাহ্যিক সদাচারে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হয়েন না—ইহাই রায়-মহাশয়ের শ্লোকানুবাদের তাৎপর্য্য বলিয়া আমরা মনে করিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই মূল সদাচার। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসও একথাই বলিয়াছেন।

স্মরণাত্তস্য কস্যাপি সদাচারস্য নিত্যতা। ৩।৬

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন:— "নহু ভগবৎস্মরণাদের্নিত্যতয়া সদাচারস্য নিত্যতা কথমস্তু, তত্র লিখতি স্মরণাত্তস্য কস্যেতি। সদাচারস্যৈব তল্লক্ষণত্বাদিত্যর্থঃ—ভগবৎস্মরণই সদাচারের লক্ষণ।"

সাধনভক্তির যতগুলি অনুষ্ঠানের কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে—স্নান, তিলক-ধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া—সমস্তের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির ব্যবস্থা; কারণ,

শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই মূলবিধি। সুতরাং ভক্তির প্রাণও শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই। ভক্তির যে অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি নাই, তাহাকে প্রকৃত সদাচার বলা যায় না—তাহা বাহ্যিক সদাচার মাত্র; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন না।

সাক্ষাৎ-সেবায় প্রবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই সূচিত করে; তাই সাক্ষাৎ-সেবায় প্রবৃত্তি না থাকিলে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও অভিলষিত ফল পাওয়া যায় না—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের উক্তি।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ভক্তির দুই রকমের সুদুর্লভত্ব উক্ত হইয়াছে; এক রকম, যাহা কিছুতেই পাওয়া যায় না; আর এক রকম, যাহা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না—যতদিন পর্য্যন্ত ভুক্তিমুক্তি-বাসনা থাকিবে, ততদিন পাওয়া যায় না।

প্রথম রকমের সুদুর্লভা ভক্তি-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলেন

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।

"অনাসঙ্গ ভাবে বহু সাধনের দ্বারা সুচিরকালেও যাহা পাওয়া যায় না।"

আর দ্বিতীয় রকমের সুদুর্লভা ভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন

"হরিণা চাশ্বদেয়েতি।"

"যাহা শ্রীহরি সহসা দেন না।"

প্রথম রকমের সুদুর্লভা ভক্তি-সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন:—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

অর্থাৎ সহস্র সহস্র সাধন দ্বারাও হরিভক্তি লাভ করা যায় না। এস্থলেও অনাসঙ্গ-সাধনসহস্রের কথাই বলা হইয়াছে।

অনাসঙ্গ-সাধন কি? অনাসঙ্গ—আসঙ্গশূন্য। আসঙ্গ কাহাকে বলে? "জ্ঞানতঃ সুলভা" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—

"কারিকায়ামনাসঙ্গৈরিতি যদুক্তং তত্রচাসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ।—আসঙ্গ শব্দের অর্থ সাধন-নৈপুণ্য; সাধন-নৈপুণ্য কি? সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিই সাধন-নৈপুণ্য।"

সুতরাং যে সাধনে সাক্ষদ্ভজনে প্রবৃত্তি নাই, তাহাই অনাসঙ্গ-সাধন; এইরূপ শত সহস্র সাধনেও শ্রীকৃষ্ণভক্তি পাওয়া যায় না।

এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় :—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপ কবিরাজ-গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ" ইত্যাদি শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামীর অভিপ্রায় এই যে, অনাসঙ্গভাবে (সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভাবে) বহুজন্ম শ্রবণকীর্ত্তন করিলেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার অনুকূল অনেক প্রমাণ আছে।

ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন :—

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেদিতি যদ্ যদি বিপরীত-ভাবনাত্যাজকৌ মননযোগ্যতা-মননাভিনিবেশৌ স্যাতাং ততঃ শ্রদ্দধানৈঃ সা ভক্তিরুপাসনাদ্বারা লভ্যত ইতি। অতঃ শ্রুতিরপি তদর্থমাগৃহ্ণাতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। অত্র নিদিধ্যাসনমুপাসনং। দর্শনং সাক্ষাৎকার উচ্যতে। শ্রীমদ্ভা—১।২।১৩ টীকা।" ইহা হইতে বুঝা যায়, মননযোগ্যতা এবং মননে অভিনিবেশ দ্বারাই বিপরীত ভাবনা (শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য ভাবনা) ত্যাগ হইতে পারে ; শ্রীকৃষ্ণে মননযোগ্যতা এবং মননে অভিনিবেশ থাকিলেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ উপাসনা দ্বারা ভক্তিকে লাভ করিতে পারেন। তাহা না থাকিলে ভক্তি-লাভ হইতে পারে না। উক্ত প্রমাণে মনন-শব্দে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি এবং মননে অভিনিবেশ-শব্দে সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিই সূচিত হইতেছে ; কারণ, সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি না থাকিলে ভক্তির অনুকূল অভিনিবেশ সম্ভব হয় বলিয়া মনে হয় না।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিই বা শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই সাধনভক্তির প্রাণ—ইহাই সদাচারের প্রাণ ; সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন বা শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন সদাচার বা ভক্ত্যনুষ্ঠান কেবল বাহ্যিক সদাচার বা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র ; ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হয়েন না। তাই রায়-মহাশয়ের প্রবন্ধের সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা লিখিয়াছিলাম—"অন্তরে যদি ভক্তি (অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি) না থাকে, তাহা হইলে কেবল বাহ্যিক সদাচারে

শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন না।"

প্রথম অবস্থায় সাধকের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি বা সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি জাগ্রত না থাকিতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ স্মৃতি বা প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে, নচেৎ ভক্তির উন্মেষের সম্ভাবনা থাকিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।

[এস্থলে ভক্তি অর্থ সাধনভক্তি ; কারণ সাধ্যভক্তি ও প্রেম একই বস্তু।]

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

সমালোচনা।

The Universal Religion of Sri Chaitanya (শ্রীচৈতন্যের বিশ্বজনীন ধর্ম) ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, প্রণীত। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ জনৈক ভক্তের নিকটে এই পুস্তিকাখানি সমালোচনার জন্য আমরা দিয়াছিলাম। তাঁহার অভিমত নিম্নে ব্যক্ত করা হইল :—

"ভক্তবর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজী ভাষায় "শ্রীচৈতন্যের বিশ্বজনীন ধর্ম" নামক পুস্তিকা লিখিতে যে উদার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র হইলেও পুস্তিকাখানি, তাঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যে অটল বিশ্বাস আছে, তাহার পরিচায়ক, অবশ্যই বলিতে হইবে। তবে দুঃখের বিষয়, ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি বিষয়টী যেরূপ ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অস্ফুট হইয়াছে। 'প্রতিপাদ্য মহিম্না হি প্রবন্ধো হি মহত্তরঃ'—এই কারিকামাত্র আশ্রয় করিলে তাঁহার পুস্তিকা খানিকে ভালই বলিতে হইবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম-সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকের সংখ্যা অতি সামান্য। অথচ এই বিষয়ে ইংরেজীতে বিস্তৃত আলোচনাও খুবই আবশ্যক। তাই আমরা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যম দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তিনি যদি বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থাদি লিখিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব-সমাজের একটা স্থায়ী কাজ করিয়া যাইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস। আলোচ্য গ্রন্থখানি জিঃ ২৪ পরগণা, পোঃ পানিহাটিতে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

শ্রীশ্রীশারদ-রাস।

রসময় শারদ-নিশি সরস পূর্ণ চাঁদনি।
রসময় শ্রীবৃন্দাবন রস-মল্লিকা হাসনি॥
রসে যমুনা বহু উজান কোকিলা করু মধুর গান।
হেরি রস-শেখর বাঁশী ফুকারে রস-মাদনি॥

শুনি বাঁশরি রস-নাগরী ধাওল রস-অভিসারে।
আপনহারা রসবিভোরা বিছুরি গেহপরিবারে॥
রসিকাকুল রসিক মেলি আলাপি রস-কাহিনী।
রস-মোহন মোহন-রাসে মাতল রস-মোহিনী॥

পহিল রাসে রসিকাকুল আপনা মানি বহু ভাগি।
রস-শেখর বুঝই ভেল ততহি রসে দূরভাগি॥
ভাঙ্গল রাসে রোয়ই ফিরি পুছই কাহাঁ রসমণি।
ঢুরইতে হেরত এক মূরছি রসবিরহিণী॥

বিরহরসে তা সঞে মিলি রোয়ই গাওত রসিক-কেলি।
সরস গীতে সো রসরাজ উয়ল মৃদু হাসনি॥

বিপুল সুখে রস উথলি সবহু ঘেরি রসরাজে;
স্মিত হসন নটন রাগ-রাগিণী তাতে রস গাজে॥
উজল রসে উজল কালা উজলা গোপ-কামিনী।
ততহি কালা ততহি গোপী মাতল রাস-মোদিনী॥

শ্রীগোপীনাথ বসাক।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মঠ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সমিতি।

আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতেই আধ্যাত্মিক গৌরবে জগতের গুরু-পদবী অধিকার করিয়া আসিয়াছে। সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের

মুকুটমণি। তন্মধ্যে কলিযুগপাবনাবতার ঐ মর ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রবর্ত্তিত পরম পবিত্র "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম" জাতি-বর্ণ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে জগতের জীবের পক্ষে পরম কল্যাণপ্রদ। একমাত্র এই অত্যুদার ও সার্ব্বজনীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মই সমুদয় জগদ্বাসী নর-নারীকে এক মহাপ্রাণতায় আবদ্ধ করিতে সমর্থ।

কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই 'সত্যতত্ত্ব-সুসন্ধিৎসু' হইয়াও শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও তৎপ্রবর্ত্তিত পরম পবিত্র ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞই রহিয়াছেন। সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, আউল বাউল প্রভৃতি উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের অশাস্ত্রীয় বীভৎস কাণ্ডকারখানাই তাঁহাদের এতৎ-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার পরিপন্থী-স্বরূপ বলিয়া অনুমিত হয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে দেশময় নানাপ্রকার গ্লানির অভ্যুদয় হওয়াতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্কোচ অহরহঃই সজ্ঘটিত হইতেছে। যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত, সদাচার-পূত, গোস্বামিগণ-সেবিত, ঋষিগণ-নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র-যুক্তি-প্রোক্ষিত, সুনির্ম্মল শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-ভাস্কর সমুদিত হইয়া জগতের পূর্ব্বোক্ত ঘোর তামসিক অন্ধকার বিদূরিত করেন, তজ্জন্য ভুবন-মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের আরাধনা, গোস্বামিগণ-প্রকাশিত ভক্তি-শাস্ত্রাদির আলোচনা, এবং বিগ্রহ-স্থাপন, লুপ্ত-গ্রন্থোদ্ধার, নিষ্কিঞ্চন ভজনানুরাগী বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের যথাসাধ্য আনুকূল্য বিধান প্রভৃতি কার্য্যের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্তই আমাদের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং এই সমিতির কার্য্যালয় রূপেই 'শ্রীগৌরাঙ্গ-মঠ' প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রকৃত শাস্ত্র-জ্ঞান ও শাস্ত্রালোচনার অভাবেই দেশময় উপ-সম্প্রদায়ের এত বাহুল্য। দেশের মহা অভাব দূরীকরণার্থ আমাদের প্রস্তাবিত মঠে গোস্বামি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিবার বিশেষ প্রয়াস পাওয়া যাইবে। কোনও গোস্বামি-শাস্ত্রাভিজ্ঞ বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিতের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটী বৈষ্ণব দর্শন-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। তদতিরিক্ত পিতৃ-মাতৃহীন, অনাথ, দুঃস্থ ও দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষা এবং বিপন্ন ও নিঃস্ব রোগীদিগের সুচিকিৎসা বিধানের জন্য একটী আদর্শ বিদ্যালয় ও সেবাশ্রম ইহার সহিত সংবদ্ধ থাকিবে। সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদ ও সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি প্রার্থনা

করিতেছি। অলমতি বিস্তারেণ।

নিবেদক—
শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দাশ শর্ম্মা।
শোণপুর (লৌহগড়),
পোঃ হরিমঙ্গল, ত্রিপুরা।

[প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানটী কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের পক্ষে বড়ই মঙ্গলকর হইবে। এজাতীয় অনুষ্ঠানের সফলতার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু ততোধিক দরকার—ভগবদনুগৃহীত শাস্ত্রজ্ঞ ত্যাগী ভক্তের। এরূপ একজন যোগ্য ব্যক্তি প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিলে, অর্থের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আমরা এই অনুষ্ঠানের সফলতা প্রার্থনা করিতেছি। সাঃ সঃ]

প্রশ্নসমালোচনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর কর বি, এল, (বাজিতপুর ময়মনসিংহ) মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্ন কয়টী পাঠাইয়াছেন :—

১ম প্রশ্ন। (ক) গৃহী বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কি ভাবে ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হইবে? (খ) বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করণীয় কিনা (গ) মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবগণের পক্ষে করণীয় কিনা?

উত্তর। (ক) শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন, যদি একাদশীর উপবাস-দিনে শ্রাদ্ধের তারিখ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই দিন শ্রাদ্ধ না করিয়া তৎপর পারণের দিনই শ্রাদ্ধ করিবে। উক্ত গ্রন্থের ১২ শ বিলাসের ২৯শ শ্লোক-সমূহ উদ্ধৃত হইল :—

একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনেতু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥
—পদ্মপুরাণে।

"একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তদ্দিন বর্জ্জন পূর্ব্বক দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে।"

একদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং-মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎপ্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ ॥
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ ॥

—পদ্মপুরাণ।

"মাতাপিতার মৃতাহে একাদশী হইলে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; কদাচ উপবাসের দিনে শ্রাদ্ধ করিবেনা; কারণ, দেবতারা বা পিতৃলোকেরা নিন্দিতান্ন সেবন করেন না। (একাদশী দিবসের অন্নকে নিন্দিতান্ন বলা হইয়াছে।)

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশী দিনে।
এয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরত্রেকঃ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

"একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত তিন জনেরই নিরয় গতি লাভ হয়।"

একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ নিষেধের হেতু বোধহয় এই যে, প্রথমতঃ ব্রহ্মহত্যা-তুল্য যে সমস্ত পাপ আছে, তৎসমস্ত পাপই একাদশী-দিনে অন্নকে আশ্রয় করে।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানিচ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২।১২

দিনেঽত্র সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যান্নস্থিতানি তু।

ঐ ১২।১৪।

এজন্য ঐ দিনের অন্ন নিন্দিতান্ন; নিন্দিতান্ন দ্বারা প্রস্তুত পিণ্ডাদি পিতৃলোক গ্রহণ করেন না। "গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ।"

দ্বিতীয়তঃ—মৃতব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্তই শ্রাদ্ধ; কিন্তু "এয়স্তে নরকং যান্তি" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে যে, একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে মৃত-ব্যক্তির নিরয়-গতি হয়। তৃতীয়তঃ—বৈষ্ণব পিতৃগণ হরিবাসরের শ্রাদ্ধ গ্রহণও করেন না; কারণ, তাঁহারা বৈষ্ণব, হরিবাসরে তাঁহারা পিণ্ডাদি-অন্ন অঙ্গীকার করিতে পারেন না।

বৈষ্ণব-পিতৃণামপি শ্রীবিষ্ণু-দিনে শ্রাদ্ধগ্রহণা যোগ্যত্বং দিক্।—হরিভক্তিবিলাস ১২। ২৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণ।

চতুর্থতঃ—শ্রাদ্ধকার্যাটীই শ্রদ্ধার কার্য্য ; একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতে যাইয়া পিতৃগণকে নিষিদ্ধান্নাদি দ্বারা পিণ্ড দেওয়ায় কোনও শ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়না, বরং অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়।

এই গেল শ্রাদ্ধের দিন সম্বন্ধে বিশেষ বিধি। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের আর একটী বিধান আছে—পিণ্ড সম্বন্ধে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৯। ৮৭

"হরির নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্য দেবতার পূজা করা বিধেয় ; পিতৃদিগকেও বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নই অর্পণ করিবে ; তাহা হইলে উহা অক্ষয় ফলার্থে কল্পিত হইয়া থাকে।"

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥ ৯। ৮৪

"ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনে প্রথমতঃ ভগবানকে অন্ন প্রদান (নিবেদন) করিবেন ; সেই নিবেদিত অন্নদ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন।"

মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে বা অন্য দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু অর্পণ করিবে, তৎসমস্তই পূর্ব্বে বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে।

দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্বিনিবেদিতম্।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্যৈব হি॥ ৯। ৯০

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজনের মাহাত্ম্যও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যস্তু বিদ্যাবিনির্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্ভ্যোঽদদাচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ॥
সিক্থমাত্রন্তু যদ্ভুঙ্‌ক্তে অন্নং গণ্ডূষমাত্রকং।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্॥ ৯। ৯৭

"বিদ্যাহীন বৈষ্ণবকে মূর্খ বোধে, বেদবিদ্গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে তাহা রাক্ষসশ্রাদ্ধ হয়। বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গ্রাসপরিমিত অন্নভোজন করিলে,

সেই অন্ন সুমেরুসদৃশ হয়; আর গণ্ডূষপ্রমাণ জল পান করিলে, সেই জল সমুদ্রতুল্য হইয়া থাকে।"

সুরাভাণ্ডস্থ-পীযূষং যথা নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
চক্রাঙ্করহিতং শ্রাদ্ধং তথা শাতাতপোঽব্রবীৎ॥ ৯। ৯৮

"শাতাতপ বলিয়াছেন—সুরাপাত্রস্থ হইলে অমৃত যেরূপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট (কার্য্যের অনুপযুক্ত) হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণবহীন শ্রাদ্ধও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।"

ভোজনাদি-সময়ে বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের পংক্তিতে বসাইবে না।

নিবেশয়েদ্বৈষ্ণবো মোহাদন্যপংক্তৌ হরেঃ প্রিয়ম্।
স পতেন্নিরয়ে ঘোরে পঙ্‌ক্তিভেদী নরাধমঃ॥ ৯। ৯৮

"প্রমাদবশে বৈষ্ণবজনকে অবৈষ্ণবের পঙ্‌ক্তিতে প্রবেশ করাইলে সেই পংক্তিভেদী নরাধমকে ঘোর-নিরয়ে পতিত হইতে হয়।"

উল্লিখিত কয়টি বিষয় ব্যতীত শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় অন্য কোনও বিষয়ে হরিভক্তি-বিলাসে কোনও বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয়, এই বিশেষ বিধির সঙ্গে যোগ রাখিয়া শ্রাদ্ধ-সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়গুলি প্রচলিত বৈদিক স্মার্ত্ত বিধি অনুসারেই নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অবশ্য সমস্ত অনুষ্ঠানই যেন ভক্তির অনুকূল হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের বিধি। তাই বোধহয় দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রাদ্ধ-কালে মন্ত্রাদি পাঠের সময় বৈষ্ণবগণ "স্বর্গপ্রাপ্তি কাম" না বলিয়া "বিষ্ণুপ্রীতি-কাম" বলেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ভক্তির অনুকূল নহে; তাই বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান না করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করাই সঙ্গত; কারণ, এক শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই অপরাপর সমস্ত কার্য্য পূর্ণ হইতে পারে।

ইহার উত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, বৈষ্ণবের পক্ষে বৈদিক কর্ম্মত্যাগ বিধেয় বটে, কিন্তু বৈদিক-কর্ম্মত্যাগের একটা অধিকার-বিচার আছে।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বেদেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ-অবস্থা না জন্মে, অথবা যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথা-

শ্রাদ্ধাদিতে অচলা শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের উক্তি। যাঁহারা স্ত্রীপুত্র-পরিজনাদি লইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন—বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধিসাধনে তৎপরতা দেখাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মত্যাগের শাস্ত্রবিহিত অধিকার খুব কম লোকেরই থাকিবার সম্ভাবনা। যাঁহার সেই অধিকার জন্মিয়াছে, কর্ম্মত্যাগে তাঁহার প্রত্যবায় হইবে বলিয়া মনে হয়না। তবে আমাদের মনে হয়, কর্ম্মত্যাগের অধিকার-প্রাপ্ত নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিও যদি স্বীয় পরিজন-মধ্যে বাস করেন, তাহা হইলে, লোক-সংগ্রহার্থ তিনিও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ডের—অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—অবশ্য তাঁহার অনুষ্ঠানে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি কোনওরূপ শ্রদ্ধা বোধহয় দেখা যায় না। তাই উক্তরূপে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি উত্তমাভক্তির প্রতিকূল হয়না। "তেন লোকসংগ্রহার্থমশ্রদ্ধয়া পিত্রাদি-শ্রাদ্ধাদং কুর্ব্বতাং মহানুভবানাং শুদ্ধভক্তৌ নাব্যাপ্তিঃ।"

—ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

(গ) বৈষ্ণবেরা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করেন না বলিয়াই জানি। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, ইহাতে ভক্তির প্রতিকূল কোনও অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গ আছে।

পুরোহিতদর্পণে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়—বৃষের বাম পদমূলে দণ্ডোৎপল ও কুঙ্কুম (অভাবে হরিদ্রা) দ্বারা একটী ত্রিশূল ও একটী চক্র অঙ্কিত করার ব্যবস্থা আছে; পরে "উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা হরিদ্রাঙ্কিত ত্রিশূল ও চক্রচিহ্ন গোপালক দ্বারা পরিষ্কার করিয়া অঙ্কিত করিবে।—(৬০০ পৃঃ)" বৃষকে এবং একটী লোহিত বর্ণের বৎসতরীকে অগ্নি বেষ্টন করাইবার ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়।

উক্ত ব্যবস্থা হইতে দেখা যায়, উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা বৃষের পাদদেশ পোড়াইয়া ক্ষত করিয়া তাহাতে ত্রিশূল ও চক্র অঙ্কিত করিতে হইবে। ইহাই বোধ হয় ভক্তি-বিরোধী অনুষ্ঠান। "প্রাণী মাত্রে কায় বাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—ইহাই ভক্তি-সাধকের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা বৃষের গাত্র দাহ করাইয়া তাহাকে বিশেষ কষ্ট দিতে হয়; ইহা প্রভুর আদেশের প্রতিকূল। আবার, ভক্তি-শাস্ত্রমতে গো-পূজাও একটী ভক্তি-অঙ্গ—"ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব সেবন"। যাহাকে পূজা করিবার ব্যবস্থা,

বৃষোৎসর্গে তাহার অঙ্গবিশেষ দগ্ধ করিয়া তাহাকে বিশেষ কষ্ট দিতে হয়।

বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধে বৃষের উৎসর্গই প্রধান কার্য্য; ত্রিশূলাদি-চিহ্ন অঙ্কন এই উৎসর্গের একটী প্রধান অঙ্গ; পুরোহিতদর্পণে ইহাকে "প্রকৃত কর্ম্ম" বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার অকরণে বোধ হয় বৃষোৎসর্গ অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। অথচ ইহা ভক্তি-বিরোধী, তাই বোধ হয় বৈষ্ণবগণ বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ তাঁহাদের অকরণীয় বলিয়া মনে করেন।

(গ) বৈষ্ণব মাত্রেরই মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ করার ব্যবস্থা হরিভক্তিবিলাসে দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।

২য় প্রশ্ন ঃ—মহাগুরু-নিপাতে মালা-তিলক রাখা এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ—মালা-তিলক ধারণ এবং বৈষ্ণবোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি বৈষ্ণবের সাধন-ভক্তির অন্তর্ভুক্ত। সাধন-ভক্তি-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্র দশাতে ব্যাপ্তি যায়। চৈঃ চঃ।

সকল স্থানে, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতে সকলের পক্ষেই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। অবস্থা-বিশেষে বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনাদি নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি কোনও সময়েই নিষিদ্ধ নহে; সন্ধ্যা-বন্দনাদিতে মালা-তিলক-ধারণ অবশ্যকর্ত্তব্য; সুতরাং কোনও অবস্থাতেই বৈষ্ণবের পক্ষে মালা-তিলক ধারণ নিষিদ্ধ নহে।

বৈষ্ণবের মালা-তিলক বোধহয় ব্রাহ্মণের উপবীতের ন্যায় সকল সময়েই ধারণীয়।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণবের একটি লক্ষণ বলা হইয়াছে—"নিত্যাচারাদবিপ্লুতঃ—১২।১৬৩। যিনি কখনও বৈষ্ণবাচার হইতে চ্যুত হয়েন না।" কোনও সময়ে মালা-তিলক-ধারণ না করিলে তাঁহাকে বৈষ্ণবাচার হইতে চ্যুত হইতে হয়।

মালা-সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

ন জহ্যাত্তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ।
মহাপাতকসংহন্ত্রীং ধর্ম্মকামার্থদায়িনীম্॥ ৪।১২১

"তুলসী মালা, বিশেষতঃ ধাত্রীমালা পরিত্যাগ করিতে নাই; উহা মহাপাপ ধ্বংস করে এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম প্রদান করে।

পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেও পূরক-পিণ্ড-দান ও উদক-ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে; এ সমস্ত পিতৃকার্য্য। তুলসী-মালা-ধারণ করিয়া পিতৃকার্য্য করাই হরিভক্তিবিলাসের বিধি।

তুলসীকাষ্ঠমালাভিভূর্ষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ।
পিতৄণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ॥ ৪।১২৯

তিলক-সম্বন্ধেও ঐ কথা—

যজ্ঞোদানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্। ৪।৭২

শাস্ত্রে মালা-তিলকধারণের ও সন্ধ্যা-বন্দনার নিত্যত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে; করণে মঙ্গল, অকরণে প্রত্যবায়—ইহাই নিত্যত্বের তাৎপর্য্য।

৩য় প্রশ্ন ঃ—শ্রীশ্রীএকাদশী-ব্রতদিনে আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও বৎসরান্তশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য কি?

উঃ ঃ—ব্রতদিনে শ্রাদ্ধ না করিয়া তৎপরদিন করিবে। ১ম প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৪র্থ প্রঃ ঃ—অন্য দেবদেবীর পূজা কি প্রণালীতে গৃহী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য?

উঃ ঃ—গৃহী-বৈষ্ণবদের মধ্যে যদি কেহ অন্য দেব-দেবীর পূজা করিতে ইচ্ছা করে, তবে অন্য দেব-দেবীকে শ্রীশ্রীভগবানের দাস-দাসী বা পরিকর জ্ঞান করিয়া পূজাদি করিবেন।

একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। চৈঃ চঃ।

আর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ দ্বারা তাঁহাদের ভোগ দিবেন।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
—হরিভক্তিবিলাস—৯।৮৭

৫ম প্রঃ ঃ—গৃহী বৈষ্ণবদিগের বিবাহ-ক্রিয়া কি ভাবে ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন হওয়া উচিত? আমাদের দেশ-প্রচলিত বিবাহ গৃহী-বৈষ্ণবদের পক্ষে শাস্ত্রসম্মত কিনা?

উঃ ।—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসই বৈষ্ণবের স্মৃতি-গ্রন্থ। তাহাতে শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনও অনুষ্ঠান-সম্বন্ধেই বিশেষ বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয়, অন্যান্য বৈদিক অনুষ্ঠানে, প্রচলিত বৈদিক-বিধির অনুসরণই কর্ত্তব্য,—অবশ্য তাহাতে যে যে স্থলে শ্রাদ্ধ ও অন্য দেবতার্চ্চনের বিধি আছে, সেই সেই স্থানে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিশেষ-বিধি-অনুসারেই চলিতে হইবে।

গৃহস্থাশ্রম বেদবিহিত আশ্রম। সুতরাং গৃহীকে, বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের সঙ্গে যোগ রাখিয়া, ভক্তির অনুকূলভাবে বৈদিক বিধি অনুসারেই ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিতে হইবে। (প্রথম প্রশ্নের উত্তরও দ্রষ্টব্য)।

বিবাহে, স্ত্রী-আচার আছে, বেদাচারও আছে। স্ত্রী-আচার দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবাহ-লীলা বর্ণিত আছে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রভুর বিবাহ-লীলায় স্ত্রী-আচার, লোকাচার ও বেদাচার যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের গন্ধমালা দিয়া শুভক্ষণে।
অধিবাস করিলেন আপ্তবর্গগণে॥
দিব্যগন্ধ চন্দন তাম্বূল মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হৃষ্ট হৈয়া;
বল্লভ আচার্য্য আসি যথাবিধিরূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে॥

* * * *

(বিবাহদিনে) প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নানদান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান॥

* * * *

খই, কলা, সিন্দূর, তাম্বূল, তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হৈয়া॥

* * * *

বল্লভ-আচার্য্য এই মত বিধি ক্রমে।
করিলেন দেব-পিতৃ-কার্য্য হর্ষ মনে॥

* * * *

হেন পাদপদ্মে (প্রভুর) পাদ্য দিলা বিপ্রবর।
বস্ত্র মাল্য চন্দনে ভূষিয়া কলেবর॥
যথাবিধিরূপে কন্যা করি সমর্পণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ॥
তবে যত কিছু কুলব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণ তাহা করিলেন পাছে॥
—আদিখণ্ড, ৯ম অধ্যায়।

উপরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহের কথাই বলা হইয়াছে; তাহাতে স্ত্রী-আচার, কুলাচারাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে; এবং বর-পক্ষ ও কন্যা-পক্ষ উভয়েই দেব-পিতৃ-কার্য্য যথাবিধি নির্ব্বাহ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহেও ঐরূপ হইয়াছে।

(বিবাহদিনে) তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি গঙ্গাস্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
তবে শেষে সর্ব্ব আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দিমুখ-কর্ম্মাদি করিতে॥
* * * *
তবে আই পতিব্রতাগণ লই সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহারঙ্গে॥
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম হর্ষ মনে।
তবে বাদ্যবাজনে গেলেন ষষ্ঠী স্থানে॥
ষষ্ঠীপূজি তবে বন্ধু-মন্দিরে মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইল নিজঘরে॥
তবে খই কলা তৈল তাম্বুল সিন্দূরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥

প্রভু যে নান্দিমুখ শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই লিখিত আছে। এদিকে প্রভু বিবাহ করিতে আসিলে সনাতন মিশ্রও

তবে বরণের সব সামগ্রী আনিয়া।
জামাতারে দিতে বিপ্র আসিলা বসিয়া॥

পাদ্য অর্ঘ, আচমনী, বস্ত্র অলঙ্কার।
যথাবিধি দিয়া কৈল বরণ বাঞ্ছার॥

আবার বিবাহ-সভায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে আনীত হইলে,

তবে হর্ষে প্রভুর সকল আপ্তগণে।
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে॥
তবে মধ্যে অন্তঃপট করি লোকাচারে।
সপ্তপ্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥

ইহার পরে,—তবে পুষ্প ফেলাফেলি লাগিল হইতে।

তারপর, জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী প্রভুর চরণে মালা দিলেন, প্রভুও তাঁহার গলায় মালা দিলেন।

তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা দুই মহা কুতূহলী॥
তারপর, আনন্দ-বিবাদ লক্ষ্মীগণে প্রভুগণে।
উচ্চ করি বর-কন্যা কোলে হর্ষমনে॥
শেষে, হেন মতে শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা করি রঙ্গে।
বসিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর লক্ষ্মীসঙ্গে॥
তবে রাজপণ্ডিত পরম হর্ষমনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে॥
পাদ্য অর্ঘ্য-আচমনী যথা বিধিমতে।
ক্রিয়া করি লাগিলেন সঙ্কল্প করিতে॥
বিষ্ণুপ্রীতে কামা করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥
তবে দিবা ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিল উল্লাস॥
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বামপাশে।
হোমকর্ম্ম করিতে লাগিল তবে শেষে॥
বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি বর-কন্যা ঘরে নিলা পাছে॥
আদিখণ্ড ১৩শ অঃ।

(৭)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর কর মহাশয় (বাজিতপুর, ময়মনসিংহ) দ্বিতীয়-পত্রে লিখিয়াছেন :—

১ম প্রঃ (ক) ঃ—শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে "বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করিতে নাই", এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি ?

উঃ ঃ—সামাজিক নিয়মে দেখা যায়, কতকগুলি জাতিকে অস্পৃশ্যাদি মনে করিয়া হেয় জ্ঞান করা হয় ; বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এইরূপ হেয়তা-জ্ঞানই বোধহয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। সামাজিক হিসাবে হেয়-জাতিতে যে বৈষ্ণবের জন্ম, হেয়-জাতিতে জন্ম বলিয়াই সেই বৈষ্ণবকে হেয় মনে করা বা অবজ্ঞা করা বা তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শন না করা—অপরাধজনক ; ইহাই বোধহয় বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি-নিষেধের তাৎপর্য্য।

প্রঃ (খ) ঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অথবা জাতিভেদ কি পরিমাণ রক্ষিত হইয়াছে ?

উঃ ঃ—বর্ণোচিত ধর্ম্ম বা আশ্রমোচিত ধর্ম্ম-ত্যাগ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতি উচ্চ একটী সোপান।

এই সব ত্যাজি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ ॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করার পূর্ব্বে একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ সম্ভব হয়না। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ত্যাগের পক্ষেও যোগ্যতা-বিচার আছে—অধিকারী ভেদ আছে ; সকলের পক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ত্যাগ সমীচীন নহে। যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ-অবস্থা না জন্মে কিম্বা ভগবৎকথায় অচলা শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন করিতে হইবে, ইহাই গোস্বামিশাস্ত্রের বিধি।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত।

সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্যেই জাতিভেদের প্রবর্ত্তন ; একভাবে না একভাবে জাতিভেদ সকলদেশেই দৃষ্ট হয় ; ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনেহয়। যাঁহারা সমাজের মধ্যে আছেন, জাতিভেদের মর্য্যাদা রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গতই ; নচেৎ সামাজিক-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ; সামাজিক

বিধানের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন, সামান্য-সদাচারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

প্রশ্ন (গ) ঃ—বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ জাতিভেদ কতদূর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায়?

উঃ ঃ—সমাজ যতদূর পর্য্যন্ত চায়, ততদূর।

প্রশ্ন (ঘ) ঃ—বৈষ্ণবের সংজ্ঞা কি?

উঃ ঃ—ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে বৈষ্ণবের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব-সেবা-প্রকরণে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বৈষ্ণবের এইরূপ সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছেন ঃ—

* * * যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥ চৈঃ চ মঃ ১৫

ইহার পরে বৈষ্ণবতর এবং বৈষ্ণবতমের সংজ্ঞা দিয়াছেন ঃ—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৬
(ইনি বৈষ্ণবতর।)

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৬
(ইনি বৈষ্ণবতম।)

ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৬

বৈষ্ণবোচিত সম্মান-প্রদর্শনস্থলে, যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তাঁহাকেই বৈষ্ণব মনে করিতে হইবে।

গুরুপ্রকরণে বৈষ্ণবের সংজ্ঞা এইরূপ ঃ—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরোনরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মদবৈষ্ণবঃ॥
—হরিভক্তিবিলাস, ১।৪১॥

যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং যিনি বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনি বৈষ্ণব; এতদ্ভিন্ন লোক অবৈষ্ণব।

ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন :—সাধারণতঃ বিষ্ণুই যাঁহার অভীষ্ট দেব, তিনিই বৈষ্ণব।

বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ। ১০ ৪

বৈষ্ণবের বিশেষ লক্ষণে বলিয়াছেন :—

মৃত্যু-সঙ্কটেও যাঁহারা হরিবাসর-ব্রত লঙ্ঘন করেন না, হরিবাসরে যাঁহারা নিশিতে জাগরণ করেন, ধর্মকর্মার্থেই যাঁহাদের জীবন, সন্তানার্থই যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ, বিপ্রশ্রেষ্ঠগণের নিমিত্তই যাঁহাদের অন্নাদি রন্ধনক্রিয়া; (ইত্যাদি আচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ) তাঁহারা বৈষ্ণব। (১০।৫—১০।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

প্রশ্ন (ঙ) ঃ—আত্মধর্ম্ম তটস্থাশক্তিতে স্থিত না হইলে বৈষ্ণবত্ব হয় কি না?

উঃ ঃ—প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। জীবাত্মা বা জীব স্বরূপতঃ শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি; জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস; মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া আছে বলিয়া স্বরূপগত ধর্ম (শ্রীকৃষ্ণ-সেবা) হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা যখন দূরীভূত হইবে, তখনই চিত্ত শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতালাভ করিবে; এই শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তই শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তির যোগ্য; বাস্তবিক চিত্তের এইরূপ অবস্থাতেই প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব (কৃষ্ণদাসত্ব) স্ফুরিত হইতে পারে। এজন্যই বোধহয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সাধকভক্তের এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন :—

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্ব্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
—দক্ষিণ ১।১৪৪।

যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু সম্যক্‌রূপে বিঘ্ন-নিবৃত্তি হয় নাই; এবং যাহারা শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকার-বিষয়ে যোগ্য, তাঁহারাই সাধক-ভক্ত।

প্রশ্ন (চ) ঃ—এতদ্দেশে গোস্বামিগণ মন্ত্রপ্রদান করিয়া যে দীক্ষা দেন, ঐ সব গৃহীগণ বৈষ্ণব-সংজ্ঞায় পড়েন কি না? পড়িলে কোন্ শ্রেণীর বৈষ্ণব?

উঃ ।—শাস্ত্রোক্ত বিধি-অনুসারে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত গুরুর নিকটে শাস্ত্রীয় মন্ত্রে যাঁহারা দীক্ষিত, তাঁহাদের সকলেই বৈষ্ণব—গৃহী হইলেও বৈষ্ণব, গৃহত্যাগী হইলেও বৈষ্ণব। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ—অধিকার ভেদে এই তিন শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন; এই শ্রেণী-বিভাগ দীক্ষার উপর নির্ভর করে না, ভক্তি বিকাশের উপর নির্ভর করে। গৃহীই হউন, আর গৃহত্যাগীই হউন, সকলের মধ্যেই এই তিন শ্রেণীর বৈষ্ণব থাকিতে পারেন।

২য় প্রশ্ন (ক) ।—বৈষ্ণবের পক্কান্ন মহাপ্রসাদ উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণের গ্রহণীয় কি না?

উঃ ।-মহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু; প্রাকৃত অন্নের সঙ্গে মহাপ্রসাদের তুলনা হয়না। স্বরূপতঃ প্রাকৃত অন্নের ন্যায় অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদে জাতি-বিচার সঙ্গত বলিয়া মনে হয়না; শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রসাদের যেরূপ মর্যাদা, সর্বত্রই মহাপ্রসাদ ঐরূপ মর্যাদাহ। কিন্তু যাঁহারা সমাজের মধ্যে বাস করেন, সমাজের মর্যাদাকেও তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন না, করা সঙ্গতও নহে; করিলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; স্থলবিশেষে মহাপ্রসাদের অবমাননাও হইতে পারে। এজন্যই উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের পক্ষে ব্রাহ্মণেতর জাতীয় বৈষ্ণবের পাচিত প্রসাদান্ন গ্রহণ সর্বত্র সমীচীন বলিয়া মনে হয়না। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণেতর জাতীয় বৈষ্ণবের অন্নকে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ত্যাগ করেন, তাহা নহে, তাঁহারাও মনে করেন, মহাপ্রসাদ সর্বথাই গ্রহণীয়, তবে সমাজের অনুরোধে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন; সন্ন্যাসগ্রহণের পরেও তিনি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের পাচিত অন্ন গ্রহণ করেন নাই।

অবশ্য ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের পাচিত অন্ন শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হইলে তাহার গ্রহণে যে স্বরূপতঃ ধর্মের কোনও ক্ষতি হয়না, সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রভু তাহাও দেখাইয়াছেন। ঝড়ুঠাকুরের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করায় কালিদাসের প্রতি কৃপা-বিতরণেও প্রভু কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই।

প্রঃ (খ) ।—এতদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের প্রসাদ জাতিনির্বিশেষে সকল বর্ণের গৃহী বৈষ্ণব এক পংক্তিতে বসিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কিনা? এতৎসম্বন্ধে বৈষ্ণব-শাস্ত্র মুযায়ী প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি?

উঃ ঃ—(ক) প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। এই বিষয়ে কোনও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে কিনা জানিনা। সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে স্বরূপতঃ কোনও দোষ হয় বলিয়া মনে হয়না; তবে সমাজের মর্য্যাদাও উপেক্ষনীয় নহে।

৩য় প্রঃ (ক) ঃ—ভেকধারী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কখন কি প্রকারে হইয়াছে?

উঃ ঃ—সম্প্রদায়ী সদাচার-পরায়ণ বৈষ্ণবদের মধ্যেও ভেকধারী আছেন। ইঁহাদের ভেক্ বোধহয় নিষ্কিঞ্চনের বেশ মাত্র। ইহার ভিত্তি বোধ হয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণের নিষ্কিঞ্চনবেশে; কালক্রমে ইহা একটী অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কোন্ সময়ে ইহা একটী অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাঁহা নিশ্চিত বলা যায় না।

এতদ্দেশে বৈষ্ণবীওয়ালা যে সমস্ত ভেকধারী-বৈষ্ণব দেখা যায়, তাঁহারাও বোধহয় উক্ত আদর্শেরই ভ্রষ্টাবস্থা। কেহ কেহ বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ-তনয় প্রভুপাদ শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামী বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোককে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহারা স্ত্রীলোক-সংসর্গে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহারাই নাকি বর্ত্তমানের বাবাজী-মাতাজীদের সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত কিছু জানি না।

প্রঃ (খ) ঃ—ভেকধারী বৈষ্ণবগণ কোন্ শ্রেণী ও কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব? তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের অন্তর্গত কিনা? তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের ব্যতিক্রম আচার করেন কিনা? করিলে কোন্ কোন্ বিষয়ে করেন এবং কোন্ সময় হইতে এই প্রথা আরম্ভ হইয়াছে?

উঃ ঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী (ক) প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। ভেকধারীদের মধ্যে সদাচার-পরায়ণ বৈষ্ণবও আছেন; সাধারণতঃ ধামাদিতেই ইঁহারা বাস করেন; কেহ কেহ ভ্রমণোপলক্ষে এতদ্দেশেও আসেন। ইঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

মাতাজীওয়ালা বাবাজীদের মধ্যেও সম্প্রদায়ী-গুরুর নিকটে দীক্ষিত বৈষ্ণব থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের আচরণ বৈষ্ণব-শাস্ত্রসম্মত নহে; তাঁহারা

সাধারণতঃ পরস্ত্রী-সঙ্গী ; পরস্ত্রীকেই সাধারণতঃ তাঁহারা বৈষ্ণবীরূপে অঙ্গীকার করেন এবং তাহার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করেন। ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার। অনেকে মৎস্যাদিও ব্যবহার করেন, ইহাও বৈষ্ণবাচার-বিরুদ্ধ। ভেক্ লইয়া নিজের স্ত্রীর সঙ্গও দোষাবহ।

বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
প্রভু বোলে তার মুখ না করোঁ দর্শন॥

ইহাই প্রভুর শ্রীমুখোক্তি।

এই সমস্ত ভেক্ধারী বাবাজীদের মধ্যে অনেকেই বাউল, কালাচান্দি প্রভৃতি সহজিয়া মতাবলম্বী আছেন ; তাঁহাদের আচরণ বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাঁহারা আবার "সোঽহং" মন্ত্রেরও উপাসক—তাই নিজেকে বা গুরুকে কৃষ্ণ জ্ঞান করেন, তদনুরূপ আচরণও করেন। ইহা ভক্তি-শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

প্রঃ (গ) ঃ—এতদ্দেশে যে ভেক্ধারী বৈষ্ণবগণ আখড়া স্থাপন করেন ও সেবাদাসী রাখেন, তাহা কোনও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত কিনা? এই ভেক্ধারী বৈষ্ণবগণের জল আচরণীয় কিনা? ও তাঁহাদের সঙ্গ করণীয় কিনা?

উঃ ঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী (খ) প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। সম্প্রদায়ী শুদ্ধাচার বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সঙ্গ করেন না বা তাঁহাদের জল গ্রহণ করেন না।

প্রঃ (ঘ) ঃ—এতদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-উপলক্ষে যে মহোৎব হইয়া থাকে, তাহাতে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণকে বৈষ্ণবজ্ঞানে নিমন্ত্রণ করা যায় কিনা?

উঃ ঃ উৎসবাদিতে তাঁহাদের নিমন্ত্রণে বোধহয় কোনও বাধা থাকিতে পারেনা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবের যে সাধারণ সংজ্ঞা বলিয়া গিয়াছেন, সেই সংজ্ঞা-অনুসারে তাঁহারাও বৈষ্ণব।

প্রঃ (ঙ) ঃ—এই শ্রেণীর ভেক্ধারী বৈষ্ণবগণ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাকার্য্য হইতে পারে কিনা? এবং ঐরূপ সেবার প্রসাদ গৃহী বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয় কিনা?

উঃ ঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ভগবান্ ; তিনি কাহার সেবা গ্রহণ করেন, আর কাহার সেবা গ্রহণ করেন না, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তিনি ভাবগ্রাহী, তিনি দেখেন হৃদয়ের ভক্তি, প্রেম ; যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার

সেবাই তিনি গ্রহণ করেন। মানুষ সাধারণতঃ লোকের বাহিরের আচরণই দেখে, চিত্তের অবস্থা দেখিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। তাই লোক সাধারণতঃ বাহিরের-আচরণ দেখিয়াই লোকসম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকে। বাহিরের আচরণকে উপেক্ষা করাও সঙ্গত নহে ; সাধারণ লোকের নিকটে বাহিরের আচরণেই শাস্ত্রের মর্য্যাদা। বাহিরের আচরণকে উপেক্ষা করিলে শাস্ত্রের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন হয় ; শাস্ত্র-মর্য্যাদা না থাকিলে জীবের আশ্রয়ের আর কিছুই থাকে না ; ক্রমে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়ে ; তখন আত্যন্তিকী-ভক্তিও উৎপাত-বিশেষ হইয়া পড়ে।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রিং বিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥
—ভঃ রঃ সিঃ।

তাই লোককে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের আদেশের অনুসরণ করিতে হয়। শাস্ত্রের আদেশ-অনুসারে আচারবিহীন লোকের দ্বারা উৎসবাদিতে ভোগরাগের বন্দোবস্ত করা সঙ্গত নহে। এইরূপ লোকের পাচিত অন্নাদি দ্বারা ভোগ লাগাইলেও সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ (গৃহী বা গৃহত্যাগী) প্রসাদ গ্রহণ করেন না।

[উক্ত আলোচনায় কোনরূপ ভ্রম পরিলক্ষিত হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ জানাইলে কৃতজ্ঞতাসহকারে তাহা প্রকাশিত হইবে।]

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

প্রার্থনা।

গৌর হে !

তব শান্ত–স্নিগ্ধ-মঙ্গলময় সৌম্য মূরতি দরশে—
ভুলিব দুঃখ নাশিব ক্লান্তি হাসিব কবে গো হরষে !
তিমির ঘরিত দীর্ঘ রজনী অবসান কবে হবে গো !
ও রূপ-ভাস্কর-ভাস্বর-ভাতি ফুটিবে কি হৃদি-নভে গো !
দীনতা যখন পূর্ণ হইয়া শূন্যতা আনি ঢাকে গো।
করুণা তোমার আবার তাহারে সান্ত্বনা দানে রাখে গো।

(২)

হিমবর্ষণে তরুবর যবে পত্র পুষ্প হারায়ে—
চরম দীনতা লভিয়া থাকে সে মরণের পথে দাঁড়ায়ে!
তখন আবার নব পল্লবে সাজায়ে তাহারে দাও হে!
দয়াময়! তব দয়ার পরশে সারাদেহ তার ছাও হে!
নিঃস্ব শুষ্ক হয়েছে হৃদয় শতেক ঝঞ্ঝা-পীড়নে,
কৃপারস দানে বাঁচাও জীবন, ঠেলোনা এদীনে চরণে!
তব ইঙ্গিতে উঠুক ফুটিয়া শাখে শাখে তার মঞ্জরী।
পরিমলে তার আসুক জুটিয়া লাখে লাখে অলি গুঞ্জরি।
ভকত তোমার সাজাক চরণ এহৃদি প্রসূন চয়নে—।
সার্থক হো'ক এ কুসুম ফোটা, হেরিয়া শ্রীপদ নয়নে!!

শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্ত্তী, কাব্যনিধি।

মনের আশা।

(কবে) জ্বাল্‌ব আমি প্রেমের বাতি
আমার হৃদয়-আঁধার-ঘরে,
সকল করম ফে'লে রে'খে
হে প্রেমময় তোমার তরে।
(স্নার আলোতে) ঘরের মাঝে দেখ্‌ব আমি,
দাঁড়িয়ে আছ তুমিহে স্বামী,
ভানুসুতাসনে মধুর বেশে
সখীবৃন্দেরে সঙ্গে ক'রে।
(সেদিন) নূতন ভাবে নৃত্য ক'রে,
গেয়ে নবগীত তোমা তরে,
(যেন) দীর্ঘ দিনের মনের আশা
পূর্ণ করিহে প্রীতিভরে।

শ্রীনববল্লভ বিশ্বাস।

ডাঃ দীনেশ সেনের কার্য্যের প্রতিবাদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, লীট্ (D. Lift) রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন কবিশেখর মহাশয় গোবিন্দদাসের কড়চা, বিবর্ত্তবিলাস প্রভৃতি মিথ্যা ঘটনাপূর্ণ সহজিয়া পুস্তক অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এবং প্রাচীন পূজ্যপাদ গোস্বামিবর্গের পরমপূত চরিতাখ্যান রূপান্তরিত ও বিকৃত করিয়া, তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রভৃতি পুস্তক দ্বারা সমগ্র শিক্ষিত জগতে প্রচার করিতেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সমাজ এবং প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের প্রতি শ্লেষ ও বিদ্বেষ উক্ত রায় বাহাদুরের লিখার ভিতরে পূর্ণ ভাবে প্রকটিত। তদুপরি উক্ত রায় বাহাদুরের পুস্তকগুলি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় দেশের কি প্রভূত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্র বুঝিতে পারিবেন। সম্প্রতি উক্ত সেন মহাশয় স্বীয় জিদ বজায় রাখিবার জন্য সুকৌশলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে মিথ্যা ঘটনা পূর্ণ গোবিন্দদাসের কড়চা পুস্তকের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ হইতে সেন মহাশয়ের কার্য্যের তুমুল প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে শীঘ্র ইহার প্রতিকার হইতে পারে, তন্নিমিত্ত সত্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রের চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা এস্থলে উক্ত সেন মহাশয়ের লিখার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি :—

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১ম সংস্করণ ১৯২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—
"মহাপ্রভু নির্ম্মল ভক্তি-বিহ্বলতায় বেশ্যাকেও আলিঙ্গন দিয়াছিলেন।"

মহাপ্রভুর স্বীয় আদর্শ-জীবন, তাঁহার শিক্ষা ও ধর্ম্মমত এই বাক্যের অসঙ্গতি ও অসত্যতা প্রমাণিত করিতেছে। ছোট হরিদাস-বর্জ্জন, শ্রীক্ষেত্রে দেবদাসীর কাহিনী এবং তাঁহার জীবনের আরো বহুতর ঘটনা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা ঢাকা-প্রকাশ, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার প্রভৃতি বহু পত্রিকায় এবিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সংস্করণ, ২৮৪ পৃষ্ঠায় লেখক গোবিন্দদাসের কড়চা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবাই হাসে।
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভুপাশে॥
*   *   *   *
কাঁচুলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন।
*   *   *   *
গিয়াছে কৌপীন খসি কোথা বহির্বাস।
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস॥
সত্যারে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি।"

প্রভুর কোন প্রামাণিক চরিত-গ্রন্থে এইরূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায় না। ভাববিহ্বল অবস্থায় প্রভুর কখনও এইরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটে নাই। পুজ্যপাদ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন, "যদি ভাববিহ্বল অবস্থায় কখনো প্রভুর স্ত্রীলোক-স্পর্শ ঘটিত, তাহা হইলে ভাবাপগমে চেতন অবস্থায় তাঁহার দেহত্যাগ করিতে হইত।" (অমিয় নিমাই-চরিত ৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহে প্রভুর চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখকের ঐ সমুদয় উক্তি একান্ত অযথার্থ প্রমাণিত হয়।

৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সংস্করণ ২৮৭ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন:—

"এই বিদ্বেষ-প্রণোদিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে তাঁহার (মহাপ্রভুর) অণুমাত্রও অনুমোদন ছিলনা।"

এতদ্দ্বারা লেখক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মকে "বিদ্বেষ-প্রণোদিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম" সংজ্ঞায় অভিহিত করিলেন এবং এই ধর্ম্ম মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অননুমোদিত, ইহা ব্যক্ত করিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বুঝুন, তাঁহাদের পরম পূজ্য শ্রীরূপ-সনাতনাদি ছয় গোস্বামীর প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত মহাপ্রভুর তিল মাত্রও সংশ্রব নাই!! ইহার টীকা আর করিব না। পাঠকই অনুভব করুন।

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২৮৭ পৃ:—

"গোঁড়া বৈষ্ণবগণ এই কড়চার (গোবিন্দদাসের কড়চার) প্রতি

শ্রদ্ধাবান নহেন। ... ... কিন্তু সত্যের অপলাপ করিবার শক্তি মানুষের নাই।"

এতদ্বারা লেখক পূজ্যপাদ বৈষ্ণব-গ্রন্থকার ও বৈষ্ণব-মহাপুরুষগণের প্রতি অভিসন্ধিমূলক সত্যের অপলাপ আরোপিত করিলেন।

৫। উক্ত গ্রন্থ ২৮৯ পৃঃ —

"হাজিপুরে কেশব সামন্ত চৈতন্যপ্রভুকে কটূক্তি করিয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যপ্রভু তাহাকে ভক্তি দিতে পারেন নাই। তাঁহার চেষ্টা সেস্থলে বিফল হইয়াছিল।"

সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের আরাধ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে ঈদৃশ অযথার্থ কল্পনা প্রয়োগ করিতে যাইয়া লেখক সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন। এক দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে ভক্তি প্রদান করিতে যাইয়া মহাপ্রভু অকৃতকার্য্য ও বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, এরূপ কাহিনী গোবিন্দকর্ম্মকারের কড়চায়ও কুত্রাপি নাই।

৬। উক্ত গ্রন্থ ১১৭ পৃষ্ঠায় লেখক রামায়ণ—বীরবাহু-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"এই কপিগণ যে চৈতন্যপ্রভুর পারিষদ্বর্গের ন্যায় স্পষ্টরূপে গুণচূড়া, ললিতা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকৃত হন নাই, ইহাই যথেষ্ট।"

রামায়ণের কপিগণের প্রতি উপযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত সুচতুর সুরসিক সেন মহাশয় তাহাদের মহৎ দৃষ্টান্ত চৈতন্য প্রভুর পারিষদ্বর্গের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন! হায়! প্রাচীন পূজ্য-পাদ গোস্বামিবর্গ, হায়! বাঙ্গালীর চিরন্তন গৌরব, তোমাদেরই ধৃষ্ট সন্তান অধম বাঙ্গালীর লেখনীতে তোমাদের পরিণতি দর্শন কর!! গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের ইহা অপেক্ষা ঘৃণা, লজ্জা ও অবমাননাকর বিষয় আর কি হইতে পারে? হে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, আপনিই না প্রত্যহ পাঠ করেন :—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

এই ছয় গোঁসাইর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২৯৮ পৃঃ —

"কটূক্তি করিবার জন্য এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র বৃন্দাবন দাসের আয়ত্ত ছিলনা, সুতরাং তিনি রাগের বশে অসংযত-বাক্ দুর্দ্দান্ত একটি শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন।"

যিনি বঙ্গভাষার অন্যতম আদি শ্রেষ্ঠ কবি, যিনি মহাপ্রভুর লীলার আদিব্যাস বলিয়া কথিত, সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার লেখনীমুখে শতবার যাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, বৈষ্ণব-জগতের, এমন কি বঙ্গভাষা-ভাষী ব্যক্তি মাত্রের পিতার ন্যায় পরম মান্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রতি ঈদৃশ অশ্রদ্ধা ও অবমাননাকর বাক্য প্রয়োগ করা কিরূপ ধৃষ্টতা, তাহা পাঠকগণ চিন্তা করুন।

৮। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২৫৫ পৃঃ—

"প্রভু বোলে যে জন ডোমের অন্ন খায়।
কৃষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায় ॥"

ইহার অর্থ অতি স্পষ্ট। মহাপ্রভু বলিতেছেন, যে ব্যক্তি ডোমের অন্ন খায়, সে কৃষ্ণ-ভক্তি পায় এবং সে-ই কৃষ্ণকে লাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুকর্ত্তৃক কথিত এই অদ্ভুত বাক্যটী লেখক কোথায় পাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন, চৈতন্যভাগবতে পাইয়াছেন। কিন্তু সমগ্র চৈতন্যভাগবতের কুত্রাপি এমন অদ্ভুত কথা নাই। কোন নীচ জাতির পক্ক অন্ন গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণ-ভক্তি পাইবে এবং কৃষ্ণ পাইবে, কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থে এরূপ কথা থাকিতে পারে, এ ধারণাও আমাদের নাই। শ্রীমহাপ্রভু সম্বন্ধে লেখকের এই অত্যাশ্চর্য্য অসত্য কথা দ্বারা সমাজের কি অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য।

৯। "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" ২য় খণ্ড ১৬১০ পৃঃ —

গ্রন্থকার ডাঃ সেন মহাশয় অকিঞ্চন দাসের বিবর্ত্তবিলাস হইতে "নায়িকা বিনু মুক্তি নাই" স্বয়ং এই ভূমিকা দিয়া প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের নামে একটী

অতি জঘন্য মিথ্যা রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব মাত্রেই উহা শ্রবণে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন, সজ্জন মাত্র শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু আমাদের উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

“নায়িকা ভিন্ন মুক্তি নাই”—

যে সব নায়িকা এবে করিয়ে গণন।
যার সঙ্গে যেই ধর্ম্ম করিলা আচরণ॥
শ্রীরূপ করিলা সাধন মীরার সহিতে।
ভট্ট রঘুনাথ কৈলা কর্ণবাই সাথে॥
লক্ষ্মা হীরা সনে করিলা গোঁসাই সনাতন।
মহামন্ত্র প্রেমে সেবা সদা আচরণ॥
গোঁসাঞি লোকনাথ চণ্ডালিনী কন্যা সঙ্গে।
দোহজন অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে॥
গোয়ালিনী পিঙ্গলা যে ব্রজদেবী সম।
গোঁসাঞি কৃষ্ণদাস সদাই আচরণ॥
শ্যামা নাপিতিনী সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাঞি।
সরস সে ভাব কৈলা যার সীমা নাই॥
রঘুনাথ গোস্বামী পীরিতি উল্লাসে।
মিরাবাই সঙ্গে তেঁহ রাধাকুণ্ড বাসে॥
গৌরপ্রিয়া-সঙ্গে গোপালভট্ট গোঁসাঞি।
করয়ে সাধন অন্য কিছু নাই॥
রায় রামানন্দ, যজ্ঞে দেবকন্যা সঙ্গে।
আরোপেতে স্থিতি তেঁহ ক্রিয়ার তরঙ্গে॥
এছে ক্রিয়া সিদ্ধি নাই রূপাশ্রিত ধর্ম্ম।
পূর্ব্ব মহাজন সবে করিয়াছে মর্ম্ম॥

ইহার টীপ্পনি আমরা কি ভাষায় করিব বুঝিতে পারি না। বিবর্ত্তবিলাস ব্যভিচার-দূষিত সহজিয়া মতের (অস্পৃশ্য) পুস্তক। সহজিয়াগণ পরকীয়া ভাবদুষ্ট স্বমত পরিপুষ্টির জন্য প্রাচীন পূজ্যপাদ আচার্য্যগণের পবিত্র নাম বরনার্থ

স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইয়া ঐ সমুদয় নামের সহিত এক একটি পরকীয়া নারীর নাম সংযোজিত করিয়া দিয়াছে। সহজিয়াগণের এই ঘৃণিত চাতুরী, বাঙ্গলা দেশের উপধর্ম্ম মতগুলির অবস্থা যাহারা জানেন, তাহাদের কাহারও অপরিজ্ঞাত নাই। এই কলঙ্কিত পুস্তক হইতে দীনেশ সেন কিরূপে এই অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তকের ভিতরে সন্নিবেশিত করিতে পারিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। এতদ্দ্বারা সমাজে বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজের ভিতরে নীতিধর্ম্মের ব্যভিচার ঘটাইবার ইঙ্গিত তাহার লেখনী-মুখে ধ্বনিত হইতেছে কিনা, বিচক্ষণ পাঠক তাহা বুঝুন। বিগত দোল পূর্ণিমায় আনন্দবাজারে সেন মহাশয় "বৈষ্ণব-কবির মর্ম্মকথা," বলিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাদের উপরোক্ত বাক্য বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে। আমার মনে হয়, এই অযথা মিথ্যা প্রকাশ ও প্রচারের সহয়তার নিমিত্ত লেখক আইন ও সমাজ উভয়তঃ দণ্ড পাইবার যোগ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্র মোহন ঘোষ।

(সম্পাদক, পূর্ববিক্রমপুর সাহিত্য-সমাজ)

সাধনা-সম্বন্ধে মিথ্যা-উক্তি।

শ্রীশ্রীসোনার-গৌরাঙ্গ পত্রিকায় কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন যে—

(ক) "সাধনা" পত্রিকার সহিত আমি সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি।

(খ) "সাধনার" সম্পাদক শ্রীমান্ রাধাগোবিন্দের সহিতও আমি সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছি।

(গ) আমার নামে সাধনায় যে সমস্ত চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমস্ত আমার প্রেরিত নহে, আমার অজ্ঞাতসারেই শ্রীমান্ রাধাগোবিন্দ সে সমস্ত আমার নামে প্রকাশ করিয়াছে।

(ঘ) আমার অনুমোদিত বলিয়া সাধনায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমি দেখিয়া দেই নাই এবং আমার অনুমোদিত নহে।

(ঙ) আমার বিনা আদেশেই সাধনা প্রচারিত হইয়াছে। ইত্যাদি।

এ সমস্ত উক্তির উত্তরে "সাধনার" গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গকে আমি জানাইতেছি যে, ঐ সমস্ত উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ; এই সমস্ত ভিত্তিহীন উক্তিতে আস্থা-স্থাপন করিয়া আমার "সাধনা" সম্বন্ধে কেহই প্রতিকূল ধারণা পোষণ করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ। আমিই সাধনার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক ; আমার সাধারণ নির্দ্দেশানুসারেই সাধনা পরিচালিত হয়। সাধনায় যাহাতে কোনওরূপ অপসিদ্ধান্ত প্রকাশিত না হয়, অনবধানতাবশতঃ এরূপ কিছু প্রকাশিত হইলেও যাহাতে তাহা সংশোধিত হয়, সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমার অবকাশ কম হইলেও সাধনা-সম্বন্ধে যখন যাহা করা দরকার, তাহা করিতে আমি অবহেলা করি না।

কার্ত্তিকের সাধনায় আমার যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কদর্থ করিয়া কেহ কেহ জানাইয়াছেন যে, আমি সাধনার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। ইহা মিথ্যা কথা। পত্রিকা-পরিচালনে যে সমস্ত ব্যবহারিক-বিষয় আছে—যেমন কত সংখ্যা ছাপা হইবে, কিরূপ কাগজ দিতে হইবে, কোথায় কোথায় পাঠাইতে হইবে, কোনও কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে কিনা, ইত্যাদি—সে সমস্ত বিষয়ের ভারই শ্রীমান্ রাধাগোবিন্দের হস্তে ন্যস্ত রাখার কথা আমার পত্রে উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

গ্রীক বৈষ্ণব। কার্ত্তিকের "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকার ৭৬৮ পৃঃ প্রকাশ :—"খৃঃ পূঃ ১৪৫-১৪০ অব্দে এণ্টিয়ালকিডাস নামক একজন গ্রীক-বীর তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। ইনি ইউক্রেটাইডেশের বংশসম্ভূত। এণ্টিয়াল-কিডাস তক্ষশিলা হইতে হেলিওডোরাস নামক একজন গ্রীককে রাজদূতরূপে মধ্যভারতস্থ বিদিশা বা বেশনগরের অধিপতির নিকট প্রেরণ করেন। হেলিওডোরাস বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। গোয়ালিয়র রাজ্যান্তর্গত ভিলসা-নগরের অদূরস্থিত উক্ত বেশনগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।"

নিষ্কিঞ্চনের আচরণ। আষাঢ়-মাসের সাধনার বিবিধ-প্রসঙ্গে (১৭৮ পৃঃ) আমরা জানাইয়াছিলাম যে, দ্বিতীয়বর্ষ সোনার-গৌরাঙ্গের বৈশাখ-সংখ্যায়, শ্রীল কৃষ্ণগোবিন্দ দাস বাবাজীর নামে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণু-প্রিয়া-যুগলভজন" শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যস্থল বা মূল প্রবন্ধাংশ কৃষ্ণগোবিন্দ দাস বাবাজীর হাতের লেখায় লিখিত নহে, উহা যাঁহার লেখা, তাঁহার হস্তাক্ষর আমাদের সুপরিচিত। তাঁহার নাম প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অনেকেই আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, কারণ, তাঁহাদের ধারণা, ইহাতে হয়তো কৃষ্ণগোবিন্দ দাস বাবাজী সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইতে পারে। তাই আমাদিগকে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে হইতেছে। উক্ত প্রবন্ধের মূল প্রবন্ধাংশ বৃন্দাবনবাসী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয়ের হস্তাক্ষরে লিখিত। উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার হাতের লেখাতেই লিখিত আছে "গয়াশ্রাদ্ধ সস্ত্রীক করাই গৃহস্থের ধর্ম্ম, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রীর ধর্ম্ম-পত্নীসংজ্ঞাই হয় না। সম্ভবতঃ তাহাতেই প্রভু একা গয়ায় গিয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান করিয়াছেন।" এই বাবাজী মহাশয়ের পীড়াপীড়িতেই উক্ত প্রবন্ধ সোনার-গৌরাঙ্গে মুদ্রিত হয় এবং উহা প্রকাশের জন্য সোনার-গৌরাঙ্গের তৎকালীন সম্পাদক ত্রুটী স্বীকার করিলে ইনিই খুব উষ্মা প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। বহরমপুরের আলোচনা-সমিতিতে ইনিই আবার পত্র দিয়া জানাইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মপত্নী নহেন—এমন কথা কৃষ্ণগোবিন্দ দাস বাবাজীর নামীয় প্রবন্ধে লিখিত ছিলনা!! ইনিই যে বহরমপুরে পত্র দিয়াছেন, আমাদের পত্রের উত্তরে তিনি গত জ্যৈষ্ঠ-মাসে ভঙ্গীতে তাহা আমাদের নিকট স্বীকার করিয়াছেন। এতদিন পরেও সম্পাদকের ত্রুটী স্বীকারের দরুণ উষ্মা, বিরক্তি এবং ঠাট্টা প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই !!!

নিয়ামক প্রভুপাদ। সাধনার নিয়ামক পরমারাধ্য প্রভুপাদের শরীর অসুস্থ ; স্থান-পরিবর্ত্তন ও বিশ্রামের নিমিত্ত সম্ভবতঃ শীঘ্র তিনি ভুবনেশ্বর যাইবেন। প্রভুপাদ শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা লাভ করুন ইহাই শ্রীশ্রীনিতাই চাঁদের চরণে আমাদের প্রার্থনা।

(মাসিক-পত্রিকা।)

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা ॥

১ম বর্ষ. | মাঘ—১৩৩৩ | ১০ম সংখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ-অন্তর্ধানে গোপীদিগের বিরহ।

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

(একতালা)

কোথা রৈলে হরি, দেখা দেও আবার
বিরহে কাতরা মোরা হে।
আমরা বরজ-রমণী, হইয়ে মানিনী,
তোমা-গুণমণিধনে হারা হলেম ওহে
পরিণাম না জানি হয়েছিলাম মানিনী,
কখনও ভাবিনাই হইবে এমনি,
যদি জানিতেম মোরা, হ'তে হবে কৃষ্ণহারা,
তাহলে এ ছার মানে কাজ কি ছিল হে,
মোরা গোপ-বালা, সকল অবলা,
সহজে সরলা হই কুল-বালা,

এখন হইয়ে চঞ্চলা, ভ্রমি চাহি কালা,

শ্যাম চিকণকালা কোথায় দরশন দেও হে ॥

(খয়রা)

কোথায় আছ হে, কোথায় আছ হে,

কোথায় আছ হে গোপীর জীবনের জীবন।

মোরা তোমার কারণে, ভ্রমিতেছি বনে,

একবার দরশন দিয়ে রাখ হে পরাণ ॥

১। নাথ হইও না নিদয়, দেখাও পদদ্বয়,

দাসী ব'লে একবার দেও দরশন ॥

(ঠুমরী)

সখি ধৈরয প্রাণে মানে না।

১। সই গো কৃষ্ণ-অন্বেষণে, গহন কাননে,

কত ভ্রমিলাম দেখা পেলেম না পেলেম না।

২। মুরলীর ধ্বনি, হইল যখনি,

চলিলাম তখনি পরিণাম না জানি,

যদি জন্‌তেম এইমত সখি রে ! তবে প্রাণ সপ্‌তেম না,

শঠের প্রেমে ম'জে এই যন্ত্রণা ॥

৩। গৃহ-কাজে রত, ছিলাম অবিরত,

বেণু-গীতে আমায় করিল বিরত,

যদি জান্‌তেম এইমত সখি রে ! ঘরের বাহির হ'তেম না,

এমন বিরহ-যাতনা আর সহে না ॥

(সোয়ারি)

কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব,

ব'লে দেও গো সখি সব কৃষ্ণ বিনে প্রাণ ত্যজিব ॥

(সুহই)

নীপ, বকুল, কদম্ব, প্রিয়াল, জম্বু, অর্ক কোবিদার।
শুন ওহে চূত, দেখেছ অচ্যুত, বল হে তরু-নিকর ॥

১। যমুনার তীরে, পর-উপকারে, সতত বসতি তব।
বল ত্বরা করি, কেন কর দেরী, দেখেছ কি হে কেশব

২। শুন গো মাধবী, দেখেছ মাধব কি ? বল যথার্থ বচন।
তুমিও স্ত্রী-জাতি, আমিও স্ত্রী-জাতি, উভয়ে সখি সমান ॥

৩। হরিণ-দয়িতে, বল গো ত্বরিতে, রাধা সহ কৃষ্ণ হেথা।
ওগো আসিয়াছিল কি ? বল বল সখি শীঘ্র বল গো কথা ॥

৪। রাধা-প্রিয়সখী, মোরা বড় দুঃখী, বল নাথের কাহিনী।
উত্তর না কহে, স্তব্ধপ্রায় রহে, জানি এহো বিরহিণী ॥

৫। রাধাঙ্গ-সঙ্গমে, কুচ-কুমকুমে, বায়ু সুবাসিত জানি।
শুন সহচরী, নিশ্চয় শ্রীহরি, এসেছিল অনুমানি ॥
(আমার মনে লয় গো) (নিশ্চয় মাধব এসেছিল গো)
(তার গন্ধ পেলেম) (ওগো অঙ্গ-গন্ধে বন ভরেছে) ॥

(দশকুশী)

এই ত কাননে সখি, বুঝি প্রাণবল্লভ এসেছিল গো,
ওগো অমিশ্রিত পদচিহ্ন দেখ।

১। বধূকে বহন করি, ভারাক্রান্ত হরি গো—
পদচিহ্ন অধিক মগ্ন হল ॥

২। প্রিয়াকে সাজাবে বলি, বুঝি পুষ্প-ডাল ধরেছিল গো,
দেখ পদাগ্রে দাঁড়ায়েছিল বন্ধু গো ॥
(অসম্পূর্ণ চিহ্ন আছে) (ধূলায় মগ্ন আছে গো)

(ছোট দশকুশী)

জানুপরি প্রিয়া রাখি, কেশ-বিন্যাস করে গো,
এই স্থানে দেখ সখি পুষ্প-গুচ্ছ পড়িয়াছে গো।

(বিরাম)

আর ত প্রাণে মানে না, প্রাণে মানে না,

ওগো সখি আর ত প্রাণে মানে না।

(আমি কি করিব কোথা যাব আর ত প্রাণে মানে না)

(পদের সুর সুহই)

ওগো শুন সহচরী, চল ত্বরা করি ঐ রেণুতে যাই গড়ি।

নিশ্চয় সহচরী, পাইব মুরারি করো না গো আর দেরী ॥

১। বুঝি সেই রমণী, রমণীর মণি, রমণে করে রমণ গো।

জানে কি রমণ? রমণের মরম, রমা যে রমণ চায় গো ॥

২। সহিতে না পারি, মোদের প্রাণ হরি, কার সনে করে বিহার গো।

চল সহচরি, এই বর্ত্ম ধরি, ধরিব সেই প্রাণহরি গো ॥

(দশকুশী)

সই গো বনে বনে, ভ্রমণ করি, খুঁজিলাম বংশীধারী গো।

(ওগো দরশন নাহি পেলাম গো) (কত তরুলতা জিজ্ঞাসিলাম গো)

(কেহ ত আমায় বলে না গো) (পশু পাখী নীরব আছে গো) ॥

(সুর—কাফ)

বল বল সহচরী, কেমনে পাব মুরারি, আর যে রহিতে নারি,

বিরহে বুঝি বা মরি ॥

(মিল—একতালা)

কোথায় আছ হরি, রাসবিহারী, বংশীবট-তটচারী,

একবার দরশন দেও হে ॥

(মিলন—পোস্ত)

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্মরমানমুখাম্বুজঃ।

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥

গোপীর রোদনে হরি, রহিতে আর নারিল,

গোপীগণ মাঝে হরি ত্বরা উপনীত হৈল ॥

১। নন্দকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
হেরিয়ে কুমুদ-বন্ধু, গোপীর কাম উথলিল,
দেখি সকলঙ্ক ইন্দু অস্ত যেতে পাসরিল ॥

২। জগত-মোহন মদন, তার মন মোহে যে মদন,
মথিত করিয়া মন, বৃন্দাবন-মদন,
পীতাম্বর পরিধান কোটী মন্মথ-মথন,
তোষিতে গোপীর মন আসি আবির্ভূত হল ॥

৩। দেখিয়ে সব গোপিকায়, পাসরিয়ে যায় আপনায়,
মাতিল রাস-রসে সবায়, ভাসিল প্রেমের বন্যায়,
ধাইয়া অচল পানে জড়াইয়া ধরিল ॥

বৈষ্ণব-পদরজ-ভিখারী—
শ্রীদেবেন্দ্রমোহন মালাকার।

গৌড়চন্দ্র—শ্রীনিবাস আচার্য্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গঙ্গাপ্রিয় সরকার ঠাকুর মহাশয় যাজিগ্রামের পথ দিয়া গঙ্গাস্নানে আসিতেন। কিছুদিন হইতে একটী বালক তাঁহার মনের বিষয় হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গিগণ লক্ষ্য করিতেন, একটী নূতন বালক দেখিলেই তিনি তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখেন। তাঁহার প্রভু যে একটী বালকের আকৃতি প্রকৃতি তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন। সে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছে, এ খবর তাঁহার নিকট আসিয়াছে, তাই তিনি ছেলে-ধরার মত যেখানে সেখানে যে কোন ছেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, সে বালকটীও পথের উপর তাহার জন্য বসিয়া আছে। বালক বসিয়াছিল—দূরে কয়েকজন শ্রীচৈতন্য-চিহ্নিত ভক্ত দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল। আগন্তুকগণের মধ্যে যিনি সকলের অগ্রে ছিলেন, তিনিও পথের উপর বালকটীকে দেখিয়া, বৃদ্ধ হইলেও যুবকের ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন।

আলাপ নাই, পরিচয় নাই, বালক অষ্টাঙ্গে পড়িয়া গেল,—পথিকবর কেমন কেমন একটী গন্ধ পাইয়া তাহাকে টানিয়া বুকে ধরিলেন—"বল বল বালক তুমি কে? তুমি আমার প্রাণটী লইয়া টানাটানি করিতেছ কেন?" "আমি যে হই সে হই, আপনার স্নেহ কৃপা এবং আশীর্ব্বাদের পাত্র।" "না না, তোমার এবং তোমার পিতার নাম না শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না।" "আমি চাখন্দী-নিবাসী শ্রীশ্রীচৈতন্যদাসের অযোগ্য পুত্র শ্রীনিবাস।" পথিকবর অস্বাভাবিক স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"তুমি সে-ই, তুমি সে-ই।" পাঠকের বোধ হয় চিনিতে বাকী নাই, যাঁহাকে শ্রীনিবাস পথে পথে খুজিতেছেন, ইনি সেই নরহরি সরকার মহাশয়।

শ্রীনিবাসের পরিচয় পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কিন্তু ঠাকুর মহাশয়! বৃদ্ধ হইয়া বালককে এত চুম্বন কেন? তাহার গায়ে এত হাত বুলান কেন? তুমি কি মন্ত্র পড়িতেছ? সে বাপ-মার একলা ছেলে,—সে যে পাগল হইয়া পড়িবে, লক্ষ্মীপ্রিয়ার আঁচলের ধনকে তুমি কি আর ঘরে থাকতে দিবেনা?

আমাদের কথা একবারে মিথ্যা নহে, বালক একা পাগল হইলনা, উভয়েই পথের উপর একটী কাণ্ডকারখানা করিয়া ফেলিল। অনেক কথাবার্ত্তা হইল, ঠাকুরের শেষ কথাটী উচ্চৈঃস্বরে উঠিল—"তোমার দ্বারা আমার প্রভুর বিশেষ কার্য্য হইবে।" বৃদ্ধ বালকের নিকট চিত্তটী রাখিয়া নিজের পথে অগ্রসর হইলেন, বালকও তাহার আত্মা বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার বৃদ্ধ-ঠাকুরদাদার ঘরে উঠিল।

ঘরের ছেলে ঘরে গেল, কিন্তু ঘোর পরিবর্ত্তন! তাহার ভিতর যেন কিছু ঢুকিয়াছে। স্বামীর স্পর্শে বালিকা-বধূটী যেমন অকস্মাৎ নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করে, নরহরির স্পর্শে এই বালকটীরও যেন সেই দশা হইয়াছে, তাহার ভিতরের গুপ্ত-ভাবগুলি যেন ব্যক্ত হইতে বসিল, ফুলটী যেন এই ফুটিবে আর কি! পণ্ডিতেরা যেমন তাহার অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া দশমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, ভাবুক ভক্তেরা সেরূপ কচি বালকটীর অলোকসামান্য চৈতন্য-প্রীতি দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন।

পিতামাতা অভক্ত হইলে তাহার হাসা কাঁদা নাচা গাওয়ায় তাহাদিগকে ভূতের ওঝা ডাকিতে হইত; কিন্তু যেমন বাবা তেমনই ছেলে, যেমন চৈতন্যদাস

তেমন শ্রীনিবাস। দুইজনের আর কোন কার্য্য নাই, কেবল প্রভুর কথায় ভাসাভাসি। সময় নাই, অসময় নাই—কেবল এক কথা। প্রভু এবং প্রভুর ভক্তগণ-সম্বন্ধে ঠাকুরের পেটে যত কিছু ছিল, পেটুক পুত্রটী ক্রমে ক্রমে সব বাহির করিয়া লইল। ঠাকুর লোভী, তাঁহার পেটে বড় কম ছিলনা, তাঁহাকে আমরা চৈতন্য-কথার সাগর বলিতে পারি; বালক অদ্ভুত বটে, সে সাগর শুষিয়া লইল, তাহাতে তাহার তৃষ্ণা কমিলনা, বরং বাড়িয়া উঠিল। পুরী এবং বৃন্দাবনে প্রভু এবং প্রভুভক্তজনের অনেকেই বর্ত্তমান, তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য সে অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার ভিতর একদিকে ধ্বনি হইতে লাগিল—"কখন কি হয় বলা যায় না, যাও যাও সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাও।" আর একদিকে ধ্বনি হইল,—"না, না, আর কিছুদিন থাক, এখনও যে পিতা মাতা উভয়েই বর্ত্তমান।" বালক দুই ধ্বনির ভিতর এক পা ঘরে রাখিয়া, আর এক পা পথের উপর তুলিয়া কোনওরূপে কাল কাটাইতে লাগিল।

কালে কাল আসিল। চৈতন্যদাস ভাল মানুষ, হঠাৎ জ্বর হইল। সে কি জ্বর, আমরা বলিতে পারি না। তাপ বড় বেশী, সপ্তম হইতে দশমে উঠিল! তিনি "হা চৈতন্য" বলিয়া ছটফট করিতে লাগিলেন, বেশীক্ষণ তাঁহাকে সে দশায় থাকিতে হইল না,—কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া উঠিলেন, নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ খুব বেশী জ্বলিল, ঘর আঁধার হইল, চৈতন্যদাস হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিত্য-আলোর দেশে চলিয়া গেলেন। সতী লক্ষ্মী জগন্নাথের বরপুত্রটী লইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

বিধাতা যে বিধিব্যবস্থায় একটী শিশুকে মহাপুরুষ করিয়া তুলেন, আমরা তাহা বিশেষরূপে জানি না, তবে মহাপুরুষদের জীবনী পড়িয়া দেখিতে পাই—হয় পিতা, নয় মাতা, কিম্বা উভয়েরই পরলোকগমন হইয়াছে। বালক শ্রীনিবাসের বেলায়ও এই নিয়মের অন্যথা হইল না, তাহাকে পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। তাহার দুঃখটা বড় বেশী হইবার কথা; তাহার পিতা কেবল জন্ম দিয়াই দায় এড়ান নাই, জন্মদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাকে চিন্তামণি-ধনের অধিকারী করিয়াছেন। দরিদ্র পিতার প্রসাদে সে যে চৈতন্য-রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, কোনও মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর পুত্রের ভাগ্যেও তাহা ঘটে না। জন্মদাতার প্রতিই ভক্তি স্বাভাবিক, সেই জন্মদাতা যদি আবার

প্রেমভক্তিদাতা হন, তবে তাঁহার প্রতি ভক্তপুত্রের কিরূপ প্রীতি হয়, সহজেই অনুমেয়, আর তাঁহার বিয়োগে কিরূপ দুঃখ হয়, তাহা যাহার হইয়াছে, সে-ই জানে, অন্যে কি বুঝিবে? উপযুক্ত পুত্র তিল-তুলসী গঙ্গাজল দিয়া ভাগ্যবান পিতার শেষের কার্য্য করিল, লক্ষ্মীপ্রিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার ক্রন্দনশীল পুত্রটীকে লইয়া কোনরূপে ঘরে মাথা দিয়া থাকিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে বেশীদিন আর তাঁহার স্বামীর ভিটাতে থাকা ঘটিয়া উঠিল না। পিতার শ্রীচৈতন্যপ্রাপ্তির পরে, অবস্থানুসারে বাধ্য হইয়া শ্রীনিবাসকে পৈতৃক ভদ্রাসন ত্যাগ করিতে হইল। মাতাপুত্রের যুক্তি স্থির হইল—বর্ত্তমান অবস্থায় যাজীগ্রামে থাকাই শ্রেয়।

চাখন্দী অন্ধকারময় হইল, যাজীগ্রাম জ্বলিয়া উঠিল। গ্রামের লোক "স্বস্তি স্বাগত" রবে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। গ্রামের জমিদার বালকের অলৌকিক আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। গ্রামের কর্ত্তা এবং গ্রামবাসী সকলেই যদি মুখ তুলিয়া চায়, তবে আর অভাব কি? শ্রীনিবাসকে তাহারা দয়ার পাত্র মনে করিতে পারিল না, বরং তাহাকে এবং তাহার মাতাকে লাভ করিয়া তাহারা নিজকেই কৃতার্থ জ্ঞান করিল। গ্রামের পশ্চিমদিকে তাঁহাদের মঙ্গলভবন উঠিল। ফাল্গুন মাসের পঞ্চমী তিথিতে তাঁহারা মহোৎসবের ভিতর গেহপ্রবেশ করিলেন।

ভগবান যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। শ্রীনিবাস প্রেমরাজ্যের পাখী, বনে বনে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যথা ইচ্ছা তথায় উড়িয়া বেড়াইতে চায়; যাজীগ্রামে আসিয়া তাহার এদিক ওদিক হইবার সুবিধা হইল। মাতাকে তাঁহার পিতামাতার গ্রামে রাখিয়া একআধটু উড়িবার বেশ সুযোগ ঘটিল।

তাঁহার উড়িয়া যাইবার ইচ্ছা একেবারে শ্রীবৃন্দাবনে, কিম্বা সমুদ্রের ধারে—শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে যেখানে শ্রীচৈতন্য মধুর মধুর লীলা করিতেছেন। শ্রীনিবাসের শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবল এক চিন্তা—কিরূপে লক্ষ্যস্থলে যাই? আমি বালক, আমার ভজন সাধন নাই, কোন্ বলে আমি শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিব?—শ্রীবৃন্দাবন-প্রাপ্ত হইব? ভিতর হইতে ধ্বনি হইল—"ভক্তকৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, নিরাশ্রয় দুর্ব্বল বালকের পক্ষে ভক্তের আশ্রয় গ্রহণই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" বালক এই অন্তরবাণীর নির্দ্দেশ অনুসারে

শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গভক্ত নরহরিকে ধরাই প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিল—কাজে কাজেই তাহার শ্রীখণ্ডে টান পড়িল। প্রেমের বালক, গৌরহরি এবং তাঁহার নরহরির প্রেমে কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হউক, আমরা এই অবসরে শ্রীখণ্ড-সম্বন্ধে দুএকটী কথা বলিয়া পবিত্র হই।

শ্রীখণ্ড।

"দেখনা তুমি হাটি হাটি,
কোথায় পাবে এমন মাটী।
এ মাটীর যে সবই মিঠা!
এখানে মধুমতীর ভিটা।

বর্দ্ধমান জেলার এই স্বনামধন্য পল্লীশিরোমণির নাম শ্রীখণ্ড কে রাখিয়াছিল, তাহা বলিতে পারিনা। তিনি যিনিই হউন, সরস্বতী তাঁহার রসনাযোগে খাঁটি সত্যই ঘোষণা করিয়াছিলেন, কারণ খণ্ড-শব্দের এক অর্থ মিষ্ট হয়, বৈষ্ণব-জগতে শ্রীখণ্ডের মত সুমিষ্ট আর কি আছে? এখানে যে সবই মধুর। ব্রজের যিনি মধুমতী, তিনি এখানে নরহরিরূপে আবির্ভূত। মধুমতীর এই স্মরণীয় লীলা-খেলার স্থলে সত্য সত্যই মধুব্যতীত আর অন্য কিছুই নাই। চৈতন্যবিজ্ঞানে ইহার জলবায়ু মাটী প্রভৃতি পরীক্ষা করিলে পরীক্ষক-মহাশয়কে অবশ্যই বলিতে হইবে, শ্রীচৈতন্যের সহিত এই পবিত্র স্থানটীর একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এখানে মানুষ চৈতন্য-ভক্ত না হইয়া থাকিতে পারেনা। আমরা ইহাকে চৈতন্যের ডিপো বা চৈতন্যভক্তের আড্ডাও বলিতে পারি। এখানেইত সেই রঘুনন্দন—যাঁহার হাতে পড়িয়া ঠাকুর লাড়ু খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে পিতা মুকুন্দ মহাপ্রভুর নিকট পিতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এখানেইত সেই লোচনঠাকুর—যিনি গোরার ধামালী গাহিয়া বৈষ্ণব-জগত মুখরিত করিয়াছেন! এখানেইত সেই চিরঞ্জীব সেন—যাঁহার মাণিক-যোড় গোবিন্দ এবং রামচন্দ্র কবিরাজ গৌড়ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন। এখানে বাস্তবিক ভক্তে ভক্তে ধূল পরিমাণ হইয়াছিল। একস্থানে এত ভক্ত একই সময়ে খুব কম স্থানেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভক্তমণ্ডলীর অধিকাংশই আবার জাতিতে বৈদ্য, হইবারই কথা। বৈদ্যজাতি ব্যাধি সারিবার

বিশেষ অধিকারী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাঁহারাই যথার্থ কবিরাজ। তাঁহারা তাঁহাদের অকথনীয় কথামৃতে ভবব্যাধিগ্রস্ত নরনারীকে চিরকালই নিরাময় করিয়া আসিতেছেন। আমরা এই শ্রীখণ্ডকে এবং শ্রীখণ্ডবাসিগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দ্রুতগামী শ্রীনিবাসের অনুসরণ করি।

শ্রীরঘুনন্দন একটী বৃক্ষের তলে বসিয়াছেন। কল্পতরুতলেই যাঁহাদের কাজ, তাঁহারা যে তথায় ঘুরা ফেরা করিবেন, ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। তাঁহার মন যেন একটু উতলা, কি যেন কি দেখিতে চান, তাই এদিকে ওদিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করিতেছেন—এমন সময় অলৌকিকদর্শন শ্রীনিবাস কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত। চোর দেখিলে চোরের প্রাণ নাচিয়া উঠে,—লম্পটের আভাস পাইলেই লম্পট চিনিতে পারে, এক জাতীয় দুইটী লোকের চারি চক্ষুর মিলন হইলেই আর পরিচয়ের বাকী থাকেনা—পরস্পর আকৃষ্ট হয়।

রঘুনন্দন আগন্তুক বালকটীর দিকে চাহিয়াই চিত্ত-চোরার কিছু গন্ধ পাইলেন, সেও প্রভুর কেহ নিশ্চয় জানিয়া যথাবিহিত প্রণাম করিলেন। শ্রীনিবাসের পরিচয় পাইয়া আত্মহারা ঠাকুর উন্মাদের ন্যায় কিছুক্ষণ হুঁ হুঁ করিলেন। দৈবক্রমে সেখানে নয়ানসেন উপস্থিত, তাঁহার বাড়ীতে সেদিন একটী খণ্ড-উৎসব, তাঁহার মহা আগ্রহে শ্রীনিবাসের মধ্যাহ্ন তাঁহার গৃহেই চলিয়া গেল। অপরাহ্নে চিরবাঞ্ছনীয় অভীষ্টদাতা নরহরির সহিত তাঁহার মিলন হইল। বৃদ্ধকালে অপুত্রক অকস্মাৎ পুত্ররত্ন পাইলে কি করিবেন স্থির করিতে পারেন না; চৈতন্যদাসের চৈতন্যময় পুত্রটী পাওয়ায় চৈতন্যপ্রিয় সরকার-ঠাকুরেরও সেই দশা হইল। পিতৃহীন বালকও তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদে হৃদয় ভরিয়া বল পাইল। শ্রীখণ্ডগ্রামে উঠিতে না উঠিতেই নৈরাশ্য সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, নরহরি-প্রমুখ ভক্তমণ্ডলীর মহা-সম্মিলনে বালক নূতন আশার মুখ দেখিয়া যেন নাচিয়া উঠিল।

ভক্তগণের হৃদয় স্বভাবতঃই আনন্দময়। বালভক্ত শ্রীনিবাসকে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দ যেন উথলিয়া উঠিল। তাঁহারা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভুর সহিত তাঁহার একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে; নতুবা জগতে এমন কি আছে তাঁহাদিগকে অসম্ভবভাবে আকর্ষণ করিবে? অভূতপূর্ব্ব এই প্রেমের বালকটী লইয়া তাঁহাদের ভিতর অনেক কথা হইল। সেই সরকার-ঠাকুরের ভাব যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে উপরে উপরে না হউক, মনে মনে বলিতে

হইয়াছিল "ভিতরে ভিতরে প্রভুর সহিত কোন বিষয়ে বিনাতারের যেন একটী বার্ত্তা চলিতেছে।" আমাদের তাহা শুনিবার উপায় নাই,—তবে একমাত্র প্রকাশ হইল, শ্রীনিবাসের পুরী-যাত্রাই স্থির। তাঁহার বড় ইচ্ছা, একবার হৃদয়ের দেবতা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এবং তাঁহার সঙ্গী ভক্তবৃন্দকে দর্শন করেন। তাহার মনকে সে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেনা, সর্ব্বদাই অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীশ্রীক্ষেত্রে ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। ঠাকুর নরহরি তাহাকে অনুমতি দিলেন, কেবল অনুমতি দিয়াই নিরস্ত হইলেন না, যাইতে তাহার কোন অসুবিধা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন—দীনহীন বালককে তিনি পথের সম্বল দিলেন। শুভস্য শীঘ্রং। ঠাকুর তাহাকে তাড়াতাড়ি যাইতে আদেশ করিলেন, কারণ প্রভুর ভাবগতি বড় ভাল নয়, ভাঙ্গাহাটে কখন কি হয় বলা যায়না।

শ্রীনিবাস, প্রভুর অন্তরঙ্গ নরহরি এবং অন্যান্য প্রিয় ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ লইয়া প্রথমতঃ যাজীগ্রামে জননীর নিকট উপস্থিত হইল। অন্তরের কথা বেশীক্ষণ গোপন করিয়া রাখিবার উপায় নাই; কারণ, তাহার চিত্তটী শ্রীচৈতন্যের জন্য পথের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ভক্তগণ বাল্যকাল হইতেই বড় চতুর। তাঁহারা যাহা করিবেন তাহা করিবেনই, এমন কাহারও সাধ্য নাই যে, তাঁহাদের অভিষ্টসিদ্ধির পথে দাঁড়াইতে পারে। প্রভুর ইচ্ছায় বাধা অনেক আসে বটে, কিন্তু তাঁহারা সে বাধা অতিক্রম করিতে বিশেষ দক্ষ। শ্রীনিবাসের আর কোন বাধা নাই। বাধা বলিতে কেবল তাঁহার স্নেহময়ী জননী। মাতৃভক্ত শ্রীনিবাস মাতার অনুমতি ব্যতীত এক পদও এদিক ওদিক হইতে পারেনা, সে মাতার নিকট এমন কৌশল করিয়া বসিল যে তিনি আর অনুমতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। যেমন প্রভু তেমন ভৃত্য। যে প্রভু তাঁহার মাতাকে ভুলাইয়া সন্ন্যাসের অনুমতি লইতে পারেন, তাঁহার ভৃত্য তাঁহার নিকট যাইতে তাহার মাতার নিকট সম্মতি লইতে যে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। এই বালকের কাণ্ড দেখিয়া দক্ষিণাপথের আর একটী অসাধারণ আচার্য্য-বালকের কথা মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতেছে। পাঠক তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছেন কি? তিনি সেই স্বনামধন্য দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্য—যিনি অল্প বয়সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। সংসারের বালকগণের কত কি ইচ্ছা হয়, কিন্তু অসাধারণ বালকের অসাধারণ ইচ্ছা! বাল্যকালেই শঙ্করের ইচ্ছা হইল "আমি

সন্ন্যাসী হইব", আর কথাটী নাই, তিনি একগলা জলের ভিতর গিয়া দাঁড়াইলেন, এই ডুবিবেন আর কি! মাতা হায় হায় করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বলিলেন—"আমি যাহা চাই, তাহা না দিলে ডুবিয়া মরিব—কি এই মরিলাম! মাতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বালক বলিলেন "আমি সন্ন্যাসী হইব।" মাতা আর কি করিবেন, জিভ্ কাটিয়া চোখের জল ফেলিলেন, শঙ্কর কৌশলে সন্ন্যাসের অনুমতি লইয়া কূলে উঠিলেন। জগতে আচার্য্যগণের সহিত কে পারিবে?" শ্রীনিবাসের মাতাও পারিলেন না। লক্ষ্মীপ্রিয়া হরিষে ও বিষাদে তাঁহার স্নেহের পুত্তলিকাকে পুরীর পথে তুলিয়া দিলেন। তিনি ভক্তপুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং সেই পুত্র ভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছে, এই জন্য তাঁহার হর্ষ; আর বিষাদের কারণ কি, যাঁহার পুত্র আছে তিনি সহজেই বুঝিয়া লইবেন। একমাত্র স্নেহের কন্যাকে স্বামিগৃহে প্রথম বিদায় দিবার সময় স্নেহময়ী বিধবা জননীর যে দশা হয়, আমরা যদি বলি, লক্ষ্মীপ্রিয়ারও সেই দশা হইল, তবে অতিরঞ্জিত করিয়া কিছু বলা হইবে না। তিনি মনে মনে অগতির গতি শ্রীচৈতন্যের করে বালককে সমর্পণ করিয়া কোনরূপে ঘরে মাথা দিয়া থাকিলেন। শ্রীনিবাস তাহার নিত্য-স্বামীর জন্য মনোরথ-বেগে পুরীর পথে অগ্রসর হইল।

পথে।

"সে বিনা আর কে মোর আছে,
কোন পথে যাই তাহার কাছে?
পথের লোক তোমরা সবে,—
কহ শ্রীধাম পাব কবে?"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা এপাড়া ওপাড়া হইয়াছিল,—সম্মিলনকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রসাদে গৌড়িয়া ও উড়িয়া এক হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৌড়িয়া উড়িয়ার দেশে প্রায়ই যাইতেছে, উড়িয়াও গৌড়িয়ার দেশে প্রায়ই আসিতেছে। গৌড়িয়াদের আত্মা উড়িয়াগণের ভিতর আছেন, তাহাদের কেহ না কেহ পুরীর পথে আছেনই—কখনও বা দলে দলে ভক্তগণ পথে পথে আনন্দের হাট বসাইয়া চলিতেছেন—কখনও কেহ একা-একাই হা গৌরাঙ্গ রবে ছুটিয়াছেন। এইরূপ যাতায়াতে দুই দেশের ভিতর যে সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, তাহা প্রশস্ত হইয়াছে। পথের দুই ধারে যাহারা বাস করে,

তাহাদের ভাগ্যের সীমা নাই—দিবানিশি দর্শনের উপর দর্শন। তাহাদিগকে আর "গৌর-ভজার" পরিচয় দিতে হয় না, তাহারা মানুষ দেখিয়াই বলিতে পারে ইনি গৌড়ভজা কি না; স্বরূপ এবং তটস্থ উভয় লক্ষণই তাহাদের জানা আছে; সুতরাং পথে উঠিয়া শ্রীনিবাসকে কাহারও নিকট পরিচয় দিতে হইল না—সে কে। তাহার মুখের হাবভাবই সকলকে বলিয়া দিল—দেখ দেখ, এমন গৌরাঙ্গভক্ত কখনও দেখিয়াছ কি? তারপর তাহার হাসা কাঁদা নাচা গাওয়ায় সকলকে অবাক্ করিল, তাহারা অনেক ভাবুক দেখিয়াছে; কিন্তু এরূপ নবীন ভাবুক ইতিপূর্ব্বে তাহাদের চক্ষে পড়ে নাই। তাহার ক্রন্দনে কে যে কাঁদিল, আর কে যে কাঁদিল না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাঁহারা চৈতন্যরাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহার ক্রন্দনে পশু পক্ষী দূরে থাকুক—তরুলতা পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিয়াছিল। যাহারা প্রাচীন মহাজনগণের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া মানিতে না পারেন, তাঁহারা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রপাতী তরুলতাতে লাগাইয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারেন। বিজ্ঞানের চক্ষুতে তাহাদের দেখিতে বাকী থাকিবে না যে, তরুলতার চৈতন্য আছে, তাহারাও মানুষের মত সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। মানুষ দুই চক্ষে ক্রন্দন করে, তাহাদের ক্রন্দন করিবার শত শত চক্ষু আছে। সে সব চৈতন্য-প্রাণগণ যে চৈতন্যভক্তের জন্য ক্রন্দন করিয়াছিল, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? ইহা কবির কল্পনা নহে, ইহা স্বাভাবিক। সেই সব চৈতন্যপ্রাণ তরুলতাগণ ক্রন্দন করিয়াই কর্ত্তব্যের শেষ করে নাই। তাহারা সাধ্যমত নানা উপচারে তাহার আনুকূল্য করিয়াছিল। এই পৃথিবীর উপর তাহারাই প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবক, তাহারা চৈতন্যসেবা করিবেন না কেন? শ্রীনিবাস প্রত্যক্ষ দেখিল, চৈতন্যের নামে যে পথের পথিক হইয়া তরুতল সার করে, তাহার ভাণ্ডার পথে পথেই পড়িয়া আছে। অভাব যে আসে, তাহা কেবল ভাববৃদ্ধির জন্য, দুঃখ যে আসে, তাহা কেবল সুখবর্দ্ধনের জন্য।

দুঃখ সত্য সত্যই আসিল, এক আধটু নহে, খুব বেশীরকম আসিল। দশদিকে হৃদয়ভেদী ধ্বনি উঠিতেছে—"নাই নাই নাই!" বাতাস ক্ষেপিয়া গিয়াছে, তাহার সহস্র মুখে কেবল "নাই নাই নাই!" মর্ম্মাহত বিহগবৃন্দের বিষন্ন বদনে ঐ এক ধ্বনি—"নাই নাই নাই!" পল্লবগুলি মর্ম্মর করিয়া ঐ এক

বিলাপগাথা তুলিয়াছে—"নাই নাই নাই!" যেখানে সেখানে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে—"নাই নাই নাই।" দুঃখ যেন সর্ব্বত্রই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, শোক যেন বিভু হইয়া চরাচরকে ছাইয়া ফেলিল! কুকুরগণ অশ্রুতপূর্ব্ব বিকৃতস্বরে উর্দ্ধমুখ হইয়া চীৎকার করিতে করিতে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল! যামঘোষগণ যাম ভুলিয়া পলে পলে কি যেন কি বিশ্ববাণীর বিষাদবার্ত্তা ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল! ধরণী ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া কম্পিত হইয়া উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিবাসের বাম অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—বাহিরের "নাই নাই নাই" ধ্বনি তাহার হৃদয় ভেদ করিয়াও উত্থিত হইল—লোকমুখে সে অবগত হইল, সে যাহার জন্য বালক হইয়াও পথের ভিখারী হইয়াছে, যাহার চরণকমল দর্শন করিবার জন্য দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়াছে, সেই আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগৎরঙ্গমঞ্চ হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়াছেন! বিষাদসিন্ধুর এই ভীষণ তরঙ্গাঘাতে আশাতুর শ্রীনিবাসের কিরূপ দশা উপস্থিত হইল, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে অক্ষম; তবে এ কথা নিশ্চয়, সৌভাগ্যবশতঃ সেখানে পাষাণ ছিল না, থাকিলে সে মাথা কুটিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, অনল থাকিলে ত রক্ষাই ছিল না, সে তাহাতে প্রবেশ করিয়া হয়তঃ অকালেই লীলা সাঙ্গ করিত,—চেতনা থাকিলেও বিপদ ছিল, সে যা হয় একটা কিছু করিয়া ফেলিত, সেই নিদারুণ বার্ত্তা শুনিতে না শুনিতেই সে "হা গৌরাঙ্গ" রবে সংজ্ঞাহীন হইল। যাহার জনক-জননী একদিন এই পথেই "হা গৌরাঙ্গ" রবে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, সে সেরূপ হইবে না কেন? সে যে সুযোগ্য পিতামাতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। একদিন তাহার পিতামাতা এই পথে পড়িয়াই স্বপ্নযোগে গৌড়কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের মুখোজ্জ্বলকারী বংশধর ভক্তিপদের যথার্থ দায়ভাক,—চৈতন্যের স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়া যে প্রভুর জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে পাগল হইয়াছে, সে তাঁহারই প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়া অভয়চরণ জড়াইয়া ধরিল,—প্রভু তাহার অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইয়া কতইনা সান্ত্বনাবাক্যে সুস্থির করিলেন! সেই স্বপ্নরাজ্যের দ্বার মুক্ত করিবার অধিকার আমাদের নাই,—তবে যাহা হইল, তাহা ভালই হইল,—আভাসে এই মাত্র ব্যক্ত করা যাইতে পারে যে, বর এবং অভয় উভয়ই পূর্ণমাত্রায় শ্রীনিবাস প্রাপ্ত হইল। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—পথে পথে মহাবিলাপকাব্য রচনা

করিবার জন্য সে জাগ্রত হইল। স্নেহময় পিতার পরলোকগমনে সে যত না কাঁদিয়াছিল, তত কাঁদিল তাহার স্বপ্ন-দৃষ্ট চৈতন্য-স্বামীর জন্য। তাহাকে পথের লোক যিনিই দেখিলেন, তিনি আর না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না—গৌড়চন্দ্র অন্তর্হিত হইয়া বোধ হয় এই নবাগত উদীয়মান গৌড়চন্দ্রের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন,—তাঁহার সম্বন্ধ ব্যতীত এরূপভাব অভাবগ্রস্ত মানব প্রকাশ করিতে পারে না।

তাহার ক্রন্দন যখন কিছুতেই থামিল না, তখন যোগ-নিদ্রাকে বাধ্য হইয়াই আবার তাহার নিকট আসিতে হইল! সে স্বপ্নযোগে দেখিল, আবার সেই বরাভয়দাতা আসিয়া তাহার শিরে চরণ ধরিয়া বলিলেন—"তুমি কাঁদিয়া আমার প্রাণে ব্যথা দিতেছ কেন? পুরীতে আমার যখন সবই আছে, তখন আমিও আছি,—তুমি শীঘ্র শীঘ্র সেখানে যাও,—ভাগবতের গদাধর—তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন,,—তোমাকে ভাগবতের ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইবে,—তুমি গৌড়ের আচার্য্যের আসনে উপবেশন করিবে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি, কাঁদিও না বৎস কাঁদিও না,—শীঘ্র লক্ষ্যস্থলে অগ্রসর হও"। প্রভাতী পাখী এমনই সময় যেন কুঞ্জভঙ্গের গান ধরিয়া দিল—"উঠজাগ"। সেই গানে শ্রীনিবাস জাগিয়া এবং উঠিয়া আনন্দ ও নিরানন্দের বেগবান তরঙ্গে বিতাড়িত হইয়া শ্রীক্ষেত্র-অভিমুখে চলিতে লাগিল।

পথের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সাধুবাদ এবং প্রশংসামূলক সমালোচনার ভিতর শ্রীনিবাস ভাবের আবেগে দ্রুতপাদক্ষেপে ধাবিত হউক, আমরা এই অবসরে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের তদানীন্তন দশাটীর প্রতি তাড়াতাড়ি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া লই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

আপন-ভোলা।

(তুমি) যা দিয়েছ প্রভু, আমার বলিতে সকলি তোমার দান।
(আর) "সকলি আমার" এভাবে ভুলায়ে হরিয়া লয়েছ জ্ঞান॥
খেলাঘর দিয়ে দাঁড়ায়ে অদূরে,
ছেলে-খেলা দেখি হাসিছ মধুরে,
খেলায় মাতিয়ে তোমারে ভুলিয়ে কেটে যায় দিনমান।
সান্ধ্য-আঁধারে তব মন্দিরে পাব কি প্রভুহে স্থান?

(ওগো) তোমারই খেলার মাদকতা-গুণে তোমারে পড়েনা মনে।
আমার মাঝারে খেলিছ যে তুমি ভাবিনাত কোনক্ষণে।
আকাশে বাতাসে পাখীর কূজনে,
পূজা-সম্ভার যোগায় যতনে।
(আমি) শুধু একা বসি নিরজনে খেলি খেলা আনমনে।
(তুমি) জলদ-মন্দ্রে লাগাও চমক, জাগাও চেতনা এনে।

(তুমি) মেঘেতে দিয়েছ উজল বিজলী শশীতে কিরণ-ধারা।
পাখীর গানেতে বেঁধে প্রাণতার করেছ পাগল পারা।
আকাশের নীল, গাছে সবুজ,
নয়নে মিলায়ে করেছ অবুঝ,
সোনালী উষার প্রাণের দোলেতে করেছ গো মাতোয়ারা।
(তুমি) তারই মাঝে আছ ধরিতে পারিনা, কবেগো পড়িবে ধরা?

(প্রভু) আমারি মাঝারে বসিয়া তুমি যে খেলিছ এসব খেলা।
(তবু) তোমারি মায়ায় আমারে ডুবায়ে করিছ কতনা ছলা।
চপলা চমকে এ ভ্রম আঁধারে।
দেখাও আলোক ঘুচাও ধাঁধারে!
তোমারই চরণ-পরশে তরুক মন-গৌতমী শীলা।
অবোধে আঁধারে রাখিয়া প্রভুহে, খেলোনা বিষম খেলা।

শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্ত্তী, কাব্যনিধি।

গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা বিচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৪। গোবিন্দদাসের কড়চা যেমন অবাস্তব ঘটনায় পূর্ণ, গোবিন্দ কর্ম্মকার নামটিও তেমনই আমাদের নিকট কল্পিত (fictitious) বলিয়াই মনে হয়। কারণ, কোন প্রামাণিক গ্রন্থে চৈতন্য প্রভুর ভৃত্য কিম্বা পারিষদ্‌বর্গের মধ্যে এই গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম কুত্রাপি উল্লিখিত দেখা যায় না। প্রভুর অন্ত্য-লীলার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে কুত্রাপি গোবিন্দ কর্ম্মকার নাম দৃষ্ট হয় না। মহাপ্রভুর অন্ত্য-লীলার প্রসিদ্ধ ভৃত্য গোবিন্দদাস—যাহার উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনিই এই গোবিন্দ কর্ম্মকার কিনা এবং তিনিই দক্ষিণ-ভ্রমণে প্রভুর অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন কিনা এরূপ সংশয় কেহ উত্থাপিত করিতে পারেন না। কারণ, প্রভুর প্রসিদ্ধ ভৃত্য গোবিন্দদাস পূর্ব্বে প্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী মহাশয়ের পরিচারক ছিলেন। প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগত হইলে পর, ইনি পুরী গোঁসাইর তিরোভাব-কালীন আদেশ অনুসারে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত সম্মিলিত হন এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পরামর্শ মতে প্রভু ইঁহাকে স্বীয় পরিচর্য্যায় গ্রহণ করেন। ঈশ্বরপুরীর পরিচর্য্যা সমাপ্ত করিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রভুর সেবার জন্য গোবিন্দ শুধু একাকী আসিয়াছিলেন না। আরও একজন আসিয়াছিলেন, তিনি কাশীশ্বর। এই কাশীশ্বর ও গোবিন্দ পুরী-গোঁসাইর সেবকদ্বয় তাঁহাদের গুরু-পরিচয়ের সুবিধার নিমিত্ত গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় একই সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছেন, যথা— "শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভুসেবকৌ।" চৈতন্যচরিতামৃতে এই দুইজনের পরিচয় এবং প্রভু সম্বন্ধে উভয়ের নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ পরিচর্য্যা-কার্য্য এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিলা আসিয়া॥

*   *   *   *

অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলেন কাশীশ্বর॥

মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে।

(চৈঃ চঃ আদি ১০ম)

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১০ম পরিচ্ছেদে প্রভুর সহিত গোবিন্দের মিলন বর্ণিত রহিয়াছে। ইহা প্রভুর দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগত হওয়ার পর। যথা—

"আর দিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ সঙ্গে।

বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥

হেন কালে গোবিন্দের হৈল আগমন।"

এই হইল মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ ভৃত্য গোবিন্দদাসের কথা। পক্ষান্তরে কড়চাকারক গোবিন্দ কর্ম্মকার তাহার কড়চার বর্ণনা অনুসারে প্রভুর সন্ন্যাসের এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। যথা—

"চৌদ্দ শ ত্রিশ শকে বাহিরেতে যাই।

* * * *

প্রাতে গঙ্গা পেরিয়ে আইনু নদের ঘাটে।"

(কড়চা পৃঃ ১।২)

সুতরাং প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দদাস কড়চাকারক গোবিন্দ কর্ম্মকার নহেন। আর তিনি দক্ষিণ-ভ্রমণে প্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন না। প্রতিপক্ষ বলে—কল্পনা দ্বারা—গোবিন্দ কর্ম্মকারকে গোবিন্দ দাসের সহিত একই ব্যক্তি করিতে চাহিতেছেন। তাহার যুক্তির অসারতা স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

১৫। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ কবিকর্ণপুর-কৃত "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা" ১৪৯৮ শকে বিরচিত হয়। ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রভুর তাবত ভক্ত ও পার্ষদ মহাজনগণের নাম ও পূর্ব্বাবতার-পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের সঙ্গী কালাকৃষ্ণদাসের নাম এই গ্রন্থে এইরূপ আছে—"কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গ সখা ব্রজে।" চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীচৈতন্য-সেবক ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য কাশীশ্বর ও গোবিন্দের উল্লেখ এই পুস্তকে কি ভাবে আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে কড়চাকারক গোবিন্দ কর্ম্মকারের উল্লেখ কুত্রাপি নাই। যথার্থতঃ গোবিন্দ কর্ম্মকার বলিয়া কেহ প্রভুর প্রিয় ভক্ত, ভৃত্য বা অনুচর থাকিলে এই গ্রন্থে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত।

১৬। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আদিলীলার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এই গোবিন্দ কর্ম্মকারের উল্লেখ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রভুর আদিলীলার শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রত্যক্ষ-লীলা-দর্শী সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত পণ্ডিত শ্রীনিবাস পণ্ডিত এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তাঁহাদের সমক্ষে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। নারায়ণীর সুকৃতিশালী পুত্র শ্রীল বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থ রচনায় মুরারি গুপ্তের কড়চাও বিশেষরূপে অবলম্বন করা হয়। মুরারি গুপ্তের কড়চা প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর আদি লীলার যাবতীয় পার্ষদ ভক্তগণেরই উল্লেখ আছে। কিন্তু কুত্রাপি গোগিন্দ কর্ম্মকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে আমরা ৪ জন গোবিন্দের উল্লেখ পাই।—গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দানন্দ ও দ্বারপাল গোবিন্দ। ইহাদের ভিতরে প্রথম দুইজনের জাতি স্পষ্ট। তৃতীয় গোবিন্দানন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ ও চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন। চতুর্থ ব্যক্তি দ্বারপাল গোবিন্দকে লইয়া আমাদের বিচার করিতে হইবে। এই দ্বারপাল গোবিন্দকে আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর আদি বিদ্যালীলা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যলীলা পর্য্যন্ত বহুস্থানে বর্ণিত দেখিতে পাই। অতি সামান্য অনুসন্ধানেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই দ্বারপাল গোবিন্দ কর্ম্মকার নহেন। কারণ, কড়চা দৃষ্টে জানা যায়, গোবিন্দ কর্ম্মকার ১৪৩০ শকে অর্থাৎ প্রভুর সন্ন্যাসের এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে দ্বারপাল গোবিন্দ প্রভুর আদি বিদ্যালীলা হইতেই অর্থাৎ তাঁহার সন্ন্যাসের অন্যূন ৭।৮ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই প্রভুর অনুচর ও দ্বার-রক্ষক ভৃত্যরূপে দৃষ্ট হন। যথা চৈতন্যভাগবত আদি ৭ম পরিচ্ছেদে—"দেখি জিজ্ঞাসয়ে প্রভু গোবিন্দের স্থানে। এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥" পুনরায় কাটোয়ার সন্ন্যাসের সঙ্গীরূপে এই দ্বারপাল গোবিন্দকে আমরা দেখিতে পাই, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ১ম পরিচ্ছেদ—"নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি। গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী॥" এই দ্বারপাল গোবিন্দকেই আবার প্রভুর নীলাচল যাত্রার সঙ্গীরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যথা চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য ২য় পরিচ্ছেদ—"নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ। সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥" প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে নীলাচল প্রত্যাগমনের পরও এই

দ্বারপাল গোবিন্দ দৃষ্ট হন, যথা, অন্ত্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদ—"চৈতন্যের দ্বারপাল সুকৃতি গোবিন্দ।" (প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত চৈতন্য-ভাগবত-টীকা দ্রষ্টব্য।) সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই দ্বারপাল গোবিন্দই কড়চাকারক গোবিন্দ কর্ম্মকার নহেন। এস্থলেও জনৈক বৈষ্ণব-সাহিত্যিক ইতিহাসের নামে যে গুরুতর ভ্রম প্রচার করিয়াছেন, তদ্বিষয় আমরা পরে বর্ণনা করিব।

১৭। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের ভৃত্যসঙ্গী-রূপে এক-মাত্র কালাকৃষ্ণ দাস নামক এক ব্রাহ্মণ-যুবকের নাম ও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য দক্ষিণে যাইতে কাহাকেও সঙ্গী লইতে চাহেন নাই, নিত্যানন্দ বহু চেষ্টায় কৃষ্ণদাসকে প্রভুর সঙ্গে দেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৭ম পরিচ্ছেদ—

"তোমার দুইহস্ত বদ্ধ নাম গণনে।
জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥
* * * *
তবে তার বাক্যে প্রভু করে অঙ্গীকার॥"

এই কৃষ্ণদাস দক্ষিণে ভট্টমারীদের দেশে তাহাদিগ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া যান। প্রভু তাহাকে তাহাদের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। পরে প্রভু নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া কৃষ্ণদাসকে [illegible] হইতে বিদায় করিয়া দেন। যথা—

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারী সহ তার হৈল দরশন॥
স্ত্রীধর দেখাইয়া তার লোভ জন্মাইল।
* * * *
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারী ঘরে॥

(প্রভু) কেশে ধরি বিপ্রে লৈয়া করিল গমন।

পরে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াঃ—

প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণে গেলেন ইহো আমা সহিত॥
ভট্টমারী হইতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
*   *   *   *
এবে আমি ইহাঁ আনি করিল বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি দায়॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
(চৈঃ চঃ মধ্যে ৯ম পরিচ্ছেদ)

অতঃপর শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন-সংবাদ বাংলায় পৌঁছাইবার জন্ম নবদ্বীপে পাঠাইয়াছেন। এতটা বিবরণ কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে চৈতন্তচরিতামৃতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কৃষ্ণদাস প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণে সঙ্গী হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে শ্রীখণ্ডের অদূরে এখনও তাহার পাটবাটী বর্ত্তমান ও প্রসিদ্ধ। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ কবি কর্ণপুর বিরচিত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় এই কৃষ্ণদাসের নাম ও পূর্ব্ব পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। চৈতন্তচরিতামৃতে আদি ১০ম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই কালাকৃষ্ণদাসকে তাহার স্বপরিচয়ার্থ অতি স্পষ্টভাষায় প্রভুর শাখারূপে গণনা করিয়াছেন, যথা—

কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন॥

সুতরাং প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের সঙ্গীরূপে এই কালাকৃষ্ণদাসের বর্ণনা চৈতন্ত-চরিতামৃতকারের ভ্রম কিম্বা মনঃকল্পনা বলিতে যাওয়া অতিশয় দুঃসাহসিকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" লেখক তাহার অত্যদ্ভুত যুক্তিদ্বারা এস্থলে কিরূপ বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহা আমরা স্থানান্তরে সন্নিবেশিত করিব।

যাহা হউক, গোবিন্দদাসের কড়চায় এই কালাকৃষ্ণদাসের বিষয় কিছুমাত্র পাওয়া যায়না। জয়গোপাল গোস্বামী সম্পাদিত গোবিন্দদাসের কড়চায় কালা-

কৃষ্ণদাসের নাম মাত্র উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু গোলোকগত শিশির বাবুর হস্তে উক্ত জয়গোপাল গোস্বামী এই কড়চার যে পাণ্ডুলিপি দিয়াছিলেন, তাহাতে কালাকৃষ্ণদাসের নাম কুত্রাপি ছিলনা। শিশিরবাবু লিখিয়াছেন যে বহিখানিকে প্রামাণিক করিবার অভিসন্ধিতে পুস্তক-সম্পাদককর্ত্তৃক পরে ইহার ভিতরে কালাকৃষ্ণদাসের নামটি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। (অমিয় নিয়াই-চরিত ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৪৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য) সুতরাং ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, গোবিন্দ দাসের কড়চার মূল পাণ্ডুলিপিতে (কড়চা যাহা কর্ত্তৃকই লিখিত হইয়া থাকুক) কালা-কৃষ্ণদাসের নামটি পর্য্যন্ত ছিলনা। এই কালাকৃষ্ণদাসের কোন উল্লেখ না থাকা গোবিন্দদাসের কড়চায় কল্পিতত্ব প্রমাণ করিতেছে।

১৮। কবি জয়ানন্দ কৃত চৈতন্যমঙ্গলের মুদ্রিত পুস্তক যাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ১৩১২ সালে (গোবিন্দদাসের কড়চা প্রকাশের ১০ বৎসর পরে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ৮৩ পৃষ্ঠায় গোবিন্দ কর্ম্মকার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপাড় ॥

এই জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পুরাতন পুস্তক বটে, কিন্তু প্রামাণিক নহে। প্রাচীন বৈষ্ণবসমাজ কর্ত্তৃক কদাপি উহার প্রামাণিকতা স্বীকৃত হয় নাই। এই পুস্তকে কোন কোন বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্য কিছু থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু বহু বিষয়েই ইহার একান্ত উদ্ভট ও অযথার্থ কল্পনা ধরা পড়ে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দেখান যাইতে পারে, জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী চৈনন্যদেবের মাতা শচীদেবীর দীক্ষাগুরু। যথা—"আই ঠাকুরাণী বন্দোঁ। চৈতন্যের মাতা। পণ্ডিত গোসাঞি যাঁর দীক্ষামন্ত্র-দাতা ॥" (জয়ানন্দ চৈ, ম, পৃঃ ২) এইরূপ একান্ত উদ্ভট ও অন্যায় কল্পনা জয়ানন্দ কিরূপে করিতে পারিয়াছেন, বুঝা যায় না। জয়ানন্দ-বর্ণিত মহাপ্রভুর তিরোধান ব্যাপারটিও ঐরূপ। "আষাঢ় মাসে একদা কীর্ত্তন করিতে করিতে চৈতন্যদেবের পদ ইষ্টকবিদ্ধ হয়, দুই এক দিনের মধ্যেই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়. শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং সপ্তমী তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন।" এইরূপ বহু অবাস্তব কথা আছে, যাহাতে আমরা জয়ানন্দের বহি খাঁটি ইতিহাস

হিসাবে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। অথবা লোকরঞ্জনের নিমিত্ত নানাবিধ অদ্ভুত কল্পনাকারী কবি-গায়কের গানের ভিতর অবিমিশ্র সত্যের আশা করাও সমীচীন নহে। আমরা প্রবন্ধান্তরে জয়ানন্দের বহির প্রামাণিকতা বিচার করিব। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখা-বিনির্ণয়ে সুবুদ্ধিমিশ্রের নাম আছে বটে, কিন্তু তাহার জয়ানন্দ নামে পুত্র ছিল এবং সে প্রভুর অতি প্রিয় ছিল, ইহা কুত্রাপি পাওয়া যায় না। 'গৌড়গণোদ্দেশ-দীপিকা'—যাহাতে তাৎকালিক সমুদয় প্রধান বৈষ্ণবগণের নাম ধৃত হইয়াছে—তাহাতে জয়ানন্দের নাম দৃষ্ট হয় না। ইহাতে জয়ানন্দের ঐতিহাসিকতা ও প্রামাণিকতার মূল্য নাশ হইয়া যাইতেছে।

কবি জয়ানন্দের পূর্ব্বোল্লিখিত আধুনিক মুদ্রিত পুস্তকে 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' নাম যথার্থতঃ উক্ত গ্রন্থকারের লিখিত কিনা, তৎসম্বন্ধেও বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে গোবিন্দ কর্ম্মকার যে প্রভুর সহিত দক্ষিণ ভ্রমণে গিয়াছিলেন সে কথা এই পুস্তকের কুত্রাপি পাওয়া যায় না। মুদ্রিত পুস্তকে আমরা শুধু দেখিতে পাই, গোবিন্দ কর্ম্মকারকে প্রভুর সন্ন্যাসের কালে গঙ্গার পাড়ে কাটোয়ায় যাওয়ার নিমিত্ত বলা হইয়াছে। জয়ানন্দের সমগ্র পুস্তকের ভিতরে এই 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' নামটি দ্বিতীয়বার দৃষ্ট হয় না। আর এই গোবিন্দ কর্ম্মকার যে কড়চা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, জয়ানন্দের বহিতে তাহার কোন উল্লেখ কিম্বা প্রমাণ নাই। বরং জয়ানন্দের বহি দ্বারা তৎকালে কড়চার অনস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। কারণ, কবি জয়ানন্দ তাহার গ্রন্থে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক কবিগণও তাহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর নাম বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু উহার ভিতরে গোবিন্দ কর্ম্মকার কিম্বা তৎকৃত কোন পুস্তকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তৎকালে যথার্থতঃ গোবিন্দের কড়চার অস্তিত্ব থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ জয়ানন্দের তালিকার ভিতরে প্রাপ্ত হইতাম। জয়ানন্দের উক্ত তালিকাটি আমরা পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে প্রদান করিতেছি, যথা—

রামায়ণ করিলা বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিলা কৃত্তিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়।
গুণ রাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিলা প্রকাশ॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্যচরিত্র আগে করিলা প্রচার॥
চৈতন্য সহস্রনাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥
শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়।
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ গোবিন্দবিজয়॥
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।
বৃন্দাবনদাস প্রচারিলা সর্ব্বোপরি॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গ্রন্থ।
গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপাল বসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে।
চৈতন্যমঙ্গল তাঁরা চামর বিছন্দে॥
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।
জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে॥

(জয়ানন্দ চৈ, ম, পৃঃ ৩)

পাঠক দেখিতেছেন, কবি জয়ানন্দ তাঁহার এই তালিকায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও তাৎকালিক সমগ্র বৈষ্ণব-কবিগণের ও তাহাদের গ্রন্থসমূহের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ও তৎপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-সম্বন্ধে যিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার উল্লেখ এই তালিকায় তিনি করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। এই তালিকায় গোবিন্দদাসের কড়চার কোনরূপ উল্লেখ না থাকায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে গোবিন্দদাস কর্ম্মকারের কড়চার অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গোবিন্দের কড়চার অনৈতিহাসিকতা ও অপ্রামাণিকতাই প্রতিপন্ন করিতেছে। ইহা অতি স্পষ্ট। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, গোবিন্দের কড়চার রচনার কাল (কড়চার বর্ণনা অনুসারে) ১৪৩০—৩২ শক ; আর জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে) ১৪৮০—৯২ শকের রচনা।

১৯। এক্ষণে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে "গোবিন্দকর্ম্মকার" পাঠ সম্বন্ধে সংশয়ের বিষয় লিখিতেছি। মুদ্রিত পুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়ঃ—

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দকর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার॥

এস্থলে 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' পাঠটি পুস্তকের যথার্থ পাঠ কিনা? গোবিন্দ দাসের কড়চার অভিভাবক মহাশয় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের হস্তলিখিত পুঁথির দোহাই দিয়া বলিতেছেন, ইহাই ঠিক পাঠ। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-দার্শনিক-পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় জয়ানন্দের প্রাচীন পুঁথিতে এ স্থলে কিম্বা অন্য কোনও স্থানে 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' পাঠ দেখিতে পান নাই। শ্রীযুক্ত রসিক-মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ স্থলে পাঠ দেখিয়াছেন, 'গোবিন্দানন্দ'। বিগতবর্ষে অগ্রহায়ণ মাসে আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় জয়ানন্দের চারিখানা পুঁথি খণ্ডিতভাবে প্রাপ্ত হই। উঁহার ২২৪১ নম্বরের পুঁথিখানি আনুমানিক আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। উহার ১৬ পত্রে উক্ত পায়ারটি নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া যায়—

মুকুন্দদত্ত বৈদ্য মকুন্দ কর্ম্মকার।
মোর সাথে আইস কাটুআ গঙ্গাপাড়॥

এ স্থলে 'মুকুন্দ কর্ম্মকার' পাওয়া গেল। অন্য তিনখানি পুঁথিতে এই খণ্ডটি না থাকায় দেখা যায় নাই। জয়ানন্দের পুঁথিতে এইরূপ পাঠের গোলযোগ দেখিয়া ইহা 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' পাঠ কুত্রাপি থাকিলেও উহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ।

মন্তব্য।—একমাত্র কৃষ্ণদাস-নামক ব্রাহ্মণই প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণ দেশে গিয়াছিলেন, ইঁহাকেই ভট্টমারী সন্ন্যাসিগণ প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন; শ্রীমন্মহা-প্রভুর সমসাময়িক কবি কর্ণপুর-গোস্বামীও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

অথাস্য সঙ্গে জগদীশ্বরস্য ব্রজন্তমেকং পরিলোলচিত্তং।
ত্বং কৃষ্ণদাসাখ্যমমী বিলোক্য বিলোভয়াঞ্চক্রুরতীব মন্দাঃ॥
—১৩।২৩

শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমনের পরে এই কৃষ্ণদাসকে যে প্রভু ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে।

অথৈষ নাথঃ পুরতোহমীষাং সাক্ষিত্বমাধায় চ কৃষ্ণদাসং।
তং ক্ষেত্রমানীতমতিপ্রযত্নাদ্‌গচ্ছেতি সম্যগ্‌বিসর্জ্জ তত্র॥
—১৩।৫৪

অথচ, দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"তাঁহার (কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর) পূর্ব্ববর্ত্তী চরিতকারেরা কেহই কৃষ্ণদাস ঠাকুরকে চৈতন্য প্রভুর দাক্ষিণাত্য-গমনের সহচর বলিয়া বর্ণন করেন নাই। বৃন্দাবন কিম্বা কবিকর্ণপুর—যাঁহারা বৈষ্ণব-গণের মতে প্রামাণিক ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা কেহই কৃষ্ণদাস ঠাকুরের এ প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। বরঞ্চ কর্ণপুর এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, কোন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সহচর হয়েন নাই।—মাসিক বসুমতী, চৈত্র, ১৩৩১ সন, ৮৯১ পৃঃ।" ডি, লিট্‌ মহাশয়ের সত্যবাদিতার বিচিত্র-বিলাস দেখিয়া হাসিও পায়, দুঃখও হয়। —সম্পাদক।

প্রশ্ন-সমালোচনা।

(৮)

শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (গিরিডি) কয়টি প্রশ্ন পাঠাইয়াছেন :—

১ম প্রশ্ন ঃ—শ্রীগৌরধাম কোথায়? শ্রীগোলোক ভিন্ন শ্রীগৌর-লীলা নিত্যবিহারের কোনও স্বতন্ত্র ধাম আছে কি না?

উঃ ঃ—শ্রীনবদ্বীপই গৌরধাম। প্রকট নবদ্বীপের কথাই গোস্বামি-গ্রন্থাদিতে স্পষ্ট লিখিত আছে, অপ্রকট নবদ্বীপের কথা কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। তবে শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপের এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরের সম্বন্ধ আলোচনা করিলে এ বিষয়ে একটা অনুমান করা চলে।

প্রত্যেক ভগবদ্ধাম ও তদ্ধামস্থিত ভগবৎপরিকরগণ, ঐ ধামাধিপতি ভগবৎ-স্বরূপের লীলাদির অনুকূল; ধামের স্বরূপও ধামাধিপতির স্বরূপের অনুরূপ। বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিচরণগণের মতে নবদ্বীপ-বিলাসী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, ব্রজবিলাসী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের আবির্ভাব-বিশেষ। ইহা হইতে মনে হয়, শ্রীনবদ্বীপও শ্রীবৃন্দাবনের আবির্ভাব-বিশেষ।

পরব্যোমের ঊর্দ্ধভাগে সহস্রদল-পদ্মাকৃতি একটী ধাম আছে, তাহার নাম গোকুল। এই গোকুলই শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট বৃন্দাবন-লীলার স্থান। গোকুলের চতুষ্পার্শ্বে চতুষ্কোণাকৃতি একটী ধাম আছে, তাহার নাম গোলোক। সাধারণতঃ গোলক ও গোকুলকে একসঙ্গে গোলোক বলা হয়। এই গোলোক হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার একদিনে একবার ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট বিহার করেন।

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্যবিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার।
অবতীর্ণ হৈয়া করেন প্রকট বিহার॥ চৈঃ চঃ।

এইরূপে বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া

দাস-সখা-পিতা-মাতা-কান্তাগণ লয়্যা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান। চৈঃ চঃ।

প্রকট ব্রজ হইতে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোলোকে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান।
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান॥
*   *   *
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানারঙ্গে॥ চৈঃ চঃ।

ইহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কথিত শ্রীগৌর-লীলার সূচনা। ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীগোলোকে বসিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে প্রকট হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, অপ্রকট নবদ্বীপও শ্রীগোলোকই, অথবা গোলোকের অন্তর্গত কোনও একটী ধাম।

শ্রীল লোচনদাসঠাকুর-রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আরও একটু বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীনারদকে বলিতেছেন,

বৈকুণ্ঠ-উপরি স্থান, গোলোক যাহার নাম
শ্রীগৌরসুন্দর তাহে রাজা।

—সূত্রখণ্ড ২৪ পৃঃ। *

গোলোকস্থিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিবরণ বলিয়া শ্রীজগন্নাথদেব নারদকে গোলোকে যাইয়া গৌর-দর্শন করিতে বলিলেন। তখন,

চলিলা নারদ-মুনি শুনি অপরূপ বাণী
বেদ-অগোচর এই কথা।
বৈকুণ্ঠ-উপর আর, গোলোক দেখিব যার,
সকল ভুবনে গুণ গাঁথা॥

নারদ যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের চরণ দর্শন করিলেন; শ্রীনারায়ণও বলিলেন,

যার ছায়া বিষ্ণু আমি, সম্পদ্‌ছায়া লখিমিনী,
বৈকুণ্ঠের ছায়া এ বৈকুণ্ঠ।
মুক্তি-ছায়া চারিমুক্তি, সভে আবরিয়া ভক্তি
সভে নাথ সে পহুঁ বৈকুণ্ঠ॥

*   *   *   *

নিশ্চয় বচন মোরি, অমায়া সে গৌরহরি,
প্রকট করুণা-কল্পতরু।
চল মুনি চলি যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাঁঞি,
সকল ভুবনে শিক্ষাগুরু॥

নারদ গোলোকে যাত্রা করিলেন; গিয়া দেখিলেন,

সব তরু কল্পদ্রুম, তহি এক নিরুপম,
রত্নমদী তার দুইপাশে।
স্বর্ণ-সিংহাসন তায়, বসিয়া গৌরাঙ্গ রায়,
সরস মধুর লহু হাসে॥

---

* প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণ।

নারদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্তবস্তুতি করিলেন ; তখন,

ঐছন নারদবাণী, শুনি কহে গুণমণি,
চল চল চল মুনিরাজ।
কলিলোক নিস্তারিব, নিজভক্তি প্রচারিব
জনমিব নদিয়া-সমাজ ॥
—সূত্রখণ্ড ২৬ পৃঃ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের প্রামাণ্যতা স্বীকার করিলে বুঝা যায়, অপ্রকটলীলায় গোলোকেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্থিতি। কিন্তু শ্রীগোপালচম্পূ-আদি গ্রন্থে গোলোক-বিহারীর যে স্বরূপের বর্ণনা আছে, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ নহে। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর গোলোকের অন্তর্ভুক্ত কোনও ধামেই অপ্রকটলীলা করিতেছেন। এই ধামকে যদি অপ্রকট-নবদ্বীপ বলা যায়, তাহা হইলে অপ্রকট-নবদ্বীপ গোলোকের অন্তর্ভুক্ত ধাম-বিশেষ বলিয়াই মনে হয়।

২য় প্রশ্নঃ। অদ্যাবধি এই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥

ইহার তাৎপর্য্য কি? এই লীলা কি আধ্যাত্মিক, অথবা অপ্রাকৃত প্রকট-লীলা? কি ভাবে এই লীলার উপলব্ধি হয়?

উঃ—"অদ্যাবধি এই লীলা" ইত্যাদি পয়ারে গৌর-লীলার নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে।

প্রাকট্যের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়, শ্রীভগবানের লীলা দুই শ্রেণীর—প্রকট ও অপ্রকট। উভয় লীলাই নিত্য। অপ্রকটলীলায়, অপ্রকট ধামে নিরবচ্ছিন্ন-লীলা প্রবাহ চলিতেছে। প্রকট-লীলা জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে নিত্য, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে প্রকট-লীলা নিত্য নহে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড-সমষ্টির হিসাবে নিত্য ; প্রত্যেক প্রকটলীলাই, যখনই এক ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হয়, তখনই আবার অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়। মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন যোগমায়া-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহে প্রকট-লীলা চলিতে থাকে। এইরূপে লীলার প্রাকট্য নিত্যই বিদ্যমান।

কোনও ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হইলেও, যদি কোনও ভক্ত উৎকণ্ঠাভরে আর্ত্ত হইয়া ঐ লীলা দর্শনের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্টলীলা দর্শন করাইয়া থাকেন।

চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজপ্রিয়াঃ।
তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎতান্ কৃপানিধিঃ॥
—লঘুভাগবতামৃত।৩৯১।

এইরূপে অদ্যাপিও কোনও কোনও ভাগ্যবান্ ভক্ত শ্রীগৌরের কৃপায় গৌর-লীলা দর্শন করিতে পারেন।

"এই লীলা কি আধ্যাত্মিক"—এইবাক্যে প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় কি, বুঝিতে পারিলামনা।

শ্রীগৌরের কৃপায় অদ্যাপিও কোন কোন ভাগ্যবান্ গৌরের যে লীলা দেখিতে পায়েন,—প্রকটলীলা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায়, ইহা তাহা নহে। কারণ, প্রকটলীলা সকলেই দেখিতে পায়েন; কিন্তু ভাগ্যবান্ ভক্ত অদ্যাপিও যে লীলা দেখেন, তাহা অপর কেহ দেখিতে পায়েন না। ইহা অপ্রকট-লীলাও নহে, কারণ অপ্রকট-লীলা লোক-নয়নের গোচরীভূত নহে। ইহা গৌর-লীলার "আবির্ভাব" বলিয়াই মনে হয়। ভগবদ্-বিরহ-জনিত ক্লান্তির উদ্রেকে, প্রেমবিবশ-চিত্ত ভক্তগণ যখন অধীর হইয়া পড়েন, তখন ভগবান ব্যগ্র হইয়া অকস্মাৎ তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হয়েন (দেখা দেন); এইরূপ প্রাদুর্ভাবকেই আবির্ভাব বলে।

বৈশ্লেষিক-ক্লমোদ্রেক-বিবশীকৃতচেতসাম্।
প্রেষ্ঠানাং সহসৈবাগ্রে ব্যগ্রঃ প্রাদুর্ভবেদসৌ॥
—লঃ ভাঃ ৪৬৯।

ভগবান্ বিভু বস্তু, তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে যখন যেখানে ইচ্ছা প্রাদুর্ভূত হইতে পারেন।

ভজনের প্রভাবে চিত্তের সমস্ত দোষ দূরীভূত হওয়ার পরে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, প্রেমের আবির্ভাব হয়, একমাত্র তখনই ভগবদ্বিরহের স্ফূর্ত্তিতে ভগবৎকৃপায় এইরূপ লীলার আবির্ভাব সম্ভব। জাতপ্রেমভক্তব্যতীত আর কাহারও এইরূপ সৌভাগ্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

৩য় প্রশ্ন।—পরিপূর্ণ গৌরপ্রাপ্তির স্বরূপ কি? শ্রীগৌর-লীলায় কাহার পরিপূর্ণ গৌর প্রাপ্তি হইয়াছে?

উঃ।—পরিপূর্ণ গৌর-প্রাপ্তি বলিতে গৌরের পরিপূর্ণ সেবা-প্রাপ্তিই,

সর্ব্ববিধ-অন্তরঙ্গসেবা-প্রাপ্তিই বুঝায়। কান্তা-প্রেম-সম্বন্ধে শ্রীলরামানন্দরায় বলিয়াছেন,

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। চৈঃ চঃ মঃ ৮।

ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রজসুন্দরীগণই পরিপূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গৌররূপে নবদ্বীপে প্রকট হইলেন,তখন ব্রজগোপীগণও গৌর-পরিকর-রূপে পুরুষদেহে নবদ্বীপে প্রকট হইলেন। ইঁহারা রাধাভাবাঢ্য গৌরের যে সেবা করিয়াছেন, তাহাই পরিপূর্ণ গৌর-সেবা। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের নিমিত্ত রাধাভাবাঢ্য গৌর যে সকল চেষ্টা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই সকল চেষ্টার আনুকূল্য বিধানই ভাবাঢ্য গৌরের মুখ্য সেবা; এই সেবা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদেরই পরিপূর্ণ-গৌর-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্বরূপ-দামোদর, রায় রামানন্দাদি গৌর-পার্ষদগণই পরিপূর্ণগৌর-সেবাপ্রাপ্ত ভক্তের আদর্শ।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ—এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।

আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥

শ্রীগৌর-লীলার তিরোভাবে কি শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন নিত্য লীলার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়? তাহা যদি হয়, তবে শ্রীগৌর-লীলার নিত্যত্ব-হানি হয়। শ্রীগৌর-লীলার নিত্যত্ব আছে কি না?

উঃ ঃ—শ্রীগৌর-লীলা নিত্য, প্রশ্নকর্ত্তার উদ্ধৃত পয়ার এবং "গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে" ইত্যাদি শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের বাক্যই তাহার প্রমাণ।

প্রথম প্রশ্নের আলোচনায় গোলোকের অন্তর্ভুক্ত যে অপ্রকট নবদ্বীপের কথা বলা হইয়াছে, প্রকট-গৌর-লীলার তিরোভাবে বোধ হয়, সেই ধামেই গমন হয়।

৫ম প্রশ্ন ঃ—অন্যান্য অবতার-লীলা—যেমন শ্রীরামলীলা, উহা নিত্যলীলা যদি হয়, তবে রাম-লীলার নিত্যবিহার ধাম কোথায়?

শ্রীরাম-লীলাও নিত্য। পরব্যোমে সমস্ত অবতারেরই পৃথক্ পৃথক্ ধাম আছে; ইঁহাদের প্রত্যেকের ধামকেই বৈকুণ্ঠ বলে; এইরূপে পরব্যোমে, অনন্ত অবতারের অনন্ত বৈকুণ্ঠ আছে। শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য ধামও পরব্যোমে।

বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলা।

অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্য-কূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ॥

—বৃঃ ভাঃ ১০।

সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোম-ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব নাহিক গণনে॥
—চৈঃ চঃ মঃ ২৯।

৬ষ্ঠ প্রঃ।—গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডলভূমি, যে বা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥

শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের এই পদের গূঢ় অর্থ কি? যিনি শ্রীগৌর-মণ্ডলভূমি চিন্তামণি বলিয়া জানেন, তাঁহার ব্রজভূমে বাস হইবার কারণ কি? শ্রীগৌর-মণ্ডলভূমি চিন্তামণি জ্ঞানলাভের পরে আবার ব্রজভূমি লাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। শ্রীগৌরলীলান্তর্গত শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা উপলব্ধির স্বরূপ কি? শ্রীগৌরস্বরূপ-প্রাপ্তির পরে কি আবার শ্রীরাধাগোবিন্দ-স্বরূপ প্রাপ্তির ইচ্ছাও প্রয়োজন হয়? হইলে ইহার ক্রম কি?

উঃ।—"শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে" ইত্যাদি বাক্যে গৌরের, গৌরপরিকর-গণের এবং গৌরলীলার নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে। "শ্রীগৌরমণ্ডলভূমি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীনবদ্বীপের চিন্ময়ত্ব সূচিত হইতেছে। উভয় বাক্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ব্রজলীলা আস্বাদনের উপায় এবং ক্রমও ব্যক্ত হইতেছে।

গোলোকস্থিত গৌরধামের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বলিয়াছেন,

তনু চিদানন্দময়, ভূমি চিন্তামণি হয়,
কল্পতরু সর্ব্বতরু তথা।
—সূত্রখণ্ড ২৫ পৃঃ।

গৌরধামে যত পরিকর আছেন, সকলের তনুই চিদানন্দময়—তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত নহে; গৌরধামের ভূমি চিন্তামণিময়—প্রাকৃত মাটী নহে। অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রাকট্য-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।

ভগবানের ইচ্ছাতেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম নিজের সমস্ত বৈভব লইয়া প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়। লীলার অন্তর্ধানের পরে আমরা যে নবদ্বীপ বা বৃন্দাবন দেখিতে পাই, তাহাও প্রাকৃত নহে—তাহাও অপ্রাকৃত চিন্ময়, তাহাতেও

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
(তবে,)　চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
(আর,)　প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৫ম।

শ্রীনবদ্বীপাদির যে প্রকাশ এখন আমরা দেখিতে পাই, তাহা চিন্ময় এবং নিত্য হইলেও, তাহাতে অন্যান্য প্রাকৃত স্থানের ন্যায় জন্মমৃত্যু, ভাঙ্গা গড়া ইত্যাদি দৃষ্ট হইতেছে। তাহার কারণ এই। শ্রীভগবান যেমন স্বেচ্ছাক্রমে লৌকিক-লীলা অঙ্গীকার করিয়া সময় সময় লৌকিক-চেষ্টা প্রকাশ করেন, তাঁহার ধামসমূহও প্রাকৃত-জগতে প্রকটিত হওয়ায় স্বেচ্ছাবশতঃই প্রাকৃত স্থানের রীতি-বিশেষ প্রকাশ করেন। "অত্র তু যৎ প্রাকৃতপ্রদেশ ইব রীতয়োঽবলোক্যন্তে, তত্তু শ্রীভগবতীব স্বেচ্ছয়া লৌকিক-লীলাবিশেষাঙ্গীকার-নিবন্ধনমিতি জ্ঞেয়ম্। —শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ১৭২॥

শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের পদে গৌরমণ্ডলের এইরূপ প্রপঞ্চাতীতত্বই সূচিত হইতেছে।

অখণ্ডরসস্বরূপ চিদানন্দঘনমূর্ত্তি নন্দ-নন্দনেই পরব্রহ্মত্বের চরম-বিকাশ; আর অখণ্ডরসবল্লভা শ্রীমতী রাধারাণীতেই স্বরূপ-শক্তির চরম-অভিব্যক্তি। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের পরম-অভিব্যক্তিস্বরূপ যুগলিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই পরম-স্বরূপ। এই পরম-স্বরূপের প্রেম-সেবাপ্রাপ্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ—ইহাই গোস্বামি-শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। এই যুগলিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই সম্মিলিত বিগ্রহে শ্রীগৌররূপে নবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছেন।

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত এবং জীবের প্রতি করুণাবশতঃ জগতে রাগমার্গের ভক্তি প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত ব্রজে লীলা প্রকট করিয়াছেন। ব্রজে তিনি অশেষ বিশেষে রস আস্বাদন করিয়া থাকিলেও রসাস্বাদনের পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই—রসাস্বাদন-সম্বন্ধীয় কয়েকটী বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে প্রকটিত হইয়া তিনি তাঁহার অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করেন। আর রাগমার্গের ভক্তি-প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে ব্রজে তিনি এমন সব অপূর্ব্ব লীলা প্রকট করিলেন, যাহা দেখিয়া বা যাহার কথা শুনিয়া মায়িকসুখমুগ্ধ জীব মায়িকসুখের অকিঞ্চিৎকরতা এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখের

অসমোর্দ্ধতা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইতে পারে। তাহার পাওয়ার উপায়ও তিনি বলিয়া দিয়াছেন—মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ ইত্যাদি বাক্যে; কিন্তু একটা চিত্তাকর্ষক আদর্শের অভাবে জীব তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিতে পারে নাই। নবদ্বীপ-লীলায় ভক্তভাবে তিনি নিজে সাধনভক্তির আচরণ করিয়া জীবকে আদর্শ দেখাইলেন—রাগমার্গের ভক্তি-প্রবর্ত্তন চরম-পরিণতি প্রাপ্ত হইল। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-প্রকটন,তাহার সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, পূর্ণতা নবদ্বীপে। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা—একই লীলা-প্রবাহের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন অংশ—ব্রজলীলা পূর্ব্বাংশ, আর নবদ্বীপলীলা উত্তরাংশ। এই দুই অংশের মধ্যে নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গেই জীবের নিকটতম সম্বন্ধ; কারণ, নবদ্বীপ-লীলাতেই পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার লীলাসূত্রটী জীবের হাতে ধরাইয়া দিয়াছেন; এই সূত্র ধরিয়াই জীবকে ভজন-রাজ্যে—লীলা-আস্বাদন-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইলে সর্ব্বপ্রথমেই নবদ্বীপ-লীলার সাক্ষাৎ হইবে, তারপর নবদ্বীপলীলায় ডুব দিতে পারিলেই ব্রজলীলায় প্রবেশ-লাভ সম্ভব হইবে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,

কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার,
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে গৌরাঙ্গ-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥

গৌর-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবর হইতেই কৃষ্ণলীলারূপ ধারা প্রবাহিত হইতেছে। কৃষ্ণলীলারূপ ধারায় প্রবেশ করিতে হইলে, গৌর-লীলারূপ অক্ষয় সরোবরে ডুব দিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন,

গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।
গৌর-প্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ ॥

গৌর-লীলার নিত্যত্ব এবং গৌর-ধামের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া যিনি গৌর-লীলায় প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছেন,তাঁহার পক্ষেই যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রূপ পরমস্বরূপের প্রেমসেবারূপ পরমপুরুষার্থ-লাভ সম্ভব—ইহাই প্রশ্নকর্ত্তার উদ্ধৃত ত্রিপদীর সার ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়।

ব্রজ ও নবদ্বীপের মধ্যে দুইটী লীলা-স্রোত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া মনে করা যায়, একটী প্রকাশ্যে ব্রজ হইতে নবদ্বীপে এবং অপরটী গূঢ়ভাবে নবদ্বীপ হইতে ব্রজে। নবদ্বীপে এই লীলাস্রোতে যিনি ডুব দিবেন, তিনি গূঢ় লীলাস্রোতের বেগে বাহিত হইয়া ব্রজে উপস্থিত হইবেন—এজন্যই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, "গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।" এবং এজন্যই আরও বলিয়াছেন—"তার হয় ব্রজভূমে বাস।"

ব্রজ ও নবদ্বীপ—উভয় ধামেই যখন একই মৌলিক উদ্দেশ্যে যুগলিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণ পরম-স্বরূপের আনন্দাস্বাদনময়ী লীলা এবং উভয় ধামের লীলার মিলনেই যখন ঐ পরম-স্বরূপের আনন্দাস্বাদনের পূর্ণতা, তখন কেবল নবদ্বীপলীলা বা কেবল ব্রজলীলার সেবাতেই ঐ পরমস্বরূপের প্রেম-সেবা-প্রাপ্তির পূর্ণতা হয় না; উভয় লীলায় সেবাপ্রাপ্তিতেই তাহার পূর্ণতা। এ জন্য শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ও বলিয়াছেন,

মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলি সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
—প্রার্থনা ৪৩।

এবং এজন্যই "শ্রীগৌরমণ্ডলভূমির চিন্তামণি-জ্ঞান-লাভের পরে আবার ব্রজভূমি-লাভের প্রয়োজনীয়তা।"

সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বদাই ব্রজের ভাবে আবিষ্ট থাকেন। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় যে ভাগ্যবান্ ভক্তের গৌর-লীলায় প্রবেশ লাভ হয়, গৌর-পরিকরগণের ভাব-তরঙ্গ-স্পর্শে তাঁহার চিত্তেও ব্রজের ভাব স্ফুরিত হয়, তখন তিনিও ব্রজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। এইরূপেই গৌর-লীলার যোগে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার উপলব্ধি সম্ভব হয়।

(৯)

শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার নাথ (অনুপমপুর, রাজসাহী) মহাশয় লিখিয়াছেন :—

১ম প্রঃ।—স্ত্রীলোকে ঋতুকালে দিবসত্রয় আহ্নিক এবং হরিনামের মালা গ্রহণ করিতে পারে কি না? তিলক-ধারণে কোনও দোষ হয় কি না?

উঃ।—রজস্বলা স্ত্রীলোকের দেহ অপবিত্র থাকে, এই সময়ে আহ্নিক-কৃত্যের

অর্চ্চনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করাই সঙ্গত। রজঃপ্রবৃত্তির চতুর্থ দিবসে স্ত্রীলোক দৈব-কার্য্যের ও পিতৃকার্য্যের উপযোগিনী শুদ্ধতা লাভ করে না। পঞ্চম দিনেই এই শুদ্ধতা লাভ হয় :—

শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেঽহ্নি ন শুদ্ধা দৈব-পৈত্র্যয়োঃ।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, কৃষ্ণ-জন্ম খণ্ড ৫৯।১১৮

দৈবে কর্ম্মণি পৈত্র্যে চ পঞ্চমেঽহনি শুধ্যতি॥

—ইতি শুদ্ধিতত্ত্বধৃতশঙ্খবচন।৪৭।

শ্রীহরিনাম-গ্রহণে কোনও বাধা নাই ; কারণ, শ্রীহরিনাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে দেশেরও নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদি-জনিত অশুচি-অবস্থায়ও নামগ্রহণে দোষ নাই,

ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি বিষ্ণোর্নামনি লুব্ধক॥

সাধনভক্তি-সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

সর্ব্বদেশ কাল-পাত্র-দশাতে ব্যাপ্তি যার।

সকল সময়ে, সকল স্থানে সকল অবস্থাতেই সকল কর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠেয়।

সুতরাং ঋতুকালে শ্রীহরিনামগ্রহণে কোনও বাধা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না ; বরং ঋতুস্নানের পর জপ-মালার অভিষেক করা যাইতে পারে। ঋতু-কালে তিলক-ধারণেও দোষ আছে বলিয়া মনে হয় না। মালা-তিলক বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বাবস্থাই ধারণীয়।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ (লীলাস্মরণ ও মন্ত্রস্মরণ) -আদিও সকল অবস্থায় করা যাইতে পারে।

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।

শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥

২য় প্রশ্ন। কোন শিষ্য যদি নিরামিষাশী ও আতপান্নভোজী হয়েন, কিন্তু গুরুদেব যদি আমিষাশী ও সিদ্ধান্নভোজী হয়েন, তাহা হইলে উক্ত শিষ্য তাহার গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে কিনা ? না করিলেও কোনও প্রত্যবায় আছে কিনা ? অথবা গুরুদেব যদি অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার উচ্ছিষ্ট-গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত কিনা ? এইরূপ স্থানে ঐ শিষ্যের কর্ত্তব্যই বা কি ?

উঃ—শাস্ত্র-বিহিত দ্রব্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ গ্রহণ করাই বৈষ্ণবের পক্ষে বিধি ; অনিবেদিত দ্রব্য কোনও বৈষ্ণব গ্রহণ করেন না।

অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্।
বৈষ্ণবাশ্চ ন খাদন্তি নৈবেদ্যভোজিনঃ সদা॥

—ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃঃ ১০।৪৮

আমিষাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইবার রীতি নাই ; যিনি আমিষাদি দ্বারা ভোগ লাগান, কিম্বা যিনি অনিবেদিত বস্তু আহার করেন, তাঁহার আচরণ বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তিনি যদি তাঁহার শিষ্যকে তাঁহার ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিতে বলেন এবং শিষ্যও যদি তাহা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয়েরই প্রত্যবায় উপস্থিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকংঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

—ভক্তিসন্দর্ভ।২৩৮।

"যে ব্যক্তি **ন্যায়রহিত কথা বলে, আর যে ব্যক্তি তাহা শুনে, তাহাদের উভয়কেই অক্ষয় কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিতে হইবে।"**

এইরূপ স্থলে শিষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আশ্বিনমাসের সাধনার ৩৩৪ পৃঃ ১ম প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(১০)

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ চন্দ্র নাথ ভাদুরী মহাশয় (ভারৈয়া, বরিশাল) লিখিয়াছেন :—

১ম প্রশ্ন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ ?

উঃ—শ্রীচৈতন্যভাগবতের যে সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আছে, তাহাদের অধিকাংশেই আদিখণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে এইরূপ পাঠ আছে :—

বোলেন ঈশ্বরপুরী "আমি **ক্ষুদ্রাধম।**
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"

কিন্তু শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থে "ক্ষুদ্রাধমের" স্থানে "শূদ্রাধম" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে কি আছে, তাহা জানা দরকার।

গোবিন্দদাসের কড়চা-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান-ব্যাপারে ঢাকা-স্বর্ণগ্রামনিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন ঘোষ মহাশয় অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির ৪১২নং পুঁথির ৭৬পৃষ্ঠায় (শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের) এইরূপ পাঠ আছে ঃ—

বোলেন ঈশ্বরপুরী "আমি **বিপ্রাধম।**
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥"

এই পাঠই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় ; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায়, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

পুরীগোসাঞি শূদ্রসেবক কাহেঁতে রাখিলা।

পুরীগোস্বামী নিজে শূদ্র হইলে এইরূপ জিজ্ঞাসারই অবকাশ থাকিত না।

হস্তলিখিত পুঁথিতে "বিপ্রাধম" স্থলে "ক্ষুদ্রাধম" শব্দের অনুমান অস্বাভাবিক নহে। হাতের লেখায় অনেকের "প্র" অক্ষরটী "দ্র" এর মত দেখায় ; "বি" অক্ষরটী একটানে লিখিলে কাহারও কাহারও হাতের লেখায়, সম্মুখের অংশশূন্য "ক্ষ" এর মত দেখাইতে পারে। "বি" এর পরে "প্র" অক্ষরটী হাত না উঠাইয়া একটানে লিখিলে "প্র" এর প্রথম লিখিতাংশ, "বি" এর সঙ্গে যুক্ত করিলে "ক্ষ" এবং "প্র" এর অবশিষ্টাংশ "দ্র" এর মত দেখাইতে পারে। আবার কেহ কেহ "্র" ফলা লিখিবার সময় "্র" ফলার বামদিকের প্রান্তকে "ু" এর মত করিয়া লিখিয়া থাকে ; "প্র" অক্ষরের "্র" ফলা এইরূপে লিখিত হইলে এবং "বি" এর নিম্নভাগে উক্ত "্র" ফলার "ু" আকৃতি-অংশ পতিত হইলে "প্র" এর আদ্যংশযুক্ত "বি" অক্ষর "ক্ষু" বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এইরূপেই কেহ হয় তো হস্তলিখিত পুঁথির "বিপ্র" শব্দকে "ক্ষুদ্র" বলিয়া "বিপ্রাধম" স্থলে "ক্ষুদ্রাধম" পাঠ দিয়াছেন। "শূদ্রাধম" সঙ্গত পাঠ বলিয়া মনে হয় না ; "বিপ্রাধম" শব্দস্থলে "শূদ্রাধম" পড়াও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না ; কারণ "প্র" স্থলে "দ্র" পড়া স্বাভাবিক হইতে পারে ; কিন্তু কোনওরূপ হাতের লেখাতেই "বি" অক্ষরকে "শূ" এর মত দেখাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, পুরীগোস্বামী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

২য় প্রঃ ঃ—শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু কে ?

উঃ ঃ—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা প্রকট করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বৈষ্ণবশাস্ত্রে মতভেদ আছে বলিয়া আমরা জানি না।

প্রভু বোলে "গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হৈল, ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ॥"
আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥

*　　*　　*

তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ১২শ অঃ।

তবে ত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাহাঞি মিলন॥
দীক্ষা অনন্তর কৈল প্রেমপরকাশ।

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭শ পঃ।

মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
যেঁহ কৃষ্ণ বলি সদা কাঁদেয় ফুকরি॥
তচ্ছিষ্য শ্রীদেবদেব চৈতন্যগোসাঞি।
মো সবার উপায় যাঁহা বিনে আর নাই॥—ভক্তমাল।

ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্॥ ২৫

—গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা।

(১১)

শ্রীযুত ধীরেন্দ্রচন্দ্র নাথ (বাঘা, রাজসাহী) মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

১ম প্রঃ ঃ—দুর্গা ও কালী উভয় দেবীই বৈষ্ণবগণের প্রণম্য কি না ? যদি প্রণম্য হয়েন, তবে কোন্ ভাবে প্রণম্যা ? বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সাধনভজন করেন কি না, কিম্বা করিতে পারেন কি না ?

উঃ ।—দুর্গা ও কালী উভয় দেবীই বৈষ্ণবগণের প্রণম্যা ; তাঁহারা ভগবৎশক্তি।

ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুকুর অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥ —চৈঃ ভাঃ।

ইহাই বৈষ্ণবের প্রতি শাস্ত্রের আদেশ ; কুকুরাদি প্রাণীও যখন বৈষ্ণবের প্রণাম পাওয়ার যোগ্য, তখন ভগবৎ-শক্তি শ্রীদুর্গাদি প্রণম্যা কি না, এই প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

বৈষ্ণবের সাধ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ; তদুদ্দেশ্যে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরই বৈষ্ণবের ভজনীয় ; অন্য দেবদেবীর সাধন-ভজন বৈষ্ণব করেন না। যদি কেহ শ্রীদুর্গাদির পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবী-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারেন ; স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা বৈষ্ণব-শাস্ত্র-নিষিদ্ধ।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।—হঃ ভঃ বিঃ
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥
—ব্রহ্মসংহিতা।

কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং।—শ্রুতি।
একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।—চৈঃ চঃ।

২য় প্রঃ ।—উক্ত দেবীদ্বয়ের প্রসাদ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিতে পারেন কি না? যদি তাঁহাদের প্রসাদ-গ্রহণ বৈষ্ণব-সম্মত হয়, তবে যে স্থানে উক্ত শক্তিপূজায় "পাঁঠাবলি" হয়, তথায় কি কর্ত্তব্য?

উঃ ।—যদি কোনও বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ দ্বারা শ্রীদুর্গাদির পূজা করেন, তাহা হইলে শ্রীদুর্গার সেই প্রসাদ বৈষ্ণব গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীবিষ্ণুতে অনিবেদিত দ্রব্যদ্বারা পূজা করিলে, ঐ প্রসাদ গ্রহণে প্রত্যবায় হইবে।

ভুক্ত্বান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
ভুক্ত্বা কেশব-নৈবেদ্যং যজ্ঞ-কোটি-ফলং লভেৎ ॥
—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯।১৩৩

"দ্বিজ ব্যক্তি বিষ্ণু-নৈবেদ্য ভোজন করিলে কোটিযজ্ঞের ফল লাভ করিবেন ;

কিন্তু অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে তাঁহাকে চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

—ভক্তমালধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।

"বিষ্ণুর নৈবেদ্যকেই সুর, সিদ্ধ এবং ঋষিগণ পবিত্র মনে করেন। অন্য দেবতার নৈবেদ্য-ভোজনে চান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠান করিতে হয়।"

বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা বৈষ্ণব যখন শ্রীদুর্গার পূজা করিবেন, তখন "পাঁঠা বলি" হইবে না। যেখানে পাঁঠা বলি, সেখানেই অন্যরূপ পূজা হইতেছে বলিয়া মনে করিবে।

(১২)

শ্রীযুত বিনোদবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় (নূতন মদনমোহন দেবের আশ্রম, বরিশাল) লিখিয়াছেন :—

প্রঃ।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়, নারায়ণ শঙ্খাসুরের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া বর প্রদান করিলেন যে, তুমি আমার উপরে নীচে থাকিবে; এবং সীতাদেবী তুলসীকে শাপ দিলেন যে, তোমার পত্রে কুকুর প্রস্রাব করিবে। বর-প্রদানকালে নারায়ণ তুলসীকে আরও বলিলেন যে, সধবা স্ত্রীলোক তোমার সেবা করিবে না; কারণ, শঙ্খজল গায় পড়িবে। এখন আমার প্রশ্ন হইল এই যে, বৈষ্ণবগণ যে তুলসী সেবা করেন, সেই তুলসী এই তুলসী এক কি না? সধবাগণ সেবা করিলে কোনও অপরাধ আছে কি না? তুলসীকে কোন্ নারায়ণ বর দিয়াছিলেন—পরব্যোমের নারায়ণ, না আমাদের শ্রীগোবিন্দ? শঙ্খাসুরের স্ত্রী জড়-দেহা না চিন্ময়-দেহা ছিলেন? শঙ্খাসুরের স্ত্রীর জন্মের পূর্ব্বে শ্যামসুন্দরের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় তুলসী ব্যবহার হইত কিনা? তুলসী ভগবানের নিত্যসিদ্ধপরিকর; শঙ্খাসুরের স্ত্রী হইতে তুলসী-সেবার বিধান হইলে ভগবানের নিত্যলীলায় দোষ স্পর্শে কিনা?

উঃ—সীতাদেবীকর্ত্তৃক তুলসীর শাপের কথা কোন্ পুরাণে আছে, বলিতে পারিনা; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আমরা ইহা খুঁজিয়া পাইলাম না।

"সধবা স্ত্রীলোক তুলসীর সেবা করিবে না," নারায়ণের বরে এরূপ কোন কথা

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। তুলসীসেবায় সধবা স্ত্রীলোকের অনধিকারের কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে, জানি না। বরং সকলের পক্ষেই তুলসী-সেবার বিধিই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত অগস্ত্যসংহিতাবচন। ৯।৩৬।

"বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে, বিশেষতঃ আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী, যে কেহই তুলসীর অর্চ্চনা করিবেন, দেবী তাঁহাকে ইষ্ট ফল দান করিবেন।"

শঙ্খ-সিন্দূর সধবা স্ত্রীলোক অত্যন্ত আদরের সহিত ধারণ করেন; কারণ, এই দুইটী বস্তুই সধবার চিহ্ন; সধবার হস্তস্থিত শঙ্খ-বলয়ের জল নিত্যই তাঁহার গায়ে পড়িয়া থাকে; তাহাতে কেহই কোনওরূপ প্রত্যবায় আশঙ্কা করেন না।

গোলোক-বিহারী শ্রীগোবিন্দের বিলাস-মূর্ত্তি পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণই তুলসীকে বর দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া তুলসীর গোলোকে নিত্যস্থিতি। শ্রীরাধিকার শাপে তিনি একস্বরূপে মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গোলোক হইতে আসিবার সময়ে শ্রীগোবিন্দও তাঁহাকে বর দেন যে, তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপকে তিনি পতিরূপে পাইবেন। এই দিকে গোলোকের নিত্য-পরিকর সুদামও শ্রীরাধার শাপে একস্বরূপে শঙ্খচূড়-রূপে অসুরদেহে জন্মগ্রহণ করেন; গোলোকে তিনি একবার তুলসীর সঙ্গ-কামনা করিয়াছিলেন; অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি তুলসীকেই পত্নীরূপে পাওয়ার নিমিত্ত তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহার অভীষ্ট বর দিলেন। এইদিকে তুলসীও ধর্ম্মধ্বজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণকে পতিরূপে পাওয়ার নিমিত্ত তপস্যা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিলেন যে, তিনি প্রথমে শঙ্খচূড়কে ও পরে নারায়ণকে পতিরূপে পাইবেন। বলা বাহুল্য তুলসী ও শঙ্খচূড় উভয়েই জাতিস্মর ছিলেন।

এই বিবরণ হইতে বুঝাযায়, শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসী জড়দেহা ছিলেন না— নিত্য-পার্ষদগণের দেহ কখনও জড় হইতে পারে না। বিশেষতঃ শঙ্খচূড়-পত্নী-

দেহেই শ্রীনারায়ণ তুলসীকে সম্ভোগ করিয়াছেন ; শ্রীনারায়ণের পক্ষে জড়দেহ সম্ভোগ সম্ভব নহে।

তুলসী গোলোকপতির নিত্যসিদ্ধ পরিকর ; গোলোক ত্যাগ করিয়া আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে ; গোলাক ত্যাগ করিলেই তাঁহার নিত্যপরিকরত্ব থাকে না। শ্রীরাধার শাপে তিনি অপর এক স্বরূপেই মানবী-যোনিতে জন্ম-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, স্বয়ংরূপে তিনি গোলোকেই ছিলেন ; এইরূপ মনে না করিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ঘটে।

অংশরূপে তুলসী বৃক্ষরূপা ; বৃক্ষরূপেও তিনি অনাদিকাল হইতে গোলোক-বৃন্দাবনে অবস্থিতা।

বৃন্দারূপা চ বৃক্ষাশ্চ যদেকত্র ভবন্তি চ
বিদুর্বুধাস্তেন বৃন্দাং মৎপ্রিয়াং তাং ভজাম্যহম্॥
পুরা বভুব সা দেবী হ্যাদৌ বৃন্দাবনে বনে।
তেন বৃন্দাবনী খ্যাতা তাং সৌভাগ্যাং ভজাম্যহম্॥

—ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃঃ ২২।১৮—১৯॥

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডেও তিনি নিরন্তর পূজিত হইতেছেন ;

অসংখ্যেষু চ বিশ্বেষু পূজিতা যা নিরন্তরম্॥

—ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃঃ ২২।২০॥

এই শ্লোকের "নিরন্তর" শব্দ হইতেই বুঝা যায়, ব্রহ্মাণ্ডেও তিনি অনাদিকাল হইতেই পূজিত হইতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি বৃক্ষরূপে পূজিত হইলে, শঙ্খচূড়-পত্নীরূপা তুলসীর সম্ভোগান্তে নারায়ণের বরে তুলসীর কেশ-রাশির বৃক্ষত্ব-প্রাপ্তির উক্তির সার্থকতা থাকে কিরূপে ?

তব কেশসমূহশ্চ পুণ্যবৃক্ষো ভবিষ্যতি।
তুলসী-কেশসম্ভূতঃ তুলসীতি চ বিশ্রুতঃ॥

—ব্রঃ বৈঃ প্রকৃঃ ২১।৩২

সম্ভবতঃ ধরা-দ্রোণের তপস্যার ফলে নন্দ-যশোদাত্ব-প্রাপ্তির ন্যায়ই তুলসীর কেশের বৃক্ষত্ব-প্রাপ্তি। উপরে উদ্ধৃত ১৮।১৯।২০ শ্লোকত্রয় হইতে বুঝা যায়, অনাদিকাল হইতেই তুলসী বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনে ও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত। তপস্যার মাহাত্ম্য-প্রকটনের উদ্দেশ্যে নন্দ-যশোদার অংশ ধরাদ্রোণ যেমন ব্রহ্মাণ্ডে

জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় অংশী নন্দ-যশোদার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, তদ্রূপ তুলসীর মাহাত্ম্য-প্রকটনের নিমিত্তও তুলসীর অংশ (কেশ), অনাদিকাল হইতে অবস্থিতা বৃক্ষরূপা তুলসীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হইলে শঙ্খচূড়-পত্নীর জন্মের পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণপূজাদিতে তুলসী-ব্যবহার অসম্ভব হয় না।

(১৩)

শ্রীযুত রমেশচন্দ্র পাল ডাক্তার মহাশয় (ফকিরহাট, চট্টগ্রাম) লিখিয়াছেন :—

১ম প্রঃ—কি কারণে শ্রীমন্মদনমোহন চৌবে-রমণীর বাৎসল্য-প্রেমের সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীসনাতনের নিকটে আসিলেন ?

উঃ—লীলারস-রসিক শ্রীমন্মদনগোপাল স্বতন্ত্র ভগবান্। কি উদ্দেশ্যে তিনি কখন কোন্ লীলা করেন, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমরা কিরূপে বুঝিব ?

বিগ্রহরূপে চৌবে-রমণীর নিকট হইতে শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে আসিলেও বস্তুতঃ তিনি চৌবে-রমণীকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তের প্রাণে কষ্ট দিতে পারেন না ; চৌবে-রমণীর প্রেমোৎকণ্ঠা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, বিগ্রহরূপে শ্রীমন্মদনগোপাল তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ ত্যাগ করেন নাই।

জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, শ্রীবিগ্রহ-সেবার-মাহাত্ম্য-প্রকটনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, তিনি শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে আসিয়া তাঁহাদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রতিষ্ঠা করাইলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্মদনগোপালের সেবার মাহাত্ম্য প্রকট করিলেন।

২য় প্রঃ—পরকীয়-বাৎসল্য-প্রেমের ভজন প্রচলিত আছে কিনা ? যদি থাকে, তাহা কিরূপ ?

উঃ—পরকীয়-বাৎসল্য-প্রেম কথাটাই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। নন্দ-যশোদায় এবং দেবকী-বসুদেবেই বাৎসল্য-প্রেম দৃষ্ট হয়। ব্রজে নন্দ-যশোদা এবং দ্বারকায় দেবকী-বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ জনক-জননী। শ্রীকৃষ্ণও জানেন, তাঁহারাই তাঁহার পিতা-মাতা ; তাঁহারাও জানেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরই

একমাত্র কান্তাপ্রেমেই প্রকট-লীলায় পরকীয়া-ভাব দেখা যায়, তাহার হেতুও আছে; পরকীয়-ভাবে কান্তারসের উচ্ছলন অত্যন্ত বেশী; তাই এই রসোচ্ছলনময় বৈচিত্র্য আস্বাদনের নিমিত্ত প্রকট-লীলায় যোগমায়ার প্রভাবে নিত্য-স্বকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়-কান্তা বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাও তাঁহাদেরই নিত্য-স্বকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে পরপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু নিত্য-স্বজননী ব্রজেশ্বরীকে শ্রীকৃষ্ণ কখনও পরজননী বলিয়া মনে করেন নাই এবং নিত্য-স্বপুত্র শ্রীকৃষ্ণকেও ব্রজেশ্বরী কখনও পরপুত্র বলিয়া মনে করেন নাই; তাহা মনে করিলে বাৎসল্য-রস উচ্ছলিত না হইয়া বরং স্তিমিতই হইত; কারণ, স্বপুত্রকে ত্যাগ করিয়া পরপুত্রের উপরে বাৎসল্যরস ঢালিয়া দেওয়া কোনও জননীর পক্ষেই স্বাভাবিক নহে।

[অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ কোনও ভ্রম দেখাইয়া দিলে, তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।]

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিরচিতা

শ্রীশ্রীরাধারসমঞ্জরী।

সংগ্রহকারের নিবেদন।

আমার বাল্যসখা ও পরমহিতৈষী বর্ত্তমান লালগড়াধিপতি রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ সাহস রায় বাহাদুরের দেবমন্দিরের পুঁথি-শালা হইতে যে সকল প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ (পুঁথি) সংগ্রহ করি, তন্মধ্যে ভাগ্যক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র-বিরচিত, এই অপূর্ব্ব ও অপ্রকাশিত "শ্রীশ্রীরাধারসমঞ্জরী". নামক গ্রন্থরত্ন খানি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হই। রাজা বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষগণ পরমভাগবত ছিলেন, দেবদ্বিজ, বৈষ্ণব এবং শ্রীভাগবত-সেবা লইয়াই তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাঁহাদেরই সংগৃহীত ঐ সকল বৈষ্ণবগ্রন্থ বা অমূল্য-সম্পত্তি। আলোচ্য শ্রীগ্রন্থখানিতে লিপির সন তারিখ নাই বটে, কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের অনুমান শ্রীগ্রন্থখানির বয়ঃক্রম প্রায় ২০০ শত বৎসর হইবে। রাজা বাহাদুর বলিয়াছেন—"প্রাচীনকাল হইতে এই সকল শ্রীগ্রন্থ তাঁহাদের দেবমন্দিরে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন।"

পরম শ্রদ্ধাভাজন রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন B. A. D. Lit. কবিশেখর

মহোদয় অধমের সংগৃহীত পুঁথি দর্শন করিতে পানিহাটী আগমন করিয়া এই শ্রীগ্রন্থখানির লিপি বা বঙ্গাক্ষর পর্য্যবেক্ষণ করতঃ, ইহা ১৫০ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আরও আনন্দের সংবাদ :—পুঁথি অন্বেষণ জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে এই শ্রীগ্রন্থের অনুরূপ আর একখানি শ্রীশ্রীরাধারসমঞ্জরী পুঁথি রামগড়াধিপতি রাজা নগেন্দ্র নাথ সিংহ বাহাদুরের রাজবাটীতে প্রাপ্ত হই। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে পূর্ব্বে এই শ্রীগ্রন্থখানির প্রচার বিশেষ ভাবেই ছিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থের নামের তালিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করি, তখন এই শ্রীগ্রন্থের নাম মাত্র আমরা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আজ শ্রীভগবানের রচিত গ্রন্থ দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলাম।

শ্রীগ্রন্থ-প্রদাতা রাজা বাহাদুরদ্বয় গ্রন্থ-প্রণেতা ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গহরির কৃপা-পাত্র। প্রাচীন বৈষ্ণব-পুঁথি প্রদান করতঃ তাঁহারা সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের আশীর্ব্বাদভাজন হইলেন। মেদিনীপুর জেলার বারুন্দা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাধন ভট্টাচার্য্য-বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় বহু পরিশ্রম করতঃ শ্রীগ্রন্থ দুখানির পাঠ মিলাইয়া প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে নিবেদন—বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতের পরমহিতৈষী, পরম পণ্ডিত ও পরমভাগবত—কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক বহু-প্রসিদ্ধ বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ ও পত্রিকা-সম্পাদক আমার পরম-বান্ধব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম এ মহোদয় এই অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন-খানির সম্পাদন ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গহরি তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রদান করুন, ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা। নিবেদন ইতি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির
শ্রীপাট পানিহাটী (পোঃ আঃ)
(২৪ পরগণা)
শ্রীপুঁথি প্রাপ্তির তারিখ
১৩৩৩। আষাঢ় পূর্ণিমা।

ভক্তপদরজ-প্রার্থী—
দীনহীন
শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

গ্রন্থের পাঠ ।

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥

কুচ-কলস-ভরার্ত্তা কেশরী-ক্ষীণমধ্যা
বিপুলতরনিতম্বা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।
প্রণয়ময়-বয়স্যা-স্কন্ধবিন্যস্তহস্তা
নিধুবন-রসপুঞ্জং যাতি রাধা নিকুঞ্জং। ১।

রমণ-রমণ-খেলা-রঙ্গ-সম্ভাবনীয়া
রতি-রভস-গভীরাভীর-নারী সুধীরা।
নিকট-বিষয়বর্ত্তীভূতকান্তাপ্রসাদা
ম্নরপতি-বরপুত্রী যাতি রাধা নিকুঞ্জং। ২ ।

শ্যামপ্রেম-বিনোদিনী মধুরিমাধারাধর-স্মেরিণী
গৌরী প্রেমবতী সতীচ সুভগা প্রেমাব্ধি-সন্দর্ভিনী।
গণ্ডে মণ্ডিতকুণ্ডলা কটিতটে ধত্তে মুদা কিঙ্কিনীং
লীলাকাঞ্চন-দেহিনী বিজয়তে রাধা সুধা-দেহিনী। ৩।

শুদ্ধস্বর্ণবিড়ম্বিনী-পরিলসদ্ধারণ্য-সম্মোহিনী
নানারত্ন-বিলাসিনী মধুরিমাধারাধরস্মেরিণী।
কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী নিরবধি প্রেমামৃতালাপিনী
শ্যামপ্রেমবিনোদিনী বিজয়তে রাধাসুধাদেহিনী। ৪।

রাধেয়ং নবযৌবনাঢ্য-বয়সোল্লাসেন সানন্দিতা
সুস্মেরাধর-চন্দ্রবিম্ববদনা-হেমাদ্রিকান্ত্যুজ্জলা।
নিত্যং কল্পতরোস্তলে নিবসিতা বেশেন ভূষাময়ী
নানাশক্তিসমন্বিতা বিতনুতে প্রেমপ্রবৃত্তিং সদা। ৫।

নানানৃত্যবিলাসগীত-রভসৈরাপূরিতং তদ্ধরে
শ্চিত্তং চন্দ্রমুখী সরোজনয়নী কন্দর্প-সম্মোহিনী।
রম্যা চারুনিতম্বিনী সুখময়ী প্রেমামৃতোদ্গারিণী
রাধাকাঞ্চন-দেহিনী বিজয়তে বৃন্দাবনস্থায়িনী। ৬।

যা শ্রীঃসত্যবতী স্বয়ং ভগবতী প্রেমামৃসংবাদিনী
যা নিত্যা মধুভাষিণী সুখময়ী সন্তোষরত্নাকরী।

সা রাধা সুধিয়াস্সুধাং রসময়ী কৃষ্ণপ্রিয়াদুর্লভা
সা জীয়াৎ ক্ষিতিমণ্ডলে প্রিয়তয়া বৃন্দাবনেবাসিনী। ৭।
বক্ত্রে চন্দ্রবিলাসিনী নয়নয়োঃ প্রেমাকৃপাপাঙ্গিনী
বিম্বৌষ্ঠাধরদন্তকান্তিবিলসন্মুক্তাবলীচন্দ্রিকা।
দোর্দ্দণ্ডাঙ্ঘ্রি সমুল্লসৎ পুলকিনী সন্ন্যাস-বিন্যাসিনী
রাধা কাঞ্চন-দেহিনী বিজয়তে কারুণ্য-কল্লোলিনী। ৮।
প্রেমোদ্গারি-দৃগন্তরেক্ষণলতাশা জীবয়ন্তীংপরাং
নানাভাব-বিকাশিনীং সুমধুরাং স্মেরাতিকান্তাননাং।
প্রোদ্যৎপ্রদ্যুতি-শাতকৌম্ভলতিকা-দেহাং মনোহারিণীং
শ্রীমন্নাগর-রাসরত্নজলধিং শ্রীরাধিকামাশ্রয়ে।৯
সেয়ং বিভাতি পরিনিন্দিত-হেমকান্তি-
রাধা বিনিন্দিতসুধা মধুরৈর্ব্বচোভিঃ।
প্রেম্না রসেন গুরুণা নবরোমরাজী
যৎ কিঙ্কিনী কটীতটে পরিধৌতি চিত্রং। ১০।
নবীন-শ্রীরাধা নবরুচির-পূর্ণেন্দু-বদনা
নবীন-প্রেমাভির্ব নব সখিভিঃ পরিবৃতা।
নবং বৃন্দারণ্যং নবকিশলয়ৈ র্লম্বিততরুং
নবীনং রাসার্থং ব্রজতি নবরঙ্গে নিধুবনং। ১১
গৌরী পদ্মমুখী কুরঙ্গ-নয়নী ক্ষীণোদরী বৎসলা
সঙ্গীতাগমবেদিনী সুখময়ী তুঙ্গস্তনী কামিনী।
শ্যামপ্রেম-বিনোদিনী মধুরিমাধারাধরস্মেরিণী
ত্রৈলোক্যৈব নিতম্বিনী বিজয়তে রাধাসুধা-দেহিনী। ১২।
রাসোল্লাস-বিলাসিনী নবশরৎ-সংপূর্ণ-চন্দ্রাননী
শুদ্ধস্বর্ণ-বিড়ম্বি-কান্তি-বিলসচ্চন্দ্রালকাকুন্তলা।
লাবণ্যামৃতমঞ্জরী রসকলা লোলেক্ষণালম্বিনী
রাধা প্রেমবিনোদিনী বিজয়তে নিত্যস্থলস্থায়িনী। ১৩।
উত্তুঙ্গস্তনভার-ভঙ্গুর-তনু-র্বিদ্যুচ্ছটা কচ্ছপিঃ
শ্রোণ্যাংমীননবাম্বুবামদপদাম্ভোজে স্ফুরন্নূপুরা।

সস্মেরাধরচন্দ্রবিম্ববদনা কন্দর্পদর্পাঙ্কুরা
প্রেমাঙ্কা মদমন্থরা বিজয়তে প্রাণাধিকা রাধিকা । ১৪ ।
উন্মীলন্ নবযৌবনা মৃদুতরৎ ফুল্লাননালঙ্কৃতা
সুশ্রোণীভরভঙ্গুরাস্মরভর-স্মেরাধরা মেদুরা ।
লীলাকুঞ্জকরা সখিপ্রিয়মুখী স্কন্ধস্ফুরত পালিকা
শ্যামা শ্যামসুহৃত্তথো বিজয়তে প্রাণাধিকা রাধিকা । ১৫ ।
বৃন্দাবনান্তরচরীস্বরপুষ্পগুচ্ছ সঙ্কিন্বতে মদনমুদ্রিতদীর্ঘনেত্রা
কর্ণে রসাল-মুকুলস্তরলং বহন্তী শ্যামাঙ্গসঙ্গমবতী জয়তীহ রাধা ।
১৬ ।।
সৈবেয়ং পরিভাতি কাঞ্চনরুচিং জিত্বা জগন্মোহিনী
অত্যন্তাদ্ভুতসুন্দরী জিতসুধাবাক্যামৃতা রাধিকা ।
ঈষদ্ধাস্যমুখী কুরঙ্গনয়নী গৌরী সুধাসারিণী
প্রেমানন্দবিলাসিনী বিজয়তে প্রেমপ্রবৃত্তা মুহুঃ । ১৭ ।
শ্রীরাধা রতিমুগ্ধভাবহৃদয়া লোলায়মানেষ্টয়া
পাণৌ পুষ্পধনুঃ সকৃষ্ণদধতী বৃন্দাবনে ক্রীড়তি ।
আশ্লেষে রতিচুম্বনৈ রতিকলালাপৈশ্চ সন্তর্পিতা
গোবিন্দেন সমং সখীগণগতা রাসোৎসবং কুর্ব্বতী । ১৮ ।।
শ্যামালিঙ্গিতগৌরদেহলতয়া মেঘস্থবিদ্যুচ্ছবিং
লিঙ্গন্তী বিকচাম্বুজদ্বয়রুচিং পদ্ভ্যাং তিরস্কুর্ব্বতী ।
সর্ব্বেষাং রতিকেলিভাবচতুরাং স্ত্রীণাং শিরোভূষণাং
শ্রীমন্নাগর-রাসরত্ন-জলধিং শ্রীরাধিকামাশ্রয়ে । ১৯ ।
রাসোল্লাসবিলাসবন্দ্যরসিকা সৌন্দর্য্যসীমাশ্রয়া
রাধাপ্রেমময়ী রতিং প্রকুরুতে বৃন্দাবনে সুন্দরী ।
শ্রীকৃষ্ণেন সমংপ্রফুল্লকুসুমৈ র্ত্তদ্বিরেফৈর্যুতং
শ্রীবৃন্দাবন-দেবতা বিজয়তে রাধা সুধামঞ্জরী । ২০ ।।
প্রেমানন্দ-বিলাস-হাস-রসিকা শ্যামা সরোজেক্ষণা
গোপীমণ্ডলমণ্ডিতা বরতনুঃ সিন্দূরসীমন্তিনী ।
শ্রীবৃন্দাবনরাসকৌতুকরসা পীনস্তনী লালনী
শ্রীকৃষ্ণস্য বিনোদিনী বিজয়তে শ্রীরাধিকা ভাবিনী । ২১ ।।

উত্তপ্ত-হেমরুচিরা বৃষভানুকন্যা সা কর্ণনেত্রযুগলাকিলপট্টবস্ত্রা।
পর্ণাদি-ভূষণযুতা নবরোমরাজীবিন্যাসচিত্রকবরী ক্রতুবেদিমধ্যা
। ২২।

কাশ্মীর-গৌরবপুষামভিসারিকানা
মারক্তরাগমণ্ডিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ।
এতত্তমালদলনীলতমং তমিস্রং
তৎ প্রেমহেমলতিকারুচিরং তনোতি। ২৩।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রাধা বৃন্দাবনেশ্বরীং
বৃষভানুসুতাং দেবীং প্রণমামি হরিপ্রিয়াং। ২৪।

রাধায়াঃ কলধৌত-গৌরকিরণৈর্বৃন্দাবনান্তর্গতাঃ
কুজন্‌মত্তময়ুর-কোকিলগণা গৌরাঃ কুরঙ্গানগাঃ।
কৃষ্ণস্যাদ্ভুতহাস্যরাসবনিতা প্রোল্লাসমুগ্ধাশয়া
সান্দ্রানন্দরসা করোন্নতমুখী শ্রীকৃষ্ণগৌরেশ্বরী। ২৫।

গৌরাঙ্গকুরঙ্গ-কোকিলাগণা গৌরাঃ শুকাশ্চাখিলা
গৌরাঃ সর্ব্বমহীরুহাঃ ফলবয়া গৌরাণি পুষ্পানি চ।
গৌরং চক্রকপোতবর্হিনিমহো গৌরঞ্চ বৃন্দাবনং
রাধাদেহরুচাদ্ভুতং সখিযুতং কৃষ্ণোহ গৌরোহভবৎ। ২৬।

রাধাদিব্যছটা চ গৌরকিরণৈ রাপূরিতং দিঙমুখং
বৃন্দারণ্যসমস্তকল্পতরবঃ স্বর্ণাঙ্গবর্ণা বভূঃ।
গৌরাঃ কোকিলভৃঙ্গ-কোকিলবয়া আশ্চর্য্যবৃন্দাবনে
রাধাদেহরুচাদ্ভুতং সখিবৃতং শ্যামোহপি গৌরোহভবৎ। ২৭।

মৌলৌ কেকিশিখণ্ডিনীমধুরিমাধারাধারস্মেরিণী
কণ্ঠে শ্রীবনমালিনী হৃদি বৃহৎকারুণ্য-কল্লোলিনী
শ্রোণৌ পীতদুকূলিনী চরণয়োর্মঞ্জীর বিন্যাসিনী
লীলাকাঞ্চনদেহিনী বিজয়তে কারুণ্য-কল্লোলিনী।২৮।

সৌন্দর্য্যস্মরকেলিগৌরবরসং গায়ন্তি তাঃ সুস্বরং
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গতালেমহতীং সম্বাদয়ন্তীতিচ।

অঙ্গে গৌরসুচন্দ্রিকা সুচরিতে লাবণ্যভঙ্গোৎসবা
শ্যামপ্রেমসুধানিধৌ রহসি সা সংপূর্ণলক্ষ্মীস্বয়ং।
লাবণ্যাৎ কমলাপ্রমোহনপদংরূপৈর্জগদ্বৈভবং
রাধায়াঃ সমতা ন চাস্তি নিখিলে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে ক্বচিৎ। ৩০।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-বিরচিতা শ্রীরাধারসমঞ্জরী সমাপ্তা
যথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখকোদোষনাস্তিকং।
ভীমস্তপীড়নে ভঙ্গমুনীনাঞ্চ মতিভ্রম॥ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দায় নমঃ।
নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে।

[এই গ্রন্থখানি-সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এখন প্রকাশ করা হইল না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে অভিজ্ঞ সুধীগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের অভিমত জানাইবেন, ইহাই প্রার্থনা। গ্রন্থখানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে অনুবাদাদির সহিত আমরা ইহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।—সম্পাদক।]

মরণের সান্ত্বনা।

চল্ ফিরে চল্ রে অভাগা
　　আপন ঘরে ফিরে,
একা কেন এমন সময়
　　পথের ধূলায় পোড়ে !
দেখ্ না চেয়ে দূর আকাশে
　　শ্রান্ত রবি ডুবে গেলো !
আঁধার আঁচল উড়িয়ে দিয়ে
　　ঝিম্ ঝিমান সন্ধ্যা এলো !
(তোর) নিদাঘ-তাপের তপ্ত দেহ,
　　জুড়িয়ে দিতে নাইত কেহ,

তাই কি মলিন বিরস বয়ান
তাই কি নয়ান ঝরে?
একা কেন এমন সময়
পথের ধারে পোড়ে?

মুছিয়ে দিতে তোর আঁখি-জল
এপারে বল কে আছে?
হেথা বুকভরা তোর ব্যথার কথা
বোল্‌বি রে তুই কার কাছে?
(হেথা তোর) নয়ত গেহ,—নাইত কেহ,
নাইত হেথা বিমল স্নেহ,—
এসেছি তাই আদেশ পেয়ে
ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোরে।
চল্ ফিরে চল্‌রে অভাগা
আপন ঘরে ফিরে।

ওই ওপারে ঘরে ঘরে
উঠ্‌লো জ্বলি সাঁঝের আলো,
(তোর) সোনার ছটা কালো নদীর
নাচা জলে ছড়িয়ে পোলো।
ধূপের ধোঁয়া, ফুলের সুবাস
উঠ্‌লো ভরি পবন আকাশ,
শাঁকের ধ্বনি ওই শুনা যায়
উঠ্‌লো বেজে দূরে।
একা কেন এমন সময়
পথের ধূলায় পোড়ে?

ঘরে যাবার এইতো সময়,
শেষ খেয়া ওই ভিড়্‌লো ঘাটে

আর কেন বল্ থাক্‌বি একা
ধূলায় ধূসর ঊষর মাঠে ?
(তোর) শ্রান্ত দেহ বুকে নিতে,
সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিতে,
ওই ওপারে দাঁড়িয়ে হরি
সারা ভুবন আলো কোরে !
চল্ ফিরে চল্‌রে অভাগা
আপন ঘরে ফিরে।

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী।

সমাজ ও সাধনা।

সেদিন ব'সে বসে ভাব্‌ছি—হঠাৎ দুটী প্রশ্ন মনে উদিত হইল। পরম ভাগবত যাঁরা, তাঁদের সে প্রশ্ন দুইটী খুবই সাধারণ, কিন্তু আমাদের ন্যায় বাহ্য-জগৎ-মুগ্ধ জীবের পক্ষে, সে সমস্যা নিতান্তই জটিল। মহাজনগণের নিকট থেকে পর্য্যাপ্ত মীমাংসা-ভিখিরী হয়ে, আমি আমার সন্দেহ নিবেদন কচ্ছি। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের ধর্ম্মের অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই—একটা বিশ্বসত্য, নানা বিচিত্ররূপে, এই দেশের মানুষের মধ্যে, আপনাকে কত না সুন্দর মধুর ও সম্রাট (majestically) ভাবে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। যত ধর্ম্ম, যত বিদ্যা, যত দর্শন ও মতবাদ, সমস্তই সেই একটী সত্যের তনু। উপনিষদ্ প্রচারিত ধর্ম্মের চরম অভিব্যক্তি, আমরা দেখি গীতোক্ত ধর্ম্মে। আর, যেখানে তাহার চরম বিকাশ, উন্নততম ভূমিতে অধিরোহণ করিয়াছে, ঠিক সেইখানেই, প্রথম রশ্মি নামিয়া আসিয়াছে, আর একটা মহত্তর অভিব্যক্তির—সেই জন্য গীতার সঙ্গে সঙ্গে অবতীর্ণ হইল, শ্রীমদ্ভাগবত। এই শ্রীমদ্ভাগবত, গীতার ভূমিতে উন্নীত-আত্মার সম্মুখে একটা বিচিত্র জগত প্রকাশ করিয়া দেয়—সে, প্রেমের সুন্দর মধুর জগৎ। গীতার সমাজের উপর নামিয়া

আসিলেন, চির কিশোর ব্রজেন্দ্রনন্দন মুরলী বাজাইয়া। এই যদি হয়, শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের অনুপূরক হইতেছে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালবর্ত্তী অপরাপর ধর্ম্মসমূহ। এই মহা সমন্বয় কি ভাবে হইতে পারে, তাহা জানিতে একান্ত বাসনা।

দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণবধর্ম্ম, ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই সাধনা। ব্যষ্টির সাধনায় কোন প্রশ্নই উঠেনা। কিন্তু যেখানে ব্যষ্টি সমষ্টির অঙ্গ, এবং সমষ্টি যেখানে বিচিত্ররূপে নিজের প্রাণের প্রেরণায়, কোথাও কূল ভাঙিয়া, কোথা ও বা কূল ছাপাইয় অসীমের পানে ছুটিয়াছে, সেখানে ব্যষ্টির সাধনা, সমাজ সাধনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, সেখানে সমাজকে বাধ্য হইয়াই, বিশ্বের অভিব্যক্তিমূলক সংগ্রামের মধ্যে যাইয়া পড়িতে-হয়। বর্ত্তমান অবস্থায়, কোনও দেশ বা দেশের অংশ-বিশেষ যদি বৈষ্ণব হয়, তাহা হইলে, তাহাদের প্রয়োগ-ফলা সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি কিরূপ হইবে? বৈদিক, বৈদান্তিক ও বৌদ্ধসমাজ, সঙ্ঘ ও রাষ্ট্রের নীতিসমূহ জগদ্ব্যপারে কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা আমরা দেখিয়াছি—কিন্তু বৈষ্ণব-রাষ্ট্র, তেমন ভাবে আমাদের সম্মুখে কিছুই উত্থাপিত করে নাই। আজ যদি পশ্চিমের কোন সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া বৈষ্ণবসমাজ ও বৈষ্ণব-রাষ্ট্রের আদর্শ চায়, আমরা তখন কোন্ scheme তাহাদিগকে দিব? বৈষ্ণবধর্ম্ম যদি ব্যক্তিগত সাধনা লইয়া, সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট থাকিতে চায়, তবে কোন জটিলতা থাকে না। কিন্তু তথাপি একটা বড় সমস্যা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। প্রচলিত সমাজ, যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শাসন ও বিচার, যে সকল জীবনচর্য্যা ও সাধনার ভিতর দিয়া, মানুষকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা তত্ত্বতঃ, না খৃষ্টীয়, না মুসলমান, না বৈদিক, না বৈদান্তিক, না বৈষ্ণব। অথচ এই সমাজ, ঐ সকল ধর্ম্মের কোন না কোনটীকে, স্বীকার করে বলিয়া প্রচার করিতেছে। যেখানে সেই সমাজ বা রাষ্ট্র এবং নৈষ্ঠিক ধার্ম্মিকের সঙ্গে বিরোধ বাধে, সেখানে ব্যক্তিকে একতর পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়। যারা একটু দুর্ব্বল ও ঐহিক, তাহারা ধর্ম্মকে সংসারের দিক হইতে অস্বীকার করিয়া, সমাজের রক্ত-চক্ষুর আদেশকে বরণ করিয়া লয়। এইরূপে অনেকের জীবন এমন বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় যে, তাহারা সংসারে চড়ায় ভাঙ্গা জাহাজের ন্যায় হইয়া থাকে। ধর্ম্ম একটা আমূল গঠন—culture বা civilisation,

রাষ্ট্র বা সমাজ, ধর্ম্মকে দর্শন করিবার একটা সাধনা—একটা উপায়। সমাজ যদি টানে বাহিরের দিকে, ধর্ম্ম যদি টানে অন্ত দিকে, তবে অধিকাংশ মানুষ কোনদিকেই বড় হইতে পারে না। আর এইরূপ বিরোধী দুইটী পথ রাখিয়া মানবজীবনকে বিপন্ন করিবার আবশ্যকতা আছে কি ?

এই দুইটী বিষয় ব্যতীত, বৈষ্ণব-সঙ্ঘের কথাও আজ মনে পড়িতেছে। পঞ্চরাত্র প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থসমূহে আমরা কোন কোন বৈষ্ণব-সঙ্ঘের অস্পষ্ট আভাস পাই বলিয়া মনে হয়। গীতায় একটা ভাগবত-ধর্ম্ম বা নারায়ণীধর্ম্মের কথা বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত দেখি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই ধর্ম্মের বিষয় বলিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনার উল্লেখ আছে। এইরূপে একটা সুদর্শন বৈষ্ণব-চক্র (?) বা সঙ্ঘের উদ্ভব ও ক্রম-বিকাশের ইঙ্গিত প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। জগতের ইতিহাসে আমরা দেখি, ধর্ম্মের প্রসার জন্ম সর্ব্বত্রই সঙ্ঘ রচিত হইয়া থাকে। সঙ্ঘ, ধর্ম্ম বা তত্ত্বের একটা সমষ্টিগত পার্থিব রূপ। প্রভুচৈতন্যমণি যে ছয়জন গোস্বামীকে নিজহাতে গড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাও ঐ সঙ্ঘরচনার জন্য—আর সে রচনা কেবল প্রাদেশিক ছিলনা ; তাহা ছিল ভারতব্যাপী। নিমাইমণি, গোস্বামিদিগের জীবনে যে এত কঠোরতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও সঙ্ঘ-রক্ষার জন্য। সঙ্ঘ রক্ষিত হইলেই সাধনা-বিশুদ্ধি রক্ষা পাইবে। সাধনার বিশুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন একই সুরে গড়িয়া উঠিবে, আর তখনই একটা যথার্থ বৈষ্ণব-সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি দেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

মহাপ্রভু মানবতার মুক্তির জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—দীন, পতিত, নির্য্যাতিত মানবের অশ্রুরাশি তার যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত দুঃখদৈন্য—তাঁরই বিরাট নেত্রের বিরাট অশ্রুরূপে তিরোভাব পর্য্যন্ত ক্ষরিত হইয়াছে। সেই অশ্রু-প্রবাহ, মানবতার বন্ধনকে মোচন করিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যে সাধনার ধারা তিনি আমাদের জীবন-প্রবাহে ঢালিয়া গিয়াছেন, তাহার স্বচ্ছন্দ সক্ষম গতিকে আমরা কতটা রক্ষা করিয়াছি ? প্রভুমণি আমাদের, আসিয়াছিলেন পতিত মানবতার জন্য। তিনি তাহাদিগকে একটা দিব্য সাধনার অধিকার দিয়াও গিয়াছেন। সেই সাধনাই আজ তাহাদের জীবনে শিল্প-সাহিত্য, ঐহিকতা দর্শন-বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজীবনও রাষ্ট্ররূপে ফুটিয়া উঠিতেছে—কিন্তু তাহাও

বিজাতীয়তার মধ্যদিয়া 'পরানুবাদের' ভিতর দিয়া।

এইজন্যই আজ প্রয়োজন হইতেছে—একটা সাধনা-কেন্দ্রের। বৈষ্ণব-ভারতীর যদি একটা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে বৈষ্ণব-জীবন সমষ্টির মধ্যে, কিরূপে তত্ত্বোপযোগী বিকাশ-লাভে ধন্য হইবে? বৈষ্ণবসাহিত্য, বৈষ্ণব-দর্শন, বৈষ্ণবানুভূতি, বৈষ্ণব-বিজ্ঞান ও বৈষ্ণব-সমাজতত্ত্বের পরীক্ষণ, গবেষণা ও প্রতিষ্ঠার জন্য একটা বৈষ্ণব-বিশ্ববিদ্যালয় নিতান্ত আবশ্যক। এই বৈষ্ণব-চৈতন্য-ভারতীতে,বৈষ্ণব-বিপশ্চিদ্‌গণ অধ্যাপনা করিবেন—জীবন ও বিশ্বসমস্যার সর্ব্বদিকে আলোকপাত করিবেন—দেশে দেশে সমন্বয় সাধন করিবেন—বিদেশে প্রচারে নির্গত হইবেন। চৈতন্যমণি যে অপার্থিব প্রেমলোকের আভাস জাতিকে দিয়া গিয়াছেন, সাধক অধ্যাপকগণ, সে লোকের নব নব তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিবেন। এমনি করিয়া একটা নবীন জীবন জগতে নামিয়া আসিবে। আর, অধুনা যে সকল দরিদ্র বৈষ্ণব-সন্তানগণ, নিম্নশ্রেণী বলিয়া সমাজে অবজ্ঞাত, অশিক্ষিত, তাহারা এই গুরুগৃহে বাস করিয়া, শিক্ষালাভ করতঃ সমাজে বরেণ্য হইবে। প্রত্যেক উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের বালকগণের জন্য, বৃত্তি প্রভৃতির সাহায্যে, কত প্রকারে শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু এই দরিদ্র বৈষ্ণবগণকে,—উচ্চস্তরের সাধন জীবনের সাধনা হিসাবে নয়,—জীবিকার্জ্জনের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনপাত করিতে হয়—তাহাদের সন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য কোনও ব্যাপক সামাজিক চেষ্টা এ যাবৎ সার্থক হইয়া উঠে নাই, কেউ ত এদেরে কোলে তুলে নেয় না—কেউ এদের দুঃখাশ্রুবিগলিত নয়ন মুছায়ে দেয় না। একদল উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে অরোহণ করিবেন—আর অবজ্ঞাত ভাইয়েরা জীবনের গ্লানি, সরমের ডালি বহন করিয়া মুষ্টিভিক্ষার জন্য দাক্ষিণ্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবে—এ যে ভাবিতেও বুক ফাটে। অথচ শ্রীচৈতন্যমণি আমাদের, পল্লীর কত অজ্ঞাত অনাদৃত সমাজ হইতে কত কত মানবরত্নের আহরণ করিয়া বৈষ্ণব-জগতকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-সমাজের এই অংশকে আমরা মানবত্বের মহিমায় মহীয়ান্ করি নাই বলিয়া, তাহারা শুধু বৈষ্ণব-সমাজের নয়, দেশের ও সমগ্র উন্নতির পথে, জগদ্দল পাথরের ন্যায়, গতিরোধ করিয়া পড়িয়া আছে।

বাংলার বৈষ্ণব-সমাজ একটা সমগ্র বস্তু। তাহাতে বিভিন্ন মঠ আছে—

থাকুক। ইহা তথাপি একটা ভাগবতী-দেহ। সুতরাং প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও ইহাদের প্রাণের একটা বড় মিল রহিয়াছে। ইহারা সকলে মিলিয়া বাংলাদেশের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-মঠ ও বিহারগুলিকে বৈষ্ণব-সমাজের Common wealth রূপে, ব্যবহার-শাস্ত্রসিদ্ধ একটা সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান বলিয়া, ঘোষণা করিতে পারেন। সর্ব্বসম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক গঠিত সঙ্ঘের অধিনায়কতায়, ইহাদিগকে ব্যবস্থিত করিতে পারেন। এই সকল বিহারের সম্পত্তির ন্যাসধারী ও সেবক নির্ব্বাচিত হইবে ঐ সঙ্ঘকর্তৃক। প্রত্যেক বড় বড় বিহারে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায়, এক একটি বিদ্যাকেন্দ্র থাকিবে—ঐ সকল বিহারের আয়ের একটা সামান্য অংশ, বৈষ্ণব-মহাবিদ্যালয়ের পোষণে নিয়োজিত হইবে। অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় অর্থ অন্যরূপে সংগৃহীত হইবে। ঐ সকল বিহারকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে আদর্শ বৈষ্ণবপল্লী, অনাথাশ্রম, দাতব্য ঔষধালয়, শিল্প কুটীর, স্বাস্থ্যভবন, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি স্থাপিত হইবে। প্রব্রজ্যা বা বান-প্রস্থের জন্য আশ্রমবাসেরও ব্যবস্থা তাহাতে থাকিবে।

বঙ্গপল্লীর যে যে স্থানে পরমভাগবতগণ আবির্ভূত হইয়াছেন, যে যে স্থানে মহাপ্রভুর লীলার কোন না কোন অংশ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল পবিত্র স্থানও রাষ্ট্র বা সঙ্ঘের চেষ্টায় 'সার্ব্বজনীন ক্ষেত্র' বলিয়া ঘোষিত হইবে। তথায় স্মৃতিফলকে সেই সকল ভাগবতগণের জীবনী-লীলা মুদ্রিত থাকিবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের ভাগবত-পদরজ-পবিত্র স্থানসমূহ দেখিয়াছি—দেখিয়াছি সেই সকল তীর্থে বৈষ্ণবগণ গমন করেন, কিন্তু তথাপি ঐ সকল স্থান শোচনীয়রূপে অনুন্নত—অবহেলিত। একবার জৈনদিগের তীর্থস্থানগুলির কথা ভাবুন—দেখিবেন, তাহারা কেমন সুন্দর—কেমন দিব্যশ্রীভূষিত! যার নামে দারিদ্র্য পালায়, অলক্ষ্মী তিরোহিত হয়—যার নামে মর্ত্ত্যে বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যধারা প্রবাহিত হয়, তাঁর বা তাঁর ভাগবতগণের পদরজ। পূতস্থানের বাহ্য অরমণীয়তা যদি অপনীত না হয়, তাহা হইলে কলিহত স্বপ্ন-বিশ্বাসী কেমন করিয়া প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবে যে, তাঁর সেবায় তাহাদের জীবন ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে—এবং তাহারা ঐ উপচিত ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যকে অতিক্রম করিয়া পরিণামে প্রেমময়ের সেবার অধিকারী হইবে? নাম ও সেবা যদি বাহ্যজগতে

পরিবর্ত্তন না আনিতে পারে, তবে তাহা যে অন্তর্জগতে পরিবর্ত্তন আনিবে— তাহা কষ্টকল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায় না কি ?

আজ যদি নবদ্বীপকে বক্ষ্যমাণ ভারতীতে পরিণত করিবার প্রয়াস কেহ করেন, তাহা অসাধ্য হইবে, এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু দুঃসাধ্য হইবে। নবদ্বীপ নবদ্বীপই থাকিবে। কিন্তু আজ এমন একটী স্থান সেই মহামিলনের মহোৎসবের জন্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক—যেখানে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একটী মহান আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীখণ্ডেও তাহা হইতে পারে— কালনা, কাটোয়ায়ও তাহা হইতে পারে—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান সপ্তগ্রাম—ইহাতে সর্ব্ববিধ সুবিধাই বর্ত্তমান। বৈষ্ণবের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, তাহার আলোচনা পরে করিব।

বাংলার বর্ত্তমান অন্তর্বিপ্লবে, অস্পৃশ্যতা ও নানাবিধ সামাজিক জাতিবৈষম্য দূর করিতে, বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় প্রেমধর্ম্মেরই আবশ্যক। এই প্রেমধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায়, রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না। আজ সমাজে— এমন কি এই বিশ্বজগতে প্রত্যেক ধর্ম্ম, নীতি ও তন্ত্রের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে ; যাহারা নবসৃষ্টির কাজে, স্ব স্ব অন্তর্নিহিত উৎকর্ষের পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই টিকিয়া থাকিবে—যাহারা পারিবেনা, তাহারা অপর সাধনায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে। এই বিশ্বব্যাপী Cultural conflictএ বৈষ্ণবধর্ম্ম কি প্রকারে স্ব-প্রতিষ্ঠায় রক্ষিত হইতে পারে, তাহা আজ ভাবিবার বিষয়। পরম ভাগবতগণ যাহাতে এ সকল ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, সেই উদ্দেশ্যেই আমার এ প্রয়াস। সুধীগণ আমার আন্তরিকতা লক্ষ্য করিয়া ত্রুটীসমূহ ক্ষমা করিলে বাধিত হইব।

বৈষ্ণবদাস—
শ্রীকালীকুমার মিত্র।

বিস্মৃতি।

সুখের বিভোরে অন্তর যদি
সাড়া নাহি দেয় ছন্দে,

ব্যাকুল মানস ভয়ে যদি তোমা
　　পরাণ ভরিয়া বন্দে।

বাজাও তবে হে বজ্রের ভেরী
আসুক প্রলয় হুঙ্কার করি,
কাঁপুক মেদিনী ঝঙ্কার দাপে
　　আলোড়ি নিখিল বিশ্ব;
জাগুক আমার অলস পরাণ
　　হেরি সে বিরাট দৃশ্য।

সুখের আধার লও হে কাড়িয়া
　　দুঃখ কর হে সাথী;
বিপদ আমার আসুক নিত্য
　　ভকতি তোমার প্রতি।

ছিন্ন করিয়া বিস্মৃতি-পাশ,
দগ্ধ করিয়া তোমা-ভোলা আশ
আন হে তোমার রুদ্র-মূরতি মানস-কালিয় দলিয়া।
তোমার চরণ-ধূলায় লুটাক ষড়নাগিনীরে লইয়া॥

শ্রীসনৎকুমার রায়।

সমালোচনা।

৯। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ।—মূল ও বঙ্গানুবাদ। ১৬১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ-গোস্বামি-সিদ্ধান্তরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডাবল ক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মায় ২৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা। কাপড়ে বাঁধাই।

বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামিচরণের ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি। বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হইলেও

বঙ্গানুবাদের অভাবে এ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই। প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ-গোস্বামি-মহোদয় ইতিপূর্ব্বে ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গত তত্ত্ব-সন্দর্ভ-নামক প্রথম সন্দর্ভ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। এবার তিনি দ্বিতীয় ভগবৎসন্দর্ভ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবজগতের এবং বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবীদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গ্রন্থের অনুবাদ অতি সুন্দর এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ; মধ্যে মধ্যে তৎপর্য্যব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে গ্রন্থখানির উপাদেয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি সাধারণের নিকটে বিশেষভাবে আদরণীয় হইবে। ছাপা এবং কাগজও উত্তম হইয়াছে।

২। স্রক্‌।—শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষ বি, এল, মহোদয় প্রণীত। ৯০ পৃষ্ঠায় ভক্তি-রসাত্মক-কবিতা-পুস্তক। মূল্য ।৵০ আনা। পোঃ ঘোড়ামারা, জিঃ রাজসাহী ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব-মহাজনগণের পদাবলী-কীর্ত্তনের উপযুক্ত লোক না থাকায় সাধারণতঃ রাজসাহী বৈষ্ণব-সভার জন্য কতকগুলি গান রচনা করিয়াছিলাম।" এই গানগুলিই "স্রক্‌" এ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানিতে ভক্তদিগের নিত্য-কীর্ত্তনীয় প্রায় সমস্ত বিষয়-সম্বন্ধেই গান আছে। গানগুলির ভাব এবং ভাষা অতি সুন্দর। দু'একটী উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

গৌর-বন্দনায়:—

"জয় জয় প্রভু গৌরচন্দ্র। ইন্দুনিন্দি-মুখারবিন্দ।
মোহনমালা মালতীফুলে, বিশাল বক্ষে বিলসি দুলে,
বিহরে সুরধুনীর কূলে, মত্ত-বারণ-গমন মন্দ।
শশি-তারকা-তপন-কর, জড়িত করি তড়িত'পর,
রচিলা বিধি তিমিরহর, গৌর-তনু ভুবনানন্দ।"

শ্রীকৃষ্ণ-স্তবে:—

নব-নীরদ-নিন্দিত নীলবপু, যদুবংশধুরন্ধর কংসরিপু।
মণিকুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগ, মুনি-মানস-কানন-কেলিমৃগ।

হরিচন্দন-চর্চ্চিত-ভালতট, কটি-অংস-বিলম্বিত-পীতপট।
বনমাল-বিলম্বিত নীলগলে, মধুরাঞ্জন রঞ্জিত নেত্রতলে॥
ইত্যাদি।

যুগল-মিলনে :—

দাঁড়াল শ্যাম-নাগর-বামে কিশোরী বর-কামিনী,
নবীন জলধর-উরসে, শোভিল যেন দামিনী,
নীলমণিক সহ কনক-কিরণ মাখামাখিরে।
হেম আঁচলে নীল অচলে কে দিল যেন ঢাকিরে।
ইত্যাদি।

ঝুলনে :—

গগন ছাওল শাওন মেঘে, সজল পওন বহত বেগে,
নাচত রঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে, ময়ূর-ময়ূরী মাতিয়া।
ডাকত ডাহুকী রোয়ত দাদুরী, হেরই বরিষা রস-মাধুরী
গাহত শ্যামা শুক-শারিকা বিহগ বিবিধ জাতিয়া।
ইত্যাদি।

আত্মসমর্পণে :—

আমি তোমারি চরণে সঁপিনু নাথ, মলিন পরাণখানি।
শত জনমের ব্যর্থ যাত্রা হ'তে এনেছি ইহারে টানি।
ইত্যাদি।

সমগ্র পুস্তিকাখানিই এইরূপ ভক্তিরস-সিঞ্চিত সুললিত-পদবিন্যাসে পরিপূর্ণ॥ পুস্তিকাখানি লিখিয়া গ্রন্থকারও ধন্য হইয়াছেন, কীর্ত্তনানন্দ ভক্তমণ্ডলীকেও ধন্য করিয়াছেন।

৩। ভক্তি-সূত্র-দীপিকা। শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তি-সাগর প্রণীত এবং ভক্তি-প্রভা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ব-বাচস্পতি কর্ত্তৃক পোঃ আলাটী, জিঃ হুগলী হইতে প্রকাশিত। ৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীনারদ কৃত "ভক্তি-সূত্র" নামক গ্রন্থখানিই মূল, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা সহ ভক্তিসূত্রদীপিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তি-সাগর মহাশয় তাঁহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় নারদ-সূত্রের সহিত গোস্বামিশাস্ত্রের সমন্বয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও মধুর। ভক্ত-সমাজে

এই গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ইতিহাস। ভক্তি-প্রভা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ব-বাচস্পতি-প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ। ৪১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য কাগজের মলাট—২৲ টাকা, উৎকৃষ্ট কাপড়ের বাঁধাই—২৷৹ টাকা মাত্র। পোঃ আলাটী, জিং হুগলী ঠিকানায় ভক্তিপ্রভা-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থখানি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির কথা এবং আনুষঙ্গিকভাবে ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কথা আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন—বৈদিক যুগেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় অংশে বৈষ্ণবের করণীয় অনুষ্ঠানাদি, বৈষ্ণবের অধিকারাদি, বিভিন্ন শাখা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের, বিশেষভাবে "গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণবের" বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তত্ত্ব-বাচস্পতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তের সঙ্গে স্থল-বিশেষে আমাদের মতভেদ থাকিলেও আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, গ্রন্থখানি বিবিধ জ্ঞাতব্য-বিষয়ের বিরাট ভাণ্ডার-বিশেষ। যেরূপ ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের সহিত বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, সংহিতা, গোস্বামিগ্রন্থ, প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ, কুলজী-গ্রন্থ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া সুপণ্ডিত গ্রন্থকার এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ এবং আদর্শস্থানীয়। তাঁহার গবেষণা ও তাঁহার শাস্ত্রালোচনা-প্রসার অতুলনীয়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ঐতিহাসিক তত্ত্বাদি যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একখানা "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ইতিহাস" সংগ্রহ করা প্রয়োজন। একসঙ্গে এত জ্ঞাতব্য-বিষয়ের সমাবেশ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

প্রার্থনা।

জানিনা কেমনে তুমি কাহাকে নাচাও।
কাকে কবে কৃপা ক'রে কেমনে বাঁচাও॥

আমি হে ত্রিতাপ-তাপে জলি নিরন্তর।
কৃপা ক'রে কর শুদ্ধ তাপিত অন্তর॥
প্রীতি দিয়ে রাখ স্মৃতি চরণের প্রতি।
তুমি বিনে অভাগার আর নাহি গতি॥

শ্রীহরি গোপাল বসাক।

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা।

মাঘ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা—	৩রা সোমবার।
একাদশী—	১৫ই শনিবার।
বসন্তপঞ্চমী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন—	২৩শে রবিবার।
মাকরী সপ্তমী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব	২৫শে মঙ্গলবার।
ভৈমী একাদশী	২৯শে শনিবার।

ফাল্গুন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব	২রা সোমবার।
একাদশী	১৬ই সোমবার।
শ্রীশিবরাত্রি	১৮ই বুধবার।
একাদশী ও আমর্দ্দকী-ব্রত	৩০শে সোমবার।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মঠ।—পৌষ মাসের সাধনায় শ্রীগৌরাঙ্গ-মঠের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোক্তা পরমভাগবত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ দাস শর্ম্মা মহাশয় পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয়েরই শিষ্য। এই সম্বন্ধে প্রভুপাদ হরেন্দ্র বাবুর নিকটে ২৮।১।৩৩ বাং তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, সাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাহা

নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

"আশীর্ব্বাদান্তে সমাচার এই। বাবা হরেন্দ্র! তোমার পত্রখানা পাইয়া সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইলাম। তোমরা যে শ্রীগৌরাঙ্গ-মঠ-সম্বন্ধে লিখিয়াছ, অবশ্য আমি ভুলি নাই। যাহা হউক, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হও এবং তোমাদের দেশে যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তজ্জন্য মনে প্রাণে পরিশ্রম করিবে। আশীর্ব্বাদক—শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।"

সাধারণের সহানুভূতি ব্যতীত এইরূপ একটী সদনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। অথচ এতদঞ্চলে এইরূপ একটী অনুষ্ঠানেরও বিশেষ প্রয়োজন। আমরা আশা করি, ধর্ম্মপ্রাণ জনমণ্ডলী প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে কৃপণতা করিবেন না। সাহায্যের টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসশর্ম্মা ; গ্রাঃ শোনপুর, পোঃ হরিমঙ্গল, জিঃ ত্রিপুরা।

কুম্ভমেলা :—এবার শ্রীহরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভ হইবে। তৎপূর্ব্বে ৪ঠা ফাল্গুন (পূর্ণিমা) হইতে ৪ঠা চৈত্র দোল-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে অর্দ্ধকুম্ভ হইবে। কুম্ভমেলায় ভারতের নানাস্থান হইতে বহুলক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। কুম্ভমেলায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইবে, তাঁহারা একসঙ্গে বহু সাধুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। সাধনার নিয়ামক প্রভুপাদ শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভ-উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবেন।

শ্রী শ্রীধূলট-উৎসব :—২৩শে মাঘ বসন্ত-পঞ্চমী হইতে শ্রীনবদ্বীপে ধূলট-উৎসব আরম্ভ হইবে। ধূলটের কীর্ত্তন এক অতি অপূর্ব্ব বস্তু।

নিবেদন :—কোন কোন লেখক একই প্রবন্ধ একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় প্রকাশের নিমিত্ত পাঠাইয়া থাকেন, ফলে দুই পত্রিকায় একই প্রবন্ধ একই সময়ে প্রকাশিত হয়। ইহা পত্রিকার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের বিনীত অনুরোধ, যাঁহারা এই ভাবে একাধিক স্থানে একই প্রবন্ধ পাঠান, আমাদের নিকট প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানান—ঐ প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রেরিত হইয়াছে কিনা।

১ম বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৩৩ [১১শ সংখ্যা।

সাধনা।

(গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মাসিক-পত্রিকা।)

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

ভারত-বিখ্যাত ভক্তি-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশীয়

প্রভুপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী

সম্পাদক

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম, এ,

অধ্যাপক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ।

কার্য্যালয় :— শঙ্করপ্রেস, কুমিল্লা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা] [প্রতি সংখ্যা

কুমিল্লা শঙ্করপ্রেসে, শ্রীসুরেশচন্দ্র দে কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সকল বিষয়ে মতের মিল না হইলেও আলোচনা-প্রসারের উদ্দেশ্যে গবেষণাপূর্ণ-প্রবন্ধাদি, লেখকগণের দায়িত্বে "সাধনায়" প্রকাশিত হয়।

সূচী।

সাধনা।

(মাসিক-পত্রিকা।)

———:০:———

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা ॥

১ম বর্ষ, } ফাল্গুন—১৩৩৩ { ১১শ সংখ্যা।

নিশান্তে—শ্রীগৌরচন্দ্রিকা।

জয় জয় গৌর কিশোর।

অহর্নিশ নব নব ভাব প্রকট তনু

পূরব পিরিতে পঁহু ভোর ॥

নিশি অবশেষ বেশ করু অঙ্গহি

দরপণে পুনঃ পুনঃ পেখি।

আবেশে কহই পুন ঐছন নাহি ভেল

কি কহব মঝু সব সখী ॥

পূরব আকাশে পুন দিঠি দেই বোলত

হায় হায় নিশি অবশেষ।

'দেহ বিদায়' বলি রোয়ি রোয়ি বোলত

নারী হাম আঙ্গিনা বিদেশ ॥

পদ দুই চলি পালটী পুন কাঁপই

কুসুম শয়ন-পর রোয়।

তুয়া লাগি হাম যোগিনী হই বাহিরাব
দেখ জনি ছোড়বি মোয়॥
আপন অঞ্চলে জনু মুখ মুছল ভানে
কহতহি গদগদ ভাবে।
তোহারি রোদনে মঝু অন্তর বিদরই
কথি লাগি এতহু হুতাশে॥
অলপক্ষণ পর তো সঞে মিলিব কান
জানবি হামে চিরদাসী;
ইহ পরলাপে আপহি অবধারল
ইহ গোপীবল্লভ শশী॥

শ্রীগোপীনাথ বসাক।

জিজ্ঞাসা।

অনেকের নিকট আমরা অনেক বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, উত্তরও পাই; উত্তর-অনুরূপ কাজও করিয়া থাকি; কাজের ফলও কিছু কিছু পাইয়া থাকি; তথাপি কিন্তু জিজ্ঞাসার অবসান হয় না। একটী বিষয়ে জিজ্ঞাসার অবসান হইলেও আর একটী জিজ্ঞাসার উদয় হয়। কেন এমন হয়?

অভাব-বোধেই জিজ্ঞাসার উদ্ভব। আমাদের অভাব-বোধের অবসান হয় না বলিয়াই জিজ্ঞাসারও অবসান হয় না।

আমাদের অভাব অনন্ত; অনন্ত হইলেও সকল অভাবের মূল-উৎস একটী মাত্র। বিভিন্ন অভাব, একটী মাত্র অভাবেরই বিভিন্ন প্রকাশ। সুখের বা আনন্দের অভাবই এই মূল অভাব।

আনন্দ-লাভের নিমিত্ত জীবের একটী স্বাভাবিকী লালসা আছে; এই আনন্দ-লালসাই বিভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া আমাদিগকে বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত করে। আমরা অর্থোপার্জ্জন করি আনন্দ-লাভের আশায়;

বিষয়-সম্পত্তি সংগ্রহ করি আনন্দ-লাভের আশায়; পুণ্য-কার্য্য করি আনন্দ-লাভের আশায়; চুরি, ডাকাইতি, মিথ্যা, কপটাচার-আদি পাপ-কর্ম্মও আনন্দ-লাভের আশার তাড়নাতেই আমরা করিয়া থাকি।

আমরা চাই নিত্য-আনন্দ; ক্ষণস্থায়ী আনন্দ সংসারে আমরা পাই; কিন্তু তাহাতে আমাদের আনন্দের বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। আমরা চাই কেবল-আনন্দ—অবিমিশ্র আনন্দ; দুঃখমিশ্রিত আনন্দ আমরা পাই; তাহাতে আমরা তৃপ্ত হই না। পরিণাম-দুঃখময় আনন্দও আমরা চাই না; সংসারে আমরা তাহা পাই; কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত হইনা। নিত্য, কেবল, আনন্দ—যাহার আদিতে আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, পরেও আনন্দ—এমন আনন্দের নিমিত্তই আমাদের লালসা; সংসারে আমরা তাহা পাই না। কথায় বলে, লোকে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে চেষ্টা করে; অমরা কিন্তু ঘোলও পাই না; খড়িগোলা লোনাজল দিয়াই আমরা দুধের সাধ মিটাইতে চাই। তাই আমাদের সাধ মিটে না; অভাব ঘুচে না; জিজ্ঞাসারও অবসান হয় না।

যদি নিত্য, কেবল আনন্দ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আনন্দ-লালসা পরিতৃপ্ত হইত, অভাব-বোধ ঘুচিয়া যাইত; কিন্তু নিত্য-আনন্দের নিমিত্তই যে আমাদের লালসা, ইহাও সাধারণতঃ আমরা বুঝি না; সময় সময় বুঝিলেও যেন বুঝিতে চাই না। তাই, কিসে সেই আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা কাহারও নিকটেই জিজ্ঞাসা করি না। কিন্তু এই জিজ্ঞাসাই মূল জিজ্ঞাসা।

কিসে আনন্দ পাওয়া যায়, এইরূপ জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে আর একটী জিজ্ঞাসা আছে। নিত্য, কেবল আনন্দ কোথায় আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর আমরা-সাংসারিক জীব দিতে পারি না; কারণ, আমরা সেই আনন্দের সন্ধান জানি না—সংসারে সেই আনন্দ নাই; থাকিলে কেহ না কেহ তাহা পাইত। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তাঁহারা—যাঁহারা তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, সন্ধান পাইয়া যাঁহারা তাহা অনুভব করিয়াছেন; অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন—ঐ আনন্দ-লাভ করিতে পারিলে আর অভাব-বোধ থাকেনা, সমস্ত জিজ্ঞাসার অবসান হয়। তাঁহারা বলেন—"আনন্দং ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম-বস্তুই আনন্দ; নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে সুখ হয় না;

যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য—যাহা ভূমা বা বিভুবস্তু, বৃহদ্বস্তু, তাহাই সুখ ; অন্য কোন বস্তুতে সুখ নাই ; ভূমাই সুখ, ভূমাই জিজ্ঞাস্য। এই ভূমা বা ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ-ঘনবস্তু ; এই সচ্চিদানন্দ-ঘন বস্তুই ভগবান্ ; আনন্দরূপে তিনি পরমাস্বাদ্য বলিয়া তিনি রস-স্বরূপ —রসো বৈ সঃ। এই রস-স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলেই জীব আনন্দী হইতে পারে—রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

কিন্তু রস-স্বরূপ ভগবান্‌কে পাইলে কিরূপে জীব আনন্দী হইতে পারে ? কেবল পাওয়াতেই আনন্দ হয়না—আনন্দ হয় অনুভবে। আমি যদি একটী পাকা আম পাই, তাহা হইলেই আমের স্বাদ আমি পাইনা, স্বাদ-গ্রহণের বাসনাও আমার চরিতার্থ হয়না। আমের স্বাদ-গ্রহণ করিলেই তাহার আস্বাদের অনুভব হয়। তদ্রূপ, আনন্দ-স্বরূপ ভগবানের অনুভব লাভ হইলেই আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়, আনন্দী হওয়া যায়।

তাহা হইলে, কিরূপে শ্রীভগবানের যথার্থ-অনুভব লাভ করা যায়, ইহাই হইল জীবের মুখ্য এবং একমাত্র জিজ্ঞাস্য। ভগবদনুভব-লাভের উপায়টী কি ?

অনুভবের উপায় অনেক রকম থাকিতে পারে ; অনুভবও অনেক রকম হইতে পারে ; কিন্তু সকল রকমের অনুভব যথার্থ-অনুভব নহে। সুপক্ক আমটী দেখিয়াই কেহ হয়তো তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন। ইহা চাক্ষুষ-অনুভব ; ইহা কিন্তু যথার্থ-অনুভব নহে। কেহ হয়তো আমটীর গন্ধ অনুভব করিয়াই তৃপ্ত হন ; আমটী যে সুমিষ্ট, তাহাও হয়তো কিছু কিছু অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু ইহাও যথার্থ-অনুভব নহে ; কারণ, তিনি রসের-স্বাদ পায়েন না। যিনি রসনার যোগে আমটীর স্বাদ গ্রহণ করেন, তাঁহার অনুভবই যথার্থ-অনুভব।

এইরূপ শ্রীভগবানেরও নানারকমের অনুভব হইতে পারে। কেহ হয়তো শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদির কথা শুনিয়া পুলকিত হইতে পারেন ; ইহাও এক রকমের অনুভব বটে—ঐশ্বর্য্যের অনুভব—কিন্তু যথার্থ ভগবদনুভব নহে। কেহ হয়তঃ অন্তরে শ্রীভগবানের রূপাদির স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারেন ; ইহাও এক রকমের অনুভব বটে, এবং ঐশ্বর্য্যাদি-শ্রবণ জনিত অনুভব হইতে উপাদেয়ও বটে; কিন্তু ইহাও যথার্থ-অনুভব নহে। ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদির যে অনুভব, তাহাই যথার্থ-অনুভব। ভগবানের ভগবত্তার সারই

হইল—মাধুর্য্য, "মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার"—একথাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন। ভগবত্তার সার যাহা, তাহার অনুভবই শ্রীভগবানের সার-অনুভব—তাহাই যথার্থ-অনুভব। এই অনুভবটী লাভ করিতে পারিলেই জীবের অনুভব পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে, জীব সর্ব্বতোভাবে "আনন্দী" হইতে পারে, তাহার অভাব-বোধ সর্ব্বতোভাবে ঘুচিয়া যায়, তাহার জিজ্ঞাসার চরম-অবসান হয়।

শ্রীভগবান সম্বন্ধে এইরূপ যথার্থ-অনুভব-লাভের উপায়টী কি, তাহাই মুখ্য জিজ্ঞাস্য। এই উপায়টী আবার নিশ্চিত হওয়াও দরকার; নচেৎ সাধকের চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হইতে পারে।

কোনও উপায়ের নিশ্চয়তা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, অন্ততঃ এই কয়টী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে:—

প্রথমতঃ, ঐ উপায়টী সম্বন্ধে কোনও অন্বয়-বিধি আছে কি না? অর্থাৎ, ঐ উপায়টী অবলম্বন করিলে যে অভীষ্ট-লাভ হইবে, এমন কোনও প্রমাণ আছে কি না?

দ্বিতীয়তঃ ঐ উপায়টী সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধি আছে কি না? অর্থাৎ ঐ উপায়টী অবলম্বন না করিলে যে অভীষ্টলাভ হইবে না, এমন কোনও প্রমাণও আছে কি না?

তৃতীয়তঃ, ঐ উপায়টী অন্যনিরপেক্ষ কি না? যদি ঐ উপায়টী অন্য কোনও বস্তুর সাহাচর্য্য অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না; কারণ, অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে, অথবা তাহার সাহচর্য্যের তারতম্যে অভীষ্ট-লাভে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

চতুর্থতঃ, ঐ উপায়টীর সার্ব্বত্রিকতা আছে কিনা? অর্থাৎ যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে ঐ উপায়টী অবলম্বন করিতে পারে কি না? যদি সার্ব্বত্রিকতা না থাকে, তাহা হইলে উপায়টীর নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না; কারণ, দেশের, পাত্রের ও অবস্থার প্রতিকূলতায় অভীষ্টলাভের বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, ঐ উপায়টীর সদাতনত্ব আছে কি না? অর্থাৎ যে কোনও সময়েই ঐ উপায়টী অবলম্বনীয় কি না? তাহা যদি না হয়,

তাহা হইলেও উপায়টীর নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না; কারণ, কালের প্রতিকূলতায় অভীষ্ট-লাভের বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

তাহা হইলে বুঝা গেল,— যাহার সম্বন্ধে অন্বয়-ব্যতিরেকমুখে বিধি আছে, যাহা অন্যনিরপেক্ষ, যাহা সার্ব্বত্রিক এবং যাহা সদাতন, তাহাই নিশ্চিত উপায়। শ্রীভগবানের যথার্থ-অনুভব সম্বন্ধে এই উপায়টীই জীবের মুখ্য জিজ্ঞাস্য। তাই ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত ২।৯।৩৫।

আত্মনঃ পরমেশ্বরস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যোঃ শিক্ষণীয়ং—যৎ যদেকমেব বস্তু অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র স্যাৎ ইতি উপপদ্যতে।— "শ্রীভগবানের যথার্থ অনুভব লাভ করিতে যিনি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীগুরুদেবের চরণে তাহাই জিজ্ঞাস্য— যাহা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।"

এই ভগবদুক্তিতে, "অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং" শব্দে উপায়টী সম্বন্ধে অন্বয়ব্যতিরেকবিধি, "এব" শব্দে অন্যনিরপেক্ষতা, "সর্ব্বত্র" শব্দে সার্ব্বত্রিকতা এবং "সর্ব্বদা" শব্দে সদাতনত্ব সূচিত হইতেছে। সুতরাং এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত উপায়ই যে শ্রীভগবানের যথার্থ-অনুভবের নিশ্চিত উপায়, শ্রীভগবানের বাক্য হইতেই তাহা বুঝা যায়।

ভগবদনুভবের উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, কর্ম্ম দ্বারা ভগবদনুভব হয়; কেহ বলেন, জ্ঞানদ্বারা ভগবদনুভব হয়, কেহ বলেন, যোগদ্বারা ভগবদনুভব হয়, আবার কেহ বলেন, ভক্তিদ্বারাই ভগবদনুভব হয়। কর্ম্ম বলিতে এ স্থলে বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মকে বুঝায়; জ্ঞান বলিতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান বা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যরূপ জ্ঞানানুসন্ধানকে বুঝায়; যোগ বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন-উদ্দেশ্যে সাধন এবং ভক্তি বলিতে সবিশেষ ব্রহ্ম শ্রীভগবানের সেবা বুঝায়। ভক্তির তিনটী স্তর; সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি, ও প্রেমভক্তি। ভক্তিমার্গের সাধক সাধনাবস্থায় যে সমস্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের নাম সাধনভক্তি; সাধনভক্তি হইতেই ভাব-ভক্তির উদয় হয়;

ভাবভক্তির পরিপক্কাবস্থার নাম প্রেমভক্তি ; এই প্রেমভক্তি লাভ হইলেই ভক্তি-মার্গের সাধক সিদ্ধ হয়েন এবং ভগবদনুভবের যোগ্য হয়েন। ইহা লাভের উপায় —সাধনভক্তি।

যাহাহউক, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয়তা-লক্ষণ পাঁচটী আছে কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। উক্ত পাঁচটী লক্ষণের একটীরও অভাব যাহাতে লক্ষিত হয়, তাহাকে নিশ্চিত উপায় বলা যাইতে পারিবে না।

কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সাধারণতঃ স্বর্গাদিসুখপ্রাপ্তিই সম্ভব ; স্বর্গাদি-সুখ অনিত্য ; কর্ম্মফল-ভোগান্তে আবার জীবকে সংসারে আসিতে হয়। সুতরাং কর্ম্মিগণ নিত্য-আনন্দ পাইতে পারে না, ভগবদনুভব তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

কর্ম্মানুষ্ঠানে ক্বচিৎ কেহ ভগবদনুভব লাভ করিতে পারে, তাহার প্রমাণও আছে।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্।
বিরিঞ্চিতামেতি অতঃপরং মাম্। শ্রীমদ্ভা।

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শতজন্মে বিরিঞ্চিত্ব লাভ করিতে পারেন ; তারপর আমাকে (ভগবান্‌কে) লাভ করিতে পারেন।" ইহা কর্ম্মসম্বন্ধে অন্বয়-বিধি। কর্ম্মসম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক বিধি দেখা যায় না অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে যে ভগবদনুভব হইতে পারে না, এরূপ কোনও বিধি দৃষ্ট হয় না।

কর্ম্মের অন্যনিরপেক্ষতাও নাই, ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কর্ম্ম স্বীয় ফল প্রদান করিতে পারে না।

য এষঃ পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ শ্রীভা।১১।৫।৩

এই শ্লোকেরই মর্ম্মানুবাদে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন :—

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিয়াও রৌরবে পড়ি মজে॥ম ২২।১৯

কর্ম্মের সার্ব্বত্রিকতা নাই, সদাতনত্বও নাই। কর্ম্মমার্গে দেশ-কাল-পাত্রাদির অপেক্ষা আছে। সকল লোক কর্ম্মমার্গের অনুষ্ঠানে অধিকারী নহে। যাহারা বেদবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাঁহারা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী নহে—যেমন, মুসলমান, খৃষ্টান্ ইত্যাদি। যাহারা বর্ণাশ্রমের মধ্যে আছে, তাহাদেরও সকলের সমান অধিকার নাই ; যেমন যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদিতে শূদ্রের অধিকার নাই। অশৌচাবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ ; কর্ম্মের ফল পাওয়া গেলেই কর্ম্মের বিরতি ঘটে ; পবিত্রস্থানব্যতীত অন্য স্থানেও কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের সার্ব্বত্রিকতা নাই। কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, তিথি-নক্ষত্রাদির বিচার আছে, কালের শুদ্ধ্যাশুদ্ধি বিচার আছে ; সুতরাং ইহার সদাতনত্বও নাই। এই সমস্ত কারণে বুঝা যাইতেছে, ভগবদনুভব সম্বন্ধে কর্ম্মমার্গ নিশ্চিত উপায় নহে।

জ্ঞানমার্গ। শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানদ্বারা যিনি ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন, তিনিও ব্রহ্মই হয়েন। জ্ঞান-সম্বন্ধে ইহা অন্বয় বিধি। এই শ্রুতি-বচনের "ব্রহ্মৈব" শব্দের অর্থ দুই রকম হয়। জ্ঞানমার্গের আচার্য্যগণ বলেন, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়েন, ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁহার আর কোনও অংশেই ভেদ থাকে না। ভক্তিমার্গের আচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্মবিদ ব্রহ্ম হয়েন না ; পরন্তু, অগ্নির সংশ্রবে লৌহ যেমন অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের সংশ্রবে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিও ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েন ; ব্রহ্মের সহিত তাঁহার ভেদ লোপ পায় না। এই প্রবন্ধে এই মতের সমালোচনা একটু অপ্রাসঙ্গিকই হইবে ; প্রয়োজনও নাই। আমরা বরং উভয় সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়াই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

জ্ঞানমার্গের-আচার্য্যেদের মতানুসারে, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি যদি ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদত্ব প্রাপ্ত হইয়া মিশিয়া যায়েন, তাহা হইলে তিনি আনন্দ হইয়া যাইতে পারেন ; কিন্তু তাঁহার স্বতন্ত্রসত্ত্বা থাকেনা বলিয়া তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মের অনুভব সম্ভব হয় না ; সুতরাং তিনি "আনন্দী" হইতে পারেন না। অনুভব করিতে হইলেই অনুভবক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম এই দুইটী বস্তু থাকা দরকার। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"—এই শ্রুতিবাক্যেও কর্ত্তা ও কর্ম্মের উল্লেখ আছে ; লব্ধা-ক্রিয়ার কর্ত্তা-অয়ং—জীব ; আর কর্ম্ম—রস—রসস্বরূপ ভগবান্। রসানু-

ভবের পরেই জীব আনন্দ পায় বলিয়া "আনন্দী" হয়—"আনন্দ" হইয়া যায়, একথা ঐ শ্রুতি বলেন নাই। এইরূপ মুক্তিতে দুঃখের অবসান হইতে পারে বটে, কিন্তু সুখ-লাভের সম্ভাবনা থাকেনা। চিনি হওয়া যায়, কিন্তু চিনির স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে—ভগবদনুভবের উপায়, উপরোক্ত অর্থানুসারে জ্ঞান ভগবদনুভবের উপায় হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

ভক্তিমার্গের আচার্য্যদের ব্যাখ্যানুসারে, ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত জীবেরও স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকিতে পারে; সুতরাং সেই জীবও ভগবদনুভবে সমর্থ হইতে পারে; তাঁহার পক্ষেও "আনন্দী" হওয়া সম্ভব। এই অর্থানুসারে, জ্ঞান, ভগবদনুভবের একটা উপায় বটে।

জীব-ব্রহ্মের-ঐক্যপ্রাপ্তিরূপ জ্ঞান সম্বন্ধে কোনও রূপ ব্যতিরেক-বিধিও দেখা যায়না, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মে অভেদ-মনন ব্যতীত যে ভগবদনুভব লাভ হইতে পারেনা—এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়না।

জ্ঞানের অন্যনিরপেক্ষত্বও নাই; স্বীয় ফল প্রদান করিতে, জ্ঞানের পক্ষে ভক্তির সাহচর্য্য প্রয়োজন।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ শ্রীভা ১।৫।১২

"সর্ব্বোপাধি-নিবর্ত্তক ব্রহ্মজ্ঞানও, অচ্যুত-শ্রীভগবানে ভক্তি-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায়না; অর্থাৎ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় না; এমতাবস্থায়, সাধনকালে, কি ফল-কালেও দুঃখপ্রদ যে কাম্য বা অকাম্যকর্ম্ম, তাহা যে হরি-ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পাইবেনা, তৎসম্বন্ধে আর বলিবার কি প্রয়োজন আছে?"

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ শ্রীভা ১০।১৪।৪

"হে বিভো! মঙ্গলের হেতুভূতা ত্বদীয়া ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করেন, তণ্ডুলশূন্য-স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের ঐ ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয়না।"

জ্ঞানের সার্ব্বত্রিকতাও নাই, সনাতনত্বও নাই। সকল লোক জ্ঞানের অধিকারী নহে; কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত জীবই জ্ঞানমার্গের সাধনে অধিকারী, সিদ্ধিলাভের পরেও নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানানুশীলন থাকেনা।

এই সমস্ত কারণে, ভগবদনুভবের পক্ষে জ্ঞান একটী উপায় হইলেও নিশ্চিত উপায় নহে।

তার-পর যোগ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,

যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিচ্ছতি। ৫।৬

"যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে।" ইহা যোগ সম্বন্ধে অন্বয়বিধি। বিভিন্ন প্রকারের যোগসম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক অন্বয়বিধি-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন—

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৬।৩৬

বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা যাঁহার আত্মা বা মন সংযত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, উপায় অবলম্বন করিলে তিনিই সফলযত্ন হইতে পারেন।"

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ অসংযতাত্মনা-শব্দ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"উক্তাভ্যামভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত আত্মা মনো যস্য তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা—অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যাঁহার আত্মা বা মন সংযত হয় নাই, তিনি বিজ্ঞ পুরুষ হইলেও (যোগ তাঁহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য)।

ইহাতে বুঝা যায়, যোগসম্বন্ধে অধিকারি-বিচার আছে; সুতরাং যোগের সার্ব্বত্রিকতা দেখা যায় না।

উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীমদ্বিদ্যাভূষণপাদ "উপায়তঃ" শব্দ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"উপায়তো মদারাধনলক্ষণাজ্জ্ঞানাকারান্ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগাচ্চেতি" ইহাতে বুঝা যায়, যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভগবদারাধনা বা ভক্তির অপেক্ষা রাখে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।—মধ্য ২২।১৪

শ্রীমদ্ভাগবতও ঐ কথাই বলেন—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ২।৪।১৭

"তপস্বী (জ্ঞানী), দানশীল (কর্ম্মী), যশস্বী (কর্ম্মিবিশেষ), মনস্বী (মননশীল যোগী), মন্ত্রবিৎ (আগম-শাস্ত্রানুগত সাধক), এবং সুমঙ্গল (সদাচার) ব্যক্তিগণও যাঁহাতে স্ব স্ব তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল-যশঃশালী ভগবান্‌কে নমস্কার, নমস্কার।"

এই সমস্ত প্রমাণে বুঝা যায়, যোগের অন্য-নিরপেক্ষতাও নাই।

অতএব, যোগও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত নিশ্চিত উপায় বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে পারেনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইলে আগামীমাসে ভক্তির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। (ক্রমশঃ)।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

নাম।

পদে কোটি পরণাম,　　মোরে দয়া কর নাম,
আবির্ভূত হও রসনায়।
পুলক-প্রবাহে ফুলি,　　আন রস সব ভুলি,
জিহ্বা যেন অবিরাম গায়।
বিষয়-বাসনাহীন,　　মুনি ঋষি নিশিদিন,
স্তুতি করে হে নাম, তোমার ;
সদা শিব সদা গা'ন,　　নারদের বীণাখান,
সঞ্জীবিত তোমার সুধায়।

নিখিল শ্রুতির হার তব পদ অলঙ্কার
কেবা জানে তব মহিমায় ;
কৃপা দৃষ্টে চাহ যারে অনায়াসে ভবপারে
নেচে গেয়ে সেই চলে যায়।
যার কণ্ঠে একবার আবির্ভূত হও তার
ত্রিতাপের সন্তাপ পলায় ;
আভাসেও যেবা লয় তার নাশ যমভয়,
অজামিল মোক্ষধাম পায়।
মরা মরা জপ করি রত্নাকর গেল তরি,
নমো নমঃ হে নাম তোমায় ;
দয়ার তুলনা নাই মোক্ষ ফল হাতে পাই
নিলে তোমা হেলায় শ্রদ্ধায় ;
কি মোর সাধন আছে আসিবে আমার কাছে
আছি আমি কৃপার আশায়।
তোমাতে যাহার চিত্ত তাহার ভৃত্যের ভৃত্য
দাস-দাস করহ আমায়।
যে প্রারব্ধ ভোগ বিনে নহে ক্ষয় কোন দিনে,
তাও কাটে তোমার প্রভায় ;
পাপ তাপ সব মুছি হে নাম, তোমাতে রুচি
দাও এই দীন অভাগায়।

শ্রীমুকুন্দ নাথ ঘোষ বি, এল, ভারতী।

প্রেমের প্রাধান্য।

বহুদিন পূর্ব্বে পরমভক্ত শ্রীলনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তিকা শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকার একটী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে সময় উক্ত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ বাজারে পাওয়া যাইত না। বটতলার খণ্ডিত, ভ্রমপূর্ণ ও

অসম্পূর্ণ পুস্তক কিনিয়া বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ কোনরূপে তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। বৈষ্ণব-সমাজে এরূপ নিত্যপাঠ্য গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্য আমার কয়েকটী সুহৃদ ও আত্মীয় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায়, আমি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তাহার পর অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে। মাসাধিক হইল জনৈক বৈষ্ণব কৃপাপূর্ব্বক আমার বাটীতে আগমন করায়, তাঁহাকে ঐ পুস্তক একখণ্ড উপহার দিয়াছিলাম। তিনি পুস্তক পাইয়া সানন্দে শিরোধারণ-পূর্ব্বক তৎপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা দ্বারা উপস্থিত জনগণের তুষ্টি সাধন করিয়া নিজের শাস্ত্রজ্ঞান-প্রকাশেও ত্রুটি করেন নাই। কথায় কথায় তিনি বলিয়া ফেলিলেন, ঠাকুর-মহাশয় পরম ভক্ত ও ভক্তি-রসে রসিক; সুতরাং প্রেমিক হইলেও গ্রন্থের নাম-করণে যেন একটু গোল করিয়াছেন। ইহার নাম "প্রেম-ভক্তি চন্দ্রিকা" না রাখিয়া 'ভক্তি-প্রেম চন্দ্রিকা' রাখিলেই মানানসই ও সঙ্গত হইত। ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতে গেলে আগে ভক্তির উল্লেখ করাই যেন সর্ব্বতোভাবে সমীচীন মনে হয়।" তিনি নিজ মত সমর্থনের জন্যও বোধহয় যুক্তিতর্ক প্রদর্শনে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে সে সময় বিষয়ান্তরের আলোচনায় আমরা ব্যাপৃত হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ঐ বিষয় আর কোনরূপ আলোচনার সুযোগ-সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। সে সময় অবধি আমি প্রতিদিনই কিছু কিছু চিন্তা করিয়া আসিতেছি। তাহারই ফল স্বরূপ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিলাম।

ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সুদুর্ল্লভত্ব পূজ্যপাদ গোস্বামি-পাদ-গণ নানা গ্রন্থে নানা ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি মহাশয় লিখিয়াছেন—

'জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ ভুক্তির্যজ্ঞাদিকর্ম্মতঃ।

সেয়ং সাধনসহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥

এইত ব্যাপার; কিন্তু প্রেমের অবতার, ভক্তির আধার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পর ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও ভক্তগণ-প্রেমের নাম স্মরণ মননে পরম পুলকিতচিত্ত ও আদ্র হৃদয় হইয়া থাকেন।

মহাদার্শনিক ও পরম বৈষ্ণব শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাশয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে লিখিয়াছেন—

"যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ
প্রেমাভিধানঃ পরম-পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

অর্থাৎ যাঁহার চরণ-কমলে ভক্তি করিলে প্রেম-নামক পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারা যায়, সেই জগতের মঙ্গলের মঙ্গল নিধান শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম॥ এখানে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণ-কমলে ভক্তির ফলে প্রেম পাওয়া যায় বলিয়া ভক্ত-সাধক প্রবোধানন্দ-স্বামী নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার দেবর্ষি নারদ নিজকৃত ভক্তিসূত্রের প্রথম সূত্রেই

"ওঁ অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ"

লিখিয়াই দ্বিতীয় সূত্রে লিখিয়াছেনঃ—

ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমস্বরূপা।"

অর্থ্যাৎ নারদ—"ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেছি," এই কথা কয়টীর পরেই লিখিয়াছেন, সেই ভক্তি পরম (ঐকান্তিক) প্রেমস্বরূপা *। 'কস্মৈ' পদ ঈশ্বরার্থে লক্ষিত হইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রশ্নার্হ বলিয়া তাঁহার নাম "কঃ" বা "কিং"॥

---

* ভক্তি একটী সাধারণ নাম ; ইহার তিনটী স্তর—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধনভক্তি হইতে ভাবের উদয় হয় ; ভাবের অপর নাম রতি বা প্রেমাঙ্কুর। এই রতি গাঢ় হইলেই তাহাকে প্রেম বলে।

সাধনভক্তি হইতে হয় প্রেমের উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৯

ভক্তির শেষ স্তরের নাম প্রেমভক্তি। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদির বাসনাত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত যে বাসনা, তাহার নাম প্রেম। আর ভক্তি অর্থ ভজন বা সেবা। "ভক্তিরস্য ভজনম্। ইহামূত্রোপাধিনৈরাস্যেন অমুস্মিন্ মনসঃ কল্পনম্॥" প্রেমের সহিত অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের বাসনার সহিত যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা, তাহাই প্রেমভক্তি। ইহাই পরমপুরুষার্থ।

(পরপৃষ্ঠা)

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে কসূক্ত নামক একটী সূক্ত আছে, তাহার প্রথম ঋক্‌টী এই—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

আবার মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুর যে সহস্র নাম আছে, তাহাতে তাঁহার নামমধ্যেও উল্লিখিত হইয়াছে "একোঃ নৈকঃ মতঃ 'কঃ কিং' যত্তৎ পদমনুত্তমম্॥"

ক শব্দে ঈশ্বরকে বুঝায়, তাহা দেখাইবার জন্যই শ্রুতি ও মহাভারতের প্রমাণ দুইটী উপরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নারদ ভক্তির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অন্য কোন শব্দের ব্যবহার না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি বা প্রেমই ভক্তি—এই মত সংস্থাপন করিয়াছেন। এখন ভক্ত সাধকগণ প্রেমের গরিমা ও মহিমা কীর্ত্তনে কিরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

রাজমহিষী মিরা বাইএর নাম বৈষ্ণব-জগতে, সুপরিচিত। তাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার, অদ্ভুত অনুরাগ ও অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্যের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে চমকিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি প্রেমের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

নিত নাহানেসে হরি মিলে ত জলজন্তু হো জাই।
ফল খানেসে হরি মিলে ত, বাদুড় বানরাই।
তৃণ ভখনেসে হরি মিলে বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়নেসে হরি মিলে বহুত রততা খোজা।

শ্রীলঠাকুরমহাশয় এইরূপ সেবার বিষয়ই তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার গ্রন্থের নাম প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। আর শ্রীনারদও তাঁহার প্রথম সূত্রে এই সাধ্যরূপা ভক্তির কথাই বলিয়াছেন, তাই দ্বিতীয় সূত্রে "পরমপ্রেমস্বরূপা" বলিয়া প্রথম-সূত্রোক্ত ভক্তিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন।—সম্পাদক।

দুধ পিনে সে হরি মিলেত বহুত বৎসবালা।
মিরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা॥

অর্থাৎ নিত্য স্নান করিলে যদি শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে জলজন্তু হওয়া ভাল, কারণ তাহারা দুই একবার মাত্র স্নান করে না, বরং দিবা-রাত্র জলমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। ফলমূল আহার করিলে যদি হরি পাদ-পদ্ম লাভ হয়, তবে বাদুর ও বানরগণ সে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। তৃণ ভক্ষণ করিলে যদি শ্রীহরির চরণ প্রাপ্তি সুলভ হয়, তবে অনেক মৃগ ও অজা অর্থাৎ হরিণ ও ছাগল সে চরণ পাইয়াছে। স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিলে যদি শ্রীহরির চরণ-প্রাপ্তির সুবিধা ঘটে, তবে পুরুষত্বহীন অনেক ব্যক্তির ভাগ্যে এ সৌভাগ্য লাভ সুগম হইতে পারে। দুগ্ধ-পান করিলে যদি শ্রীহরিকে পাওয়া যায়, তবে গাভীর বৎস-গণ ও মানব-শিশু সকল ত কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ অবশ্যই তাহারা লাভ করিতে পারে। মিরাবাই কহিতে-ছেন, প্রেম ব্যতীত শ্রীহরির চরণ-পদ্ম লাভ হয় না। দোঁহাটীর ভাবার্থ ও তাৎপর্য্য বড় সুন্দর ও গম্ভীর। যাঁহারা মনে করেন, নিত্য স্নান করিলে, ফলমূল আহার করিলে, তৃণ ভক্ষণ করিলে, স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিলে, অথবা কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিলেই শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, ঐরূপ ব্যবহার প্রণালীর দ্বারা, জলজন্তুগণ, বাদুড় বানরগণ, হরিণ ও ছাগল সকল, খোজাগণ এবং বৎসবালকগণ শ্রীহরির চরণের কণা মাত্র লাভেও অধিকারী হইতে পারেন নাই। ঐসকল লোকাচার ও বাহ্যাচার অবলম্বনে কোনই ফল নাই, এজন্য মিরাবাই ধীর গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন :— 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।' অর্থাৎ নন্দলাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত মনে প্রেম প্রকাশ করিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

---

* উদ্ধৃত মীরাবাইর দোঁহাটী আজকাল গ্রামোফোনের রেকর্ডেও শুনিতে পাওয়া যায়। দোঁহাটীর প্রথম চরণ শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধ-লেখক উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা এই :—

সাধন করনা চাহিরে মনোয়া ভজন করনা চাহি।
প্রেম লাগানা চাহিরে মনোয়া প্রেম লাগানা চাহি॥ (পরপৃষ্ঠা)

আর একজন সাধক-ভক্তের উক্তির উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না ; তিনিও সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমের গৌরব কীর্ত্তনে সমুৎসুক হইয়া গাহিয়াছেন :—

থাক চড়ায়ো জটা বাড়ায়ো ভয়ো ব্রহ্মচারী।
কাশী-বাসী ভয়ো সন্ন্যাসী ফল-মূল ভিক্ষাহারী॥
বসন রঙ্গায়ো মূড় মূড়ায়ো ভয়ো দণ্ডধারী।
মৌনী ভয়ো, ধনী জাগায়ো তরুতল-নিবাসকারী॥
বেদ পুরাণ পঢ় ছাড়্যো জ্ঞানকী লম্বা চৌড়ী বাত।
ভয়ো সন্ত, বড়ে মহান্ত, চেলা চপেটা সাথ॥
অহো ভাগ্য, লিয়ো বৈরাগ্য ছোড় ঘর দ্বার নারী।
বড়া আখাড়া, দিয়ো ভাণ্ডারা কহরা ঝাণ্ডা ঝারি॥
মুদ্রা মন্ত্র, যোগ, যাগ, যন্ত্র, জো কুচ সাধন শিখা।
কহ ত সাধু প্রেম বিনা, রঙ্গ ঢঙ্গ সব ফিকা॥

অর্থাৎ সব বুঝিলাম, এবং স্বীকার করিলাম, তুমি শরীরে ভস্ম মাখিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়াছ, জটা-কলাপ বিস্তার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে চলিয়াছ, মরণ মাত্রেই মুক্তিলাভ হইবে, পাপ তাপ সকল বিদূরিত হইবে,—এই আশায় কাশী-বাসী সন্ন্যাসী হইয়াছ এবং কঠোর সাধন অভ্যাস-

---

ইহার পরে মীরাবাই যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম চরণের সঙ্গে যোগ রাখিয়াই সমস্ত দোঁহাটীর অর্থ করিতে হইবে ; তাহাতে, অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় বলিয়া মনে হয় :—প্রেম ব্যতীত "নন্দলালা"কে পাওয়া যায় না ; তাই "নন্দলালার" প্রতি প্রেম "লাগাইতে" হইবে। আবার সাধন-ভজন ব্যতীত চিত্তে প্রেমের আবির্ভাবও হয় না ; তাই মীরাবাই মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "রে মন! সাধন করিতে হইবে, ভজন করিতে হইবে।" প্রেমাবির্ভাবের অনুকূল সাধন-ভজন ব্যতীত কেবল, তিনবেলা স্নান, ফলাহার, তৃণাহার, দুগ্ধাহার বা স্ত্রী-ত্যাগ—এই সমস্তের কোনটী দ্বারাই "নন্দলালাকে" পাওয়া যাইবে না। "নন্দলালা" একমাত্র প্রেমেরই বশ, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইহাই শ্রীভগবদুক্তি।—সম্পাদক।

অভিপ্রায়ে অন্নব্যঞ্জন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল ফল-মূল মাত্র ভোজন করিয়া জীবন ধারণের ব্যবস্থা করিতেছ। মানিলাম তুমি গৈরিক বসন পরিধান ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ডী হইয়াছ, সত্যপ্রিয় হইয়া বাক্সংযম-পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়াছ, দিবারাত্র ধুনি জ্বালাইয়া এবং কাহারও গৃহে আশ্রয় না লইয়া সকল ঋতুর প্রভাব সহ্য করিবার বাসনায় বৃক্ষতলে কালযাপন করিতেছ, দেখিলাম তুমি বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি", "মায়াময়মিদং সর্ব্বং" সাধনাসিদ্ধিবোধক এইরূপ মহাবাক্যসকল এবং বড় বড় জ্ঞানের কথা বলিতেছ, আবার তুমি সাধু শান্ত, বড় মহান্ত মহারাজ সাজিয়া অনেক শিষ্য-সেবক ও পরিচারকবর্গে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ। ভাগ্যক্রমে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া গৃহদ্বার পরিবার-আদি পরিহার করিয়াছ, সাধুমণ্ডলী লইয়া প্রধান আখড়াধারী হইয়াছ, বহুসংখ্যক ব্যক্তির আহারের ব্যবস্থা করিয়া বড় বড় ভাণ্ডারা দিয়াছ এবং প্রকাণ্ড গগনভেদী (ঝাণ্ডা) বিশাল পতাকা তোমার আখড়ার চতুষ্পার্শ্বে—পত পত শব্দে উড়িতেছে। আর তুমি বিবিধ মুদ্রার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া, উচ্চাটন, বশীকরণ মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানোপযোগী মন্ত্র, আসন প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ, অগ্নিষ্টোম-আদি যাগ প্রভৃতি যত কিছু সুকঠিন ব্যাপার শিক্ষা করিয়াছ। সকলই বেশ ভাল লাগিতেছে ; কিন্তু প্রকৃত সাধক ভক্ত কহিতেছেন —প্রেম ব্যতীত এই সকল সাধন-পদ্ধতি, এই সমস্ত অনুষ্ঠানই বিবর্ণ ও সৌষ্ঠব-শূন্য জানিবে। যাঁহার জন্য এত সাধন, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে না পারিলে, তাঁহার প্রেমামৃতে প্লাবিত না হইলে কিছুতেই কিছু হইবে না এবং প্রকৃত আনন্দও পাওয়া যাইবে না। প্রেমিক সাধক ও ভক্ত তুলসীদাসজী দুইটী দোঁহায় তাঁহার মনোভাব পরিব্যক্ত করিয়া প্রেমের প্রাধান্য ও ভগবদ্দর্শনের সার্থকতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন :—

চৌদ্দ চার আঠার পঢ়ে শুনে ক্যা হোই।
প্রেমসে এক অকছর পঢ়ে বড়ে পণ্ডিত হি গুই॥

অর্থাৎ চারিবেদ, আঠার পুরাণ এবং চতুর্দ্দশ বিদ্যার পড়াশুনা করিলে কি ফল হইবে অর্থাৎ কোন লাভই হইবে না ; কিন্তু প্রেমের সহিত একটি অক্ষর পড়িলেও বড় পণ্ডিত অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারিবে।

আবার—

তুলসী জপ তপ পূজিয়ে সব গোরিয়াকী খেল।
যব প্রিয়সে সরবর হোই তব রাখ্ পেটারী মেল॥

অর্থাৎ আত্ম-শিক্ষার জন্য তুলসীদাস কহিতেছেন :—

জপ, তপ, পূজা অর্চ্চনা এই সকল কেবল বালিকার পুতুল খেলার মত। যখন প্রিয়তম স্বামীর সন্দর্শনলাভ ঘটিবে, তখন এই সকল খেলার জিনিষ পেটারার মধ্যে আবদ্ধ রহিবে। যেমন বালিকাগণ শৈশবকালে পুত্তলিকা লইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির পর যখন স্বামি-সহবাসে যায়, তখন ক্রীড়ার সামগ্রী ঐ পুত্তলিকা প্রভৃতিকে বাক্স মধ্যে পূরিয়া রাখিয়া যায়। সাধক-জনের জপ তপ পূজারাধনা প্রভৃতিও সেইরূপই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রাণপ্রিয়তম সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি পরম-প্রেম প্রদর্শন জন্য তাঁহার সন্দর্শন লাভ ঘটিলে তখন ঐ সকল বাহ্যানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে না *। এই জন্যই শাস্ত্রের বচন :—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥—শ্রুতি।

---

* ভক্তিমার্গের সাধনে, কয়েকটী অঙ্গ আছে, যাহা সাধনও এবং সাধ্যও; সিদ্ধাবস্থায়ও ঐ সকল অঙ্গের বিরতি নাই। "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ শ্রীভাগবত ২।৯।৩৫॥" এই শ্লোকেই ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা এবং সদাতনত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামিচরণ এই শ্লোকের টীকায় "শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণা"মিত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন :—"এতদুক্তং ভবতি যৎ কর্ম্ম তৎ সন্ন্যাসভোগশরীর-প্রাপ্ত্যবধি। যোগঃ সিদ্ধ্যবধিঃ সাংখ্যমাত্মা-জ্ঞানাবধিঃ। জ্ঞানং মোক্ষাবধি। তথা তত্তদ্ যোগ্যতাদিকানি চ সর্ব্বাণি। এবংভূতেষু কর্ম্মাদিষু শাস্ত্রাদিব্যভিচারিতা চ জ্ঞেয়া। হরিভক্তিস্তু অন্বয়-ব্যাতিরে-কাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র তত্তন্মহিমভিরুপপন্নত্বাৎ তথাভূতস্যরহস্যাঙ্গিত্বং যুক্তমিত্যাদি।" তিনি আরও লিখিয়াছেন "ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে। তস্মিন্ ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে তস্মিন্ নিত্যপার্ষদে সামান্যেন দর্শনাদপি সার্ব্বত্রিকতা।" সাধনসিদ্ধ পার্ষদ, কি

বঙ্গানুবাদ—

সেই পরাবর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমের সন্দর্শন লাভ ঘটিলে হৃদয়-গ্রন্থি ভিন্ন, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন এবং এই মায়াময় সংসারের সর্ব্ববিধ কর্ম্মবন্ধন আপনা আপনি ক্ষীণ হইয়া যায়।* প্রেমের টান, প্রেমের বন্ধন বড়ই কঠিন, বড়ই মধুর। এই জন্যই কবিবাক্যে প্রসিদ্ধি আছে:—

বন্ধনানি যদি সন্তি বহূনি প্রেমরজ্জুকৃত বন্ধনমন্যৎ।
দারুভেদনিপুণোঽপি ষড়ঙ্ঘ্রিঃ নিষ্ক্রিয়ো ভবতি পঙ্কজবদ্ধঃ॥

অর্থাৎ— এ জগতে বন্ধন অশেষবিধ আছে।
কিছু দৃঢ় নহে প্রেমবন্ধনের কাছে॥
তার সাক্ষী ষট্‌পদ কর দরশন।
অনায়াসে দৃঢ় কাষ্ঠ করে বিদারণ॥
কিন্তু যবে কোমল কমলে বাঁধা পড়ে।
না পারে ছিড়িতে তাহা, নাহি নড়ে চড়ে॥

শ্রীযুক্ত তারা কুমার কবিরত্নের অনুবাদ।

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে প্রেমের লক্ষণ নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে পরম পূজ্যপাদ শ্রীরূপ-গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন:—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাব-বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

নিত্যসিদ্ধপার্ষদগণেও ভক্তি দৃষ্ট হয়; অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান, তাহা সাধনভক্তি নহে; তাহা সাধ্যভক্তি। তখন, ঐ সকল অনুষ্ঠানকে ভক্তের চিত্তস্থিত প্রেমের অভিব্যক্তির দ্বারস্বরূপই বিবেচনা করা যায়। সাধনা-বস্থায় যথাবস্থিত দেহে বহিরঙ্গ সাধনার প্রয়োজনীয়তা আছে; ইহা দ্বারা সাধকের চিত্ত প্রেমাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে। তাই, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রাগানুগীয় সাধন-ভক্তিতেও "বাহ্যে সাধক-দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি" নববিধাভক্তির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। —সম্পাদক।

* এই শ্লোকটী এস্থলে উদ্ধৃত হওয়ায় মনে হইতেছে, বাহ্যানুষ্ঠানকে লেখক কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু ভক্তি-অঙ্গের বাহ্যানুষ্ঠানও কর্ম্ম নহে।
—সম্পাদক।

অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ থাকা সত্ত্বেও যুবক-যুবতীর (১) যে ভাববন্ধন সর্ব্বথা ধ্বংস-রহিত, তাহাই প্রেম নামে পরিকীর্ত্তিত।

তিনি আবার ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতেও লিখিয়াছেনঃ—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সঙ্গ স্ততোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, পরে ভজন, ভজনের ফল অনর্থ-নিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে রুচি, রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব, এবং ভাব হইরে প্রেমের উদয় হয়। এই যে সাধন-পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা যেমন তত্ত্বের দিক হইতে সত্য ও সুন্দর, তেমনই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতারও উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় পরম পদার্থ প্রেমের সাধন-ভজনে ব্রজ-গোপীগণের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। (২) তাঁহারাই প্রেমপারাবার শ্রীশ্যামসুন্দরের চরণতলে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন—শ্যামসাগরের শীতল অতল সলিলে প্রাণ ভরিয়া অবগাহন করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রেমসিন্ধুতে তন্ময়ী হইয়া প্রেমরসের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ জগতে প্রকাশ করিয়া প্রেমশিক্ষার গুরুস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। সেই সুগভীর প্রেম, সেই অপার্থিব ভালবাসা, সেই প্রেমানন্দরস- সম্মিলনের ধারণা বা কল্পনা করা সাধারণ জনগণের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভক্ত, ভাবুক ও প্রেমিক না হইলে এই প্রেমামৃত আস্বাদন করিবার অধিকার কাহারই হইতে পারে না। কামনা-পূর্ণ কামসাগরে নিমগ্ন মানবগণের পক্ষে কাজেই

---

(১) অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকা—শ্রীকৃষ্ণও তৎপরিকরভুক্তা ব্রজসুন্দরীদিগের সম্বন্ধেই এই উক্তি। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ভাব-বন্ধনে স্বসুখ-বাসনা আছে বলিয়া তাহা প্রেম-নামে অভিহিত হইতে পারে না।—সম্পাদক।

(২) ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ-পরিকর ; তাঁহাদের পক্ষে কোনওরূপ সাধনের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজন—সাধনাত্মকভজন নহে, পরন্তু সাধ্যাত্মকভজন।—সম্পাদক।

অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা ব্রজগোপীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা। এই প্রেমময়ী ও মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকার মহিমা বা গুণগরিমা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে পূজনীয় কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেনঃ—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ-কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সারাংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥

আর এখানে অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রেমময়ীর মহাভাবে বিভোর হইয়া যিনি প্রেমবিতরণার্থ স্বয়ং প্রেমাবতার হইয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের প্রেমের কথা বলিয়াই আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ই উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

আর সব পরিহরি, পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন, প্রেম করি আশ।
এক ব্রজরাজপুরে, গোবিন্দ রসিক বরে,
করহ সদাই অভিলাষ।

তারপরে আবার লিখিয়াছেনঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতিমতি তারে সেব,
প্রেমকল্পতরু দাতা।
ব্রজরাজ নন্দন, রাধিকার প্রাণধন,
অপরূপ এইসব কথা।
নবদ্বীপে অবতার, রাধাভাব অঙ্গীকার,
ভাবকান্তি অঙ্গের ভূষণ।

তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি,
সঙ্গেসব পারিষদগণ।
গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি,
সাধিলা মনের নিজ কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কিভাবে কান্দয়ে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত সমাজ।

এই পরম দয়াময় প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন জন্য নিজ প্রার্থনায় পুনরায় লিখিয়াছেনঃ—

হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায়মনে লহরে স্মরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হইল পতিত পাবন॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার-শমন।
নরোত্তম দাসে কহে, গোরা সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥

লীলা-সূত্রে আছে—

পূর্ব্বে ব্রজ-বিলাসে, যেই তিন অভিলাষে, (১)
যত্নেহ আস্বাদ্য না হৈল।
শ্রীরাধার ভাব সার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল।
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি॥

---

(১) সেই তিন অভিলাষ ঃ—
(ক) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার প্রেম।
(খ) শ্রীরাধিকা কর্তৃক আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য॥

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গোস্বামীর অমৃতনিঃস্যন্দিনী লেখনী হইতে কাম ও প্রেমের যে অপূর্ব্ব ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিলে এ প্রবন্ধ পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ হইবে না ভাবিয়া তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম :—

"গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম॥
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীব্রজবধূগণের প্রেমই কাম নামে খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়াছে; উদ্ধবাদি ভগবৎ-পরায়ণ মহানুভবগণ এতাদৃশ কামতত্ত্বা অভিমানরূপ ভাবের দ্বারা উপলক্ষিত প্রেমাতিশয় বাঞ্ছা করিতেছেন।

প্রভুপাদ—৺রাধিকানাথ গোস্বামীর
অনুবাদ।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা, তারে বলিকাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥

* * * *

(গ) শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে শ্রীরাধিকার সুখ।

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা" ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার ষষ্ঠ শ্লোকে এবিষয় বিশদ ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ও তাহা ভক্তজন মধ্যে সুবিদিত বলিয়া এখানে আর লিখিলাম না।

সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ *
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥ আদি ৪ পরিচ্ছেদ।

প্রিয়তমের পরম জ্ঞান ব্যতীত প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হয় না এবং প্রেম ব্যতীতও প্রিয়তমের স্বরূপ বোধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাই শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন :—

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইলা সীমা ॥ অন্ত্য ১৭।৬৩

প্রেম-পিপাসু ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমপ্রার্থী—
শ্রীদুর্গাদাস রায়।

আমার প্রকৃত বন্ধু কে ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্ব-সংখ্যায় দেখান হইয়াছে যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা আমাদের অতি প্রিয় দেহ, যাহাকে আমরা 'আমি' বলিয়া অভিমান করি, এমন কি জীবাত্মা পর্য্যন্ত কেহই আমাদের বন্ধু নহে। সকলকে নিরসন করিয়া পরমাত্মাই একমাত্র বন্ধু—ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিশেষ। একই শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ-প্রকার ভক্তের নিকটে বিবিধ প্রকারে অভিব্যক্ত হয়েন।

যথা—জ্ঞানীর নিকটে নির্ব্বিশেষব্রহ্মরূপে, যোগমার্গাবলম্বীর নিকটে পরমাত্মারূপে, এবং ভক্তিসাধকের নিকটে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কর-চরণাদিবিশিষ্ট ভগবানরূপে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে,—

---

* প্রেমের সেবন—প্রেমের সেবা।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"অন্তর্য্যামিত্বাদিময় মায়াশক্তি-প্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্ট-জ্ঞানং পরমাত্মেতি।" সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী মায়াশক্তি-প্রচুর এবং চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট যে জ্ঞান, তাহাই পরমাত্মা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায়,—

আত্মা অন্তর্য্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহো গোবিন্দের অংশ-বিভূতি যে হয় ॥
অনন্তস্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের প্রীতির আস্পদ যে পরমাত্মা, তাহা শ্রীমন্মদনগোপালের অংশ-বিশেষ। যখন অংশবিশেষেই আমাদের প্রীতি সঞ্জাত হয়, তখন পরমাত্মার মূল অংশী আনন্দচিন্ময়রসের মূর্ত্তস্বরূপ শ্রীমন্মদনগোপাল যে সর্ব্বজীব-হৃদয়ব্যাপী প্রীতিরাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইবেন, সে বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য কি আছে? প্রকটলীলা সমালোচনা করিলেই তাহা সম্যক পরিস্ফুট হয়। আনন্দের মূর্ত্তি শ্রীভগবানকে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষে যে প্রীতি করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? পশুপক্ষী বৃক্ষলতা স্থাবর জঙ্গম সকলেরই শ্রীভগবানে প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনগমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার বিরহে অযোধ্যাবাসী প্রাণিগণের কথা দূরে থাক, এমন কি বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত শোকে ক্রন্দন করিয়াছেন।

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ যে দিন কালীয়নাগকে শাসন করিবার জন্য বিষজালপূর্ণ কালীয়হ্রদে প্রবেশ করিলেন, সে দিবস ব্রজবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ত শোকে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেনই, গাভী, বৎস, মৃগ, পক্ষীগুলি পর্য্যন্তও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতেছিল। শোক-তাপ-দগ্ধ বৃক্ষগুলির পর্য্যন্ত বজ্রাহতের প্রায় পত্র পুষ্প ও মঞ্জরীসমূহ বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল।

কেবল শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে নহে, তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই জগতের কি অবস্থা হয় দেখুন। তাঁকে দেখিয়া গাভীসমূহ আহার ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে তাঁর শ্রীমুখে

নয়ন দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাদের বৎসগুলি স্তনদুগ্ধ পান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া অবস্থান করে। মাতার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে লক্ষ্য হইত না। হরিণগুলি তাঁর চরণতলে পড়িয়া আনন্দে গড়াগড়ি দেয়। ময়ূর সকল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে নাচিতে তাঁর চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়ায়। শুকশারী কোকিল প্রভৃতি পক্ষিকুল উচ্চ কণ্ঠে তাঁর গুণ গান করে। বৃক্ষসকল নব নব পত্রে মঞ্জরিত হইয়া সুপক্ক ফলপ্রসব করিয়া শাখাগুলি অবনত করিয়া আনন্দে মাটীতে লুটায়। বিভিন্ন ঋতুর সুগন্ধি কুসুমসমূহ একত্রে প্রস্ফুটিত হয় এবং যমুনা আনন্দে স্ফীত হইয়া উজান বহিয়া যায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে জগতের একমাত্র বন্ধু, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

আরও কে বন্ধু এই প্রশ্ন করিলে ইহাই উত্তর পাওয়া যায়,—"স বন্ধু র্যোবিপন্নানামাপদুদ্ধরণক্ষমঃ।" যিনি বিপন্নদিগকে আপৎ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ, তিনিই বন্ধু। যখন আমরা মাতৃগর্ভে অবস্থান করি, তখন শ্রীগোবিন্দ ব্যতীত কে আমাদের বন্ধু ছিল ? তাহার পরে যখন ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমরা কি বিপন্ন, তখন আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল পুষ্ট ছিল না। ইন্দ্রিয়সকলের কোনপ্রকার বিন্দুমাত্রও শক্তি ছিলনা, সেই অসহায় অবস্থায় কে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, কে তখন মার বক্ষে দুগ্ধের বিধান করিলেন ? শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এরূপ বন্ধু আর কে আছে ?

জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমরা যাঁর কৃপাশক্তিকণা প্রভাবেই সর্ব্বত্র সকল প্রকার বিপদসাগর হইতে উত্তীর্ণ হই, যিনি আমাদিগকে দিবসে রাত্রে, জলে, স্থলে, সুসময়ে দুঃসময়ে সর্ব্বত্র সকলকালেই রক্ষা করিতেছেন, যিনি সাধুগণের উদ্ধার এবং অসুরকুলের নিধনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, সেই পরম দয়াল ভক্তবৎসল পালন-সমর্থ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত জগতের বন্ধু আর কে আছে ? আমরা এ জগতে যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া কল্পনা করি, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষ ব্যতীত তাহারা কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্ত্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধি র্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্॥

যে সমুদয় হতভাগ্য জীব শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করে, দুঃখের প্রতিকারোপযোগী সাধন-সমূহ সেই সমস্ত লোকের তাপ সম্যকরূপে দূর করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত পিতামাতা পুত্রকে রক্ষা করিতে পারে না, ঔষধের দ্বারা ব্যাধির শান্তি হয় না, এবং সমুদ্রে যে ব্যক্তি মগ্ন হইতেছে, নৌকাও তাহার উদ্ধারের উপায় হয় না। কারণ ঐ মজ্জনোন্মুখ ব্যক্তির সহিত নৌকাও জলমগ্ন হইতে দেখা যায়। অতএব পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আমাদিগকে বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। এই অভিপ্রায়ে শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

"প্রেষ্ঠো ভবান্ তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।"

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণই যে আমাদের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু তাঁহাকে বন্ধু বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না, তিনি বন্ধুর উপযুক্ত আমাদের কি উপকার করিতেছেন, তাহাও দেখিতে হইবে। আমরা যাহাকে বন্ধু বলি, যদি আমরা তাহাকে কোন দিন ভুলিয়া যাই, তবে সে-ই আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবে। এক দিনের জন্যও সে আমাদের কথা মনে করিবে না। আমাদের দেহ ত জড়া প্রকৃতির বিকার; এবং সে নিজেও জড় অর্থাৎ অচেতন। তার নিজেরই যখন অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই, তখন সে আমাদের দুঃখ ভাবিবে কিরূপে? পরমাত্মার চেতনা থাকিলেও তিনি আমাদের সুখদুঃখে নির্লেপ; তিনি সর্ব্বদাই উদাসীন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এ প্রকার অকৃত্রিম বন্ধু যে, আমরা চিরকালই তাঁহাকে ভুলিয়াই আছি, কিন্তু তিনি ক্ষণেকের জন্যও আমাদিগকে ভুলেন না। আমাদিগকে নিজের কাছে লইবার জন্য সর্ব্বদাই আহ্বান করিতেছেন। কেবল আহ্বান করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, যাহা দ্বারা আমরা তাঁহাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, যাঁহা দ্বারা আমাদের সহিত তাঁর দৃঢ় প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং যাহা থাকিলে তিনি আমাদিগকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন, সেই অপ্রাকৃত দুর্ল্লভ বস্তু প্রেমভক্তি আমাদিগকে দান করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল রহিয়াছেন। এই প্রেমভক্তির আবির্ভাব না হইলে তাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয়ে আকুল পিপাসা জাগে না, এবং তাহা না হইলে আমরা তাঁহাকে পাইয়াও অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করিতে পারিব না।

আরও, এজগতে সাধারণ বন্ধুমাত্রেই আমাদের যত উপকার সাধন করুক

না কেন, কেহই আমাদিগকে আনন্দ দিতে পারে না। কারণ, প্রকৃত আনন্দ-বস্তু প্রাকৃত জগতের অতীত। তবে যে আমরা কোথাও কোথাও আনন্দের দেখা পাই, তাহা ক্ষণিক এবং পরিণামে দুঃখময়। স্বর্গের দেবতাগণ, এমন কি পিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত আনন্দ দিতে পারেন না। কারণ তাঁহারাও প্রাকৃত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা মোক্ষ পর্য্যন্ত দিতে পারেন; কিন্তু মোক্ষেও আনন্দ নাই। মোক্ষ নির্ব্বিশেষ অবস্থা, সে সময়ে আনন্দ ভোগ করিবে কে? স্বয়ং শ্রীভগবানই আনন্দ-পদার্থ। তাঁকে পাইলেই সকলে আনন্দলাভ করে। রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি (শ্রুতিঃ)।

এই আনন্দ-পদার্থ ভগবানকে জীবের সহিত সাক্ষাৎকার করাইতে একমাত্র ভক্তিই সমর্থা। কারণ, ভক্তির ধর্ম্মই এই যে, ইহা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মজনিত পাপ এবং অবিদ্যা প্রভৃতি সকল প্রকার ক্লেশের ধ্বংস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করাইয়া থাকে। এই ভক্তিরই পরাবস্থা প্রেম। অতএব একমাত্র প্রেম-ভক্তিই ভক্তকে ও ভগবান্‌কে আনন্দ দিতে সমর্থা।

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচায়।
আপনি নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঁই ॥

কিন্তু এই প্রেম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত প্রাকৃতা প্রাকৃত জগতে অন্য কেহই দিতে সমর্থ নহেন।

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও এই কথার প্রতিধ্বনি দিতেছেন :—

আমা বিনে অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥

এই প্রেমভক্তি-দান কার্য্যটী শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর-যুগে বৃন্দাবনলীলায় সিদ্ধ হয় নাই। সে অবতারে তিনি বিবিধ প্রকার ভক্তের দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রস অশেষ বিশেষে আস্বাদন করিয়াছিলেন। প্রেমভক্তি-শিক্ষাদানরূপ অনর্পিত-চর অনন্য-সাধারণ কার্য্যটী সম্পাদন করার তখন শ্রীকৃষ্ণের অবকাশ ছিল না। এইজন্য পুনরায় কলিযুগে তিনি আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ঘরে—

প্রেমভক্তি শিক্ষাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥

শ্রীমন্মদনগোপাল স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া আপনি আচরণ পূর্ব্বক এই প্রেমভক্তি আমাদিগকে শিক্ষাদান করিলেন। সুতরাং অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-রূপে অবতীর্ণ, আমাদের প্রাণের প্রাণ শ্রীমন্মদনগোপাল ব্যতীত প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে ??

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ব্যাকরণতীর্থ।

আমার কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমার ভিতর সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইলে, ঐরূপ ভাবের উদয় হইবে। তখন, আমার মস্তিষ্ক বেশ পরিষ্কার,—বুদ্ধি নির্ম্মল। জ্ঞানে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, আহারে বিহারে, যজ্ঞদান তপস্যায় আমার আমূল পরিবর্ত্তন।

তমোগুণে ভূত-প্রেতের, রজোগুণে যক্ষরাক্ষসের পূজা করিয়াছি, এখন দেব-উপাসনায় প্রবৃত্ত হইব। সনাতন শাস্ত্রের দিকে আকর্ষণ হইবে। বেদ-পুরাণাদি পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিব না।

পদার্থকে যথার্থরূপে জানিতে সমর্থ হইব—এবং অন্তঃকরণে একটী স্বাভাবিক সুখের সাড়া পাইব।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ গীতা—১৪।৬

গব্য দ্রব্য, বন্যফল, আতপ তণ্ডুলাদি পবিত্র এবং প্রীতিকর আহারে অনুরাগ এবং প্রবৃত্তি হইবে। রাজস ও তামস খাদ্য আদৌ ভাল লাগিবে না।

আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনা।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃস্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

যে আমি পূর্ব্বে মৎস্য মাংস পঁয়াজ রসুনাদির [illegible]

আমিই—অথও যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করিতে বসিব,—আমিষ আহারের পদে পদে দোষ, নিরামিষ সাত্ত্বিক আহারের পদে পদে গুণ, একে মানুষের সমূহ ক্ষতি এবং অবনতি, অন্যে বিশেষ লাভ এবং উন্নতি।

আমি অন্ধকারে পড়িয়াও থাকিব না, আবার মরুভূমিতে ছুটিয়াও বেড়াইব না,—নিদ্রা এবং আলস্যে যে সুখ, তাহাতে ঘৃণা উপস্থিত হইবে,—এবং বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজাত-সুখকে বারংবার থুৎকার দিব। তখন নিজে চিন্তা করিয়া, এবং শাস্ত্র-আলোচনার ফলে বেশ বুঝিতে পারিব—কর্ম্মফলেই আমার বন্ধন, সেই জন্য আর ফলের উপর আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। মুক্তি প্রয়োজন বলিয়া মনে হইবে,—কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞান হয় না, আত্মজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না, চিত্তশুদ্ধি আবার বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে,—তাই চিত্তশুদ্ধির জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া—নিষ্কাম ভাবে প্রথমে যজ্ঞদান তপস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব।

মালিন্য এবং চাঞ্চল্যের অভাবে হৃদয়খানি হইবে প্রসন্ন-সলিলা নদীর মত—নির্ম্মল এবং স্থির। তাহার ভিতর আমার স্বরূপ দর্শন হইবে, তখন বোধ হইবে, সর্ব্বভূতের ভিতরেই আমার আত্মার মত একজাতীয় এক ভাবাপন্ন আত্মাই বর্ত্তমান। এই আত্মা নিত্য এবং অব্যয়।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌।
গীতা—১৮। ২০।

নিত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, অনিত্য বস্তুতে আসক্তি থাকিবে না। প্রকৃত "আমি" কে বুঝিতে পারিয়া, আর মিথ্যা উপাধিযুক্ত হইয়া "আমি, আমার" বাক্য ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। অচল আত্মায় চিত্ত সন্নিবিষ্ট থাকায়, জিহ্বা এবং উপস্থ আমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না—মুক্তিলাভের জন্য ধৃতির সহিত সর্ব্বদাই উৎসাহ বর্ত্তমান থাকিবে। ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায়, কর্ম্মের সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে কোনই চিত্তবিকার উপস্থিত হইবে না। সাত্ত্বিক-কর্ত্তার লক্ষণ আমার ভিতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
গীতা—১৮। ২৬

তখন আমি এমন বুদ্ধি লাভ করিব, যাহার দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধন-মুক্তি বেশ বুঝিতে পারিব।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধি সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥

গীতা—১৮। ৩০

সাত্ত্বিকী বুদ্ধির সহিত সাত্ত্বিকী ধৃতি বর্ত্তমান থাকায়, আমি মুক্তিপথেরই পথিক হইব,—আমার দৃষ্টি নীচের দিকে যাইবে না, ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধির উপরে আত্মার দিকেই নিবদ্ধ থাকিবে।

না থাকিতে পারে আমার স্রক্-চন্দন-বনিতা, না থাকিতে পারে ধন সম্পদ, না থাকিতে পারে, হর্ম্ম্য কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কিন্তু সে সব কারণে কিছুতেই আমার মনে দুঃখ আসিবে না, উপরন্তু—আত্মবুদ্ধির দিক হইতে এক অপূর্ব্ব সুখপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া আমার মন, ইন্দ্রিয় এবং দেহকে প্রসন্ন এবং শক্ত করিয়া রাখিবে। প্রকৃত সুখের উৎস কোনদিকে কোথায় নির্ণয় করিতে পারিয়া আমি দিগ্‌ভ্রান্তমানবগণের নিকট তারস্বরে ঘোষণা করিব—সুখ নাই বাহিরে; সুখ আছে ভিতরে। সুখ নাই জড়ে, সুখ আছে আত্মায়। অন্ধকার হইতে মরুভূমিতে ছুটিয়াছিলাম,—তথা হইতে তপোবনে উঠিয়াছি—সত্যের দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছি বলিয়া এইবার আমার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে।

কিন্তু এই উন্নতি আমার স্থায়ী উন্নতি নহে—দেবীমায়ার নাগরদোলায় পড়িয়া উপরে উঠিয়াছি, আবার পড়িয়াও যাইতে পারি,তামস-রাজস দেশকাল পাত্রদ্রব্যাদির সংযোগ, স্পর্শ প্রভাবে আমার ভিতর পুনরায় তম ও রজো গুণের প্রাধান্য হইতে পারে—তখন আমি পুনর্মূষিক। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধানুসারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া, যদি কর্ম্মযোগে সিদ্ধহস্ত হইতে পারি, তবে আমার নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ হইতে পারে। এই সিদ্ধিলাভের পর কর্ম্ম আর আমার প্রকৃতির অনুকূল হইবে না—তখন জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়া নির্ম্মল চিত্তে ধ্যানধারণা-সমাধি-সাধনে বসিয়া থাকি। মনবুদ্ধির উপর উঠিয়া আত্মদর্শন করিব—আর বলিব সোহং—আমিই সেই আত্মা—ব্রহ্মোহং আমিই সেই জীবব্রহ্ম। আমি নিজকে আত্মা এবং ব্রহ্ম জানিলেও, কখনও পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম মনে করিব

না,—করিলে আমার অধঃপতন হইবে, ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের প্রতি ভক্তি থাকিবে, জ্ঞানযোগে আমি সিদ্ধ হইব। আমার এই জীবন্মুক্ত-দশায়—সত্ত্ব-রজ-তম কোনও গুণেরই প্রাধান্য থাকিবে না, আত্মশক্তিই বিকসিত হইবে। আমার ভিতর তমোগুণের শোচনা, রজোগুণের আকাঙ্ক্ষা একেবারে অন্তর্হিত হইবে—সাত্ত্বিক কৈবল্যজ্ঞান খাঁটী হইয়া দাঁড়াইবে—তখন আমি ব্রহ্মসদৃশ—আমার ভিতর দিয়া ব্রহ্মজ্যোতি বহির্গত হইবে, আমার প্রসন্নতা—মুখমণ্ডলে বিরাজ করিবে—তখন জীবব্রহ্ম জীবাত্মা আমি সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ মনে করিব,—আমার নিজের ভিতর ভূত দেখিতে না পাওয়ায়, আব্রহ্ম-স্তম্বে আর আত্মভূতকে দেখিতে পাইব না—দেখিব সবাই একজাতীয় নিত্য-আত্মা। তখন আমি এক আত্মাতেই রমণ করিব। পরমাত্মা পরব্রহ্মের প্রতি ভক্তি থাকায় তাঁহার প্রসাদে আত্মারাম আমি পরাভক্তি লাভ করতঃ ত্রিগুণাতীত জ্ঞানী ভক্ত হইয়া নিত্যধামে মুক্তিলাভ করিব।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ গীতা—১৮।৫৪

ক্রমোন্নতিমার্গে ইহাই আমার চরম উন্নতি। অনাদিকাল হইতে অপৌরুষেয় বেদে এই উন্নতিপ্রদ-মার্গ প্রশস্ত আছে।

ইহা ব্যতীত আর একটী অচিন্ত্য প্রভাবসম্পন্ন মার্গ নিত্য বিদ্যমান আছে—তাহার নাম সদ্যোন্নতিমার্গঃ বা শুদ্ধাভক্তিযোগ। ভগবৎ-ভক্তের কৃপা ব্যতীত, এই মার্গে উঠিবার উপায় নাই। এই ভক্তি দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা করে না। ঊর্দ্ধ মধ্য অধঃলোকে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে—দেবতা মানুষ, রাক্ষস, অসুর—এমন কি হনুমান বানর প্রভৃতিতে ইহার উদয় হইতে পারে। ক্রমোন্নতিমার্গে সহসা উন্নতি লাভ করা যায় না, কিন্তু সদ্যোন্নতিমার্গে সুদুর্লভ ভক্তিসম্পদ লাভে আমি রাতারাতিই বড়লোক হইতে পারি। আজ রাত্রিতে আমি সুদুরাচার, সুপ্রভাতেই আমি ধর্ম্মাত্মা হইয়া উঠিতে পারি। আজ রাত্রিতে আছি বেশ্যালয়ে,—কাল সূর্য্য না উঠিতেই বিল্বমঙ্গলের মত—কৃষ্ণ-কর্ণামৃত কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে রওনা হইতে পারি। ইহাতে নিষ্কামকর্ম্ম করিতে হইবে না, জ্ঞানযোগে উঠিতে হইবে না—ভক্তি দ্বারা ভক্তি লাভ করিয়া ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে বাঁধিয়া ফেলিব—এই নির্গুণাভক্তি-লাভের

ফলে আমি ত্রিগুণাতীত শুদ্ধ-ভক্তগণ মধ্যে গণ্য হইব—স্বতন্ত্র ভগবান পর্য্যন্ত প্রীতিবশে বশীভূত হইবেন। ক্রমোন্নতিমার্গে আমি প্রথমে কর্ম্মী, মধ্যে জ্ঞানী, শেষে ভক্ত,—সদ্যোন্নতিমার্গে আমি থাকিব মধ্যে ও শেষে ভক্ত। প্রথমটীতে আমি মুক্তিপ্রার্থী ভক্ত—দ্বিতীয়টীতে আমি প্রেমভক্তি বা সেবাপ্রার্থী ভক্ত,—উভয়ক্ষেত্রেই আমি ত্রিগুণাতীত। ইহাই আমার চরম উন্নতি—এখান হইতে আর পতনের আশঙ্কা নাই, অভয় চরণকে ধরিতে পারিলে আর কি ভয় আছে? আমি গুণাতীত হইয়াছি বা ভগবানের প্রিয় ভক্তপদ লাভ করিয়াছি, এ কথা কস্মিনকালেও আমার মুখে আসিবে না, বরং ভক্ত্যুত্থিত বিনয় দৈন্য বশতঃ নিজকে ধিক্কার দিব এবং অতি নীচই মনে করিব, এবং অন্যের নিকট পরিচয়ও দিব তাই বলিয়া। আমি যে ভগবানের প্রিয় ভক্ত হইয়াছি, তাহা বাহির হইবে—কথার দ্বারা নহে, কিন্তু নিজের স্বভাবসুলভ আচরণ এবং কার্য্যকলাপ-দ্বারা। দ্বেষ আমার ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইবে, কাজে কাজেই কোনও ভূত বা জীবকে আমি দ্বেষের চোক্ষে দেখিতে পারিব না, কিন্তু দ্বেষ করিব না বলিয়া যে জীবগণের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িব—তাহা নহে; সজাতীয় ভক্তগণের সহিত মিত্রতা করিব, জীবের নানাবিধ দুঃখ দেখিয়া ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিব, তোমার পাদপদ্মে এই সব হতভাগ্য বদ্ধজীবগণের রতিমতি হউক। জীবের প্রতি আমার দয়া থাকিবে, কিন্তু তাই বলিয়া যাহাদের সহিত দৈহিক লৌকিক ও সামাজিক সম্বন্ধ, তাহাদের প্রতি মমতা থাকিবে না, আমি আর "আমি আমার" করিব না, ঐহিক পারত্রিক সুখ দুঃখ আমার নিকট সমান বলিয়া প্রতিভাত হইবে—তাই সুখ চাহিব না, দুঃখকেও নিবারণ করিব না। আমি ভগবানের সহিত ভিতরে বাহিরে যুক্ত হইয়া সদাসর্ব্বদা সম্যকরূপে তুষ্ট থাকিব, মনোহর বস্তুর সংযোগে, আমার চঞ্চল চিত্ত নিয়মিত হইয়া থাকিবে। দুঃখে বিপদে প্রলোভনে আমি পথভ্রষ্ট হইব না, দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া ভগবৎরাজ্যে অগ্রসর হইব। যে মন এবং বুদ্ধি লইয়া গোলযোগ, তাহা আর আমার থাকিবে না, ভগবানের চিন্তা, সিদ্ধান্ত-নির্ণয় এবং সাধনায় অর্পণ করিব। সৎচিন্তা করিতে করিতে যাহা কিছু অসৎ, সব আমার ভিতর হইতে বহির্গত হইবে, মহদ্‌গুণ লাভে আমি ক্রমে ক্রমে সদাশিবের মত হইয়া উঠিব। আমাকে দেখিয়া বা আমার জন্য, কাহারও উদ্বেগ বা ভয় হইবে না—ভক্তিচক্ষে হরিময় চরাচর দেখিব বলিয়া কেহই আমাকে উদ্বিগ্ন করিতে পারিবে না! হর্ষ, অমর্ষ,

ভয়, উদ্বেগ এসব রজস্তমোগুণের বৃত্তি—এসব হইতে মুক্ত হইব। ভগবান এবং ভক্ত ব্যতীত কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব না। দেহ এবং মন শুচি রাখিব। ভজন-বিষয়ে দক্ষতা হইবে। প্রাকৃত বিষয়ে উদাসীন হইব, ব্যথা আমার অন্তঃকরণ হইতে চলিয়া যাইবে। ইতর স্বার্থ সাধনে যে কর্ম্মারম্ভ করা হইয়া থাকে—সে সব পরিত্যাগ করিব। ভোগের অনুকূল বিষয় লাভে নাচিয়া উঠিব না, প্রতিকূল অপ্রিয় কিছু পাইলে, দ্বেষ করিব না। আপনার বলিতে যাহা, তাহার কিছু হারাইলে—শোক হইবে না, অপ্রাপ্ত বিষয়লাভে আকাঙ্ক্ষা হইবে না। শুভ এবং অশুভ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া এক ভগবানকে সার করিয়া বসিব। সকলেই কৃষ্ণের জীব, আমার আত্মীয়, তাই তথাকথিত শত্রু মিত্র আমার সমান হইবে। মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বসমূহ সাধনার অন্তরায়, তাই সকলকে সমান জ্ঞান করিব। স্ত্রী-সঙ্গী এবং অভক্তের সঙ্গ আমি বিশেষরূপে বর্জ্জন করিব। কেহ নিন্দা করিলে ক্ষেপিয়া উঠিব না, আবার কেহ স্তবস্তুতি করিলেও উৎফুল্ল হইব না, নিন্দাস্তুতি উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে কেবল ভগবানের স্মরণ-মনন করিব। যোগক্ষেম সম্বন্ধে যাহা কিছু উপস্থিত হইবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিব। এক নিকেতনে থাকিলে, তাহার প্রতি আসক্তি হইতে পারে—তাই এক এক দিন এক এক বৃক্ষতলে বা এক এক লীলাস্থলে থাকিব, অথবা নির্দ্দিষ্ট নিকেতন থাকিলেও, তাহার প্রতি কোন আসক্তি পোষণ করিব না, মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিব, মর্ত্ত্যে আমার নিকেতন নাই—আমার নিত্য নিকেতন কৃষ্ণের নিত্যধামে। আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণভজনই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য—এই বিষয়ে আমার মতি স্থির হইবে। আমি যে ভক্তিমান, তাহা আমার স্বরূপ এবং তটস্থ লক্ষণেই প্রকাশিত হইবে। ভগবান তাঁহার প্রিয় ভক্ত সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, আমিই সে সকলের সত্যতা প্রমাণ করিব।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রকরুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমসুখদুঃখক্ষমী॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধি র্যোমেভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যয়ঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দা-স্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

গীতা—১২।১৩—১৯

সাধারণতঃ জগতে ধন-সম্পদ এবং বিদ্যাই উন্নতির নির্ণায়ক। যে যতই ধন-সম্পদ এবং বিদ্যালাভ করে, তাহাকে তত উন্নত বলা হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু যথার্থ উন্নতি নহে। প্রাকৃত ধন-সম্পদ এবং বিদ্যা মাত্রই অনিত্য ;—তাহা দ্বারা নিত্যবস্তু লাভ হইতে পারে না ; সুতরাং জাগতিক উন্নতি যতই বেশী হউক না কেন, তাহাকে প্রকৃত উন্নতি বলা যাইতে পারে না। ভক্তিই প্রকৃত ধন-সম্পদ, এবং রাজবিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। এই ধন-সম্পদ এবং বিদ্যা প্রকৃতির বৃত্তি নহে—কিন্তু ভগবানের চিচ্ছক্তির বৃত্তি ; উভয়ই নিত্য-বস্তু ;—তাঁহাদের দ্বারা নিত্য ভগবানকে লাভ করা যায়। সুতরাং ভক্তি এবং রাজ-বিদ্যালাভই প্রকৃত উন্নতি। ইহা লাভ করিলে আর পতনের আশঙ্কা বা বিনাশ-ভয় থাকেনা ; এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানেরই অভয় বাণী আছে—"আমার ভক্ত প্রণষ্ট হয় না"

"নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" গীতা—৯।৩১

এখন আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, আমি যদি কৃষ্ণভক্ত হইতে পারি, তবেই আমার চরম উন্নতি।

আমিও নরাকার ভগবান।

আমি আমাকেও দেখিতে পাই না, ভগবানকেও দেখিতে পাই না, দেখিতে পাই আমার অনিত্য দেহকে—যাহা কালে অদৃশ্য হইবে। আমাকে দেখিতে না পাইলেও যেমন নিত্য আমি আছি, সেইরূপ ভগবানকে দেখিতে না পাইলেও নিত্য তিনি অবশ্যই আছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমিত্বে

আমি তাঁহার মধ্যে ছিলাম, ভোগ-বাসনায় তাঁহার ভিতর হইতে তাঁহার এই মায়া-রাজ্যে নামিয়া আসিয়াছি। এখন আমাকে বিশ্লেষণ করিলে পাই—অপরা প্রকৃতির পরিণাম অনিত্য দেহ এবং তাহার পশ্চাতে পরা প্রকৃতির অংশ নিত্যজীব আমি। তাহা হইলে আমার ভিতর এখন ভগবান কোথায়? আমি কি এখন তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র? আমি কি তবে তাঁহার ত্যাজ্য পুত্র? ভগবান বলিতেছেন—না, না, তুমি আমাকে ছাড়িলেও আমি তোমাকে ছাড়ি নাই,—তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছি। যে খানে তুমি, সেখানেই আমি; তুমি যে ক্ষেত্রে, আমিও সেই ক্ষেত্রে। তুমি যেরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ, আমিও সেরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ।"

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ।
"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাংবিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু" ভারত।

গীতা—১৩।১—২

ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আমি কৃষকের মত দেহ-ক্ষেত্রে কর্ম্ম করতঃ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি।

পুরুষঃ সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। গীতা—১৩।২০

ভগবানও আমার ক্ষেত্রে আছেন, তিনিও কি আমার মত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন? তিনি বলিতেছেন—"না, না, তুমি প্রজা, আমি রাজা,—এক ক্ষেত্রের উভয়েই মালিক। তুমি আমার অধীনে, ক্ষেত্রের সুখ-দুঃখ তুমি ভোগ কর, কিন্তু আমি করিনা। এককক্ষেত্রে থাকিলেও, আত্মারাম আপ্তকাম আমি সাক্ষীরূপে থাকি—আমি তোমার প্রভু ও পালক, তুমি দেহের ঈশ্বর বটে, কিন্তু আমি তোমারও ঈশ্বর, সুতরাং মহেশ্বর। তুমি দেহ আত্মা, কিন্তু আমি পরমাত্মা, দেহপুরীতে প্রবেশ করিয়াছ বলিয়া তুমি পুরুষ, আমিও তোমার দেহ-পুরীতে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া পুরুষ, কিন্তু তোমা হইতে স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাকে পরম পুরুষ বা পর পুরুষ বলা হয়।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

তুমি-যুক্ত তোমার দেহকে ক্ষর পুরুষ এবং দেহ হইতে মুক্ত কূটস্থ তোমাকে অক্ষর পুরুষ বলা হয়। এই ক্ষর অক্ষর পুরুষ হইতে একটী উত্তম পুরুষ আছেন। তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত। অব্যয়-ঈশ্বর তিনি ত্রিলোকে প্রবেশ করিয়া পালনকর্ত্তারূপে বিরাজমান আছেন।

ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃপরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ গীতা ১৫।১৭

সেই ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে আছেন, তিনি তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্বভূতকে নাচাইতেছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা ১৮৷৬১

শ্রীভগবানের উক্ত বাক্যসমূহ হইতে বুঝা গেল, তিনি নিত্যবদ্ধ আমার ভিতরও ধারক, পালক, চালক হইয়া অন্তর্য্যামি-পরমাত্মারূপে বর্ত্তমান। তিনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী বলিয়া পুরুষাবতার। শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি তিনি সত্ত্বগুণের প্রতি দৃষ্টিপাতকরতঃ পালনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন বলিয়া গুণাবতার। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেই ব্যাপিয়া আছেন, তাই তাঁহার নাম বিষ্ণু। "যেন সর্ব্বমিদং ততম্।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

দুঃখের কথা।

করিনু পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে,
উলটিয়া সেই কফ লাগিল বুকেতে।

আজ কয়েকটী দুঃখের কথা, "শ্রীসোনার-গৌরাঙ্গ"-সম্পাদক ও "শ্রীসাধনা"-সম্পাদকের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

উভয় সম্পাদকের ভাব বা চিন্তার বিনিময়ের দ্বারা নৈতিক বা সামাজিক উন্নতি সাধন করাই পত্রিকা-প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম-পত্রিকার কিন্তু

কেবল মাত্র সমাজের উন্নতি-সাধনই উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু সম্প্রদায়ের গ্লানিসমূহ বিদূরিত করতঃ প্রকৃত সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপন ও রক্ষণই একমাত্র হেতু। কিন্তু আজ-কা'ল এসকলের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করাই ধর্ম্ম-পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে।

দুঃখের বিষয় সম্প্রতি "সোনার-গৌরাঙ্গ" ও "সাধনা" এই দুইখানি বৈষ্ণব-পত্রিকাতেও এ দোষের সংস্পর্শ বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। দুই সম্পাদকের মধ্যে পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী ও কটাক্ষপূর্ণ কটূক্তিসমূহ যথেষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। শুধু কি তাই! বৈষ্ণবের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ হইতেও ইহাদের উভয়ের লেখনী বিরত হয় নাই।

এমন কি সাধনার গত পৌষ-সংখ্যায় দেখিতে পাইলাম, যিনি আমার স্মারসিকী-উপাসনার গুরুস্থানীয়, যাঁহাকে আমি প্রাণপ্রতিম বলিয়া মনে করি, সেই শ্রীবৃন্দাবনবাসী নিষ্কিঞ্চন প্রাচীন-বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রতিও শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমার দুঃখের বিষয় আর কি আছে!

এই দুইখানি পত্রিকার সহিত আমার সংস্রব আছে বলিয়াই, সমস্ত বাগ্-বিতণ্ডাদ্বারা আমাকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছে। ইহাদের দুইজনের আচরণে আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি।

যদি বৈষ্ণবনিন্দা বা কটাক্ষ করাই এই দুই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহাদের দ্বারা সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন ত সুদূরপরাহত, বরং অবনতির পথই দিন দিন উন্মুক্ত ও প্রদর্শিত হইতে থাকিবে। সুতরাং নিজ নিজ মানসিক আবিলতা বিস্তার করিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করার চে'য়ে, নীরব থাকাই ইহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ মনে করি। কারণ, যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তির বীজাঙ্কুর পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে ইহাদের মনে বিন্দুমাত্রও ভীতির সঞ্চার হইতেছে না। পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে ভীত হইয়া বলিয়াছেন,—

"হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মোর বৈষ্ণব-পরাণ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও এ বিষয়ে সাবধান করিতেছেন,—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপড়ে কিংবা ছিণ্ডে বৃক্ষ শু'কে যায় পাতা॥

বহু ভাগ্যে ও বহুজন্মের সাধনায় জীবের ভক্তি-সম্পত্তি লাভ হয়। মহৎ-কৃপা ও মহৎ-সঙ্গই এই ভক্তিলতা-বীজাঙ্কুর রক্ষার একমাত্র উপায়। স্বল্পমাত্র বৈষ্ণব-অপরাধেই এই অঙ্কুর বিনষ্ট হইয়া যায়। এ জন্য বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে সর্ব্বদাই সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণের নিকট আমাকে লজ্জিত হইতে হইবে বলিয়াই কেবল এই দুঃখ প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু ইহারা উভয়েই আমার স্নেহের পাত্র, একমাত্র এই অনুরোধেই এত দুঃখ পাইলাম।

হইতে পারে, একজন স্বার্থ ও জেদের বশবর্ত্তী হইয়া অপরকে অভদ্রোচিত অন্যায় কথা বলিয়াছে, তাই বলিয়া অপরকেও সহিষ্ণুতার মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে হইবে, ইহা কখনই বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার নহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বৈষ্ণবের আচরণ সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-বাক্য বর্ণিত আছে যে,—

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
তাড়নভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে তভু পানি না মাগয়॥

শ্রীগৌরসুন্দরের এই সকল সমুজ্জ্বল উপদেশরত্নাবলী ইহারা কি একবারেই ভুলিয়া গিয়া আপনাপন মর্য্যাদা পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছে! এই কি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-পত্রিকা-সম্পাদকগণের বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার! এই কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-ভাষিত "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের সার-গ্রাহিতার পরিচয়!

হা শ্রীনিতাইচাঁদ! হা শ্রীগৌরসুন্দর! তোমাদের শ্রীপদারবিন্দে সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি, স্বীয় অদোষদর্শিতা ও ভক্তবৎসলতাগুণে ইহাদিগকে বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে নিস্তার কর, ইহাদের উভয়ের হৃদয়ের আবিলতা দূর করিয়া দাও! ইহারা যেন পরস্পর বিদ্বেষ ভাব ভুলিয়া গিয়া বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইয়া, প্রাণ ভরিয়া তোমাদের মহিমা-বর্ণনে জগতের উপকার সাধন করিতে পারে।

আর ইহাদের দুইজনের নিকট আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা জানাইতেছি যে, শ্রীমান্ যোগেন্দ্র ! শ্রীমান্ রাধাগোবিন্দ ! তোমরা দুইজনেই আমার পরম স্নেহ-ভাজন ; শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সাধুজননিষেবিত সমুজ্জ্বল অকৈতব প্রেম-ধর্ম্ম-প্রচারে তোমরা জীবন উৎসর্গ করিয়াছ দে'খে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। উপস্থিত তোমাদের পরস্পরের এই ভাবান্তর দেখিয়া মর্ম্মন্তুদ বেদনা পাইয়াছি। পুনরায় তোমরা হৃদয়ের কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্বসকল প্রচার কর ; তাহা দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, তোমরাও শান্তিলাভ করিবে। ইহাতেই আমারও পরম সন্তোষ জানিবে। অলমধিকেন।

শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

[পরমারাধ্য প্রভুপাদের "দুঃখের কথা" শুনিয়া বিশেষরূপে ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইলাম। একেই তো কোটি জন্মের অপরাধের বোঝা মাথায় বহন করিয়া সংসারে ফিরিতেছি, তার উপর আবার নিজের দুর্দ্দৈব বশতঃ প্রতিমুহূর্ত্তে কত নূতন নূতন অপরাধ সঞ্চয় করিতেছি। অপরাধই বোধহয় অপরাধ টানিয়া থাকে ; তাই, পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধের ফলেই আবার নূতন নূতন অপরাধে লিপ্ত হইতেছি—সাধুর পোষাক পরিয়া কোন কোন সময় যেমন গৃহে চোর প্রবেশ করে, তদ্রূপ অনেক সময় সত্য ও ন্যায়ের ছদ্মবেশে অপরাধের স্পৃহাও চিত্তে জাগরিত হইয়া আমার ন্যায় হতভাগ্যের চিত্তকে পরিচালিত করে, মোহবশতঃ তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারি না। পরম হিতৈষী প্রভুপাদ আমার অপরাধের স্বরূপ দেখাইয়া দিয়া বাস্তবিক প্রভুর কাজই করিয়াছেন। তাঁহার করুণার তুলনা নাই ; তিনি অজস্রই করুণাবর্ষণ করিতেছেন—কিন্তু অপরাধভারে নিপীড়িতচিত্ত সেই করুণার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। প্রভুপাদ এবং বৈষ্ণববৃন্দ কৃপা করিয়া তাঁহাদের এই দাসানুদাসকে তদ্রূপ যোগ্যতা দান করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

আমার ন্যায় অপরাধী জীব যখনই যে বিষয় লইয়া বৈষ্ণবের চরণে উপস্থিত হইবে, তখনই নিজের আচরণে বৈষ্ণবের মনে কষ্ট দিতে থাকিবে। আমি

বাস্তবিক তাহাই করিয়াছি; তজ্জন্য এখন বাস্তবিকই অনুতপ্ত; গুলি একবার বাহির হইয়া গেলে তাহার আর প্রত্যাহার চলে না। এখন আর কোনও উপায় দেখি না। তবে একমাত্র ভরসা—বৈষ্ণব পতিত-পাবন, পরমকরুণ; তাঁহাদের চরণে অপরাধ-ক্ষমার অধিকারও আমি হয়তো হারাইয়াছি—তাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবসুলভ করুণাধারায় যদি এই অধমের অপরাধরাশি ক্ষালন করিয়া দেন, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইতে পারি।

সাধনায় যোগেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সোনার-গৌরাঙ্গে বিদায়-নিবেদনে এবং "তু'একটী কথা" নাম্নী পুস্তিকায় যাহা লিখিয়াছি, তাহা সত্য হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার গ্লানিজনক অনেক কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তজ্জন্য বিশেষভাবেই অনুতপ্ত। তদুত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, সেই বিচারে এখন আর প্রয়োজন নাই; তবে একথা বলিতে পারি, এইরূপ অবস্থায় পড়িলে এইরূপ লেখা অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার লেখার জন্য দুঃখিত হইয়াছিলাম—কিন্তু প্রভুপাদের কৃপায় এখন আর দুঃখিত নহি। আমার প্রার্থনা—অপ্রীতিকর কথা প্রকাশের জন্য তিনি কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিলে কৃতার্থ হইব।

অতঃপর উভয় পত্রিকাই যাহাতে একই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈষ্ণব-জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে, সহৃদয় বৈষ্ণববৃন্দ কৃপা করিয়া তদ্রূপ আশীর্ব্বাদ করুন, ইহাই প্রার্থনা। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ]

কান্তা-প্রেম।

রসিক-ভক্তগণ-মুকুটমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তদীয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে, গোদাবরী-তীরে কোন এক বৈষ্ণব বৈদিক-ব্রাহ্মণের গৃহে নিভৃত স্থানে, কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমিক ভক্ত শ্রীরায়রামানন্দের সহিত যে ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল ও সেই মিলন-প্রসঙ্গে যে সাধ্য-নিরূপণ-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছিল, তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। সেখানে "কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'আমি তাহার কান্তা' এইরূপ অভিমানোত্থ প্রীতিই কান্তাপ্রেম-নামে অভিহিত। এই কান্তা-প্রেমের সহিত অন্যান্য জাতীয় প্রেমের তুলনা করিলেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সুচারুরূপে প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমে কান্তা ও প্রেম এই দুইটী শব্দের ধাতুগত অর্থ নির্ণয় করা যাইতেছে। "কান্তা"-শব্দটী কম্ ধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে আ-যোগ করিয়া এবং প্রেম প্রী+ইমন্ (ভাবে) করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই দুইটী শব্দের অর্থই তর্পণ-ইচ্ছা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধাতুগত পার্থক্য না থাকিলেও লক্ষ্যগত ভেদ আছে।

কাম-অর্থে সাধারণতঃ নিজেন্দ্রিয়-চরিতার্থতার ইচ্ছাই বুঝায়। পক্ষান্তরে, প্রেম-শব্দে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-চরিতার্থতা-সাধনই বুঝায়। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥"

কাম অন্ধতম। কারণ ইহা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করে। আর প্রেম সূর্য্যকিরণের ন্যায় স্বীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া প্রিয় বস্তুর জন্য আত্মোৎসর্গ করে। কাম ব্যভিচারী ও বহু বিষয়গামী; প্রেম একনিষ্ঠ ও উহার গতি সিন্ধুগামী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু এখানে কাম-শব্দের হেয়াংশ লক্ষ্য করিয়াই এরূপ উক্ত হইয়াছে। কামের হেয়াংশ অর্থাৎ স্বসুখ-তাৎপর্য্যানুসন্ধান-বর্জ্জিত হইয়া, যদি উহা দ্বারা ভগবৎসুখের আনুকূল্যানুসন্ধানই বুঝায়, তবে ঐ কাম পরম-পুরুষার্থরূপে শাস্ত্রে বহু প্রশংসিত হয়। কারণ, কামের উপাদেয় অংশ তীব্র পিপাসা টুকুই কেবল তখন রহিল এবং সেই অদম্য বেগবতী ইচ্ছা প্রেমের অনুগত ভাবে থাকিয়া সাধ্যবস্তুর নব নব ভাবে আস্বাদন করাইতে লাগিল। ভর্জ্জিত ধান্যের মত এইরূপ কামের দ্বারা অবিদ্যাঙ্কুর উৎপন্ন হয় না; বরং রসবিশেষেরই আস্বাদন হয়।

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম-ক্রীড়া-সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥"

এই জন্য কান্তাগণের প্রেমই কাম বলিয়া কথিত হয়। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ধৃত হইয়াছে,—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

প্রাকৃত কাম দ্বারা, অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর—যিনি "সাক্ষাৎ মন্মথঃ-মন্মথঃ" তাঁহার আস্বাদন কদাপি সম্ভবপর নহে, ইহা বলা বাহুল্য। সেই জন্য যেখানে "কামাদ্‌গোপ্য" বলিয়া শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, তাহার এইরূপেই অর্থ করিলে সঙ্গত হয়। প্রাকৃত-জগতে যেরূপ কার্য্যতঃ বস্তুর ভেদ না থাকিলেও লক্ষ্যগত ভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কাম ও প্রেমে অর্থগত ভেদ না থাকিলেও উদ্দেশ্যগত ভেদ আছেই। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

দুইজন লোক বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন তাহার নিজ ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে, অন্যজন শ্রীভগবানের অর্চ্চনার জন্য ফুল সংগ্রহ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে উভয়ের কার্য্যের ভেদ না থাকিলেও প্রথম ব্যক্তির কার্য্যটী নিজেন্দ্রিয়-ভোগরূপ মায়িক-বৃত্তি বলিয়া বন্ধনই সৃষ্টি করিবে; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য ভগবৎভক্তিরূপ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া প্রেমোন্মেষের সহায়ই হইবে। এখানে যেমন উদ্দেশ্যভেদে একই অনুষ্ঠানের স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ দেখা যায়, সেইরূপ কামে সাধারণ মনুষ্যের ও গোপীগণের লক্ষ্য পৃথক্ থাকে বলিয়া ফল অত্যন্ত বিলক্ষণ। সাধারণ জীব খণ্ডিত বস্তুর পশ্চাতে কামান্ধ হইয়া স্বসুখানুসন্ধান করে; কিন্তু লাভ হয় বন্ধন ও যাতনা—পক্ষান্তরে শ্রীব্রজবালাগণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রস-স্বরূপ শ্রীভগবানকে অদম্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া সম্ভোগ করিতে বাঞ্ছা করিয়া পরম-পুরুষার্থ প্রেমই লাভ করেন। শ্রুতি বলেন, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নোল্পং সুখমস্তি।" এখানে ইহাও বিচার্য্য যে, তাঁহাদের এই সম্ভোগেচ্ছা স্বসুখ-পূরণার্থ নহে, তাহা কেবল ভগবানের সুখবর্দ্ধনার্থই; তাঁহাদের হৃদয়ে অন্য বাসনা উদিত হয় না। তাই চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"না গণি আপন সুখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হইল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবার্য্য॥

(অন্ত্য, ২০ পরিচ্ছেদ)

সমর্থারতির ইহাই লক্ষণ—সম্ভোগেচ্ছাকে রতির অনুগত করিয়া রাখা। যেমন অগ্নির সহিত লৌহের তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হইলে লৌহের শীতলতা ও তমোগুণ অপসারিত হইয়া অগ্নির দাহিকাশক্তি ও প্রকাশগুণ উহাতে সংক্রামিত হয়, সেইরূপ রতি বা কৃষ্ণের সুখ-বিধানে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত সম্ভোগেচ্ছা তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে নিজ ভোগেচ্ছার ঘন মোহ দূরীভূত হইয়া হৃদয় অনুরাগের কুঙ্কুমবর্ণেই রঞ্জিত হয়। যাহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হয়, তাহারই মুখ্যতা ; এখানে সেই জন্য অনুরাগেরই মুখ্যতা—সম্ভোগেচ্ছার গৌণতা, তাই রসামৃত-সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে,—

"মিথোহরের্ম্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদি কারণম্।
মধুরাঽপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতারতিঃ॥"

গোপীগণ ভগবানের সেবা করিয়াই কৃত-কৃতার্থ—নিজ সুখের জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন। 'কান্ত-সেবা সুখপুর, সঙ্গম হইতে সুমধুর'—এ কথা কেবল ব্রজবালাগণই বলিতে পারেন। কারণ, প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলিয়া গেলেন, তখন ব্রজসুন্দরীগণের যেরূপ বিগাঢ় বিরহদশার কথা শ্রীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, সেরূপ অবস্থায় সাধারণ ভক্ত জীবন ধারণই করিতে পারে না। কিন্তু তবু যে ব্রজবালাগণ জীবিতা ছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে—কান্তের সুখ। তাঁহাদের বিশুদ্ধ প্রেমই জীবন রাখিয়াছিল। পাছে তাঁহাদের জীবন-নাশে শ্রীকৃষ্ণের দুঃখোদয় হয়—ইহাই তাঁহাদের জীবন-রক্ষার মূল কারণ। সেই জন্য শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—

"ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃপ্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যোমে মদাত্মিকাঃ॥" ১০।৪৬।৫

অর্থাৎ আমি পুনরায় আসিব বলিয়া আশা দিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা কোনওরূপে বিরহ-তাপ-তপ্ত জীবন ধারণ করিতেছেন। আমাতেই তাঁহাদের আত্মা আছে, এই জন্য বোধ হয় তাঁহারা জীবিত আছেন ; নচেৎ স্ব স্ব দেহে তাঁহাদের আত্মা থাকিলে বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইত। তাই চৈতন্য-চরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

"প্রিয়া প্রিয় সঙ্গহীনা প্রিয় প্রিয়া সঙ্গ বিনা
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে তার এই দশা হবে
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ॥" ইত্যাদি।

এইরূপ ব্রজদেবীগণের বহু আচরণ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রেমের গভীরতা ও অসীমতা অনুমান করা যায়।

তবেই দেখাগেল যে, কাম বলিতে যদি উহার হেয়াংশ স্বসুখানুসন্ধান বর্জ্জিত তীব্রজালাময়ী পিপাসা বুঝায়, তবে সকল শাস্ত্রই একবাক্যে তাদৃশ কামের প্রশংসাই করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। শুধু তাহা নহে, এইরূপ প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষাদ্বারাই প্রেমের তারতম্য ও গভীরতা নির্ণীত হইয়া থাকে। এবং যাঁহা প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার বিষয় অর্থাৎ অখণ্ড আনন্দ তাহা লাভ করিলেই অন্য সকল কামনা চিরতৃপ্ত হয়। এখানে জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে যে প্রভেদ তাহা এই—জ্ঞানী সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনো নাশ করিয়া সকল বাসনা নির্ব্বাণ পূর্ব্বক নিরিন্ধন অগ্নির মত শান্ত হন, কিন্তু ভক্তিমার্গে ভগবদ্‌বিষয়ক সঙ্কল্প অতীব আদরণীয়। শুধু তাহাই নহে—যাহার যত তীব্র সঙ্কল্প, তাহার ততই নিবিড় ভগবদনুভূতি। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসের সহিত মধুর রসের তুলনা করিলেই বুঝা যইবে যে, কান্ত-প্রেমে কিরূপ বিশাল বারিধির উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গের মত মহাভাবময়ী আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ঐরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয়না না।

শান্ত ভক্তের মিলন-বিরহ নাই, কারণ তাঁহার সমবুদ্ধি অর্থাৎ তিনি জানেন পরমাত্মা নিখিল জগতে ওতপ্রোতঃভাবে অনুস্যূত হইয়া আছেন। তাই তাঁহার হৃদয় প্রশান্তসাগরের মতই শান্ত, নীরব; তাহা সম্ভোগ-বিয়োগের বিচিত্র লীলাময় তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠেনা, তিনি অন্তরেই ভগবৎ সাক্ষাৎ-কার করিয়া তুষ্ট থাকেন। সেই জন্য মিলন বিরহের নব নব উদ্দীপনায় সে হৃদয় স্পন্দিত হয়না। তাঁহার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শমতার প্রাধান্য হেতু এবং এই শমতার অর্থ শ্রীভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধি অর্থাৎ শান্তভক্তের ইষ্ট নিষ্ঠা, এই একটী গুণ, তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন না। দাসভক্ত কিন্তু তাহার প্রভুকে অন্তরে দেখিয়াই তৃপ্ত নহে—তাঁহার শ্রীচরণ-সেবাসম্পত্তি লাভে ব্যাকুল।

এখানে আকাঙ্ক্ষার অধিকতর স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। সেই জন্ত দাস্যে ইষ্টনিষ্ঠা ও সেবা—এই দুইটী গুণ। কিন্তু দাস্যে সঙ্কোচ থাকে বলিয়া সখ্য-প্রেমের তাহা হইতেও উৎকর্ষ। যদিও ব্রজের দাস্য-প্রীতি অন্যস্থানের দাস্যভাব অপেক্ষা সঙ্কোচ-শূন্য—কারণ ব্রজের দাসগণ কৃষ্ণকে ও আপনাদিগকে ব্রজেশ্বরের লাল্য—এই অভিমান রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ প্রভু-বুদ্ধিতে সেবা করেন না। প্রাকৃত জগতে যেরূপ দেখা যায়, অভিন্ন-হৃদয় সখাগণ পরস্পর ক্রীড়া-কৌতুকাদি করিয়া থাকে, ব্রজের সখাগণও সেইরূপ সাধ্বস-সঙ্কোচ-শূন্য হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আহার-বিহারাদি করিয়া থাকেন। প্রভু বিশ্রাম করিলে দাস যেমন স্বভাবতঃ তথায় যাইতে সঙ্কোচবোধ করে, সখার সেরূপ নহে। তাঁহার ওরূপ সঙ্কোচ নাই—তিনি সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণের সহিত লীলা-বিলাসাদি করিতে উৎকণ্ঠিত। তাহ'লে সখ্যে তিনটী গুণ দেখা যায়—ইষ্ট নিষ্ঠা, সেবা ও অসঙ্কোচ ভাব। তবে কখনও একটু অভিমানোত্থ সঙ্কোচ দৃষ্ট হয়, যেমন কখনও কলহ উপস্থিত হইলে সখার মনে হয়—হয়ত কৃষ্ণ আর তাহার সহিত খেলা করিবেনা। বাৎসল্যে কিন্তু মদীয়, অভিমান আরও অধিক—সেখানে আদৌ সঙ্কোচ নাই, সেইজন্য এই রসে চারিটী গুণ। পূর্ব্বোক্ত তিনটী গুণ, অধিকন্তু মাতাপিতা বশতঃ লালন-পালন। বাৎসল্য-রসের ঘনীভূত মূর্ত্তি মা ব্রজেশ্বরী জানেন যে, তিনি ভিন্ন কে আর কৃষ্ণের তত্ত্বাবধান ও হিতাকাঙ্ক্ষা করিবেন? তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণের লালন পালনে ব্যাপৃতা। কৃষ্ণ গোষ্ঠে যান—তাহাও মা যশোদার ভয়, পাছে কোন বনে বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁহাকে নয়নের আড়াল করিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। দামবন্ধন লীলা আলোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, যখন কৃষ্ণকে তিনি বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও বাঁধিতে অসমর্থা হইলেন এবং সমগ্র পল্লীর রজ্জুতেও দুই অঙ্গুলি পরিমাণ ন্যূন হইতে লাগিল, তখনও শ্রীকৃষ্ণ যে যুগপৎ অণু ও বিভুতত্ত্ব, তিনি যে সীমার মাঝেও অসীম, এসকল কথা মা যশোদার হৃদয় বিন্দুমাত্রও আলোড়িত করিলনা। তাঁহার কৃষ্ণে পুত্রাভিমান এতই প্রবল যে, তিনি মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় কৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও বিচলিতা হন নাই—বরং কোন অপদেবতার আবেশ হইয়াছে ভাবিয়া কৃষ্ণের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ব্রজের এমনই মাধুর্য্যময়ী প্রীতি যাহা কোনরূপ ঐশ্বর্য্য-দর্শনেই সঙ্কোচিতা হয় না। জগতে যেমন মাতার হৃদয় সর্ব্বদাই পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল থাকে—

মা যশোদারও তদ্রূপ। তবেই মমতাধিক্য হেতু বাৎসল্যের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব।

ইহার পর কান্তাপ্রেম আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, সেখানে কৃষ্ণের প্রতি নিত্যসিদ্ধা ব্রজবালাগণের কিদৃশী মদীয়তাময়ী প্রীতি—কৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রকারে সম্ভোগ করাইবার কিরূপ অদম্য নব নব আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয়-পারাবারে কল্লোলময়ী উর্ম্মিমালার মতই উছলিয়া উঠিতেছে। যেমন, যে নদী সাগরের যত নিকটে থাকে, তাহাতে ততই জোয়ার ভাটা দেখা যায়, সেইরূপ শ্যাম-সাগরের যে যত নিকট, তাহার হৃদয়-তটিনীতে ততই সম্ভোগ-বিয়োগের উচ্ছলিত নৃত্য—ততই প্রেম-বৈচিত্রী ও নব নব লীলা। তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য কৃষ্ণ বিরহেও মনে করিতেন, কোটি যুগ পরিমাণ কাল কান্তের সহিত দেখা হয় নাই। "ত্রুটী যুগায়তে ত্বাং অপশ্যতাম"..........তাস্তাক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেননীতা ময়ৈব বৃন্দাবন গোচারণে ক্ষণার্দ্ধবৎতা পুনরঙ্গতাসাম্ হীনা ময়া কল্পসম বভূবুঃ ইত্যাদি বাক্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আবার যখন কান্তের সঙ্গ-সুখসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন রাস-রজনীর ব্রহ্মরাত্রিও তাঁহাদের নিকট ক্ষণকাল তুল্য জ্ঞান হইত। যখন ব্রজসুন্দরীগণ আবার তৃষিত নয়ন-চকোর দিয়া তাঁহাদের প্রাণকোটি প্রেষ্ঠের ঘন-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশসমাবৃত পূর্ণেন্দুসুন্দর স্মেরাননের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া মুখসুধা পান করিতেন, তখন পলককারী ব্রহ্মাকে ভৎর্সনা করিতেন—'জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম' 'গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি' ইত্যাদি বাক্যে তাহা বর্ণিত আছে। এইরূপ নিমেষাসহনীয়তা শাস্ত্রে কোথাও শোনা যায় না। এইরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যে আস্বাদনেরও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কারণ তীব্র ব্যাকুলতা ও দৌর্ল্লভ-বুদ্ধি না থাকিলে বস্তু-প্রাপ্তিতেও আস্বাদন হয় না। যেমন কোন লোক যখন দারুণ তৃষ্ণায় আতুর, তখনই তিনি সলিল পান করিয়া যথার্থ তৃপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু যাহার তৃষ্ণা নাই, তাহার ঐ বারিলাভে কোনই ফল নাই। তবেই দেখা গেল—আকাঙ্ক্ষাই আস্বাদনের পরিমাপক। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সম্বন্ধে আর একটী কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের প্রতি যে প্রগাঢ় প্রীতি, তাহা কোন ঐহিক সম্বন্ধজনিত নহে অর্থাৎ কেবলমাত্র তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষাই প্রীতিবন্ধনের হেতু। সেই তাঁহাদের প্রীতি "কামরূপা" অর্থাৎ কামেন রূপ্যতে যা সা, যে ভক্তি সম্ভোগেচ্ছাকে প্রেমরূপে

পরিণত করে তাহাকে কামরূপা বলে। সেই জন্ত তাঁহাদের প্রীতি সীমাবদ্ধ হয় নাই—পক্ষান্তরে মহিষীগণ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হইলেও তাঁহাদের প্রীতি 'সম্বন্ধরূপা' বলিয়া সসীম (গোবিন্দে পিতৃত্বাভিমনোত্থ প্রীতিই) সম্বন্ধরূপা। তাঁহারা ব্রজবালাগণের মত কৃষ্ণকে অখণ্ডরস-বল্লভরূপে লাভ করিতে পারেন নাই, এবং পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও অন্যান্য স্থানের সকল প্রীতির সমাবেশ এক কৃষ্ণ-প্রীতির মধ্যে দেখিতে তাঁহারা সমর্থ হয়েন নাই। কারণ, দাম্পত্যসূত্রে তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের একটী বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। সেইজন্ত মহিষীগণ স্বরূপশক্তি হইলেও সেখানে "কান্তা" শব্দ প্রযোজ্য হইবে না। যেমন সংসারে বহুপাত্র জল ধারণ করিলেও "জলধি" শব্দটী রূঢ়িবৃত্তিতে অসীম জলাশয় পারাবারেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অনন্ত প্রেমের আশ্রয় অধিরূঢ় মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজবালাগণেই "কান্তা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাঁহারা সকামা নহেন, কিন্তু কামরূপা। কারণ, যাঁহারা সকামা, তাঁহাদের ইচ্ছায় কামনা ত্যাগ হইতে পারে, সেইজন্ত কামনাটি গৌণ এবং যাঁহাদের কামনা তাহাদেরই মুখ্যত্ব; কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের সম্বন্ধে তাহা নহে। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক দুর্দ্দমনীয়-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা গ্রস্তহৃদয়া—সেই জন্ত কামনারই মুখ্যত্ব। সেই বেগবতী আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড স্রোতেই তাঁহাদের কুল, মান, গুরুগঞ্জনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল ভাসিয়া গিয়াছিল। তাই শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছিলেন—'যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চহিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং'—১০।৪৭।৫৪॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গাঙ্গুলী এম, এ,

শ্যাম-বিরহে।

শ্যামের বিবাহে পরাণ মোর,
পারিনা ত সই, রাখিতে
তবু বলিস তুই
"শান্ত হ'লো সই,"
কিছুই পারিস্‌নি বুঝিতে।

প্রাণের ভেতর লেগেছে আগুন,
সব বুঝি ছাই করিতে,
কত বেশী ভার
পরাণে হ'য়েছে
পারিনারে আর বহিতে।

বঁধুটি আমার গিয়েছে যেদিন
মথুরায় কংস বধিতে
সবরিপু মাঝে
আমি যেন একা
পড়েছি মরমে মরিতে।

চাঁদ আর কভু ঢালে না সুধা
লেগেছে আগুন ডারিতে,
ক্ষত রাশি মাঝে
নুন যে ছিটায়
আমার পরাণ নাশিতে।

দখিন হাওয়া পারেনা লো সই,
আমায় শীতল করিতে,
বিরহ আগুন
বাড়া'তেই শুধু
লেগেছে মধুর বহিতে।

যুই জাতি—আদি যত আছে ফুল
পারিনা ত আর দেখিতে
চোখ ঝাঁপি থাকি
তবু আসে গন্ধ
আমায় জ্বালিয়ে মারিতে।

মধুপ-গুঞ্জন, কোকিলের কুহু
পারি নারে আর শুনিতে,
দানব গর্জ্জন
যেন লাগে কানে,
কানে হাত দেই রোধিতে।

বৃন্দাবিপিনের প্রতি রেণু মাঝ
ভরে' আছে তার স্মৃতিতে,
দেখি'লো যেদিক
হাপিয়ে যে উঠি
(কেউ) পারে কি এমনে বাচিতে ?

যমুনার চণ্ডস্রোত লাগে ভাল
কামনা তাইতে ডুবিতে,
ফুল-চন্দন দিয়ে
পরম যতনে
বাসনা মৃত্যুরে পূজিতে।

আগুন আমার বড় লাগে মিঠা
সে পারে শান্তি করিতে,
দে, না লো সখি
চিতাগ্নি সাজিয়ে
(আমার) পরাণ শীতল করিতে।

মিনতি করি বলিস্‌নি আমায়
এ পরাণ ধরি রাখিতে,
কি কাজ আমার
এ দেহ ধারণে
দে, দে, লো শীগ্‌গির মরিতে—

শ্যামচাঁদ বিনে সব যে আঁধার
জীবন যৌবন সহিতে,
মরি গিয়ে আমি
মধুপী হইয়ে,
মাতি, র'ব তার মালাতে
অধিক কি সুখ, এ হ'তে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ।

তোমার আহ্বান।

"আমি ত তোমারে চাহিনা জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ।"
(রজনী সেন)

কে তুমি আমায় প্রত্যহ আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তল হতে থেকে থেকে ডাক্‌ছ? কে তুমি করুণাময়! আমি তোমার কোন খোঁজ না নিলেও সদাই আমাকে তোমার বিমল আনন্দে টেনে নেবার জন্ত হাত দুখানি বাড়িয়ে বসে আছ। যখন সংসারের ভীষণ তাড়নায়, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে পিপাসায় কাতর চাতকের মত এ দগ্ধ হৃদয়খানি চারিদিকে ছুটাছুটি কর্‌তে থাকে, তখন, কে তুমি, তোমার বরষার নবীন মেঘখানা নিয়ে আমার কাছে এসে আমায় তোমার শান্তি-বারি দিয়ে শীতল করে দাও? আমি ত তোমাকে একবারও খুঁজি না, একবারও চাই না, তবুও কেন দয়াময়, তুমি আমার জন্ত এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়? কেন তুমি, তোমার কাছে যাব ব'লে আমার পানে চেয়ে আছ! আমার জন্ত এত টান তোমার!!

তোমার সঙ্গে যেন কতকালের চেনা, কতকালের আত্মীয়তা! কই আমি ত তোমাকে চিনিনা, জানিনা! কত কাছে বসে আছ, আমি কিন্তু তোমাকে দেখিনা। তুমি কাছে থেকে আমার সদসৎ সব কাজই দেখ্‌ছ, আমি কিন্তু কিছুই জানিনা। কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পড়ে মন যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা

সদসৎ কিছুই ঠিক করতে পারে না, কেবল চিন্তা-স্রোতে ভেসে অনন্তের পথে চ'লে যায়, তখন তুমিই যেন কোথা হতে এসে জহ্নু ঋষির গঙ্গাপানের মত এক মূহুর্ত্তে সমস্ত ভাবনা দূর করে দিয়ে আমায় অসতের ভীষণ যাতনাময় তীব্র বিষের জ্বালা হতে উদ্ধার করে সত্যের সুধা-সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও।

কে তুমি এ শস্যশ্যামলা ধরণীতে আস্‌বার পূর্ব্বে আমার খাওয়ার জন্য মাতৃস্তনে ক্ষীর দিয়ে রেখেছিলে! যখন আমার বল্‌তে কেউ ছিল না—কেবল মাত্র অসহ্য যন্ত্রণা—তুমিই কি সে সময় সেই ঘোর অন্ধকারময় মাতৃ-জঠরে তোমার বিমল শান্তির কোলে স্থান দিয়ে দশ মাস দশ দিন রক্ষা করেছিলে? এই সুশীতল বারি, সুগন্ধি বায়ু, শ্যামল শস্য, সবই তুমি আমার জন্য ক'রে রেখেছ—কিছুরই অভাব রাখনি; আমি না চাইতেই দয়াময়, সব দিয়েছ; তুমি ত সবই দিয়ে রেখেছ, কিন্তু তবুও আমার চাই-চাই যাচ্ছে কই! তোমার ত প্রভু, অপার করুণা—আমি কিন্তু কৃতঘ্ন।

চারিদিকেই প্রকৃতি তোমার জয় গাইছে, জলে স্থলে, পর্ব্বতে কন্দরে, সর্ব্বত্রই তুমি বিরাজিত থেকে তোমার কাছে নিয়ে যাবার জন্য সদাই ডাক্‌ছ, আমি তোমার ডাক্ শুনেও শুন্‌তে পাচ্ছি না। সর্ব্বত্রই তোমার মহিমা দেখ্‌ছি, কিন্তু একবারও তোমার কথা ভাব্‌ছি না, একবারও তোমায় চিন্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি না, নদী কুলু কুলু নাদে তোমারই জয় গান ক'রে তোমারই ডাক আমায় শুনিয়ে তোমার কাছে চলেছে, আমি আর তার কথা শুন্‌ছি না—হেলায় মুখ ফিরিয়ে বসে আছি। পবন তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করে আমায় বলে যাচ্ছে "ওরে অভাগা, সে ডেকেছেরে, আর আমার সাথে আয়, আমি তার কাছে যাচ্ছি, তোকেও নিয়ে যাব," আমি কিন্তু তার কথায় কানও পাতি না; সদাই ভাব্‌ছি আমার ভাবনা! কাল চলেছে তোমার কাছে, আর আমায় বলে যাচ্ছে "আয়রে আয়, সে বড়ই ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌ছে, আমি চলেছি তুই তার ডাকে সাড়া দে," আমি সে কথা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি, আর মনে মনে ভাব্‌ছি, এখানেইত আমার সর্ব্বস্ব, আমি আবার যাব কোথা। কারও কথা আমি কানে তুল্‌ছি না।

তুমি প্রভু যেই হও, আমি তোমাকে চিনি না, জানি না—এমন কি একবার জান্‌তে ইচ্ছাও করি না। হে করুণাময়, দয়ার সাগর, তোমার এ অযাচিত করুণা পেয়েও তোমাকে ভুলে আছি!!! তোমাকে প্রতিদান কিছুই দিচ্ছি

না—আমার সে সামর্থ্যও নাই, একমাত্র ভরসা তোমার যুগলচরণ, তুমি ত প্রভো কৃপাময়, তবে তাই কর, যেন আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারি।

বৈষ্ণবপদরেণুপ্রার্থী—

শ্রীনবকুমার কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্তভূষণ।

প্রশ্ন-সমালোচনা-সম্বন্ধে।

শ্রীশ্রীভাগবতোত্তমেষু!

মহাত্মন্! বর্ত্তমান পৌষমাসের "সাধনায়" প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ-নিষেধ সম্বন্ধে যে সৎসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠে যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলাম। অন্যান্য বিষয়েও যে সদুত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহাও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়াই মনে করি।

কিছুদিন অতীত হইল, জনৈক মহাত্মা "উপবাসদিনে বৈষ্ণবের আদ্যশ্রাদ্ধাদি করণীয় কিনা?" এবিষয় জিজ্ঞাসু হইলে পরমারাধ্যাতম পিতৃদেব শ্রীমদ্গোপী-মোহন গোস্বামি মহাশয় শাস্ত্রযুক্তিমূলক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ যে সুবিস্তৃত সদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আপনার সিদ্ধান্তের অনুকূল হইবে মনে করিয়া পাঠাইতেছি; ইহা "সাধনায়" প্রকাশ করা যদি আপনি সমীচীন মনে করেন, তবে কৃপা করিয়া সংশোধন পূর্ব্বক শ্রীপত্রিকার একপার্শ্বে স্থান দান করিবেন।

কৃপার্হ

শ্রীবিরাজমোহন গোস্বামী।

সাচার, ত্রিপুরা।

উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ-নিষেধ।

[শ্রীমদ্গোপীমোহন গোস্বামি প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র]

পরমপ্রেমাস্পদেষু!

বাবা! আপনার পিতৃদেবের নির্য্যান-কাহিনী শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলাম! হর্ষের কারণ—শ্রীহরিসভার উৎসবে-হরিভক্তগণের সমাগমে, দেশ শ্রীহরিধামে পরিণত হইলে, শ্রীহরিবাসরদিবসে শ্রীহরিনামোচ্চারণ

করিতে করিতে শুনিতে শুনিতে, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মস্তকে ও বক্ষে রাখিয়া এবং পাঠ শুনিয়া, শ্রীব্রজরজ, শ্রীচরণতুলসী, শ্রীনামাবলী ও শ্রীনামাঙ্কাদিতে বিভূষিত হইয়া, শ্রীতুলসীদেবীকে শিয়রে রাখিয়া, শ্রীভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া, কলিকলুষনাশন শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনের মধ্যে—

"নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ।
ভীষ্মের নির্য্যান সবার হইল স্মরণ॥" চৈঃ চঃ, অন্ত্যঃ ১১শঃ

রমণীগণের ঘন ঘন হুলুধ্বনি এবং ভক্তগণের সুমধুর প্রেমকণ্ঠোচ্চারিত উচ্চ হরি-ধ্বনির মধ্যে শমন-রণে বিজয়ী হইয়া মহাবৈকুণ্ঠে যাত্রাকরা—ভূমণ্ডলে এমন সৌভাগ্য কাহার কখন ঘটিয়া থাকে ?

"ঐছন ভাগ যব ভই হামারা।
তব হু হও ভবসাগর পারা॥

এমন মহাপুরুষের পুত্ররত্ন বলিয়া আপনারাও ধন্য। পিতার অন্তিম সময়ে সদ্গতি-সাধনার্থ সপরিবারে এইরূপ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া ততোধিক ধন্য। আপনারা আমাদিগকে ভালবাসেন বলিয়া আমরাও ধন্য।

তবে বাবা! বিষাদের কারণ, এহেন আড়ম্বরশূন্য অন্তরনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্তকে হারাইয়া বাস্তবিকই জগৎ অন্ধকার দেখিতেছি। সকল শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হায় হায়! ক্রমে ক্রমে যে একেবারে সঙ্গ হারা হইয়া পড়িলাম। ভক্ত-প্রবর সেই ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী নাই, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-নিবাসী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৈক-জীবন ভজনাদর্শ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ নাই, অদ্য আবার ভক্তপ্রবর ব্রজ-নাথকেও হারাইলাম; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? হায় হায়! মাদৃশ হতভাগার কি দুর্ভাগ্য।

"প্রভু কহে কোন দুঃখ দুঃখ-মধ্যে সার।
[রায় কহে] কৃষ্ণভক্ত-বিরহবিনা দুঃখ নাহি আর॥" চৈঃ চঃ

কিন্তু বাবা! ততোধিক দুঃখের বিষয়—না জানি, আপনারা সামাজিকতার অনুরোধে জনসাধারণের ন্যায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার না করিয়া, গতানুগতিক ন্যায়ানুসারে বৈষ্ণবস্মৃতির বিড়ম্বনা ঘটাইয়া এহেন মহাপুরুষের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াও উপবাসদিনে সম্পন্ন করিয়া "ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতাভোক্তা পরেতকঃ।" রূপ ফললাভ করেন, ইহাই ভাবনার বিষয়।

বাবা! বিরক্ত হইবেন না, আন্তরিক অসহ্য দুঃখের যাতনায় অধীর হইয়া বলিতেছি, আপনারা যদি নিত্যধামগত পিতৃদেবের অধোগতির জন্য দেশ-প্রথানুযায়ী উপবাসদিনে শ্রাদ্ধক্রিয়া দ্বারা সৎপুত্রের কর্ত্তব্য পালন করেন, তথাপি আমার বিশ্বাস, আপনাদের পবিত্রচেতা পিতা স্বকীয় সাধনলভ্য নিত্যধাম হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার জন্য, আপনাদের প্রদত্ত জল-পিণ্ডরূপ-পাপান্ন কখনও শ্রীহরিবাসরদিনে গ্রহণ করিবেন না; যেহেতু—

"গর্হিতান্নং নচাশ্নন্তি পিতরশ্চদিবৌকসঃ।" (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ পিতৃগণ ও দেবগণ কখনও পাপান্ন ভোজন করেন না। বলা বাহুল্য, একাদশীর উপবাসদিনে সমুদায় পাপই যে অন্নাশ্রিত হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বত্র সুবিদিত। নারদ-পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা-সমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥"

ব্রহ্মহত্যাদি যত কিছু পাপ আছে, সমুদয় পাপই শ্রীহরিবাসর উপস্থিত হইলে অন্নাশ্রয় করিয়া অবস্থিত হয়।

এই জন্যই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

বৈষ্ণবপিতৄণামপি শ্রীবিষ্ণুদিনে শ্রাদ্ধগ্রহণাযোগাদিতিদিক্।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১২ বিলাস, ২৯ শ্লোকের টীকা।

বৈষ্ণবপিতৃগণ শ্রীহরিবাসর-দিনে শ্রাদ্ধ গ্রহণ করেন না; কারণ ঐ তিথি পিণ্ডাদি-অন্ন গ্রহণের অযোগ্য; এ জন্য তাঁহারা উহা অঙ্গীকার করিতে পারেন না।

এমন শ্রাদ্ধের সার্থকতা কি! ফলতঃ সৎপুত্রের পক্ষে পিতৃলোকের অগ্রাহ্য এ হেন দূষিত অন্নদ্বারা কখনও পিণ্ডপ্রদান কর্ত্তব্য হইতে পারে না—যাহা গ্রহণ করিলে পরলোকগত পিতা নিরয়গামী হইয়া থাকেন।

হায়! এই জন্যই কি পিতৃদেব আজীবন প্রাণপাত করিয়া অর্থবিত্ত দিয়া পুত্রদিগকে বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ এবং জ্ঞানবান্ করিয়া থাকেন! শ্রাদ্ধ করা পরলোকগত পিতার সদ্‌গতির জন্য, না অধোগতির জন্য? পরিতৃপ্তির জন্য না অতৃপ্তির জন্য?

আপনারা শ্রীশ্রীভগবৎ-কৃপায় এবং পিতৃ-আশীর্ব্বাদের ফলেসকলেই সুশিক্ষিত, হৃদয়বান্ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ পরম-ধর্ম্মানুরাগী। এই ক্ষেত্রে এধর্ম আপনাদের

কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। একদিকে দেশাচারের অনুসরণ করিয়া লৌকিকতা রক্ষা, অপরদিকে বৈষ্ণবাচারানভিজ্ঞ সামাজিকতার অন্ধ বিশ্বাস উপেক্ষা করিয়া স্বধর্ম্ম-রক্ষা, ইহার মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃকল্প মনে করেন, তাহাই অবলম্বন করিবেন।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" গীতা, ৩।৩৫

সম্পূর্ণরূপে পরধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিত অঙ্গহানি সত্ত্বেও স্বধর্ম্ম-সাধন শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল। স্বধর্ম্মপালনে দেহান্ত হইলেও কল্যাণ লাভ হয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবের পক্ষে বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবস্থা অমান্য করিয়া প্রচলিত সাধারণ দেশপ্রথার অনুসরণ করা কথনও তাঁহার স্বধর্ম্ম নহে। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যাচার নিরূপণার্থই বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রয়োজন। সাধারণ স্মৃতির ব্যবস্থা দ্বারা তাহা সাধিত হয় না বলিয়াই মহানুভব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভগবৎপ্রেরণায় "শ্রীনৃসিংহ-পরিচর্য্যা" ও "শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি" বৈষ্ণবস্মৃতিসকল প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রারম্ভেই শ্রীমদ্ গোস্বামিপাদ তাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—

"চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে, শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেঽঞ্জসা লিখন্।
আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ, সার্দ্ধং সমাহৃত্যসমস্তশাস্ত্রতঃ॥"

আমি শ্রীবৈষ্ণবদিগের পরম হর্ষের নিমিত্ত তাঁহাদিগেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য যে কিছু কর্ম্ম, তৎসমুদায় সদাচারপরায়ণ-বৈষ্ণবগণের সহিত বিচার করতঃ সমস্ত শাস্ত্র হইতে আনয়ন করিয়া অনায়াসে লিখিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব-নামক ভগবানের শরণাগত হইলাম॥

অতএব বলা বাহুল্য যে, শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত কর্ত্তব্যাচার প্রতিপালন করাই বৈষ্ণবের স্বধর্ম্ম। ইহা প্রত্যাখান করিয়া অপর স্মৃতির অনুসরণ করা শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরণানুচর বৈষ্ণবগণের কথনও কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই "পরধর্ম্ম-ভয়াবহ" রূপ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। ফলতঃ যিনি যে স্মৃতির অনুগত, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সেই স্মৃতির ব্যবস্থানুযায়ী অনুষ্ঠানেই সর্ব্বদা রত থাকিতে হইবে ; যেহেতু ইহা তাহার স্বধর্ম্ম। এই বঙ্গদেশেও দেখা যায়, কেহ প্রাচীন

স্মৃতির মতানুসারে, কেহ স্মার্ত্তরঘুনন্দনস্মৃতির মতানুসারে, কেহ বা মৈথিলস্মৃতির মতানুসারে চলিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে ক্রিয়াকাণ্ডের অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয় ; কিন্তু তথাপি কেহ কাঁহাকে অকার্য্য হইল বলিয়া দোষারোপ করিতে পারেন না। মনে করুন মৈথিলস্মৃতির মতানুসারে অকালে-বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হইতে পারে না, অথবা পঞ্চাঙ্গ ক্রিয়া না করিয়া কেবল বৃষোৎসর্গ করা যায় না ; কিন্তু স্মার্ত্তস্মৃতিতে তাহার বাধা নাই। ইহা বলিয়া স্মার্ত্তগণ মৈথিলিদের ক্রিয়া লোপ হইল, একথা বলিতে পারেন না ; কারণ, মৈথিল মতাবলম্বীদের ইহা স্বধর্ম্ম। পক্ষান্তরে মৈথিলিগণও স্মার্ত্তমতানুবর্ত্তীদিগকে অকালে বৃষোৎসর্গ করায়, কিম্বা পঞ্চাঙ্গহীন বৃষোৎসর্গ করায়—ইহাকে অকার্য্য বলিতে পারেন না। যেহেতু ইহা তাঁহাদের স্বধর্ম্ম। অতএব শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণানুচর বৈষ্ণবগণ যদি স্বকীয় বৈষ্ণব-স্মৃতির ব্যবস্থানুযায়ী কর্ত্তব্যানুষ্ঠানদ্বারা সাধারণ দেশপ্রথার কথঞ্চিৎ অন্যথাচরণও করেন, তথাপি তাহা দোষাবহ হইতে পারে না। বরং প্রচলিত দেশপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবস্থা উপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই সে স্বধর্ম্মভ্রষ্টতাজনিত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে। যেহেতু সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবস্মৃতির অনুসরণ করাই বৈষ্ণবের স্বধর্ম্ম।

দেশাচার কোনস্থলে গ্রাহ্য, কোনস্থলে ত্যাজ্য, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; যথা—

"ন যত্র সাক্ষাদ্ বিধয়ো ন নিষেধাৎ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচার-কুলাচারৈ স্তত্রধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥ স্কন্দপুরাণ।

যে স্থলে বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্টরূপে বিধি বা নিষেধ না থাকে, সেই সেই স্থলেই দেশাচার এবং কুলাচার দেখিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়।

স্মৃতের্বেদ-বিরোধেতু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈবলৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥

বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে, যেরূপ স্মৃতিবাক্য অগ্রাহ্য হয়, তদ্রূপ স্মৃতি-শাস্ত্রের বিপরীত হইলে দেশাচারকেও অগ্রাহ্য করিতে হয়।

এই জন্যই বেদচতুষ্টয়ের ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য অধিকরণমালায় লিখিয়াছেন, "বিরোধেত্বনপেক্ষমসতিহ্যনুমানমিতি।" ফলতঃ শিষ্টাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখানে দেখা যায়, একাদশীর উপবাস-বাধিত শ্রাদ্ধ, পরদিন দ্বাদশীতে সম্পন্ন করা কথঞ্চিৎ দেশাচারবিরুদ্ধ হইলেও

সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত। পরন্তু এই শাস্ত্রাজ্ঞা-লঙ্ঘনে মহান্ অনর্থপাতেরই সম্ভাবনা। শ্রাদ্ধকর্ত্তা, ঐ শ্রাদ্ধে ভোক্তা, এবং যাঁহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা হয়, সেই পরলোকগত মহাত্মা, এই ত্রিবিধ জনেরই নরকগমন অনিবার্য্য। এমত স্থলে শাস্ত্রাজ্ঞা রক্ষা করা বিধেয়, না দেশাচার রক্ষা করা বিধেয়, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ একাদশীর উপবাস-বাধিত শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতে করা যে একান্ত দেশাচার-বিরুদ্ধ, এ কথাও বলা যায় না; যেহেতু শ্রীবৃন্দাবনাদি ধামে আদর্শ বৈষ্ণব-সমাজে তাহাতো চিরদিনই প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও অনেক স্থলে অনেকদিন হইতেই এইরূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। আমরা তাহার তত্ত্ব করিনা, তাই জানিতে পারি না। তবে বিরল-প্রচার এই মাত্র কথা। তাত হইবেই; এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে কয় জনেই বা বৈষ্ণব-স্মৃতির খবর রাখেন, কয়টি শ্রাদ্ধই বা একাদশ্যাদি উপবাস দিনে উপস্থিত হয়! সুতরাং দেশ-প্রচলিত সাধারণ ও স্মার্ত্তস্মৃতির ব্যবস্থানুসারেই সর্ব্বত্র ক্রিয়াকাণ্ড চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে যে স্থলে অনুষ্ঠানশীল তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব-পণ্ডিত আছেন, সে সে স্থলে প্রায়শঃ বৈষ্ণব-স্মৃতির ব্যবস্থানুসারেই সমুদায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে আপনাদের বিদিতার্থ উপবাস-বাধিত শ্রাদ্ধ যে যে স্থলে বৈষ্ণব-স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে দ্বাদশীতে হইয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। তত্ত্ব করিলে বোধহয় আরও অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

১। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামী চরণানুগৃহীত মাধ্ব-গৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পরিবারে এবং শিষ্যমণ্ডলীতে এইরূপ উপবাস বাধিত অনেক শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতে হইয়াছে।

২। শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসী কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশ্য নিত্যধামগত প্রভুপাদ্ শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের শ্রাদ্ধ।

৩। বিক্রমপুর, আরিয়ল নিবাসী সুবিখ্যাত বৈষ্ণব-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিমোহন গোস্বামি শিরোমণি মহাশয়ের পিতৃ শ্রাদ্ধ।

৪। বিক্রমপুর, বিট্‌গাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত নবকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতৃ শ্রাদ্ধ।

৫। বিক্রমপুর, দ্বিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিমোহন কবিরাজ মহাশয়ের পিতামহীর শ্রাদ্ধ।

৬। ত্রিপুরা, সাহাপুর নিবাসী ৺শ্যামাচরণ গোপের শ্রাদ্ধ।

এতদ্‌ব্যতীত আমাদের বাড়ীতে প্রথমতঃ আমার সহধর্ম্মিণীর, তৎপর (ভ্রাতুষ্পুত্রের ঘরের পৌত্র) শ্রীমান্ শশাঙ্কমোহনের প্রথমা পত্নীর উপবাস দিবসীয় শ্রাদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থানুসারে আমরা দ্বাদশীতেই করাইয়াছি। (পশ্চাৎ সে সকল পণ্ডিত মহোদয়গণের ব্যবস্থা পত্র সহ নাম প্রকাশ করিব।) (ক্রমশঃ)

শ্রীবিরাজমোহন গোস্বামী।

(২)

শ্রীযুত গোপীবল্লভ বিশ্বাস মহাশয় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর ব্রাহ্মণ-বংশজাতত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাঠাইয়াছেন :—

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে প্রেমবিলাস গ্রন্থের ২৩ শ বিলাসে এইরূপ উক্তি আছে :—

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্যামসুন্দর আচার্য্য।
কুমার হট্টবাসী বিপ্র সর্ব্বগুণে বর্য্য॥
তাঁর পুত্র ঈশ্বরপুরী বুদ্ধে বৃহস্পতি।
বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র তাঁর অতি গতি॥
পরম পণ্ডিত ঈশ্বর ছাড়ি গৃহবাস।
মাধবেন্দ্র-শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্যাস॥
ঈশ্বরপুরী হৈল সন্ন্যাস-আশ্রমে।
মাধবের করে সদা চরণ-সেবনে॥

সুতরাং প্রেমবিলাসের মতে তিনি ব্রাহ্মণ।

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা-বিচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[আমার সুদীর্ঘ কড়চা-বিচার প্রবন্ধে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় একটু নিবেদন করিতেছি। এই গোবিন্দদাসের কড়চা নামক ক্ষুদ্র পুস্তককে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থরূপে অবলম্বন করিয়া রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কবিশেখর মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এবং আরও কতিপয় পুস্তকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলা ও চরিত্র বর্ণন করিয়া তদ্দ্বারা বৈষ্ণব-জগতের চিরমান্য শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রামাণিকতা নষ্ট করিতেছেন। নিরপেক্ষ বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে, এই কড়চা পুস্তকখানি সম্পূর্ণ জাল, কল্পিত ঘটনায় পূর্ণ, এবং একান্ত আধুনিক। অথচ ডাক্তার মহাশয় ইহা চৈতন্যদেবের ভৃত্য গোবিন্দকর্ম্মকার কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, ইহা অবলম্বনে চৈতন্যদেবের জীবনী অনেক অসত্য ঘটনায় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছেন। গোবিন্দ কর্ম্মকার নামে কোন ব্যক্তির চৈতন্যদেবের ভৃত্য বা সঙ্গীরূপে থাকা কোন প্রাচীন পুস্তক দ্বারা প্রমাণিত হয় না। ডাক্তার দীনেশ বাবুর পুস্তকগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত এবং কোন কোন পুস্তক প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতরেও প্রচারিত। ডাক্তার মহাশয়ের এই গুরুতর ভ্রম কিম্বা অন্যায় কার্য্যের বিরুদ্ধে বিগত দুই বৎসর যাবত বাঙ্গালা দেশে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। বহু বাঙ্গালা ও ইংরেজী পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আমাদের প্রবন্ধ ও প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এখনও অচল, অটল। স্বীয় জেদ্ বজায় রাখিবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট। ডাক্তার মহোদয়ের লিখাসমূহ সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের মঙ্গল এই আন্দোলনের সহিত কিরূপ সংশ্লিষ্ট, তাহা অভিজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিবেন। এই কড়চা সম্পর্কে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় আমরা বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। তাহাদের বিচারেই প্রকৃত সত্য স্থাপিত হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।]

২০। তৎপর বর্ণনীয় প্রসঙ্গ। প্রভু সন্ন্যাস লওয়ার পর শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতগৃহ হইতে নীলাচল যাত্রা করিলেন। কোন্ পথে চলিলেন, তৎ সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবত বর্ণন করিতেছেন,—প্রভু শান্তিপুর হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিতে চলিতে চব্বিশ পরগণা আঠিসারা গ্রামে অনন্ত পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হন। তথায় একরাত্রি অবস্থান করিয়া গঙ্গার তীরে তীরে ছত্রভোগে আসিলেন। এই ছত্রভোগ একটি তীর্থস্থান। এই তীর্থটি বর্ত্তমান ২৪ পরগণা ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত খাড়ী নামক গ্রামে অবস্থিত। এখানে অম্বুলিঙ্গ শিব বর্ত্তমান। ইহার অদূরেই শতমুখী গঙ্গা প্রবাহিতা। এখানে গ্রামের অধিপতি রামচন্দ্র খান আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হন এবং প্রভুকে ভক্তগণ সহ শতমুখী গঙ্গা পার করিয়া দেন। ইহাই চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা, যথা :—

উত্তরিলা আসিয়া আঠিসারা নগরেতে ॥
যেই আঠিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম ॥
রহিলেন প্রভু আসি তাহার আলয়ে ॥

* * * *

ছত্রভোগ গেল প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে ॥
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিল নিকটে ॥
দেখিয়া হইল প্রভু আনন্দে বিহ্বল।

* * * *

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান ॥ ইত্যাদি (অন্ত্য, ২য়)

চৈতন্যচরিতামৃতও প্রভুর নীলাচল-গমনের এই পথই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা :—

গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে ॥
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ)

কিন্তু এই পথ সম্বন্ধে গোবিন্দ দাসের কড়চা বর্ণন করিতেছে, প্রভু কণ্টক নগরে সন্ন্যাস লইয়াই বর্দ্ধমান হইয়া গোবিন্দের গৃহ কাঞ্চন নগরে আইসেন ; তৎপর দামোদর পার হইয়া কাশী মিত্র নামক জনৈক ব্যক্তির গৃহে আতিথ্য

গ্রহণ করেন। তথা হইতে হাজীপুর হইয়া মেদিনীপুরের নিকটে উপস্থিত হন। তথা হইতে নারায়ণগড় আসিয়া ধলেশ্বর শিব দর্শন করেন। ইত্যাদি।*

প্রভুর নীলাচলের পথ-প্রসঙ্গে ভক্তিভাজন ৺শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, "যদি গোবিন্দের বর্ণনাই সত্য বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল মিথ্যা হইয়া যায়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ।

সংবাদ।

মহামহোপাধ্যায়। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল ভাগবতকুমার গোস্বামী, শাস্ত্রী, এম্, এ, পি, এইছ, ডি, মহোদয় হুগলী কলেজের অধ্যাপক; বাগনা পাড়ার গোস্বামি-বংশে তাঁহার জন্ম। সাধারণ-সংস্কৃত-শাস্ত্রে, বিশেষতঃ গোস্বামি-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। ইতিপূর্ব্বে ভক্তিধর্ম্ম-সম্বন্ধে ইংরেজীতে এক খানা অতি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইছ, ডি, উপাধিলাভ করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দেশেও বিশেষ গৌরব লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি বিগত ১লা জানুয়ারী তারিখে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দান করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অতি অল্প লোকেই "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি পাইয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত গৌরবজনক উপাধি। গোস্বামি-সন্তানের মধ্যে অপর কেহ ইতিপূর্ব্বে এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাই, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয়ের এই অসাধারণ গৌরবে সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ আপনাকে

*সন্ন্যাসের পরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রেমোন্মাদ-অবস্থায় তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে উপস্থিত হয়েন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য, ৪র্থ পরি), মুরারিগুপ্তের কড়চা (তৃতীয় প্রক্রম, তৃতীয় সর্গ) এবং কবিকর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য (১১শ সর্গ ৫৭—৬৮ শ্লোঃ)—এই তিন প্রাচীন গ্রন্থই এই উক্তি সম্বন্ধে একমত।—সম্পাদক।

গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের ন্যায়, তাঁহার সদাচার এবং ভজন-পরায়ণতাও আদর্শস্থানীয়। আমরা আশা করি, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন পূর্ব্বক বিভিন্ন দেশে ভক্তিধর্ম্মের গূঢ় রহস্য প্রচার করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন,—আর আদর্শ গোস্বামিরূপে বৈষ্ণব-সাধকগণের ভজনাদর্শ প্রকটিত করিয়া, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়, ভবিষ্যতেও বৈষ্ণব-সমাজের ধন্যবাদার্হ থাকিবেন —ইহাই শ্রীনিতাইচাঁদের চরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

কুম্ভ-উপলক্ষে ৩০শে ফাল্গুনে শ্রীএকাদশীতে শ্রীযমুনায় সমস্ত সাধুদের স্নান হইবে এবং দোলপূর্ণিমা দিন শেষ স্নান হইবে। ইহার পরে সাধুগণ হরিদ্বারে যাইবেন। হরিদ্বারে বৈশাখের তিন তারিখে পূর্ণিমার শেষ স্নান হইবে।

প্রভুপাদ ঃ পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া গেল প্রভুপাদের পাঠে অনাবিল-আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইতেছে।

শ্রী বিগ্রহের অন্তর্দ্ধান ঃ অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদিগকে জানাইতে হইতেছে, শ্রীপাটে খেতুরী হইতে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ কে বা কাহারা অপসারিত করিয়াছে।

সাধনার বৎসর শেষ হইয়া আসিল। যাঁহারা এখনও প্রথম বৎসরের মূল্য দেন নাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

(মাসিক-পত্রিকা)

সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা॥

১ম বর্ষ, } চৈত্র—১৩৩৩ { ১২শ সংখ্যা।

গৌড়চন্দ্র-শ্রীনিবাস আচার্য্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুরীতে।

এক চাঁদ বিনা সব আঁধারে,
পড়ি তারাগণ চারিধারে!
কেউ বা আছে কেউবা নাহি,
প্রাণ বিদরে পুরী চাহি!

অচল-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পুরী চিরকালই সৌষ্ঠবান্বিত; সচল ব্রহ্মের শুভাগমনে তাহার গৌরব আবার কোটি কোটি গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাস্তবিকই এই পুণ্যক্ষেত্রের ইতিবৃত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অবস্থান একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা। এই নিত্য মনোহর দৃশ্য-পটে যে অলৌকিকলীলা প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহা তৎকালীন ভাগ্যবান ভারতবাসিগণ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। সত্যকথা বলিতে গেলে, এই স্থলেই বৃন্দাবনের গুহ্য ব্যাপারের চরম হইয়াছিল—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে অচিন্তনীয় বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য শচীনন্দন

শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছিলেন, তাহা এখানেই পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার অবস্থিতির জন্য ভারতের বরেণ্য মহাপুরুষগণ এই ধর্ম্মকে সার করিয়া বসিয়াছিলেন। জীবের দিনগুলি এই জগতের উপর গণা কিনা বিশেষজ্ঞগণ বলিতে পারেন, তবে প্রভু গৌরমণি যে নির্দ্ধারিত ৪৮ বৎসরের জন্য জীবের স্থূল চক্ষুর গোচর হইয়াছিলেন, তাহা আমরা সাহস করিয়া ঘোষণা করিতে পারি। যেই তাঁহার গণা দিনগুলি শেষ হইয়া গেল, আর কথাটী নাই, অমনি তিনি ভিতর ঘরে প্রবেশ করিলেন, দেখিতে দেখিতে এই "নাই"রে হইয়া পড়িল। অনেকেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন। যাঁহাদের থাকিবার কথা, তাঁহারা থাকিলেন। যাঁহারা থাকিলেন, তাঁহাদের দশা বর্ণনা করিবার ভাষা আমাদের নাই, তবে এই মাত্র প্রকাশ করা যায়—তাঁহারা চৈতন্য-অভাবে জড়বুদ্ধিগণের দৃষ্টিতে জড়ের মত হইয়া পড়িলেন এবং ভক্তগণের দিব্য চক্ষে শ্রীবিগ্রহের মত প্রতিভাত হইলেন। প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের ভিতর স্বরূপ-দামোদরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাণপ্রিয়ের সন্ন্যাস হেতু তিনি উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া—সন্ন্যাসগ্রহণ-পূর্ব্বক কাশীবাসী হইয়াছিলেন।—এরূপ মর্ম্মী জীবন-সখাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাই তিনি তাঁহার গম্ভীরার অন্দরমহলের পরম দরদী বা দরদিনী হইয়াছেন। প্রভুর এবং তাঁহার এই স্বরূপের অন্তর্ধানে রঘুনাথ আর পুরীতে কেমন করিয়া দাঁড়াইবেন! অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনুসরণ করিবারও কথা নাই। তাঁহার কণ্ঠে মহাপ্রভুর ভাণ্ডার আছে। অনুগমনের প্রবল ইচ্ছা হইলেও, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়, তিনি থাকিতে বাধ্য। প্রভু এবং স্বরূপের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুরীর কার্য্যশেষ হইয়াছে, তাই শ্রীবৃন্দাবনের দিকে তাঁহার গতি হইল। গুরু-গৌরাঙ্গ তাঁহাকে শিলা প্রদান করিয়া গোবর্দ্ধনে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন এবং গুঞ্জাহার দ্বারা শ্রীমতীর শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি মনে করিলেন, এজীবনে আর প্রয়োজন কি,—গোবর্দ্ধন হইতে দেহপাত করিয়া দেখি, রাধারাণীর কৃপা পাই কিনা। তিনি এরূপ সংকল্প করিয়া মনোরথবেগে লক্ষ্যস্থলে ধাবিত হইলেন।

কাশীশ্বর এবং গোবিন্দের মধ্যে কাশীশ্বর পূর্ব্বেই প্রভুর আদেশ অনুসারে গৌরগোবিন্দ-বিগ্রহ লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, শ্রীগোবিন্দ না মরিয়া

কোনওরূপে জীবনধারণ করিতেছেন—প্রভুপাদোপাধান শঙ্কর ঘোষেরও সেই দশা। রসিক রামানন্দ বিরহরসার্ণবে হাবুডুবু খাইতেছেন। অতি বড় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাটী হইয়া পড়িয়া আছেন। মহারাজা প্রতাপরুদ্রের কথা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, প্রভুহীন পুরী তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িল, রামানন্দ সার্ব্বভৌম প্রভৃতির প্রবোধ-বাক্যও বিফল হইল, তিনি তাহার বড় সাধের শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া দূরে দূরে মাথা ভাঙ্গিতে লাগিলেন। শিখিমাইতি এবং তাঁহার ভগিনী বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবী দেবীর সরস আবাস বিরস হইয়া পড়িয়াছে,—অবশ্য অশ্রুরসের অভাব নাই, তাহাতে একরূপ ভাসমান বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেই তাণ্ডবনৃত্যের পদ আছে বটে, কিন্তু আর সে নৃত্য নাই, খঞ্জের মত পড়িয়া আছেন। যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা গিয়াছেন, যাঁহারা এখনও যান নাই, তাঁহারা "আছে ও নাই" এর মধ্যে। পুরীতে এখন কোনটী দারু-বিগ্রহ আর, কোনটী নরবিগ্রহ স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে যেন এখন সবই বিগ্রহ, তাঁহারা চৈতন্যহীন হইলেও জড়ের মত অচেতন নহেন, সেখানে ভাবরাজ্যের শোক-দুঃখ বিলাপ বিমর্ষ প্রভৃতি যেন মূর্ত্তিধারণ করিয়া এক মহা বিয়োগান্ত নাটক প্রকটিত করিতেছে।

কিন্তু এই নাটকের যিনি মূল নায়িকা, তাঁহার কথা শেষে বলিব বলিয়া রাখিয়া দিয়াছি, এ বড় বিচিত্র কথা। অন্য নাটকে স্ত্রীলোক নায়িকা হন, কিন্তু আমাদের এই চৈতন্যনাটকে পুরুষই নায়িকা হইয়া বসিয়াছেন। ইনি আমাদের সেই চিরকুমার শ্রীগদাধর, যিনি জীবনে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত কিছুই জানেন না। গোরাকে যদি আমরা গদাই এর পতি উপপতি নাগর নায়ক প্রভৃতি বলি, তবে কোনটীই অশোভনীয় হয় না। বৃন্দাবনের দিকে চাহিয়া মহাত্মারা তাঁহার ভিতর রাজনন্দিনী প্যারীর সাড়াশব্দ পান, আমরা বলি তথাস্তু। গৌরের ভিতর যখন কৃষ্ণ আছেন, তখন তাঁহার রাজনন্দিনীর শব্দ উঠিবেই ত—শ্রীরাধাঠাকুরাণী গিরিধারী কৃষ্ণকে যেরূপ ভালবাসেন, গদাধর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহার চেয়ে কম ভালবাসেন না। কোন কোন মহাত্মা আবার তাঁহার ভিতর ললিতা সখীর গন্ধ প্রাপ্ত হন, আমরা বলি তাঁহাদের নাসিকাও মিথ্যা সংবাদ দান করেন না। গৌরকৃষ্ণ যখন গৌরাঙ্গীর ভাবে বিভাবিত, তখন তিনি রাধা বলিয়াই গণ্য হন, তখন গদাধর যে ললিতার অভিনয় করিবেন, ইহা অসঙ্গত হইতে পারে না।

ললিতা শ্রীমতীর যেরূপ কাজে লাগিয়াছেন, এই পুরুষবেশধারী তাম্বূলসেবার অধিকারী মাধবনন্দনও ললিতার নীচে নামেন নাই, বরং এক কাঠি উপরেই উঠিয়াছেন। গোরার এই গদাই প্রীতির তুলনা কোথায়? তিনি তাঁহার গোরার জন্য সব করিতে প্রস্তুত,—এমন কি গোপীনাথের সেবা, ক্ষেত্র-সন্ন্যাস প্রভৃতি সমুদ্রের জলে চিরকালের মত ভাসাইয়া দিয়াও তাঁহার গোরা যে দেশে যায়, সে দেশে যাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এহেন গদাধর তাঁহার নায়কের সহিত যাইতে পারেন নাই। তিনি যে শ্রীমদ্‌ভাগবত গৌরহরিকে শুনাইতেন, তাহা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। ভাগবতই প্রভুর ধর্ম্ম, সহধর্ম্মিণী গদা সে ধর্ম্ম প্রভুর নির্দ্ধারিত যোগ্যপাত্রের হস্তে সমর্পণ না করিয়া পৃথিবীর উপর হইতে উঠিয়া যাইতে পারেন না। গেলে তাঁহার সুখ হয় বটে, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা-সেবা পালন হয় না। সেবাই সেবকের ধর্ম্ম—নিজের সুখ দুঃখ অন্বেষণ নহে। তাই বিরহ-দুঃখে জর জর হইয়াও, গদাধর ভাগবত ধর্ম্মকে যোগ্যপাত্রে দান করিবার জন্য পথ-পানে চাহিয়া আছেন। পাঠক! এখন সন্ধান করিয়া দেখুন, এই যোগ্যপাত্র কে?

আমরা এখন আমাদের পাত্রের নিকট যাই। তিনি কখন কোথায় কি আহার করিয়া চলিলেন, তাহা বলা বড় কঠিন, তবে তিনি যে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তি-প্রকাশপূর্ব্বক নামাবলী গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, ইহা সকলেই দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চূড়াদর্শন করিয়া প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার কপাল ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল, দৌড়িতে দৌড়িতে তিনি সূর্য্যের সহিত পারিয়া উঠিলেন না, সে মর্ত্তভূমি অন্ধকার করিয়া অস্তাচলে প্রবেশ করিল, কিন্তু অন্ধকার তাঁহার কি করিবে, যিনি শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া ভগবান এবং ভক্ত-সঙ্গমে ধাবিত হইয়াছেন?

প্রথমে নরেন্দ্রসরোবর দেখিয়া তিনি আর চলিতে পারিলেন না—"হা হা প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া বসিয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার মন বসিয়া পড়িল না, তাহাতে অনেক কথা জাগিয়া উঠিল, যাহা ভিতরে জাগিল তাহা এই ভক্ত-ভগবান-সঙ্গম স্থলে যেন প্রত্যক্ষ-গোচর হইল—প্রেমের বালক শ্রীনিবাসকে অনেকক্ষণ সেই প্রেমের সরোবর-তীরে গড়াগড়ি দিতে

হইল। সেখান হইতে কোনরূপে উঠিয়া রাত্রিতেই সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখন অসময়, শ্রীমন্দিরের দ্বার পড়িয়া গিয়াছে, ঠাকুর ভিতর ঘরে আছেন। ভোকে কিছু হউক না হউক, শোকে শ্রীনিবাস এক ধারে পড়িয়া রহিলেন, এমন সময় একজন মহাপ্রসাদ লইয়া উপস্থিত। তিনি বলিয়া উঠিলেন "জগন্নাথের এই আনন্দবাজারে কেহ উপবাসী থাকে না, "এই প্রসাদ গ্রহণ কর।" প্রসাদ রাখিয়া দাতা চোখের পলকে কোথায় চলিয়া গেলেন। আনন্দে বিহ্বল হইয়া অনাহারী অতিথি শ্রীজগন্নাথের দ্বারে সেই প্রথম নিশাতেই মহাপ্রসাদ যে কি অপার্থিব বস্তু তাহা তাঁহার সবই রসনায় আস্বাদন করিলেন। অজ ভব-বাঞ্ছিত সেই সুদুর্লভ দ্রব্য লাভে তাঁহার জিহ্বা অন্য দিনের চেয়ে যেন বেশী রকম নাচিয়া উঠিল, কৃষ্ণ-নাম জোরে জোরে আসিতে লাগিল, তিনি সেই জগন্নাথের সিংহদ্বারে পড়িয়া জগন্মঙ্গল হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্কীর্ত্তনের গুণে একরূপ নিদ্রা আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। এ কিরূপ নিদ্রা? বদ্ধজীব যে নিদ্রার অধীন হয়, তাহা তমোগুণ-জাত, সে নিদ্রায় মায়ারাজ্যের নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে হয়। বহির্ম্মুখ বদ্ধজীব দূরের কথা, যে সব ভক্তের ভিতর নিগুর্ণা-ভক্তির উদয় হয় নাই, সেই সব সগুণ ভক্তও ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কিছু চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াও আজে বাজে নানাবিধ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, ভক্তিদেবীর কৃপায় কখন কখন তাঁহারা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কিছু দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা নিগুর্ণা-ভক্তিতে অধিকারী, তমোগুণজাত নিদ্রা তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে থাকে। তাঁহাদের নিকট যোগনিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই বাঞ্ছনীয় নিদ্রায় ভগবান কিম্বা ভগবৎ-রাজ্যের কিছু না কিছু দর্শনে তাঁহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে। কোন্ ভক্তের কতদূর দৌড়, তাহা এই নিদ্রা এবং স্বপ্ন হইতেই অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। শ্রীনিবাসের স্বপ্ন দেখিয়া সুধীগণ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তিনি কোন্ দেশের লোক। পথে আমরা তাঁহার স্বপ্ন দেখিয়াছি, এখন সিংহদ্বারে দেখিয়া কৃতার্থ হই। যে-ই তাঁহার চক্ষু নিমিলিত হইল, অমনি ভিতরের দ্বার মুক্ত হইল। তিনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরিকরগণের সহিত বিরাজ করিতেছেন,—সম্মুখে তাঁহার গদাধর ভাগবত পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন, তিনি আবার নয়নে বুক ভাসাইয়া শ্রবণ করিতেছেন।

শ্রবণকীর্ত্তনমূলক সেই ভাগবত-ধর্ম্মের মহাসভায় ভগবান্ এবং ভক্তগণকে দেখিয়া, তিনি জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অভাবনীয় ভাবাবলী দর্শনে অবাক্ হইলেন, স্বপ্ন অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার দুঃখ বেশী হইল ত কম হইলনা, তিনি জাগিয়া জাগিয়া আবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। আবার নিদ্রা আসিল,—আর একটী দৃশ্য-পট দৃষ্টিগোচর হইল, তিনি দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়কন্দরের গৌরসিংহ ভক্তগণের সঙ্গে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া হরিনাম করিতে করিতে সিংহদ্বারের দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন,—তাঁহার শ্রীমুখ হইতে প্রিয় শ্রীনিবাসের প্রতি আশার বাণী হইল—"তুমি কেন বৃথা কাঁদিতেছ? তোমার হৃদয়-কমলে আমি যে দিবানিশি বাঁধা আছি, তোমার দ্বারা আমার বিশেষ কাজ আছে, তোমার জন্য আমার প্রাণাধিক গদাধর ভাগবত বুকে করিয়া পড়িয়া আছেন,—যাও তাঁহার নিকট যাও, মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" স্বপ্ন-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই নিশা-ভঙ্গ হইল। চেতন পাখী চৈতন্যদাসের দৈবপ্রাপ্ত পুত্রটীকে আশার বার্ত্তা শুনাইয়া দিল। ভাগ্যবান্ স্বপ্নদ্রষ্টা স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সম্পাদনে মার্কণ্ড সরোবরে চলিলেন। সেখানে নিয়মিত কার্য্য শেষ করিয়া তিনি গদাধরের পথে উঠিলেন। সমুদ্রধারে তাঁহার আশ্রম, সেখানে শ্রীমান্ গোপীনাথ আছেন। গদাধর শ্রীমতীর মত তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। পথে একজন বহুদর্শী বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পণ্ডিত গদাধরের তত্ত্ব লইলে তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তাহার অনুমান হইয়াছিল—আগন্তুকের ভিতর চৈতন্যশক্তি বর্ত্তমান, নতুবা তাঁহার এত আকর্ষণ কেন? তাঁহাকে যে বুকের ভিতর চাপিয়া চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করিতেছে। সে যাহা হউক, তিনি আনন্দের সহিত আগন্তুককে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ এর প্রীতিকুঞ্জে তুলিয়া দিলেন। তাঁহার বাহ্যদৃশ্যেই শ্রীনিবাস গলিয়া গেলেন, ভিতরে রাসরসারম্ভী বংশীধারী গোপীনাথকে দেখিয়া তিনি কদলী তরুর মত নিপতিত হইলেন। যিনিই তাঁহাকে দেখিলেন; তাহার চিত্তটী তাঁহার নিকট চলিয়া গেল। তিনিই আচম্বিতে বলিয়া উঠিলেন—"এই কি সেই?"—অনেকের চক্ষু এই একের উপর পড়িল, পরিচয় পাইয়া আবার কেহই আর তুলিয়া লইতে পারিলেন না। কিন্তু যাঁহার জন্য ছুটাছুটি, সেই গোরার তিনি কোথায়? তিনি সেখানে—যেখানে জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, তিনি বসিয়া আছেন বটে, তাঁহার পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার

সম্মুখে আছেন ইহাও সত্য, আবার শ্রীগ্রন্থখানি যে তাঁহার চক্ষের জলে ভিজিয়া গিয়াছে ইহাতেও কাহারও মিথ্যা বলিবার উপায় নাই, তবে তিনি কোন দেশে গিয়াছেন তাহা কে বলিবে? বাহিরের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিলনা, হইল;—বাহিরে শ্রীনিবাসের আগমনে তাঁহারও একটু বাহ্যজ্ঞান আসিল, তিনি তাহার চির সজল নয়ন তুলিয়া চাহিলেন, অবসর বুঝিয়া সংবাদদাতা দৈন্সভরে নিবেদন করিল;—"চাখন্দীর চৈতন্যদাসের পুত্র শ্রীনিবাস দ্বারদেশে উপস্থিত।" শ্রীনিবাসের নাম শুনিয়া আশাতুর পণ্ডিত দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন, সংবাদদাতা আগন্তুককে তাঁহার সম্মুখে লইয়া গেল। শ্রীনিবাস দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন;—পণ্ডিত স্নেহময়ী জননীর মত দুই হস্তে তাহাকে বক্ষদেশে ধারণ করিলেন, সে করুণ দৃশ্যটী যিনি দেখিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কে তাহা দূরে দূরে থাকিয়া বর্ণনা করিতে সক্ষম হইবে? গদাধরের স্পর্শে শ্রীনিবাসের ভিতর কি যেন কি প্রবেশ করিল, তিনি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রসাদে নিরাশ-শ্রীনিবাস এক নূতন আশায় নাচিয়া উঠিলেন। ক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই রটিয়া পড়িল,—জগন্নাথের যিনি বরপুত্র, মহাপ্রভুর যিনি ভবিষ্যতের আশা, সেই চৈতন্যদাস-তনয় শ্রীনিবাসের শুভাগমন হইয়াছে। ভক্তগণ প্রভুর বিরহে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাঁহার শক্তিসম্পন্ন কৃপা-পাত্রটীকে দর্শন করিবার জন্য চক্ষু উন্মিলন করিলেন। শ্রীনিবাস পণ্ডিত-গোস্বামীর লোকের সহিত একদিক হইতে প্রভু-ভক্ত দর্শন করিয়া চলিলেন। ভক্তগণের এতদিনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইল, শ্রীনিবাসের ভিতরে তাঁহারা তাঁহাদের ছিত্ত-চোরার বিদ্যমানতা বিশেষভাবে অনুভব করিলেন, তাঁহাদের সর্ব্ব ইন্দ্রিয় সেই অলৌকিকদর্শন বালকটীর প্রতি আকৃষ্ট হইল, তিনি প্রণাম করিতে না করিতেই, সকলে দুই হাতে তুলিয়া বুকের ভিতর লইলেন। সকলেই প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"আমাদের প্রভুর যে কার্য্য বাকী আছে—তোমার দ্বারা সুসম্পন্ন হউক।" কি ছোট কি বড় প্রত্যেক ভক্তস্থানেই একই ব্যাপার, একই কথা, তাই কাহারও নাম উল্লেখ করিলাম না, যাঁহারা সেই সময় বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ভক্তদর্শন যেরূপ, ঈশ্বরদর্শনও সেইরূপ, জগন্নাথ সুভদ্রা বলভদ্রের হাসি যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল, তিনি কি দেখিতে কি দেখিয়া

কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু গরুড়স্তম্ভের তলে কি একটী দর্শন করিয়া, তিনি আর একবারেই স্থির থাকিতে পারিলেন না, পূজারী আবার তাঁহার ভিতর কাহার যেন আভাস পাইয়া মালাপ্রসাদ লইয়া তাঁহার নিকট ছুটিলেন।

ভিতর ঘরে গদাধরের সহিত তাঁহার কত কি হইল তাহা আমরা সব বলিতে পারি না, তবে দুই একটী কথা বাহির হইয়া পড়িল। পণ্ডিত বলিলেন—"বৎস, আমার বড় সাধ ছিল, তোমাকে ভাগবত পড়াইব, কিন্তু তাহা আর হইল কই? তোমার ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা হইবে শ্রীবৃন্দাবনে। তবে যে ভাগবত শুনিয়া প্রভু আমার কাঁদিতেন এবং প্রভুর অশ্রুতে অনেক স্থলে যাহার বর্ণ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে, সেই প্রেমময় ভাগবতখানি তোমাকে দিবার জন্য বসিয়া আছি।" এই বলিয়া তিনি ভাগবতখানি বাহির করিলেন। আমরা জানি না, গদাধরের সেই ভাগবতের ভিতর কি আছে, শ্রীনিবাস দূর হইতে দেখিয়াই বান আনিলেন, স্পর্শে তাঁহার যাহা হইল তাহা হইলই, তিনি বুকে ধরিয়া যেন কোন রাজ্যে চলিয়া গেলেন। গৌরগদাধরের প্রেমাশ্রুসিক্ত সেই দুর্লভ শ্রীমদ্ভাগবত লাভে তাঁহার অন্তঃকরণে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। প্রেমিক দাতা কেবল শ্রীগ্রন্থরত্ন দান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, অনেক গুহ্যাদপি গুহ্য ভাগবত রহস্য তিনি প্রকাশ করিয়া দিলেন, সন্দেহের স্থলগুলি ঠিকভাবে ভাঙ্গিয়া দিলেন, ভাগবতরাজ্যে প্রবেশ করিবার যে চাবিটা গৌরচন্দ্র তাঁহার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহা এই উদীয়মান গৌড়চন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গদাধরের অসাধারণ প্রীতিতে শ্রীনিবাস বাঁধা পড়িয়া গেলেন, তাঁহার আর তাঁহার পাদপদ্ম ছাড়িয়া কোথায়ও একপদও যাইতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু গদাধরের ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। তাঁহার নিজের কোনও ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই, গৌরের যেরূপ ইচ্ছা, তাঁহারও সেইরূপ ইচ্ছা। তিনি শ্রীনিবাসকে আদেশ করিলেন—"তোমাকে এখানে থাকিলে চলিবে না, তোমাকে বৃন্দাবনে যাইতে হইবে, সেখানে তোমার দীক্ষা শিক্ষা হইবে, তোমার জীবনের কর্ত্তব্য কি, সেখানে জানিতে পারিবে। প্রথমে যাও গৌড়ে, তারপর যাইও বৃন্দাবনে।" ঠাকুর নরহরি, গদাধর দাস প্রভৃতি—যাঁহারা ধিকি ধিকি করিয়া গৌরভূমিতে জ্বলিতেছেন, তাঁহাদের নিকট তিনি তাঁহাদের প্রাণের কথা বলিয়া দিলেন। কিন্তু এই আদেশে শ্রীনিবাসের বড় কষ্ট হইল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রকট

ভাবে না পাইলেও তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীস্বরূপ গদাধরকে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। তার পর পুরীতে রামানন্দ রায় পরমানন্দপুরী প্রমুখ প্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের অনেকেই বর্ত্তমান। তিনি এই সকলের সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহার বড় আশা। তাঁহার মনের সে আশা মনেই থাকিল, তাঁহাকে গদাধরের তথা গৌরের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইল। কিন্তু তাঁহার বিদায় গ্রহণ যেন বিসর্জ্জনের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তিনিও ভক্তগণকে ছাড়িতে পারেন না, ভক্তগণও তাঁহাকে ছাড়িতে পারেন না,—তিনি প্রত্যেকের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া এবং প্রত্যেককে কাঁদাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রভুর কার্য্যের জন্য ভক্তগণ তাঁহাকে যাঁহার যত সাধ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অনিচ্ছায় বিদায় দিলেন। তিনি জগন্নাথের দ্বারে মাথা ভাঙ্গিয়া শেষ বিদায়ের জন্য গদাধরের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিবাস পণ্ডিত-গোঁসাই এর নিকট কিরূপ ভাবে বিদায় হইলেন, সে বিষয়ে আমরা নীরব থাকিব। গৌরচন্দ্রের প্রস্থানের পর, ভক্তগণ বিলাপ করিয়া করিয়া বিগ্রহের ন্যায় ঘরে ঘরে বসিয়া-ছিলেন, আমাদের গৌড়চন্দ্র আসিয়া তাঁহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, তাঁহারা আবার পূর্ব্বজীবনের সাড়া দিতে বসিয়াছিলেন। পুরী হইতে তাঁহার প্রস্থানের পর তাঁহারা আবার অন্তর্দশা লাভ করিলেন। যাঁহারা সচলব্রহ্মের ক্রীড়াপুত্তলিকা, অচলব্রহ্ম তাঁহাদিগকে কিরূপে চালাইবেন? তিনি যেরূপ দারুরূপে শ্রীমন্দিরে রহিলেন, তাঁহারা নররূপেই, সেইরূপ মৌনমুদ্রা অবলম্বন করিলেন। আমরা সকলকেই প্রণাম করিয়া এখন আমাদের শ্রীনিবাসের অনুসরণ করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।

জিজ্ঞাসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮।৬৫

"অর্জ্জুন! আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এইরূপ করিলেই আমাকে পাইবে।" ইহা ভক্তি-সম্বন্ধে **অন্বয়-বিধি।**

ভক্তি-সম্বন্ধে ব্যতিরেক-বিধিও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

শ্রীভা, ১১।৫।৩

"চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা আত্মপ্রভব সাক্ষাৎ ঈশ্বর-পুরুষকে (না জানিয়া) ভজন করেন না, কিম্বা (জানিয়াও ভজন করেন না বলিয়া) অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়েন।"

পারং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ যদি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধম॥

"যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ অবগত হইয়াছেন, তিনিও যদি সর্ব্বেশ্বরে ভক্তিযুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহাকেও পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।"

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্যকৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ শ্রীভা, ১০।২।৩২

"হে কমল-নয়ন! তোমার প্রতি ভক্তির অভাব বশতঃ অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি যে সমস্ত লোক নিজেদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা তাঁহারা পর-পদ প্রাপ্ত হইয়াও তোমার চরণকমলের অনাদরহেতু অধঃপতিত হয়।"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও বলেন,

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

এই সমস্তই ভক্তি-সম্বন্ধে **ব্যতিরেক-বিধি।**

ভক্তির **অন্য-নিরপেক্ষতাও** আছে। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিতে ভক্তির অপেক্ষা আছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু ভক্তি, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির কোনও অপেক্ষাই রাখে না। ভক্তিরাণী স্বতন্ত্রা, স্বতঃই পরম-শক্তি-শালিনী।

ভক্তি বিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥ চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৬৫

কর্ম্মদ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা, দানধর্ম্ম দ্বারা, বা তীর্থযাত্রা-ব্রতাদি দ্বারা যাহা কিছু ফল পাওয়া যায়, কেবল ভক্তি দ্বারাই সেই সমস্ত ফল পাওয়া যাইতে পারে; ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভক্তিদ্বারা স্বর্গও পাইতে পারেন, মুক্তিও পাইতে পারেন, ভগদ্ধামে ভগবচ্চরণ-সেবাও পাইতে পারেন।

যৎকর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।

—শ্রীভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩

শ্রীমদ্‌ভাগবত আরও বলেন,

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ১১।১৪।২১

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিতেছেন—"আমি সাধুদিগের প্রিয় আত্মা; শ্রদ্ধার সহিত আমাতে অর্পিত একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আমি বশীভূত হই।"

এই বাক্যের "একয়া ভক্ত্যা" শব্দেই প্রমাণিত হইতেছে যে,ভক্তি অপর কিছুর সাহচর্য্যই অপেক্ষা করেনা।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তির ফল ভগবদনুভব লাভ করিতে হয়তো জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা না থাকিতে পারে; কিন্তু ভক্তির সাধনে জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা আছেকিনা? তাহাও নাই।

তস্মান্মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ ভবেদিহ॥

শ্রীভাঃ ১১।২০।৩১

এই শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। মঃ ২২।৮২

ভক্তির উন্মেষের পক্ষেও ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। ভক্তি অহৈতুকী ; ভক্তি হইতেই ভক্তির উন্মেষ।

ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥

এক্ষণে বুঝা গেল, ভক্তি সর্ব্ববিষয়েই অন্যনিরপেক্ষা, স্বতন্ত্রা।

ভক্তির **সার্ব্বত্রিকতা**ও আছে। যে কোনও লোক ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার। চৈঃ চঃ ৩।৪।৬৩

মানুষ মাত্রেরই যে শ্রীকৃষ্ণভজনে অধিকার আছে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতেও তাহা জানা যায়।

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা। পূঃ ২।৩৩

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইহার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়,

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কসা

আভীর-শুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।

যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ

শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

শ্রীভাঃ ২।৪।১৮॥

"কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খসাদি যে সকল পাপজাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপস্বরূপ, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভক্তকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার।"

মনুষ্যের কথা তো দূরে, কীট-পশু-পক্ষী-আদিও ভক্তির প্রভাবে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে।

কীট-পক্ষি-মৃগাণাঞ্চ হরৌ সংন্যস্ত-কর্ম্মণাম্।

ঊর্দ্ধামেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥

—গরুড়পুরাণ।

"হরিতে সংন্যস্ত-কর্ম্মা কীট, পক্ষী এবং মৃগগণও ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে, জ্ঞানিব্যক্তিদের সম্বন্ধে আর কথা কি ?"

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—শিবানন্দ-সেনের কুক্কুর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শব্দ উচ্চারণ করিত; শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন ঝারিখণ্ড পথে শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার কৃপায় বনবাসী সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তুও কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিয়া প্রেমে মত্ত হইয়াছিল। নারদের কৃপায় এক ব্যাধ কিরূপ কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীচরিতামৃত-পাঠকগণ অবগত আছেন।

সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিতো ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারেনই, অপিচ দুরাচার ব্যক্তিও পারেন।

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতোহি সঃ॥
—গীতা ৯।৩০

"যিনি অন্যদেবতার আশ্রয় ত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার ভজনই করেন, সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে; কারণ,তিনি সম্যগ্‌ব্যবসিত অর্থাৎ আমাতে একান্ত-নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ আশ্রয়কে তিনি অবলম্বন করিয়াছেন।"

সমস্ত অবস্থায়ই ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়। প্রহ্লাদাদি গর্ভাবস্থায়, ধ্রুবাদি বাল্যে, অম্বরীষাদি যৌবনে, যযাতি-আদি বার্দ্ধক্যে, অজামিলাদি মৃত্যু-সময়ে, চিত্র-কেতু-আদি স্বর্গগতাবস্থায় ভজন করিয়াছিলেন। নরকে অবস্থান-কালেও ভজন-ক্রিয়া চলিতে পারে।

যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি চ নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥

"যেখানে যেখানে নরকবাসিগণ শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তাঁহারা হরিভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্র দশাতে ব্যাপ্তি যার॥

জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় সিদ্ধিলাভেও (ভগবৎ-প্রাপ্তিতেও) ভক্তির বিরতি নাই; ভক্তিমার্গের সাধক সিদ্ধদেহে ভগবদ্ধামেও ভক্তির অনুষ্ঠান (ভগবৎ-সেবা) করিয়া থাকেন।

মৎসেবয়া প্রতীতং যে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
—শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৭

এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

ভক্তির অনুষ্ঠানে স্থানাস্থানেরও নিয়ম নাই,

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥

"শ্রীহরি-নাম-সম্বন্ধে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই; যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানেই শ্রীনাম গ্রহণ করা যায়; উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই।"

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥
—শ্রীভা, ২।২।৩৬

"সকল লোকই সকল সময়ে এবং সকল স্থানে শ্রীহরির নাম-গুণাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে।"

এই সমস্ত প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তির সার্ব্বত্রিকতাও আছে, সদাতনত্বও আছে।

এক্ষণে দেখা গেল, নিশ্চয়তার সমস্ত লক্ষণই ভক্তিতে বিদ্যমান্; সুতরাং একমাত্র ভক্তিই ভগবদনুভবের নিশ্চিত উপায়।

ভক্তি যে ভগবদনুভবের নিশ্চিত উপায়, তাহা স্থির হইল; কিন্তু ভক্তিদ্বারা যে ভগবদনুভব লাভ হয়, তাহা যথার্থ অনুভব কি না, তাহা বিবেচ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীভগবানের মাধুর্য্যানুভবই যথার্থ অনুভব। কিন্তু মাধুর্য্য-অনুভবের উপায় কি? ভক্তি-শাস্ত্র বলেন, মাধুর্য্য-অনুভবের একমাত্র উপায়—প্রেম।

প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ চৈঃ চঃ ১।৪।৪৪
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবানন্দপ্রাপ্তির কারণ ॥ চৈঃ চঃ ১।২।[illegible]

এই প্রেম লাভ করিবার একমাত্র উপায় আবার ভক্তি।

সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥ চৈঃ চঃ ২।১৯।১৫১

এবে সাধন-ভক্তির কথা শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥ চৈঃ চঃ ২।২২।৫৫

এই সমস্ত প্রমাণে দেখা গেল—ভক্তি হইতে প্রেম লাভ হয়, এবং প্রেমই ভগবানের মাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র হেতু; সুতরাং ভক্তিই হইল ভগবানের মাধুর্য্য-আস্বাদনের বা যথার্থ ভগবদনুভবের একমাত্র উপায়। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভা, ১১।১৪।২১

এবং তিনি আরও বলিয়াছেন,

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ গীতা ১৮।৫৫

"স্বরূপতঃ আমি যেরূপ, আমার বিভূতি ও গুণাদি যাহা যাহা আছে, নির্গুণা-ভক্তিদ্বারাই তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। মৎ-পর-ভক্তি হইতে আমার সম্বন্ধে যাথাত্ম্য বস্তুজ্ঞান জন্মিলে জীব আমার সহিত যুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ আমার স্বরূপকে লাভ করিতে পারে।"

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি দ্বারাও ভগবদনুভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যথার্থ অনুভব বা মাধুর্য্যের অনুভব লাভ হয় না।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা॥

শ্রীভা, ১১।১৪।২১

শ্রীভগবান্ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির বশীভূত নহেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,

ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যাজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥ ২।২০।১২১

ভক্তিও আবার সাধারণতঃ দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানময়ী ভক্তি এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা কেবলা ভক্তি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী-ভক্তির অনুষ্ঠানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়

প্রেমের উদ্ভব হয়—তাহার ফলে, সাধক সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে পারেন এবং শ্রীভগবানের নারায়ণ-স্বরূপের সেবা করিতে পারেন।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায়, চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥ চৈঃ চঃ

আর ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীনা কেবলা ভক্তিতে ব্রজপ্রেমলাভ হইতে পারে এবং মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবালাভ হইতে পারে। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ-স্বরূপ অপেক্ষা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে মাধুর্য্য অনেক বেশী; তাই শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত লালসান্বিতা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের এমনই একটা স্বাভাবিকী শক্তি আছে, যাহা—অন্যের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া উঠায়।

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নর-নারী করয়ে চঞ্চল॥ চৈঃ চঃ

শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়—শুদ্ধ নির্ম্মলপ্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল প্রেম—যাহা একমাত্র শুদ্ধাভক্তি হইতেই লাভ করা যায়। সুতরাং ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনের বা শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ-অনুভবের একমাত্র উপায়।

তাহা হইলে বুঝা গেল—ভক্তিই জীবের মুখ্য জিজ্ঞাস্য এবং ভক্তির কথাই শ্রীগুরুদেবের চরণে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

কান্তাপ্রেম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অন্যদিক দিয়াও ব্রজদেবীগণের আস্বাদনের উৎকর্ষ দেখান যাইতে পারে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নবকিশোররূপে লাভ করিয়াছিলেন। যেরূপ ইহ জগতে দেখা যায়, মানবের যৌবনাগমে অঙ্গের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ

অপ্রাকৃত চিন্ময়-রসে যাঁহার তনু-নির্ম্মিত, যিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি, তাঁহার কৈশোর-কালে যে কি অপূর্ব্ব, অপার্থিব রূপ-মাধুর্য্য বিকশিত হইয়াছিল, তাহা কেবল—যাঁহারা তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রেম-বিভাবিতনেত্রে দর্শন করিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। সখ্যের কাল বাল্য ও পৌগণ্ড বয়সে মা যশোদা কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যময়ী প্রীতিদ্বারা আনন্দাস্বাদন করিয়াছেন; কিন্তু কিশোরবয়সের যে অপ্রাকৃত রস—যাহাদ্বারা শ্রীরাসলীলাদি হইয়াছিল—তাহা কেবল গোপীরাই সম্ভোগ করিয়াছিলেন। যদিও—যেমন অবয়বীর সহিত অবয়বের ভেদ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ ধর্ম্মীর সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ-ত্যাগ সম্ভব নহে, কিশোর—ধর্ম্মী, অন্যান্য-ধর্ম্ম বাল্য-পৌগণ্ডাদির মধ্যেও অনুস্যূত ছিল—কিন্তু তাহার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয় নাই। কান্তাপ্রেমে নিখিল-ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মীর আস্বাদন হয় বলিয়া সকল জাতীয় প্রেমাপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। সেই জন্যই কবিরাজগোস্বামী বলেন "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে" অর্থাৎ যিনি যে রসের সাধক, তিনি সেই রসে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করেন। কিন্তু অন্যান্য রসে মধুররসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিখিল গুণ-রাশির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয়না বলিয়াই কান্তাপ্রেমের গৌরব। চন্দ্র সর্ব্বদাই পূর্ণ হইলেও যেমন প্রতিপদ হইতে কলা কলা বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণিমার ষোড়শ কলায় পূর্ণাভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সদা পূর্ণ হইলেও মাধুর্য্যময়ী কান্তা-প্রীতিতেই তাঁহার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পূর্ণাভিব্যক্তি হয়।

এইজন্যই সম্বিৎমূর্ত্তি শ্রীউদ্ধবের মত মহাভাগবতও ব্রজদেবীগণের সৌভাগ্য বর্ণনা করিতে ভাষা খুজিয়া পান পান নাই—এবং তাঁহারা যে প্রসাদ-বিশেষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যে কাহারও, এমনকি শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও লাভ হয় নাই তাহা,—

> "নায়ং শ্রিয়োঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
> স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
> রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
> লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীনাম্।" ১০।৪৭।৫৩

ইত্যাদি বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন; ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীলক্ষ্মী-দেবী—যিনি নারায়ণের নিজ বক্ষোবিলাসিনী, তিনিও ব্রজবালাগণের মত

শ্রীভগবানকে আস্বাদন করিতে পারেন নাই, কারণ, তাঁহার ঐশ্বর্য্যাবরণযুক্ত তদীয়তাময় বিপ্রলম্ভশূন্য প্রেম—ব্রজসুন্দরীগণের মাধুর্য্যপূর্ণা স্বীয়তাময়ী প্রীতির নিম্নস্থান অধিকার করিবে, ইহা বলা বাহুল্য। প্রেমের দুইটী কলেবর—মিলন ও বিরহ—শ্রীলক্ষ্মীর বিরহ নাই, তাই তাঁর প্রেম অঙ্গহীন। এই মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীভগবান্ যে সকল লীলা-বিলাসাদি করিয়াছিলেন, তাহা যদি কেহ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে, তবে তাহার অচিরাৎ হৃদ্রোগ নষ্ট হইয়া শ্রীভগবচ্চরণে পরাভক্তি লাভ হইবে। ইহা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীরাসলীলার ফলশ্রুতিতে বলিয়াছেন। ইহা হইতেও পবিত্রতর বস্তু আর কি হইতে পারে? যে সকল ব্রজবধূর লীলা-শ্রবণে কাম নষ্ট হয়, তাঁহারা যে স্বয়ং প্রেম-স্বরূপিণী ইহা কি আর বলিতে হইবে?

এই সকল ব্রজবালাগণ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসিদ্ধা শক্তি, তাহা শ্রীভাগবতে বহুস্থানে কথিত হইয়াছে। যথা—

'রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ' ১০।৩৩।১৭

অর্থাৎ বালক যেমন আপন প্রতিবিম্ব বা ছায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ ব্রজগোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এখানেও তাঁহাদের শ্রীভগবানের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন প্রতিবিম্ব বিম্বকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারেনা, অথচ উহা যে বিম্বের সহিত একই, তাহা বলা যায় না—সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে। এই দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবান্ অন্য কোন নারীর সহিত ক্রীড়া করেন নাই—তিনি স্বীয় শক্তির সহিতই ক্রীড়া করিয়াছিলেন। কারণ, যিনি আপ্তকাম, তাঁহার প্রাকৃত বিহারাদি যে হইতেই পারেনা ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যেমন পঙ্কদ্বারা কখনও পঙ্কক্ষালন সম্ভবপর নহে, সেইরূপ প্রাকৃত কামলীলা শ্রবণ দ্বারা কখনও কাম নাশ হইতেই পারে না, এবং যাহা স্বরূপতঃ তরল-পদার্থ নহে, তাহাদ্বারা যেমন ক্ষালনক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারেনা, তেমনি যাহা স্বরূপতঃ প্রেম নহে, তাহাও কখনও প্রেম উন্মেষিত করিতে পারেনা। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তদীয় প্রীতিসন্দর্ভে এইরূপে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। এই কান্তাপ্রেম ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে "প্রিয়তা" নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রীতিসন্দর্ভে তাই উক্ত হইয়াছে—

"এষ ভাবঃ (কান্তভাবঃ) কামতুল্যত্বাৎ শ্রীগোপিকাসু কামাদিশব্দেনাপ্যভিহিতঃ স্মরাখ্য-কাম-বিশেষস্তঃ, বৈলক্ষণ্যাৎ। কামসামান্যম্ খলু স্পৃহা-সামান্যাত্মকম্। প্রীতিসামান্যন্তু বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদনুগত-বিষয়-স্পৃহাদিময়ো জ্ঞানবিশেষো লক্ষিতম্। ততো দ্বয়োঃ সমানপ্রায়-চেষ্টত্বেপি কামসামান্যস্য চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যা। শুদ্ধপ্রীতিমাত্রস্য চেষ্টাতু প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যৈব। তত্র তদনুগতমেব চাত্ম-সুখমিতি মুখ্যবৃত্তিরেব প্রীতিশব্দঃ। অতএব যথাপূর্ব্বং সুখপ্রীতিসামান্যয়োরু-ল্লাসাত্মকতয়া সাম্যেপ্যানুকূল্যাংশেন প্রীতিসামান্যস্য বৈশিষ্ট্যং দর্শিতম্। তথা কামপ্রীতিসামান্যয়োরপি স্পৃহাত্মকতয়া সামান্যেপি তদংশেনৈব তজ্‌জ্ঞেয়ম্"। অর্থাৎ এই কান্তভাব কামতুল্যের মত বলিয়া কাম-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। স্মরাখ্য প্রাকৃত কাম ইহা হইতে ভিন্ন ; কারণ, উভয়ের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। সাধারণতঃ কাম-শব্দে স্পৃহা বা স্বসুখ-ইচ্ছা বুঝায়। প্রীতি শব্দে বিষয়ানুকূল্যা-ত্মক বিষয়গত আকাঙ্ক্ষাময় জ্ঞান, অর্থাৎ প্রীতির যিনি বিষয়, তাঁহারই আনুকূল্য দ্বারা অনুভব-বিশেষ বুঝায়। সেই জন্য কাম ও প্রেম উভয়ের চেষ্টা সমানপ্রায় হইলেও কাম-শব্দে স্বসুখতাৎপর্য্য ও শুদ্ধপ্রেমে প্রিয়ানুকূল্যই বুঝায়। আত্মসুখ প্রেমের অনুগত বলিয়া প্রীতি-শব্দের সেখানে মুখ্যাবৃত্তি। অতএব পূর্ব্বে যেরূপ দেখান হইয়াছে; সাধারণতঃ সুখ ও প্রীতি উল্লাসাত্মকতা-নিবন্ধন সমান হইলেও আনুকূল্যাংশেই প্রীতির বৈশিষ্ট্য, সেইরূপ কাম ও প্রেম সামান্যতঃ ইচ্ছাংশে অভেদ হইলেও আনুকূল্যাংশেই প্রীতির বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি।

এইরূপ শুদ্ধ প্রেমে যে শ্রীভগবান্ বশীভূত হন, তাহাও নিজ মুখে ব্রজবালাদের নিকট বলিয়াছেন। "ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে", অর্থাৎ আমার-প্রতি তোমাদের যে প্রেম আছে—ইহা অতি সৌভাগ্যের কথা,কারণ মদীয় ভক্তিই জীবের অমৃতত্বের কারণ,এখানে কান্তাপ্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা শ্রীভগবদ্বাক্যেই ধ্বনিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আমার স্বভাবই এই যে, যাহার যেরূপ প্রেম আমি তাহাকে সেইরূপই ভজি। তিনি প্রেমে কখনই উদাসীন নহেন, কিন্তু কান্তাপ্রেমের এমনই অত্যদ্ভুত শক্তি যে, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অন্যপ্রেমে উদাসীন করিয়া বশীভূত করে। চরিতামৃতে তাই উক্ত হইয়াছে

"মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে   তোমার যে প্রেম হয়ে
সেই প্রেম পরম প্রবল।"

"তোমার যে প্রেমগুণে করে মোরে আকর্ষণে।"
"যেবা স্ত্রী পুত্রধন করি বাহ্য আচরণ
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া,"

ইত্যাদি বাক্যে ব্রজদেবীগণের প্রেম-মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

"ন পারয়েহয়ং নিরবদ্যসংযুজাম্।"

অর্থাৎ তোমাদের শুদ্ধশ্রেষ্ঠ প্রীতির ঋণ আমি কখনই পরিশোধ করিতে পারিবনা, তোমাদের নিজগুণে তাহার বিনিময় হউক—ইত্যাদি বাক্যে তাহাই দেখা যায়। সেইজন্য কান্তাভাবময়ী প্রীতি যে প্রেমরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, এ বিষয় আর সন্দেহ নাই। কারণ,এরূপ পূর্ণ দেহাত্ম-নিবেদন কোন প্রেমেই সম্ভব নহে—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কুল, মান, বিধি, নিষেধ সকল দ্বন্দ্ব-ধর্ম্মের অতীত হইয়া কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানই ধ্রুবতারার মত জীবনে লক্ষ্য করিয়া, কেহই তাঁহার শরণাগত হইতে পারে নাই—ইহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। গীতায় "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান যে তাঁহার অনাদিপ্রেমযজ্ঞে নিখিল নিমন্ত্রণ-বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সফলতা একমাত্র ব্রজসুন্দরীগণেই দেখা যায়। কান্তাগণের মধ্যে শ্রীরাধা "কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি" ইহা অত্যন্ত সত্য। তিনি কৃষ্ণময়ী। শ্রীরাধার

—কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে,
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,"দেবী-কৃষ্ণময়ী-প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।" তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাভিব্যক্তি হয়—যেমন সমুদ্র সদা পূর্ণ থাকিলেও চন্দ্রোদয়ে তাহার উর্ম্মিমালা উদ্বেলিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ সর্ব্বদা স্বরূপে পূর্ণ হইলেও ব্রজবালাগণের প্রেমচন্দ্রোদয়ে তাঁহার মাধুর্য্য উচ্ছলিত হয়। অনন্ত-শক্তির আধার-স্বরূপ শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি যে তাঁহার অত্যন্ত বল্লভা হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! শক্তি-শক্তিমানে চিরদিন আলিঙ্গিত, মিলিত হইয়া বিরাজিত, যেমন সূর্য্যমণ্ডলে পরমাত্মা তাঁহার বরণীয় ভর্গের সহিত স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। যে হ্লাদিনী-শক্তি ভগবানের অন্তরে অমূর্ত্তরূপে আছেন, তিনিই অলৌকিক অচিন্ত্য-ভগবদিচ্ছার প্রভাবে, অথবা প্রেমবশ্যতা-নিবন্ধন প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া বাহিরে আসেন। যেমন

অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ভেদ সাধন করা সম্ভব নহে, কিন্তু দাহ্য পদার্থ প্রাপ্ত হইলে দাহিকাশক্তির স্ফুরণ হয় মাত্র, সেইরূপ শ্রীভগবানের নিত্য হৃদয়-বিলাসিনী চিচ্ছক্তি লীলায় মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রকটিতা হন। এইরূপ ভগবান আত্মারাম আত্মকাম হইলেও, আনন্দবিশেষ অনুভব করিবার নিমিত্ত, অখণ্ড-আনন্দস্বরূপই ঘনীভূত আনন্দমূর্ত্তি-বিশিষ্টরূপে প্রকট হইয়া থাকেন,—যেমন অসীম মহাসাগরের-অনন্ত জলরাশির মধ্যে কোথাও অত্যধিক শৈত্য বশতঃ জমিয়া তুষারে পরিণত হয়—তখনই আনন্দের প্রতিষ্ঠা—বা শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর ভাষায়—ঘনীভূত প্রতিমার বিকাশ হয়, তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে, "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্," এইরূপে আদি পুরুষ ও আদ্যা প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়। প্রাকৃত জগতের কোন তুলনাই অভেদ-পরিচয়ে সমর্থ হইবে না।

যদি তবুও পৃথিবীর ভাষায় বলিতে হয়, তবে এক তনু যদি দুইটী সমভাবে বিভক্ত হইয়াও চেতনাসম্পন্ন থাকে, তবে যেরূপ একটীর প্রতি অপরটীর স্বাভাবিক আকর্ষণ হয়, সেইরূপ রসরাজের প্রতি মহাভাবের আকর্ষণ। সিন্ধু-গামিনী নদীর যেরূপ সমুদ্রের দিকে স্বাভাবিকী নিরবচ্ছিন্না গতি, সেইরূপ আনন্দ-স্বরূপ শ্যাম-সাগরের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীরাধা-প্রেম-তটিনীর অদম্য আকাঙ্ক্ষা,—অতৃপ্ত অনন্ত আবেগ।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিষয়ে শ্রুতি বলেন,—"শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।" শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নহে শাস্ত্রপরমাণ॥"

যেমন মৃগমদ ও তাহার গন্ধে কোন গুণগত ভেদ নাই, সেইরূপ শক্তিমান্ কৃষ্ণ ও শক্তি শ্রীরাধায় গুণগত ভেদ নাই। সুতরাং তাঁহারা অভিন্ন মূর্ত্তি; কারণ,অসীম প্রেমই তাঁহাদের ভেদ দূরীভূত করিয়াছে। সে অভেদের অবস্থা এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে, তখন স্ত্রীপুরুষে ভেদ পর্যন্ত্য দূরীভূত হয়, অর্থাৎ কে কান্ত ও কে বা কান্তা তাহাও উপলব্ধি হয় না। ইহাই প্রেমবিবর্ত্ত-বিলাস। তাই রসিকভক্ত-শ্রেষ্ঠ শ্রীল কবিরাজগোস্বামী "না সো রমণ না হাম রমণী, দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি" বলিয়াছেন। কিন্তু অভেদের মধ্যেও কিরূপ আস্বাদন হয়, তাহা চিন্তাতীত। সেই জন্যই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, ভেদাভেদ

উভয়ই অচিন্ত্য, কারণ যাহা প্রকৃতির পরপারে, তাহা ধারণা করা মনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব—চিন্তার অসামর্থ্য-নিবন্ধনই তাঁহারা এরূপ স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা কলিযুগপাবনারতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে এই ভেদাভেদতত্ত্বের সমন্বয় হয়। এবিষয় চরিতামৃতে এইরূপ ধৃত হইয়াছে, "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি-হ্লাদিনীশক্তি রস্মা-দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনাতদ্দ্বয়ঞ্চৈক্য-মাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।" অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ একআত্মা হইয়াও ব্রজলীলায় ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পুনরায় সেই উভয় মূর্ত্তিই একতা লাভ করিয়া চৈতন্যনামক রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপে প্রেম আস্বাদ করিয়াছিলেন। এখানে ব্রজলীলায় যেরূপ ভেদতত্ত্ব, সেইরূপ গৌরলীলায় অভেদতত্ত্ব 'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ' স্পষ্টই দেখিতে পাই। এইরূপ চিদানন্দমূর্ত্তির যিনি নিত্য স্বরূপসিদ্ধা শক্তি, তিনিই শ্রীরাধা বা "কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।" তবেই এখন বুঝিতে পারা যায়—শক্তি ও শক্তিমানে যে কিরূপ দ্বৈতাদ্বৈত—ভেদাভেদ ভাবে বিজড়িত, তাহা ভাষার ও চিন্তার অতীত। ইহা এক অপ্রাতিম অপরিমেয়-অতলস্পর্শী-গভীর অবস্থা—যাহা অচিন্ত্য ব্যাপার। লেখনীতে ও ভাষায় ইহার ইঙ্গিত করিতে যাইয়াই যত বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা মূকাস্বাদনবৎ স্বানুভবগম্য। মহা নির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীশিব এই বিষয় উল্লেখ করিতেছেন;—

"অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতম্।

অর্থাৎ কেহ অদ্বৈতজ্ঞান ইচ্ছা করেন, কেহবা দ্বৈতজ্ঞান ইচ্ছা করেন, কিন্তু আমার দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত তত্ত্ব কেহ জানে না। লক্ষ্যার্থের প্রতি যদি মনোনিবেশ না করিয়া আমরা বাচ্যার্থের প্রতি দেখি ও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদের নিগূঢ়তম রহস্য ধীর মনে চিন্তা করি, তাহলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, তাহা এক অচিন্ত্য ব্যাপার। চিদাদ্বৈত-তত্ত্বটী অদ্বৈত-বাদের বাহিরের কথা—বিচারের দ্বারা ঐ মতবাদ স্থাপন করিতে গিয়া উহা ঐ রূপেই প্রতিভাত হইতেছে, কিন্তু তাহার গভীরতম প্রদেশে যে তত্ত্ব—যাহা

ছিলনা, তাহা এক বিরাট অচিন্ত্য বস্তু। তাঁহার এই বাক্যটী হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে,—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাৎ সুনির্ম্মলং। কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ।" অর্থাৎ নির্ম্মলী ফলের রেণু যেমন জলের মলরাশি নিঃশেষে নষ্ট করিয়া স্বয়ং সেই সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানও জীবের অজ্ঞান অপনীত করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়। ইহার অর্থ কি? অদ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞান দূরীভূত করিয়া নিরিন্ধন অগ্নির মত উপশান্ত হইয়া যায়—তখন রহিল কি? অজ্ঞান ত পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে—জ্ঞানও থাকেনা, কারণ জ্ঞানও পূর্ব্ব শ্লোকে নাশ প্রাপ্ত হয় বলা হইয়াছে। যাহা রহিল তাহাই রহিল। ইহা জ্ঞানাজ্ঞান ভেদাভেদেরও অতীত অবস্থা। তাই শ্রুতি বলেন "যত্র বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ইহা মুখে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। তবেই দেখা গেল যে, এক মহা অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য তত্ত্ব—যাহা প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া কখনই উপলব্ধি হইতেই পারেনা, তাহাই অবিদ্যানির্ম্মুক্ত জ্ঞান-বিরহিত অবস্থা।

ইহাই কান্তাপ্রেমের চরম পরিণতি—যেখানে আকার ও উপাধি উভয়ই তিরোহিত হইয়া এক অপূর্ব্ব, অচিন্ত্য আস্বাদনে পর্য্যবসিত হয়। নিরুপাধিক প্রেমের পরাকাষ্ঠা এইখানে।

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, এম, এ।

শ্রীপাট-খেতুরে বিরাট মহোৎসব।

গত ৩০শে পৌষ শ্রীপাট-খেতুরে বিরাট মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই দিন গৌড়-রাজর্ষি শ্রীল মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন; যথা শাস্ত্র দেবকার্য্যের পর, নানাবিধ বাদ্য, বৈষ্ণব-ভদ্রমহিলাদিগের হুলুধ্বনি ও বহু লোকের হরিধ্বনির সহিত, অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকার বি, এ, মহাশয়ের সহায়তায় কপিকল দ্বারা মন্দিরের ভিত্তির প্রস্তরখানি স্থাপিত করেন। একখানি বৃহৎ মর্ম্মর প্রস্তরে নিম্নোক্ত শ্লোক দুটী উৎকীর্ণ হইয়াছে।

অহিবেদবসুজ্যানে শকে ধনুর্গতেঽরুণে।
উত্তরায়ণ-সংক্রান্তৌ দ্বাদশ্যাং শুক্রবাসরে ॥ ১ ॥
ভিত্তিসংস্থাপিতা চাত্র কুটস্থ শ্রীমহাপ্রভোঃ।
সুবিখ্যাতৈ মহারাজৈ মণীন্দ্রচন্দ্রনন্দিভিঃ ॥ ২ ॥

ঢাকা হইতে একটী বড় পাত্র ও একটী সুন্দর করণী প্রস্তুত করিয়া আনা হইয়াছিল। পাত্রটীতে লিখা ছিল—

ব্যবহৃতমিদং পাত্রং মহারাজৈরশোভনম্।
ভিত্তিসংস্থাপনার্থায় কুটস্থ শ্রীমহাপ্রভোঃ ॥

করণীতে লেখাছিল—

অনেন প্রোথিতা ভিত্তিঃ কুটস্থ শ্রীমহাপ্রভোঃ।
শ্রীপট্টনে মহারাজৈঃ সংক্রান্তাবুত্তরায়ণে ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ ব্যতীত বল্লভীকান্ত, ব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, রাধামোহন নামক আরও পাঁচ বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কালক্রমে, ব্রজমোহন কোনও ভক্তকর্ত্তৃক শ্রীধাম বৃন্দাবনে স্থানান্তরিত হইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎকালীন সেবায়েত ব্রজমোহনের পরিবর্ত্তে গোপীনাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা-পূজাদি করিয়া আসিতেছিলেন।

গত ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে শ্রীকৃষ্ণ, রাধামোহন, রাধাকান্ত ও বল্লভীকান্ত-মূর্ত্তি চতুষ্টয়ের অঙ্গভঙ্গ হয়। তারপর এ যাবত তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন মূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত ৩০শে তারিখেই রাজসাহী-জিলাস্থ তালন্দএর জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র এম, এ, বি এল মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে তৎকর্ত্তৃক, ভগ্নমূর্ত্তি-চতুষ্টয় ও ব্রজমোহনমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পাঁচটী নূতন শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েন। অদ্বৈত বংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল মুরলীমোহন গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন।

মন্দিরের বাহিরে বটবৃক্ষতলে হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও মহোৎসবের বন্দোবস্ত ছিল। এই মহোৎসবে প্রায় ১০০০।১২০০ শত ভক্ত আহার করিয়াছিলেন। মহারাজা বাহাদুর মন্দিরের প্রাঙ্গণে জনসাধারণের সহিত একত্রে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। এই দিন শ্রীপাটে যেরূপ আনন্দজনক ব্যাপার হইয়াছিল, জনসাধারণের মতে এইরূপ আর কখনও হয় নাই। দৈবদুর্যোগ (বৃষ্টি) না হইলে

সম্ভবতঃ আরও অনেক লোকের সমাগম এবং আনন্দ আরও বেশী পরিমাণে হইত।

মন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল মহারাজ বাহাদুর এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ শ্রীপাট সম্বন্ধে অনেক কথার অবতারণা করেন, তৎপর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাঁহাদের শ্রীপাটের সহিত সংস্রব কিরূপে সংঘটিত হইল তাহা বর্ণনা করিয়া যাঁহারা শ্রীপাটের সেবার্থে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও অর্থদানের তালিকা পাঠ করেন, অতঃপর এই সভায় নিম্নোক্ত ৩টী বিষয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যথা,—(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির অন্ত মন্দিরাপেক্ষা বৃহত্তর ও উন্নত হইবে। (২) নূতন শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ভগ্নমূর্ত্তি-চতুষ্টয় নদীতে গভীর স্রোতোজলে নিক্ষেপ করা হইবে। (৩) মহারাজ বাহাদুর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর যে মন্দিরটী স্থাপিত হইতেছে, ইহার নাম মণীন্দ্রকূট রাখা হইবে।

সভাস্থলে মহারাজবাহাদুরের সম্বর্দ্ধনার্থ, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বরচিত নিম্নোক্ত শ্লোকটী পাঠ করেন।

বিমল-কনককান্তিঃ কর্ম্মিণাং কর্ম্মবীরো—
বিবিধ-বিষয়-বিজ্ঞঃ পুণ্যো বদান্যঃ।
সকল গুণি-গুণজ্ঞো গৌরবং বৈষ্ণবানাং
ভজতু সুহৃদমার্য্যং ভূপতিঃ সর্ব্বকালম্॥

নিম্নোক্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী এই বৃহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, কিশোরীমোহন চৌধুরী, রায় ভবানীনাথ নন্দী বাহাদুর, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য, রামতারণ মুখোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিজয় নাথ সরকার, দেবেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, গোসাঞি জিতেন্দ্রচৈতন্য ভারতী, সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, মুকুন্দনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র কাব্য-বেদান্ততীর্থ, রমেশচন্দ্র কাব্য-বেদান্ততীর্থ, নরেন্দ্রচন্দ্র কাব্য-স্মৃতিতীর্থ, কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী, শশী-শেখর মৈত্র, লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী, দুর্গাগতি ভট্টাচার্য্য (হোতা), বিজয়চন্দ্র কাব্যব্যকরণতীর্থ, রমণীকান্ত সিদ্ধান্তরত্ন, রামগোপাল আগরওয়ালা,

সুরেন্দ্রনাথ সান্যাল, জিতেন্দ্রমোহন রায়, যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ধীরুরাম ঠাকুর, সুবোধচন্দ্র সান্যাল, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি অনেক ভক্তই উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যার পর মহারাজ বাহাদুর ও সুরেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র মহাশয়ের মটরে গোদাবাড়ী গিয়া লাল-গোলাঘাট হইয়া রাজধানী ফিরিয়া যান ও রাজসাহীর ভদ্রমণ্ডলী কেহ ঘোড়ারগাড়ীতে কেহ মোটরে সকলই চলিয়া আইসেন।

শ্রীরোহিণী কুমার নাথ।

অপেক্ষায়।

এস প্রিয়তম ! তোমারি আশায় ব'সে আজি কত রজনী দিন।
নিরাশার মেঘে ঢেকেছে হৃদয়, আশার আলোক অতীব ক্ষীণ॥
যে দিন ভুলায়ে যাইলে পলায়ে সে দিন অতীতে গিয়াছে চলি'।
কি কাজ সখা হে সে সব স্মরিয়া কি কাজ নয়ন সলিল ফেলি॥
গভীর আঁধার রয়েছে ঘেরিয়া পশেনা হেথায় প্রভাতি আলো।
হৃদয়ের মাঝে কেবলি হতাশা, কেবলি হেথায় তমসা-কালো॥
"আসার আশায়" আর কতদিন এ ঘোর বিজনে থাকিব ব'সে।
এস প্রিয়তম বারেক হাসিয়া, লয়ে যাও মোরে আলোর দেশে॥

শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্ত্তী কাব্যনিধি।

শ্রীনবদ্বীপে আনন্দের বন্যা।

কৃষ্ণলীলামৃত-সার তার শত শত ধার,
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥

যদিও প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর এবার প্রেমের পসরা লইয়া আসিয়াছেন,

তথাপি পূর্ব্বলীলায় প্রেমদানে যেন কিছু কাতরতা ছিল, যেহেতু প্রভু আমার পূর্ব্বলীলায় যাকে তাকে প্রেম দিতেন না।

মুক্তিং দাদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং।

যদি কেহ তাঁর কাছে ভোগ-বাসনা বা মুক্তি-বাসনা বুকে লইয়া যায়, মুখে সে যাই বলুক না কেন, ঠাকুর আমার বু'ঝে ফেলেন ; ঐ সব কৈতব দে'খে তিনি কৌতুক সহকারে হাস্‌তে থাকেন এবং বলেন তোমার ঋণ আমি অনায়াসে শোধ করতে পার্‌ব ! এস এই নাও তোমার ভুক্তি, এই নাও তোমার মুক্তি ! আমাকে পা'বে না, আমি তোমার কাছ্‌ থেকে ছুটিলাম। এই ব'লে প্রভু আমার স'রে পড়েন ; ইহা চিরন্তন স্বভাব।

কিন্তু এবার নিজেই প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছেন,—পাত্রাপাত্র বিচার করিবেন না, যোগ্যাযোগ্য দেখিবেন না, অপরাধ নিরপরাধ গণিবেন না,—সকলকেই নামের সহিত প্রেম দিয়ে দেবেন। তাই এবার পরমকারুণিক গৌর-প্রেমে মাতোয়াল-ঠাকুর শ্রীনিতাই চাঁদকে সঙ্গে এ'নেছেন,——যে ঠাকুর নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে যে'য়ে, মা'র খে'য়ে' সে'ধে যে'চে, আচণ্ডালে প্রেম মহাধন বিলাইয়া দিয়ে গেছেন।

সেই শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তির মূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-সন্তানগণের দ্বারাই জগতে ঐ প্রেমের প্রচার বা আস্বাদন অধিকতর সম্ভবপর। যেহেতু সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু পর্য্যন্তও শ্রীনিতাইচাঁদের করুণা দে'খে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন এবং প্রেম-ধন বিতরণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া, অফুরন্ত প্রেম-ভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্বভার ঠাকুর শ্রীনিতায়ের হাতেই দিয়ে রে'খেছেন। অদ্যাবধি সেই নিত্যানন্দ-শক্তি জগতে প্রকট থাকিয়া, নিতাই-চৈতন্যের কারুণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অদ্যাবধি জগৎকে কৃষ্ণপ্রেমে হাসাইতেছেন, কাঁদাইতেছেন, নাচাইতেছেন, অনুভবশীল ভাগবতগণ ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন।

এই নিতাইচাঁদের বংশের সমুজ্জ্বল রত্ন, বাঙ্গালীর গৌরব, ভারতা-কাশের অকলঙ্ক পূর্ণশশধর অশেষ বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-নিষ্ণাত, পণ্ডিত-প্রবর, প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়, বিগত ১৯শে

পৌষ ঢাকা হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাত্র সাতদিন শ্রীনবদ্বীপে ছিলেন; তন্মধ্যে পাঁচদিন (নিজ ভবনে) শ্রীশ্রীমদনমোহনের নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ক'রেছিলেন। পাঠে অপার আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। মধ্য-লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন-প্রসঙ্গে—"রায় কহে কান্তা-প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার" পয়ারটীর ব্যাখ্যাই পাঁচ দিন হইয়াছিল।

উহাতে শ্রীল প্রভুপাদ সাধ্যতত্ত্বটী সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বসুখানুসন্ধান-গন্ধহীন বিমলভাস্কর সদৃশ মধুর জাতীয় ব্রজপ্রেমই সর্ব্বসাধ্য-সার। সকলকার প্রেমানুরূপ ভজন করা যাঁহার ব্রত, সেই রসিকশেখর নবনটবর শ্রীমদনমোহনও এই প্রেমের অনুরূপ ভজন করিতে না পারিয়া, নিজের প্রতিজ্ঞা নিজে রাখিতে পারেন নাই, ব্রজসুন্দরীগণের নিকট হা'র মানিয়াছেন এবং স্বয়ং শ্রীমুখে ব্রজদেবীগণের কাছে ব'লেছেন,—তোমরা আমার জন্য যেরূপ ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, আমি তোমাদের জন্য তাহার বিন্দুমাত্রও দেখাইতে পারি নাই। তোমরা মর্য্যাদাপ্রাপ্ত কুল-ললনা, তোমাদের যাহা সর্ব্বস্বধন সেই লজ্জা-ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-বেদমর্যাদা লোক-মর্য্যাদা অনায়াসে উল্লঙ্ঘন ক'রেছ, কোন অপেক্ষা রাখ নাই। ধন্য তোমাদের রাগের পরাক্রম, ধন্য তোমাদের পবিত্র প্রেমের আকর্ষণ! আমি যদি দেব-পরিমাণের আয়ুঃলাভ করি, এমন কি ব্রহ্মার পরমায়ুও পাই, তথাপি তোমাদের এই নিরবদ্য প্রেমের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। এই ব'লে শ্রীকৃষ্ণকে ঐ প্রেমের কাছে ঋণিত্ব স্বীকার করতে হ'য়েছে। বুদ্ধিসত্তম সাক্ষাৎ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় পর্য্যন্তও এ প্রেমের পরমপবিত্রতা, সাধুতা ও সর্ব্বোৎকৃষ্টতা নিজে বর্ণন ক'রেছেন।

প্রেম-শব্দের চরমপর্য্যাপ্তি একমাত্র এই গোপী-প্রেমেতেই, ইহাতে নিজ সুখের লেশ মাত্রও নাই, শুধু কৃষ্ণকে সুখী করাই এ প্রেমের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলেই গোপীগণের সুখ, স্বতন্ত্ররূপে নহে। নিজেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির ইচ্ছার নাম কাম, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির ইহার নাম প্রেম। এ জগতের কামটী বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিকার, অতএব নিখিল দুঃখের আকর, আর প্রেম মহাধন অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির বিলাস; অতএব অশেষ সুখের নিদান, এমন কি সুখময় কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত সুখী করিবার হেতু।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি সাধনের যত কিছু সামগ্রী, তাহা গোপী-প্রেমের ভিতরেই সম্যক্‌রূপে বিরাজিত। এই গোপীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় একমাত্র প্রেমরসে বিভাবিত। তাই তাঁহাদের চাহন, হাসন, চলন, বলন, গায়ন,—যত কিছু চেষ্টা সব আনন্দচিন্ময়রসের বিলাস, সব কৃষ্ণ-সুখের উপাদান। কান্তা বা ব্রজদেবীগণের মুকুটমণি হইলেন আবার শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। এজন্য রাধাপ্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ-সুখের চরম উৎকর্ষ। যিনি অখণ্ড আনন্দরসময় সেই রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে অশেষ বিশেষে রস আস্বাদন করাইতে এবং কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব বা মদনমোহনত্ব ধর্ম্মের অভিব্যক্তি করাইতে এই রাধাপ্রেমই সমর্থ। তাই শ্রীরামানন্দ রায় রাধা-প্রেমকে সাধ্যশিরোমণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সাধ্যতত্ত্বের এই সকল স্তর শ্রীল প্রভুপাদ পাঠে সুন্দররূপে বিশ্লেষণ ক'রেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-সেবাই যে সর্ব্বসাধ্যের সার, তাহা বুঝাইয়া দিয়েছেন। এই প্রেমসেবার পরিপাটীসমূহ সাধু-শাস্ত্র-গুরু-মুখে শ্রবণে তাহাতে লোভোৎপত্তির পর, এই প্রেমের একমাত্র আশ্রয় শ্রীব্রজদেবীগণের অনুগতভাবে যাঁহারা ঐ প্রেমসেবার পরিপাটীসমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তাঁহাদের ভাগ্যেই ঐ সাধ্যবস্তুর প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এ সকল অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়, এবং আমাদের পরমহিতজনক, তাহা পাঠে শ্রীল প্রভুপাদ বেশ সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন।

যে অনর্পিতচরী-প্রেমভক্তি-বিশেষ প্রচারের নিমিত্ত পরমকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যে প্রেমভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্বভার শ্রীনিতাইচাঁদের হস্তে বিন্যস্ত ক'রেছিলেন, সেই প্রেমের মাহাত্ম্য ও প্রাপ্তির উপায়সকল অতিসুন্দররূপে শ্রীল প্রভুপাদ বুঝাইয়া দিতেছেন। তাই স্বতঃই মনে হইতেছে যে শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি অদ্যাবধি জগৎকে অখণ্ড আনন্দরস আস্বাদন করাইবার জন্য জাজ্বল্যমানরূপে বিরাজিত আছেন সন্দেহ নাই। শ্রীনিতাইচাঁদের এই করুণার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি আমরা শ্রীল প্রভুপাদ হইতে পাইতেছি, এজন্য প্রভুপাদের চরণে চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীমদনমোহনের সম্মুখে যখন শ্রীভক্তিরসসিদ্ধান্তপরিপাটী সকল বিস্তার করেন, তখন মনে হয় শ্রীমদনমোহন যেন আপনার গুণ আপনি

শু'নে মন্দ মন্দ হাসিতে থাকেন। শ্রীমদনমোহনের শোভা অতি মনোরম, প্রভু-পাদ শ্রীবৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বদিবসে ২৫ শে পৌষ শ্রীমদনমোহনেরে অপূর্ব্ব শিঙ্গার হইয়াছিল। তখন মধ্যাহ্ন সময়, মনে হইল শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে প্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরী মিলিত হইয়াছেন। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ কতই না বিকাশ পাইয়াছে, পরস্পর পরস্পরের অঙ্গচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত হইতেছেন, অপূর্ব্ব মধুরিমা-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের শোভা দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইলেন, কিছুকালের জন্য এ জগতের কথা ভুলিয়া গেলেন।

অতঃপর ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর দেববর্ম্মা সাধু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগোবিন্দ-জীউর মন্দিরে দর্শন করিতে গেলেন। সাধু মহাশয় রাজপথ হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহকারে সংবর্দ্ধনা করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের জগমোহনে লইয়া গেলেন এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নবনবায়মান মধুরিমা প্রভুপাদকে আস্বাদন করাইতে লাগিলেন। প্রভুপাদ আনন্দভরে দর্শন করিতে থাকিলেন। বামভাগে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীগোবিন্দের শোভাবর্দ্ধন করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন; দক্ষিণপার্শ্বেও শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিতে গা ঢাকা দিয়া আবার রসে ঢলঢল এক ঠাকুর শোভা পাইয়াছেন। ইহাঁকে দে'খে মনে হয়, যেন নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনীয় লীলার রহস্য বুঝাইয়া দিতে এবং রসরাজ-মহাভাব মিলিত-স্বরূপ প্রচার করিতে শ্রীগোবিন্দ নিজেই নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে ঐরূপে বিরাজমান আছেন। শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে এই তিনের মাধুর্য্য আস্বাদনের পর প্রভুপাদ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

তখন শ্রীগোবিন্দের নাটমন্দিরে শ্রীধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-সেবক-গোস্বামি-পাদগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ অন্তরঙ্গ, যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অতিশয় কৃপাভাজন তাঁহাদের তিনজন গোস্বামিপাদ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনে অতীব প্রীতিলাভ করিলেন, কিছুকাল প্রভুপাদের সঙ্গে দুই চারিটী প্রাণের-কথা আলাপ করিলেন ও শুনিলেন। অতঃপর তাঁহারা প্রভুপাদকে শ্রীধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে যাওয়ার জন্য আগ্রহ-বিশেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তখন প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গনে চলিলেন। গোস্বামি-পাদগণ সপ্রীতি ও সাদরে প্রভুপাদকে সংবর্দ্ধনা করিতে

করিতে শ্রীমন্দিরের জগমোহনে লইয়া গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে লাগিলেন, প্রভুপাদ নয়ন-মনের সাধ মিঠাইয়া দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল। ঠাকুরের দর্শনে আজও রামানন্দ রায়ের প্রত্যক্ষীভূত সেই রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-বপুঃ সাক্ষাৎ স্ফূর্ত্তি পায়, আজও প্রভুর সাক্ষাৎ শ্রীমুখভাবিত—

"গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্র-সুত বিনু তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥"

এই গূঢ়রহস্য-পূর্ণ বাক্যের অনুরূপ মাধুর্য্যময় কলেবর, যুগপৎ হৃদয় ও নয়নের পথে ভাসিতে থাকেন সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভাবাঢ্য মাধুর্য্য আস্বাদনের পর শ্রীল প্রভুপাদ অষ্টাঙ্গ প্রণাম ও শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন।

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে নাটমন্দিরে স্বয়ং শ্রীমুখকমলোদ্‌গীর্ণ "হরে কৃষ্ণ" নামে অষ্টপ্রহর শ্রীসংকীর্ত্তন উৎসব হইতেছিলেন। প্রভুপাদ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক-গোস্বামি-পাদগণ শ্রীকীর্ত্তনে যোগদান করিলেন, মনে হইল শ্রীনিতাই-গৌর নিজ নিজগণ লইয়া আজ শ্রীকীর্ত্তনে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ ক'রেছেন, আজ প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিতেছিল, তাহাতে সমস্ত নবদ্বীপ টলমল করিতেছিল, তাহার শত শত ধারা যেন দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করিতে করিতে প্রবলবেগে ছুটিতেছিল। তখন শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং যেন শ্রীকীর্ত্তনাবেশে গর গর হইতেছিলেন, দুই নয়নে যেন অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, কখনও বা যেন হেমদণ্ডবাহু উৎক্ষেপণ করিতে, কখনও বা যেন প্রিয়ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন।

এই আনন্দ আস্বাদনের পর সে দিন শ্রীল প্রভুপাদ নিজ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর দিন ২৬শে পৌষ প্রাতে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, কাশীধাম হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীনরহরিদাস (ভাগবতভূষণ)।

শ্রীরাধার স্বপ্নে শ্রীগৌরাঙ্গ-আবির্ভাব-সূচনা।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী-শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ-তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।

যমুনাপুলিনে রাস-অবসানে রসময়ী-রসময়।
নিভৃত-নিকুঞ্জে রতনপালঙ্কে সুখসাগরে ভাসয়॥
অলসে-অবশে সরসপরশে কুসুমতলপোপরি।
পরাণে পরাণে আছয়ে শয়ানে নব-নাগর-নাগরী॥
যত অলিগণ ঘুমে অচেতন আপন আপন কুঞ্জে।
শারী-শুকপিক সম্বিৎ নাহিক অলিকুল নাহি গুঞ্জে।
মন্দসমীরণ বহে অনুক্ষণ কুসুম-গন্ধ ল'য়ে—
চিরতাপহর রাতুলযুগল চরণারবিন্দ সেবে॥
রত্নদীপদুই নীলপীত হই দুহুঅঙ্গ ছটায়।
নীলপীতরঙ্ করে বিকিরণ কুঞ্জ আলোকিত তায়॥
গভীর রজনী স্বপ্ন দেখে ধনি পরাণ-নাথের পাশে।
মনপ্রাণহর গৌরাঙ্গসুন্দর অলপ অলপ হাসে॥
ঐরূপ দেখিয়ে প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে আছয়ে স্বপনরঙ্গে।
অতৃপ্ত-নয়নে দেখে সে রতনে ভয় পাছে সুখ ভাঙ্গে॥
স্বপ্নের আবেশ হ'ল যবে শেষ চমকি উঠিল রাই।
সজল-নয়নে কহয়ে তখনে পরাণ-নাথে জাগাই॥
স্বপনে দেখিনু অপরূপ-তনু মোর অঙ্গের বরণ।
তব অঙ্গধাম বঙ্কিম-নয়ান মম নয়নরঞ্জন॥
চন্দন-তিলকে ললাটে-ঝলকে শ্রীঅঙ্গে লাবণ্য খেলে।
চন্দনচর্চ্চিত বক্ষে বিলম্বিত মালতীর মালা দোলে॥
ভাবে নাচে গায় কীর্ত্তনে বেড়ায় ভক্তগণ সঙ্গে করি।
প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসায় সদা বলে হরি হরি॥

মোর মন-প্রাণে হ'রে নিল কেনে কিছুনা বুঝিনু কিসে।
বল প্রাণনাথ হেন অকস্মাৎ কি দেখিনু স্বপ্নাবেশে ?
চতুর্ম্মুখ কত দেব শত শত যোড়করে বন্দে পায়।
কিন্তু অপরূপে গৌরাঙ্গস্বরূপে মোর মন কেন ধায় ॥
রাধার বচন শুনিয়া তখন বিদগ্ধ রসিক শ্যাম।
আপন হৃদয় প্রকাশি কহয় প্রেমময়ী রাধাঠাম ॥
রসের স্বপন কৈলে দরশন গৌর হ'তে নয় মনে।
স্বপন কথন সুসত্যবচন হেন হবে কোন দিনে ॥
গৌরাঙ্গবরণ যে কৈলে দর্শন ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনে।
তোমার প্রেমের অদ্ভুত মহিমা পরিণতি আস্বাদনে ॥
স্বাতন্ত্র্য হারাই প্রেমে ভেসে যাই স্থির নহে কালরূপ।
কেমন তোমার প্রেমের-স্বভাব ভেবে হই গৌররূপ ॥
মোরে আলিঙ্গিয়া, শুন প্রাণ দিয়া, থাক যবে বিনোদিনী।
গৌরাঙ্গ-স্বভাব স্বতঃসিদ্ধভাব হৃদয়ে জাগে তখনি ॥
ছাড়ি কুলমান কৈলে প্রাণদান একনিষ্ঠ আরাধনে।
প্রেম-অনুরূপ ভজিতে নারিনু বাঁধিলে আমারে ঋণে ॥
তব প্রেমসীমা জানিতে বাসনা জানিতে নারিনু এ রূপে।
লয়ে তব ভাব মোর আবির্ভাব হবে কলিযুগে নবদ্বীপে ॥
ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইয়া তব ভাবে বিনোদিনী।
গাহিব কাঁদিব কীর্ত্তনে নাচিব করি হরি হরি ধ্বনি ॥
নাচিব নাচাব কাঁদিব কাঁদাব তব ভাবে সর্ব্বলোকে।
তব প্রেমাস্বাদে শীতল হইবে পাসরিবে দুঃখশোকে ॥
চতুর্ম্মুখ কত দেখিয়াছ শত নারে তারা প্রেম দিতে।
তোমার প্রেমের মহিমা বুঝিতে বাঞ্ছে জীব-জন্ম নিতে ॥
অবতার কত আসি যায় শত যুগধর্ম্ম পালিবারে।
গৌরাঙ্গস্বরূপে প্রেমরসকূপে আকর্ষিছে বলে মোরে ॥
ধন্য তব ভাব প্রেমের স্বভাব হেমাঙ্গে শ্যামাঙ্গে মিলি।
যেচে দিব প্রেম ঘরে ঘরে যেয়ে পাষাণ যাইবে-গলি ॥

ভেসে যাবে কলি প্রেমের বন্যায় কৃষ্ণনাম বরিষণে।
স্থাবর জঙ্গম রসে ডুবাইব শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনে॥

শ্রীগোপীনাথ বসাক, বি, এ, বি, টি

প্রশ্ন-সমালোচনা-সম্বন্ধে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, আপনারা নাকি কাঁহার নিকট শ্রুত হইয়াছেন—আমার স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপবাস-বাধিত বলিয়া তৎপরদিন দ্বাদশীতে করায় আমি লোক-সমাজে অবজ্ঞাত হইয়াছিলাম। এইকথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আজ পর্য্যন্তও কেহ আমার কাছে ইহা অকার্য্য হইয়াছে বলিয়া কখনও প্রকাশ করিতে শুনি নাই। আর যদি তাহা হইত, তবে আমার স্ত্রীর শ্রাদ্ধের নূন্যাধিক ১০।১২ বৎসর পরেও আবার আমাদের বাড়ীতেই নির্ব্বিবাদে ঐরূপ কার্য্য করা হয় কি করিয়া? সুতরাং যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। তবে কথা এই যে, এ দেশে এরূপ অনুষ্ঠান সর্ব্বাদৌ আমাদের বাড়ীতে হওয়ায় শ্রাদ্ধের অব্যবহিত পরে বৈষ্ণব-শাস্ত্রানভিজ্ঞ কতিপয় মহাত্মা ইহাকে অভিনব পন্থা বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন। তখন ইহার প্রতিকারকল্পে বৈষ্ণব-স্মৃতির বিচারার্থ পরম ভাগবত ৺ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উত্তেজনায় গল্লাই নিবাসী বাবুদের দেবালয়-প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। শীর্ষস্থানীয় কতিপয় বৈষ্ণব-পণ্ডিত নানা প্রতিবন্ধকে উপযুক্ত সময় সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ঢাকা স্বারস্বত-সমাজের প্রধানতম পণ্ডিত (বিক্রমপুর-ফুরসাইল নিবাসী) ৺অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সভাস্থ হইয়াও বিচারের শেষ সময় পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন নাই। এই জন্য সভার কার্য্য কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলেও উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই। কেহই ইহাকে অকার্য্য বলে নাই। এমন কি, আপত্তিকারীদের পক্ষ সমর্থনার্থ যে দুইজন স্মার্ত্ত এবং নৈয়ায়িক পণ্ডিত সভাস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ইহাকে অবৈধ ব্যাপার বলেন নাই। সে পক্ষের

প্রধানতম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রথমতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনার সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধ একাদশাহে (একাদশীর উপবাস বলিয়া) না করাইয়া তৎপরদিন দ্বাদশীতে করাইয়াছেন বলিয়া কোন সংশয় আছে কি না?

আমি। অণুমাত্রও না?

তিনি। ব্রাহ্মণের চিরাচরিত একাদশাহে শ্রাদ্ধ না করাইয়া দ্বাদশাহে করাইলেন, তথাপি আপনার কোন প্রকার সন্দেহ হইল না ইহার কারণ কি?

আমি। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা অলঙ্ঘ্য গুরুবাক্যের প্রভাবে অণুমাত্রও সংশয় জন্মে নাই। যদি কোনপ্রকার সন্দেহের লেশাভাসও থাকিত; তবে কি আর এভাবে কার্য্য করাইতে সাহস পাইতাম? "সংশয়াত্মাবিনশ্যতি" এই ভগবদ্বাক্য কি কখনও বিস্মৃত হইতে পারি?

তিনি। আপনার প্রতি কেমন গুরুবাক্য।

আমি। কেবল আমার প্রতি কেন? নিখিল বৈষ্ণবজনের প্রতিই গুরুবাক্য, পরম গুরুবাক্য, এমন কি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্-বাক্য।

তিনি। সে কি প্রকার?

আমি। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। আমরা তাঁহারই দাসানুদাস বা দাসাভাস, সুতরাং তদীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়াই আমাদের জীবন-ব্রত। তিনি যখন নিখিল জীবের মঙ্গল সাধনার্থ শ্রীমৎ-সনাতন গোস্বামিপাদকে শক্তি সঞ্চার করিয়া বৈষ্ণবস্মৃতি প্রণয়নের আদেশ করেন, তখন আমাদের সর্ব্বতোভাবে তদনুসরণ করিয়া চলাই একান্ত কর্ত্তব্য।

অন্যান্য ভক্তি-গ্রন্থপ্রণয়নে গোস্বামীদের প্রতি শ্রীপ্রভুর পরোক্ষ বাক্য, কিন্তু এই বৈষ্ণবস্মৃতি "শ্রীহরিভক্তি-বিলাস" প্রণয়নে শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি একেবারে সাক্ষাৎ বাক্য।

সুপবিত্র শ্রীকাশীধামে দুই মাসকাল অবস্থান করিয়া প্রভু সনাতনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া সর্ব্বতোভাবে শক্তিসঞ্চার করতঃ উপযুক্ত পাত্রবোধে যখন বৈষ্ণবস্মৃতি প্রণয়নের আদেশ প্রদান করেন, তখন বিনয়ের-খনি

শ্রীমচ্ছনাতন গোস্বামী সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ হইয়াও প্রভুর নিকট দীনভাবে কি বলিয়াছিলেন এবং প্রভুই বা কি উত্তর দিয়াছিলেন, আদৌ সে প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন, যথা—

পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণবস্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানি বিচার।
মো হইতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করাহ সেই সিদ্ধ হয়॥
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ॥
তথাপি এই সূত্র শুন দিগ্‌দরশন।
সর্ব্বাবরণ লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ণ॥
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দুঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান্, সব মন্ত্র বিচারণ॥ ইত্যাদি ২

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৪পঃ।

এভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবস্মৃতিতে যাহা যাহা বর্ণন করিতে হইবে, তাহারও মূলসূত্র স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বাক্য যে সাক্ষাৎ ভগবদ্ বাক্য, ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বরং ইহা অর্থগৌরবে ও ভক্ত্যঙ্গের বিধান প্রভাবে বেদবাক্য অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবার্হ। বেদ শ্রীভগবানের পরোক্ষ বাক্য, ইহা শ্রীভগবানের সাক্ষাদ্ বাক্য। যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত ব্যবস্থা অলঙ্ঘ্য বেদবাক্য বা স্বাক্ষাদীশ্বর-বাক্য বলিয়া অবিচারিতরূপেই প্রতিপালন করিতে হইবে। বলিতে কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ বৈষ্ণবজগতের পরম গুরু শ্রীমচ্ছনাতন গোস্বামীর লিখিত শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত "অথোপবাসদিনে শ্রাদ্ধ-নিষেধঃ।" এই বাক্যই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পুরাণান্তরের প্রমাণ

ব্যতীতও আমরা নিঃসংশয়ে তাহা শিরোধার্য্য করিতে পারিতাম ; তথাপি আবার পরম দয়ালু শ্রীমদ্‌গোস্বামিপাদ মাদৃশ দুর্ব্বলান্তঃকরণ সন্দিগ্ধ হৃদয় জীবাধমগণের বিশ্বাস-দৃঢ়তার জন্য যথেষ্ট শাস্ত্রযুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এক উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ নিষেধ সম্বন্ধেই "পদ্মপুরাণ," "স্কন্দপুরাণ" এবং "ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের," অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়াছেন—

১। একাদশীর ব্রত-তিথিতে সমুদয় পাপ অন্নাশ্রিত হইয়া থাকায় দেবলোক এবং পিতৃলোক সে পাপান্ন গ্রহণ করেন না। (গর্হিতান্নং নচাশ্নন্তি পিতরশ্চদিবৌকসঃ। পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড)।

২। তথাপি এই দূষিতান্ন দ্বারা যাহারা উপবাস দিবসেই শ্রাদ্ধ করেন, তাহারা তদনুষ্ঠানের ফলে পরলোকগত মহাত্মা এবং ঐ শ্রাদ্ধে ভোজন-কর্ত্তাদের সহিত স্বয়ং নিরয়াগামী হইয়া থাকেন। (যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধমেকাদশীদিনে। ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)।

৩। অতএব উপবাস দিনে করণীয় শ্রাদ্ধ ঐ দিনে না করিয়া তৎপর পারণার দিনে করিবে। (একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ। তদ্দিনেতু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥ (পদ্মপুরাণ)। একাদশী সদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তকং ভবেৎ। উপবাসং তদাকুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ (স্কন্দপুরাণ) ইত্যাদি ইত্যাদি

সাক্ষাদ্ভগবদুদিত বৈষ্ণবস্মৃতির এমন সুস্পষ্ট ব্যবস্থা থাকিতে একাদশীর উপবাস বাধিত শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতে করিতে বা করাইতে সংশয় করিব কেন ? বিশেষতঃ বৈষ্ণবের দীক্ষা-সংকল্পেও যখন কথিত হইয়াছে "শক্তৌ ফলাদি-ভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে॥" অর্থাৎ শক্তি থাকিতে উপবাস দিনে ফলাদি ভোজন করিবেনা এবং একাদশীর ব্রতোপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করিবেন না।

এভাবে সাক্ষাৎ মন্ত্রগুরু-সকাশে দীক্ষার সময় এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণানুচর বৈষ্ণবগণ কোন প্রাণে কোন প্রমাণবলে উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করিতে যাইবেন তাহা বুঝিতে পারি না।

তিনি। সকলে ত দীক্ষাকালে শ্রীগুরু-সন্নিধানে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন না।

আমি। এই কথা আংশিক সত্য বটে ! আধুনিক কোন কোন গুরু এইরূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু তা বলিয়া সেই গুরু কি শিষ্যকে,—"সদাচার পালন করিতে হইবে," "সত্য পথে চলিতে হইবে," "সর্ব্বদা সৎসঙ্গে থাকিতে হইবে," এইরূপ

কিছুই কি উপদেশ দেন না ? যদি না দেন, তবে তাহাকে প্রকৃত দীক্ষাই বলা যায় না। আর যদি দিয়া থাকেন, তবে এক সদাচার পালন বলাতেই সমুদয় বৈষ্ণবাচার পালন করিতে হইবে ইহাই সূচিত হইয়াছে। যেহেতু দীক্ষা-প্রকরণেই "শ্রাদ্ধংচৈকাদশীদিনে" (একাদশীর ব্রতোপবাস দিনে শ্রাদ্ধ না করা) এই সকল সদাচার কথিত হইয়াছে।

সেস্থলে (সময়াতে) উক্ত হইয়াছে—ভক্ত্যঙ্গ যাজনের অনুকূল ১০৪টি নিয়ম অঙ্গীকার না করাইয়া গুরুদেব শিষ্যকে মন্ত্র প্রদানই করিবেন না। যথা—

"চতুর্য্যুক্ শতসংখ্যেষু প্রাগ্ গুরোঃ সময়েষু চ।
শিষ্যেণাঙ্গীকৃতেষ্বেবদীক্ষাকৈশ্চন মন্ত্যতে॥" বিষ্ণুযামল।

কেহ কেহ বলেন, শিষ্য প্রথমতঃ গুরুদেবের একশত চারিটি নিয়ম অঙ্গীকার করিলেই দীক্ষিত হইতে পারেন।

এখন গুরু দয়াপরবশ হইয়াই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, সমুদয় নিয়মের উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে যদি সদুপদেশ দিয়া মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেন, তবে কি আর শিষ্য দীক্ষাকাণ্ডোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবে না ?

তিনি। তা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে, নতুবা তাহার দীক্ষাই সফল হইবে না—মন্ত্রসিদ্ধিই ঘটিবে না।

আমি। তবে এখন দেখুন্ দেখি স্বয়ং শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, সেই গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, সাক্ষাদ্ভগবৎবাক্য উপেক্ষা করিয়া কোন সাহসে বৈষ্ণবগণ একাদশ্যাদির উপবাস দিবসে শ্রাদ্ধ করিতে যাইবেন ? তাহা হইলে সে দুষ্কৃতকারীর আর কি কোটি কল্পেও নিষ্কৃতি আছে ?

শাস্ত্র বলেন—

আজ্ঞাভঙ্গং গুরোর্দেব যঃ করোতি স মূঢ়ধী।
প্রয়াতি নরকং ঘোরং শূকরত্বমবাপ্নুয়াৎ॥

যে মূর্খ গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, সে ঘোর নরকে পতিত হয় এবং জন্মান্তরে শূকর-যোনি প্রাপ্ত হয়।

বৃথা ধর্ম্মং বৃথা চর্য্যাং বৃথা দীক্ষাং বৃথা তপঃ।
বৃথা সুকৃতিমাখ্যাতিং গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘনান্ নৃণাং॥

গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘনকারীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দীক্ষা, শিক্ষা, জপ, তপ, খ্যাতি,প্রতিপত্তি সকলই বিফল॥ অতএব—

ন লঙ্ঘয়েদ্ গুরোরাজ্ঞামুত্তরং ন বদেত্তথা।
দিবারাত্রৌ গুরোরাজ্ঞাং দাসবৎ প্রতিপালয়েৎ ॥

গুরুর আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিবেনা, এমনকি গুরুবাক্য হইলে (একার্য্য কেন করিব ?) একথাও জিজ্ঞাসা করিবেনা। দিবারাত্র দাসের ন্যায় গুরোরাজ্ঞা পালন করিবে।

আমি এই সন্নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই গুরুবাক্য, পরমগুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য এবং সাক্ষাদ্ভগবদ্বাক্যের অনুসরণ করিয়া পরম নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে একাদশীর উপবাস-বাধিত শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতে করাইয়াছি। ইহাতে আবার সংশয় জন্মিবার কথা কি ?

তিনি। যদি শাস্ত্রবাক্যে অর্থাৎ বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবস্থায় এবং গুরুবাক্যে আপনার এতাদৃশ সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধ অবশ্যই সফল হইয়াছে। ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই ; যে হেতু শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিই শ্রাদ্ধের প্রকৃত অধিকারী। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদীয় "শ্রাস্ত্রীয়-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্টতঃই ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন , যথা—

"শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত" ইতি গোভিলসূত্রাৎ।
"সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে ॥"
ইতি পুলস্ত্যবচনাচ্চ। শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ।
"প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রাদ্ধত্যুদাহৃতা।
নাস্তিহ্যশ্রদ্ধধানস্য ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনম্॥"
ইতি পুলস্ত্যবচনাৎ ॥ শ্রাদ্ধতত্ত্বম্ ॥

"শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে" এই গোভিলবচনে এবং "যে কর্ম্মে সুসংস্কৃত (উত্তমরূপে পাক করা) ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ-দধি-ঘৃতসংযুক্ত অন্ন শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়।" এই পুলস্ত্যের বাক্যে। [শ্রাদ্ধকার্য্যে একমাত্র শ্রদ্ধারই প্রাধান্য দেখা যায়] এই শ্রাদ্ধশব্দের অর্থ—"শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়।" মহর্ষি দেবল বলেন—ধর্ম্মকার্য্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধানামে অভিহিত হইয়াছে, কেননা, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানের কোন আবশ্যকতাই বোধ করেন না॥"

আপনি যখন দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্, তখন আপনার সহধর্ম্মিণীর এই শ্রাদ্ধকার্য্য যে অবশ্য সফল হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারেনা।

তখন উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই একবাক্যে কহিলেন, আপনার এই কার্য্য অবশ্যই শাস্ত্রানুমোদিত। ইহাকে কেহই অকার্য্য বলিতে পারেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং গুরুবাক্যে যাঁহার এতাদৃশ প্রগাঢ় বিশ্বাস, তিনিই প্রকৃত শ্রাদ্ধাধিকারী। আপনি বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবস্থানুসারে একান্ত শ্রদ্ধার সহিত যে ক্রিয়া করাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই শ্রাদ্ধনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

সে সময় আপত্তিকারীদের অন্যতম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় আমাকে কহিলেন,—"আপনার সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবস্থানুসারে করায় মনে যখন কোনই সংশয় উদয় হয় নাই, তখন আবার বিচারার্থ এই বিরাট-সভার আয়োজন কেন?

আমি। যাহাতে জনসাধারণ বৈষ্ণবস্মৃতির উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বতোভাবে তদনুসরণে কৃতকৃতার্থ হইতে পারে, শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানাশ্রয়ে ক্রিয়কাণ্ডের মধ্যদিয়াও পরাভক্তি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্যই এই মহাসভার আয়োজন।

তিনি। সে উদ্দেশ্য এভাবে সিদ্ধ হয় কিনা সন্দেহ, যেহেতু সকলের জ্ঞানবুদ্ধি-ধারণা কখনও একরূপ হয়না। সুতরাং সকলই যে একমত হইবে, একপথে চলিবে, কিছুতেই এইরূপ আশাকরা যায়না। যদি তাহাই হইত, তবে কি আর জগতে এত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইত?

সে যাহা হউক, এখন আমরা মীমাংসার্থ বলিতেছি, বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবস্থানুসারে যখন দেখা যায়, উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করিলে—"ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ।" রূপ মহান্ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়, তখন উক্ত স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ না করিয়া (পতিত শ্রাদ্ধের ন্যায়) তাহা অমাবস্যাতে করিলেই ভাল হয়।

তখন এই বাক্যের অনুমোদন করিয়া পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, ইহাতে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবস্মৃতি উভয়েরই একপ্রকার মর্য্যাদা রক্ষা করা হইল। আমরা মনে মনে এইরূপ সমাধান করিয়াই মীমাংসার্থ সভায় উপস্থিত হইয়াছি। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিরাজমোহন গোস্বামী॥

মহাভাব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দিব্যোন্মাদবৈচিত্রী।

শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ সৌরভ্য-অধর-রস
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভী পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিকে ধায়॥

"সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপের মাধুর্য্যই বল, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যই বল, অঙ্গস্পর্শের মাধুর্য্যই বল, অঙ্গ-গন্ধের মাধুর্য্যই বল, আর অধর-রসের মাধুর্য্যই বল—সমস্তই অনির্ব্বচনীয়, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা কাহারও নাই। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে এমন একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে যে, আস্বাদনের কথাতো দূরে, রূপ-রসাদির কথা শুনিলেই আস্বাদন করিবার নিমিত্ত যেন একটা উৎকণ্ঠাময়ী মত্ততা জন্মিয়া থাকে। সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিবার নিমিত্ত আমার চক্ষুর, তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্ত আমার কর্ণের, তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত আমার ত্বকের, তাঁহার অঙ্গের সুগন্ধ অনুভব করিবার নিমিত্ত আমার নাসিকার এবং তাঁহার অধর-রস পান করিবার নিমিত্ত আমার রসনার বলবতী লালসা জন্মিয়াছে; সখি! আমার ইন্দ্রিয়-বর্গের লালসা আমি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। পাঁচ জন লোক একটীমাত্র ঘোড়ায় চড়িয়া প্রবলবেগে পাঁচটী বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিলে ঘোড়ার যে অবস্থা হয়, সখি! পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা হইয়াছে।"

পঞ্চেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক মনের উৎপীড়নের কথা উঠিতেই প্রভুর হৃদয়ে যেন দুঃখ-সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; তাই নিকটবর্ত্তী রামানন্দ রায়কে বিশাখা-সখী মনে করিয়া তাঁহার নিকটে নিজের আক্ষেপের কথা জানাইতে লাগিলেন;

সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট দস্যুগণ
সভে করে, হরে পরধন॥

"সখি! আমার যাহা দুঃখের কারণ, তাহা কাহারও নিকটে বলিবার কথা নহে। কিন্তু তোমারা আমার প্রাণপ্রিয়-সখী, তোমাদের নিকট আমার গোপনীয় কিছুই নাই। আমার দুঃখের কারণ কি, তাহা বলি শুন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমার চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ অত্যন্ত লালসান্বিত হইয়াছে; এই লালসার তাড়নায় তাহারা যেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে—ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের ক্ষমতা হারাইয়াছে। পরের ধন-সম্পত্তি দেখিয়া লোভ জন্মিলে তাহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত দস্যু-গণ যেমন ব্যাকুল হইয়া পড়ে,—অপহরণ করিতে পারিবে কিনা, নিজেদের কোনওরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে যেমন দস্যুদের তখন আর কোনওরূপ অনুসন্ধানই থাকেনা, আমার ইন্দ্রিয়বর্গের অবস্থাও তদ্রূপই হইয়াছে। সখি! আমি কুলবতী; শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ; তাঁহার মাধুর্য্য-আস্বাদনে আমার অধিকার নাই। আস্বাদনের লোভ আমার পক্ষে শোভনও নহে। কিন্তু সখি! আমার দুঃখের কথা আর কি বলিব! সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্তই আমার ইন্দ্রিয়বর্গের উন্মাদকরী লালসা জন্মিয়াছে!! এই লালসার উন্মাদনায় তাহারা এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছে যে, আমার পক্ষে কি কর্ত্তব্য—আর কিই বা অকর্ত্তব্য,—কোন্‌টী ধর্ম্ম, আর কোন্‌টীই বা অধর্ম্ম, তাহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবার যোগ্যতা তাহাদের নাই। লালসা-উন্মত্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অত্যা-চারের কথা, তোমাকে কিরূপে বুঝাইয়া বলিব সখি!

এক অশ্ব, এককক্ষণে পাঁচ পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে যায়।
এককালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে
এই দুঃখ সহনে না যায়।

সখি! আমার একটী মাত্র মন; পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই একই সময়ে তাহাকে পাঁচ দিকে খুব জোরের সহিত টানিতেছে—চক্ষু টানে শ্রীকৃষ্ণের রূপের দিকে, কর্ণ টানে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের দিকে, নাসিকা টানে অঙ্গগন্ধের দিকে, জিহ্বা টানে অধর-রসের দিকে, আর ত্বক্ টানে গাত্রস্পর্শের দিকে! মনকে প্রত্যেকেই নিজের অভিলষিত বিষয়ের দিকে প্রবলবেগে টানিতেছে, মন কোন্ দিকে যাইবে বলতো সখি! একজনের পরে যদি আর এক জন টানিত—

রূপ দেখার পরে যদি কণ্ঠস্বর শুনার লোভ জন্মিত—তাহা হইলে মনের কোনই অসুবিধা হইত না। কিন্তু তা তো নয় সখি! আমার কোনও ইন্দ্রিয়েরই যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব সহ্য হয় না! সকলেই এক সঙ্গে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল! মন কি করিবে সখি! বুকফাটা পিপাসায় অধীর হইয়া পাঁচজন লোক যদি একটী মাত্র জলপাত্রের নিকটে একই সময়ে উপস্থিত হয়, আর কাহারও যদি ক্ষণমাত্র বিলম্বও সহ্য না হয়—তাহারা পাঁচ জনেই যদি একই সময়ে জল পাত্রটীকে টানিতে থাকে, তাহা হইলে পাত্রটীর যে অবস্থা হয়—সখি! পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা। একটী মাত্র ঘোড়াকে পাঁচজনে যদি একই সময়ে পাঁচদিকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করে; তাহা হইলে ঘোড়াটীর যে অবস্থা হয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের যুগপৎ আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা। সখি! এমতাবস্থায় ঘোড়া যেমন প্রাণে বাঁচিতে পারে না, আমার মনও যেন তেমনি প্রাণশূন্য হইয়া গিয়াছে, মনের যেন আর চেতনা-শক্তি নাই। উন্মত্ত ইন্দ্রিয়-কুলের এত অত্যাচার! এ দুঃখ কি সহ্য হয় সখি!"

ইন্দ্রিয়-বর্গের উদ্দাম-লালসার কথা বলিতে বলিতে, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের বলবতী শক্তির কথা প্রভুর মনে পড়িল; তাই তিনি আবার বলিলেন :—

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সভার কাহাঁ দোষ
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের প্রাণে
মোর দেহে না রহে জীবন॥

"সখি! আমার মনকে নির্দ্দয়ভাবে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া ইন্দ্রিয়-বর্গকে দোষ দিতে পারি না, তাহাদের উপর রাগ করিতেও পারি না। তাহাদের কোন দোষ নাই, কারণ ইন্দ্রিয়-বর্গ ইচ্ছা করিয়া আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিই আমার ইন্দ্রিয়-বর্গকে প্রবল-শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে—এই আকর্ষণে বাধা দিবার শক্তি আমার ইন্দ্রিয়-বর্গের নাই। সুবৃহৎ চুম্বকের আকর্ষণে যেমন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড বাধা দিতে পারে না, চুম্বকের দিকে যেমন লৌহখণ্ডকে আকৃষ্ট হইতেই হয়, শ্রীকৃষ্ণ রূপাদির আকর্ষণেও তদ্রূপ আমার ইন্দ্রিয়-বর্গ আকৃষ্ট না হইয়া স্থির থাকিতে

পারে না। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের যোগ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণরূপাদির আকর্ষণে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনও আকৃষ্ট হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের দলিতাঞ্জন-চিক্কণ নবঘন-স্নিগ্ধরূপ আমার নয়নকে, তাঁহার অমৃত-নিন্দি কণ্ঠধ্বনি আমার কর্ণকে, তাঁহার মৃগপদ-নীলোৎপল-বিজিত অঙ্গগন্ধ আমার নাসিকাকে, তাঁহার ইতর-রাগ-বিস্মারণ অধর-রস আমার রসনাকে এবং তাঁহার কোটিচন্দ্র সুশীতল গাত্রস্পর্শ আমার ত্বককে আকর্ষণ করিতেছে— এই আকর্ষণ এতই প্রবল যে, আকর্ষণের নির্দ্দয়তায় আমার ইন্দ্রিয়বর্গ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। সখি! আমার ইন্দ্রিয়বর্গই যখন প্রাণ হারাইতেছে, আমার দেহে আর কিরূপে প্রাণ থাকিবে ?”

“সখি! তোমরা আমার হিতৈষিণী, তোমরা হয়তো উপদেশ দিবে— শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের যখন এতই আকর্ষণ, তখন সেই আকর্ষণের সীমা হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে দূরে রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। দূরে রাখিতে পারিলে ভাল হইত, তা সত্যই, কিন্তু তাহা তো অসম্ভব। প্রবল বন্যায় সমস্ত দেশ যখন ভাসিয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড কোথায় আত্ম-গোপন করিবে সখি!—

কৃষ্ণরূপামৃত-সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু,
একবিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥

সখি! শ্রীকৃষ্ণরূপের অদ্ভুত শক্তির কথা কি আর বলিব! শ্রীকৃষ্ণরূপের যে মধুরতা, তাহার নিকটে অমৃতের মধুরতাও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত; এই রূপ-মাধুর্য্য আবার সমুদ্রের মতনই অসীম, অতল—যতই আস্বাদন করা যায়, ততই যেন এই মাধুর্য্য বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, ইহার আর কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। আবার সমুদ্রে যেমন সর্ব্বদাই তরঙ্গ থাকে, শ্রীকৃষ্ণের দেহেও তদ্রূপ নিত্য নবায়মান রূপের লহরী খেলা করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপলহরী প্রবল বন্যার ন্যায় সমস্ত জগতকেই প্লাবিত করিয়া থাকে। জগতকে প্লাবিত করিতে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র রূপের প্রয়োজন হয় না—রূপের এক কণিকাই যথেষ্ট। যাহা জলে ডুবিয়া যায়, তাহার যেমন সকল দিকেই জল থাকে, আর তাহার ভিতরেও যেমন জল প্রবেশ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের

এক কণিকাতেই জগতকে এমন ভাবে ডুবাইতে পারে যে, সমগ্র জগদ্বাসী ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই কেবল কৃষ্ণরূপই দেখে, শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না—নয়ন মুদিলেও কৃষ্ণরূপ দেখে, খুলিলেও কৃষ্ণরূপই দেখে।

এই শ্রীকৃষ্ণরূপ-সমুদ্রের আরও এক অদ্ভুত-শক্তির কথা বলি শুন। তোমরা সকলেই জান, দেশে যখন বন্যা আসে, তখন অনেক উচ্চ ভূমি জলমগ্ন হইয়া যায়; পাহাড় পর্ব্বত কখনও জলমগ্ন হয় না; হইলেও ছোট ছোট পাহাড়গুলি হয়তো কোনও সময়ে জলমগ্ন হইতে পারে, কিন্তু সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গ কখনও জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া কেহই শুনে নাই; কিন্তু সখি! আশ্চর্য্যের বিষয়,—শ্রীকৃষ্ণ-রূপের বন্যা রমণীদিগের পাতিব্রত্যরূপ সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গকেও জলমগ্ন করিয়া ফেলে—কেবল তাহাই নহে—গিরিশৃঙ্গের মূলোৎপাটন করিয়া, সামান্য তৃণখণ্ডের ন্যায় তাহাকে স্রোতোবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়। গিরিশৃঙ্গ যেমন ঝড়-বৃষ্টি-আদি কিছুতেই বিচলিত হয় না, কুলবতীদিগের পাতিব্রত্যও তদ্রূপ অচল, অটল। তাঁহারা অম্লানবদনে অগ্নিকুণ্ডাদিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি সতীত্বে বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। উচ্চ-গিরিশৃঙ্গ যেমন চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত বস্তুর উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, কুলবতীদিগের সতীত্বও তদ্রূপ তাঁহাদের অন্যান্য গুণরাজীর শীর্ষস্থানে অবস্থান করে। কিন্তু এমন যে সমুচ্চ এবং সুদৃঢ় পাতিব্রত্য, শ্রীকৃষ্ণ-রূপের প্রবল বন্যা তাহারও মূলোৎ-পাটন করিয়া স্রোতের মুখে সামান্য তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই সর্ব্বনাশা রূপের এক কণিকার দর্শন পাইলেই—ত্রিজগতে যত কুলবতী ললনা আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় নারীধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়া থাকেন। সখি! ত্রিজগতে এমন কোন্ রমণী আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার নারীধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? এই রূপের এমনই দুর্দ্দমনীয়া শক্তি!"

"এই তো গেল শ্রীকৃষ্ণের রূপের অত্যাচারের কথা। আর তাঁর কণ্ঠস্বরের যে অত্যাচার, তাহা একেবারে অকথ্য!

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানারস-নর্ম্মধারী
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরী-গুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥

সখি! শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই মধুর; শুধু কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্তই জগতের নারীগণ উৎকণ্ঠিতা। তাহার উপর আবার, ঐ মধুর কণ্ঠস্বরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কথা প্রকাশ করেন, তাহাও নানাবিধ নর্ম্ম-পরিহাসাদিতে পরিপূর্ণ—শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রসের উৎসতুল্য। সখি! শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের অত্যাচারের কথা আর কি বলিব! কোনও নিষ্ঠুর উৎপীড়ক ব্যক্তি কোনও জীবের কাণে রজ্জু লাগাইয়া খুব জোরের সহিত আকর্ষণ করিলে কাণের যে অবস্থা হয়, শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের আকর্ষণেও জগতের নারীগণের কাণের সেই অবস্থা হইয়াছে। কাণে রজ্জু লাগাইয়া টানিলে কাণ যেমন রজ্জুর দিকেই উন্মুখ হইয়া থাকে, নারীগণের কাণও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুরীর দিকেই উন্মুখ হইয়া আছে, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্ম-পরিহাসের মধুর বচন শুনিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত। এই উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা, কর্ণসংলগ্ন রজ্জুর যন্ত্রণা হইতেও তীব্রতর। সখি! নারীগণের কর্ণের উপরে, শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের এইরূপ উৎপীড়ন যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়?"

"শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের স্পৃহণীয় শীতলত্বের শক্তি যে কিরূপ, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি, শুন:—

কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দুচন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন॥

"সখি! শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের সুশীতলতার তুলনা জগতে মিলেনা; আমাদের ব্যবহারের জিনিসের মধ্যে চন্দনই সর্ব্বাপেক্ষা শীতল; আর আমাদের দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা শীতল। কিন্তু সখি! কৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার নিকটে ইহারা নিতান্ত নগণ্য। চন্দ্রের বা চন্দনের শীতলতায় সময় সময় তৃপ্তির অভাব জন্মিতে পারে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের শীতলায় এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে, অথচ আহাতে শৈত্যের তীব্রতাজনিত দুঃখ নাই—যতই অনুভব করা যায়, অনুভবের লালসা যেন ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সমগ্র শীতলতার কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার এক কণিকার নিকটেও কোটি কোটি চন্দ্রের এবং রাশি রাশি চন্দনের শীতলতা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত, এই শীতলতার যে কি অপূর্ব্ব-শক্তি, তাহা আর কি বলিব!

সুশীতল চন্দ্র সমুদ্রের তরল জলকেই আকর্ষণ করিতে পারে; কিন্তু আকর্ষণ করিলেও জলকে নিজের নিকটে লইয়া যাইতে পারেনা, কেবল মাত্র জলের সামান্য একটু চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়া সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের সৃষ্টি করে মাত্র; ক্ষুদ্রতম পর্ব্বতকেও আকর্ষণ করিবার শক্তি চন্দ্রের নাই। কিন্তু সখি! কৃষ্ণাঙ্গ-শীতলতার অপূর্ব্ব শক্তির কথা বলি শুন। ইহা যুবতী রমণীগণের সমুন্নত স্তনরূপ পর্ব্বতদ্বয়ের সহিত বক্ষঃস্থলকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে, আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গাত্রসংলগ্ন করাইতে সমর্থ! কেবল একটী নয়, দুইটী সমুচ্চ পর্ব্বতকেই আকর্ষণ করিবার শক্তি কৃষ্ণাঙ্গ-শীতলতায় আছে। আবার কেবল পর্ব্বতদ্বয়কেই নহে,তাহাদের আশ্রয়স্থল-বক্ষকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিবার শক্তি ইহার আছে। পর্ব্বতের আশ্রয় যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর সহিত পর্ব্বতকে আকর্ষণ করিয়া চন্দ্র যদি নিজের নিকটে নিতে পারিত, তাহা হইলে বরং চন্দ্রের শীতলতার সহিত কৃষ্ণাঙ্গ-শীতলতার কিছু তুলনা হইতে পারিত; কিন্তু এক চন্দ্রের কথা কি বলিব সখি! কোটি চন্দ্রও তাহা পারেনা; অচল পর্ব্বতকে নেওয়ার কথা তো দূরে, তরল জলকেও বুঝি কোটিচন্দ্রের সমবেত আকর্ষণে চন্দ্রের নিকটে নিতে পারেনা। সখি! কৃষ্ণাঙ্গের সুশীতলত্ব অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়। এই অনির্ব্বচনীয় শক্তিসম্পন্ন শীতলত্ব রমণীগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত লালসান্বিত করিয়াছে।”

“এই তো গেল, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-শীতলতার কথা; তাঁহার অঙ্গ-গন্ধের কথাও কিছু বলি শুন।

কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদ-হর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব-ধন।
জগত নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ॥

সখি! কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের যে অপূর্ব্ব চমৎকারিতা, তাহার কথাই বা কি বলিব? বাক্যের দ্বারা ইহা প্রকাশ করিবার শক্তি কাহারও নাই। এমন কোনও সুগন্ধি-বস্তুও জগতে নাই, যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতে পারে। সুগন্ধিদ্রব্যের মধ্যে দুইটীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা জানি—মৃগমদ, আর নীলোৎপল। কিন্তু সখি! কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভের নিকটে ইহারা উভয়েই নিতান্ত নগণ্য—গন্ধের চমৎকারিতায়ও নগণ্য, গন্ধের

স্থায়িত্বেও নগণ্য, আবার গন্ধের ব্যাপকতায়ও নগণ্য। মৃগমদ বা নীলোৎপল যে স্থানে নেওয়া যায়, সে স্থানে অনেকক্ষণ তাহার গন্ধ থাকে বটে, কিন্তু সখি! তা কতক্ষণই বা থাকে? চিরকাল তো আর থাকেনা? দু'চার মাসও থাকেনা। কিন্তু সখি! যে রমণীর নাসিকায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ একবার প্রবেশ করিয়াছে, সেই রমণী সর্ব্বদাই—চিরকালই নিজের নাসিকায় সেই অপূর্ব্ব সুগন্ধ অনুভব করিতে থাকে। এই সুগন্ধ যেন তাহার নাসিকায় স্থায়ী বাসস্থানই নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া থাকে। আরও অপূর্ব্ব বিশিষ্টতার কথা শুন সখি! যে স্থানে মৃগমদ বা নীলোৎপল থাকে, কেবল সেই স্থানেই অল্প কতটুকু যায়গা ব্যাপিয়া ইহার গন্ধ প্রসারিত হয়, ইহা কখনও সমস্তজগৎ ব্যাপিয়া প্রসারিত হয়না। কিন্তু সখি! কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ কেবল দু'একজন নারীর নাসিকাতেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকেনা,—জগতে যে স্থানে যত রমণী আছে, তাহাদের সকলের নাসিকাতেই তাহার ব্যাপ্তি।

আবার আরও একটী অপূর্ব্বতা এই যে, এই গন্ধ রমণীগণের নাসিকায় সর্ব্বদা বাস করিলেও, ইহার স্বাদ-গ্রহণের তৃষ্ণা কখনও নির্ব্বাপিত হয়না—বরং প্রতি মুহূর্ত্তেই আরও অধিকতর-রূপে অনুভব করার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে। সখি! এই সমস্ত কারণেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ নারীগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত লালসান্বিত করে।"

"আরও দু'একটী কথা শুন সখি! শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস সম্বন্ধেও কিছু বলিঃ—

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।
ছাড়ায় অন্যত্র লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন॥

"সখি! কৃষ্ণের অধর-সুধার মাধুর্য্যের কথা বলিবার শক্তি আমার নাই। যে রমণী একবার ইহা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার মন আর অন্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইতে পারেনা, সর্ব্বদাই ঐ অধর-সুধা আস্বাদন করিবার নিমিত্তই তাঁহার মন লোলুপ—তাঁহার নিকটে অন্য বস্তুর মাধুর্য্য—তাহা যতই রমণীয় হউক না কেন—শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার মাধুর্য্যের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ। যে রমণী কখনও ইহার স্বাদ পায়েন নাই, শ্রীকৃষ্ণের অধরে মন্দহাসি দেখিলে তিনিও আর স্থির থাকিতে পারেন না। সখি! যে কখনও অমৃতের স্বাদ গ্রহণ

করে নাই, অমৃতের স্বাদের কথা শুনেও নাই, সে জানে না অমৃত কত মধুর; সুতরাং অমৃত দেখিলেও তাহার লোভ না জন্মিতে পারে। কিন্তু অমৃতের সঙ্গে যদি কর্পূর মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ঐ কর্পূরের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কর্পূরবাসিত অমৃত আস্বাদনের নিমিত্ত সে-ও চঞ্চল হইয়া উঠে। তদ্রূপ সখি! যে নারী কখনও কৃষ্ণের অধর-রস পান করে নাই, সেই নারীও যদি তাঁহার মনোরম অধরে মন্দহাসিটুকু একবার দেখিতে পায়, তাহা হইলে ঐ হাস্যোজ্জ্বল অধরের সুধাপান করিবার নিমিত্ত তাহার চিত্তে বলবতী লালসা ও উৎকণ্ঠা জন্মিয়া থাকে। সখি! কৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতে না পারিলে মনে যে দুঃখ জন্মে, তাহা বর্ণনাতীত—কোনও ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ের সমস্ত মূলধন হারাইয়া ফেলিলে তাহার চিত্তে যে দুঃখ জন্মে, কৃষ্ণের অধর-সুধা হইতে বঞ্চিত নারীর দুঃখের নিকটে তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।"

দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার ভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে হঠাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল; তখন দেখিলেন, স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দ বিষণ্ণচিত্তে তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া তখন প্রভু দুই হাতে তাঁহাদের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া গভীর বিষাদের সহিত বলিলেন—

শুন স্বরূপ-রামরায়।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥

"প্রাণের স্বরূপ! প্রাণের রামানন্দ! কৃষ্ণ-বিরহে আমার প্রাণ যায়; বল বল আমি কি করিব? কোথায় যাইব? কোথায় গেলে আমার প্রাণের কৃষ্ণধনকে পাইব? তোমরা উপায় বলিয়া দাও; নতুবা বুঝি আমার আর প্রাণরক্ষা হয় না।"

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

ভারতী-মহোৎসব।

গত ২৯ শে মাঘ শনিবার ভৈমী একাদশী তিথিতে শ্রীপাট দেন্দুড় গ্রামে শ্রীপাদ কেশব-ভারতী-প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব—শ্রীঅষ্টপ্রহর-শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন,

মুখে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তৎপরদিন প্রভাতে-কুঞ্জভঙ্গ-সঙ্কীর্ত্তন ও ধূলট্-উৎসব, মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবাদি ভোজন এবং অপরাহ্নে উৎসব উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ এবং গান-গীত হইয়াছিল। আমরা "সাধনায়" তন্মধ্যে শ্রীযুত তারাপদ মুখোপাধ্যায় ব্যাকরণস্মৃতিতীর্থের প্রবন্ধ এবং ডাক্তার কালীপদ ডাক্ষিতের গানটী দিলাম। এইদিন বর্দ্ধমান জেলার আউরিয়া গ্রামেও ভারতী-প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী।

গীত।

আজি ভারতী-মন্দিরে
জাগ্রত কর নিদ্রিত যারা
উদ্বোধি আখিনীরে।
প্রেম-সম্ভারে সাজায়ে অর্ঘ্য,
ডেকে আন আজ ভূতলে স্বর্গ,
ছুটুক আবার প্রেমের উৎস
পাষাণের বুক চিরে।
ওই ঋষিবর ভারতী-চরণে,
কর নিবেদন ব্যথিত বেদনে
"হে ঋষি আজ নিমায়ে তোমার—
নিয়ে এস, এস ফিরে।"
মোহ-মদিরা-বিহ্বল ভ্রান্ত,
বিশ্বের জীবে করিতে শান্ত।
কে দিবে ঔষধি, কে ছিটাবে বারি
যদি না সে গোরা ফিরে॥

শ্রীকালীপদ ডাক্ষিত এম, বি,

ভারতীস্মৃতি। *

আজ আমরা সকলে এই যে পুণ্য-ক্ষেত্রে সমবেত হয়েছি, সে স্থানের সংস্পর্শে এসে আমরা নিজেদিগকে পবিত্র জ্ঞান কর্‌ছি, যে পুণ্য-ভূমি সন্দর্শন মাত্রেই

* দেনুড়ে, শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর আবির্ভাব-মহোৎসবে পঠিত।

অতীতের একটা ধূমায়মান বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যে স্মৃতির আলোক-রশ্মি উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ছে, যে কাহিনী স্মরণ ক'রে নয়ন-যুগল বাষ্পজলে পূর্ণ হয়ে আস্‌ছে, অতীতে সে কোন্ দিন এসেছিল, সে কোন্ বাঞ্ছিত রত্ন লাভ ক'রে এই পুণ্যক্ষেত্র সমুদ্ভাষিত হয়ে উঠেছিল, তা আজ স্পষ্ট ক'রে জনসমাজে প্রকাশ কর্‌বার শক্তি না থাক্‌লেও, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে সে ভাবোচ্ছ্বাস আর রুদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ছিনা। এই পল্লীর শ্যামলিমার বুকে, এই কোকিল-শ্যামা-দয়েলের কলতান-মুখরিত নিভৃত কুঞ্জে, এই শ্যামল শষ্পাস্তৃত প্রকৃতির স্বরচিত সভামণ্ডপে যে কোন গুণী মহাত্মার আবির্ভাব হয়েছিল, যার জন্য এই ক্ষুদ্র পল্লী বঙ্গের মধ্যে আপন গৌরবের পরিচয় পরিস্ফুট ক'রে তুল্‌তে পেরেছে; আজ আমরা সেই সর্ব্বগুণময় মহাত্মার পরিচয় পূর্ণ প্রকাশ কর্‌তে পারবনা; তবে তাঁর পবিত্র স্মৃতি-মূলে ভক্তির অর্ঘ্য-পুষ্প নিবেদন কর্‌তে বদ্ধাঞ্জলি হ'য়ে দণ্ডায়মান হয়েছি। আমিও যেমন জানি, আপনারা সকলেই ঠিক তেমনই জানেন—এক অতীত যুগে এক কনক-রাগ-রঞ্জিত প্রভাতে, এক মলয়ানিল-পরিষেবিত শান্তিময় বিপ্রকুটীরে এক মহাপুরুষ—শিশুরূপে এই পুণ্য ভূমির বক্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন তাঁকে শাস্ত্রাধ্যাপনারত পণ্ডিত মুকুন্দমুরারি ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামভদ্র বলেই সেখানকার লোকে জেনেছিল; কিন্তু তিনি যে পতিত-পাবন কলি-কল্মষহারী শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের গুরুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন কেউ তা জান্‌তে পারে নাই। তথাপি পল্লীর নরনারী অবাক্ বিস্ময়ে এই নবাগত দেব-শিশুর প্রতি নির্ণিমেষে চেয়ে থাক্‌ত। আহা কি শ্রীঅঙ্গের দিব্য দ্যুতি! কি আকর্ণ-বিস্তৃত প্রশস্ত ললাট—কি ভ্রমর-লাঞ্ছিত কুঞ্চিত-কেশ, কি বংশীরব-নিন্দিত সুমধুর কণ্ঠধ্বনি, সর্ব্বোপরি বালকের কি প্রাণভরা স্বর্গীয় ভক্তিভাব! কে গো তুমি অন্ধ আমাদের ঠুলী বাঁধা চোখ দুটো খুলে দিয়ে দিব্য দ্যুতিতে তা ঝল্‌সে দিতে এসেছ, কে গো তুমি পান্থসখা! পথভোলা আমরা, আমাদের হাত ধ'রে খেয়াঘাটের যে কোন করুণা-প্রবণ নাবিকের কাছে নিয়ে চলেছ? জানিনা তুমি কতকাল কতরূপে কত যুগে যুগে কত ভাবে এমনি ক'রে সুষুপ্তির মোহজাল ছিন্ন করে, নিদ্রিত ভ্রান্ত-জনকে জাগিয়ে তুলে পথ ধরিয়ে দিয়েছ, আজ ভাব্‌তে পারিনা দেব! বল্‌তে পারিনা প্রভু? ভাষা জোগায় না দয়াময়! তোমার অহৈতুকী করুণার যাতে কণা মাত্র প্রকাশ হ'তে পারে। দেহুড়বাসী, তথা তদ্দেশবাসী যখন এমনিই

ভাবে বালকের প্রতি প্রেমাসক্ত, তখন সেই বালক—বালক বৈ কি? যখন আমরা সেই পরম দেবতাতে মনুষ্যত্বের আরোপ করেছি, তিনি যখন আমাদেরই খেলাঘরে আমাদেরই গৃহ-প্রাঙ্গণে আমাদের সঙ্গে মিশে একদিন আমাদিগকে ভালবাস্‌তে, কাঁদতে, ভাবতে, শিখিয়ে গেছেন, তখন তাঁকে আমাদেরই ভেবে আমাদের কথায় পরিচয় দেবার অধিকার পেয়েছি বৈকি? তখন সেই বালক একদিন সকলের প্রেমবন্ধন, ভালবাসার আকর্ষণ ছিন্ন করে ব্রহ্মচারি-বেশে নিরুদ্দিষ্ট হলেন। দেনুড়বাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেঁদে আকুল হ'ল। বৃদ্ধ মুকুন্দমুরারি নয়নের জলে দৃষ্টিহারা হলেন, জ্যেষ্ঠ সহোদর বলভদ্র ভ্রাতৃশোকে উন্মাদপ্রায় হলেন। আমরা তাঁকে পেয়ে হারালেম, তিনি চেনা দিয়েও চিনতে দিলেন না, আজ কোথায় পাই তোমায় ওগো জগদ্‌গুরু!" ওগো বিশ্ব-প্রেমিক! ওগো আর্ত্তবৎসল! এস দেব! এবার তোমায় চিনেছি, তোমায় আবার পেতে চাই, তোমার সেই মধুরোজ্জ্বল আলোকের রশ্মিতে চির তমসাচ্ছন্ন এ হৃদয়কন্দর আলোকিত করতে চাই—এস প্রভু! এস পথিক বন্ধু! এস দীন-বৎসল!

ভক্তের আকর্ষণে তিনি কি দূরে থাক্‌তে পারেন? কিছুকাল পরে দেনুড় বাসীরা সংবাদ পেলেন, তাদের সেই স্নেহের ধন, ভালবাসার নিধি, কামনার—কল্পতরু, রামভদ্র কাটোয়ার নিকট খাটুন্দীনামক স্থানে ব্রহ্মচারি-সন্ন্যাসীর বেশে কেশব-ভারতী আখ্যায় জগন্মঙ্গল-ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছেন। ছুটল আকুল প্রাণে তারা ফিরিয়ে আন্‌তে—তাদের হারানিধিটিরে। বলভদ্র পাঠালেন তাঁর পুত্র স্নেহের গোপালকে পিতৃব্যের সামীপ্য লাভ করে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করবার জন্য; কিন্তু সব ব্যর্থ হ'লো। অনন্ত-বিমান-বিহারি-বিহঙ্গ আর সংসার-খাঁচায় ধরা দিলেন না, সকলকে মধুর বচনে পরিতুষ্ট ক'রে স্বগৃহে ফেরালেন, ভ্রাতৃবংশধর গোপালকে গোপালমন্ত্র মূলধন দিয়ে বালগোপাল-মূর্ত্তি-পঞ্চক প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়ে পিতৃবংশ রক্ষণের জন্য আবার স্বধামে ফিরিয়ে পাঠালেন। কুলোজ্জ্বল গোপালও গুরু ও পিতৃব্যের অনুজ্ঞা সযত্নে শিরে ধারণ করে দেনুড় গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হলেন, গোপাল-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ-পঞ্চকের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তিত্রয় আজিও আমাদের নয়নের পাপতমঃ নিরাকৃত ক'রে ভারতী-প্রভুর বাল্যাশ্রম দেনুড় ব্রহ্মচারি-ভবনে বিরাজ করছেন। সেই কুলপাবন গোপালের বংশ-সম্ভূত ভক্ত মহাত্মাগণ তদবধি আজি পর্য্যন্ত শাখ্য ব্রহ্মচারী আখ্যায় অভিহিত হয়ে

এখনও ভারতী-প্রভুর সঞ্চারিত ভাব-ধারার প্রবাহে শুষ্ক এ পল্লীকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছেন। দেনুড়ের বর্ত্তমান ব্রহ্মচারী-বংশের পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ভক্ত শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সরোজাক্ষ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মহাত্মা যেন দেনুড়ের নিভৃত বক্ষঃ আলোকিত করে ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত পবিত্র প্রেমধর্ম্মের প্রচার করে এতদ্দেশকে ধন্য ও গৌরবময় করে তুলেছেন। আমরা আজ সেই পরমপুরুষ ভারতীপ্রভুর পবিত্র-স্মৃতি-মূলে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রসূনাঞ্জলি ঢেলে দিয়ে ও ব্রহ্মচারী-বংশীয় মহাত্মা-গণের স্বধর্ম্মোন্নতি কামনা করে আজ এই ক্ষুদ্র বক্তব্যের উপসংহার করলুম। শ্রীগৌরোজ্জ্বরতি।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়
স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ।

কেমনে তা'কে বল্‌ব চেনা ?

আমার সাম্‌নে চির অচেনা তুমি, যদিও তাঁদের চেনা হও।
চোখের পাতা বুজিয়ে জলে কেন গো লুকিয়ে লুকিয়ে রও॥
চ'খে বুকে, আর প্রাণের পথে তোমার সাথে মিশতে চাই।
মন ভুলিয়ে আড়াল দিয়ে কেন চোখে দেওগো ছাই ?
আশে পাশে তুমি, সবাই বলে মিশ্‌তে আস বারম্বার।
এমন আসা এসো না ওগো (যাতে) বাজেনা হৃদয়-বীণার তার।
না চেনে কি তোমায় কইব আমি এখনো কি তুমি আছ অচেনা,
দেখিনি চরণ-রেখা কভু যাঁর কেমনে তা'কে বল্‌ব চেনা ?
যদি, যদু মধু শ্যাম রামের মত আমার সাথে কইতে কথা।
বুঝ্‌তুম তবে চেনা বটে ঘুচ্‌ত সকল মনের ব্যথা।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামি-কাব্যতীর্থ

প্রত্যাবর্ত্তনে।

("গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।"—বিদ্যাপতি)

পরদেশ ভ্রমি বহুদিন, ফিরে এসেছি আপন ঘরে,
হে রাজাধিরাজ! হে বিচারপতি! ক্ষমিয়া লবে কি তারে?
যাহা কিছু তুমি দিয়েছিলে সাথে, সব্ হারায়েছি সংসার-পথে,
হতাশ হৃদয়—প্রাণ, মন ল'য়ে (আজ) এসেছি তোমার দ্বারে!
ক্ষমিয়া লবে কি তারে?

তোমার মহান্ সিংহাসন তলে, শঙ্কিত-চিতে নয়নের জলে
রাজাধিরাজের আদেশ পালিতে দাঁড়ায়েছি করযোড়ে!
ক্ষমিয়া লবে কি তারে?

উপার্জ্জিত কিছু আনি নাই সাথে শত ঋণ ল'য়ে এসেছি,
মূলধন মোরে দিয়েছিলে যাহা—তাহাও হারায়ে ফেলেছি।
লভিতে শরণ তোমার চরণে, আসিয়াছি আজ আকুল পরাণে,
ভরসা—নিরাশা—আশা উদ্বেগে শূন্য হৃদয় জুড়ে।
আজি এসেছি তোমার দ্বারে।

তোমার আদেশ না শুনিয়া আমি বহুবার হেন গিয়েছি,
ফিরিবার কালে শত ঋণ-ভার মাথায় করিয়া এনেছি।
তুমি করুণার ধারা করিয়া সিঞ্চিত, মৃতপ্রায় দেখি কোরেছ জীবিত,
কত অপরাধ করিয়াছ ক্ষমা—অবোধ ভাবিয়া মোরে।
(আজ) ক্ষমিয়া লবে কি তারে?

নিজ ঘর ছাড়ি' বিদেশেতে আর যাব'নাকো কোন দিন,
হে দয়ার রাজা!—এবার আমার শুধি' দাও সব ঋণ!
রুধি' লহ তব মহান করুণা, কর মোরে সদা প্রবল তাড়না,
—চেতনা জাগিবে হৃদয়ে আমার (তব) রুদ্র মূরতি হেরে।
ক্ষমিয়া লহ গো তারে।

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী।

মৌচাক।

(শ্রীআনন্দ ভট্ট লিখিত)

সত্য "আমি" নিত্য। আমরা অনন্ত আমি অনুভব করি—ব্রাহ্মণ আমি, ধনী আমি, মানী আমি ইত্যাদি। এই অনন্ত আমি—আবার বিজলীর মত কোথায় মিশিয়ে নূতন আমির উদ্ভব হয়। তখন রামের পিতা আমি, শ্যামের বন্ধু আমি, যদুর ঠাকুরদাদা আমি। নূতন অনন্ত আমি আবার যমের নিষ্ঠুর আহ্বানে একেবারে জনমের মত মিশিয়ে যায়, আবার একেবারেই নূতন করে' আমির উদ্ভব হয়—যা'কে বলে পুনর্জ্জন্ম। এইরূপে "করম-বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ"—নূতন নূতন আমির সৃষ্টি। অর্থাৎ পুরাতন আমি ও আমার যাওয়া—নূতন আমি ও আমার উদ্ভব। এ'কেই বলে সংসার (সংসরতি সম্যক্ পরিবর্ত্ততে অহন্তা অস্মি স্নিতি—সংসারঃ।)

এ যে আমি, ইহা দুদিনের ; জনমের মত 'আমি' নয়। এমন এক 'আমি' আছে, যা' শাশ্বত, যা' বিধ্বংসহীন। তা' হ'ল স্বরূপের আমি, এর পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন নেই।

জীবের স্বরূপে এক আমি লেগে আছেই। ইন্দ্রিয়সকল ও অহঙ্কারতত্ত্ব লোপ হ'য়ে গেলেও "সুখমহমস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এই অনুভব যে 'আমি'র বলে হয়।

সেই 'আমি'কেই বলে খাটি 'আমি'। অন্য সকল 'আমি' কৃত্রিম। "অহমিবাচরতি ইতি ক্বিবন্তং কৃত্রিমমহম্"—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

কৃত্রিম আমির বন্ধন ছিড়ে' যদি ঠিক আমিতে জীব পৌছ্‌তে পারে, তখনই জীব কৃতার্থ ও ধন্য। সেই আমিতেই অমৃত প্রস্রবণ উদ্গীর্ণ। সেই আমিতেই মাখা থাকে "নিত্য কৃষ্ণদাসোঽহম্।" এই আমিই নিত্যসিদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত। ইহার কখনও পতন নেই, কারণ ইহা স্বরূপানুবন্ধী।

এই নিত্যসিদ্ধ বুদ্ধমুক্ত কৃষ্ণদাস আমির স্ফূর্ত্তি, ভগবৎপ্রেমেই সম্ভাবিত হ'তে পারে। এর মূল কেন্দ্রভূমি ভগবৎপ্রেম। তাই এই পবিত্রতম আমির পূর্ণ উদ্বোধনের জন্য প্রেমের প্রয়োজনীয়তা। তা'তেই প্রেম হ'য়েছেন প্রয়োজনতত্ত্ব।

সেই নিত্য আমি শুদ্ধ আমির শুভ্র কিরণচ্ছটায় ব্যবহারিক সুখ দুঃখ তলিয়ে

যায়। হৃদয়ভরে তখন পবিত্র স্নিগ্ধ মধুর সনাতন আনন্দ ফুটে উঠে। যার টানে টানে হৃদয়বীণার প্রতি তন্ত্রী গভীর ভাবে বাজবার মত বেজে উঠে।

ওগো মরু-মরীচিকার ভ্রান্ত পান্থ, তোমরা কি তোমাদের ভেতরকার বস্তুটা খুঁজে দেখ্‌বে না? তোমাদের আহাম্মকী কি ঘুচ্‌বে না?

শ্রীমদ্ভাগবত।

জয় সকল নিগমাগম-সার।
মহামুনি ব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবত
শুক মুখ অমৃত পসার॥
পরীক্ষিত মহারাজ ব্রহ্মশাপ করি ব্যাজ
করিলা যে ধনের প্রসার।
মহাপ্রভু-নিজগণে আস্বাদিলা জনে জনে
প্রেমামৃত রসের পাথার॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্ব-রসান্বিত
প্রত্যক্ষরে কত অর্থ কয়।
প্রেমভক্তি-রসাস্বাদে স্বাদু স্বাদু পদে পদে
কৃষ্ণ নাম রূপ লীলাময়॥
কৃষ্ণ লীলা ঝলমল রতনময় কুণ্ডল
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সে কুণ্ডল কাণে দিলে আপনি গোবিন্দ ভুলে
লোভে করে নিজ পরিকর॥
স্বরূপ রামানন্দ সনে মূল শ্লোক আস্বাদনে
উথলিল যেই ভাবসিন্ধু।
সে গৌরাঙ্গের ফেলালব আস্বাদিয়া ভক্ত সব
গোপীবাসে দেহে এক বিন্দু॥

শ্রীগোপীনাথ বসাক।

গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা-বিচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২১। তৎপরে প্রভুর নীলাচলে উপস্থিতি-প্রসঙ্গ। ভক্তপাঠকগণ অবগত আছেন, প্রভুর অগণিত শ্রেষ্ঠভক্তগণের মধ্যে ব্রজরসের পূর্ণ পাত্র মাত্র সাড়ে তিন জন ছিলেন—স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দ রায়, উড়িষ্যাবাসী শিখি মাহিতী ও তাহার ভগ্নী মাধবী দাসী। স্ত্রীলোক বলিয়া মাধবী অর্দ্ধস্থানীয়া। মাধবী ভক্তকবি। তিনি প্রভুর অন্ত্যলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং কোন কোন লীলা তাঁহার স্বরচিত পদে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। মাধবীর রচিত প্রভুর নীলাচলে আগমনের পদটি প্রসিদ্ধ। সম্পূর্ণ পদটি এই :—

কলহ করিয়া ছলা,　　আগে পহুঁ চলি গেলা,
ভেটিবারে নীলাচল রায়।
যতেক ভকতগণ,　　হৈয়া সকরুণ মন,
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥
নিতাই বিরহ অনলে ভেল অন্ধ।
আঠার নালাতে হৈতে,　　কান্দিতে কান্দিতে পথে,
যায় নিতাই অবধূত চন্দ্র॥
সিংহদুয়ারে যাইয়া,　　মরমে বেদনা পাইয়া,
দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
হরেকৃষ্ণ হরি বোলে,　　দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে,
নীলাচলবাসীরে সুধায়॥
জাম্বুনদ হেম জিনি,　　গৌরাঙ্গ বরণখানি,
অরুণ-বসন শোভে গায়।
প্রেম-ভরে গর গর,　　আঁখিযুগ ঝর ঝর,
হরি হরি বোল বলি ধায়॥
ছাড়ি নাগরালী বেশ,　　ভ্রমে পঁহু দেশ দেশ,
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসীতে কয়,　　অপরূপ গোরারায়,
ভট্টগৃহে করল প্রবেশ।

মাধবীর এই পদটির দ্বারা প্রভুর নীলাচলে আগমন বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভিতরে প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ-লীলার পরবর্ত্তী কলহ, ভক্তগণকে ছাড়িয়া প্রভুর একাকী অগ্রে গমন, ভক্তগণের প্রভুর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলা, প্রভুর সংবাদের নিমিত্ত নিত্যানন্দের সিংহদ্বারে অবস্থিতি, প্রভুর সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহে প্রবেশ প্রভৃতি কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা পাওয়া যাইতেছে। এস্থলে চৈতন্য-চরিতামৃতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লক্ষ্য করুন :—

নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥
সার্ব্বভৌম লঞা আইলা আপন ভবন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১ম)

চৈতন্যভাগবত প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন-লীলা এবং নীলাচলে আগমন ব্যাপারটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন। একটু নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে :—

আইলেন মাত্র প্রভু আঠার নালায়।
* * * *
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে তাহা বল মোরে ॥
মুকুন্দ বলেন তবে আগে তুমি যাও।
ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
* * * *
হেনরূপে সার্ব্বভৌম-মন্দিরে গমন ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য়)

মাধবীর বর্ণনার সহিত চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা মিলিয়া যাইতেছে। উহা উভয় গ্রন্থের প্রামাণিকতা দৃঢ় করিতেছে। কিন্তু এস্থলে গোবিন্দদাসের কড়চায় কি পাওয়া যাইতেছে, তাহাও শ্রবণ করুন। কড়চায় কুত্রাপি প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জনের কথা পাওয়া যায়না*। যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা এই :—

---

* শ্রীমন্নিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গের কথা কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-মহাকাব্যে (১১শ সর্গ ৮০ শ্লো) এবং মুরারিগুপ্তের কড়চায়ও (তৃতীয় প্রক্রম, ৫ম সর্গ) উল্লিখিত আছে। —সম্পাদক।

সিংহদ্বার ত্যজি যাই আঠার নালায়।
ধ্বজা দেখি প্রভু মোর পড়িল ধরায়॥

*　　*　　*　　*

বেগে গিয়া ধূলা পায় প্রভুর দুয়ারে।
অশ্রুস্রোতে বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে না পারে॥
বহুকষ্টে প্রেমধারা প্রভু নিবারিয়া।
মহাবিষ্ণু হেরি প্রভু উঠিল কান্দিয়া॥
ভক্তগণ চমকিত রোদনের রোলে।
ধেয়ে গিয়া গদাধরে তুলিলেন কোলে॥
গরুড়ের স্তম্ভ গিয়া আঁকড়ি ধরিলা।
কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিলা॥
ইহা দেখি ধ্যানপুরী উত্তরীয় দিয়া।
প্রভুর শোণিতধারা দিল মুছাইয়া॥
দর্শন করিয়া গেলা মিশ্রের ভবন।

(কড়চা পৃঃ ৪৪)

সম্পূর্ণ অমিল। দণ্ড-ভঙ্গ-লীলা নাই। ভক্তগণের সহিত প্রভুর কলহ নাই। ভক্তগণকে ছাড়িয়া প্রভুর অগ্রে গমন নাই। সার্ব্বভৌম-ভট্টের গৃহে আশ্রয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে পাওয়া যাইতেছে মিশ্রের (কাশী মিশ্রের) ভবনে গমন।*

বিরুদ্ধবাদীর মত সারবান বলিয়া ধরিলে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি অনেক পরবর্ত্তী লিখা বলিয়া তাহার সহিত কড়চার অমিল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু মাধবী দাসী যে প্রভুর সমসাময়িক, শুধু তাহা নহে প্রভুর অন্ত্যলীলা প্রত্যক্ষ-কারিণী এবং শ্রেষ্ঠ ভক্ত-তপস্বিনী। তাঁহার উক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কেহই সংশয় করিতে পারেন না। তাহার লিখার সহিত গোবিন্দের বর্ণনার মিল নাই কেন? আমরা বলিতেছি, যথার্থতঃ গোবিন্দ-কর্ম্মকার প্রভুর সঙ্গী হইয়া থাকিলে এরূপ অমিল হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন-লীলাটি

---

* কবি কর্ণপুরও সার্ব্বভৌমের গৃহে গমনের কথাই লিখিয়াছেন। (চৈঃ চঃ মহাকাব্য ১০।১)।—সম্পাদক।

চৈতন্যচরিতে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহার অনুল্লেখ কড়চার কল্পিতত্ব ভিন্ন আর কিছুই ব্যক্ত করেনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ।

সমালোচনা।

১। শ্রীমন্ত্রভাগবতম্। ভক্তিপ্রভা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদের সহিত সম্পাদিত ও প্রকাশিত; ১৩০ পৃষ্ঠা; মূল্য ১॥০; ছাপা ও কাগজ উত্তম। পোঃ আলাটী, জিং হুগলী ঠিকানায়, প্রকাশকের নিকটে প্রাপ্তব্য।

যাঁহারা স্ব-স্ব-বুদ্ধি-প্রতিভা ও কল্পনার আশ্রয়েই শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনা করিতে যান, তাঁহারা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা পৌরাণিক আখ্যাধিকামাত্র; বেদ বা উপনিষদের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত নহে। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত বেদ এবং উপনিষদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, বেদান্তের সূত্র এবং বেদের ঋকের মর্ম্ম লইয়াই শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রথিত।

চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লৈয়া ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্র যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন॥ চৈঃ চঃ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বীজ যে ঋক্-মন্ত্রের অভ্যন্তরে নিগূঢ় ভাবে নিহিত আছে, "মন্ত্র-ভাগবত" পাঠেই তাহা সুন্দররূপে জানা যায়। মহাভারতাদি-গ্রন্থের টীকাকার শ্রীমন্‌নীলকণ্ঠসূরী এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের রচয়িতা। ঋগ্‌বেদ হইতে কতকগুলি ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন, বেদের উপরেই শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রতিষ্ঠিত।

পণ্ডিতপ্রবর তত্ত্ববাচস্পতি-মহাশয় মূল ও ব্যাখ্যার অনুবাদ সহ এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া বৈষ্ণব-জগতের যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। বঙ্গানুবাদের ভাষাও অতি মধুর ও প্রাঞ্জল।

তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রের গৃহেই এই গ্রন্থখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত হওয়ার যোগ্য।

২। শ্রীউদ্ধব-সন্দেশঃ।—শ্রীমদ্ রূপগোস্বামি-বিরচিত; মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ব-বাচস্পতি কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ১১০ পৃষ্ঠা; মূল্য ।॰ আনা। পোঃ আলাটী, জিঃ হুগলী ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ধবকে যখন ব্রজে পাঠায়েন, তখন—কি ভাবে কাহাকে তাঁহার সম্বাদ জ্ঞাপন করিয়া সান্ত্বনা দিতে হইবে, কোন্ পথে কোথায় আগে যাইতে হইবে, কি করিতে হইবে না হইবে ইত্যাদি বিষয়ে, উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কোনও বিশেষ উপদেশের কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে না থাকায় ভক্তবৃন্দের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের নিমিত্ত শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিচরণ "উদ্ধব-সন্দেশ" রচনা করিয়াছেন। কবিত্বের অপূর্ব্বতায়, ভাষার লালিত্যে, ভাবের মাধুর্য্যে এবং রস-বৈচিত্রীর প্রাচুর্য্যে শ্রীউদ্ধব-সন্দেশ ভক্তিরস-রসিক বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিশেষ আস্বাদনীয় ও আদরের বস্তু। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-আদি রস-গ্রন্থে এই গ্রন্থের অনেক শ্লোক উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা হইতেই শ্রীউদ্ধব-সন্দেশের ব্রজরস-নিষিক্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তত্ত্ব-বাচস্পতি মহাশয় এই রসময়-সন্দেশ পরিবেশন করিয়া রসিকমণ্ডলীর রস-লালসা চরিতার্থতার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

৩। শ্রীশ্রীশিক্ষামৃত।—শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত। ৮৪ পৃষ্ঠা; মূল্য ।৵॰ আনা; ছাপা ও কাগজ অতি উত্তম।

শ্রীমদ্দাস-গোস্বামীর "মনঃশিক্ষার" এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ "শিক্ষাষ্টকের" শ্লোক-সমূহ সংস্কৃত টীকা ও ব্যাখ্যামূলক প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণববৃন্দের নিকটে শিক্ষাষ্টক ও মনঃশিক্ষার নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তত্ত্ব-বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার ব্যাখ্যায় যে অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমরা ভক্তমণ্ডলীকে অনুরোধ করি। তত্ত্ব-বাচস্পতি মহাশয়ের বৈষ্ণব-সেবার উপকরণ অতি উপাদেয়।

৪। ভক্তিসন্দর্ভ সার। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ১২৮+।৶॰ পৃষ্ঠা। মূল্য কাগজে বাঁধাই ।৵॰

কাপড়ে বাঁধাই ৮৮/০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ৫১ নং বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট।

পরমভাগবত গ্রন্থকার, পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি মহোদয়ের প্রিয় শিষ্য। শ্রীজীব গোস্বামিচরণের ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রভুপাদের উপদেশ অবলম্বনে তিনি ভক্তি-সন্দর্ভসার রচনা করিয়াছেন। ভক্তিসন্দর্ভ, ভক্তি-সম্বন্ধে মূল দার্শনিক গ্রন্থ ; কিন্তু ইহা সংস্কৃতে লিখিত বলিয়া সাধারণের পক্ষে দুরধিগম্য। রায় চৌধুরী মহাশয় ভক্তিসন্দর্ভসার প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবজগতের একটী মহান্ অভাব দূরীভূত করিলেন। এই গ্রন্থে ভক্তিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয়ই অতি মধুর ও সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ভজন-নিষ্ঠ রায় চৌধুরী মহাশয় ভগবদ্-বিষয়ে বিশেষ অনুভবশীল ; তাঁহার এই অনুভব ভক্তি-সন্দর্ভসারের অধিকাংশস্থলকেই ভক্তগণের পক্ষে বিশেষ আস্বাদনের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব-দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের উপদেয়তা বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় প্রত্যেক বৈষ্ণবের গৃহেই রক্ষিত হওয়ার যোগ্য। আমাদের বিশ্বাস, সাহিত্যসেবীদের নিকটেও এই গ্রন্থখানি বিশেষরূপে আদরণীয় হইবে।

ভক্তি-সন্দর্ভসারে চারিখানা চিত্রপটও আছে; একখানি গ্রন্থকারের নিজের ; আর তিনখানি গ্রন্থকার-সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল-শ্রীবিগ্রহের ; যুগল-বিগ্রহের চিত্রপটের মধ্যে দুইখানি তিনবর্ণে রঞ্জিত অতি মনোরম।

৮। আহ্নিক-পদ্ধতি।— শ্রীযুত রাধিকারঞ্জন গোস্বামী ভাগবতভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৫৫ পৃষ্ঠা ছাপা ও কাগজ উত্তম। ১নং বৈষ্ণব-পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জিং নদীয়া ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য। আহ্নিক-পদ্ধতির সঙ্গে, পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের একখানা অতি সুন্দর হাফ্‌টোন্ ব্লকের চিত্রপট সংযোজিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান-সমূহের বিধান, ভোগ-আরতি, সন্ধ্যা-আরতি, মঙ্গল-আরতি, প্রার্থনা, নিশান্ত-লীলা-স্মরণ-পদ্ধতি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাধকদিগের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপকারী হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভমেলা বসিয়া গিয়াছে। মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদিগের বিভিন্ন তাঁবু থাকে ; শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত মাধ্বগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়েরও একটী তাঁবু আছে ; "সাধনার" প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক প্রভুপাদ এই তাঁবুতে ভক্তি-সন্দর্ভ পাঠ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনের পত্রে জানা গেল, প্রভুপাদের পাঠে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নাম সকলেই জানেন এবং বিধর্ম্মী আততায়ীর হস্তে যে তিনি নিহত হইয়াছেন, একথাও সকলে জানেন। নানা কারণে হিন্দুসমাজ ধ্বংসোন্মুখ হইতেছে দেখিয়া স্বামীজি হিন্দু-সমাজের রক্ষার নিমিত্তই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সকলেই জানেন, সামাজিক অসুবিধাদি সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতি বৎসর বহু হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন ; সামাজিক অসুবিধা দূর করিয়া এই পথ দিয়া হিন্দু-সমাজের ক্ষয় রোধ করিবার নিমিত্ত স্বামীজি যত্নবান ছিলেন। আর, যাঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আবার হিন্দু-ধর্ম্মে ও হিন্দু-সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক, যথাবিধি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পরে স্বামীজি তাঁহাদিগকেও হিন্দু করিয়া লইতেছিলেন। এই সকল কার্য্যে, তিনি অনেক অন্যধর্ম্মাবলম্বীর বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন ; ইহারই ফলে তাঁহাকে অকালে আততায়ীর হস্তে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে হইল। স্বামিজীর এইরূপ পরিণামে হিন্দু মাত্রই দুঃখিত।

অনাচরণীয় হিন্দুদিগকে আচরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে নানাস্থানে নানারূপ আন্দোলন চলিতেছে। গত সরস্বতী-পূজার সময়ে কুমিল্লায় এক সার্ব্বজনীন উৎসব হইয়া গিয়াছে ; তদুপলক্ষে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রায় তিন সহস্র হিন্দু একই ঘরে, এক সঙ্গে, একই পুরোহিতের সাহায্যে সরস্বতীপূজা করিয়াছেন, একসঙ্গে অঞ্জলি দিয়াছেন এবং প্রসাদ ভোজন করিয়াছেন। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

"পথিকে" প্রকাশ, দোলপূর্ণিমা-উপলক্ষে বরিশালের পটুয়াখালীতে নাকি এক সার্ব্বজনীন দেব-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তদুদ্দেশ্যে জয়পুর

হইতে শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ আনীত হইয়াছেন। যে কোনও হিন্দুই নাকি এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে এবং পূজা দিতে পারিবেন।

দেখিতে দেখিতে প্রায় একটী বৎসর গত হইয়া গেল; শিশু সাধনার বয়ক্রম একবৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। সাধনার এই একটী বৎসর যে নিরাপদে কাটিয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায়না, ইতিমধ্যে সাধনার উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এবং ভক্তমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদেই শিশু-সাধনা এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ধাত্রীর অসতর্কতার ফলে, শিশু-সাধনার গায়ে যে ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত ধূলাবালি কিছুই লাগে নাই—তাহা বলাও সঙ্গত হইবে না। ধাত্রীর ত্রুটি যথেষ্টই আছে, তবে স্নেহময়ী জননী এবং হিতৈষী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ উদারতাবশতঃ ধাত্রীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া ধূলাবালিমণ্ডিত শিশুকেই সাদরে অঙ্কে স্থান দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরণে অযোগ্যা ধাত্রীর কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। ধাত্রীর কাতর প্রার্থনা—তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া অযোগ্যা ধাত্রীকে এমন শক্তি দেন, যাহাতে তাঁহাদের আদরের শিশুটীর তত্ত্বাবধান করিতে সে সমর্থ হয়।

আজ বর্ষ শেষে সাধনার লেখকবর্গের চরণে ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারাই যথারীতি আহার যোগাইয়া শিশু-সাধনার দেহপুষ্ট করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব রক্ষার সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপা-ঋণ আমাদের পক্ষে অপরিশোধনীয়। ভবিষ্যতেও যেন তাঁহাদের এইরূপ কৃপা হইতে তাঁহাদের স্নেহপুষ্ট সাধনা বঞ্চিত না হয়, ইহাই প্রার্থনা।

বর্ষশেষে সাধনার গ্রাহক, অনুগ্রাহক বর্গের চরণে আমাদের প্রণতি জানাইতেছি এবং আমাদের ভ্রম-প্রমাদের জন্ম তাঁহাদের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন — যেন নববর্ষে আবার তাঁহাদের কৃপাশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তাঁহাদের সেবাতেই নিয়োজিত হইতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরণম্।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুঃ।

অথ মঙ্গলাচরণম্।

অখিলরসামৃত-মূর্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ।
কলিত-শ্যামাললিতো রাধা-প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ-প্রোক্তা টীকা।

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।—

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তে।
শ্রীশ্রীরাধমদনমোহনৌ বিজয়েতাম্॥

যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ-ভাব দূরীভূত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়, যিনি নিখিল জীবের সংসার-বিমোচনের নিমিত্ত স্বাংশ-কলা-বিভূতিরূপ নানা প্রকার অবতার-সমূহ প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন, সেই স্বয়ং ভগবান্

শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥

অথ সোঽয়ং নিখিলসহৃদয়হৃদ্য-সমুদয়হৃদয়ালঙ্কারঃ সকলকবিমণ্ডলাখণ্ডলো ভগবন্নিদেশপরমমঙ্গলসুধাধারাপরম্পরয়া নির্ম্মীয়মাণে প্রত্যূহতাপাঙ্কুরোদ্গমেঽপ্যস্মিন্ গ্রন্থে সদাচার-সম্মাননার্থমবশ্যকর্ত্তব্যমঙ্গলাচরণমপ্যনুষঞ্জয়তি—অখিলেতি। বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যদ্যপি বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ইত্যভিধানাৎ বিধুশব্দঃ সর্ব্ব-

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। হরেকৃষ্ণাদি দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক মহামন্ত্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের নামাবলী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া জগদ্বাসিজন সকলকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জিত করিতঃ করিতে সর্ব্বোপরি বিরাজ করুন।

যিনি নিখিল রসিক ভক্তগণের লোভনীয় সমুদয় হৃদয়ালঙ্কার-স্বরূপ এবং সমস্ত কবিজগতের সুরপতিসদৃশ, সেই পরম-পূজ্যপাদ শ্রীলরূপগোস্বামিচরণ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর আদেশরূপ পরম-মঙ্গলময় অমৃত-ধারা-সমূহ প্রাপ্ত হইয়া, তদ্দ্বারা এই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন। সুতরাং সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারিত এবং ভক্তি ও ভগবন্মহিমায় পরিপূর্ণ এই গ্রন্থ নিজেই অশেষ-বিঘ্নবাধারূপ সন্তাপরাশির মূলোৎপাটনে সমর্থ, ইহাতে কোনরূপ অমঙ্গলোদ্গমের সম্ভাবনা নাই; এজন্য এগ্রন্থের মঙ্গলাচরণ অনাবশ্যক। তথাপি, একমাত্র সাধুগণের আচরিত পন্থার সম্মান-রক্ষা-নিমিত্তই এই গ্রন্থবিষয়ে অবশ্যকর্ত্তব্য মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। যথা—

শান্তাদি দ্বাদশরস যাঁহাতে বিদ্যমান—এমন পরমানন্দ-স্বরূপ যাঁহার মূর্ত্তি, চতুর্দ্দিকে প্রসরণশীল কান্তিদ্বারা যিনি তারকা ও পালিনাম্নী দুইজন যূথেশ্বরীকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি শ্যামলা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীরাধিকার সর্ব্বাতিশয় প্রীতি সম্পাদন করিতেছেন, সেই সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তক ও সর্ব্বসুখবিধানকারী বিধু * শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন।

* এস্থলে বিধু এই শ্লেষযুক্তবিশেষ্যপদের প্রয়োগদ্বারা চন্দ্রকে আংশিক উপমানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; চন্দ্রপক্ষে ব্যাখ্যা এই টীকার শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

ভগবৎপর এব, তথাপি রাধাপ্রেয়ানিত্যসাধারণবিশেষণেন শ্রীকৃষ্ণমেব প্রতিপাদয়তীতি জ্ঞেয়ম্। তদুৎকর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ—অখিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণাঃ শান্তাদ্যা দ্বাদশ যস্মিন্, তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ। তত্রাপি রসবিশেষবিশিষ্ট-পরিকর-বৈশিষ্ট্যেন আবির্ভাববৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে। অতএব আদিরসবিশেষ-বিশিষ্ট-পরিকর-সম্বন্ধেন নিতরাং। যথা দশমে—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্যেতি॥

বিধু—শ্রীকৃষ্ণ, জয়তি—সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। "বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ—যাঁহার দক্ষিণস্তনোর্দ্ধে শ্রীবৎস-চিহ্ন বিরাজিত, তিনিই বিধু" এই অভিধানানুসারে বিধুশব্দ যদিও সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরই বাচক বটে, তথাপি "রাধাপ্রেয়ান্—শ্রীরাধার অতিশয় প্রীতি-বিধানকারী" এই অসাধারণ বিশেষণ-পদের প্রয়োগদ্বারা বিধুশব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিতেছেন; অন্য কোন ভগবৎস্বরূপকে নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ, একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণভিন্ন আর কোনও ভগবানই শ্রীরাধিকার প্রীতিবিধানে সমর্থ নহেন। সর্ব্বোৎকর্ষের হেতুভূত তদীয় স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন,—অখিল রস—বক্ষ্যমাণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎস—এই দ্বাদশ রস যাহাতে বিদ্যমান আছে, তাদৃশ অমৃত—পরমানন্দ-স্বরূপ মূর্ত্তি যাঁহার, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ যদিও স্বয়ং অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, তথাপি রসবিশেষ-বিশিষ্ট পরিকরগণের বৈশিষ্ট্যই তাঁহার আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আদিরসবিশিষ্ট (সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধুর-রসশালী) পরিকরগণের সম্বন্ধ ঘটিলেই তাঁহার আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য সমধিকরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে (৪৪ অ ১৩ শ্লো) মথুরা-রমণীগণ বলিয়াছেন,—অহো

ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধদিত্যাদি। তত্রাতিশুশুভে তাভি-রিত্যাদি শ্রীভাগবতে। তাসু গোপীষু মুখ্যাঃ দশ ভবিষ্যোত্তরে শ্রূয়তে।— গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথা॥ তথেতি দশম্যপি তারকানাম্নোবেত্যর্থঃ। দশমীত্যেকং নাম বা। স্কান্দ-প্রহ্লাদ-

কষ্ট! আমাদিগের পুণ্য অতি অল্প, যেহেতু, আমরা এই শ্রীকৃষ্ণকে অসময়ে দর্শন করিলাম; গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যা করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রতিক্ষণে নিত্যনবনবায়মান এই শ্রীকৃষ্ণের রূপ লোচনদ্বারা নিরন্তর পান করি-তেছেন। এই রূপ—লাবণ্যের সার, সাম্য বা আধিক্য পরিশূন্য, অনন্যসিদ্ধ, লক্ষ্মীগণের দুষ্প্রাপ্য, ঐশ্বর্য্য-যশঃ-শ্রী-প্রভৃতির অব্যভিচারী আশ্রয়।

শ্রীশুকদেব-গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন (১) শেষশঙ্করাদি যোগেশ্বরগণ হৃদয়া-ভ্যন্তরে যাঁহার আসন কল্পনামাত্র করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যাদি প্রকাশে সমর্থ হইয়াও গোপীসভায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত উত্তরীয়-সমূহ দ্বারা রচিত আসনে উপবেশন করতঃ তাঁহাদিগকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া অসম্ভব শোভাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ গোপীদিগের সম্পর্কে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর একমাত্র আশ্রয়ভূত প্রকাশবিশেষ পোষণ করিয়া ছিলেন।

শ্রীশুকদেবগোস্বামিচরণ আরও বলিয়াছেন, (২) দেবকীসুত (৩) শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্ববিধ শোভা-সম্পন্ন হইয়াও রাসমণ্ডলে ব্রজসুন্দরীগণের সংসর্গেই সর্ব্বাতিশয়রূপে শোভিত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডে শুনিতে পাওয়া যায়,—সেই গোপীদিগের মধ্যে দশজন মুখ্য। যথা—গোপালী, পালিকা, ধন্যা, বিশাখা, ধনিষ্ঠা, রাধা, অনুরাধা, সোমাভা, তারকা—এই নয়

(১) তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাশ গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ॥১০।৩২।১৩

(২) তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।১০।৩৩।৬

(৩) এস্থলে দেবকীসুত বলিতে শ্রীযশোদানন্দনকেই বুঝিতে হইবে। কারণ শ্রীনন্দপত্নীর যশোদা ও দেবকী এই দুইটী নামই প্রসিদ্ধ আছে—দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীত্যপি;

সংহিতা-দ্বারকামাহাত্ম্যে চ ললিতোবাচেত্যাদৌ — মুখ্যাস্বষ্টসু পূর্ব্বোক্তাভ্যোঽন্যা ললিতা-শ্যামলা-শৈব্যা-পদ্মা-ভদ্রাশ্চ শ্রূয়ন্তে। পূর্ব্বোক্তাস্তু শ্রীরাধা-ধন্যা-বিশাখাশ্চ। তদেতভিপ্রেত্য তত্রাপি মুখ্যাভিরুত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যে দ্বে তাবন্নিষ্কৃষ্য তাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য বৈশিষ্ট্যমাহ।— প্রস্মরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃরুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালিনাম্নীযূথেশ্বর্য্যৌ যেন সঃ। অথ মধ্যমমুখ্যাভ্যামাহ। কলিতে স্বীকৃতে শ্যামাললিতে যেন সঃ। অথ পরমমুখ্যয়া বৈশিষ্ট্যমাহ। রাধায়াঃ প্রেয়ান্

জন। আর দশমী যিনি, তাঁহার নামও তারকা অথবা 'দশমী' এইটী দশমী বা শেষোক্ত গোপীর একটী নাম, ইহাই শ্লোকোক্ত 'তথা'-শব্দের অর্থ। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে 'ললিতোবাচ—শ্রীললিতাজী বলিয়াছেন' ইত্যাদিস্থানে যে আটজন গোপী মুখ্যারূপে বর্ণিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে —ললিতা, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রা এই পাঁচজন পূর্ব্বোক্ত গোপালী প্রভৃতি দশজন হইতে ভিন্ন; আর রাধা, ধন্যা ও বিশাখা এই তিনজন পূর্ব্বোক্ত দশজনের অন্তর্গত, ইহাই শুনা যায়। এজন্য মূলশ্লোকেও এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া (মুখ্যাগণের মধ্যে তিনটী বিভাগ দেখাইয়া) তন্মধ্যেও যাঁহারা মুখ্যা, তাঁহাদের সম্পর্কে উত্তরোত্তর শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রথমতঃ কনিষ্ঠমুখ্যাদিগের মধ্যে তারকা ও পালি এই দুইজনকে নিষ্কর্ষরূপে স্থাপন করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। যথা—প্রস্মর-রুচিররুদ্ধতারকাপালিঃ—চতুর্দ্দিকে প্রসরণশীল কান্তিসমূহদ্বারা তারকা ও পালি নাম্নী দুইজন যূথেশ্বরীকে যিনি বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। অনন্তর মধ্যম-মুখ্যাগণের মধ্যে দুইজনের সংসর্গগুণে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাধিক্য বা প্রকাশবৈশিষ্ট্য বর্ণন করিতেছেন। যথা—কলিত-শ্যামাললিতঃ—শ্যামা (শ্যামলা) ও ললিতা এই দুইজনকে যিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠমুখ্যা শ্রীরাধার সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক-মাধুর্য্য বা আবির্ভাববৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন, যথা,— রাধাপ্রেয়ান্—শ্রীরাধার প্রিয়তম অর্থাৎ যিনি শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশয়রূপে প্রীতি-

অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তা। ইগুপধজ্ঞাপ্রীগৃকিরঃ কঃ ইতি কর্ত্তরি কপ্রত্যয়ো বিধেয়ঃ। অতএব অস্যা এবাসাধারণ্যমালোক্য পূর্ব্ববদ্‌যুগ্মকেনাপি নেয়ং নির্দ্দিষ্টা। অতস্তস্যা এব প্রাধান্যং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে উত্তরখণ্ডে তৎকুণ্ডপ্রসঙ্গে।—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ন্তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

বিধানকারী। ইগুপধাবিশিষ্টধাতু, জ্ঞাধাতু, প্রীধাতু, গৄধাতু ও কৄধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয়ের বিধান করিতে হয়। এই সূত্রানুসারে এস্থলেও প্রীধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয় করিয়া 'প্রিয়'-শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে; তাহার উত্তর তদ্ধিত ইয়সু প্রত্যয় করিয়া প্রেয়ান্ পদ (১মার একবচনে) সাধিত হইয়াছে। সুতরাং 'রাধিকাপ্রেয়ান্'-পদে শ্রীরাধিকার সর্ব্বাতিশয়-প্রীতিকর্ত্তা বুঝিতে হইবে। ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের মনকে যিনি প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধিকারও আবার প্রীতি বা আনন্দ বিধান করিতে যখন সমর্থ হন, তখনই (শ্রীরাধার সঙ্গে বিহার সময়েই) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বা আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্য অসমোর্দ্ধরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে ;—রাধাসহ যদা ভাতি তদা মদন-মোহনঃ—শ্রীরাধার সঙ্গে যখন বিহার করেন, তখনই সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনত্ব বা অপরিসীম-মাধুর্য্য প্রকটিত হইয়া থাকে।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববৈশিষ্ট্য-সম্পাদন বিষয়ে এই শ্রীরাধিকারই অসাধারণতা অবলোকন করিয়া, ইহাঁকে পূর্ব্ববৎ যুগ্মকরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ দুইটীতে তারকা ও পালি এবং শ্যামলা ও ললিতা এই দুই দুই জনকে একসঙ্গে উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন ; শ্রীরাধার সংসর্গগুণে শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার সময় কিন্তু শ্রীরাধার সমান বা শ্রেষ্ঠ আর কেহ না থাকায়, একমাত্র শ্রীরাধার নামই উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য শ্রীরাধারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা সূচিত হইল। শ্রীরাধার প্রাধান্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীরাধাকুণ্ড-প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে,—"শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়া, শ্রীরাধার কুণ্ডও সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় ; যেহেতু সমস্ত গোপীদিগের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা।"

অতএব মৎস্যপুরাণে শক্তিত্বসাধারণ্যেনাভিন্নতয়া গণনায়ামপি তস্যা এব বৃন্দাবনে প্রাধান্যাভিপ্রায়েণাহ।— রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে তস্যা এব মন্ত্রকথনে।—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিসম্মোহিনী পরা ॥

ঋক্‌পরিশিষ্টশ্রুতাবপি।— রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বেতি। অথএব দশমে গোপ্য আহুঃ।— অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বর ইতি।

সর্ব্বলৌকিকালৌকিকাতীতেঽপি তস্মিন্ লৌকিকার্থবিশেষোপমাদ্বারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশঃ স্যাদিতি কেনাপ্যংশেনোপমানমাহ। পক্ষে বিধুশ্চন্দ্রো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। এবং বিশেষ্যে সাম্যং দর্শয়িত্বা বিশেষণেঽপি সাম্যং দর্শয়তি। অখিলঃ অখণ্ডঃ রস আস্বাদো যত্র তাদৃশমমৃতং পীযূষং তদাত্মিকৈব মূর্ত্তি

স্নুতরাং মৎস্যপুরাণে শক্তিত্বসামান্যে অভেদরূপে শ্রীরাধার গণনা থাকিলেও বৃন্দাবনে তাঁহারই (শ্রীরাধারই) প্রাধান্য দেখাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,— শ্রীকৃষ্ণের শক্তিগণ মধ্যে রুক্মিণী দ্বারবতীতে প্রধান, শ্রীরাধা কিন্তু বৃন্দাকর্তৃক বনমধ্যে (বৃন্দাবনমধ্যে) প্রধান। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রেও শ্রীরাধিকারই মন্ত্রকথনপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে,—শ্রীরাধিকা—দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তিবিমোহিনী ও পরা (শ্রেষ্ঠা) বলিয়া কথিত (১)। ঋক্‌পরিশিষ্টশ্রুতিতেও উক্ত আছে,—আর আর প্রিয়াজন থাকা সত্ত্বেও একমাত্র শ্রীরাধার সঙ্গেই দেবদেব মাধব এবং মাধবের সঙ্গেই শ্রীরাধা সর্ব্বত্র সর্ব্বাপেক্ষা শোভা ধারণ করিয়া থাকেন। এজন্যই দশমস্কন্ধে শ্রীগোপীগণ বলিয়াছেন,—সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ভক্তজনের অভীষ্ট প্রদানে পরম স্বতন্ত্র হইলেও আরাধনা-দ্বারা

(১) দেবী কৃষ্ণময়ী ইত্যাদি পদ কয়েকটীর বিশেষ অর্থ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি-পরিচ্ছেদে—দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী ইত্যাদি পয়ারে দ্রষ্টব্য।

যস্য তারকাপালিঃ তারকাশ্রেণী। বিশ্বপ্রকাশে শ্যামাশব্দো রাত্রিপর্য্যায়ঃ কলিতমুরীকৃতং শ্যামায়াঃ রাত্রে ললিতং বিলাসো যেন ইতি। রাত্রিবিলাসিত্বেনাপি সাম্যং জ্ঞেয়ম্। তথা রাধায়াং বিশাখানাম্ন্যাং তারায়াং প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিমান্।

তাঁহাকে শ্রীরাধা নিশ্চয় বশীভূত করিয়াছেন; যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে (শ্রীরাধাকে) প্রীতি সহকারে নির্জ্জনবনপ্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক বস্তুর অতীত, এজন্য লৌকিক কোনও পদার্থের সহিত তাঁহার উপমা সম্ভবে না; তথাপি লৌকিক পদার্থ-বিশেষ চন্দ্রের সহিত উপমা-দ্বারা, তাঁহাতে (শ্রীকৃষ্ণে) লোকসকলের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারিবে—এই অভিপ্রায়ে কোনও অংশবিশেষে চন্দ্রকে উপমানরূপে বর্ণন করিতেছেন, সর্ব্বাংশে নহে। চন্দ্রপক্ষে অর্থ,—বিধু—চন্দ্র, জয়তি—সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত অবস্থান করিতেছে। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার অন্ধকার ও উত্তাপ-জন্য দুঃখোপশমকরূপ ও সুখপ্রদরূপ অংশে 'বিধু' এই বিশেষ্যপদগত চন্দ্রপক্ষে সাম্য দেখাইয়া বিশেষণপদগত সাম্যও দেখাইতেছেন। যথা—অখিল—অনন্ত, রস—আস্বাদ আছে যাহাতে, তাদৃশ অমৃত—পীযূষ, তদাত্মিকা মূর্ত্তি যাহার, এই অর্থে চন্দ্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত মনোহর কিরণসমূহদ্বারা তারকাশ্রেণীকে যিনি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এই অর্থে চন্দ্র—প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালি। বিশ্বপ্রকাশমতে শ্যামাশব্দ রাত্রির পর্য্যায়বাচক, এতদনুসারে শ্যামা অর্থাৎ রাত্রির ললিত—বিলাস যিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই অর্থে চন্দ্র—কলিতশ্যামাললিত। এই বিশেষণদ্বারা রাত্রিবিলাসিত্বরূপ অংশেও সাম্য বুঝিতে হইবে। এইরূপে রাধা অর্থাৎ বিশাখানাম্নী তারকাতে চন্দ্র অতিশয় প্রীতিমান্।

(অথ গ্রন্থারম্ভঃ)

উত্তমা ভক্তিঃ।

—:০:—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

অন্বয়ার্থ :— অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিতা শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্যানুকূল্যেন কায়বাঙ্মনোভির্যাবর্ত্তী ক্রিয়া সা ভক্তিঃ।১।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তাটীকা।

অথ তস্যা লক্ষণং বদন্নেব গ্রন্থমারভতে অন্যেতি। যথা ক্রিয়া-শব্দেন ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে, তথাত্র অনুশীলনশব্দেনাপি ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে। ধাত্বর্থশ্চ দ্বিবিধঃ।—প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মকঃ। তত্র প্রবৃত্ত্যাত্মকো ধাত্বর্থস্তু কায়-বাঙ্মানসময়স্তচ্চেষ্টারূপঃ।

অনন্তর উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতে বলিতে গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন। যথা—অন্যাভিলাষিতা-পরিশূন্যভাবে ও জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতরূপে কায়-মনো-বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আনুকূল্য-বিশিষ্ট অনুশীলন, বা যাবতীয় ক্রিয়াই উত্তমা ভক্তি। ক্রিয়া-শব্দদ্বারা যেমন ধাতুর সর্ব্বপ্রকার অর্থ কথিত হয়, অনুশীলন-শব্দদ্বারাও সেইরূপ এ স্থলে সকল প্রকার ধাত্বর্থই কথিত হইতেছে।

ধাতুর অর্থ প্রধানতঃ দুই প্রকার,—চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ। তন্মধ্যে চেষ্টারূপ অর্থ আবার দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি বা গ্রহণ চেষ্টারূপ এবং নিবৃত্তি বা ত্যাগচেষ্টারূপ। যেমন—"রাম পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে" এই বাক্যের অন্তর্গত গমনক্রিয়ারূপ ধাতুর অর্থ—প্রবৃত্তি বা গ্রহণ এবং নিবৃত্তি বা ত্যাগ, এই উভয়বিধ চেষ্টারূপে প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ রাম পূর্ব্বদিকের প্রবৃত্তি বা গ্রহণরূপ একটী চেষ্টা করিতেছে এবং তদ্ভিন্ন পশ্চিমদিকের নিবৃত্তি

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

নিবৃত্ত্যাত্মকধাত্বর্থশ্চ প্রবৃত্তিভিন্নঃ। সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতেত্যাদি-বচনব্যঞ্জিতঃ সেবানামাপরাধাস্তভাবরূপশ্চ। স চ বক্ষ্যমাণরতিপ্রেমাদিস্থায়ি-

---

বা ত্যাগরূপ অপর একটী চেষ্টা করিতেছে; এই দুই প্রকারে এ স্থলে গম্‌ধাতু বা গমনক্রিয়ার অর্থ প্রতীত হইতেছে। এই উভয়বিধ চেষ্টারূপ অর্থেরই আবার কায়িক-বাচিক-মানসিকরূপ তিনটী করিয়া ভেদ আছে। যথা—কায়িক-প্রবৃত্তিরূপ, বাচিক-প্রবৃত্তিরূপ ও মানসিক-প্রবৃত্তিরূপ এবং কায়িক-নিবৃত্তিরূপ, বাচিক-নিবৃত্তিরূপ ও মানসিক-নিবৃত্তিরূপ। এই কয়েকটীই ধাতুগত চেষ্টারূপ অর্থের অবান্তরভেদ। ইহা ছাড়া ধাতুর ভাবরূপ একটি অর্থের কথা যে বলা হইয়াছে, উহা কেবল মানসিক অনুভবাত্মক। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে, রাম যখন পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে, তখন তাহার মনে সুখ বা দুঃখের অনুভব একটী হইতেছে, এই সুখ বা দুঃখকে গম্ ধাতু বা গমনক্রিয়ার ভাবরূপ অর্থ বলা যায়। ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে শ্লোকোক্ত অনুশীলন-শব্দেও ঐরূপ কায়িক-বাচিক-মানসিক-ভেদে ত্রিবিধ প্রবৃত্ত্যাত্মক ও ত্রিবিধ নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ একটী অর্থ,—আর ভাবরূপ একটী অর্থ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ অর্থ, প্রবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ অর্থ হইতে ভিন্ন, ইহা পরবর্ত্তী—"সেবানামাপরাধা-দ্যুদ্ভবাভাবকারিতা" ইত্যাদি বাক্যে ব্যঞ্জিত—সেবাপরাধ ও নামাপরাধের উৎপত্তির অভাবকারিতারূপ বুঝিতে হইবে (পূর্ব্ববিভাগ—২য় লহরী)। অর্থাৎ সাধন-ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে, ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ—গুরু-পাদাশ্রয়াদি দশটী অঙ্গের প্রবৃত্তি বা গ্রহণ—ইহার নাম প্রবৃত্তিচেষ্টারূপ অনুশীলন; আবার ভগবদ্‌বিমুখজনের সঙ্গত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সেবা-নামাপরাধের উৎপত্তির অভাবকারিতা অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ-সমূহের বর্জ্জন পর্য্যন্ত দশটী অঙ্গের নিবৃত্তি বা ত্যাগ—ইহার নাম নিবৃত্তি-চেষ্টারূপ অনুশীলন। তন্মধ্যে নিবৃত্তিচেষ্টারূপ অনুশীলনটী, প্রবৃত্তিচেষ্টারূপ অনুশীলন হইতে ভিন্ন, কিন্তু উভয়টীই অনুশীলন-শব্দের চেষ্টারূপ অর্থের অবান্তরভেদ।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ভাবরূপশ্চ। তদেবং সতি কৃষ্ণসম্বন্ধি কৃষ্ণার্থং বা অনুশীলনমিতি। তৎসম্বন্ধমাত্রস্য তদর্থস্য বা বিবক্ষিতত্বাদ্ গুরুপাদাশ্রয়াদৌ, ভাবরূপস্যাপি ক্রোড়ীকৃতত্বাদ্ রত্যাদিস্থায়িনি ব্যভিচারিষু ভাবেষু চ নাব্যাপ্তিঃ। এতচ্চ কৃষ্ণ-তদ্ভক্তকৃপয়ৈকলভ্যং শ্রীভগবতঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপমপি কায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেনাবিভূর্তমিতি জ্ঞেয়ম্।

অনুশীলন-শব্দের একটী অর্থ—চেষ্টারূপ; আর অপর অর্থ—রতিপ্রেমাদি স্থায়িভাব—যাহা পরে বর্ণিত হইবে, সেই ভাবরূপ। এইরূপে, প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ অর্থে যে অনুশীলন-শব্দ কথিত হইল, সেই অনুশীলন যদি শ্রীকৃষ্ণের যে কোন প্রকার সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়, অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত হয়, তবেই তাহাকে ভক্তি বলা যায়। আপত্তি হইতে পারে যে,—"এ স্থলে ভক্তির লক্ষণে একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনকেই ভক্তি বলা হইয়াছে, গুরুপাদাশ্রয়াদি এবং স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাব-সকলের কথা কিছু উল্লেখ নাই; এ জন্য এই লক্ষণটীতে অব্যাপ্তি-দোষের প্রসক্তি দেখা যাইতেছে অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয়াদি সাধন-ভক্তির অঙ্গসকলে এবং স্থায়িভাব ও ব্যভিচারি-ভাবসমূহরূপ ভাবভক্তিতে লক্ষণের প্রাপ্তি হইতেছে না।" ইহারই উত্তরে বলা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবিশিষ্ট যাবতীয় অনুশীলন, অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তক অনুশীলন—এই উভয় প্রকারকেই কৃষ্ণানুশীলন-পদের দ্বারা বলিবার ইচ্ছাহেতু, গুরুপাদাশ্রয়াদিতে এবং ভাবরূপ অর্থকেও কৃষ্ণানুশীলনের অন্তর্ভূত করাতে রত্যাদি স্থায়িভাবে ও ব্যভিচারিভাব-সমূহে লক্ষণের অব্যাপ্তি (১) দোষ ঘটে নাই অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয়াদি—চেষ্টারূপ অনুশীলনের অন্তর্গত এবং স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাব—ভাবরূপ অনুশীলনের অন্তর্ভূত, এইরূপে লক্ষণের সঙ্গতি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবিশিষ্ট বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তক চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ অনুশীলন বা ভক্তি, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তকৃপায়ই লভ্য হইয়া থাকেন। এই কৃষ্ণানু-শীলন বা ভক্তি, শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তিবিশেষের বৃত্তিবিশেষরূপ। যদি

---

(১) অব্যাপ্তিদোষের লক্ষণ, কিঞ্চিৎ পরে দ্রষ্টব্য।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

অগ্রে তু স্পষ্টীকরিষ্যতে। কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ংভগবতঃ কৃষ্ণস্য তদ্রূপাণাং চান্যে-ষামবতারাণাং গ্রাহকঃ। তারতম্যমগ্রে বিবেচনীয়ং। তত্র ভক্তিস্বরূপতা-সিদ্ধার্থং বিশেষণমাহ—আনুকূল্যেনেতি। প্রাতিকূল্যে ভক্তিত্বাপ্রসিদ্ধেঃ।

বলা যায় যে,—শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা সেই ভক্তিকে, জীবগণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন যে,—শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির অনুষ্ঠান করা জীবগণের পক্ষে অসম্ভব হইলেও উহা (ভক্তি) জীবসকলের কায়বাক্যাদির বৃত্তির সহিত একীভূতরূপে স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যেমন—লোহিতবর্ণতা ও দহনকারিতা অগ্নিরই ধর্ম্ম, লৌহের ধর্ম্ম নহে; কিন্তু লৌহকে যদি অগ্নির মধ্যে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে অগ্নি—লৌহকে তাহার নিজের ধর্ম্ম কৃষ্ণতা ও শীতলতাকে পরিত্যাগ করায় এবং লৌহের সঙ্গে একীভূতরূপে প্রকাশ পাইয়া লৌহকে লোহিতবর্ণতা ও দহনকারিতা-ধর্ম্ম প্রদান করে। এ স্থলে লোহিতবর্ণতা ও দহনকারিতা-ধর্ম্ম যেমন অগ্নি হইতেই লৌহে তাদাত্ম্যরূপে সংক্রমিত হইতে দেখা যায়, ভক্তিও সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা হইয়াও জীবসকলের কায়বাক্যাদির বৃত্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়েন, বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণানুশীলন-পদের কৃষ্ণ-শব্দ এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অন্যান্য স্বরূপ—রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণেরও গ্রাহক। যদিও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তক অনুশীলন এবং রাম-নৃসিংহাদি অবতার-সম্বন্ধীয় বা রাম-নৃসিংহাদি অবতারের নিমিত্তক অনুশীলন—এ উভয়ই ভক্তি বটেন, তথাপি ইহার মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা পরে বিবেচনা করা হইবে।

কৃষ্ণানুশীলন যে ভক্তির স্বরূপ, ইহাই সিদ্ধির নিমিত্ত উহাতে 'আনুকূল্যেন—আনুকূল্যবিশিষ্ট' এই বিশেষণ-পদটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। যেহেতু, প্রতিকূল অনুশীলন ভক্তিরূপে প্রসিদ্ধ নহে। যেমন শিশুপাল প্রভৃতি দৈত্যগণও কৃষ্ণানুশীলন করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হওয়ায়, ভক্তিরূপে সিদ্ধ হইল না।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

আনুকূল্যঞ্চ উদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিরিত্যুক্তে লক্ষণে অতিব্যাপ্তিরব্যাপ্তিশ্চ। তদ্ যথা—অসুরকর্ত্তৃকপ্রহাররূপানুশীলনং যুদ্ধরসঃ উৎসাহরতিঃ

আনুকূল্য-শব্দের অর্থ—যাঁহার উদ্দেশে অনুশীলন করা যাইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তি; অর্থাৎ যেরূপ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর, সেইরূপ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়ার নামই আনুকূল্যবিশিষ্ট অনুশীলন বা ভক্তি। এরূপ অর্থ করিলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিরূপ দোষের প্রসক্তি হয়। তাহার দৃষ্টান্ত যথা—যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করে, সেই প্রহাররূপ অনুশীলন, যুদ্ধরস-বিষয়ে (১) উৎসাহ-রতিরূপে পরিণত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের

(১) বীররস চতুর্বিধ, যথা—যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীর। তন্মধ্যে যুদ্ধবীররসকেই এস্থলে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গৌণভক্তিরসের অন্তর্গত বীররসের যুদ্ধবীর,—শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষের নিমিত্ত উৎসাহবান্ তদীয় সখা বা বন্ধুবিশেষ। প্রতিযোদ্ধা—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, অথবা শ্রীকৃষ্ণ দর্শকরূপে অবস্থিত থাকিবেন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্য সুহৃদ্বর প্রতিযোদ্ধা হইবেন। যথা—

পরিতোষায় কৃষ্ণস্য দধদুৎসাহমাহবে।
সখা বন্ধুবিশেষো বা যুদ্ধবীর ইহোচ্যতে॥
প্রতিযোদ্ধা মুকুন্দো বা তস্মিন্ বা প্রেক্ষকে স্থিতে।
তদীয়েচ্ছাবশেনাত্র ভবেদন্যঃ সুহৃদ্বরঃ॥
—উত্তরবিভাগে তৃতীয়লহরী।

কিন্তু টীকাকৃৎপাদ, দৃষ্টান্তস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধবীররূপে, আর অসুরগণকে প্রতিযোদ্ধারূপে বর্ণন করিয়াছেন। এজন্য এই যুদ্ধবীররসটী গৌণভক্তিরসের অন্তর্গত বীররস হয় নাই। গৌণভক্তিরসের অন্তঃপাতী বীররসকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিলে, লক্ষণের ব্যাবৃত্তিপ্রদর্শনের সহায়তা হয় না; যেহেতু, ঐ বীররসটী যদিও গৌণ, তথাপি ভক্তিরসই বটে। এজন্য গৌণভক্তিরসের অন্তর্ভূত যুদ্ধবীররসকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে ইষ্ট-সিদ্ধি হয় না বলিয়া, টীকাকৃৎপাদ এস্থলে প্রাকৃতরসশাস্ত্রকারগণের সম্মত বীররসের অন্তর্গত যুদ্ধবীররসকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধরসে উৎসাহরতিরূপ রোচমানাপ্রবৃত্তি দেখানই এস্থলে টীকাকৃৎপাদের উদ্দেশ্যমাত্র, অন্য কিছু নহে; এজন্য দৃষ্টান্তটী দূষণীয় হয় নাই।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

শ্রীকৃষ্ণায় রোচতে। যথোক্তং প্রথমস্কন্ধে—মনস্বিনামিব সন্ সংপ্রহার ইতি। তথা শ্রীকৃষ্ণং বিহায় দুগ্ধরক্ষার্থং গতায়াঃ যশোদায়াস্তাদৃশানুশীলনং শ্রীকৃষ্ণায় ন রোচতে। যথোক্তং শ্রীদশমে—স জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরমিতি। তথাচ

রুচি উৎপাদন করিতেছে। যদি বলা যায় যে, অসুরগণের প্রহার আবার উৎসাহ-রতির পরিপোষক হইয়া রুচি উৎপাদন করে, এ কথা কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা-পরিহারের নিমিত্ত, শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

* * * * মনস্বিনামিব সন্ সংপ্রহারঃ॥—১।১৩।২৬

সাধারণের দৃষ্টিতে দুঃখপ্রদ হইলেও বিপক্ষগণের তীব্র যুদ্ধ যেমন উৎসাহবান্ বীরগণের নিকট প্রহর্ষহেতুই (রুচিকরই) হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ-সময়ে অসুরগণের ঐরূপ অনুশীলন অনুকূল অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর বলিয়া, উহাকে যদি ভক্তি বলা হয়, তবে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে অর্থাৎ অসুরগণের প্রহাররূপ অনুশীলন—যাহা ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী, তাহাতেও ভক্তির লক্ষণ যাইয়া পড়ে।

আবার মা যশোদা যে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপানে পরিতৃপ্ত না করাইয়া ক্রোড় হইতে নামাইয়া রাখিয়া দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, মা যশোদার তাদৃশ (স্তন্যপান না করাইয়া দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত গমনরূপ) অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হইয়াছিল না। যথা—

স জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং সংদশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্।
ভিত্ত্বা মৃষাশ্রু দৃষদশ্মনা রহো জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৯।৬

মা যশোদা স্তন্যপান না করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নামাইয়া রাখিয়া যাওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইলেন, কম্পমান অরুণবর্ণ-অধর দন্তদ্বারা দংশন করিতে করিতে একটী শিলাপুত্র (নোড়া)-দ্বারা দধিমন্থন-পাত্রটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং স্তন্যপানে অতৃপ্ততাহেতু সত্য সত্যই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গৃহা-

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

তত্র তত্র অতিব্যাপ্তেরব্যাপ্তেশ্চ বারণায় আনুকূল্যানাং প্রাতিকূল্যশূন্যত্বমেব বিবক্ষণীয়ম্। এবং সতি অসুরে দ্বেষরূপ-প্রাতিকূল্যসত্ত্বান্নাতিব্যাপ্তিঃ। এবং

ভাণ্ডারে নির্জ্জনস্থানে প্রবেশ করিয়া ক্রোধভরে সঞ্চয়াভ-নবনীত সকল ভক্ষণ করিলেন।

এস্থলে মা যশোদার এই অনুশীলনটী শ্রীকৃষ্ণের অরুচিকর বলিয়া, ভক্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে না, এজন্য এস্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ দৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্যজাতীয় প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী—যাঁহার নিখিল-চেষ্টাই বাৎসল্যজাতীয় প্রেমভক্তির পরিণতিবিশেষ, সেই মা ব্রজেশ্বরীর প্রেমভক্তিবিশেষময় ঐ অনুশীলনটীতে ভক্তির লক্ষণ যাইতেছে না।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত উভয়স্থলে (অসুরগণের ও মা যশোদার অনুশীলনে) অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিরূপ (১) দোষ নিবারণের নিমিত্ত, আনুকূল্য সকলকে প্রাতিকূল্যতাশূন্যরূপেই বলিবার অভিপ্রায়। আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যদি বাস্তবিক পক্ষে প্রাতিকূল্যতাশূন্য না হয়, তবে সেরূপ অনুশীলনকে ভক্তি বলা যাইবে না। এরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায়, অসুরগণকর্ত্তৃক প্রহাররূপ অনুশীলনে দ্বেষরূপ প্রাতিকূল্যতা বিদ্যমান থাকায়, উঁহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিল না অর্থাৎ অসুরগণের প্রহাররূপ অনুশীলনটী প্রাতিকূল্যতাশূন্য না হওয়ায়, উহা ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইল না।

---

(১) "অলক্ষ্যে লক্ষণস্য গমনমতিব্যাপ্তিঃ"—লক্ষণদ্বারা যে বস্তুকে লক্ষ্য করা হইতেছে, তদ্‌ভিন্ন অপর (অলক্ষ্য) বস্তুতে যদি লক্ষণের ব্যাপ্তি (ব্যাপিয়া থাকা) বুঝায়, তবে তাহাকে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ বলে। আর—"লক্ষ্যে লক্ষণস্যাগমনমব্যাপ্তিঃ"—লক্ষণদ্বারা যে বস্তু লক্ষ্য করা হইতেছে, তাহাতে যদি লক্ষণের সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্তি না থাকে, তবে তাহাকে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ বলে।—তর্কসংগ্রহদীপিকা।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

যশোদায়াঃ প্রাতিকূল্যাভাবান্নাব্যাপ্তিরিতি বোধ্যম্। এতেন বিশেষণস্যানুকূল্য-

---

মা যশোদার অনুশীলনটী যদিও আপাততঃ প্রতিকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তথাপি মা যশোদাতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রতিকূলতার লেশমাত্রও না থাকাতে, উহাতে লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে নাই। অর্থাৎ মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই দুগ্ধরক্ষার্থ গমন করিলেন বলিয়া উহা প্রতিকূলতাশূন্য হইয়াছে, এজন্য উহা ভক্তিরই পরিপাটী-বিশেষরূপে পরিগণিত। এরূপ বুঝিতে হইবে (১)।

---

(১) ব্রজবাসিগণের দেহ, গেহ, অর্থ, সুহৃৎ, আত্মা, পুত্র, প্রাণ, মন—যত কিছু সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত। ব্রজবাসীমাত্রের সম্বন্ধেই যখন এইরূপ, তখন মা ব্রজেশ্বরীর সর্ব্বস্বই যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? অতএব মা ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্তভাবে ফেলিয়া যে দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, উহাও শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। পিতামাতা পুত্রের উপস্থিত দুঃখ সহ্য করিয়াও, যাহাতে পুত্রের ভবিষ্যজ্জীবনে দৈহিকসুস্থতা, ধন ও বিদ্যাদি লাভ হইতে পারে, সেরূপ কার্য্যসকল সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন; ইহা কটুতিক্তাদি ঔষধপান, স্নান ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তাড়ন-ভৎর্সনাদি-কার্য্যে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ব্যবহার পিতা-মাতা ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না; এজন্য ইহা বাৎসল্যভাব ভিন্ন অন্যভাবের দুর্ব্বোধ্য। পুত্রের সুখের জন্য পুত্রকে তাড়নভৎর্সনাদি করা, পিতামাতার স্নেহেরই পরিণতি-বিশেষ। পক্ষান্তরে গোপজাতিদিগের দুগ্ধরূপ সম্পত্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা যত্নাগ্রহ। সুতরাং মা ব্রজেশ্বরী মনে করিলেন, এই বালকের নিমিত্ত যত কিছু সম্পত্তি আছে, তন্মধ্যে দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। অথচ এ বালক ইহার নিজের কোনই সম্পত্তি রক্ষা করিতে জানে না; আমি তাহার জননী, অতএব ইহার সম্পত্তি রক্ষা করা, একমাত্র আমারই কর্ত্তব্য; এই বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া রাখিয়া দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত মা যশোদার গমন-টীও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে স্নেহময়ই হইয়াছিল। যেমন লোকে নিজের সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত, আত্মাকে কত ক্লেশই না সহ্য করাইয়া থাকে, তথাপি উহাতে আত্মার প্রতি প্রীতিবিশেষই সূচিত হয়; সেইরূপ মা যশোদা যে শ্রীকৃষ্ণের আপাত দুঃখ

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ত্যৈব ভক্তিত্বমস্ত। ভক্তিসামান্যস্যৈব কৃষ্ণায় রোচমানত্বাদ্বিশেষ্যস্য অনুশীলন-

---

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে,—আনুকূল্য * এই বিশেষণ-পদকেই ভক্তি বলা হউক। কারণ—যাহা যাহা ভক্তি বলিয়া অভিহিত, তাহা সমস্তই যখন আনুকূল্য বা শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তি, তখন আনুকূল্যই ভক্তি—এরূপ বলা যাইতে পারে। সুতরাং 'অনুশীলন' এই বিশেষ্যপদের প্রয়োগ নিরর্থক। এরূপ আশঙ্কাও পূর্ব্বোক্তরূপে নিরস্ত হইতেছে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য না হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না; আবার অরুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতা-শূন্য হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং শুধু রুচিকর প্রবৃত্তিই ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইবে না,

---

সহ্য করিয়াও, দুগ্ধরূপ-সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মায়ের প্রগাঢ় স্নেহবিশেষই প্রকাশ পাইতেছে। এজন্য মা ব্রজেশ্বরীর এই অনুশীলনটী আপাততঃ শ্রীকৃষ্ণের অরুচিকর হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে প্রতিকূলতার লেশমাত্রও না থাকাতে, উহা বাৎসল্যজাতীয় প্রেমভক্তি-রূপে অব্যাহত থাকিল। (এ সম্বন্ধে বৈষ্ণবতোষণীর—"যদ্বামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্ম-তনয়ঃ··························যথা সম্পত্ত্যর্থং সহ্যমানেঽপ্যাত্মদুঃখে স্নেহবিশেষ আত্মনি গম্যতে তদ্বদিতি বিবেচনীয়ং" এই অংশ দ্রষ্টব্য।—১০স্ক, ৯অ,)

* 'আনুকূল্যেন' পদের তৃতীয়া বিভক্তিটী বিশেষণেই প্রযুক্ত হইয়াছে, উপলক্ষণে নহে। বিশেষণ—কার্য্যের সহিত অন্বিত থাকে আর উপলক্ষণ কার্য্যের সহিত অনন্বিত থাকে। যেমন—'শস্ত্রধারীদিগকে আনয়ন কর' এই কথা বলিলে শস্ত্রধারী পুরুষদিগকে আনয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে শস্ত্র সকলেরও আনয়ন করা বুঝায়, তেমন এস্থলে—'আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনের নাম ভক্তি' এই কথা বলাতে অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আনুকূল্যেরও ভক্তিত্ব বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু শস্ত্রধারীদিগকে ভোজন করাও—এই বাক্যে শস্ত্রসকলের ভোজনের অপ্রসক্তির ন্যায়, পূর্ব্বোক্তস্থলে আনুকূল্যের ভক্তিত্বের অবিধান করা হয় নাই।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা ।

পদস্য বৈয়র্থ্যমিত্যাপি শঙ্কা নিরস্তা। তাদৃশ প্রাতিকূল্যাভাবমাত্রস্য ঘটেঽপি সত্বাৎ। উত্তমত্বসিদ্ধ্যর্থং বিশেষণদ্বয়মাহ—অন্যাভিলাষিতা শূন্যমিত্যাদি। কথম্ভূতমনুশীলনম্? অন্যস্মিন্ ভক্ত্যতিরিক্তে ফলত্বেনাভিলাষশূন্যং। ভক্ত্যা

পরন্তু প্রতিকূলতাশূন্য অনুশীলনের নামই ভক্তি। অতএব, অনুকূল হইয়াও যদি অনুশীলন-শব্দের—প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ, অথবা ভাবরূপ অর্থের মধ্যে কোনও প্রকার অর্থ-বিশেষকে না বুঝায়, তবে তাহা ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইবে না; কারণ—অনুশীলন শব্দের চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অর্থের কোনও প্রকার অর্থের প্রকাশ না পাইয়া, কেবল আনুকূল্য অর্থাৎ প্রতিকূলতার অভাবই যদি ভক্তি হয়, তবে চেষ্টা বা ভাবরূপ অর্থশূন্য জড়পদার্থ যে ঘট, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশ্যে প্রতিকূলতাশূন্য বলিয়া, তাহাকে (ঘটকে) ভক্তি বলা যাইতে পারে! কিন্তু তাহা কখনও সম্ভবে না। যেহেতু—ঘট যদিও প্রতিকূলতাশূন্য বটে, তথাপি অচেতন পদার্থ বলিয়া চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ যে কোনও প্রকার অনুশীলন বা ক্রিয়া পরিশূন্য বলিয়া উহাকে ভক্তি বলা যায় না। সুতরাং ধাতুগত চেষ্টারূপাদি যাবতীয় অর্থের গ্রহণের নিমিত্ত, 'অনুশীলন' এই বিশেষ্যপদের প্রয়োগ সুসঙ্গত হইয়াছে।

এইরূপে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া, সেই ভক্তির উত্তমত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত তটস্থলক্ষণরূপে (১) অপর দুইটী বিশেষণপদের প্রয়োগ করিয়াছেন; যথা—'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' একটী এবং 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং' এই একটী। পূর্ব্বোক্ত অনুশীলনটী কি প্রকার? তাহাই বলিতেছেন,—অন্যাভিলাষিতাশূন্য—ভক্তি

---

(১) শাস্ত্রকারগণ স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণদ্বারা বস্তুর পরিচয় করিয়া থাকেন; যথা:—তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপলক্ষণং। তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থ-লক্ষণং।—যাহা বস্তু হইতে অভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম স্বরূপলক্ষণ। আর যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম তটস্থলক্ষণ। যেমন—আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণভক্তি—এস্থলে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম, কৃষ্ণভক্তি হইতে অভিন্ন থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিকে বুঝাইয়া দিতেছে, এজন্য ইহার নাম স্বরূপ-লক্ষণ।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা ইত্যেকাদশোক্তের্ভক্ত্যুদ্দেশকভক্তিকরণমুচিতমেবেত্যতো ভক্ত্যাতিরিক্ত ইতি। যথাত্রান্যাভিলাষশূন্যং বিহায় অন্যাভিলাষিতাশূন্যমিতি স্বভাবার্থকতাচ্ছীল্যপ্রত্যয়েন কস্যচিদ্ভক্তস্য কদাচিচ্ছঙ্কটে প্রাপ্তে—হে ভগবন্

ভিন্ন অন্য (স্বর্গাদি) কোনও বিষয়ে ফলরূপে অনুসন্ধানশূন্য। যেহেতু—একাদশ-স্কন্ধে উক্ত আছে—"ভক্তিদ্বারা সঞ্জাত ভক্তি অর্থাৎ শ্রবণাদি সাধনভক্তির ফল প্রেমলক্ষণা ভক্তি"—এস্থলে ভক্তির ফল ভক্তিই দেখাইয়াছেন, কর্ম্মাদির ন্যায় অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) বা তজ্জনিত স্বর্গাদি ফলরূপ পৃথগ্‌বস্তু নহে।

যদি বলা যায়,—এস্থলে অন্যাভিলাষিতাশূন্যং না বলিয়া, অন্যাভিলাষশূন্যং এরূপ প্রয়োগ করিলেইত ইষ্টসিদ্ধি হইত; তবে আবার অন্যাভিলাষিতাশূন্যং—(ণিন্ প্রত্যয় ও তা প্রত্যয়যুক্ত) এই বর্ণগৌরববিশিষ্ট পদের প্রয়োগ করিবার সার্থকতা কি? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, অন্যাভিলাষশব্দের উত্তর স্বভাবার্থ দ্যোতক অর্থাৎ শীলার্থে ণিন্প্রত্যয় (ও তাহার পর ভাবে তা প্রত্যয়) করিয়া দেখাইয়াছেন যে—কোনও ভক্তের অকস্মাৎ কোনরূপ শঙ্কট উপস্থিত হইলে, সেই ভক্ত যদি শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যে—"হে ভগবন্! আমি

আবার উক্ত ভক্তি-লক্ষণের "অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মাদি-দ্বারা অনাবৃত" এই অংশের অন্তর্গত অন্যাভিলাষিতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদি, উত্তমাভক্তি হইতে ভিন্ন থাকিয়া ঐ ভক্তিকে বোধ করাইতেছে, এজন্য ইহার নাম তটস্থ লক্ষণ।

অথবা, আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণভক্তির অসাধারণ ধর্ম্ম বা আকৃতি-প্রকৃতি-বিশেষ, এজন্য এইটী কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। যথা—

আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপ লক্ষণ।

—শ্রীচরিতামৃত—মধ্য—দ্বাবিংশ।

আর অন্যাভিলাষিতাশূন্য থাকা ও জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত থাকা—ঐ ভক্তির অসাধারণ কার্য্য; এজন্য ইহার নাম তটস্থ-লক্ষণ। যথা—

কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থলক্ষণ।

—ঐ

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ভক্তং মামেতদ্বিপত্তেঃ সকাশাৎ রক্ষেতি কাদাচিৎকাভিলাষসত্ত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। যতস্তস্য বৈবশ্যহেতুক-স্বভাববিপর্য্যয়েণৈব তাদৃশাভিলাষো নতু স্বাভাবিক ইতি বোধ্যং। পুনঃ কীদৃশং জ্ঞানমত্র নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানং নতু ভজনীয়ত্বেনানুসন্ধানমপি তস্য অবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম—স্মার্ত্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি নতু ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ। আদিশব্দেন ফল্গুবৈরাগ্যযোগ-সাংখ্যা-

তোমার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহই নাই, অতএব এই বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা কর" এইরূপ কাদাচিৎক অভিলাষ প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও সেই ভক্তের ভক্তির কোন ব্যাঘাত হইতেছেনা। যেহেতু, সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে ঐ ভক্ত বিবশ-ভাবাপন্ন হইয়াই স্বভাববিপর্য্যয়হেতু ঐ প্রকার অভিলাষ করিয়াছেন, বস্তুতঃ ঐরূপ অভিলাষ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে; ইহাই বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং—(জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা আবৃত নহে, এরূপ আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি) এস্থলে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানকে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু ভজনীয়-আকারে অনুসন্ধানরূপ জ্ঞানকে নিষেধ করেন নাই; যেহেতু ভজনীয়-আকারে অনুসন্ধানরূপ জ্ঞানের অবশ্য অপেক্ষা আছে। এখানে কর্ম্ম বলিতে স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু ভজনীয় বিষয়ের পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্মকে নিষেধ করেন নাই; যেহেতু ভজনীয় বিষয়ের পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্ম কৃষ্ণানুশীলনেরই অন্তর্গত।

জ্ঞান-কর্ম্মাদি—এই আদি শব্দে ফল্গুবৈরাগ্য (১), অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগাদিকেও নিষেধ করিয়াছেন। জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত বলিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য একথা বলেন নাই। কারণ— যে জ্ঞান (নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ) ও যে সকল কর্ম্মাদি (স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদিরূপ) ভক্তিকে আবরণ করে, সেই সকল জ্ঞান-কর্ম্মাদির চর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু ভজনীয়রূপে অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ও ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি-

(১) প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ভ্যাসাদয়ৈস্তৈরনাবৃতং নতু শূন্যমিত্যর্থঃ। তেন চ ভক্ত্যাবরকানামেব জ্ঞানকর্ম্মাদীনাং নিষেধোঽভিপ্রেতঃ। ভক্ত্যাবরকত্বং নাম বিধিশাসনাপ্রিত্যকর্ম্মাকরণে

রূপ কর্ম্ম, অনুশীলনেরই অন্তর্ভূত, এজন্য উহা বর্জ্জনীয় নহে। সুতরাং ভক্তির আবরক জ্ঞান-কর্ম্মাদি নিষেধ করাই অভিপ্রায় হেতু, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত বলিয়াছেন (কিন্তু 'জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য' বলেন নাই)। (২)

---

(২) উত্তমা-ভক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গ-সকলকে জ্ঞান বলিয়া মনে করা যাইবে না। কারণ—কর্ম্ম ও জ্ঞানের—সাধন ও সাধ্য পরস্পর ভিন্ন বস্তু এবং উভয়ই জড় পদার্থ। ঘৃত-সমিৎ-কুশাদি বিনাশি-বস্তু দ্বারা নিষ্পন্ন যজ্ঞাদি কর্ম্ম জড়-পদার্থ, তদ্দ্বারা উৎপন্ন হয় যে অপূর্ব্ব, সেই অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টের ফল—স্বর্গাদিও ক্ষয়শীল। কারণ, বিনাশি-বস্তু দ্বারা নিষ্পন্ন বস্তুও বিনাশী।

এবং বিনাশিভির্দ্রব্যৈঃ সমিদাজ্যকুশাদিভিঃ।
নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যা তু সা ভবিত্রী বিনাশিনী॥
—প্রীতিসন্দর্ভঃ, ৫ম অনুচ্ছেদঃ।

বিশেষতঃ যাহা যাহা ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহা সমস্তই অনিত্য। এজন্য কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন অপূর্ব্ব ও স্বর্গাদি ফল অনিত্য। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গসকল, কোন প্রকার ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদ্য নহে; ভক্তি-মার্গের সাধনও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি এবং সাধ্যও শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি। যেহেতু—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ; অতএব কি সাধন কি সাধ্য—কোন অবস্থাতেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকে বাদ দেওয়া যাইবে না। তবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকে সাধনাবস্থায় কারণরূপা ভক্তি বলা হয়, এই মাত্র প্রভেদ। এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ, অতএব নিত্য ও পরমার্থভূত। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সমূহ, এই সকল ভক্তি-অঙ্গকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে; বস্তুতঃ ভক্তি-অঙ্গসকল আপনাপনি ইন্দ্রিয়সমূহে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

জ্ঞানের ফল যদিও জড় নহে, তথাপি প্রাকৃত-মনের দ্বারাই জ্ঞানের আলোচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু স্মরণাঙ্গভক্তি প্রাকৃত মনের গম্য নহে;

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

প্রত্যবায়াদিভয়াৎ শ্রদ্ধয়া ক্রিয়মাণত্বং তথা ভক্ত্যাদিরূপেষ্ট-সাধনত্বাৎ শ্রদ্ধয়া ক্রিয়মাণত্বঞ্চ। তেন লোকসংগ্রহার্থমশ্রদ্ধয়া পিত্রাদিশ্রাদ্ধাদং কুর্ব্বতাং মহানুভবানাং শুদ্ধভক্তৌ নাব্যাপ্তিঃ। অত্র শ্রীকৃষ্ণানুশীলনং কৃষ্ণভক্তিরিতি

ভক্তির আবরণ দুই প্রকার হইয়া থাকে, যথা—[১] শাস্ত্রীয় বিধির শাসন-হেতু নিত্যকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়াদি উপস্থিত হইবে ভয়ে, শ্রদ্ধা সহকারে স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান—এই এক প্রকার। [২] আর স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে ভক্তি প্রভৃতি অভীষ্ট ফললাভ হইবে মনে করিয়া, শ্রদ্ধা সহকারে স্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান—এই এক প্রকার। সুতরাং মহানুভব ভক্তগণ লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে পিতৃশ্রাদ্ধাদি কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাহা (শ্রদ্ধা সহকারে করা হয় না বলিয়া) ভক্তির আবরক নহে; ঐ সকল মহানুভব ভক্তগণের আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলন যদিও কর্ম্মাঙ্গশূন্য হইল না, তথাপি (কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত বলিয়া) তাঁহাদের ঐ অনুশীলনে উত্তমাভক্তির অব্যাপ্তি দোষ ঘটে নাই। ফলকথা, কর্ম্মাদির উপর শ্রদ্ধা না রাখিয়া ব্যবহারিক রীতির মর্য্যাদামাত্র রক্ষার নিমিত্ত, শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠান, ভক্তির আবরক হয় না; এজন্য উহাতে উত্তমা ভক্তির ব্যাঘাত জন্মে না।

ভগদ্ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহে কেবলা ভক্তি শব্দের * উত্তমাভক্তিতেই বিশ্রান্তি অর্থাৎ যে ভক্তিতে অন্যকামনার লেশমাত্র নাই, যে ভক্তিকে

যেহেতু স্মরণাঙ্গও শ্রবণাদির ন্যায় ভক্তিরই অন্যতম অঙ্গ বলিয়া স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষরূপা; উহা প্রাকৃত মনের দ্বারা প্রকাশের অযোগ্য, বস্তুতঃ আপনাআপনি মনোমধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন মাত্র। জ্ঞানমার্গে জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়গত ভেদ থাকে না; স্মরণাঙ্গে সেরূপ নহে, ইহাতে সাধনাবস্থাতেও ভক্ত-ভগবানের ভেদ থাকেই, এমন কি সাধ্যাবস্থাতেও ঐ ভেদ বিনষ্ট হয় না। এজন্য স্মরণাঙ্গ নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য নহে।

*শাস্ত্রে প্রধানতঃ তিনপ্রকার ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তাটীকা

বক্তব্যে ভগবচ্ছাস্ত্রেষু কেবলস্য ভক্তিশব্দস্য তত্রৈব বিশ্রান্তিরিত্যভিপ্রায়স্তথোক্তম্ ॥ ১ ॥

জ্ঞানকর্ম্মাদি আবরণ করিতে পারেনা, এরূপ ভক্তি বা আনুকূল্য-বিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনেই কেবল-ভক্তিশব্দের পর্য্যবসান; ইহাই শ্রীভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রসকলের অভিপ্রায়। এজন্য "কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণভক্তি" এইটী মাত্র এস্থলে বলিবার উদ্দেশ্য হওয়াতেও, অন্যাভিলাষিতাশূন্য-মিত্যাদিরূপই ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন। এই লক্ষণোক্ত উত্তমা ভক্তিরই অপর নাম স্বরূপসিদ্ধাভক্তি।

যে সকলভক্তিতে ভক্তি ভিন্ন অন্যকামনা ও জ্ঞানকর্ম্মাদির মিশ্রণ আছে, সে সকল ভক্তি অতীব দুর্ব্বলা। এই উত্তমাভক্তিতে একমাত্র ভক্তিবাসনাভিন্ন অন্যকামনার গন্ধমাত্রও না থাকায় এবং ইহা জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা সম্পূর্ণ অনাবৃত বলিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী ও সর্ব্বথা বৈশিষ্ট্যশালিনী। এজন্য মূলগ্রন্থে জ্ঞান-কর্ম্মাদিমিশ্রিতা ভক্তি হইতে এই উত্তমা ভক্তির বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। যথা—এই ভক্তি ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকারিণী, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা

আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা। শ্রবণকীর্ত্তনাদি যেমন স্বয়ংই ভক্তি-রূপে সিদ্ধ, নিষ্কাম-কর্ম্মাদি তেমন আপনা হইতে ভক্তিরূপে সিদ্ধ নহে; তথাপি এই নিষ্কাম-কর্ম্মসকল যদি শ্রীভগবানে সমর্পিত হয়, তবে উহারা ভক্তির কার্য্য যে চিত্তশুদ্ধি, তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎরূপে ভক্তির আকারে আকারিত বা ভক্তিত্বকে প্রাপ্ত হয় বলিয়া, উহাদিগকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হইয়া থাকে। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির অপর নাম মিশ্রাভক্তি; ইহা দুই প্রকার—কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা। এই কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তির অঙ্গীভূত নিষ্কাম কর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসকল, শ্রবণকীর্ত্তনাদির ন্যায় আপনা হইতে ভক্তিরূপে সিদ্ধ নহে। উহারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির পরিকররূপে স্থাপিত হইয়া অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া, আংশিকরূপে ভক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়া, উহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। আর্ত্ত, অর্থার্থী ও মুমুক্ষু অধিকারিগণই

ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। এস্থলে আরও বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদি ভূতের শব্দাদিগুণ যেমন পর পর বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহেও আছে, সেইরূপ সাধনভক্তির গুণ ভাবভক্তিতে আছে; আবার ভাবভক্তির গুণ প্রেম-ভক্তিতে আছে। অতএব সাধনভক্তিতে ক্লেশনাশকত্ব ও শুভপ্রদত্ব—এই দুইটী গুণ আছে। ভাবভক্তিতে—নিজের গুণ মোক্ষলঘুতাকারিত্ব ও সুদুর্লভত্ব এবং সাধনভক্তির গুণ ক্লেশনাশকত্ব ও শুভপ্রদত্ব—এই চারিটী গুণ আছে। প্রেমভক্তিতে—নিজের গুণ সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মতা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিতা, সাধনভক্তির গুণ ক্লেশনাশকত্ব ও শুভপ্রদত্ব এবং ভাবভক্তির গুণ মোক্ষলঘুতাকারিত্ব ও সুদুর্লভত্ব—এই ছয়টী গুণ আছে।

ঐ ক্লেশ প্রধানতঃ তিন প্রকার;—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাপ আবার অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধভেদে দুই প্রকার। যাহা অদৃষ্ট বা কারণরূপেই বিদ্যমান আছে, কূটাদিরূপ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার নাম অপ্রারব্ধ পাপ—ইহা অনাদিসিদ্ধ ও অনন্ত। আর যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নাম প্রারব্ধ পাপ। যাহা বাসনাময় অর্থাৎ প্রারব্ধ বা ভোগাবস্থাতে পরিণত হওয়ার উন্মুখ, তাহাই পাপবীজ। বীজরূপে পরিণত হইবার উন্মুখ বা বীজেরও কারণাবস্থার নাম কূট। অনাদিকালের ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-জন্য অজ্ঞানতা বা স্বরূপ বিস্মৃতিকারিণী-মায়ার নাম অবিদ্যা; এই অবিদ্যাই কূটাদি সর্ব্ববিধ পাপের মূলীভূত কারণ। উত্তমা-ভক্তি, সাধনাবস্থাতেই এই সকল ক্লেশরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন, এজন্য এই ভক্তির নাম ক্লেশঘ্নী।

পূর্ব্বোক্ত শুভ-শব্দের অর্থ,—সাধক-কর্তৃক সর্ব্বজগতের প্রীতিবিধান এবং সর্ব্বজগৎ-কর্তৃক সাধকের প্রতি অনুরক্ততা অর্থাৎ সাধক সকল জগৎকে

এই সকল ভক্তির অধিকারী। এই সকল ভক্তি হইতে যাহা সম্পূর্ণ পৃথক, যাহাতে মুক্তীচ্ছাপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কামনার গন্ধমাত্রও নাই, যাহা জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনই যাহার স্বরূপ—সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তির নামই স্বরূপসিদ্ধাভক্তি। একমাত্র ভক্তিতেই কামনা বলিয়া, ইহা—নিগুর্ণা, কেবলা, শুদ্ধা, মুখ্যা, অনন্যা ও স্বরূপসিদ্ধা প্রভৃতি নামে অভিহিতা। মূলে এই ভক্তিরই উত্তমা ভক্তি বলিয়া লক্ষণ করা হইয়াছে।

ভালবাসেন, আবার সকলে সাধককে ভালবাসে—এই দুইটী প্রধান গুণ এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় সদ্‌গুণ ও সুখ—এই সকলকে পণ্ডিতগণ শুভশব্দে বর্ণন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সুখ আবার বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও ঐশ্বরিকভেদে তিন প্রকার। প্রাকৃত সুখভোগের নাম বৈষয়িক সুখ। মুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে লীন হওয়ার নাম ব্রাহ্মসুখ। নিত্য পরমানন্দ বা ভগবৎপ্রীতিদ্বারা অখণ্ড আনন্দময় ভগবান্‌কে অনুভব করার নাম ঐশ্বরিক সুখ। উত্তমা ভক্তি, এই সকল শুভ প্রদান করেন; এজন্য উত্তমা ভক্তিকে শুভদা বলা হইয়া থাকে।

সাধকের হৃদয়ে ভগবদ্‌বিষয়িনী রতি বা ভাব-ভক্তির আবির্ভাব হওয়া মাত্র, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ, তৃণের মত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। এজন্য ঐ ভক্তিকে মোক্ষলঘুতাকারিণী বলা হইয়াছে।

যে সকল সাধন অনাসঙ্গ বা নিপুণতাশূন্য অর্থাৎ যে সকল সাধনে স্বর্গাদি বিষয়ভোগের প্রতি বাসনা রহিয়াছে, এরূপ বহুবিধ সাধনদ্বারা সুদীর্ঘকালেও ঐ ভক্তিকে লাভ করিতে পারা যায় না এবং আসঙ্গ বা নিপুণতার সহিত (অন্যাভিলাষিতাশূন্যভাবে) সাধনভূত সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের (উত্তমাভক্তির) অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও, যে পর্য্যন্ত ফলভূত ভক্তিযোগ বা প্রীতিলক্ষণা-ভক্তিতে প্রগাঢ় আসক্তি না জন্মে, সে পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ ঐ ভক্তিকে প্রদান করেন না। এই দুই কারণে ঐ ভক্তিকে সুদুর্ল্লভা বলা হয়।

পরার্দ্ধকালব্যাপী সমাধির ফলে যে ব্রাহ্মসুখ উদিত হয়, সেই ব্রাহ্মসুখকে পরার্দ্ধসংখ্যাদ্বারাও যদি গুণ করা যায়, তথাপি উহা ভক্তিরূপ সুখসাগরের পরমাণুতুল্যও হইতে পারে না, এজন্য এই উত্তমাভক্তিকে সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা বলিয়াছেন।

যিনি পুরুষ-যোষিৎ কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মপর্য্যন্ত সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আবার ভক্তহৃদয়স্থিত প্রেম-ভক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া প্রিয়বর্গের সহিত আকৃষ্ট হয়েন; এ জন্য ঐ ভক্তিকে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলা হইয়াছে। ১।

সা ভক্তিঃ সাধনভক্তি র্ভাবভক্তিঃ প্রেমভক্তিরিতি ত্রিবিধা।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

সা ভক্তিরিতি।—অথাত্র সাধন-সাধ্যরূপো দ্বিবিধো ভেদ এবাস্তু ভাবস্যাপি সাধ্যভক্ত্যান্তর্ভাবোঽস্তু কিং ভেদত্রয়করণেনেতি চেন্ন। যতোঽগ্রে বক্ষ্যমাণস্য উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি সাধকভক্তলক্ষণস্য মধ্যে রত্যপরপর্য্যায়স্য ভাবস্যাবির্ভাবেঽপি সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতা ইতি বিশেষণেন প্রবলতরস্য কস্যচিদপরাধস্য কশ্চন ভাগোঽবশিষ্টোঽস্তি ইতি লভ্যতে। এবং সতি ক্লেশজনকস্যাপরাধস্য লেশেঽপি

উত্তমা-ভক্তির ভেদ।

পূর্ব্বোক্ত উত্তমাভক্তি আবার সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিভেদে তিন প্রকার। এ স্থলে আপত্তি হইতেছে যে, উত্তমা-ভক্তির 'সাধন রূপ ও সাধ্যরূপ' এই দুইটী ভেদ স্বীকার করিয়া, ভাবভক্তিকে সাধ্যভক্তিরই অন্তর্ভূত বলা হউক; তিনটি ভেদ স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? ইহারই উত্তরে বলা যাইতেছে যে, এরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত নহে। যেহেতু মূল গ্রন্থের দক্ষিণ-বিভাগে প্রথম লহরীতে বর্ণিত আছে,—

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-রতি (ভাব) উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে বিঘ্ননিবৃত্তি হয় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকারে যোগ্যতা ঘটিয়াছে, তাঁহারা সাধক-ভক্ত বলিয়া কথিত। সাধক-ভক্তের এই লক্ষণটীতে দেখা যাইতেছে যে, সাধকের রতি বা ভাবভক্তির আবির্ভাব হওয়ার পরও,—"সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ—সম্যক্‌রূপে বিঘ্ননিবৃত্তি হয় নাই" এই বিশেষণটী থাকাতে, তখনও ঐ সাধকভক্তে কোন প্রবলতর মহদপরাধের কিছু না কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। এ জন্য যাহা ক্লেশ বা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ, সেই মহদপরাধের লেশমাত্রও যে পর্য্যন্ত ভক্তেতে বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ঐ ভক্তেতে সাধ্যভক্তির আবির্ভাব সম্ভাপর নহে। কাজেই ভাবভক্তিকে

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

সাধ্যভক্তেরাবির্ভাবো ন সংভবতি। অতএব তত্রৈবোক্তেসা সাধ্যভক্তিবিশিষ্ট সিদ্ধভক্ত-লক্ষণস্য মধ্যে অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদাকৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ সিদ্ধাঃ স্যুরিত্যনেন তত্রৈব প্রতিপাদিতং। তস্মাদ্ভাবস্য সাধ্যভক্তেরন্তর্ভাবো ন সংভবতি। তত্রৈব সাধনভক্তেরন্তর্ভাবস্তু সুতরামেব নাস্তি। যতোঽত্রৈব প্রকরণে সাধনভক্তিলক্ষণে ভাবসাধনস্বরূপ বিশেষণেন ভাবস্য সাধনভক্তিত্বং পরাস্তং।

সাধ্যভক্তির অন্তর্ভূত বলা যাইতে পারে না। যেহেতু ভাবভক্তি হওয়ার পরও ভক্তে মহদপরাধ বা তাহার কার্য্য—বিঘ্ন (ক্লেশ) বিদ্যমান থাকে। এ জন্য মূল গ্রন্থে ঐ স্থানে বর্ণিত সাধ্যভক্তিবিশিষ্ট-সিদ্ধভক্তলক্ষণে উক্ত আছে,—

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ ... ...॥

যাঁহারা কোন প্রকার ক্লেশকে জানেন না এবং সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ক্রিয়াতে রত, তাঁহারা সিদ্ধ ভক্ত। সুতরাং সিদ্ধভক্তলক্ষণেও পূর্ব্ববৎ জানা যাইতেছে যে, ভাবভক্তি সাধ্যভক্তির অন্তর্ভূত হইতে পারে না। কারণ, এই সিদ্ধভক্তলক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা সাধ্য প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সিদ্ধভক্তগণ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ বা বিঘ্নপরিশূন্য। আবার যাঁহাদের রতি বা ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সাধকভক্তগণের লক্ষণে দেখা যায় যে, রতি বা ভাব উৎপন্ন হইবার পরও সাধকভক্তগণের ক্লেশ বা বিঘ্ন সম্যক্‌রূপে বিদূরিত হয় না। এজন্য ভাবভক্তিকে সাধ্যভক্তির অন্তর্ভূত বলা যাইতে পারে না।

যদি বলা যায় যে, ভাব-ভক্তিকে সাধন-ভক্তিরই অন্তর্ভূত বলা হউক। তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে—"ভাব-ভক্তি সাধন-ভক্তির অন্তর্গত"—একথা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কারণ, এই প্রকরণে সাধন-ভক্তিলক্ষণে—'সাধ্যভাবা' (যদ্দ্বারা ভাবভক্তি সাধ্য হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি) এই বিশেষণটী দ্বারা, সাধনভক্তি যে ভাবভক্তির সাধন অর্থাৎ সাধনভক্তি দ্বারা যে ভাবভক্তি সাধ্য হইয়া থাকে, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ভাবভক্তিকে সাধনভক্তির অন্তর্ভূত বলিয়া আশঙ্কা করিবার অবসরও দূরীভূত হইল। যেহেতু ভাবভক্তি কখনও

সাধনভক্তিঃ পুনর্বৈধীরাগানুগাভেদেন দ্বিবিধা ॥ ২ ॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ভাবস্য ভাব-সাধনত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ সাধূক্তং ভক্তেস্ত্রিবিধত্বমিতি বিবেচনীয়ং। কৃতীতি।—সা সামান্যতো লক্ষিতোত্তমা ভক্তিঃ। ইন্দ্রিয়ব্যাপারেণ সাধ্যা

ভাবভক্তির সাধন হইতে পারে না, পরন্তু সাধনভক্তিই ভাবভক্তির সাধন। অতএব সাধনভক্তিদ্বারা সাধ্য—ভাবভক্তি, সাধনভক্তি হইতে পৃথক; আবার প্রেমভক্তি হইতেও যে ভাবভক্তি পৃথক *, তাহা ত অব্যবহিত পূর্ব্বেই দেখান হইল। সুতরাং সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিভেদে ভক্তি যে তিন প্রকার, একথা বলা অতি সুন্দর হইয়াছে।

সাধন-ভক্তি।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যাদি-শ্লোকে সামান্যাকারে যে উত্তমাভক্তির লক্ষণ করা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা সাধনীয় সেই ভক্তির নাম সাধনভক্তি। সাধন-ভক্তি দ্বারা ভাবভক্তি সাধ্য হইয়া থাকে। ভাব নিত্যসিদ্ধবস্তু, কোন সাধন-দ্বারাই ইহা সাধ্য হয় না; কিন্তু সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধকের হৃদয় নির্ম্মল হইলে, সেই নির্ম্মল হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ হইতে এই ভাবের প্রকট হওয়ার নামই সাধ্যতা (১)। এই সাধনভক্তি আবার বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার (২)।

---

* যদিও "ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে" ইত্যাদি বাক্যহেতু, ভাব ও প্রেম—তত্ত্বতঃ পৃথক্ বস্তু নহে, তথাপি উভয়ের অবস্থাগত ভেদ আছে বলিয়াই, টীকাকৃৎপাদ এস্থলে (ভাব ও প্রেমের) পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন।

(১) কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

(২) বৈধী ও রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ পরে বর্ণিত হইবে।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

চেৎ সাধনাভিধা ভবতি। অত্র ইন্দ্রিয়ব্যাপারস্য ভক্ত্যন্তর্ভাবঃ; যাগক্রিয়ায়াঃ (পূর্ব্বাত্রি যায়াঃ) যথা যাগান্তর্ভাবস্তথৈব জ্ঞেয়ঃ। তেন ভক্তিভিন্নস্য ন ভক্তি-জনকত্বমিতি সিদ্ধান্তোঽপি সঙ্গচ্ছতে। অত্র ভাবভক্তেরনুভাবরূপস্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদেঃ সাধনত্বব্যবহারাভাবাত্তন্নিবারণায়াহ সাধ্যেতি। সাধ্যো ভাবো যয়া

শ্রবণাদি ভক্তি-অঙ্গ-সমূহের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত, সাধক প্রথমে মনে মনে সংকল্প করিয়া থাকেন; যেমন—আমি আজ শ্রীভগবদ্‌গুণানুবাদ শ্রবণ করিব। এইরূপ মানসিক সংকল্পের পর তদনুরূপভাবে বাচিক-চেষ্টাও প্রকাশ পাইয়া থাকে, তৎপর কায়িক-চেষ্টা দ্বারা ভগবদ্‌গুণানুবাদ-কীর্ত্তন-স্থানে গমন করা হয়। পরে শ্রবণেন্দ্রিয়কে ব্যবহারিক শব্দ হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক, শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিতে হয়। শ্রবণাদি ভক্তি-অঙ্গ-সকল অনুশীলনের অব্যবহিত পূর্ব্বানুষ্ঠিত এইরূপ চেষ্টার নাম—ইন্দ্রিয়-ব্যাপার বা ইন্দ্রিয়প্রেরণা। যজ্ঞের নিমিত্ত ঘৃত-সমিৎ-কুশাদি আহরণরূপ পূর্ব্বানুষ্ঠিত-ক্রিয়া যেমন যজ্ঞেরই অন্তর্ভূত, শ্রবণাদি-সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত ঐ সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপারকেও এ স্থলে সেইরূপ ভক্তিরই অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে। "ভক্তি ভিন্ন কর্ম্মজ্ঞানাদি অপর কোনও সাধনই যে ভক্তিকে আবির্ভাব করাইতে পারে না, পরন্তু ভক্তিই যে ভক্তি-আবির্ভাবের হেতু" এ সিদ্ধান্তও সঙ্গত হইতেছে।

ভক্তির কারণরূপ অবস্থাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গসমূহকে সাধনভক্তি বলা হয়। কিন্তু ভাবভক্তির অনুভাব বা কার্য্যরূপ অবস্থাতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গ-সকলকে সাধনভক্তি বলিয়া ব্যবহার করা যায় না, ভাবভক্তি বলিয়াই ব্যবহার করা হয়। এ জন্য ঐ ভাবভক্তির অনুভাব বা কার্য্যরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গ-সকলকে যদি কেহ পূর্ব্ববৎ সাধনভক্তি বলিয়া আপত্তি করেন, তাহাই নিবারণের নিমিত্ত মূলে 'সাধ্যভাবা' এই বিশেষণটী প্রয়োগ করিয়াছেন। যদ্দ্বারা ভাব সাধ্য হয়, তাহার নাম সাধ্যভাবা। এই সাধনভক্তি দ্বারা প্রেমের প্রথমাবস্থারূপা ভাবভক্তি সাধ্য হয়েন অর্থাৎ সাধনভক্তিই ভাবভক্তির আবির্ভাব করাইয়া থাকেন, এজন্য সাধনভক্তিকে 'সাধ্যভাবা' বলা হইয়াছে। সাধন-

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

সা ভাবজনকেত্যর্থ তেন ধর্ম্মার্থাদিপুরুষার্থান্তরসাধকভক্তিশ্চ পরিহৃতা উত্তমায়া উপক্রান্তত্বাৎ। ভাবাদীনাং সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বাভাবঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যেতি। ভাবস্থাপ্যুপলক্ষণমতঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়োঽপি গ্রাহ্যাঃ।

ভক্তি-লক্ষণে সাধ্যভাবা এই বিশেষণটির প্রয়োগ দ্বারা, যে ভক্তিতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ অন্য পুরুষার্থ সাধিত হইয়া থাকে, সে ভক্তিকে এই সাধনভক্তি-সংজ্ঞা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতু ভক্তি ভিন্ন অন্য কামনার গন্ধমাত্রও যাহাতে নাই, সেই উত্তমাভক্তির প্রসঙ্গই এ স্থলে আরম্ভ করা হইয়াছে। সুতরাং যে ভক্তিতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদিরূপ অন্যবস্তুর প্রতি ফলরূপে অনুসন্ধান থাকে, অন্যাভিলাষিতাশূন্য নহে বলিয়া তাহাকে এ স্থলে ভক্তি বলিয়াই স্বীকার করা হয় নাই।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে,—সাধনভক্তি দ্বারা সাধ্য হয় বলাতে ভাবভক্তি কৃত্রিম হইয়া পড়িল অর্থাৎ ভাবভক্তি সাধনরূপ ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন হওয়াতে ভাবভক্তির জন্যত্ব (জন্ম হওয়া) দোষ উপস্থিত হইল। যে সকল বস্তুর উৎপত্তি বা জন্ম আছে, তাহা অনিত্য। সুতরাং সাধানভক্তি দ্বারা যখন ভাবভক্তি উৎপন্ন হয়, তখন ভাবভক্তি ঘটাদির ন্যায় জন্য বা অনিত্য পদার্থ। অতএব, এই অনিত্য ভাবভক্তি আবার পরম-পুরুষার্থ-বস্তু কিরূপে হইবে?

এই আশঙ্কা-পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন,—সাধনভক্তি দ্বারা ভাবভক্তি সাধ্য হয় বলাতে, সাধনভক্তি ভাবভক্তিকে জন্মাইল—এরূপ বুঝিতে হইবে না। যেহেতু প্রেমের প্রথমাবস্থারূপা ভাবভক্তি নিত্যসিদ্ধবস্তু অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপে এই ভাব, শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ-পরিকরগণে নিত্যই বিরাজমান আছেন; অতএব ইহা কোন সাধন দ্বারাই সাধ্য নহেন। তবে যে "সাধনভক্তি দ্বারা ভাবভক্তি সাধ্য হয়" বলা হইয়াছে, এই সাধ্যতার অর্থ—প্রাকট্য বা আবির্ভাব মাত্র, ঘটাদির ন্যায় উৎপত্তি বা জন্ম নহে; অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন সাধকের হৃদয় নির্ম্মল হয়, তখন সেই নির্ম্মল হৃদয়ে ঐ ভাব নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ হইতে

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

তেষামপি কর্ত্তৃজিহ্বাদৌ প্রাকট্যমাত্রং। যথা শ্রীকৃষ্ণো বসুদেবগৃহে অবততার। ভক্তীনাং ভগবচ্ছক্তিবিশেষত্বেনাগ্রে সাধয়িষ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ ॥২॥

আসিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধ ভাবের এইরূপ আবির্ভাব হওয়ার নামই সাধ্যতা।

এখানে মূলে (নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য) এই ভাব শব্দটিকে উপলক্ষণরূপে* প্রয়োগ করিয়াছেন; এ জন্য ভাবশব্দে ভাবভক্তির অনুভাব বা কার্য্যরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভাবভক্তি যেমন ভক্তহৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন, ভাবভক্তির অনুভাব বা কার্য্যরূপ নিত্যসিদ্ধ-শ্রবণকীর্ত্তনাদিও সেইরূপ আপনা হইতেই ভক্তে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্যলীলাতে প্রপঞ্চের অদৃশ্যভাবে নিত্যই বিরাজমান থাকিয়াও প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইবার জন্য নিত্যলীলা হইতে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু বসুদেব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে জন্মাইয়াছিলেন— এমত নহে। সেইরূপ যাঁহারা এই নিত্যসিদ্ধ শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের কর্ণ ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়সমূহে শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু কর্ণ ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ নিজ-নিজ চেষ্টায় শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ সকলকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। যেহেতু—ভক্তিকে শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষের বৃত্তিবিশেষরূপে অগ্রে (ভাবভক্তিপ্রসঙ্গে) নিরূপণ করা হইবে। ২।

---

* স্ব-প্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বমুপলক্ষণং। — যাহা নিজকে প্রতিপাদন করিয়া অপরকেও প্রতিপাদন করে, তাহাকে উপলক্ষণ বলে। 'নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য' এস্থলে ভাব-শব্দটী ভাবভক্তিকে প্রতিপাদন করিয়া, তাহার অনুভাব বা কার্য্যরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকলকেও প্রতিপাদন করিয়াছেন; এজন্য ভাব শব্দটিকে উপলক্ষণ বলা হইয়াছে।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকনাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥৩॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

অত্র বহুষপি ক্রমেষু সৎসু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ আদাবিতিদ্বয়েন। আদৌ

প্রেমাবির্ভাবের ক্রম।

প্রেম-আবির্ভাবের বহু ক্রম আছে, তন্মধ্যে যেটী প্রায়িক অর্থাৎ সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ক্রমটীই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। যথা—ভগবদ্বহির্মুখতাদোষে দূষিত জীব সংসার-সাগরের অনন্ত প্রবাহে পতিত হইয়া অনন্তকাল যাবৎ ভ্রমণ করিতেছে; শ্রীভগবানের অনুগ্রহে যখন সেই জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন শ্রীভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ লাভ ঘটে। এইরূপে প্রথম সাধুসঙ্গ লাভ হইলে, সেই সাধুমুখে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্ এই তিনের মাহাত্ম্য-পূর্ণ শাস্ত্র শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য জন্মে। সেই শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ—শ্রীভগবদ্গীতাদি শাস্ত্রসমূহের অর্থের প্রতি বিশ্বাস শ্রীভগবদ্গীতাতে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন এবং অবশেষে গুহ্য হইতেও অতি গুহ্যতম ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
—গীতা ১৮। ৬৫

আমার ভক্ত হইয়া আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভজন-পরায়ণ হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। অর্জ্জুন! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় হও, আমার এই বাক্য যাহাতে সত্য হয় সে জন্য তোমাকে শপথ (প্রতিজ্ঞা) করিয়া বলিতেছি, ইহাতে কোনই সন্দেহ করিও না।